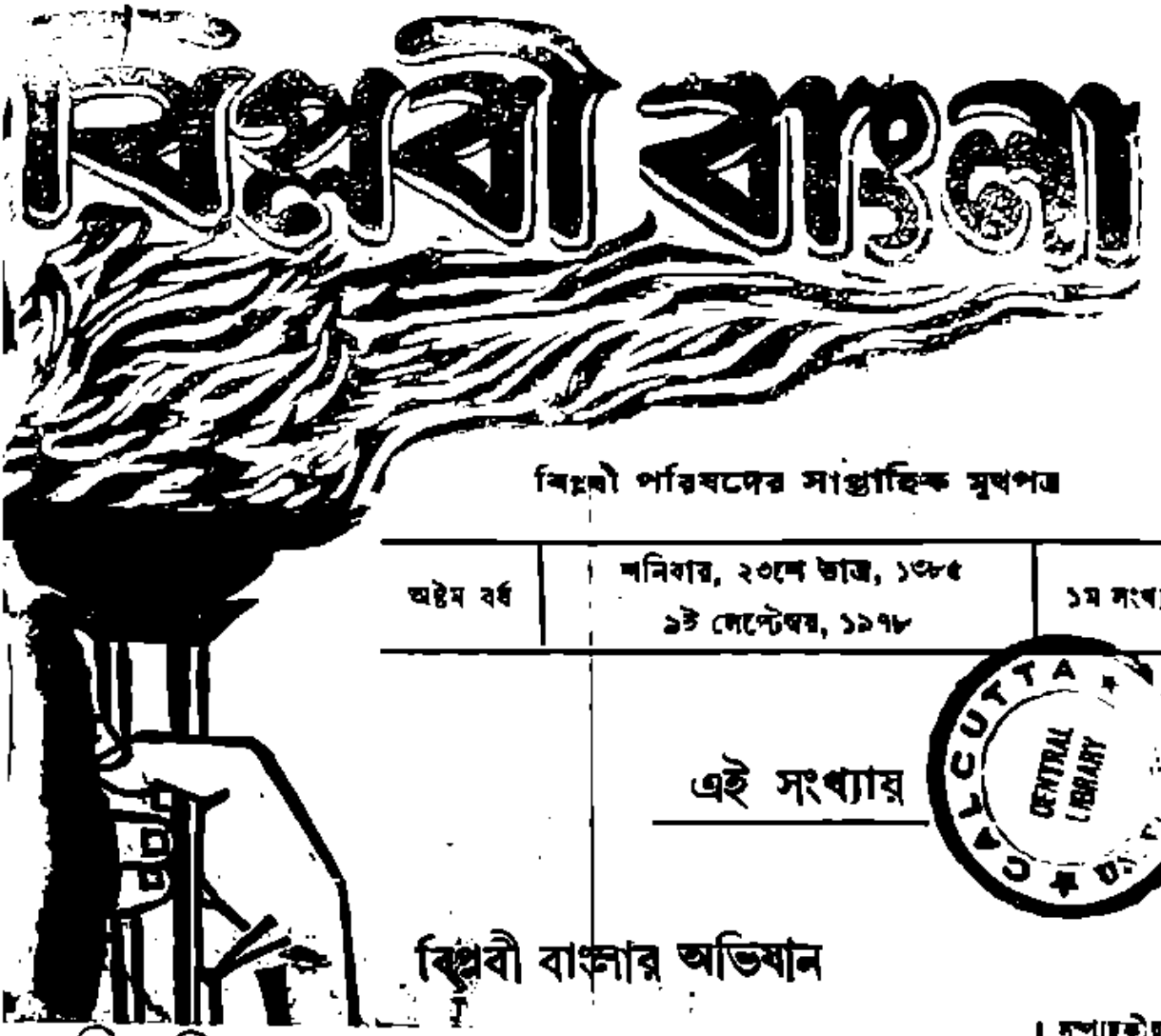

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

অষ্টম বর্ষ	শনিবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৩৮৫ ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮	১ম সংখ্যা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

এই সংখ্যায়

বিপ্লবী বাংলার অভিযান
। সম্পাদকীয় ।

শক্তির ঐতিহাসিক পদযাত্রা
। কৌটিল্য ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক অনিমী মোহন দাশগুপ্ত ।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য
। প্রীতম হালদার ।

যাঁরা শুধু দিয়ে গেল

বিপ্লবী বাংলা
বর্ষ — ৮
সংখ্যা — ১-৮, ১০-১৬,
১৮ — ৪৬
১৩৮৫ - ৮৬ / 1978

"যদি ভারতের মাটি পবিত্রতার মহাশক্তি সঞ্চারিণী হয়, তা হলে তার কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

—স্বামীজী

সম্পাদকীয়

বিপ্লবী বাংলার অভিযান

পথ পরিক্রমায়—বার্ষিক মাইলস্টোনের সপ্তম সীমারেখা অতিক্রম করে অষ্টম বার্ষিকীতে পদার্পণ করলো বিপ্লবী বাংলা—বৈপ্লবীক সংগ্রামী আদর্শের মশালটি দৃঢ় মুষ্ঠিতে তুলে ধরে।

১৯৭০ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর বিপ্লবী বাংলার অভ্যুদয় – নব পর্যায়ে—নব কলেবরে। বিপ্লবী বাংলার পূর্ব পরিচয় "বিপ্লবী বাঙ্গালী"। পরে রূপান্তরিত হয় "বিপ্লবী বাংলায়।" ৯ই সেপ্টম্বর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছিল। বুড়ি বালামের তীরে নব-ভারতের হলদি ঘাটরূপে রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল স্মরণীয় ১৯১৪ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর। বাঘা যতীনের নেতৃত্বে সশস্ত্র ইংরাজ রাজ শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম সম্মুখ সমরে বীরত্বের যে কীর্তি গাথা রচিত হয়েছিল সেদিন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তার তুলনা নাই।

ঋষি বঙ্কিমের মাতৃবন্দনা 'বন্দে-মাতরম'—সঞ্জীবনী মন্ত্র একদা মুমূর্ষু পরাধীন জাতির মনে যে প্রেরণা এনে দিয়েছিলে—বিশ্বজয়ী বিপ্লবী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বজ্র কণ্ঠের বাণী "উত্তিষ্ঠত:—জাগ্রত:" চেতনাহীন জাতীর স্নায়ুতন্ত্রে এনে দিয়েছিল নবজাগরণের চেতনা। বিপ্লব মন্ত্রের গুরু শ্রীঅরবিন্দ বিংশ শতাব্দীর সূচনায় যে অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষায় পথ নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই পথের যাত্রায় ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সত্যেন থেকে শুরু করে—'ঠাকুর রোশনলাল' 'আসফাক উল্লা' 'রাজেন্দ্র লাহিড়ী' 'কর্তার সিং সারাবা' 'ভগৎ সিং' 'শুকদেব রাজগুরু' বিপ্লবের মশাল উর্দ্ধে তুলে ধরে ফাঁসীর মঞ্চে সেয়ে গেলেন জীবনের জয়গান। 'যতীন মুখার্জি, চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী, নীরেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, সতীশ পাল'—বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে দিলেন আত্মাহুতি। সেই পথ অনুসরণে পরবর্ত্তীকালে মাষ্টারদা সূর্য্যসেনের নেতৃত্বে আরও ব্যাপক আকারে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। আর চরমতম পর্য্যায়ে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু প্রস্তুতি চালালেন সুদূর জাপানে প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠন করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চরম এবং শেষ আঘাত হানার জন্য। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়

'নেতাজীর আবির্ভাব এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়করূপে বৃটিশ সাম্রাজ্য বাদের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তারই পরিণতিতে ইংরাজ রাজশক্তি ভারত সাম্রাজ্যের অধিকার ছাড়তে বাধ্য হল। ভারত আজ স্বাধীন। অতীতের বিপ্লবীরাও আজ বয়োবৃদ্ধ, কিন্তু একদা বিপ্লবের মশাল বজ্রমুষ্টিতে তুলে ধরে যে পথ পরিক্রমায় তাঁরা যাত্রা শুরু করেছিলেন সে পথের সীমারেখা কি শেষ হয়ে গেছে? না, শেষ হয়ে যায় নি। প্রগতির পথের কোন শেষ নাই। বিপ্লবের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না কোন দিন। সকল বাধাকে অতিক্রম করে দুর্গম পথের যাত্রায় দুর্জয় সংকল্প আর দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্যদিয়ে সে পথ অতিক্রম করে এসেছে। বৈপ্লবিক আদর্শবাদের যে পবিত্র মশাল একদা সারা ভারতবর্ষকে আলোকিত করেছিল শতশত শহীদের আত্মবলিদানের মধ্যদিয়ে—আজও যে মশালের দীপশিখা নির্বাপিত হয়ে যায় নি। —অনির্বাণ সে দীপশিখাকে আজ তুলে নিতে হবে চলার পথের যাত্রী দেশের তরুণদের।

পরবর্তী পর্যায়ে বিপ্লবের যে পথ সে পথ অর্থ-নৈতিক বিপ্লবের পথ। দেশের প্রতিটি মানুষকে অর্থনীতির দিক দিয়ে স্ব-নির্ভর করে তোলার পথ। দেশকে সমৃদ্ধশালী, শক্তিশালী করে তোলার পথ, সেই পথ পরিক্রমায় আজ এগিয়ে আসতে হবে দেশের তরুণশক্তিকে। তারাই দেশের শক্তি, তারাই দেশের বল —তারা উৎসর্গীকৃত প্রাণ। যে মশাল একদা তুলে ধরেছিলেন বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবীরা—তাঁদেরই উত্তরসূরীরূপে প্রজ্বলিত ওই মশাল দেশের তরুণ শক্তি তাদের দৃঢ় হাতের বজ্রমুষ্টিতে ঊর্দ্ধে তুলে সামনের দিকে—প্রগতির পথে—দেশকে শক্তিশালী, সমৃদ্ধশালী করার শপথ নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলুক বিপ্লবী বাংলার অষ্টম বার্ষিকী পদযাত্রার সূচনায় এই প্রত্যাশাই আমরা করি।

বিপ্লবী বাংলার প্রাণশক্তি দেশের তরুণ সমাজ। দেশাত্মবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলাই হোল বিপ্লবী বাংলার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। নিছক অতীত জীবন স্মৃতির চর্বিত চর্বন নয়—বৈপ্লবিক আদর্শের অনুশীলন—ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ গবেষণা চর্চার মাধ্যমে দেশের তরুণ শক্তির মনকে উজ্জীবিত করে তোলাই হল বিপ্লবী বাংলার মহান ব্রত। এই মহান সংকল্প নিয়ে আমরা পথযাত্রা শুরু করেছি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের আপোষহীন সংগ্রাম আজও আমরা অব্যাহত রেখেছি।

বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক—জয়হিন্দ্।

রক্ততীর্থ-যাত্রী

রক্ততীর্থ বালেশ্বরে চলিয়াছি শহীদ তর্পণ করিতে। বীরযোদ্ধা বাঙালী শহীদদের বুকের রক্তে যে ভূমি আমাদের নিকট পবিত্র হইয়া রহিয়াছে সেই রক্ততীর্থের ধূলিকণায় সেদিনের সেই প্রবাহিত পবিত্র অল্প রক্তধারায় দুই একটি বিন্দু আজও তাহার বর্ণ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সঞ্জীবিত রহিয়াছে কিনা কে জানে!—কিন্তু চলিয়াছি সেই রক্তের আকর্ষণে। দুর্নিবার তাহার আকর্ষণ, সুস্পষ্ট সুনিশ্চিত তাহার আহ্বান!

আজিকার তরুণ বাঙালী, আজিকার স্বাধীন স্বয়ংশাসিত বাঙালী, তোমরা সে আহ্বান শুনিতে পাও কিনা জানি না,—তোমরা সে আকর্ষণ অনুভব কর কিনা জানি না! কিন্তু আমরা যাহারা জীবন প্রভাতে সেই রক্তের আহ্বানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম তাহাদের নিকট সে আহ্বান একটা মৃত্যুহীন অনুজ্ঞা হইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে আজ অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল, সে আকর্ষণ জীবনের গতি ও প্রগতির নির্দেশ দান করিতেছে আজও।

১৯১৪ সাল। সেদিনের বাঙালী, সেদিনের ভারতবাসী দেশকে দেশমাতৃকা বলিয়া জানিত, দেশকে দেশজননী বলিয়া পূজা করিত। শৃঙ্খলিত দেশমাতৃকাকে মুক্ত করিবার জন্য মায়ের সন্তান যাহারা তাহারা সেদিন অস্ত্রোৎসর্গের শপথ গ্রহণ করিয়াছিল, মাতৃ অঙ্গকে শৃঙ্খলের বেদনামুক্ত করিবার জন্য অকাতরে আত্মাহুতি দিয়া গৌরব বোধ করিয়াছে। ১৯১৪ সালে বালেশ্বর তাহারই একটি ইতিহাস বুকে করিয়া তীর্থে পরিণত হইয়া আছে। সে তীর্থ তাই ভারত সন্তানের মাতৃতীর্থ।

তোমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, দেশ আজ তোমার নিকট কয়েক লক্ষ বর্গ মাইল ভূসম্পত্তি তোমরা সেই সম্পত্তির নির্বিকল্প সর্বাধিকারী। ইচ্ছা করিলে তাহাকে ভোগ করিতে পার, ইচ্ছা করিলে তাহাকে দান করিতে পার, সগদ মূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতেও পার। তোমাদের হিংসা করি না; কিন্তু আমরা যাহারা দেশকে একদিন জননী বলিয়া জানিয়াছিলাম তাহারা তাহাকে দান, বিক্রয় বা ভোগের সামগ্রী বলিয়া ভাবিতেও পারি না—লজ্জায় সঙ্কোচে ভয়ে নিজের অস্তিত্বকে হারাইয়া ফেলি। বালেশ্বরের রক্ততীর্থ তাই আজও আমাদের মাতৃতীর্থের অভিজ্ঞান।

ঐশ্বর্য্য গৌরবে গৌরবান্বিত মুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের গর্বিত নাগরিক তোমরা। দামোদরবাঁধ বাখরানাডাল, হীরাকুঁদ, দুর্গাপুর, ময়ূরাক্ষী, মাইথন, কুরকেল্লা, ভিলাই তোমাদের জয় পতাকা তোমাদের অবজ্ঞা করি না, কিন্তু ভুলিতে পারি না সম্পদ একদিন আমাদের ছিল, তাহার আকর্ষণে লুব্ধ আততায়ি বারংবার যখন মাতৃ অঙ্গে শাঘাত হানিয়াছে, শুধু সম্পদ দিয়া সে আঘাত নিবারণ

করিতে পারি নাই, বুকের রক্ত ঢালিয়া সে আঘাত রোধ করিতে হইয়াছে., অথবা রক্ত দিতে পারি নাই বলিয়া মাতৃঅঙ্গে বন্ধনের বেদনা অসহায়ের মত সহ্য করিতে হইয়াছে। তাই বালেশ্বরের রক্ততীর্থ আজও আমাদের মুক্তিতীর্থের প্রতীক, তাহাকে ভুলিতে পারি না।

তোমরা প্রগতিবাদি বন্ধুবৎসল জাতি বলিয়া সারা পৃথিবীতে আজ পরিচিত হইয়াছে,—বন্ধু তোমরা। জননীকে খণ্ডিত করিয়া এক মাতৃগর্ভজাত ভ্রাতার মিত্রতা ক্রয় করিয়াছ, প্রতিবেশী চীন তোমাদের সীমান্ত বেদখল করিলে তোমরা অন্যতম বন্ধুর মিত্রতার অভিযান কল্পনা করিয়া তোমার সজ্জিত কর, তোমাদের সুবিস্তীর্ণ সম্পত্তির কিছু অংশ নির্বিবাদে তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রতিবেশীর সহিত মৈত্রী সম্পর্ক প্রগাঢ় করিবার স্বপ্ন দেখিতে পার। তোমার স্বপ্ন সার্থক হউক। মাতৃ অঙ্গ বিলাইয়া দিয়া বন্ধুকে লইয়া যদি সুখে থাকিতে পার, শান্তিতে বাস করিতে পার, যদি সসম্মানে গৌরবে ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে পার, তবে আমরা ক্ষুব্ধ হইব না।—কিন্তু ভাই, তোমাদের আজিকার এই বন্ধুত্ব বিনিময়ের সওগাদ অথবা পণ্য যে সম্পত্তি তাহাকে জীবন প্রভাতে একদিন আমরা শৃঙ্খলিতা, অবমানিতা, অশ্রুসজলা মাতৃরূপে লাভ করিয়াছিলাম।

তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিতে, তাহাকে অবমাননা হইতে রক্ষা করিতে, তাহার নয়নের অশ্রু মুছাইতে একদিন তোমাদেরই পূর্বগামীগণ যখন বন্ধুর অন্বেষণে, মিত্রের সন্ধানে পৃথিবীর প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর নিঃসম্বল পর্যটন করিয়া ফিরিয়াছেন তখন তাহাদের ভাগ্যে জুটিয়াছে পঙ্কুকুরের বিড়ম্বনা। সে জ্বালা সে বিড়ম্বনা কল্পনা করিতেও তোমাদের বলি না। কিন্তু আমরা ভুলিতে পারি না। তাই চলিয়াছি সেই রক্ততীর্থে যেথায় প্রথমতম এক বন্ধুর গোপন সওগাদ গ্রহন করিতে গিয়া সেদিন দুর্দিনের বন্ধু অন্বেষণে রত তোমাদেরই পূর্বগামী একদল বাঙ্গালী তরুণ বুকের রক্ত ঢালিয়া নির্বান্ধব প্রান্তরের বালুকণাকে রঞ্জিত করিয়া গেল। আজ তোমার সুদিনের বন্ধু মিলিয়াছে, জানি না সে কেমন! কিন্তু তোমাদের জীবনে স্বার্থকতা দান করিতে, তোমাদের জীবনকে গৌরবমণ্ডিত করিতে বন্ধু খুঁজিয়া যাহারা পায় নাই, আপন রক্তের রেখায় তোমাদের আজিকার যাত্রাপথের যাহারা নিশানা নির্দেশ করিয়া গিয়াছে, যদি ইচ্ছা হয় মুহূর্তের জন্য তাহাদের স্মরণ করিও, সুদিনে না হউক দুর্দিনে ছায়ার মত পার্শ্বে থাকিয়া, বিবেকের মত বুকের মধ্যে বসিয়া, শক্তির মত বাহুকে আশ্রয় করিয়া তোমাদের তাহারা সঙ্গদান করিবে, তোমাদের সঙ্গী হইবে। স্মরণ করিও আজ শত-সহস্র শহীদের সঙ্গে তাহাদের—

বুড়ীবালামের তীরে—
বুকের রক্তে সেদিন যাহারা রাঙালো ধরণীরে।

উদ্ধৃতি—বিপ্লবী বাঙ্গালী

নূতন ইহুদী

কৌটিল্য

ভগবান, তোমার বিশ্ব হইতে নীতিবোধ, বিবেকদংশন, সহানুভূতি, শিষ্টাচার, মানবতাবোধ সবই কাড়িয়া লইয়াছ? আর শুধু অবশিষ্ট রাখিয়াছ, মিথ্যাচার চাটু করিয়া, (রাজনৈতিক) অভিসন্ধি, (গূঢ়) বিদ্বেষ, কূট কাটব্য ও ধড়? এই সেদিন সি. পি. এম. নেতা, ওরফে রামফল্ট সভাপতি বলিয়াছেন, বলপ্রয়োগের দ্বারা উদ্বাস্তুদের হৃতকারণো পাঠাইতে হইবে। এই নিষ্ঠুর অমানুষিক উক্তির পাশে একটি ছোট্টশব্দ অনুযোজনা করা হইয়াছিল, 'প্রয়োজন হইলে'। এই প্রয়োজনের কোন মাপকাঠি নাই। একের 'প্রয়োজন' অন্যের পক্ষে বিপদ হইতে পারে। আসলে 'প্রয়োজনটা' ইতিপূর্বেই হইয়া রহিয়াছে। এবং রামফল্ট সরকারের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মচারীরা আসল ইঙ্গিতের নাম যে 'প্রয়োজন হইলে' তাহাও বুঝিয়া লইয়াছেন। দ্বিধা-বিভক্ত আইনসভায় গর্বোদ্ধত মুখ্যমন্ত্রীর বাক্যগুলির সব স্পষ্ট বোঝেন। মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন, তিনি (আইনসভা) বিধান সভাও ভাঙিবেন না এবং উদ্বাস্তুদের আইন মোতাবেক গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা ও মামলা করিবেন। এসব বিবৃতি কাশীপুর শিবিরে গুলি হইবার পর)। সে যাহাই হউক, যে সব ইঙ্গিত অর্থবহ তাহা বিশেষ ভাষার মাধ্যমে আসেনা। কাজেই এই নিরাভরণ ভাষাটি (প্রয়োজন) যে কালে কালে ভয়ঙ্কর রূপ লইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি। বস্তুতঃ পক্ষে বর্তমান, কাশীপুর উদ্বাস্তু শিবিরে যাহা ঘটিয়াছে তাহা অনুমাত্র ভয়ঙ্কর বলিয়া আখ্যা দিলেই চলিবেনা। এই ঘটনা হইতে উদ্বাস্তু দরদী সি. পি. এম. আর তাহাদের দলবল সরকার রামফল্ট সবারই আসল রূপ চিনিয়া লইতে হইবে। ভাগ্যের পরিহাস আর কাহাকে বলে, এই সি. পি. এম. দলের শতকরা নব্বই ভাগ, পূর্ব বাঙ্গালার উদ্বাস্তু সমাজের পুনর্বাসন মন্ত্রী স্বয়ং উদ্বাস্তু সমাজের লোক। নেতা (রামফল্টের সভাপতি) স্বয়ং উদ্বাস্তু সমাজের লোক। সবার পূর্ব কূলে বসিয়া সবাই সুতন সুরে গান গাহিতেছেন। আর হতভাগাদের প্রতি মেজাজ দেখাইতেছেন। এই সব নেতৃত্ব যদি পূর্ব বাঙ্গালায় বন্ধ হইয়া থাকিত তবে এতবাক্য-স্ফূর্তি হইত কিনা, তাহা খোদাই জানেন। এখানে পশ্চিম বাঙ্গালায় গণতন্ত্রের নামে দল তন্ত্রের সুবিধাবাদ প্রচার গর্বোদ্ধত বাক্যষ্টা-সবই চলে। এখানে কোন আপদ বালাই নাই। কংগ্রেস বড় খারাপ। কিন্তু কংগ্রেস রচিত গঠনতন্ত্রটা (বুর্জোয়াতন্ত্রী) হইলেও একটু একটু সুবিধাজনক অধিকার আছে। ওইটাই লুটিয়া পুটিয়া যতটা পারাযায় ভোগ করা যাক। ওইটেই গণতান্ত্রিক অধিকার বুঝিয়া রাখ। সব ব্যাপারেই বিভক্ত ব্রাহ্মণের মুখে যেমন, ওঁ বিষ্ণুঃ তেমনি সি. পি. এম. এর মুখে সব ব্যাপারেই ওঁ গণতন্ত্রী-মানুষ বিষ্ণুঃ। নূতন মন্ত্র গ্রহন করিলে যেমন, অবিরাম জপিতে হয়, এ-ও ঠিক তাহাই হইল। প্রোলেতারীয় এক নায়কতন্ত্রী মার্কসবাদীরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নেশায় মশগুল হইয়া উঠিলেন। এবং ওই নামই জপ করিতে লাগিলেন। ভারতের যে কোন অংশে যে কোন ভারতবাসীর থাকিবার যে মৌলিক অধিকার আছে, এই মূল কথাটা একদম চাপিয়া গেলেন। 'উদ্বাস্তু হঠাও' এই শ্লোগান তুলিয়া সভায় বাজীমাৎ করিবার জন্য সব পার্টিজনদের বলিয়া দিলেন।

স্থান নাই। পশ্চিম বাঙ্গালায় স্থান নাই। হতভাগ্যদের হৃতকারণো ফিরিয়া যাইতেই হইবে। কারণ, ইহার মধ্যে একটু সুবিধাবাদের গন্ধ আছে। সবাই জানেন, কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তুদের প্রতি বিদ্বেষমূলক ব্যবহার করিয়া থাকেন। আর ওই বিরূপ ভাবটি (বিদ্বেষমূলক ভাবটি) সম্বল করিয়া ওরাও—অর্থাৎ বাম সরকারের শরীকেরাও

কেন্দ্ররাজ্য মিতালী মিতালী ভাব দেখাইতেছেন। অন্যথায় বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্র বিমুখ, শুধু বিমুখ নয়। সক্রিয় ভাবে বিরোধীতার প্রচারে নামিয়াছেন। তাই আজ উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া, আপাতমধুর সম্পর্কের জোরে বামফ্রন্টের সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী চোখা চোখা বাক্য বাণ বর্ষন করিতেছেন।

যাঁহারা কলিকাতার পার্শ্ববর্তী সুবিধাজনক অঞ্চলগুলি দখল করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহারা উদ্বাস্তু সমাজের উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত। এদের শিক্ষার জোর আছে। যোগাযোগের জোর আছে। এরা বুদ্ধিজীবী। ভালকে মন্দ করিয়া, মন্দকে ভাল করিয়া সাজাইয়া বলিতে জানে। এদের যুক্তি বাস্তিক তবে ঠাসা। এও হয়, ওঁ-ও হয়। এদের ছেলেরা আজ সংসদ সদস্য। বিধানসভা সদস্য, বড় বড় চাকুরে। এরা সবাই দল বাঁধিয়া কলিকাতা এবং অন্যান্য শহরের ভাল অঞ্চলগুলি দখল করিবার পর, এখন যাঁরা আসিতেছেন বা আসিয়া পড়িয়াছেন তাহাদের আপদ বলিয়া মনে করিতেছেন। এখানেও সেই স্বিত স্বার্থের খেলা। অবশ্য দখলে কল উদ্বাস্তু উপনিবেশ সৃষ্টি হয় নাই। এই অবশ্য দখলী উপনিবেশ উদ্বাস্তু শিবিরগুলি আমাদের গ্রাম-পল্লী নেতাদের বড় খাঁটি ছিল। এখান হইতে নির্বাচনের দিন নানা রকম ষ্ট্র্যাটেজি তৈরী হইত। সরকারকে কি প্রশ্নে ঘায়েল করা যায়, তার সব রকম প্রচেষ্টাই চালানো হইত। বিধাতা এক দিন বামদের প্রতি বাম-ই ছিলেন। বহুদিন পরে তিনি সদয় হইয়া যে অস্ত্রটি বামদের হাতে তুলিয়া দিলেন তাহার প্রথম প্রয়োগ হইল উদ্বাস্তুদের উপরে।

[ইতিপূর্বে উদ্বাস্তু সমস্যা লইয়া সি. পি. এম নেতারা আর তাদের সহযোগীরা যথেষ্ট হৈচৈ করিয়াছেন। তখন তাদের পক্ষে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত বেকার যুবকেরা ভাল দিয়াছেন। দুর্ভাগ্যের বা আন্দামানে, যাতে পুনর্বাসন না হয়, তার জন্য তথাকথিত বাস্তু হারা আন্দোলন গড়াই করিয়াছেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির পোলাকী জনপ্রিয়তা অর্জনের এই উদ্বাস্তু শিবিরগুলি ছিল প্রধান উৎস। যে-উদ্বাস্তু সমাজ এই নেতাদের প্রতিপালনে ব্যস্ত ছিলেন, তারা জানেন না যে কম্যুনিষ্ট পার্টিই একদিন পাকিস্তানের স্বপক্ষে প্রচার চালাইয়া জনমত সৃষ্টির কাজে ব্যস্ত ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টিতে কম্যুনিষ্ট পার্টির সক্রিয় অংশ আছে। নৈতিক দাবি আছে। সেদিন সংখ্যা লঘু জাতগোষ্ঠী (nationality) আত্মনিয়ন্ত্রণ চাই বলিয়া ওরাই চীৎকার করিয়াছিলেন। ভারতে ইসলাম পন্থী সমাজ সংখ্যা লঘু অতএব তাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার আছে। জিন্না সাহেবের এই তথ্যটাকেই সাজাইয়া গুছাইয়া পাকিস্তান নাম দিয়া দাবী করিয়াছিলেন। বিপদ শুধু এখান হইতে শুরু হয় নাই। আজিকার উদ্বাস্তু সমাজ সৃষ্টিতে আরও অনেক ঐতিহাসিক কারণ সৃষ্টি হইয়াছিল। তৎকালীন বাঙ্গালায় ১৯৪০ সালে কংগ্রেস লোক গননা বয়কট করে। ফলে ১৯৪০ সালের তৎকালীন সরকার লোক গননার কারসাজিতে 'সাধারণ' নামক হিন্দু সমাজকে প্রায় সংখ্যা লঘুতে পরিণত করিয়াছিল। দেশ ভাগের সময় এই সংখ্যা অনুযায়ী দীঘানা ভাগ হইয়াছিল। কার পাপে পূর্ব্ব বাঙ্গালার হিন্দু সমাজ ডুবিল তাহা আজ আর বিচার করিতে চাহিনা। আর শতবত বিচার করিয়াও লাভ নাই। যে জোয়ার বহিয়া গিয়াছে তাহাকে আর ফিরাইয়া আনা সম্ভব নহে। তাই বর্ত্তমান পরিস্থিতি লইয়া বিচার করিতে হইবে। যখন বাঙ্গালার বহিরে এই হতভাগ্যের দলকে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা হইতেছিল তখন প্রবীণ স্বাধী নেতা সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় সুন্দর বনে পুনর্বাসন সম্ভব বলিয়া একটি ছক প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই ছকটি পুরাপুরিই সম্ভবত দৈনিক যুগান্তর, পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের ক্রমওয়েল বিপ্লব হইতে শুরু করিয়া আধুনিক যুগের রুশ বিপ্লব পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে যখনই কোন রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে তখনই জনতার একটি অংশ গৃহবাস ত্যাগে বাধ্য হইয়াছে। জনতার এই গৃহবাস ত্যাগ একটি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহন করিতে হইবে। জনতা নিজে জানেনা ইতিহাসের শক্তির ক্রীড়নক হইয়া তাহারা এই কাজ (অর্থাৎ গৃহবাস ত্যাগ)

করিয়া থাকে। ইতিহাসের এই শিক্ষাটা ভারতীয় নেতারা গ্রহণ করেন নাই। তাই উপ্ত জনতার আবির্ভাব যখনই হইয়াছে তাহাকে তখনই নিছক ঘৃণ্যতার দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন। এই অর্থহীন ভাবালু ঘৃণ্যতা কতক্ষণ টিকিয়া থাকে। এই জাতীয় রঙ চটকা ভাবুলতা দুদিনে উবিয়া গেল। কেহই উহার মর্মস্থলে মনস্তাত্ত্বিক নাড়ীর অস্ত্র বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। ফলে তথাকথিত মানবতা ভরা-নিমাদ দুদিনেই ফুরাইয়া গেল। মানবতা যখন সহানুভূতির পাত্রে তলানি স্বরূপ পড়িয়া রহিল, তখন সহানুভূতির পাত্রটাকে একলথিতে ভাঙিয়া ফেলিয়া যে যার ঘরে যাইবার উপক্রম করিতেছে। আজ আর উদ্বাস্তুদের প্রতি কাহারো সহানুভূতিও নাই, দাক্ষিণ্যও নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি ১৯৪০ সালে বাঙলার যে লোকগণনা হয় তাহা কংগ্রেস অবিমৃষ্যকারিতায় বসে বর্জন করিয়াছিল। এই বর্জনের ফল সম্পূর্ণ পায় মুসলীম লীগ। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা যেমন না গ্রহণ না বর্জন নীতিদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। কংগ্রেস ইচ্ছায় হোক বা দূরদৃষ্টির অভাবেই হোক, নিষ্ক্রিয় নীতি গ্রহণ করার ফলে ভারতের সমগ্র রাজনীতিটা বিপথে চলিয়া গেল। মুসলীম লীগ আগিল। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ছাড়া পথ নাই। প্রকৃত পক্ষে, মুসলীম লীগ লড়াই করিয়া পাকিস্তান আদায় করিয়াছে। কংগ্রেসের গৃহযুদ্ধের বড় ভয় ছিল। কিন্তু পাকাবে যাহা ঘটিয়াছে তাহা গৃহ যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়। একটা সাম্প্রদায়িক খোলস পরিয়া সব কাজ সমাধা হইয়াছিল। বাঙালী হিন্দু ওই জাতীয় গৃহ যুদ্ধকে মনে মনে গ্রহণ করেন নাই। এই হিন্দু সমাজ অমনিতেই অর্ধ মনোভাবাপন্ন নয়। তার উপর সমগ্র সমাজটার কি হইবে, তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তা করেন নাই। যেহেতু দিল্লী হইতে বাঙলা অনেক দূরে, সেহেতুই বাঙলার সমস্যা অনুধাবন করে নাই অথবা আসল সমস্যার চেহারাটা অবলোকন করে নাই। স্থানীয় সরকার অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুখ্যত পশ্চিমবঙ্গবাসীর হাতে। তাঁরা ভোট দিয়া সরকার গঠন করেন। তাঁরা তা নিয়ে ব্যস্ত তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত সাধারণ মানুষ পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত মানুষকে সন্দেহের চোখে দেখে। ওরা আসে কেন? ওরা ওদের জন্মভূমিতে থাকলেইত পারে? কিন্তু তাদের পূর্ববঙ্গ বাসীদের জন্মভূমি নয় মাতৃভূমি—একথাটা কি কেন্দ্রীয় সরকার, কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কাহাকেও বোঝানো যাইতেছে না। ভারতেরপূর্ব অঞ্চলে ইতিহাস একটি নূতন ইহুদী শ্রেণী সৃষ্টি করিল। এই নতুন ইহুদী শ্রেণী সৃষ্টিতে আসামের গোপীনাথ বড়দলুই ও অওহর লাল নেহেরুর একটা বড় রকমের দান রহিয়াছে। আসাম বরাবরই পূর্ববঙ্গ বাসীদের প্রতি বিরূপ। সিলেট জেলার বাঙালীদের প্রতি আসামের বৈরীভাবের অন্ত ছিল না। যখন কেবিনেট মিশন Grouping (গ্রুপিং-এর) কথা উল্লেখ করলেন তখন হইতে গোপীনাথ বড়দলুই ইহার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করিলেন। গান্ধীজী তখন নোয়াখালীতে, গোপীনাথ বড়দলুই গিয়া গান্ধীজীকে ধরিলেন, যদি ক্যাবিনেট মিশনের গ্রুপিং মানিয়া লওয়া হয় তবে আসামের সমূহ ক্ষতি। গান্ধীজী নোয়াখালী হইতে গ্রুপিংএর বিরুদ্ধে একটি বিবৃতি দিয়া ভারত ইতিহাসের মোড় ফিরাইয়া দিলেন। আসাম গ্রুপিং এ যাবে না এই ছিল গান্ধীজীর বিবৃতির মর্ম। ক্যাবিনেট মিশন চলিয়া গেল। ভারতভাগের মতামতগুলি মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। এর পরবর্তী ইতিহাস এখানে পুনরাবৃত্তি করিয়া লাভ নাই। যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিয়াছে। পাঞ্জাবের সমস্যা পাঞ্জাবীরা মারিয়া পিটিয়া সাবধান করিয়াছে। যতদূর স্মরণ হইতেছে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল উদ্বাস্তু স্বার্থে কিছু সংলগ্ন এলাকার ভূখণ্ড দাবী করিয়াছিলেন। অওহরলাল এই দাবীর মধ্যে বোধ হয় আন্তর্জাতিক সমস্যা দেখিতে পাইয়াছিলেন। অতএব ছলেবলে কৌশলে দাবীটা কে চাপা দেওয়া হইল।

(চলবে)

ভারতীয়
সাম্রাজ্যবাদ শক্তির ঐতিহাসিক পদযাত্রা

[ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথের কাছ থেকে ১৬০০ সালে 'বণিকের মানদণ্ড' হিসেবে 'কোম্পানী'র সনদ লাভ করে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' ধীরে ধীরে ভারত ভূমিতে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করতে থাকে। 'রাজদণ্ডে' 'বণিকের মানদণ্ডে'র আত্মপ্রকাশ ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর। যুদ্ধ-বিগ্রহ আর চক্রান্তদ্বারা পরবর্তী এক বৎসরে ইংলণ্ডেশ্বরের অধীনস্থ হয় ভারতভূমি-চিহ্নিত হয় বৃটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজন্যবর্গের রাজ্য হিসেবে। পলাশী যুদ্ধের পূর্বে কলিকাতার কাশিমবাজারে কোম্পানীর চক্রান্তের জালপ্রতি বাংলায় ওদের ক্রীড়নক নবাবের আড়ালে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থোদ্ধার। শিল্প বিপ্লবের আগমনী হিসেবে ১৭৫৪ সালে ইংলণ্ডে 'বাষ্প শক্তির' (SteamEngine') আবিষ্কার তখন দিনে দিনে কাঁচা মালের চাহিদা বাড়িয়ে তোলে—তাদের শিল্পজাত পণ্যের বিক্রয় স্থল। সাম্রাজ্যবাদী লোভের প্রতিক্রিয়া হিসেবে শুরু থেকেই এদেশের সমাজদেহে দেখা যায় ইংরেজদের ঠাঁই না দেওয়ার চেষ্টা, যেখানে পারা যায় সেখানেই তাদের উৎখাত করার প্রচেষ্টা এবং সর্বশেষে তাকে সম্পূর্ণ বিলোপ করে ভারতবাসীর আত্মপ্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রয়াস। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির ঐতিহাসিক পদচিহ্ন এখানে দেওয়া হল। —সম্পাদক, বিপ্লবী বাংলা]

১৭৫৪ : ইংলণ্ডে 'বাষ্প শক্তির' আবিষ্কার (Steam Engine)

১৭৫৬ : বাংলার নবাব আলীবর্দীর মৃত্যু ; নবাব হলেন সিরাজদ্দৌলা। ইংরেজের কাশিমবাজার দুর্গ ও ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করেন নবাব সিরাজদ্দৌলা ২২শে মে এবং ২০শে জুন।

১৭৫৭ : পলাশীর যুদ্ধ ২৩শে জুন ; যুদ্ধে মীরমদন ও মোহনলালের মৃত্যু বরণ। নবাব সিরাজদ্দৌলা পরাজিত ও নিহত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্রীড়নক মীরজাফর নবাব হলেন ২৮শে জুন।

১৭৬০ : মীরজাফর গদীচ্যুত, নবাব হলেন মীর কাশিম। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৭৭৪)।

১৭৬৩ : মীর কাশিমের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ।

১৭৬৪ : মীর কাশিম পরাজিত ও ছদ্মবেশে দিল্লীতে উপনীত। মীরজাফর আবার নবাব হলেন।

১৭৬৫ : মীরজাফরের মৃত্যু ; তার পুত্র নাজিমুদ্দৌলা নবাব হলেন। দিল্লীশ্বর পরাজিত হলেন বক্সার যুদ্ধে। বাদশা শাহ-আলমের কাছ থেকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী সনদ লাভ আমদানীর ব্যবস্থা এবার রাজস্ব আদায়ের অধিকারে আরও পুষ্ট হল।

১৭৬৬ : খেলনুর বিদ্রোহ (১৭৬৬-১৭৯৪)।
হায়দার আলীর বিরুদ্ধে ইংরেজ মারহাটা ও নিজামের সমঝোতা।

১৭৬৭ : ক্লাইভের ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন। প্রথম চুয়ার বিদ্রোহ। ঝিলুয়ার বিদ্রোহ।

১৭৬৯ : হায়দর আলী ও বৃটিশের প্রথম যুদ্ধ।

১৭৭০ : বাংলায় নিদারুণ মন্বন্তর। চুয়ার বিদ্রোহ।

১৭৭২ : বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যাবলী পরিদর্শনের জন্য কমিটি নিয়োগ।
হেষ্টিংস কর্তৃক রাজস্ব-বোর্ড স্থাপন। বাংলার নবাবের হাত থেকে শাসন ও রাজস্বের দায়-দায়ীত্ব কোম্পানীর গ্রহণ।

১৭৭৩ : বাংলা-মাদ্রাজ-বোম্বাই প্রেসিডেন্সীত্রয়ের উপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাজার সঙ্কুচিত বৃটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ আরোপিত (Regulating Act of 1773)। বাংলার লাটসাহেব হলেন এবার বড়লাট—তাঁরই খবর-দারির আওতায় এলো প্রেসিডেন্সীত্রয়।

১৭৭৪ : কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপন। চৈৎ সিংহ কাশীর স্বাধীন-নৃপতি বলে ঘোষিত।

১৭৭৫ : মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসী (এই আগষ্ট) বিচিত্রপুর হুলীবাজারে।

১৭৭৬ : ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী।

১৭৭৮ : নীল চাষের প্রবর্তন (১৭৭৮-১৮০০)।

১৭৮২ : তমলুকের পাণী কৃষকশ্রেণীর বিদ্রোহ—ঘাণী পরাজিত ও রাজাচ্যুত।

১৭৮৩ : বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ভারতে দাস-ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ। পাসিয়া বিদ্রোহ : দিনাজপুর ও রংপুরে কৃষক বিদ্রোহ।

১৭৮৪ : ইংলণ্ডে 'নিয়ন্ত্রণ বোর্ড' গঠন (Board of control) : এই বোর্ড 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' যাবতীয় ভারতীয় কার্য্যাবলীর নিয়ামকরূপে গঠিত হয় (Pill's India Act)।

১৭৯০ : টিপু সুলতানের কালিকট যুদ্ধে পরাজয়।
তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ।

১৭৯১ : বোম্বাইয়ে মুদ্রণ সম্পর্কিত বিধিনিষেধ আরোপ।

১৭৯২ : বালাবার বিদ্রোহ।

১৭৯৩ : লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'—ফলে জমির মালিকানার ঘটলো হেরফের, মধ্যস্বত্ব ভোগীরূপে আত্মপ্রকাশ করলো সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী জমিদারগণ।
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য-সনদ আরো কুড়ি বৎসরের জন্য পুনর্নবীকরণ। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কর্তৃক উচ্চপদস্থ দেশীয় কর্মচারীগণ অপসারিত ও বিদেশীগণ নিয়োজিত।
বে-আইনী সনদ প্রস্তুত বা আমদানী নিষিদ্ধ হল

১৭৯৪ : ভিজিয়ানাগ্রাম বিদ্রোহ।

১৭৯৫ : নীল চাষের জন্য জমির স্থায়ী অধিকার দেওয়া হল বিদেশীদের (Regulation XXXIII)
ঘাটশিলা যুদ্ধ।

১৭৯৮ : পাগল বিদ্রোহ (১৭৯৮-১৮০০)।

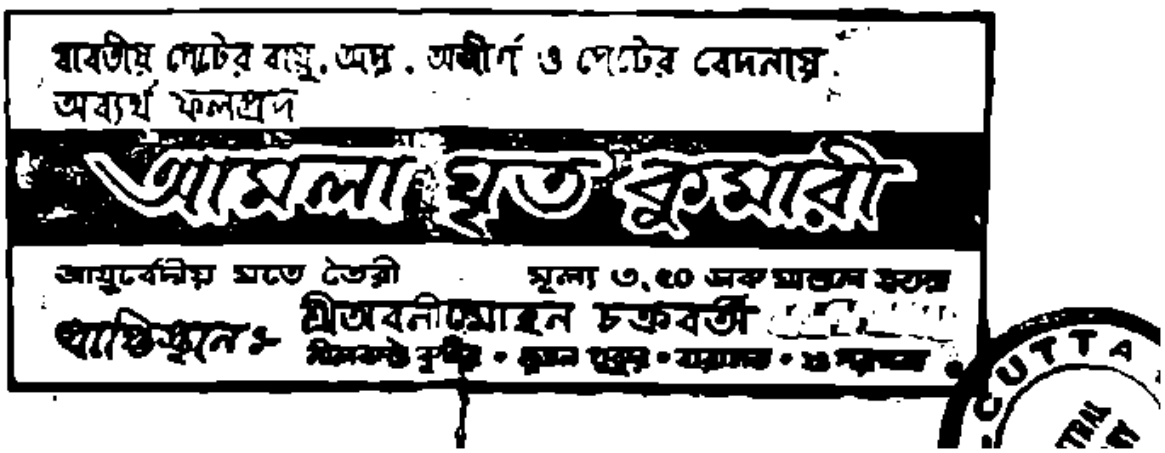

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

ইংল্যাণ্ডে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

বোম্বে কংগ্রেসে গৃহীত এক প্রস্তাবানুসারে ইংল্যাণ্ডে কংগ্রেসের একটি ডেপুটেশন প্রেরণের ব্যবস্থা করা হল। এই ডেপুটেশনের কাজ হবে "সেখানে কংগ্রেসের মতামত প্রচার করা এবং কংগ্রেস যে রাজনৈতিক শাসন সংস্কার চায় তার প্রতি ব্রিটিশ জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা।" রাজনৈতিক শাসন সংস্কার বলতে এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ হল কাউন্সিল সমূহের পুনর্গঠন ও পরিবর্ধন করে জন প্রতিনিধিগণ কর্তৃক পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার সূচনা করা। প্রকৃতপক্ষে এই দাবীটি কংগ্রেসের সমানরই ছিল। কংগ্রেসের বোম্বে অধিবেশনে পরিকল্পনাটির একটি কাঠামো তৈরী করা হয় এবং সেটি গৃহীত হল। এই কাঠামোতে কাউন্সিলগুলি পুনর্গঠিত হবে সে বিষয়ে একটি মোটামুটি রূপরেখা টানা হয়। মিঃ ব্র্যাড্‌লকে এই রূপরেখা অনুযায়ী পার্লিয়ামেণ্টে একটি বিল আনার জন্য অনুরোধ করা হল। নাম উল্লেখ করে ডেপুটেশনের সদস্যগণকে নিয়োগ করা হল। এই ডেপুটেশনের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মিঃ ডিউম, স্যার ফিরোজ শা মেটা, মিঃ মনোমোহন ঘোষ, মিঃ ডব্লু. সি. বনার্জি, মিঃ শম্ভিক উদ্দীন, মিঃ আর্ডজে নর্টন, মিঃ আর এন. মুদলকর এবং আমি নিজেও ছিলাম।

ডেপুটেশনের প্রত্যেক সদস্যকেই নিজের খরচ নিজেকেই বহন করতে হবে। আমরা জানতাম যে, এমন কি ইংল্যাণ্ডেও এই ব্যবস্থাকে অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে করা হয়; কিন্তু আমরা সেজন্য কোন দ্বিধা বোধ করিনি, অন্যান্য সদস্যগণের আর্থিক সঙ্গতি কিরূপ ছিল, আমি জানিনা, কিন্তু আমার যা সঙ্গতি ছিল, তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। সর্বসাকুল্যে আমার পারিবারিক সম্পদ ছিল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে ১০ হাজার টাকা। ঐ টাকা ছিল আমার স্ত্রীর নামে গচ্ছিত করা। এই রকম একটা হিসাব করা হয়েছিল যে প্রত্যেক সদস্যের ৪ হাজার টাকার মত, অন্য কথায় বলা যায় যে এ ব্যাপারে আমাকে আমার স্বল্প সঞ্চয়ের এক তৃতীয়াংশ আমাকে ব্যয় করতে হবে। এই ত্যাগ স্বীকারের জন্য আমি কোন বোধ করিনি। আজ আমি আমার স্ত্রীর প্রতি একটু মর্যাদা প্রদর্শন করে বলতে পারি যে তার কাছেই আমি এজন্য ঋণী। তিনি স্বেচ্ছাতে আমার কাজে সায় দিলেন এবং যে উদ্দেশ্যে সেই সিকিউরিটির টাকাটা চাওয়া হল সে উদ্দেশ্যে সেই সিকিউরিটির কাগজগুলো দিয়ে দিলেন। এই কাজের জন্য যে খরচ বহন করতে হয়েছিল তার এক কার্দিও নিজেদের তহবিল ছাড়া অন্য কোন সূত্র থেকে গ্রহণ করিনি। আমাদের যাত্রা কাল থেকে শুরু করে দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত সমস্ত পথ খরচ এবং হোটেল খরচ আমরা নিজেরাই বহন করেছি। ডেপুটেশনের প্রত্যেক-সদস্য সম্পর্কেই একথা সত্য। কংগ্রেসের এটাই ছিল ইংল্যাণ্ডে প্রথম ডেপুটেশন, এবং এই ডেপুটেশনের মিশন ছিল সেই একটাই শাসন সংস্কারের সূচনা করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা যে শাসন সংস্কার শেষ পর্যন্ত ভারতে শাসনে পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

এই ডেপুটেশন সে সময়ে প্রচুর কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল। একথা বলা কিছুমাত্র অতিরঞ্জন হবেনা যে ডেপুটেশন দেশের লোকের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা নিয়েই তাদের কাজে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা ১৮৯০ সালের মার্চ মাসে ইংল্যাণ্ডে রওয়ানা হই এবং লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছলাম এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটি আমাদের জন্য কয়েকটি

সভার আয়োজন করেন। প্রথম সভা হয় ক্লার্কেনওয়েল রোডে। এটি ছিল ঘাদাতাই নৌরজির নির্বাচন কেন্দ্র। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন। দিনটির কথা আমার বেশ ভাল করেই মনে আছে। সভার আগে কি ঘটেছে, পরে কি হয়েছে, সবই আমার মনে আছে। আমরা জন ইয়ুলের অভিথিরূপে স্যাপনাল লিবারল ক্লাবের খাওয়া দাওয়া করলাম। তারপরে ক্লার্কেনওয়েলে রওনা হলাম। ভারতে যে রকম সভার অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে আমি অভ্যস্ত, দেখলাম ওখানেও কতকটা সেই রকমই সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভায় একটি মঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে মঞ্চের উপর বক্তারা এবং স্থানীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সমবেত হয়েছিলেন। তা ছাড়া ছিল হল ঘরের অঙ্গন যেখানে দর্শক শ্রোতারা বসেছিলেন।

সভায় আমার সঙ্গে মিঃ এইচ. ই. এ কর্টনের সঙ্গে দেখা হল। ইনি হচ্ছেন স্যার হেনরী কর্টনের পুত্র। পিতা পুত্রকে পাঠিয়েছেন আমার সঙ্গে দেখা করে তার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার জন্য। সভায় যে রকম শ্রোতার আসর দেখলাম, তাতে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। কারণ এ রকম শ্রোতার আসর দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম না। আমরা যখন সভায় যাচ্ছিলাম তখন জর্জ ইয়ুল আমাকে বললেন যে ভারতীয় শ্রোতার আসর ও ইংল্যাণ্ডের শ্রোতার আসরের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই; কেউই দীর্ঘ বক্তৃতা ও নীরস কথার অবতারণা বিন্দুমাত্র পছন্দ করেন না। ভারত এবং ইংল্যাণ্ড উভয় দেশের শ্রোতাগণই তাদের একটা জন্মগত সংস্কারজাত হৃদয়ানুভূতির প্রতি আবেদনশীল বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে পড়েন। বক্তাকে তাদের হৃদয়ের এই অনুভূতির দিকটা আবিষ্কার করে সে দিকে লক্ষ্য রেখে বক্তৃতা করতে হয়। আমি অবিলম্বেই এই সত্য আবিষ্কার করে ফেললাম, প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ সাহিত্য ও ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় থাকায় আমার বক্তৃতার ধরণ কিরূপ হওয়া উচিত তা আমি বুঝে নিয়েছিলাম। তাই মোটামুটি ভাবে আমার প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি। ইংরেজরা তাদের নিজেদের ভাষায় কোন কৃষ্ণবর্ণের লোকের মুখের বক্তৃতা শুনতে অভ্যস্ত নয়। প্রথম প্রথম হয়ত তারা একটুখানি ধাঁধায় পড়েন এবং কৌতুক বোধ করেন। কিন্তু পরক্ষণেই বক্তার বক্তৃতা শুনতে শুনতে তার বক্তৃতার মর্ম বুঝতে আরম্ভ করেন এবং প্রশংসাও করে থাকেন; আর বক্তা যদি নিজের অভিপ্রায় কি তা সঠিকভাবে বুঝতে পারেন তাহলে তিনি তার বক্তৃতায় তাদের মধ্যে একটা অকপট সহানুভূতি এবং হয়ত বা যে উৎপীড়নের জন্য তারাও অংশত দায়ী তার নিবারণের জন্য একটা মনোভাবও জাগিয়ে তুলতে পারেন। ম্যাঞ্চেষ্টারে চেয়ার অব কমার্সে আমার এক বক্তৃতার পরে এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ভারতীয় সমস্যার ব্যাপারে আমার হৃদয় আজকের মত এত গভীর ভাবে আর কখনই আলোড়িত হয়নি।" ইংল্যাণ্ডে আমাদের কাজ করার মত একটা ব্যাপক ক্ষেত্র ছিল এবং সে কাজ করার মত একটা বড় রকমের সুযোগও পেয়েছিলাম। কিন্তু সে সুযোগ আমরা পুরোমাত্রায় গ্রহণ করিনি, কয়েকটি স্থান থেকে জনসভায় আমাদের বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে আবারও সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান হয়। ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েলসের দক্ষিণাঞ্চলের জনসভাগুলির সংগঠক মিঃ অগাষ্টাইন হ্যানি কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির কাছে যে অফিসিয়াল রিপোর্ট পাঠান তাতে লিখেছেন :

"সমস্ত জনসভায়ই এই রকম দাবী উঠেছিল যে মিঃ ব্যানার্জি আবারও যেন তাদের সঙ্গে মিলিত হন। আপনাদের কাছে বিশেষ করেই বলতে পারি যে তার উপস্থিতিতে আন্দোলন বড় রকমের সুযোগ পাবে, কারণ যে সমস্ত সহরে আগেই যাওয়া হয়েছে সে সমস্ত সহরে বিপুল সংখ্যায় শ্রোতাদের আগমন নিশ্চিত ভাবে আশা করা যায়। আপনাদের কমিটিকে এই প্রকৃত অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে দৃঢ়তার সহিত বলছি, মিঃ ব্যানার্জিকে আমি আগেই একথা জানিয়েছি। আমার এই অভিমতকে আরও প্রত্যয়িত করার জন্য আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে কার্ডিফের মিটিং শেষ হওয়ার পরক্ষণেই সাউথ ওয়েলস্ লিবারেল ফেডারেশনের সেক্রেটারী মিঃ আর. এন. হল তার দলের পক্ষ থেকে মিঃ ব্যানার্জিকে

ভারতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে আর একবার কায়ত্তিক ভ্রমণ করতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছেন। তিনি মিঃ ব্যানার্জিকে কায়ত্তিকের সব চেয়ে বড় হল ঘরে সাউথ ওয়েলসের কেন্দ্র সমূহের প্রতিনিধিগণের এক সভায় বক্তৃতা করতে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন যে কায়ত্তিকের সেই সভায় ভারতের দাবী দাওয়া সম্পর্কে শুনবার জন্য কয়েক হাজার লোকের এক শ্রোতা সমাবেশ হবে। আমিও গ্লাইমাউথে এই রকম জন-সমাবেশের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮৯০ সালের সেই ডেপুটেশনের মত আর কোন ডেপুটেশন ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করা হয়নি। এই ডেপুটেশনের পেছনে ছিল সংগঠনের শক্তি; আর সম্ভবতঃ আমাদের কিছু পরিমাণে ছিল। সে রকমটি আর হয়নি। তবে এই ১৮৯০ সালের ডেপুটেশনের ফলে যে লাভ হয়েছে কংগ্রেস আন্দোলনের ইতিহাসে তার কোন তুলনা মেলে না। ইংল্যাণ্ড, ওয়েলস্ এবং স্কট-ল্যাণ্ডের অনেক বড় বড় সহরে আমরা জনসভায় বক্তৃতা করেছি এবং এই ডেপুটেশন যথাযথ ভাবে মিঃ গ্লাডষ্টোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার মত প্রয়োজনীয় কাজও করেছে। গ্লাডষ্টোনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আমাদের মনে এই ধারণা হয় যে তিনি পার্লামেন্টে লর্ড রুসের কাউন্সিলগুলি লোকপ্রতিনিধি সংক্রান্ত বিলের দ্বিতীয়বার পঠন অনুষ্ঠানের সময় বক্তৃতা করবেন এবং নির্বাচন নীতির সমর্থন করবেন। আমাদের সে ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, দ্বিতীয়বার ঐ বিলটি পঠনের সময় মিঃ গ্লাডষ্টোন জোর দিয়েই বলেন যে ভারতীয় জনগণকে যা দিতে হবে তা হল প্রকৃত এবং সক্রিয় প্রতিনিধিত্ব। নির্বাচনের নীতি বলতে যা বুঝায় তা অবশ্য কার্যতঃ স্বীকার করে নেওয়া হলনা। তবে নির্বাচনের নীতি স্বীকার করে নেওয়ার দিকে একটা অগ্রগতি সুস্পষ্ট ভাবেই এর মধ্যে ছিল। ১৮৯২ সালের পার্লিয়ামেন্টারী ষ্ট্যাটিউট অনুযায়ী গভর্ণমেণ্ট যে বিধি প্রনয়ন করেন তাতে মিউনিসিপ্যালিটি ও স্কুল বোর্ড সমূহকে স্থানীয় কাউন্সিলগুলিতে সদস্য প্রেরণের অনুমতি দেওয়া হয়, অবশ্য তা গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ। তা ছাড়া প্রাদেশিক কাউন্সিল সমূহের বেসরকারী সদস্যগণকে ইম্পিরিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউ-ন্সিলে সদস্য প্রেরণের অধিকারও দেওয়া হল। কাউন্সিল-গুলিতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং বাজেট সম্পর্কে প্রতিবছর আলোচনা করার অধিকারও স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই ভাবে, প্রধানতঃ কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের ডেপুটেশনের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের অধিকার আদায়ের দিকে উল্লেখযোগ্য প্রথম পদক্ষেপ সূচিত হল। ১৯০৯ সালের স্ট্যাটিউট দ্বারা ১৮৯২ সালের আইনকে আরও উদার করা হল বটে; তবে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের ভিত্তি ১৮৯২ সালের আইনের দ্বারাই ভাল ভাবে এবং যথাযথ রূপে স্থাপিত হয়।

এতক্ষণ যাবৎ ডেপুটেশনের বেহারাদের সম্পর্কে কিছুই বলিনি। কিন্তু আমার সেই সমস্যিত সহকর্মী বন্ধুদের দানের সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে কোন সঙ্কোচ নেই। আমার মনে হচ্ছে তাদের অবদান যথেষ্ট পরিমাণে স্বীকৃতি লাভ করেনি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জনক মিঃ এলেন হিউম এই অভিযানে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। একজন সিভিল সার্ভিসের লোক হিসাবে তার সারাটি জীবন কেটেছে কাজের টেবিলে; সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করার সুযোগ তিনি পাননি। কিন্তু তিনি যখন আমাদের ইংল্যাণ্ডের সভাগুলিতে বক্তৃতা করলেন, তখন তিনি একজন অভ্যস্ত তর্ক-বিশারদের মতই তার সামর্থ্য ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করলেন। আমার বেশ মনে পড়ে, ব্রাডফোর্ডের এক সভায় কংগ্রেসের একজন সমালোচককে তার সমালোচনার জবাব দিতে কিভাবে তিনি তৈরী করে দিয়েছিলেন। উক্ত সমালোচক এই সভায় বলেছিলেন যে রাজনৈতিক শাসন সংস্কার লাভের আগে সমাজ সংস্কার প্রয়োজন এবং কংগ্রেসকে ভারতে সামাজিক জীবন বিকাশের সুফল লাভ না হওয়া পর্যন্ত তার কার্য-ক্রমকে পূর্ণতর দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এলেন হিউম ছিলেন তাঁর মহান পিতার (তাঁর পিতা ছিলেন জোসেফ হিউম) মহান পুত্র। তাঁর সঙ্গ ও সাহচর্য্য আমাদের বিশ্বাসকে উজ্জীবিত করেছে। (চলবে)

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য

শ্রীজ্ঞান ঘালদার

আলোচ্য বিষয়টি গুরুতর এবং বর্তমান নিবন্ধকারকে সমগ্র ব্যাপারটির বিশালতা বোঝানই দুরূহ, সুতরাং অন্যপরে কা কথা। অবশ্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিসর এত বৃহৎ নয় যে আলোচনাকারীকে তার মধ্যে থৈ হারিয়ে ফেলতে হবে, কারণ, "বাংলাসাহিত্যের জগৎ" ব্যাপারটির সূত্রপাত মেরে কেটেও বিদ্যাসাগরের পিছনে আর টেনে নেওয়া যায়না, সেই হিসাবে তার বয়স একশ তিরিশ বছরও দাঁড়ায় না, আসলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সম্পর্কের গভীরতা প্রায় অতলান্ত। তাতে ব্যক্ত করা, এই এক চিলতে লেখার মধ্য দিয়ে বর্তমান লেখকের সাধ্যে কুলাবে না, অথচ উপায়ন্তরও নেই।

১৯৩৯ সালে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছিলেন—"...মানুষের মর্মানুসন্ধানে বিদেশী পরকমাই সাম্প্রতিকদের একমাত্র সম্বল। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় এখনও নিশ্চয় বৈষিক উৎক্রমনিকার নিয়ম মানে, এবং তাঁর পালীন মাত্রাজ্ঞান বর্তমান প্রগতি বিলাসীদের মতই অস্বাভাবিক ঠেকুক না কেন, রবীন্দ্রনাথের উৎকেন্দ্রীক ব্যক্তিত্বই ইরানিয়ন উপৃথলতার ব্যতিক্রম। সুতরাং অতিশয়োক্তির মত শোনালেও, তাঁকেই গত পঞ্চাশ বছরের বঙ্গীয় চিৎপ্রকর্ষের পুরোধা বলা বিধেয়। রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত অগ্রনীরা যে পার্বত্যের সংস্কৃতির স্বপ্ন দেখেছিলেন, সন্ধান পাননি, সেই কল্পনা বিলাসকে এই পাওববর্জিত দেশের গোষ্পদোচয়ে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ, এবং আমরা সকলে যেহেতু সেই প্রবাহেরই বুদ্বুদ, তাই আমাদের পক্ষে তাঁর গতি-অগতির বিচার অথবা উপকার-অপকারের আলোচনা শুধু অশোভন নয়, দুষ্করও।"

বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি অতিশয় সাবধানী এবং অতিশয়োক্তির ধার কাছ না ঘেঁসে সে স্বয়ং উদাসের স্বাভাবিক প্রকাশকেও সযত্নে বরণ করেছে। বাংলা সাহিত্যের জগতে নবনব স্তরের প্রতিষ্ঠাতা আমার বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। এই ভিত্তিতে বাংলা সংস্কৃতির জন্ম, এবং সে ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের অবদান পরোক্ষ নয়, প্রত্যক্ষ। তার পূর্বে বাংলা সংস্কৃতি মুখ্যত অবসর বিনোদনের অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রচারের বাহন ছিল। তার পূর্ণাঙ্গ রূপ তখনও অজানা ছিল। রবীন্দ্র পূর্বযুগের বাংলা সাহিত্যে এক বঙ্কিমকে বাদ দিলে সাহিত্যের জন্যেই সাহিত্য করার উদাহরণ আর মেলে না। বঙ্কিমও দুর্গেশনন্দিনীর সঙ্গে গল্প জুড়েছেন বটে, কিন্তু প্রায়শই অবশ্যই নায়ক নায়িকাকে বলি দিয়ে, তিনি আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন যে অধর্মের পরাজয় এবং ধর্মের জয় হবেই। রবীন্দ্রনাথ শিল্পী হিসাবে প্রধানতঃ ব্যক্তি কেন্দ্রিক। তিনি এক কথা জানতেন যে সমষ্টি ব্যক্তির যোগফল মাত্র। তাই তার উপন্যাস গুলিতে বহু জায়গায় ব্যক্তিত্ব স্বচ্ছন্দ বিহার সমাজের ধার ধড় একটা ধারেনি এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিফলন সর্বাংশে আধুনিক, অন্ততঃ পূর্বের উপন্যাসগুলির তুলনায়। তবে মানে এই নয় যে রবীন্দ্র উপন্যাস সমাজ সচেতন না, তবে সমাজ সেখানে পটভূমি মাত্র। অবশ্য ব্যক্তির উপরে সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিফলন আমরা "ঘরে বাইরে", আর "চার অধ্যায়" তে তো স্পষ্ট দেখি। এবং এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে তাঁর "গোরা" উপন্যাসখানি সমাজসেবকদেরও হাতে লাগবে। শুধু মনস্তাত্ত্বিকগনের যারা নয় আমার বিবেচনায় রবীন্দ্র উপন্যাস বাংলা উপন্যাস জগতে এই নাবিক স্বাচ্ছন্দবোধ এনে দেয়। যা পরবর্তী বাংলা

উপন্যাসকে প্রায় বাঁধনহারা করেছে। অবশ্য উপন্যাসের চেয়ে ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথ আরও ভাস্বর। এবং বস্তুতঃ বাংলার এই ব্যাপারটির গুরুদাতা এবং প্রধান পালনকর্তা একা তিনি। তাঁর অসাধারণ মুন্সিয়ানার ছোটগল্প কাব্য হতে গিয়েও সার্থক গল্পই হয়েছে, কবিতা হয়ে যায়নি, যেমন, "ক্ষুধিত পাষাণ"। অপর পক্ষে শিল্পী মাত্রই যে বস্তু নিষ্ঠার ভার করে এগোন, এই সময়ে তা-বোধ হয় তাঁর সবচেয়ে তীক্ষ্ণ হোয়েছিল। প্রাক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনায় এই সময়কার রবীন্দ্রনাথের বস্তুজগতের প্রতি তীক্ষ্ণ সংবেদনশীলতা আমাদের রীতিমত বিস্মিত করে। এখানে যে সমস্ত সাধারণ মানুষকে সাধারণ কথা নিয়ে আলোচনা করতে দেখি তা পরবর্তী রবীন্দ্রকাব্যে এবং পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে অনুপস্থিত। আমার বিবেচনায়, গল্প-সাহিত্যের যে সব পরবর্তীরা ভুলেছেন রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে তার সূত্রপাত হয়েছিল বহুপূর্বেই। ছোট গল্প এমন একটি সাহিত্যিক মাধ্যম, যার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ। শুধু তাই নয়, বঙ্কিমও এমন মাধ্যমের অন্বেষণে ফিরেছেন যাতে উপন্যাসের গুরুভার নেই, অথচ ধার আছে ধারালো, কিন্তু তার সন্ধান তিনি পাননি এবং কার্যকারণে আস্থা রাখলে বলতেই হয়, মানিক, বনফুল বা পরশুরামের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি তাঁদের নিজেদেরও অজ্ঞাত থাকতো তাঁদের পথ পরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথকে একাধারে সাহসী বা দুঃসাহসী পথ-প্রদর্শক আর নিপুন খোদাইকার হিসেবে না পেলে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্তপ্রধান হয়েছেন। এবং তাঁর অতিবাদী তথা আধ্যাত্মিক প্রবণতা উচ্চগ্রামে বেজেছে। ফলতঃ ছোট গল্প পরিণত রবীন্দ্রনাথের কলম ত্যাগ করেছে নির্লিপ্ত সাহিত্যিকতার প্রহারে। অবশ্য তত-দিনে তাঁর বিজিত সাম্রাজ্যের এই অংশের ইজারা পেয়ে গেছেন নবীন লেখকের দল। এই সময়কার উপন্যাসের কুশীলবরাও তত্ত্বের ভারে মুহ্যমান।

ব্যতিক্রম দেখি কাব্যের বেলায়। কাব্যে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই অসম সাহসী এবং অস্থির মতি। ফলে নতুন নতুন অসংখ্য পরীক্ষা অবিরত চালাতে তিনি যেমন পিছপা নন, তেমনই কোন নতুন পরীক্ষার সাফল্যের চূড়ায় এসেও তাই তাজিয়ে বাকী জীবন চালান রবীন্দ্র চরিত্রের একেবারে বিপরীত। ফলে সমালোচকের বিচারে যেখানে কেবলমাত্র "জাননীয়" কবি হিসাবেই তিনি বাংলা কাব্য জগতে চিরস্থায়ী আসন পেতে পারতেন, সেখানে তার পরে 'কণিকা'র পরীক্ষা চালানো যে কোন কবির ব্যব-সায়িক স্বার্থের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে।

আসলে মধুসূদন প্রথম বাংলাভাষায় কবিতাকে গদ্যের থেকে পৃথক করতে প্রয়াস পান। এই সংক্রান্ত গবেষণায় একথা তিনি বুঝেছিলেন যে যতিপাত হয় অর্থের ভিত্তিতে, পড়তি শেষে তার আগমন অনিবার্য্য নয়। এবং প্রচলিত ভাষা - রীতির প্রতিও তিনি সম্পূর্ণ ভাবে আস্থা হারাইয়েছিলেন। কিন্তু বিরল ও অভিধানিক ব্যঞ্জনময় শব্দের নির্বাচনকেই তিনি একমাত্র বিকল্প ভেবেছিলেন, প্রচলিত কথ্য ভাষা রীতির শক্তি বোঝেন নি। রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র কথাই নয় একেবারে আট পৌরে পারিবারিক ভাষাকে কবিতায় মাধ্যম করলেন। সেই সঙ্গে আরও একটি বড় কথা যে গদ্যিকারের বোধাতিরিক্ত বাংলা কাব্যে রবীন্দ্র-নাথেরই প্রথম দান। অর্থাৎ, এককথায় কবিতার টেকনিক কর্ম ও বিষয় বক্তব্যে তাঁর বাঁধা পথকেই পরবর্তী কবিরা বিস্তৃত করেছেন। পরিহার করতে পারেন নি। বাংলা ছন্দোমুক্তির প্রথম দূত রবীন্দ্রনাথ। 'লিপিকা'র সেই পরীক্ষার সূত্র এবং অগ্রগতি। 'পুনশ্চ,' 'শেষ সপ্তক,' পত্রপুট, শ্যামলী, পার হয়ে একেবারে 'শেষ লেখা, পর্যন্ত। এর মধ্যে লেখা বিচিত্রিতা, বীথিকা, প্রান্তিক, সেঁজুতি, আকাশপ্রদীপ, ছড়া ছড়ার ছবি, প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থে তাঁর সৃষ্টি অনেক বেশী গণমুখী। এবং প্রকৃতি দর্শনেও মুক্তার ভাব যেন তিনি অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন।

রবীন্দ্রনাট্য বাস্তবিক পক্ষে আরেকটি বিস্ময়। কারণ, এখানেও রবীন্দ্রনাথ বাঁধা পথের পথিক নন এবং তাঁর নাট্য রচনার মূল লক্ষ্য ও বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা। যার ফলে 'চিরকুমার সভা'র মত নাটকেও চরিত্ররা তত উজ্জ্বল নয়, যত উজ্জ্বল নাট্যকারের তাঁদের মুখে বসানো

(১৬-এর পাতায় দেখুন)

যাঁরা শুধু দিয়ে গেল

ভারতের সশস্ত্র বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামে—ইংরাজি সেপ্টেম্বর মাসে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করে শহীদ হয়েছেন—

১। কালাচাঁদ বসু

১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যশোরে পুলিশ হাজতে বর্বরোচিত নির্যাতনে জীবন দান করেন।

২। আবদুল্লা ৩। ভগৎ সিং ৪। বুধ সিং ৫। বুধা সিং ৬। মঙ্গর সিং ৭। ইন্দের সিং (১) ৮। লছমন সিং ৯। মোটা সিং ১০। তারা সিং ১১। আধুয়ান সিং ১২। জ্যাঠা সিং ১৩। ইন্দের সিং (২)

১৯১৫ সালের প্রথম দিকে ব্রিটিশ সরকার জানতে পারে যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীদের প্রভাবে ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী কর্ম তৎপরতা দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং তার ফলে ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে আনুগত্য বিরোধীতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুকে সরকারী গোয়েন্দারা তখন এই উপলক্ষে খুঁজছে। ব্রিটিশ সরকার এ সম্পর্কে জরুরী তদন্তের জন্য বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটির সমীক্ষার ফলে ভারতীয় সৈন্যদলের ১৩ নং ক্যাভেলরি ফ্রন্টিয়ার ফোর্স-এর ১৮ জন অফিসার ও জোয়ানকে জরুরী আদালতে বিচারের জন্য পাঠানো হয়। এই বৎসরের ১৪ই আগস্ট থেকে লাহোরে এই গোপন বিচার অনুষ্ঠিত হয়। একতরফা বিচারে ১৭ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যু দণ্ডের আদেশ হয়, পরে পাঁচজনকে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি দিয়ে দ্বীপান্তরিত করা হয়, এবং ১৯১৫ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর একই দিনে পাঞ্জাবের আমবালা জেলে বাকি এ ১২ জন জোয়ান ও অফিসার ফাঁসীর মঞ্চে জীবন দান করে ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন।

১৪। যতীন মুখার্জী (বাঘা যতীন)

১৫। চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী

১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর উড়িষ্যা রাজ্যের বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত চাষখণ্ডে সরকারী সৈন্য দলের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে জীবন দান করে ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের সাহায্যের জন্য জার্মান থেকে জাহাজ বোঝাই যে অস্ত্র ও গোলাগুলী আসবার কথা ছিল সেগুলো ঐ অঞ্চলে সমুদ্র উপকূলের কোন গোপন স্থানে সংগ্রহ করে নেবার জন্য বিপ্লবী নেতা যতীন মুখার্জী কিছু সঙ্গীসহ বালেশ্বর জেলার অরণ্য অঞ্চলে অজ্ঞাতবাস করছিলেন। সরকার সংবাদ পেয়ে ওদের ধরবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করে। নেতা হিসাবে যতীন মুখার্জী জীবিত অবস্থায় ধরা না দিয়ে সম্মুখ যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৬। করণ সিং ১৭। উদয় সিং ১৮। বিষেণ সিং ১৯। মহেন্দ্র সিং ২০। ধন্না সিং।

পাঞ্জাবের 'বাবর আকালি' দলের যোদ্ধা এই পঞ্চবীর ১৯২৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তৎকালীন কাপুর থালা রাজ্যের বোমেলি অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্য

দলের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে আত্মাহুতি দেন। বিরুদ্ধ পক্ষের সৈন্য ও ব্রিটিশ অফিসার সহ বেশ কিছু সংখ্যক শত্রু এই সংঘর্ষে নিহত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য

(১৪-এর পাতার পর)

শ্লেষোক্তি। এবং পরবর্তীকালে রচিত 'রক্তকরবী, রাজা বা তাসের ঘরে' মূলীলবের আর চরিত্র থাকেনি, তারা হয়ে উঠেছে প্রতীক। নব নাট্য আন্দোলনে প্রতীকের স্থান অবিসম্বর। প্রতীকি নাটা একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি মাধ্যম, একথা অনস্বীকার্য—এই ধারাটিরও প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথে। তাছাড়া নাটকের আঙ্গিকে ও পরিণামে সম্পর্কে তাঁর তোলা ঝড়ই পরবর্তী বিদ্রোহীদের শক্তি জুগিয়েছে প্রাথমিক স্তরে। সে বিদ্রোহ অবশ্য এখনও বিপ্লবে পরিণত হবার অপেক্ষায়।

আজকে আমরা যে সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের মধ্যে বাস করি, সাহিত্য যার একটি প্রধান অঙ্গ, বস্তুতঃ গত শতাব্দী ধরে তা রবীন্দ্রনাথের একার নির্মাণ। আজকে আমাদের কথ্য ভাষা, মুখের গান এমন কি চাল চলন পর্যন্ত, যা কিছু বাঙালী সংস্কৃতি বলে খ্যাত তা তাঁর সৃষ্টির দান। কথাটা শুনতে অতিশয়োক্তির মত শোনালেও বিশ্লেষণে এই কথাই প্রমাণিত হবে। আর সেই বিশ্লেষণের অঙ্কে উপযুক্ত স্থান বর্ত্তমান লেখকের হাতে নেই। তাঁর অনুপম ভঙ্গীর অনুসরণেই বলা যায়—একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মত একতারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরের ধর্ম সংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল; রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে তাহাতে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল।

পূর্বে যাহাতে কেবল স্বামীর গ্রামা সুর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত প্রবদ্ধ অঙ্গের কলাবতী রাগিনী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

২১। প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরী ২২। অনন্ত হরি মি

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বিচারাধীন বন্দী অবস্থা থাকা কালে জেলের মধ্যে গোয়েন্দা অফিসা ভূপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়কে হত্যা করার অভি যোগে ১৯২৬ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর আলিপু সেন্ট্রাল জেলেই ফাঁসীর মঞ্চে আত্মোৎসর্গ করেন

২৩। যতীন্দ্রনাথ দাস

বিখ্যাত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় শহীদ ভগ সিং রাজগুরু ও শুকদেব প্রমুখ সহকর্মীদের সং লাহোর সেন্ট্রাল জেলে বিচারাধীন বন্দী অবস্থা থাকাকালীন রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি কারা কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার ও সেকালে প্রচলিত কার আইনের বর্বরতার বিরুদ্ধে আমরণ অনশনে মাধ্যমে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। দীর্ঘ ৬৩ দি দিন অনশনান্তে ১৯২৯ সালের ১৬ই সেপ্টেম্ব এই বীর বিপ্লবীর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। একই কারণে এই ধরণের সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মোৎ সর্গের বিশ্ব ইতিহাসে যতীন্দ্রনাথের স্থান দ্বিতীয়।

২৪। জীবন ঘোষাল অপর নাম মাখন ঘোষাল

চট্টোগ্রাম যুব বিদ্রোহে সক্রিয় অংশগ্রহণে পর পলাতক অবস্থায় চন্দননগরে অপর কয়েকজ সহকর্মীর সঙ্গে বসবাস কালে ১৯৩০ সালে ২রা সেপ্টেম্বর গভীর রাত্রে সশস্ত্র ব্রিটীশ ও ফরাস পুলিশদল কর্তৃক অবরুদ্ধ হন। অবরোধ ভে করবার চেষ্টায় প্রতিপক্ষের সঙ্গে বন্দুযুদ্ধে জীব দান করে শহীদলোকে উত্তীর্ণ হন।

২৫। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর গভীর রা

চট্টোগ্রাম যুব বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত একদল গেরিলার দ্বারা চট্টোগ্রাম ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্ব দান করে এই দুঃসাহসী বিপ্লবী বীরাঙ্গনা সম্মুখ সংগ্রামে জীবন দান করে শহীদের অমরত্ব লাভ করেন।

২৬। সন্তোষ কুমার মিত্র

২৭। তারকেশ্বর সেন

কয়েক হাজার বিপ্লবীকে নির্বিচারে কারারুদ্ধ করে রেখেও বাইরে বাংলার বিপ্লবীদের ক্রমবর্ধমান কর্ম তৎপরতা রোধ করতে বা সঙ্কুচিত করতে না পেরে জেলের অভ্যন্তরে বিনা বিচারে বন্দীদের উপর জুলুম ও অত্যাচার করবার জন্য সরকারী দপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের ব্রিটীশ শাসকেরা একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিল। তাদের বিশ্বাস বা ধারনা ছিল যে বাইরে সশস্ত্র কার্যকমিটি সম্পূর্ণভাবে এইসব বন্দী শিবির থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। নির্দ্ধারিত এই কার্য্যক্রমের প্রথম শিকার হয়ে ছিলেন খড়্গপুরের নিকটবর্ত্তী হিজলী বন্দী শিবিরের রাজবন্দীগণ। ১৯৩১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর গভীর রাত্রে এই বন্দীদের উপর যে অতর্কিত আক্রমণ হয় তার ফলে গুলীর আঘাতে প্রাণত্যাগ করে শহীদ হয়েছিলেন সন্তোষ কুমার ও তারকেশ্বর। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই হত্যার বিরুদ্ধে তাঁর প্রবল প্রতিবাদ ঘোষণা করেন। তাঁর সুবিখ্যাত 'প্রশ্ন' কবিতাটি এই উপলক্ষেই লেখা।

২৮। মণি লাহিড়ী।

২৯। অমিল ভাদুড়ী।

ভারতে ব্রিটীশ স্বার্থের অন্যতম প্রবক্তা ও পরিপোষক তৎকালিন স্টেট্‌সম্যান পত্রিকা তখনকার দিনের সর্বপ্রকার জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র হিসাবে কাজ করতো। বিশেষ করে বিপ্লব আন্দোলন ও বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আমলাতন্ত্রকে খোলাখুলিভাবে প্ররোচিত করবার জন্য এই পত্রিকার সম্পাদক আলফ্রেড্‌ ওয়াট্‌সন বিপ্লবীদের লক্ষ্যের মধ্যে এসে পড়েন। হিজলী বন্দী শিবিরে নিরস্ত্র বন্দীদের উপর গুলী বর্ষণের স্বপক্ষে মন্তব্য করায় বাংলার বিপ্লবীরা একে তাদের অন্যতম প্রধান শত্রু হিসাবে গণ্য করে তার প্রতি চরম শাস্তি বিধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে মোটর গাড়ীতে ভ্রমণরত ওয়াট্‌সন-এর উপর একদল বিপ্লবী অপর একটি মোটর গাড়ী থেকে গুলী বর্ষণ করেন। গাড়ীটি তখন হেস্টিংস-এর পাশ দিয়ে চলছিল। ওয়াট্‌সন আহত হয় এবং তার গাড়ী দ্রুত চলতে থাকে। দুই গাড়ী থেকেই তখন গুলী বিনিময় হতে থাকে। এই ভাবে দুখানা গাড়ী কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীর মাঝের হাট পর্য্যন্ত পৌঁছলে বিপ্লবীদের গাড়ীর পেট্রল ফুরিয়ে যায়। এই সময় পুলিশ এসে পড়ে। একজন সার্জেন্ট এসে এদের গতিরোধ করতে চেষ্টা করে এবং গুলী ছুঁড়তে থাকে। বিপ্লবীদের দু'জনের মধ্যে চার জন সরে পড়তে সক্ষম হন। বাকী দুইজন, মণি লাহিড়ী ও অনিল ভাদুড়ী ধরা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে পটাসীয়াম সাইনাইড খেয়ে আত্ম বিসর্জন করেন।

৩০। অমাবসু পাঁজা।

৩১। মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত।

মেদিনীপুরে ব্রিটীশ শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল তাকে বাস্তবে পরিণত করবার তৃতীয়

পর্য্যায়ে জেলা শাসক বি. ই জি বার্জকে খেলার মাঠে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলী করে হত্যা করবার সময় অনাথ ও মৃগেন ঘটনাস্থলেই পুলিশের গুলীতে আহত হন। সেদিন ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর। অনাথ সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ত্যাগ করে শহীদলোকে উত্তীর্ণ হন এবং মৃগেন পরের দিন ওরা সেপ্টেম্বর অনাথকে অনুসরণ করেন।

৩২। এ. কাদির, ৩৩। আনন্দন
৩৪। সত্যেন বর্দ্ধন ৩৫। কৌজ সিং

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকে ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্স্ লীগের কিছু সংখ্যক বিপ্লবী কর্মীকে জলপথে ও স্থলপথে ভারতে প্রেরণ করেন ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে ও ভারতস্থ বিপ্লবী সংগঠন সমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে দুই দল সাবমেরিনে রওয়ানা হয়। জলপথে দক্ষিণ ভারতের উপকূলবর্ত্তী মুক্ত অঞ্চলের দিকে এবং অপর দুই দল পর্বত ও অরণ্যপথ অতিক্রম করে চট্টগ্রাম ও আসামের দিকে অগ্রসর হয়। উভয় দলেরই কিছু সংখ্যক বিপ্লবী ভারতে প্রবেশের মুখে সীমান্তে ব্রিটীশ সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েন। একদলে এদের চার জনের বিচার হয়। যুদ্ধকালীন জরুরী আইন অনুসারে গোপন সামরিক আদালতে।

কৌজসিং এসেছিলেন স্থলপথে এবং অপর তিনজন সাবমেরিন থেকে রাবার বোট-এ কোয়াম্বেটুর উপকূলে অবতরণ করবার সময় গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৩ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ পেনিটেনসীয়ারি জেলে 'বন্দেমাতরম্' ও "নেতাজী কী জয়" ধ্বনি করে এরা চারজন ফাঁসির মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করে শহীদের অমরলোকে উত্তীর্ণ হন।

৩৬। মানকুমার বসুঠাকুর, ৩৭। নন্দ কুমার দে, ৩৮। দুর্গাদাস রায়চৌধুরী, ৩৯। নিরঞ্জন বর্মা, ৪০। চিত্তরঞ্জন মুখার্জি, ৪১। ফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী, ৪২। সুধীলকুমার মুখার্জি, ৪৩। কালিপদ আইচ, ৪৪। বীরেন্দ্রমোহন মুখার্জি।

১৯৪৩ সালের প্রথম দিকে ব্রিটীশ সৈন্যবাহিনীর গোয়েন্দা দপ্তর কর্তৃপক্ষকে জানায় যে ৪ নং মাদ্রাজ কোষ্টাল ডিফেন্স্ ব্যাটারির সৈন্যদলের মধ্যে নেতাজীর আই এন্ এ আন্দোলনের প্রভাবে সৈন্যদলে বিদ্রোহাত্মক কর্মতৎপরতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এর ফলে কিছু সংখ্যক সন্দিগ্ধ জোয়ান ও সৈন্যবিভাগীয় কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করে জঙ্গী আইন অনুসারে তাদের বিচারের আদেশ হয়, ঐ বৎসরের ৬ই জুলাই ও ৫ই আগষ্ট এই দুই দিন বাঙ্গালোরের সেণ্ট এণ্ড্রুজ চার্চ্চে এদের বিচার হয়ে নয় জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। ১৯৪৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ পেনিটেনসীয়ারী জেলে একই দিনে এই নয়জন বীর বিপ্লবী সৈনিক ফাঁসির মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করেন। ফাঁসির মঞ্চে আরোহন করার পূর্বে সমস্ত রাত এরা জয়ধ্বনি করে—এবং 'বন্দেমাতরম্' গান করে দেশমাতৃকার পায়ে তাদের এ জীবনের শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

RgedNo. R. N .24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | বাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

e/36

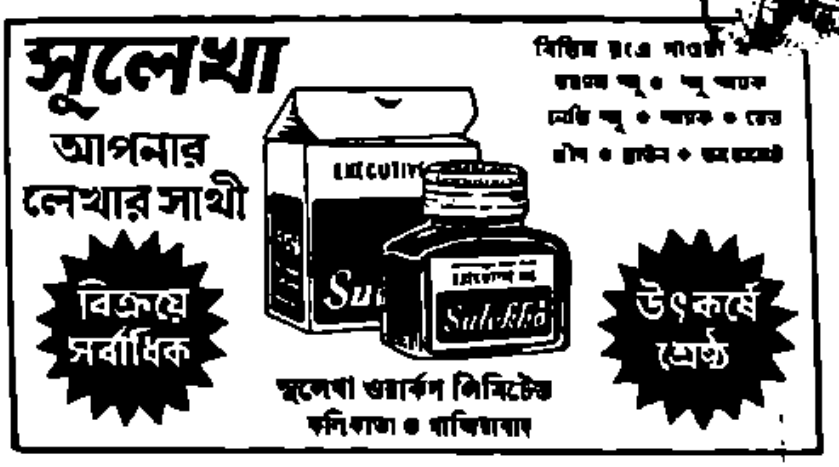

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY
18 SEP 1979

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প ভাটাচার্য, শ্রীবারীন রায়।
সম্পাদক—শ্রীশান্তি শরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বোম্বাই—শ্রীমধুগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। কার্যালয় সচিব—শ্রীজীবন গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পত্রিকাদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

অষ্টম বর্ষ	শনিবার, ৩০শে ভাদ্র, ১৩৮৫ ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮	২৯ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

CALCUTTA

আর এক বাংলাদেশ

। সতী ভূষণ সেন ।

নূতন ইহুদী

। কৌটিল্য ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক মলিনী মোহন দাশগুপ্ত ।

জনতাদল কোন পথে ?

। বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

পরের জন্য আত্মবিসর্জন
ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের
অন্য কোন মূল্য নাই।

—বঙ্কিমচন্দ্র

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী প্রতুল ভট্টাচার্য্য

গত ৭ই সেপ্টেম্বর প্রাতে প্রবীণ বিপ্লবী প্রতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কলিকাতাস্থ বালভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৮ বৎসর।

অনুশীলন বিপ্লবী দলে ছাত্র জীবনে দীক্ষা গ্রহণ করে আজীবন দেশ-মাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এই মহান বিপ্লবী। তিনি ১৯২৪ সালে Law কলেজে অধ্যয়নকালে রাজবন্দী হন। দীর্ঘ ৪ বৎসর কারাবাসের পর ১৯২৮ সালে মুক্তি পান। তিনি সুভাষ চন্দ্র বসুর অ্যাডভান্স রিভলটিং গ্রুপের ভলা-টিয়ার বাহিনীর অন্যতম মেজর ছিলেন। ১৯৩০—১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত পুনরায় কারাবাস হয়। এই মহান কর্মীর মৃত্যুতে আমরা একজন নিকট আত্মীয়-বিয়োগ ব্যথা অনুভব করিতেছি। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি এবং পরিবার-বর্গকে জানাই আমাদের আন্তরিক সমবেদনা।

আগামী সপ্তাহে বিপ্লবী বাহির হইবে না। পরবর্তী সপ্তাহে বিশেষ সংখ্যা হিসাবে শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

আর এক বাংলাদেশ

শ্রীসতী ভূষণ সেন

১৯৭০ সালে বাংলাদেশের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস চোখের সামনে রচিত হতে দেখেছি। কানে এখনো বাজছে মুজিবের উদাত্ত আহ্বান, "আজ আমরা আর হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খৃষ্টান নই, আমরা বাঙালী। আমরা পাঞ্জাবীদের আর্থিক দাসত্ব থেকে মুক্তি চাই। কণীদা, কংগ্রেস কোন কোন আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় বলুন। মনিদা, কমিউনিষ্ট পার্টি কটা আসন চায় বলুন। আমরা সবাই মিলে এক আওয়ামী লীগের নামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। আজ আর গলাগলি নয়। বুঝিয়ে দেব দুষমনকে, আমরা একজাতি এক প্রাণ, আমরা বাঙালী।"

সেই সময় আর একটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল আমাদের পায়ের নীচে, পৃথিবীর অপিঠে, দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে। সোশ্যালিষ্ট নেতা আলেন্দ (Allende) আহ্বান করেছিলেন দেশের যাবতীয় বামপন্থীদের, "আসুন আমরা 'পপুলার ইউনিটি মোর্চ্চার একত্র হই। আমি সোশ্যালিষ্ট, আপনি কমিউনিষ্ট, উনি র‍্যাডিক্যাল," তিনি ক্রিশ্চান ডেমক্রাট, আর ঐ ছোট ইউনিয়ন ন্যাশনাল। আমাদের আসল পরিচয় আমরা চিলিয়ান, আমাদের সকলের উদ্দেশ্য আমেরিকার আর্থিক দাসত্ব থেকে মুক্তি"।

অল্প কদিন আগে পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থানের ফলে আয়ুবখাঁর পতন হয়েছিল। সেই প্রবল গণবিক্ষোভকে সামরিক আইনের শক্তিতে স্তব্ধ করে দিতে তিনটি দিনের বেশী সময় লাগেনি জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁর। এর পরেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সর্বদলীয় পার্টি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং বিপুল ভোটাধিক্যে প্রায় সবগুলি আসনই অধিকার করে বসে। কিন্তু সাবধ কমতা হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও কসে যায়।

সেই সময় যদি মুজিবের হাতে ছোট একটি আবহান গেরিলা' দলও থাকতো, জাতীয়তাবাদের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ অসম সাহসী একদল তরুণ যদি মুজিবের পাশে থাকতেন, তবে তাদের সাহায্যে অতি সহজেই তিনি ক্ষমতা অধিকার করতে পারতেন; তাদের আকস্মিক আক্রমণের মুখে পাকিস্তানী আর্মি দিশেহারা হয়ে যেত। মুজিবের মনে এই পরিকল্পনা কখনো চমক দিয়ে উঠেছিল কিনা জানিনা। বিপ্লবী মহানায়ক মহারাজের সঙ্গে তাঁর কি গোপন আলোচনা হয়েছিল, আজ আর জানবার উপায় নেই। তবে এটা অনুমান করা কঠিন নয়, যে সেই জামাজোলের মধ্যে যাহবলে ক্ষমতা করায়ত্ত করে ফেললে, কারও সাধ্য হত না তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে। তিনি ক্ষমতায় আসলে বাংলাদেশের এক জেনারেশন প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী মুসলিমও কোতল হতেন না, জেনারেল টিক্কা খাঁর পল্টনের হাতে। মুজিব শক্ত হাতে দেশের হাল ধরতে পারতেন। ইতিহাস অন্য ভাবে রচিত হত।

১৯৭০ এর নির্বাচনে পপুলার ইউনিটি মোর্চ্চা বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে চিলির রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন আলেন্দ। নির্বাচনী ম্যানেফেস্টোতে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আলেন্দ। প্রথম বিদেশী কোম্পানীগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা দ্বিতীয় ভূমিসত্ব আইন সংশোধন। একশো বছর ধরে আমেরিকান কোম্পানীগুলো চিলির জাতীয় সম্পদ লুটে পুটে খাচ্ছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথায় তারা প্রমাদ গনল। তবে কিনা ডিমোক্রেসীর হাত পোড়ানির পরে, আমেরিকা

আর নতুন করে আগুন নিয়ে খেলা করতে সাহস করল না।

আলেন্দ শাসনভার গ্রহণ করার পরে মার্কীন কিছুই করলেন না। আমেরিকার হাত গোখরো সাপের লেজে হাত দেওয়া তো নয়ই। সমাজবাদের পথে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ ছিল অতীব সাধারণ ও আড়ম্বরবিহীন। দেশের দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের দুর্দশার কিছুটা লাঘব করবার চেষ্টা করলেন মাত্র। প্রতিটি শিশুর জন্য মাথা পিছু দৈনিক এক লিটার দুধ বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করলেন। সরকারী চাকুরেদের বেতনের উর্ধসীমা বেঁধে দেওয়া শ্রমিকদের মজুরী বাড়ি ভাড়া বাড়িয়ে দিলেন, আর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বেঁধে দিলেন। বুঝতে দিলেন জনতাকে যে তাদের আপনজন এবার ক্ষমতায় এসেছে। আমেরিকাও মোটামুটি আশ্বস্ত হল।

নির্বাচনী প্রতিজ্ঞাপূরণের কাজ হাতে নিলেন আলেন্দ পরের বছর জুলাই মাসে। তখন টনক নড়ল আমেরিকার। প্রথমে তাঁরা খনিগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করলেন। তাঁরাই ছিল চিলির প্রধান আয়ের সম্পদ, খনিগুলি সবই আমেরিকান মালিকানাধীন। ক্ষতিপূরণের কথা উঠতে জবাব দিলেন আলেন্দ, "ক্ষতিপূরণ চাইতে আমেরিকার লজ্জা হওয়া উচিত। খনিতে ওরা লগ্নী করেছে মোট তিন কোটি ডলার। বিগত পঞ্চাশ বছরে খুঁড়ে তুলে নিয়ে গেছে ৫৩০ কোটি ডলারের সম্পদ। তার উপরে ফেলে গেছে ৭৩৫ কোটি ডলার বাজার দেনা, সেটা আমাদেরই শোধ করতে হবে। ক্ষতিপূরণ তো আমাদেরই পাওনা।

অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ যে দেওয়া হবে না সেটা জানিয়ে দিলেন। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও তাই ছিল। কিন্তু আসল প্রশ্ন হল খনিগুলি চালানো নিয়ে। চালাবো এবং চালিয়ে দুটো পয়সা দেশের হাত করা নিয়ে। বিদেশী কারিগর, কেউ চিলিয়ান সরকারের চাকরী করবে না। নতুন টেকনিশিয়ান ও ম্যানেজমেন্ট টীম রিক্রুট করা চাই [শ্রমিক সকলেই চিলিয়ান]। নিজের শক্ত ঘাঁটি থাকা চাই যে জিনাসের দিকটা সামলাবে। খনি থেকে তাঁরা তুলে বিদেশে চালান দিতে হবে, বিক্রি করে টাকা ঘরে আনতে হবে।

আমাদের দেশের পাবলিক সেক্টার কোম্পানীগুলির ২০।৩০ বছরের ইতিহাস যারা জানেন, যে পরিমাণ লোকসান ওরেও টেনে চলেছে তাঁরা তার খবর রাখেন, তাঁরা বুঝবেন আলেন্দের পক্ষে কাজটা খুব সহজসাধ্য ছিল না। এর উপরে এল বিপদের উপর বিপদ, নতুন শাসকের মাদকতায় চিলির শ্রমিক সংগঠনগুলি আরো দুটি আমেরিকান কোম্পানীর কারখানা অধিগ্রহণ করে বসল। একটি কোর্ডের মোটর কারখানা, অন্যটি নর্দান ইণ্ডিয়ান গ্রাস কোম্পানী। আলেন্দ এগুলির গায়ে হাত দিতে চান নি, তবু এগুলিও তাঁর ঘাড়ে পড়ল। শ্রমিক সংগঠনগুলি তখন পাল্লা দিয়ে ফ্যাক্টরী অধিকার করে চলেছে। দেখতে দেখতে ১৫।২০ টা কাপড়ের কল চালাবার দায়িত্ব নিতে হল সরকারকে। এগুলি বিদেশী মূলধনী কারবার নয়, সবই চিলির টাটা বিড়লাদের সম্পত্তি তাঁরা এতদিন আমেরিকানদের দুর্দশা দেখে পুলকিত হচ্ছিলেন, এবার তাঁদের টাঁকে হাত পড়ল।

ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি সবদেশেই উচ্চবিত্ত গোষ্ঠীর মানুষ। সর্বত্রই তারা সরকারের সমর্থক। রাজা আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন বলেই তারা নির্ভয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করবার সুযোগ পায় এবং নিজ নিজ সম্পদবৃদ্ধি করতে পারে। তাই তারা রাজভক্ত। কিন্তু রাজা যদি তাদের ধনসম্পদ অধিগ্রহণ সুরু করেন তখন রাজভক্তিতে ভাটার টান আসে। এই উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেরাই আর্মির অফিসার কোরে যোগ দেয়, সরকারী চাকরীতে ঢুকে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করে। দেশের কোন্ আইনটা শক্ত হাতে প্রয়োগ করলে নিজেদের তাঁর প্রাধান্যের সুবিধা, আর কোন্ আইনটা চোখ বুজে পাতা উল্টে যাওয়াই উচিত, স্থির করে এরাই। শাসনকার্য সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করতে হলে এদের তাদের হাতে রাখতে হবে। মিষ্টি কথায় না পাড়লে, চোখ রাঙিয়ে। অন্ততঃ এরা যাতে নিউট্রাল থাকে, 'সাবোটেজ' না করে দেখতে হবে।

চিলির সৈন্যদল যে আমেরিকার তাঁবেদার ছিল তা নয়। আমেরিকার বাজার থেকে লড়াই-এর সরঞ্জাম কিনতো তাই কিছুটা ঘনিষ্টতা হয়েছিল। আসলে আর্মি ছিল রাজনীতি বিবর্জিত প্রফেশনাল আর্মি। লাটিন আমেরিকার অন্য দেশের আর্মির মত কোন মেক্সিলাদলের শাখা নয় তারা। কিংবা কিউবার আর্মির মত মার্ক্স ও লেনিনের বইয়ের পাতা থেকে বেড়িয়ে আসা খোরতর কমিউনিষ্টতো নয়ই। তাই সিয়া [C. I. A.] পক্ষে ওদের ভেতরে অনুপ্রবেশ করা সহজ হয়েছিল।

আলেন্দ যখন তামার খনিগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করছিলেন, আমেরিকা মৌখিক প্রতিবাদ ছাড়া সামনা সামনি কিছুই করেনি। ভেতরে ভেতরে চিলিতে আর্থিক সঙ্কট ও অরাজকতা সৃষ্টিতে সাহায্য করছিল। অপেক্ষা করছিল কতদিনে একদিকে সরকারী আমলা অন্যদিকে মিলিটারী জেনারেলরা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে প্রস্তুত হয়। আর্মির পেছনে দক্ষিণপন্থী দলগুলি সমবেত হবে, সর্বত্রই তা হয়ে থাকে। কিন্তু চিলির কমিউনিষ্ট পার্টিও যে শুভ গোধূলি লগ্নে তাদেরই সোঠে এসে যোগ দেবে সেটা কেউ আশা করে নি। কি করে সেটা সম্ভব হল, সেকথা শুনুন।

ফ্যাক্টরীগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় উৎপাদন কমছিল। ভূস্বামীদের কবল থেকে উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছিল না, কৃষির উৎপাদন বাড়ছিল না। জিনিষপত্রের দাম বাড়তে বাড়তে চলেছিল। তখন পপুলার ইউনিটির দেয়র পার্টনার কমিউনিষ্ট পার্টি পরামর্শ দিলেন, আমেরিকাকে ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকার করে নিয়ে মিটমাট করে ফেলা ভাল। তাহলে আমেরিকার সাহায্য নিয়ে আর্থিক বুনিয়াদ মজবুত করা সহজ হবে। হয়ত মনে মনে বাসনা ছিল তাদের, আমেরিকার সোঠে ভিড়িয়ে দিয়ে আলেন্দের রাজনৈতিক ভবিষ্যত খতম করে দেওয়া। আলেন্দ, সেই আত্মঘাতি প্রস্তাবে রাজি হলেন না।— ধুর্জিও খোমস্কারের অনুরূপ প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নি।

আলেন্দের সম্মুখে অন্য পথ ছিল প্রাইভেট সেক্টর সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত করে স্টেট ট্রেডিং এর হাতে সংগ্রহ ও বিপনণের ভার দেওয়া। এবং তারই মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করা। সেখানে অসুবিধা ছিল 'ঘরো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি'। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের একাধিক শ্রমিক সংগঠন। সকলেই জঙ্গী, 'হামডি মিলিটারী তোমডি মিলিটারী' সম্পর্ক। মিলেমিশে কাজ করার সম্পর্ক নয়। শেষটায় অফিসিয়াল Supply & Price Control Board এর উপর করে দিলেন সংগ্রহ ও বিপনণের। তাতে কালোবাজারী কমল, কিন্তু জিনিষপত্র একেবারে উধাও হয়ে গেল বাজার থেকে। শেষটায় ব্যবসায়ী ও আর্মির সহযোগীতা চাইলেন সরকার, মন্ত্রীসভায় তাদের কয়েকজন প্রতিনিধির স্থান দিতে চাইলেন। তারা বুঝলো এইবার পপুলার ইউনিটির দম ফুরিয়ে আসছে। —ধুর্জিও যখন আর্মির সহায়তা চেয়েছিলেন কালোবাজারী দমন ও কৃষি পুনর্গঠনের কাজে তরুণ অফিসার গোষ্ঠী তখনই ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করে।

চিলিতে এই সময় এল ৭৩ এর নির্বাচন। দক্ষিণপন্থী দলগুলি আশা করেছিলেন যে দেশের আর্থিক সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে সরকারকে পরাজিত করতে পারবেন। তবু যদি দৈবের খেয়ালে সেটা সম্ভব না হয় তখন কি করা হবে, তারও একটা পরিকল্পনা রচনা করা হল। বিরোধীদের সকল আয়োজন ব্যর্থ করে দিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করলেন আলেন্দ। —সেই জয়ই হল তাঁর কাল।

যদি পরাজিত হতেন তবে সম্ভবতঃ একটা কমিশনের সামনে তাঁর বিচার হত। দেশদ্রোহিতার অপরাধে শাস্তি হওয়াও অসম্ভব ছিল না। কারণ, যতটা বয়স হলে একটা জাতির আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয় চিলির সে বয়স হয় নি। তবু তাঁর প্রাণটা তো হারাতে হত না। দুর্ভাগ্য যে তিনি জয়লাভ করলেন। তখন শত্রুর ষড়যন্ত্রজাল ছড়িয়ে পড়ল ভূস্বামীদের প্রাসাদ থেকে, প্রসারিত হল আর্মি ব্যারাকে, মূল চলে গেল মাটির নীচ দিয়ে সিয়া [C. I. A.] দপ্তরে। দুনিয়ায় যে কেউ স্বাধীন পথে চলবার চেষ্টা করেছে সেই হয়েছে আমেরিকার চক্ষুশূল।

নতুন কিছু দেখলেই লাল কুত্তার ভয়ে চমকে ওঠে আমেরিকা। নইলে আলেন্দে বা মুজিব কমিউনিষ্ট ছিলেন না। বরং আলেন্দের পতনের অন্যতম কারণ ছিল কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর বিরোধিতা। উভয়ের ক্ষেত্রেই সুতো ধরে পেছনে বসেছিলেন যাদুকর নিক্সন।

তখনও আমির আন্তরিকতার উপরে আলেন্দের দৃঢ় বিশ্বাস। তাদেরই দাবী মেনে নিয়ে আলেন্দে শ্রমিক সংগঠনগুলির অভিযোগ Lunatic fring এর উপর আকর্ষণ করলেন। বিপ্লবের দায়িত্ব ফিরিয়ে দিলেন ব্যবসায়ীদের। শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির নতুন দাবি অগ্রাহ্য করলেন। শেষটায় আমির তরুণ অফিসার গোষ্ঠী যখন তাঁর প্রাসাদ আক্রমণ করল, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এল মাত্র কয়েকজন অনুগত দেহরক্ষী। একলা একটি মেশিনগান হাতে প্রেসিডেন্ট তার আমির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এগিয়ে গেলেন। মাত্র এক ঘণ্টা আগে যাঁর প্রাসাদের সামনে লাখ লক্ষ লোকের মিছিল সমবেত হয়েছিল, মুহুর্মুহু ধ্বনি দিয়েছিল (Allende, Hit the reactionaries hard, the people are defending you") আলেন্দে তুমি আগে বাড়ো হাম লোগ সব পিছে হ্যায় !"

গ্রীক ট্রাজেডির অবশ্যম্ভাবী পরিণামের সম্মুখে বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পনের কথা মনে করিয়ে দেয় আলেন্দে ও মুজিবের জীবনকথা। আশা করছিলেন তাঁরা সমস্যা যত দুরূহই হোক আপনা থেকে সমাধান হয়ে যাবে। আমি অফিসাররা যড়যন্ত্র করছেন, সে তাঁদের অজানা ছিল না। বিশ্বাস ছিল দেশের জনতার উপরে। "আমার গায়ে হাত দিলে মানুষ ওদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে ; সে ওরা জানে।" বলেছিলেন মুজিব।

শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি সম্পন্ন—বিখ্যাত 'ফলিতজ্যোতিষ' গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীহরিহর জ্যোতিশাস্ত্রী

বি, এ, এল, এল, বি (কলিঃ) এ, সি, আই, আই (লণ্ডন)

প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে ১১টা এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার ব্যতীত অন্যদিন বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বপ্রকার জ্যোতিষী কার্য্য করেন।

কোষ্ঠী বিচারের পারিশ্রমিক ন্যূনপক্ষে ২০ টাকা।

চেম্বারের ঠিকানা :

সি-৩৪, কাননগো পার্ক, পতিয়া, ২৪ পরগণা

৫ নং বাসরুট, বৈষ্ণবঘাটা ষ্টপ।

নূতন ইহুদী

কৌটিল্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাঙ্গালার মন্বন্তর হইতে শুরু করিয়া বাঙ্গালা ভাগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের বর্ত্তমানে রাজ্যের বাংলার মত ক্ষতি হয় নাই। বাঙ্গালী বাদে অন্য কোন রাজ্য অনুভব করিতে পারে নাই এই হতভাগা জাতির (বাঙ্গালী জাতির) উপর দিয়া কি ঝড় বহিয়া গেল। দেশ ভাগের পর কংগ্রেস সভাপতি পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন বলিয়াছিল, উদ্বাস্তু পুর্নবাসনের জন্য ভারতে লেভি প্রথা প্রবর্ত্তিত হোক। সেই লেভির অর্থ হইতে পুনর্বাসন কাজ সমাধা হইবে। কে কার কথা শোনে, সবাই তখন ক্ষমতার স্বাদ পাইয়া আনন্দে বিভোর। বিশ্বমানবের এত বড় একটা অংশ ভারতের মাটিতে তেলে জলে আগাছার মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে, আন্তর্জাতিক জগতে তেমন কোন সাড়াই পাওয়া যায় নাই। আমরা (unra) পুনর্বাসন সমস্যাকে আন্তর্জাতিক পর্য্যায় তুলিতে রাজী হয় নাই। তার কারণ বোধ হয় জনতার এই বাসত্যাগ কোন যুদ্ধ-বিগ্রহের ফল নয়। আন্তর্জাতিক আইনের কোন ধারায় এই হতভাগোর দল পড়ে তা আমরা ঠিক জানি না। কিন্তু মানবতার একটা দিক রহিয়াছে তাহা সমস্ত সমস্যার ওপরে স্থান পাইতে পারে। বাঙ্গালী জীবনের এমনই রূঢ় ব্যঙ্গ পরিহাস যে, ভারতবাসী হইয়া ভারতবাসীর প্রতি ভারতীয় ব্যবহার করে নাই। আমরা হইলাম ভারতীয় বাঙ্গালী, আমাদের জীবনের দায়-দায়িত্ব এমনই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে তাহাকে সংখ্যার যোগে বিচার করিলে প্রায় শূন্য হইয়া পড়ে। গল্প আছে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের বিষয় নিয়ে কোন প্রশ্ন আলোচনা হইলে পার্লামেন্টের সদস্যরা ঝিমাইতেন। 'ভারত' একটা আলোচনার যোগ্য বিষয়বস্তু নয়—এই ভাব। গোড়া বাঙ্গালী, তথা উদ্বাস্তু—এদের সম্বন্ধে কোন আলোচনা শুরু হইলে ভারতীয় সংসদের সভ্যরা প্রায় সবাই ঝিমাইতে শুরু করেন। প্রথমতঃ বাঙ্গলার (পশ্চিম বাঙ্গালার) সমস্যা সম্বন্ধে কেহই বড় একটা মাথা ঘামাইতে চাহেন না। দ্বিতীয়তঃ উদ্বাস্তু—এরাত মনুষ্য সমাজের ব্যাকার জনক বস্তু। যে দণ্ডকারণ্য শিবির সম্বন্ধে এত কথা আছে তাহা কেহ শুনিতে চাহে না। ওখানকার (শিবিরের) মেয়েদের সহজে এবং সস্তায় পাওয়া যায়। শুরুদের দ্বারা দাসবৃত্তি করানো চলে। বাকী সব কথা নাই বলিলাম। অভিজ্ঞ পাঠক ইহা হইতে সব বুঝিয়া লইবেন। ভারতীয় সংসদের পাঁচশ-র ওপরে সদস্য তাদের মধ্যে পশ্চিম বাংলার জন্য চল্লিশেক লোক সভায়, আর রাজ্য সভার হিসাব ঠিক মনে পড়িতেছে না। সবই মিলিয়া যে যে সংখ্যা আছে তাহাতে কোন চাপ সৃষ্টি করা যায় না। তার ওপর দলীয় মেজাজ রহিয়াছে। তার ফলে ভারতীয় বাঙ্গালীর কথা। উদ্বাস্তুর কথা কেহ শোনে না। পাঞ্জাবীরা দিল্লীর কাছে বাস করে, তাদের সমস্যা তারা জোরের সঙ্গে উগ্রভাবে প্রকাশ করিতে পারে। প্রয়োজনে দিল্লীকে অচলও করিয়া দিতে পারে। অহিংস

কংগ্রেস হিংসাকে বড় ভয়ের চোখে দেখে। যারা নিজেরা হিংসা পন্থী তারা অন্যের বিপরীত হিংসাকে ঠেকাইবার কৌশলও জানে। কিন্তু কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সরকার হিংসার কাজটা অর্থাৎ গুলি চালনার কাজটা পুলিসের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আছে। দস্তুরমতো মারধোর গুলি চালান হয়েছে। কিন্তু তা খাস দিল্লীর ঘাড়ের ওপর গিয়া পড়ে নাই। আর পাঞ্জাব, হরিয়ানার যদি কিছু ঘটে, তবে খাস দিল্লী নিয়ে টানাটানি। জলবন্ধ, আলো বন্ধ, পরিবহন বন্ধ, তারপর আরো কত কিছু। এক কথায় কুরুক্ষেত্র দিল্লী চঞ্চল করিয়া তুলিতে পাঞ্জাবের লোকেরা পারে। দিল্লী শক্তের ভক্ত। নরমের যম। তাই তাদের উদ্বাস্তু সমস্যা যত তাড়াতাড়ি সমাধান হইয়াছে, বাঙ্গলার উদ্বাস্তু সমস্যা সে পরিমানে কিছুই হয় নাই। দিল্লীতে এমন দৃশ্য ও কোন দিন দেখা গেছে। পথের পাশে ক্যাম্পে বসিয়া ধুকধুকে কাশুচে টাকা বিলি হইতেছে। আর কি ঠিকানা কেউ জানে না। কেউ জানীয়দার নেই। উদ্বাস্তু বলিলেই হইল। অবশ্য এই জাতীয় স্বর্ণযুগ বেশী দিন ছিল না। তাহা হইলেও হিন্দীভাষী পাঞ্জাবীরা কেন্দ্রীয় সরকারকে যে কাজ করাইয়া লইয়াছে, তার সিকি ভাগও বাঙ্গালার উদ্বাস্তুরা পায় নাই। ইহা অবিশ্বাস্য হইলেও ঘটিয়াছে। গাড়ী গাড়ী সেলাইয়ের কল পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। আর এদিকে একটি সেলাইয়ের কল বাহির করিতে এক এক জনকে গলদঘর্ম হইতে হইয়াছে। আর যে সব তিক্ত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহা নাই বলিলাম। এখানে কাকের মাংস কাকে খায়। এক উদ্বাস্তু আর এক উদ্বাস্তুর সর্বনাশ চিন্তায় মগ্ন।

কেন বাঙ্গলার উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে এই বৈষম্য মূলক আচরণ সম্ভব হইল? ইহার কারণগুলি বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

প্রথমতঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তু সমাজকে কোন দিনই সুনজরে দেখেন নাই। পরিস্থিতি এক অদ্ভুত ছাঁচে গড়িয়া উঠিল। তার কারণ তৎকালীন রাজনীতি—অর্থাৎ কংগ্রেস রাজনীতি সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস রাজনীতিতে উদ্বাস্তু যে একটা সমস্যা তা স্থান পায় নাই। তার উপর পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উদ্বাস্তু সমস্যা আরো স্থান পাইল না। ইহার একটা মূল কারণ পশ্চিম-বঙ্গ কংগ্রেসের নেতৃত্বের আমূল পরিবর্তন কংগ্রেসের মধ্যে যে সব পূর্ব বাঙ্গবাসী ছিল, দেশ ভাগের পর তাহাদের পায়ের তলার মাটি এক নিমেষে সরিয়া গেল। অথচ ইহাদেরই আত্মীয় স্বজন বন্ধু উদ্বাস্তু। এই কংগ্রেসীরা কাহাকেও নিজেদের সমস্যার কথা বলিয়া বুঝাইতে পারেন নাই। তাহার কারণ, তাহাদের হাতে ক্ষমতা নাই।

পশ্চিম বঙ্গে যাঁহারা খাদি গ্রুপ বলিয়া পরিচিত তাহারা মোটামুটি কংগ্রেসের কর্ণধার হইলেন। ইহাদের অনেকেরই পূর্ব-বঙ্গবাসীদের প্রতি একটা চাপা বিদ্বেষ ভাব ছিল। পূর্ব বাঙ্গালার হিন্দু সমাজের কথাবার্তা, চলন-বলন, আচার-আচরণ সবই পশ্চিমবঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। দেশ উদ্ধারের পালায় যে গাওয়ানা সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হউক না কেন ক্ষমতা দখলের বেলায়, স্বাচ্ছন্দ্য সম্পদ ভোগের বেলায়, কেহই অংশীদার পছন্দ করেন না। পশ্চিম বঙ্গের হুগলী গ্রুপ হঠাৎ এমন একটা অসম্ভব হারে রাজনৈতিক গুরুত্ব পাইয়াগেসিল, এবং সেই হারে পূর্ব বাঙ্গালার রাজনৈতিক কর্মীরা ব্যক্তিগতভাবে এবং দলগত

ভাবে অবিশ্বাস্যভাবে সবই হারাইল। ঘরবাড়ী রাজনৈতিক ঘাঁটি ইত্যাদি। নদীর পূর্বকূল ভাঙিয়া পশ্চিম কূলে চর দেখা দিল। এই ভাঙা গড়ার মধ্যে উদ্বাস্তুরা রাজনৈতিক দাবার ঘুঁটিতে পরিণত হইল। পূর্ব বাঙ্গলার রাজনৈতিক কর্মীদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, গ্রামবাসী আজ সবই গাছের তলায়। অথচ উহাদের হইয়া লড়াই করিবার মত মনোবল, সঙ্ঘশক্তি, রাজনৈতিক কর্মীদের ছিল না। তার কারণ এই কর্মীরাই রাজনৈতিক সংস্থা কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত অথবা অপাংক্তেয় বলিয়া বিবেচিত। এই নিরুপায় করুণ অবস্থার মধ্যে কতগুলি সামাজিক বিদ্বেষভাব, ভেদবুদ্ধি মাথাচাড়া দিয়া উঠিল। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় যত দিন জীবিত ছিলেন তত দিন এই সামাজিক ক্লেদ উপর প্রদেশে ভাসিয়া উঠিতে পারে নাই। তিনিও কিছু দিন বাদে কেন্দ্রের দেয়া উদ্বাস্তু পুনর্বাসন অর্থ পশ্চিম বাঙ্গালার গঠনমূলক অর্থনীতির মধ্যে গুঁজিয়া দিলেন। ফলে টাকাটা নিছক উদ্বাস্তুখাতে ব্যয়িত হইত না। বিধানচন্দ্রের মৃত্যুর পর অতুল্য-প্রফুল্ল সেতুত্ব পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে এমনভাবে দানা বাঁধিল যে উদ্বাস্তুদের সাপের সঙ্গে তুলনা করা হইত। অর্থাৎ সাপ দেখিলে যেমন লাঠি দিয়া মারিতে হয় তেমনি উদ্বাস্তুদের দেখা মাত্র এমন ব্যবহার করিতে হইবে যেন উদ্বাস্তুরা সেই ব্যবহারকে মৃত্যু সমতুল্য মনে করে। এই বিদ্বেষ বহ্নি ও ঘৃনা প্রজ্জ্বলিত করিতে মেদিনীপুরের খাদি গ্রুপ, হুগলী গ্রুপের সঙ্গে হাত মিলাইল। একেবারে সোনায় সোহাগা। অর্থাৎ উদ্বাস্তুদের কোন কূল নাই, রাজনৈতিক জাতি কূলও নাই, পরম পরানন্দ বৈষ্ণব কূলও নাই।

এই দুরবস্থার সুযোগ কমিউনিষ্ট পার্টি লইয়াছে, আর ডামাডোলের মধ্যে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের জন্ম হইল। এই প্রকল্প রূপায়ণে কিছু অভিজ্ঞ রাজনৈতিক কর্মী আগাইয়া আসিলেন। কাজেও হাত দিলেন তাঁরা। কিন্তু সেখানেও সিসমোগ্রাফ যন্ত্র, কে বা কাহারা অতি উৎসাহের মুখে বোমা প্রহার করিয়া থাকিবেন, এখানে এক পূর্ববঙ্গ সৃষ্টি করিবেন। দিল্লীর কানে জল গেল, দণ্ডকারণ্য নববঙ্গ হইবে কেন? অন্যান্য রাজ্যের লোক ও সেখানে পুনর্বসতি লাভ করিবে। তারপর, তখন বার্মা সমাজে ভারতীয়দের বাড়ি ঘর ছাড়া করিয়া তাড়াইয়া দিতেছে। নিরুপায় ভারত সরকার অগত্যা ভারতীয়দের বার্মা হইতে ফিরাইয়া আনিলেন। তাহাদেরও কিছু স্থান যাতে দণ্ডকারণ্য হয় তার জন্য এক নূতন দেবীর সৃষ্টি হইল। আদিবাসী, উদ্বাস্তু বাঙ্গালী, আর বার্মা ফেরৎ দক্ষিণীরা—এই তিনেরই সমস্যা একই প্রকারের এমন নহে। এদের মধ্যে বাঙ্গলার উদ্বাস্তুরাই তীব্র সমস্যায় ভুগিতেছিল। কারণ পূর্ব বাঙ্গলার ঢেলে জলে মানুষ হইয়াছে যারা জলভরা অবনত আকাশের তলায় দাড়াইয়া শস্যাদি চাষ করিতে অভ্যস্ত যারা তাদের কাছে দণ্ডকারণ্য সম্পূর্ণ মরুভূমি। এই মরুভূমিতে পড়িয়া বাঙ্গালার উদ্বাস্তুরা সবই হারাইল।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

ইংলাণ্ডে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

মিঃ মুখোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন আমাদের কাজ শুরু করার পরে। কিন্তু তিনি মনেপ্রাণেই একাজে যোগ দিয়েছিলেন। তার ঘটনা বিন্যাস ও তথ্য উপস্থাপন করার ক্ষমতা, স্বচ্ছ ও সরল প্রকাশভঙ্গী এবং তার গভীর ঐকান্তিকতা ব্রিটিশ শ্রোতাদের মনের উপর গভীর রেখাপাত করে। মিঃ সৈয়দ আলি ইমাম (পরবর্তী কালে স্যার আলি ইমাম) গ্লাইমাউথে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। তিনি তখন ব্যারিষ্টারী করতে কেবল মাত্র শুরু করেছিলেন। তার শান্ত, অমায়িক এবং পরিচ্ছন্ন বিচার বুদ্ধি সেই সময়েই সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়। তার এই বিচার বুদ্ধি অনেক ঘটনা বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে তাকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনতে বেশ সাহায্য করে। মিঃ দাদাভাই নৌরজি এবং স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন সময় সময় আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং বক্তৃতা করে সাহায্য করেছেন। মিঃ এর্ডলেনবর্টন ডেপুটেশনের আর একজন সদস্য ছিলেন। তিনি কিছুটা বিলম্বে যোগ দিয়েছিলেন বটে, তবে আমাদের জন্য অনেক ভাল কাজ করেছেন। অক্সফোর্ড ইউনিয়নে ডিবেটের সময় তিনি কংগ্রেসের প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি ছিল এই : "এই সভা হাউস অব কমন্সে উপস্থাপিত বিলটির মধ্যে নির্বাচন নীতি স্বীকৃত না হওয়ার বিষয়টি দুঃখের সহিত লক্ষ্য করছে।"

এই বিতর্ক সভার বিষয়টি একটি স্মরণীয় ঘটনা। অক্সফোর্ড ইউনিয়ন ছিল রক্ষণশীল দলের একটি এক দুর্গ। এই অক্সফোর্ড ইউনিয়নেই মিঃ গ্লাডস্টোন একজন বড় তর্কবিশারদ রূপে নিজেকে প্রথম চিহ্নিত করেন এবং তাঁর এই এ্যালমামেতারের প্রভাবেই তিনি তাঁর বিরাট কর্ম জীবনের শুরুতে "অনমনীয় টোরি গোষ্ঠির উদীয়মান আশা" রূপে প্রতিভাত হন। আমরা মিঃ হিউম, মিঃ নর্টন এবং আমি প্রায় এই স্থির বিশ্বাস নিয়েই বিতর্ক সভায় প্রবেশ করলাম যে সেই তরুণ রক্ষণশীলদের সমাবেশে আমাদের প্রস্তাব টিকবে না। সেখানে আমার মিঃ উইলসনের সঙ্গে দেখা হল। উইলসন ছিলেন সে সময় প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন অধ্যাপক এবং কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তার রাজনৈতিক মতবাদ আমার জানা ছিল। তাই তাকে দেখে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হল যে তিনি আমাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই ভোট দেবেন। তাকে এ বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বুঝলাম যে আমি ঠিকই ধারণা করেছি।

সাফল্য সম্পর্কে কোন আশা না রেখেই আমরা লড়াইয়ে নামলাম। কিন্তু একটা খারাপ নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যেও ঘরটা সম্ভব কিছু লাভ করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম। মিঃ নর্টন বেশ একটি জোরাল ভাষায় তার প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন। প্রস্তাবটির বিরোধিতার নেতৃত্ব দিলেন লর্ড হিউমেসিল। তার বিরোধিতার উত্তর দেওয়ার ভার পড়ল আমার উপর। আমি আগে থেকেই কিছুটা ধারণা করে নিয়েছিলাম কি ধরণের যুক্তি তিনি উপস্থাপিত করতে পারেন। আমার ধারণা ঠিকই হয়েছিল। আমি সেই ধারণার উপর নির্ভর করে পূর্বেই ঘটনা ও তথ্যসহ নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিলাম তার মোকাবিলায় দাঁড়াবার জন্য। তার তূণীরে সবচেয়ে সাংঘাতিক ধারাল তীর ছিল আমাদের শিক্ষাগত অনগ্রসরতা। আমি তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম যে ১৮২১

সালে ইংল্যাণ্ডে স্কুল ছিল মাত্র ১৮৫৩টি এবং উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল ৭৫০,০০০ জন। আরও বলবার যে ১৮৮২ সালের আগে পর্যন্ত তারা ভারতের স্কুলগুলির ও পণ্ডিতগণের সম সংখ্যায় পৌঁছতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডে ১৮৮১ সালে ইংল্যাণ্ডে পুরাদস্তুর পার্লামেণ্টারী প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে উঠেছে। সে ক্ষেত্রে তুলনায় আমরা তো অনেক কমই চাচ্ছি। আমার এই তথ্যের দ্বারাকে খণ্ডন করার মত কোন সওয়াল উত্তর ছিলনা। ইয়র্কের আর্ল রিপনের পুত্র ডরুল ল্যাভলি—বালকটি বেটার ৬ষ্ঠ —এক চমৎকার মনোজ্ঞ বক্তৃতা করে আমাদের সমর্থন করলেন। দু-পক্ষের ভোটদাতারা আলাদা আলাদা হয়ে বসলেন।

অতি বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা দেখলাম যে অধিকাংশ ভোটই পড়ল আমাদের পক্ষে। প্রস্তাবটি গৃহীত হল বলে ঘোষণা করা হল, এই ভোট কংগ্রেস ডেপুটেশনের একটি স্মরণীয় বাহাদুরীর কাজ। ভোটে এই জয়লাভের দ্বারা এটাই প্রকাশ পেয়েছে যে কংগ্রেসের শাসন সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রমের মধ্যে যে দাবী আছে তা এত সামান্য ও পরিমিত যে ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে বেশী রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কাছেও তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

অক্সফোর্ড ইউনিয়নে আমি যে বক্তৃতা করেছিলাম তার একটা অংশ মিঃ বর্টন প্রায়ই আবৃত্তি করে শুনাতেন তিনি এটা করতেন কতকটা কৌতুকের ঘলে আর কতকটা বন্ধুভাবে তা সমর্থন করতেন বলে। সেই অংশটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"এই বিতর্কসভায় বক্তৃতা করার সময় এরকম মন্তব্য করা হয়েছে যে ভারতে ইংরেজদের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতবাসীরা বর্বর বা আধা বর্বর ছিল। আমার মনে হয় এ রকম ভাষাই ব্যবহার করা হয়েছিল। এই সভাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তারা ভারতের হিন্দুগণ, যে হিন্দুবংশে জন্মলাভ করায় আমি গৌরব বোধ করছি (তুমুল হর্ষধ্বনি—এক মহান মানব গোষ্ঠীর বংশধর স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ইয়োরোপের সর্বাপেক্ষা বেশী সভ্যজাতি সমূহের পূর্বপুরুষগণ যখন তাদের নিজেদের দেশে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন, তখন আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ এমন এক নীতিশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব ও সমুচ্চ ভাষার অনুশীলন করতেন যা আজও পর্যন্ত সমস্ত সভ্যজগতের প্রশংসার বিষয় হয়ে রয়েছে। (তুমুল হর্ষধ্বনি) আপনাদের কেবলমাত্র একটুখানি পথ হেঁটে বোডলিয়ান লাইব্রেরীতে যেতে হবে। সেখানে গেলে দেখতে পাবেন ভারতবর্ষের ইতিহাস, কৃষ্টি ও দর্শনের রেকর্ড, সুতরাং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওই সমস্ত মন্তব্য যথাস্থানে করা হয়নি (হর্ষধ্বনি) আমরা যে দাবী এখানে উপস্থাপিত করেছি তাকে সমর্থন করার জন্য যদি এই মন্তব্য করা হয়ে থাকে, যদি আমাদের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের দাবীকে উপেক্ষা করার জন্য এই মন্তব্য করা হয়ে থাকে, তা হলে বলব যে এর চেয়ে বেশী অনুপযুক্ত স্থান ওই মন্তব্যের পক্ষে আর হয়নি। এর কারণ অতি সহজ ও সরল, এবং তা হচ্ছে এই যে আর্য্য গোষ্ঠীর সভ্যতার একটা মূলগত বৈশিষ্ট্যই ছিল তাদের স্বায়ত্তশাসনশীল প্রথা ও বিধি-বিধান, এবং আমরা সেই আর্য্যদেরই সন্তান (হর্ষধ্বনি)। মাননীয় বিরোধী নেতা স্যার হরকোর্ট বাটলার তার বক্তৃতায় তার বেনারী সেই থেকে প্রমাণ বলে উল্লেখ করে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি বেনারী বেইনকে ভারতীয় বিষয় সম্পর্কে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করতে। কী বলেছেন তিনি ভারত সম্পর্কে? বলেছেন, স্বায়ত্তশাসনমূলক ব্যবস্থার সর্বপ্রথম সক্রিয়রূপের দৃষ্টান্ত ভারতের আদি ইতিহাসে পাওয়া যায়। সেখানে গ্রাম্য সমিতিগুলি পাহাড়-পর্বতের প্রাচীনত্বের মতই প্রাচীন? (হর্ষধ্বনি)। আমরা যখন প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান অথবা আংশিক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের দাবী জানাচ্ছি, তখন এটা বুঝতে হবে যে আমরা এমন কিছু চাচ্ছি যা ভারতীয় জনগণের প্রতিভা ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা তাদের ইতিহাসের ঐতিহ্যে

মিশে আছে এবং যা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নীতি ও অভিপ্রায়ের সঙ্গেও সম্পূর্ণ মিলে যায়।"

আমার বক্তৃতা আমি এইভাবে শেষ করি :—"প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান লাভের অধিকার মানুষের একটি পবিত্র অধিকার। বিধাতা ইংরেজ জাতির হাতে সেই অধিকার রক্ষার ও প্রসাধনের দায়িত্ব ভার অর্পণ করেছেন। কোন বিশেষ জাতিরই একমাত্র অধিকার রূপে তা দেওয়া হয়নি। সমস্ত মানব সাধারণেরই তা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। ইংল্যাণ্ড হচ্ছে গণ-প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের লীলা নিকেতন। ইংল্যাণ্ডের এই কেন্দ্র থেকে গণ-প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ দূর দূরান্তে বিস্তৃত হয়েছে, যার জন্য যথার্থভাবেই এই দেশকে স্বাধীন জাতি সমূহের করুণাময়ী জননী বলা হয়ে থাকে। ভারতের জনগণও সেই মায়েরই সন্তান। সন্তান রূপে সে তার জন্মগত অধিকার দাবী করছে। আর সে অধিকার হল, ব্রিটিশ নাগরিক ও ব্রিটিশ প্রজাপুঞ্জের সহিত সমান নাগরিক অধিকার। আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত যে ব্রিটিশ জনগণের কাছে আমার এই আবেদন সাড়া না জাগিয়ে পারে না; সেই সাড়া হবে সহানুভূতির সাড়া, আমাদের দাবী স্বীকার করে নেওয়ার সাড়া (হর্ষধ্বনি)। আমি এই সভার কাছে সুবিচার চাচ্ছি। আমি সেই স্বাধীনতার জন্য আবেদন করছি যে স্বাধীনতা আমাদের সম্পর্কের ও ব্রিটিশের মধ্যে অসামঞ্জস্য নয়, বরং যা সেই স্বাধীনতার বেদী মূলকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করবে। আমি সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ যে এতক্ষণ যাবৎ আমি আপনাদের কাছে বললাম তা অখণ্ডনীয় এবং আমি এ বিষয়েও নিঃসন্দেহ যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই কথাগুলির কোন গুরুত্ব, কোন মর্ম কোন তাৎপর্য ইংরেজগণ সাধারণের মধ্যে এবং এই সভায় থাকবে, আপনারা সর্ব সম্মতভাবে এবং দৃঢ়তার সহিত ভোট দিয়ে আমাদের আশা আকাঙ্খার প্রতি আপনাদের সহানুভূতি প্রকাশ করবেন। আমাদের অভিলাষ এই যে যে ন্যায় বিচার বোধ ও স্বাধীনতার আদর্শ ইংরেজ জনগণের হৃদয়ে, বিশ্বাসে এবং অনুভূতিতে চিরন্তন ও গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে আছে—তা তারা যে দলেই থাকুন না কেন, যে নীতিতেই বিশ্বাসী হোন না কেন, যে সম্প্রদায়ের সঙ্গেই যুক্ত থাকুন না কেন—সেই ন্যায় বিচার এবং স্বাধীনতার নীতিতে ভারত বর্ষের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হোক (উচ্চ ও দীর্ঘ হর্ষধ্বনি)।"

১৮৯০ সালের ৬ই জুলাই আমি বোম্বেতে ফিরে এলাম এবং সেই দিনই সন্ধ্যায় ফ্রেমজি কাওয়াসজি ইন্সটিটিউটে আমাকে স্বাগত জানাবার জন্য এক বিশাল জনসভার অনুষ্ঠান হয়। এলাহাবাদ এবং কলকাতায়ও এইরূপ জনসভার অনুষ্ঠান হয়েছিল। আমি বারে বারে আমার সেই একই স্বপ্নের রেশ টেনে গেলাম। আমার সে স্বপ্ন ছিল এই যে যে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে, তা চালিয়ে যেতে হবে এবং বারে বারেই ইংল্যাণ্ডে ডেপুটেশন পাঠাতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নানা কারণে ডেপুটেশন আর পাঠান হল না বা পাঠান সম্ভপর হয়নি।

আমার নিজের কথা বলতে গেলে, দেশে ফিরে আসার পর ডিপণ কলেজের ব্যাপারে এক দারুণ ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম। আমার বাইরে থাকার সময় কলেজের উপর এক মরণ আঘাত হানার সমস্ত আয়োজনই পূর্ণ হয়েছিল। ঘটনাটি এই :—একটি ছাত্র ডিপন কলেজ থেকে বি- এল পাশ করে। কলেজের উপস্থিতি খাতায় তাকে উপস্থিত দেখান হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে উপস্থিত ছিল না। বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান হল এবং সিণ্ডিকেটের একটি একটি সিদ্ধান্তক্রমে এক বছরের জন্য কলেজের আইন বিভাগের অনুমোদন বাতিল করে দেওয়া হল। কলেজের পক্ষে এটা একটা নিদারুণ দুর্ঘটনা। সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্তকে যদি কার্যকর করা হয়, তাহলে আর্থিক দিক থেকে কলেজের সর্বনাশ হবে। কারণ, সেই দিনে স্বতন্ত্র কলেজগুলির কলা বিভাগ সমূহ আইন বিভাগের উদ্বৃত্ত তহবিল থেকে মোটা রকমের সাহায্য পেত। সুতরাং পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ল। তখন আমার মনের অবস্থা যা হয়েছিল, তা হল এই যে ইংল্যাণ্ডে ভাল কাজ করার যে আনন্দে মনটা ভরপুর হয়ে ছিল, তা উবে গেল। আমার বন্ধুরা পাল্টা দিয়ে আমাকে পার্টি দিতে ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে ব্যস্ত। আমার কিন্তু মনে সে সময় একমাত্র চিন্তা "আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে কি করে কলেজকে বাঁচান যায়" নিজের বুক দিয়ে কলেজটাকে হাতে গড়েছি; প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই কলেজ উচ্চমানের দক্ষতা ও সাফল্য অর্জন করেছে। কলেজটিকে নিয়ে আমি এমন এক প্রচণ্ডতম বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়লাম। (ক্রমশঃ)

জনতাদল কোন পথে

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জনতাদলে ঐক্য সুদূর পরাহত, যদিও আপোসের চেষ্টা চলছে এবং চলবে শেষ পর্য্যন্ত। চরণ সিংয়ের শিবির কখনও উৎফুল্ল কখন বা বিষাদে, হতাশায় ও প্রাপ্তীত বস্তুর অভাবে ম্রিয়মান। মোরারজী ভাই অটল, অনড় ও একগুঁয়েমিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—সে দাবী কান্তি ভাইয়ের বিরুদ্ধে চরণ যে অভিযোগের কথা প্রকাশ করেছে তা তাঁকে প্রত্যাহার করে নিতেই হবে, নচেৎ কোন আপস সম্ভব নয়—চরণ সিংকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্বে ফিরিয়ে আনায় মোরারজী কিছুতেই রাজি নয়। এদিকে চরণ কোনমতেই উক্ত অভিযোগগুলি প্রত্যাহারে সম্মত নয়, ফলে দল ধীরে ধীরে তাদের পথে আগুয়ান—যা কারো কাছে বাঞ্ছিত নয় এবং কাম্যও নয়। তাই রবিরায় অ্যাচ্যুতন ও কর্পূরী ঠাকুর অস্থির ভাবে নানা পন্থায় ও নানাজনের সাহায্য ও সহযোগিতায় আপোসের মাধ্যমে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কঠিন পরিশ্রম করে চলেছেন এবং সম্ভাব্য সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু প্রার্থীত ফল লাভ হতে হতে আবার তা বানচাল হয়ে যাচ্ছে। মোরারজীর কঠিন ও একগুঁয়ে মনোভাব বারে বারে আপোসের সব আশাকে ব্যর্থ করে জনতার গভীর নৈরাশ্য ও হতাশা আমদানি করছে—যা আজ সমগ্র ভারত বাসীর কাছে অসহ্য বিরাগের কারণ হচ্ছে। জনতা কোন কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় বসার অধিকার ভারতবাসীর কাছে পেয়েছিল তা বোধ হয় এখন একেবারেই ভুলে গেছে আর তাই এই বৃথা কলহ, আত্মম্ভরিতা ও অযথা কালক্ষেপ—যা মোটেই জনকল্যাণকর নয় বরং ক্ষতিকর। মোরারজী ভাই প্রধান মন্ত্রী হয়েই বেশ বড় গলায় ঘোষণা করেছিলেন যে, আগামী দশ বছরের মধ্যেই তিনি ভারতের বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ ইতি টানবেন অর্থাৎ আগামী দশ বছর পরে ভারতে কেহই বেকার অবস্থায় জীবন যাপনে বাধ্য হবে না। তাই আমাদের প্রশ্ন—বিগত ১৭ (সতের) মাসে কতজন বেকার কাজ পেয়েছে—মোরারজী ভাইয়ের উক্ত প্রতিশ্রুতি মত ও তাঁর পরিকল্পনা মারফৎ তাহা জনগণকে কেন্দ্রীয় সরকার আকাশ বাণীর মাধ্যমে জানাবেন কি? আমরা জানি একটিও নয়, কারণ বল রাখিতেই জনতা সরকারের প্রাপ্তীত পরিচ্ছেদ। জনগণের কথা তাঁরা চিন্তা করবেন কখন আর তাদের উৎকণ্ঠা লাঘবের চেষ্টাই বা করবেন কখন? দিবারাত্র 'আপোস আপোস খেলায় মন্ত্রী ও এম্‌পিরা জনতাদল বাঁচাতে প্রমত্ত। মোরারজী ভাইয়ের একাদশ বনাম চরণ সিংয়ের একাদশের 'আপোস' খেলা শুরু হয়েছে প্রায় গত দুইমাস যাবৎ। মোরারজীর দলে—চন্দ্রভান্ গুপ্ত, ডঃ প্রতাপ চন্দ্র, আডবাণী, প্রফুল্ল সেন, কৃষ্ণকান্ত, চন্দ্রশেখর, মৈমনসিংহ নথমল, মধুদণ্ডবতে, ডঃ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী, মোহন ধরিয়া, নানাজী দেশমুখ, জর্জ ফার্নান্ডেজ—এই এগার জন এবং রিজার্ভে আছেন বিজু পট্টনায়ক, এল, কে, আদ্বানি অটল বিহারী বাজপেয়ী ইত্যাদি আর চরণ সিংয়ের দলে রাজনারায়ণ, রবিরায়, গায়নন্দন মিশ্র, কর্পূরী ঠাকুর, দেবীলাল, রামনরেশ যাদব, সুশীল ধাড়া, চারিজন রাষ্ট্রমন্ত্রী যাঁরা বিদ্রোহ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্বে স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিয়েছেন—এই এগারজন রিজার্ভে আছেন তামাম্ ভারতের তাঁত সম্প্রদায় দুঃস্থ স্বচ্ছল কৃষকগণ। "আপস" খেলায় রেফারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবনরাম, কারণ তিনি সচরাচর এ ব্যাপারে একবারও মুখ খোলেন নি এবং প্রকৃতই নিরপেক্ষ, তবে মনে মনে আশা করে বসে আছেন যে মোরারজী ভাই প্রধান মন্ত্রীর চাহারদেওয়ালি, তিনি সরাসরি প্রধান-

মন্ত্রী হিসাবে বসে পড়লেন যদিও তিনি জানেন যে অটল বিহারী বাজপেয়ী সে সময়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবেন। জনতাদলের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার কার্য্য কলাপ থেকেই সাধারণে বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে আর এই কারণেই এত গোলযোগ ও পরস্পরের উপরে দুর্নীতির এত মারাত্মক ধরণের সব অভিযোগ। জনতার মৃত্যু কি তবে আসন্ন? তত্ত্বার যে তত্ত্বতাবে জনতা তার এই বিবাদ ও বিদ্বেষকে বিমাংসার পথে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হচ্ছে তার আর সীমা পরিসীমা নেই। এর আসল কারণ একটাই এবং তা হচ্ছে জনতা নেতৃত্বে দেশ প্রেমিকের স্থলে কতকগুলি জনতাদোহীর ভিড়। যদি দেশপ্রেম এঁদের মধ্যে জাগরূক থাকতো, তবে তবে এই বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে দেশ গঠনের কাজে জনতাদল জোর কদমে এগিয়ে যেতো। হায়! এঁরা জনতাদলভুক্ত হয়ে কেবল নিজেদের মধ্যে আত্মকলহে কালহরণ করতেই ব্যতিব্যস্ত। দেশের মঙ্গলের চিন্তা এঁদের ধারে কাছে আসতে ভয় পায়, এমনি আজ পরিস্থিতি এঁরাই সৃষ্টি করেছেন। হায়! দুর্ভাগা সমগ্র দেশবাসীর, তারা বুঝতেও পারেনি এঁদের মুখের কথায় আর মনের কথায় কত পার্থক্য। এঁরা আজ ভারতবর্ষকে ভোবাতে বসেছে, তবু এখনও হুঁস নেই। কি পথে যে দেশকে এঁরা আজ আত্মস্বার্থে ও দলস্বার্থে নিমজ্জিত করছে—তা কি এঁরা জানেন না—না জেনে শুনেই ও দেশের বিরুদ্ধে তাঁদের এই হীন ষড়যন্ত্র রাজনৈতিক চক্রান্ত যার কোনও ক্ষমা নেই। কি মর্মান্তিক দুরবস্থায় এঁরা আজ দেশকে এনে ফেলেছে। দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেল অথচ এঁরা দুর্নীতিমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আরোহন করেছিলেন। সে প্রতিশ্রুতি কি ধূলায় অবলুণ্ঠিত নয়? অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতার প্রতিশ্রুতি কি আজ সুদূরে মিলিয়ে গেল? বেকারত্ব দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি কি আজ মোরারজীভাই ভুলে গেলেন—না কংগ্রেসীয়ের আসন্ন বিপদের চিন্তায় তিনি এতই বিভোর যে সে সব প্রতিশ্রুতির কথা তাঁর আর এখন মনেই নেই। বর্ণগত বৈষম্য, শ্রেণীগত বৈষম্য, প্রাদেশিকতার কারণে বৈষম্য ও সর্বপ্রকার বৈষম্যের অবসানের যে প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিয়েছিলেন তার কি সলিল সমাধি এত শীঘ্রই মোরারজী সরকার নিশ্চিন্ত মনে করে ফেললেন? বণিক, বণিক ও এক চেটিয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সঙ্কল্প কি শুধু নির্বাচনী ইস্তাহারেই সীমাবদ্ধ রহিল—তার বাস্তব প্রয়োগ ও রূপায়ণের এক কুফল থেকে উদ্ধার করা কি সরকারের পক্ষে আদৌ সম্ভব আলো সামান্য আঁচড়ও কাটবে না? দেশে যে অরাজকতা বহু দিন ধরেই বিদ্যমান ছিল—তা দূরীকরণের কি কোনও ব্যবস্থা সরকার আজো কোরে উঠতে পারলেন না? এক কথায় জনতা সরকার সর্বক্ষেত্রেই ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন বলে দেখা যাচ্ছে।

(চলবে)

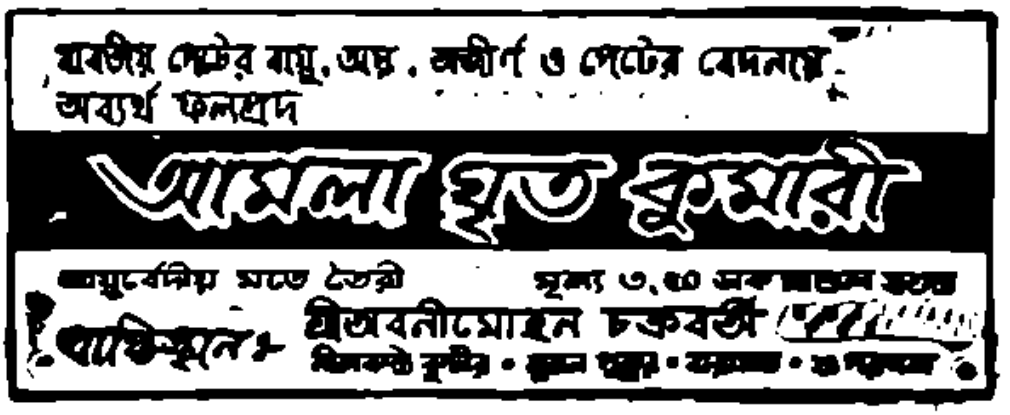

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Dist—BANKURA		
Roy Smt. Pusparani w/o Late Kalipada Roy	Vill Mangolda, P. O. Arra	100	29. 4. 78
	Di—BIRBHUM		
Dutta Smt. Mahamaya w/o Late Dwijapada Dutta	P. O. & Vill Ahmedpur	200	26. 2. 78
Devi (Chatterjee) Smt. Kamala w/o Late Jagodish Chatterjee	Namopara, P. O. Purulia	100	24. 2. 78
	Dist—HOOGHLY		
Basu Baman Chandra	Vill Khalisani, Bowbazar P. O. Chandernagore	200	1. 10. 75
Chakraborty Gnan Ranjan	Bansberia Govt. Colony (Correction of name only)	200	31. 3. 74
Koley Baidyanath	P. O. & Vill Pursurah	200	1. 10. 76
Roy Smt. Rani w/o Late Kalipada Roy	Barasat G. T. Road P. O Chandernagore Ex-Andaman polit ical prisoner	100	22. 2. 78
	Dist—MIDNAPORE		
Mondal Basudeb	Vill Khejurberia, P. O. Nandakumar Amendment for pension with effect	200	15. 8. 72
Manna Smt. Tilottama w/o Late Gangaram Manna	P. O. & Vill Iswarpur	150	15. 8. 72
Pal Satish Chandra	Vill Purba Majigan, P O. Amarshi	200	
	Dist—MURSHIDABAD		
Roy Smt. Purnima w/o Late Rabindra Narayan Roy	Vill Srimantapur P.O. Lalgola	150	13. 5. 78
	Dist—JALPAIGURI		
Bhattacharji Upendra	Ghumti No. 4, P.O. Jalpaiguri	100	1. 10. 76
	Dist—COOCH-BEHAR		
Ghosh Khagendra Nath	P. O. & Vill Changrabandha	200	1. 10. 76

Rgd.No. R. N .24511/71 Biplebi Bangla Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা মূল্য—৩০ পয়সা

20 SEP 1978

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী, শ্রীবারীণ রায়।
সম্পাদক—শ্রীশান্তি পরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতালা—শ্রীমধুগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীমনীন্দ্র ভদ্র।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
—— . —প্রিন্টিং করপোরেশন, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

শারদীয়া সংখ্যা

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

অষ্টম বর্ষ	শনিবার, ২০শে আশ্বিন, ১৩৮৫ ৭ই অক্টোবর, ১৯৭৮	৩,৪ সংখ্যা

CENTRAL LIBRARY CALCUTTA

এই সংখ্যায়

দুর্গোৎসব জাতীয় উৎসব

এখনও দেশ বাঁচে — ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস — শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস

বিপ্লবী জীবন — পি. মিত্র

পঞ্চাশ বছর পূর্বে — শ্রীত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী

ছাত্র সমাজ—আদর্শ রূপায়ণ — শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়

জনতাদল কোন পথে — শ্রীঘনশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চাই — শ্রীবীরেন্দ্র নাথ ভৌমিক

ইতিহাসের পাতা থেকে — রক্তা দাস

কবি অবতার — শ্রীসতীভূষণ সেন

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস — শ্রীক্ষীরোদ দত্ত

নির্বুদ্ধিতা—না—হৃদয়হীনতা — শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

গ্রন্থ সমালোচনা — শ্রীসুভাষ সিংহ

পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল্য নাই।

—বঙ্কিমচন্দ্র

দুর্গোৎসব—জাতীয় উৎসব

বাঙালীর দুর্গোৎসব কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, একটি জাতীয় উৎসব। সমাজের সকল স্তরের লোকদেরই উদ্দিপনা ও আনন্দদায়ক। সাড়া পড়ে যায় শ্রমিক, কর্মচারী, ছাত্র, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক প্রভৃতি সকলের মধ্যে। শ্রমিক ও কর্মচারীরা বোনাসের দাবী তুলে উৎসবের আগমনী বার্তা এনে দেয়। ব্যবসায়ীরা দোকান পাট নতুন সাজে সাজিয়ে যুবক যুবতীদের মনে নতুন পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত করার আগ্রহ তুলে উঠায়ে দেয়। পত্র পত্রিকা পূজা সংখ্যা প্রকাশের উপকরণ সংগ্রহে তৎপর হয়, বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজেদের দ্রব্য সম্ভারের উৎকর্ষতা প্রমাণের সুযোগ গ্রহণ করে। সাহিত্যিক ও শিল্পীদের তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টি ও শিল্প সাধনায় মনুন করে উৎসাহ দান করে। ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাইরেও ইংলণ্ড, আমেরিকায় যেখানে বাঙালী আছে দুর্গোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। কলিকাতার অবাঙালীরাও দুর্গাপূজা ও দুর্গোৎসব মহাসমারোহে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করে। বেহুয়া বাজার ফলপট্টিতে হিন্দু-মুসলমান মিলিত হয়ে দুর্গোৎসবের আয়োজন করে, বেন্টিং ষ্ট্রীট এলাকার চীন দেশীয়রাও দুর্গোৎসব উদ্‌যাপন করে।

দুর্গোৎসবের এই সার্বজনীন রূপ যেমনি নিমের নয়। এর প্রভাব পূজামণ্ডপে বিশেষভাবে পড়েছে। নানান রঙিন কাপড় বাঁশের ফ্রেমে আটকে যে কোন স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণে অপূর্ব মণ্ডপ তৈরী করে ফরামিরা। যেমন সাজ সজ্জা, তেমন রুচি। প্রতি বৎসরই নতুন এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইতিহাস ভেতনা; কখনো প্রাচীন বাংলার মন্দিরের আদল, মহীশূরী ধাঁচ, কখনো উড়িষ্যার স্থাপত্য। সামান্য সময়ে সাধারণ উপকরণে অল্প কয়েক দিনের জন্য পূজার সময় কলিকাতা শিল্পকলার নন্দন-কানন হয়ে উঠে। প্রতিমা নির্মাণে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যধারাও থাকে। চক্ষুচিত্রের মধ্যে দুর্গাদেবীর সপরিবার সনাতনী উপস্থিতি এবং ধ্যান মন্ত্রের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে প্রতিমায় অপরূপ সৌন্দর্য্য ও ভক্তির সূচনা হয়। কিন্তু বারোয়ারী পূজার ব্যাপক সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রতিমা নির্মাণ সনাতন রীতি থেকে কতকটা বিচ্যুতি হয়েছে। দুই তিন বৎসর আগে বিস্কুট, কাঠ কয়লা ঝিনুক, নারকেলের খোসা, বেত, তাল ইত্যাদি অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষ দিয়ে প্রতিমা তৈরী করার একটা ঝোঁক এসেছিল, ইহা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি হয়েছিল। দুঃখের বিষয় গত বৎসর হতে এই ঝোঁকটা কমে গিয়েছে। আমোদ-প্রমোদ প্রসঙ্গে এখনকার পূজার আমোদ প্রমোদ পুরান কলিকাতার আমোদের তুলনায় অনেক সংযত। আগে ধনীদের বাড়িতে পূজার সময় মদের ফোয়ারা বইত আর বাইজি নাচ চলত, এতে ইংরেজ বণিকরাও যোগ দিত। আজকাল পূজা মণ্ডপে এ ধরণের বেলেল্লাপনা কেহ ভাবতেই পারে না। সামান্য সামান্য হালকাবাজি হলেও তেমন আপত্তিকর কিছু কদাচিৎ ঘটে। আমোদ প্রমোদে আরও শালীনতা আসা দরকার এবং যৌবন উচ্ছাস আরও সংযত হওয়া প্রয়োজন ঠিকই, কিন্তু যাঁরা সেল সেল বলে চেঁচান এবং অতীতের দোহাই দিয়ে গর্ব অনুভব করেন। তাঁরা জানেন না এখনকার পূজা আগেকার তুলনায় কত নির্দোষ ও সুশোভন।

দুর্গোৎসবের এই রূপ হঠাৎ একদিনে ঘটেনি। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূজার রূপ ও পদ্ধতি বদলাচ্ছে। অতীত যুগে যা তাকালেও এই শতাব্দির তৃতীয় চতুর্থ দশকে দৃষ্টি মিলে দেখাযায় জমিদার ভিত্তিক সমাজ ভেঙ্গে পড়ার মুখে গ্রামের পূজা বারোয়ারী আকারধারণ করে। গ্রামে সকলে মিলেমিশে পূজা সুরু হয়, তখনও পূজা সার্বজনীন রূপ নেয় নাই। গ্রামের মৃৎ শিল্পী কুমার ধ্যান-মন্ত্রের সঙ্গে মিল খাইয়ে প্রতিমা গড়তেন ঠাকুর দালানে (পূজার জন্য নির্দিষ্ট ঘর বা দালান), গ্রাম্য শিল্পী ফুলমালী সোনার উপর নানা রকম ফুল লতার কাজ দ্বারা মণ্ডপ সজ্জা করতেন। তখন পরিবারের কর্তারা বাড়ীতেই থাকতেন কিন্তু ছেলেরা লেখাপড়া ও জীবিকা অর্জনের জন্য কলিকাতা বা নিজেদের জেলা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে কেহ কেহ উদ্যোগী হয়ে থিয়েটার করার জন্য গ্রামের ছেলেদের মধ্যে পার্ট বিতরণ করতেন। পূজার সময় সকলে মিলেমিশে থিয়েটার হত। গ্রামের সকলকেই পূজার প্রসাদ বিতরণ করা হত, একত্র খাওয়া দাওয়ারও ব্যবস্থা ছিল। ইহাই ছিল সেই সময়কার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা। পরবর্তীকালে জমিজমার উপস্বত্ব হতে জীবিকা চালান অসম্ভব হয়ে পড়ায় ও বাড়ির ছেলেরা শহরে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হওয়ায় শহরেই আবাসস্থান গড়ে উঠল, মাঝে মাঝে গ্রামে যেতে হত জমিজমার সামান্য উপস্বত্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এই পটভূমিকায় গ্রামের পূজা বন্ধ হতে লাগল। শহরেই পূজার ব্যবস্থা হতে লাগল। পূজার রূপ নিল সার্বজনীন। হিন্দুরা জাতিভেদ নির্বিশেষে সকলেই পূজায় অংশ গ্রহণ করত। পূজার আমোদ-প্রমোদে যোগদান করত।

সামন্ততন্ত্র বিলোপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেল। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে গড়ে উঠছে নতুন সমাজ ব্যবস্থা। সমাজের প্রাচীন শ্রেণী বিন্যাস ভেঙ্গে উদয় হয়েছে নতুন শ্রেণী বিন্যাস—মালিক ও শ্রমিক। যারা শ্রম করে তারা সকলেই শ্রমিক বলে দাবী করছে, শ্রমিকদের মধ্যে বেশী বেতন কম বেতনের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এক পঙক্তিতে দাড়িয়ে লড়াই করছে মালিকের সঙ্গে। মালিক ও কর্মচারী ও শ্রমিকের সঙ্গে আপোষ ছাড়া গত্যন্তর নাই বুঝে সমঝোতার পথেই চলতে বাধ্য। এই সামাজিক পরিবেশেই বর্তমানে দুর্গোৎসব রূপ নিয়েছে। কাজেই বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা সমাজ জীবনের চলার ভঙ্গিরই রূপ ও রাগের ছবি। আমাদের চাই বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা ধর্মীয় গোড়ামির গণ্ডি ছেড়ে সামাজিক কৃষ্টি ও শিল্পের উৎস হউক এবং যুবকদের নির্মল আনন্দের মধ্য দিয়ে সমাজ সেবায় ব্রতী করার উৎসাহ দান করুক।

জনতা স্থবির হয়ে বসে থাকে না ; এগিয়ে চলবেই। দুর্গোৎসবের মধ্যেও এর প্রকাশ দেখা যায়। বর্তমান অবক্ষয় যুগে সম্ভিক্ষু সমাজ ব্যবস্থা রূপবে ভাবীকালের যুব সমাজ, তাঁদের এখনও চেনা যায় না, জানা যায় নাই। কিন্তু আজ মায়ের চরণ স্পর্শ করে প্রার্থনা করতে হবে। ভাবী কালের সুস্থ, সুখী ও শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি দান কর মা। এইটুকু করতে পারলেই মায়ের পূজা সার্থক হবে। দুর্গোৎসব পুরাপুরি জাতীয় উৎসব রূপ পরিগ্রহণ করবে। বাঙ্গালী বিশ্বে সবার এগিয়ে যাবে। হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকল ভারতবাসীর মিলনক্ষেত্র হবে বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব।

এখনও দেশ বাঁচে

ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

ভারত চন্দ্র রায় গুনাকরের "অন্নদার ভবনে গমন" সম্পর্কীয় কয়েকটি কথা মনে পড়ে। ঈশ্বরী পাটনি ছদ্মবেশী অন্নদাকে গঙ্গা পার করে দিলে দেবী পাটনিকে বর যাচিঞা করতে বলেন। পাটনি বললে "আমার সন্তানে যেন মাকে ছুঁয়ে আছে"।

যে বয়সে এই বৃত্তান্ত পড়েছিলাম সেটা অপরিণত কাল। তাই মনে হত লোভী বর কেন সে চেয়েছিল? এখন বুঝতে পারি এর গুরুত্ব কতখানি।

কৈশর পার হয়ে যৌবনে পদার্পণকালে বিপ্লবী সমিতিতে ছুটি। সেখানে সর্বাঙ্গীন উন্নতির শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তার সঙ্গে দেশ-প্রেম উদ্দীপ্ত করার অশেষ চেষ্টা চলত। সকল সভ্য সমবেত হয়ে যে গানগুলি গাওয়া হত তার মধ্যে ছিল একটি গানের অংশ—"এই অন্নপূর্ণ ভারতভূমে অন্নের কাঙ্গাল হয়েছি মা।"

কে অন্নের কাঙ্গাল করেছে?—ব্রিটিশ সরকার। তারপর ঐ সরকারকে ঠেলে ফেলে দেবার যে মহাসাধনা আরম্ভ হয় তাতে একটা সোপান ছিল সত্যিকার আত্মাহুতি। কেন? মুষ্টিমেয় অনতারণ বিশাল মানবকে জাগিয়ে তোলবার জন্য। নিদ্রিত দেশবাসী যেন জেগে উঠে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার করে। অর্থাৎ অসন্তোষ যেন ব্যাপকভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তার ফলে হবে স্বাধীনতা প্রাপ্তি।

কি সে আত্মদানের জন্য কাড়াকাড়ি—হুড়োহুড়ি। চরম ত্যাগের উদ্দেশ্য ছিল, দেশবাসীর তন্দ্রা যেন ছোটে। তারা পরস্পরকে বলাবলি করবে—কি হল, কি হল? যৌবনের স্বপ্ন হচ্ছে যশে, খ্যাতিতে, আনন্দে বিশ্বে বৈভব অর্জন ও ভোগ করার। কিন্তু এ যে দেখছি উল্টোরথ। এরা কারা। সর্বত্যাগী সোনা অন্নেষণের দল।

বিপ্লবীদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফলশ্রুতি দেশ অনেক খানি পেয়েছিল। অসন্তোষ বোধ বেড়েছিল। তারপর এল গান্ধী আন্দোলনের বন্যাগুলি। পূর্বের অসন্তোষ চালিত রথের গতিবেগ আরও অনেক বাড়ল।

তবু হিসাব করে দেখলে আন্দাজ পাওয়া যাবে। গান্ধীজী চালিয়েছিলেন তিনটে আন্দোলন ১৯২১ সালে অহিংস অসহযোগ। ১৯৩০ সালে পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলন (যদিও এটাকে বলা হয় লবণ আইন ভঙ্গের আন্দোলন) এবং ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। ১৯৩২ সালের আপত্তি এবং ১৯৪০ সালে ব্যক্তিগত আইনভঙ্গ আন্দোলন এরই মধ্যে মিলিয়ে যায়।

ইংরেজদের রক্ষিত নথিপত্র থেকে প্রকাশ পায় প্রত্যেক আন্দোলনে সারা ভারতে ষাট হাজার করে লোক জেলে বাস করেছে। তাহলে সর্বসাকুল্যে ৩×৬০ এক লাখ আশী হাজার জন জেলে গমন করে। ধরা যাক এদের প্রত্যেকের জন্য ব্রিটিশ বিরোধী হয় কুড়িজন করে। সেই হিসাবে ছত্রিশ লাখ লোক বৃটিশ বিরোধী বা অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তখন দেশের জন সংখ্যা ছিল চল্লিশকোটি, সে অনুপাতে বেশী লোক অসন্তুষ্ট হয় নাই। এদেশ থেকে ইংরেজ তখন তার প্রয়োজনমত লোকবল, অর্থ ও সরঞ্জাম সবই পেয়েছিল।

স্বাধীনতার পর মহাঘাটকের পট পরিবর্তন। স্বাধীনতার যুদ্ধকালে প্রতিটি সভায় সহরে, গ্রামে বলা হত "যদি আপনাদের সহায়তায় সরকারী শক্তি আমাদের হাতে আসে তাহলে কংগ্রেস-দরিদ্র কৃষক, মজুর প্রভৃতির সবচেয়ে বেশী কল্যাণকর কাজ করবে।" কিন্তু কে কার কল্যাণ করল?

আজ তেইশদিন স্বাধীনতা ভোগ করে দেশে কয় লোক আছে যারা অভিষ্ঠ হয়ে ওঠে নাই। অসন্তোষের বহ্নি সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। এই বিক্ষি বিক্ষি জ্বালা আজ

একদিন প্রচণ্ড অগ্নীপ্রলয়ের মত বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে ছেয়ে ফেলবে। সে হবে অশুভ পরিসমাপ্তি। পেটের ভাত, পরার কাপড়ের মূল্য যারা আকাশ স্পর্শী করে তুলেছে তারা হবে ঐ অগ্ন্যুদ্গমের ভস্ম দাহী। ত্যাগীরা ভোগী হয়েছে। আর কি রক্ষা আছে, ইংরেজ গেল ১৫-১৭ টাকা মন চালের দাম রেখে। আজ চাল একশ টাকা মণ। তবুও পরিত্রাণের পথ তার ইঙ্গিত দিচ্ছে টানে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক ২০০ টাকা অথবা চীনা টাকার সর্ব্বনিম্ন আয় ৬০ টাকা। সেখানে খাওয়া পরার জিনিষগুলির দাম কমিয়ে রাখা হচ্ছে। রাষ্ট্র এগুলি সরবরাহের মালিক।

সেইদিকের দৃষ্টান্ত থেকে এদেশে যদি প্রাণাচ্ছাদনের ব্যবস্থা সকলের আয়ত্তের মধ্যে রাখা যায় তাহলেই দেশ বাঁচতে পারে। আমাদের কর্তৃপক্ষ বলবেন লোকের আয় বেড়েছে এবং বেড়ে চলবে। অতএব তাদের মূল্য-বৃদ্ধির জন্য আপত্তি করার কারণ থাকতে পারে না। টাকা এখন সহর থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে।

ঠিক কথা কিন্তু ব্যাপারটা যে উল্টো হয়ে দাড়াচ্ছে। ভাত-কাপড়ের দামবৃদ্ধির চাপে বৃদ্ধি পাওয়া আয় কোথায় উড়ে যাচ্ছে। সুতরাং দারিদ্রের চাপ যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে। এর একমাত্র উপায় হচ্ছে জোয়ারের মত মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ করা। সরকার থেকে একটা ভারা বাঁধ বেঁধে সেই ধারে আহার্য্য ও পরিধেয় বিক্রীর ব্যবস্থা করা। সরকারকেই এই ব্যবস্থাগুলি হাতে নিতে হবে।

শোনা যায় তিন কোটি টন চাল বাজারে বিক্রীর জন্য আসে। মণপ্রতি যদি ২ টাকা লাভ দেওয়া যায় এবং সরকার বিক্রী করে, তাহলে ছয় কোটি টাকা সরকারের আয় হয়। এই ভাবে যদি কাপড় বিক্রী করা যায় তাহলে বছরে চার হাজার কোটি গজ কাপড় বিক্রী করে সরকার প্রচুর লাভবান হতে পারে। সুতরাং ভাত ও কাপড় সাধারণে সুলভ মূল্যে পেতে পারে।

সরকারকে আসলে পুঁজিপতি ও বড় মহাজনদের কাছে নিজেদের বন্ধক থেকে মুক্ত করতে হবে। সরকার এই মোক্ষলাভ করবেন এ আশা কি করা যায়? কেন হবে না? দৃঢ় দৃষ্টিতে রাজকার্য্য চালাতে হবে। তবেই দেশের অসন্তোষের আগুন নিভতে পারে। দেশ বাঁচতে পারে।

অতএব প্রথম ও প্রধান কথা হচ্ছে জন সাধারণের সত্যিকার প্রতিনিধিদের হাতে শাসনভার আনতে হবে সরকারি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে মহাজন খাদ্য ও পরিধেয় জিনিসগুলি আটকে দেশের আপামর জনসাধারণকে যেন আর বধ করতে না পারে।

(বিপ্লবী বাঙ্গালী হইতে উদ্ধৃত)

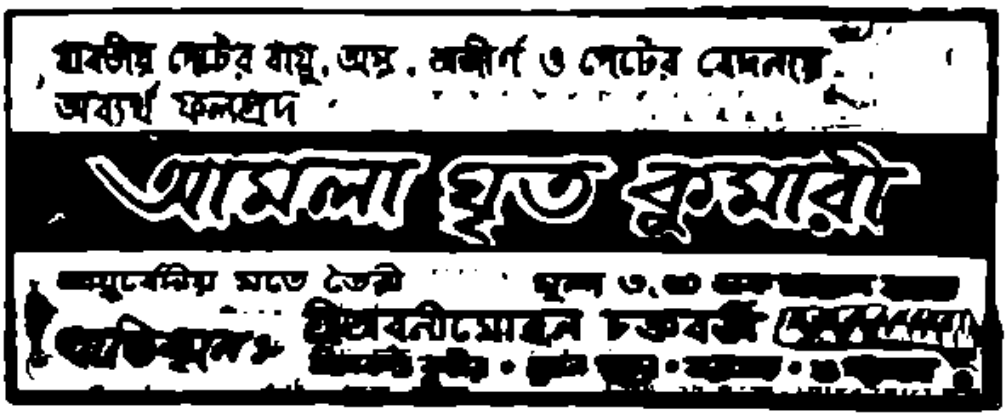

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস

ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস।

[বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথ ও অনুশীলন সমিতি বিপ্লবী নেতা হরিকুমার চক্রবর্তী ও অতুল কৃষ্ণ ঘোষের বিবৃতি এবং নলিনী কিশোর গুহের বাংলার বিপ্লববাদ পুস্তক অবলম্বনে লিখিত]

চিংড়িপোতা ডাকাতির (১৯০৬, ডিসেম্বর) পর হরিকুমার চক্রবর্তী ও যতেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য (এম. এম. রায়) কলিকাতা অনুশীলন কেন্দ্রে অবস্থান করতে ছিলেন, সেই সময় যতীন্দ্রনাথ অনুশীলন সমিতির পশ্চিম বঙ্গের সর্বাধিনায়ক সতীশ চন্দ্র বসুর সঙ্গে আলাপ করতে আসেন। সতীশবাবু হরিবাবু ও নরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে যতীন্দ্র নাথের পরিচয় করিয়ে দেন। যতীন্দ্র নাথ সম্বন্ধে সতীশবাবু বলেন উনি একজন বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্মী। হরিকুমার বাবুরা এই পরিচয়ে বিস্মিত হন ; কারণ যতীন্দ্র নাথকে যদিও তাঁরা ইতিপূর্বে তাঁদের গ্রামে (কোদালিয়া) দেখেছিলেন এবং আলাপে আকৃষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে সরকারী কর্মচারী বলেই জানতেন, বিপ্লবী বলে জানতেন না। যতীন্দ্রনাথ তখন ইংরেজ সরকারের সেক্রেটারী হইলার অফিসে চাকরী করতেন।

পশ্চিমবঙ্গেও অনুশীলন সমিতি নিষিদ্ধ হলে তরুণ কর্মীরা কর্মক্ষেত্রে নামবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে. সতীশবাবুর কর্মনীতি তাঁদের আকৃষ্ট করতে পারে না। তখন একজন বাস্তিব সম্পন্ন নায়কের সন্ধান করতে গিয়া যতীন্দ্র নাথের প্রতি আকৃষ্ট হন।

দশেমোদর বন্যার (১৯১৩ সাল) সময় বিপ্লবী কর্মিদের সঙ্গে যতীন্দ্র নাথের যোগাযোগের সুযোগ ঘটে এবং যতীন্দ্র নাথের নেতৃত্বে সম্মিলিত একটি দল গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যতীন্দ্র নাথের নেতৃত্বে তাঁর নিজের অনুগামীরা অতুলকৃষ্ণ ঘোষের সেবা সমিতি, মাদারিপুর পূর্ণচন্দ্র দাসের দল, বরিশাল পার্টি, বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলীর পার্টি এবং উত্তর বঙ্গ এই কয়টি দল একত্র হয়। অনুশীলনের প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী, রবীন্দ্র মোহন সেন, ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী প্রভৃতিও যতীন্দ্র নাথের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। শিয়ালদহের নিকট আর্য্যনিবাসে যতীন্দ্র নাথ মিনাইদহ হতে এসে থাকতেন। যতীন্দ্র নাথের সঙ্গে উক্ত আর্য্যনিবাসে প্রতুলবাবু, রবিবাবু ও নলিনী কিশোর গুহ বিপ্লবী কর্মপন্থা এবং অর্থ সংগ্রহের পদ্ধতি নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। অনুশীলন নেতারা বলেন সকলে মিলে এক সংস্থাভুক্ত হলে সংস্থার নির্দেশ অনুযায়ীই কর্মনীতি স্থির হবে। নানা কথার পর উক্ত আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। অতঃপর শ্রীরাম মুদী লেনে অতুল ঘোষের বাড়ীতে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়, সেদিন যতীন্দ্র নাথ অন্য সময় থেকেই চলে যেতে বাধ্য হন। অন্য এক দিন বিশদ আলোচনা হবে বলে যান। কিন্তু তিন চার দিন পরই প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী ও নলিনী কিশোর গুহ ধৃত হন। ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তীও ধৃত হন। কয়েক দিন পর অনুশীলন নেতা নরেন্দ্র মোহন সেন ঢাকা হতে কলিকাতায় এলে অনুশীলনের বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও কিতীশ চন্দ্র বানার্জি যতীন্দ্র নাথের সঙ্গে মিলে একযোগে কাজ করার প্রস্তাব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। সকল কথা শুনে নরেন সেন বলেন অনুশীলন কোন আঞ্চলিক সংস্থা নয়, সর্বভারতীয় সংস্থা। সম্পূর্ণভাবে মিলে

কাজ করতে হলে তাড়াহুড়া করলে ফল ভাল হতে পারে না। আমাদের বাংলার বাহিরে নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গেও বিশেষ পরামর্শ দরকার। অনেকগুলি দল একত্র হয়েছে ভালই ; তাঁরা সংখ্যা বৃদ্ধি করুন, তোমরাও সংগঠন বাড়াও। কার্যকালে মিলন হবেই। ইহার অল্প কয়েক দিন পরই নরেন সেন ও বীরেন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা গ্রীয়ার পার্কে ধৃত হন।

যতীন্দ্র নাথের সঙ্গে আর্যাদিবাস ও শ্রীরামমুদি লেনে মিলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত কথাবার্তা হয় কলিকাতা গোপন কেন্দ্রে অনুশীলনের সর্বভারতের নেতা রাসবিহারী বসু এলে রবি সেন ও নলিনী কিশোর গুহ বিস্তারিত বলেন। বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বলেন এই জন্য ভাববার কোন হেতু নেই এবং রবীন্দ্রনাথের গানটি উদ্ধৃত করেন—

"ঘণ্টা যখন উঠবে বেজে—
আসবে সবাই আপনি সেজে
এক সঙ্গে সব যাত্রী যত—
একই রাস্তা লবেই লবে।"

বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ রাসবিহারীর এই জলন্ত বিশ্বাস ও প্রত্যয় বাংলার সকল বিপ্লবীদল এবং সকল নেতা ও কর্মী সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

বিপ্লবী রাসবিহারীর এই প্রত্যয় ছিল বলেই ১৯১৫ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারী সারা ভারত ব্যাপি অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার পর বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্র নাথকে জানান প্রয়োজন মনে করেন এবং সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন।

১৯১৪ সালের শেষ দিকে চন্দন নগর হতে মতিলাল রায়ের পত্র নিয়ে একজন মারাঠী যুবককে অতুলবাবুর নিকট কলিকাতায় পাঠান। অতুলবাবু পত্র অনুযায়ী চন্দননগর যান। সেখানে শুনেন অনুশীলনের সারা ভারতের নেতা রাসবিহারী বসু দেখা করতে চান। এই সংবাদ যতীন্দ্র নাথকে জানান। যতীন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (এম, এন, রায়) ও অতুল ঘোষ ফেরারসে গিয়ে রাসবিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাসবিহারী অভ্যুত্থানের সম্ভাব্য অয়োজনের কথা জানোয়ে বলেন সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ হলে তাঁরা যেন সদলবলে যোগদান করেন। যতীন্দ্রনাথ বলেন ইউরোপ থেকে অস্ত্রাদি পাঠানো হবে বিপ্লবীদের জন্য, সেইগুলি পৌঁছা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার হতে পারে। রাসবিহারী বললেন সকল দিক বিবেচনা করেই তারিখটী স্থির করা হয়েছে। অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। অভ্যুত্থান সুরু হউক, আপনি সুষ্ঠুভাবে শেষ করবেন। সহানুভূতির সঙ্গে এই সমন্বয় সাধন করে দুই মহানায়ক যাঁর যাঁর কর্মপন্থায় এগিয়ে যান।

কাজেই বিপ্লব অনুষ্ঠানে বাংলার বিপ্লবীদলের মধ্যে সমন্বয়ের কোন অভাব ছিল না। পরবর্তী যুগেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর স্মরণে বিপ্লবী নেতাদের সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী যেন বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আগামী দিনেও দেশ সেবার পাথেয় হয়।

———

বিপ্লবী জীবন

পি, মিত্র

প্রতি শৈশবেই মা আমায় শিখিয়ে ছিলেন চোখ বুজে কিছুক্ষণ ধ্যান করতে। তখন ধ্যান কাকে বলে বুঝতাম না। শুধু মাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই যেন ঐরূপ চোখ বুজে কিছুক্ষণ ধ্যান করতাম। বড় হলে বাড়ীতে দারোয়ানের কাছে লাঠি খেলা শিখতে গিয়ে ছিলাম। সে প্রতিজ্ঞা করালে, "পাপ করতে পারবে না তবে লাঠি খেলা শিখাইল।"

দৈহিক বল চিরকালই আমার খুব ছিল। গ্রামের একটি ব্রাহ্মণ ছেলে একবার শবসাধনের উত্তর সাধক হবার জন্য আমার সাহায্য চাইল। আমি স্বীকৃত হলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি একটা গোলমাল হয়ে গেল। তখন সেই ব্রাহ্মণ ছেলেকে কাঁধে নিয়ে তার বাড়ীতে রেখে এলাম।

বিলাত গেলাম ব্যারিষ্টার হবার জন্য। সেখানে গিয়ে ইংরেজ জাতির স্বদেশ ভক্তি দেখে আমরা তিনজন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অপর একজন এবং আমি একত্র হয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম দেশে গিয়ে এবার আমরাও দেশ সেবা করব। পরাধীনতার দুর্ভাগ্য ভাবব, স্বাধীনতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব।

ঠিক তখনই স্পেন দেশে একটা যুদ্ধ চলছিল। তাতে লিপ্ত ছিল ফরাসী জাতি। স্বাধীনতার যুদ্ধ করতে হলে, যুদ্ধ শিখতে হবে; তাই আমি এবং সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি মিলিত হলাম প্যারীসে। অনেক বেগ সহ্য করে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম আমরা ভলেন্টিয়ার হব। ফরাসী প্রেসিডেন্ট অনুমোদন করলেন। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের একটা রিভলবার; একখানা তরোয়াল ও একটা বাইসেল যোগাড় করতে হবে। আমি আবার ইংলাণ্ডে ফিরে এলাম বইপত্র সব বিক্রী করে অস্ত্র ও পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে এবারে গেলাম ব্রিস্তে উপসাগরের তীরে। যেতে না যেতেই খবর পেলাম উভয় জাতির মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে তাই আর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যেতে হল না।

অতঃপর আবার পড়াশোনায় মনযোগ দিয়ে পরীক্ষা পাস করে দেশে ফিরলাম। আসার সময় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী আমায় বললেন "যাও, দেশে গিয়ে বল বাঁধতে থাক। আমি ফিরেই যেন দেখি মস্তবড় বল তোমার হাতে।"

আমি দেশে ফিরে দল সংগ্রহ করতে লাগলাম। হাড়ি, বাগ্দি, প্রভৃতি সকল জাতিই দলে যোগ দিল। সকলকে ড্রিল করাতে লাগলাম। দলে সহস্রাধিক লোক হয়ে গেল। এমন সময় সুরেন্দ্র নাথ ফিরলেন। আমার দল দেখে তিনি ত অবাক তখন মনে হল এখন টাকা পাই কোথায়। কয়েক জন মিলে পরামর্শ করে 'India Association' করা হল প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র আমারই স্ব-গ্রামবাসী। তাই সকলে মিলে পরামর্শ করে আমাকেই তাঁর কাছে পাঠাল তাকে 'India Associasion'এর সভ্য করার জন্য। তিনি রাজী হলেন নাম লিখলেন কিন্তু দু-তিন দিন পরেই একখানা চিঠি লিখলেন আমাকে। 'প্রথম আমি একটা মস্তবড় ভুল করেছি তখন অত খেয়াল ছিল না তোমাদের সভ্য তালিকার মধ্যে অমুকের নাম দেখলাম তার সম্বন্ধে আমার ধারণা খুবই খারাপ। যেখানে এইলোক সভ্য সেখানে আমি সভ্য থাকব না আমার নামটা কেটে দিবে।' কিছুকাল পরে আমাদের গুপ্ত উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়ে পড়ল এবং India Association-এর অবস্থাও খারাপ হল।

এদিকে আমার পিতৃদেব আমাকে এতকাল লক্ষ্য করছিলেন। তিনি দেখলেন আমি কলকাতা থাকলে পড়ার কিছুই হবে না। এই সমস্ত কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকব। তিনি তখন হিন্দু দেবতার উপর একটু বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তাই তিনি এক রকম জোর করে আমাকে মফস্বল শহরে যেতে বাধ্য করলেন। আমি বরিশালে গেলাম। কিছু-কাল সেখানে ব্যবসা করে পুনঃ কলকাতায় ফিরে এলাম তখন আমার পূর্ব্বদল ভেঙে গেছে।

বরিশাল থেকে ফিরবার মুখে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে এলাম সে দিন তিনি বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি প্রুফ দেখছিলেন। প্রুফ দেখবার পর যে লোকের হাতে উহা দিলেন তাকে বার বার সাবধান করে দিলেন, 'আমি প্রিন্ট অর্ডার দিলাম দেখো এতে যেন কোন ভুল না থাকে। কারণ এ গানটা থেকে ত্রিশ বছর পরে একটা বিরাট ব্যাপার হবে।'

কলকাতা এসে এবার হাইকোর্টে রিতিমত যাতায়াত করতে লাগলাম। আমার এক মামা শ্বশুর বেশ ধনী, থাকতেন পাইকপাড়ায়। আমি পসার বৃদ্ধির জন্য তাঁর বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাই। সেখানে প্রায়ই এক কৌপীন আঁটা সন্ন্যাসীকে দেখি। আমি গেলেই সেই মামা-শ্বশুর সেই কৌপীন ধারীর পায়ের ধুলা নিতে বলেন। মামা শ্বশুরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আমি তাঁর পায়ের ধুলা নেই।

সিন্ধুদেশবাসী এক ভদ্রলোক তাঁর বিশেষ পরিচিত তিনি কলকাতায় একখানা ইংরেজি ধরণের কাগজের মালিক। সম্প্রতি তিনি কিছুদিনের জন্য দেশে যাবেন। তাই কাগজের ভার তিনি আমার উপর দিয়ে যেতে চান। এই সম্পর্কে কথার জন্যই আমরা দুজনে সেখানে বসে আছি। ক্রমে আমাদের ভিতরে দেশ বিদেশের কথা আরম্ভ হল। ফরাসী ও জার্মানীদের মধ্যে একটা যুদ্ধ বাঁধবার সম্ভাবনা হয়ে উঠেছিল। আমরা সে সম্বন্ধে কথা বলছিলাম ইংরাজীতে। কিন্তু সাধু একবার বলে বসলেন ও লড়াই নেই হোগা। হোগা লেকিন বহুৎ দের হ্যায়।

একটা অ্যাংটা সাধু আমাদের কথার জবাব দিচ্ছে দেখে আমরা ফরাসী ভাষায় কথা বলতে শুরু করলাম। কিন্তু সাধু সে কথায়ও মাঝে মাঝে

উত্তর দিতে লাগলেন যেন তিনি ফরাসী ভাষাও বোঝেন। তখন আমরা ইটালিয়ান ভাষায় কথা বলতে লাগলাম। কিন্তু তার কথা শুনে মনে হল সে ভাষায় যেন তার দখল আছে।

সকল কথা শেষ করে যখন বাড়ী ফিরব তখন সেই সাধুটিকে দেখলাম না। মামা শ্বশুর মহাশয়ের কাছ থেকে তার ঠিকানা জেনে নিলাম। পরবর্তী রবিবার সেই ঠিকানায় গিয়ে সাধুর দেখা পেলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি সেদিন যে আমাদের সকল ভাষার কথার উত্তর দিলেন আপনি কি ঐ সব ভাষা জানেন। সাধু বললেন নেহিজী, "তবে কি করে আমাদের কথা বুঝলেন?" "তুম লোগোকা মন ভাও মালুম হুয়া।" কি করে আপনি তা বোঝেন আমাকে শিখাতে হবে। সাধু আমাকে বসতে বললেন আমি কিন্তু বসলাম না। সারাদিন দাঁড়িয়ে রইলুম। মধ্যে মধ্যে একটু পায়চারী করি আর সিগারেট ধরিয়ে টানি। গাড়ীটা ইতিপূর্বেই ফেরত পাঠিয়েছিলাম। ক্রমে রাত্রি হল আমরা উভয়েই একভাবে তিনি মাঠের সম্মুখস্থ রকে বসে আর আমি দাঁড়িয়ে ময়দানে। উভয়েরই আহার নিদ্রা নাই। ভোর হয় হয় এমন সময় দেখলাম সাধু যেন একটি জ্যোতির্ময় মণ্ডলের মধ্যে বসে আছেন। দেখেই পা জড়িয়ে ধরে বললাম আমায় দীক্ষা দিন। সাধুজি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হিন্দীতেই বললেন "তোর গুরু আমি নই। তুই বড় ভাগ্যবান পুরুষ। তোর গুরু নিজে নিজে তোর বাড়ী উপস্থিত হবেন। এই বলে তিনি আমাকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বললেন যত দিন তোর গুরু না আসে তত দিন তুই এ মন্ত্রটি জপ করিস।

পরদিন বাড়ী এলাম। এই ঘটনার কিছুকাল পরে একদিন একদল গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত তাদের মধ্যে যিনি প্রবীণ তিনি গেরুয়াধারী ছিলেন না সাদা কাপড় পরা। তিনি আমাকে বললেন তোমার সাথে আমার দুটি কথা আছে। আমি একটু তীক্ষ্ণস্বরে বললাম আমি হাইকোর্টে যাব দেরী করতে পারব না টাকা পয়সা চাইলে এই পাঁচটি টাকা নিন। তিনি বললেন অর্থের আশায় আমি আসিনি তোমাকে কটি কথা আমি জিজ্ঞাসা করব। এই বলেই তিনি বললেন, "তুমি কে তা তুমি জানতে চাও? না আমি কে তা তুমি জানতে চাও? আমি বললাম আপনি কে তা আমার জানবার দরকার নেই আমি কে তাও আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই না তা যদি এত কালেও না বুঝে থাকী আর আমার বুঝবার দরকার নেই। তবে ভারতের প্রকৃত সম্পদ সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন তা যদি বলেন আমি শুনতে পারি।

তখন তিনি তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর ভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব যেভাবে আরম্ভ করতে হয় সেভাবে বলতে লাগলেন। আমি কোর্টে যাওয়া ভুলে গেলাম বেলা যখন একটা বাজে স্বামিজী বললেন আজ থাক কাল আবার আসব। সঙ্গের লোকজন ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে। আমি ভেতরে গিয়ে সবার খাবার ব্যবস্থা করে দিলাম। আবার আসরা বসলাম তত্ত্ব কথা চলতে লাগল। সবাই আমরা এক সঙ্গে নিরামীষ আহার করলাম। আহারান্তে আবার বসলাম। রাত্রি দুইটায় আমাদের আসর ভাঙল। আমি বললাম আমাকে দীক্ষা দিন। পরদিন আমি ও আমার স্ত্রী দীক্ষিত হলাম ব্রহ্ম মন্ত্রে। এই স্বামীজী জগৎপুর আশ্রমের পূর্ণানন্দ স্বামী।

পঞ্চাশ বছর পূর্বে

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তি

১৯০৫ সনে, এক শুভ মুহূর্ত্তে, স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম হয়, সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব দলেরও জন্ম হয়, তখন আমাদের বয়স ১৪ হইতে ২০। ২২ বৎসরের মধ্যে ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের মোহিনী শক্তিতে যুবকদের মন মোহিত হইয়াছিল, "আমার দেশকে স্বাধীন করিব। বিদেশীর অধীনতা পাশে আবদ্ধ থাকিব না," এই দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া যুবকের দল ছুটিয়াছিল এক বিপদ সঙ্কুল পথে। তাহাদের মাথার উপর দিয়া কত ঝড় বহিয়া গিয়াছে ভ্রুক্ষেপ নাই, কত দিন অনাহারে বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছে—যাহা নাই মাতা পিতার স্নেহ মায়া, স্ত্রীর বন্ধন তাহা করিতে পারে নাই তাহাদের গতি, তাহারা হাসিতে হাসিতে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়াছে, কারাগারে দ্বীপান্তরে কত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, ফাঁসির রজ্জু, বেত্রাঘাত তাহাদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। তখন সম্মুখে প্রলোভনের কোন জিনিস ছিল না মন্ত্রীত্বের গদী, এম, এল, এ'র চাকুরী ছিল তাহাদের কল্পনার বাহিরে, অবশ্যই প্রলোভন যে না ছিল তাহা নহে দেশদ্রোহীতার পুরস্কার স্বরূপ বিদেশী গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মোটা টাকা, বড় চাকুরী, সরকারী খেতাব এর প্রলোভন ছিল কিন্তু স্বদেশ প্রেমের কাছে এই সব প্রলোভন তুচ্ছ মনে হইয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের বিফলতা ও প্রচণ্ড দমন নীতির ফলে দেশের জনসাধারণ ও আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে নৈরাশ্য ও ভয় দেখা দিল কিন্তু বাংলার তরুণের দল নিরাশ হয় নাই, ভয়ে ভীত হয় নাই তাহারা বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত করার চেষ্টা করিতে লাগিল তখন রাজনীতি ক্ষেত্রে ২০। ২৫ বছরের যুবকেরাই নেতৃত্ব করিয়াছে। তাহারাই বিদেশে লোক পাঠাইয়াছে, তাহারাই জার্মান গভর্ণমেণ্টের সহিত ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহারাই বিভিন্ন কেণ্টনমেণ্টে লোক পাঠাইয়া ভারতীয় সৈনিকদিগকে হাত করিয়াছে, তাহারাই তাহাদের প্রচারপত্র "স্বাধীন ভারত ও লিবার্টি কাগজ বাহির করিয়াছে, আবার তাহারাই প্রয়োজনে খুন করিয়াছে ডাকাতি করিয়াছে, পুলিশের সহিত লড়াই করিয়াছে।

বিপ্লবী নেতারা জানিতেন চরিত্রই জাতির মেরুদণ্ড। তাই তাহারা সর্বপ্রথমে চরিত্র গঠনে মনোনিবেশ করিলেন। বিপ্লব দলের সভ্যদের প্রথম প্রতিজ্ঞাই ছিল" আমার চরিত্রটি নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র রাখিব। বিপ্লব দলে চরিত্রহীনের কোন স্থান ছিল না, বিপ্লবী নেতারা জানিতেন দেশের স্বাধীনতার পর দেশ শাসনের গুরু দায়িত্বভার তাহাদের উপর পতিত হইবে, তাহাদের যদি চরিত্রহীন স্বার্থপর লোক থাকে তবে তাহারা দেশের নামে নিজ স্বার্থ

সিদ্ধি করিবে, জনগণের কোন কল্যাণে লাগিত হইবে না। জাতি দুর্বল হইয়া পড়িবে। বিপ্লবীদের অধিকাংশই বিবাহ করেন নাই, তাহারা সর্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জন করিয়াছিলেন, তাহারা সন্ন্যাস জীবনযাপন করিতেন, তাহারা ছিলেন গীতার নিষ্কাম চরিত্রের কর্মীদের মধ্যে ছিল আন্তরিকতা, আমার দেশকে স্বাধীন করিব, আমার দেশকে বড় করিব, এই চিন্তাই ছিল প্রবল ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তা তাহাদের মনে উদয় হয় নাই। তখন নেতা হওয়া লোভনীয় জিনিষ ছিল না, নেতার বিদায়ই ছিল বেশী ফাঁসি গুলির আঘাতে মৃত্যু।

বিপ্লব সফল হয় নাই বিপ্লবীরা সশস্ত্র বিপ্লবদ্বারা ভারতবর্ষ স্বাধীন করিতে পারে নাই, ভারতের স্বাধীনতা আসিয়াছে, আপোষে,—পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা আসিলে, পরাধীনতার সঙ্গে বৃটিশের সমস্ত আবর্জনা দূরীভূত হইত। ইংলণ্ডের সহিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের আপোষে স্বাধীনতা আসিয়াছে। ভারত বিখণ্ডিত হইয়াছে, বৃটিশের সমস্ত আবর্জনা রহিয়া গিয়াছে, সেই চোরাকারবারী দল, সেই অত্যাচারী পুলিশ কর্মচারীর দল, সকলেই উন্নত মস্তকে রহিয়া গিয়াছে, রাতারাতি সকলেই রং বদলাইয়াছে সকলে দেশপ্রেমিক সাজিয়াছে—তাহারাই এখন দেশভক্ত, তাহারাই এখন শাসক—তাহাদের ইঙ্গিতে দেশ শাসন চলিতেছে। তাই চারিদিকে দেখা যাইতেছে দুর্নীতিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ জন্মগ্রহণ করিতেছে, দুর্নীতিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে তাহারা দুর্নীতি শিক্ষা পাইতেছে। অনেক সময় দুর্নীতির আশ্রয় শিক্ষা পাইতেছে। অনেক সময় দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ না করিলে জীবনযাত্রা নির্বাহ করাও কঠিন হইয়া পড়ে।

একদিন এক সহরে, এক শিক্ষক বন্ধুর বাসায় আছি, অনেকটি পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্র শিক্ষক মহাশয়ের নিকট গিয়াছে প্রমোশনের তদ্বির করিতে। শিক্ষক মহাশয় বাসায় ছিলেন না, আমি তাহাদের সহিত গল্প জুড়িয়া দিলাম, আমি সহানুভূতির সহিত বলিলাম, ফেল করিলে কেন, তোমরা নকল করনা? তাহারা উৎসাহিত হইয়া বলিল, নকল'ত সকলেই করে, ইহা রেওয়াজ হইয়া গিয়াছে কিন্তু সারা বছর পড়া হয় নাই, বই খুলিয়া বাহির করিব কি করিয়া? আমি যখন বলিলাম তোমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, এখন আমাদের প্রয়োজন, বড় বড় বৈজ্ঞানিক, বড় বড় দার্শনিক বড় বড় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, তোমরা নকল করিয়া বড় বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হইতে পারিবে না এবং যখন তাহারা টের পাইল আমি একজন এম, এল, এ তখন তাহারা আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল। পঞ্চাশ বছর পূর্বে নকল করিয়া পাশ করা আমাদের কল্পনার অতীত ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইহাই রেওয়াজ। অর্থাৎ নকল সকলেই করে, নকল করা অপরাধের মধ্যে গণ্য নয়, দুর্নীতির মধ্যে গণ্য নয়।

দেশ স্বাধীন হইয়াছে কিন্তু এ স্বাধীনতা কাহার জন্য? এই স্বাধীনতা দ্বারা দেশের জনগণের কোন কল্যাণ সাধন হইয়াছে কি? দেশের জনগণ কি মনে করে এই স্বাধীনতা দ্বারা তাহারা উপকৃত হইয়াছে দেশের স্বাধীনতা আসিয়াছে মুষ্টিমেয় লোকের জন্য শাসকশ্রেণী, পুঁজিবাদী (Capitalist) ও চোরাকারবারীদের জন্য। বর্তমান দুর্নীতিপূর্ণ দূষিত আবহাওয়ার পরিবর্তন না করিতে পারিলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। যে আত্মত্যাগ ও নির্যাতন ভোগের ফলে দেশের স্বাধীনতা আসিয়াছে। সবই কি বিফলে যাইবে? কলুষমুক্ত নূতন সমাজ জাতি গড়িয়া তুলিবে কে?

(বিপ্লবী বাঙালী হইতে উদ্ধৃত)

ছাত্রসমাজ—আদর্শ রূপায়ণে—

জগদীশ চট্টোপাধ্যায়

ছাত্র ও যুবকরা সমস্ত দেশের ইতিহাসের গঠন করেছে, আমাদের দেশেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আমাদের দেশে বিশেষ করে বাংলা দেশে ছাত্ররা দেশবাসীর চিন্তা শক্তিতে নতুন প্রেরণা দিয়েছে, দেশের সংস্কারকে মনকে সংস্কারমুক্ত করে নতুনের সন্ধান দিয়েছে। ছাত্রদের স্বাধীন প্রচারেই বিশ্বের সভ্য ইহা চিরন্তন সত্য।

উনবিংশ শতাব্দির প্রথমভাগে রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, প্যারিচাঁদ মিত্র, শিব চন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত হয়েও দেশীয় ভাবধারায় নতুন চিন্তার অবতারণা করেছিলেন, সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারের খোলস হতে বের হয়ে নতুন চিন্তার আমদানী করেছিলেন। ওরা সকলেই কলেজের ছাত্র ও ডিরোজিওর শিষ্য ছিলেন। Henry Louis Vivian Derozio ১৮২৬ হতে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত মাত্র ৫ বৎসর হিন্দু কলেজে শিক্ষক ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই ডিরোজিও পরলোক গমন করেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্যবৃন্দ সেই সময়ের চিন্তাধারায় প্রবল রেখাপাত করতে সমর্থ হয়েছিল। ইহার পরই রাজা রামমোহন রায় ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের বাণী নিয়ে আগাইয়া এলেন। রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারে আগাইয়া এসেছিল ছাত্ররা। সেইজন্য তদ্‌কালীন ছাত্ররা সমাজপতিদের দ্বারা অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। Indian National Congress গঠিত হওয়ার আগেই বাংলায় সর্বভারতীয় জাতীয়তা বোধ ও পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গড়ে উঠেছিল।

১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনেও ছাত্ররা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলে ছাত্রদের সভায় প্রথম বিদেশী পণ্যবর্জন ও স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করেছিল। সভার পর ছাত্ররা কলেজস্কোয়ারে সমবেত হয়ে ধ্বনী তুলেছিল 'বন্দেমাতরম্'। হরিদাস ও উমামুখার্জি প্রণীত "Bande Mataram & Indian nationalism" গ্রন্থে লিখেছেন—এই সময়েই প্রথম ইংরেজের বিরুদ্ধে রণ-ধ্বনী দেওয়া হয় 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনী দ্বারা। ছাত্ররা দলে দলে আন্দোলনে আগাইয়া আসে। ছাত্রদের এই আন্দোলন থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালের ১২ই অক্টোবর কার্লাইল সার্কুলার প্রচার করা হয় এই সার্কুলারে সতর্ক করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় যদি কোনও ছাত্র প্রতিবাদ দিবসে অথবা বয়কট আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। এই সার্কুলারের প্রতিবাদে সচীন্দ্র নাথ বসুর নেতৃত্বে গঠিত হল অ্যান্টীসার্কুলার সোসাইটি"। এই সচীন্দ্রনাথ বসুকেও ১৯০৮ সালের ১১ই নবেম্বর ১৮১৮ সনের তিন নম্বর রেগুলেশন অনুযায়ী অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চাটার্জী, পুলিন বিহারী দাস, ভূপেশচন্দ্র নাগ, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, কৃষ্ণকুমার মিত্র, প্রমথনাথ মিত্র, ও সুবোধ চন্দ্র মল্লিকের সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়। বাংলার বিপ্লবীদল গুলিও ছাত্রদের দ্বারাই পুষ্টিলাভ করেছে। এই সময় পর্য্যন্ত ছাত্রের দ্বারা ছোট ছোট ক্লাব, কুস্তির আখড়া গঠিত হয়েছে কিন্তু ছাত্রদের নিজস্ব কোন কেন্দ্রিয় সংগঠন গড়ে উঠে নাই।

১৯২০ সালে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে সি,আর, দাশ গান্ধীজীর অসহযোগ কর্মসূচীর বিরোধিতা করার সাহস দিয়েছিলেন, কিন্তু গান্ধীজী সি,আর, দাসকে তার বশবর্তী করে ছিলেন। সি,আর, দাসের

আহ্বানে বিরাট মিছিল কোয়ারে (বর্তমান প্রতাপচন্দ্র পার্ক) ছাত্র সমাবেশে তিনি বলেন Students of Bengal I bow down to thee. এই সম্বন্ধে Mahatma Gandhi Vol II গ্রন্থে লিখেছেন " The message of Non-Co-Operation bore fruit first in Bengal. As early as January on an appeal by Mr. Das, 3000 College students went on strike in Calcutta. Thousands of boys & girls deserted School" এই সময়ও ছাত্রদের নিজেদের কোন সংগঠন ছিল না। কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনের সময় ছাত্রদেরও সমাবেশ হত। ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনের সময় প্রথম ছাত্র সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন Sir P. C. Roy. ইহার পর ফরিদপুর, ও চট্টগ্রামে একই ধরণের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফরিদপুরে দেশবন্ধু সি. আর. দাশ ও চট্টগ্রামে নির্মল চন্দ্র চন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সমস্ত বাৎসরিক অধিবেশনের কোন সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল না।

১৯২২-২৪ সালে নিরঞ্জন সেন গুপ্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ছাত্রদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে "Student" নামে একটি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ করে, কিন্তু আট মাস পর পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৩ সালে ছাত্রদের রামমোহন হলে একটি কনভেনসন্ হয়। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। আর্য্যসমাজ হলে (Cornwallis st.) সম্মেলন হয়। ১৯২৪ সালে বিভিন্ন কর্মপন্থা নিয়ে পার সি, সি, রায়ের সভাপতিত্বে Calcutta Students Association গঠিত হয়। ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত সংগঠিত ভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যায়। ১৯২৭ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী সাইমন কমিশন পদার্পণের প্রতিবাদে কংগ্রেসের হরতাল করার আহ্বানে Calcutta Students Association সমর্থন জানায় এবং ছাত্রদের অংশগ্রহণ করার জন্য ডাক দেয়। এসোসিয়েশনের কর্মীরা প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের সম্মুখে পিকেটিং-এ অগ্রণী অংশ গ্রহণ করে।

সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনে ছাত্রদের হরতাল আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই জন্ম নেয় সারা বাংলা ব্যাপি সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন এবং গঠিত হয় All Bengal Students Association (A. B. S. A) ১৯২৮ সালে হুগলীর কংগ্রেস সংখ্যায় "জাতীয় মুক্তি প্রবাহে ছাত্র সমাজ" শিরোনামায় অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন It was in Bengal that the first Student Association as an effective organisation, the A. B. S. A was formed in 1928. Even to-day throughout India the students organisation basically follow pattern set by A. B. S. A সমগ্র বাংলাদেশে ব্যাপি A. B. S. A সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল। A, B, S, A এর নিজস্ব নীতি ও কর্মসূচী ছিল। A, B, S, A ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল এবং বার হাজারের অধিক ছাত্র কারাবরণ করেছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধিতেছিল ১৯২৭ সাল হতে। ১৯২৭ সালে কৃতীছাত্র প্রমোদ ঘোষাল প্রেসিডেন্সি কলেজ ইউনিয়নের সম্পাদক নির্বাচিত হয়। ১৯২৮ সালের ২০শে জানুয়ারী কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবসের কয়েক দিন পূর্বে প্রমোদঘোষাল ছাত্রদের জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য আবেদন জানায়, সভায় ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন হয় ও বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত গান করা হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রমোদ ঘোষালকে ইহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে বলে। প্রমোদ ঘোষাল অস্বীকার করায়, তাহাকে সাসপেণ্ড করা হয়। ইহাতে কেবলমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের নয় সারা বাংলার ছাত্ররাই বিক্ষুব্ধ হয়। ১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী হরতালের দিন প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের পিকেটিং চলছিল, প্রমোদ ঘোষাল উপস্থিত ছিলেন ছাত্র-জনতার ভিড় বৃদ্ধি পাইতে থাকে হঠাৎ এক ইউরোপীয় সার্জেন প্রমোদ ঘোষালকে লাঠি পেটা করে। এই খবর

প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজ গেটে জমায়েৎ হতে থাকে এবং কলেজ স্কোয়ারের চতুর্দিকে ছাত্র পুলিশদের মধ্যে সংঘর্ষ সুরু হয়। ছাত্রদের মধ্যে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে রুখে দাঁড়াবার জন্য আওয়াজ ওঠে। ছাত্র আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল Stepleton এবং রাইটার্স বিল্ডিংএর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রেসিডেন্সি কলেজ ও Eden Hindu Hostel বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ১৩ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। Scottish Church College ও City college ও ছাত্রদের উপর দমননীতি প্রয়োগ করা হয়। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র, Calcutta student' Association এর কার্যকরী সমিতির সভ্য বীরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে ছাত্র মহলে একটী বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হত। ইহাই পরে A. B. S. A এর মুখপত্র হয়েছিল।

সকলে মিলে মিশে কাজে অগ্রসর হতে কোনরূপ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয় নাই। প্রথম পদক্ষেপে ১৯২৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী প্রঃ নৃপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সভাপতিত্বে এলবার্ট হলে সারা কলিকাতা ছাত্রদের সভা হ'ল। এই সভায় সারা বাংলা থেকে একটি শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার জন্য প্রবোধকুমার ঘোষাল, বীরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, অমরেন্দ্র নাথ রায় এই তিন জনের একটি কমিটী গঠিত হয়। দ্বিতীয় সভা হয় ৭ই মার্চ প্রবোধ কুমার ঘোষালের সভাপতিত্বে। এই সভায় ১৭ই ফেব্রুয়ারীর কমিটী আরও সম্প্রসারিত করা হয়। সভা নির্বাচিত হয় প্রবোধ কুমার ঘোষাল, বীরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, শচীন্দ্র নাথ মিত্র, রেবতী মোহন বর্মন, অক্ষয় কুমার সরকার, মনিন্দ্র লাহিড়ী এবং কলিকাতার প্রতি কলেজ হতে দুই জন নির্বাচিত প্রতিনিধি। এই সময় ১২১-এ, Bowbazar st. এ সকলে মিলিত হ'ত।

শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু বিশেষভাবে সাহায্য করতেন। এবং তৎকালীন জননেতৃবৃন্দ সকলেই সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। তখনকার Forward পত্রিকায় ২১-১২-২৮ The students movement in Bengali : Its aims and objects, শিরোনামায় লিখেছিলেন The growing realisation on our part of the national degeneration and backwardness in every sphere of life has found expression in the student movement of to-day. Ours in a movement to regain physical and mental efficiency that ought to be ours. It is also a general movement against injustice and inequality wherever found, against ignorance and half education, against intellectual stagnancy and moral misconceptions.

এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই অনুযায়ী কর্মপন্থা পরিচালনা করাই ছিল তৎকালীন ছাত্র আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। কমিটীতে স্থির হয় সংগঠনের নাম হবে All Bengal Student Association এবং অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয় প্রবোধ কুমার ঘোষাল সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক, অন্যান্য বিভাগের সম্পাদক মনীন্দ্র মোহন লাহিড়ী, বীরেন রায়, বিমল উকীল, কুমুদলাল ভট্টাচার্য্য, জগদীশ চ্যাটার্জি, কোষাধ্যক্ষ অমর রায়। পণ্ডিত জওহর লাল নেহরুর সভাপতিত্বে ১৯২৮ সালের ২২ হইতে ২৫ সেপ্টেম্বর মির্জাপুর কোয়ারে (শ্রদ্ধানন্দ পার্ক) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। A. B. S. A ইংরেজ সরকার বে-আইনী ঘোষণা করা পর্য্যন্ত তিনটী সম্মেলন হয়েছিল। প্রথম সম্মেলন (কলিকাতা) ১৯২৮ সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দ্বিতীয় সম্মেলন (ময়মনসিংহ) ১৯২৯ সভাপতি Dr. Muhammad Alam of Punjab তৃতীয় সম্মেলন (উত্তর কলিকাতা) ১৯৩১ সভাপতি শ্রীমতি কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়, উদ্বোধন করেন অন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-chancellor Prof C. R. Reddy.

A. B S A সকল ক্ষেত্রের মনীষীদের নেতৃত্ব ও পরামর্শ গ্রহণ করেছিল। অতি অল্প সময়ে সমস্ত জিলায় A B S A শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলার বাইরে মানভূম, শ্রীহট্ট ও গোয়ালপাড়ায় ABSA শাখা বিস্তার হয়েছিল। ১৯২৯ সালে লাহোরে কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে A. B. S A এর উদ্যোগে Punjab Student Union এর প্রচেষ্টায় All India student organisation গঠন করার উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রদেশের Students union এর প্রতিনিধিদের কনভেনসন্ ডাকা হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সভাপতিত্ব করেন। All India Student Federation গঠন করার জন্য ১৯৩০ সালের এপ্রিল মে মাসে সভা আহ্বান করা স্থির হয় কিন্তু গান্ধীজী সংগ্রামের ডাক দেওয়ায় ও সেই সংগ্রামে ছাত্র-নেতারা যোগ দেওয়ায় সেই সভা বন্ধ হয়ে যায়।

A B. S. A গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে চলত, কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহন করতে হলে ছাত্র-প্রতিনিধিদের সম্মেলনে স্থির হত। ১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিল Albert Hall এর সভায় বাংলার ছাত্র-প্রতিনিধিদের সভায় civil Disobedince movement এ যোগদান করা স্থির হয়েছিল। গান্ধীজীর ১৯৩২ সালের আন্দোলনে ও A. B. S. A কেবলমাত্র দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। সংগঠন গঠন করে আন্দোলন পরিচালনা করেছে হাজার হাজার ছাত্র কারাবরণ করেছে বাংলার আন্দোলন প্রধানতঃ ছাত্রদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে। ইংরেজ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ২-১-৩২ তারিখ A. B. S. A বে-আইনী ঘোষণা করে এবং ABSA অফিস পুলিশ তালাবন্ধ করে দেয়। কংগ্রেসের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়েছে কিন্তু A, B, S, A এর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় নাই। প্রত্যাহৃত না হলেও A, B, S, A কর্মিদের ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছাত্র সমাজের মধ্যে কাজ চালিয়ে গিয়েছে। ১৯৩৭ সালের পর একাধিক ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠেছে এখনও বহু ছাত্র সংগঠন কাজ করছে। কিন্তু ছাত্র সংগঠনগুলি যেন ছাত্রদের ক্ষেদমুক্ত করে দেশের অগ্রগতির পথে আগাইয়া নিতে পারছে না। ১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী সাইমন কমিশনের ভারতে পদার্পনের দিন কলিকাতার ছাত্রগণ পুলিশের লাঠি ও গুলিতে রক্তমাত হয়ে যে শপথ নিয়েছিল, সেই শপথ ১৯৩৬ সন পর্য্যন্ত A B S A কর্মীরা পালন করেছে।

আজও ABSA কর্মীরা প্রতিবৎসর ৩রা ফেব্রুয়ারী মিলিত হন। তাদের উত্তরসূরী আজকের ছাত্র সমাজ তাদের ৩রা ফেব্রুয়ারীর শপথ আজ গঠনে আত্মনিয়োগ করে পূর্ণ করবে এই প্রত্যাশায়।

শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি সম্পন্ন—বিখ্যাত 'ফলিতজ্যোতিষ' গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীহরিহর জ্যোতিশাস্ত্রী

বি, এ, এল, এল, বি (কলি) এ, সি, আই, আই (লণ্ডন)

প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে ১১টা এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার বাতীত অন্যদিন বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বপ্রকার জ্যোতিষী কার্য্য করেন।

কোষ্ঠী বিচারের পারিশ্রমিক ন্যূনাপক্ষে ২০ টাকা।

চেম্বারের ঠিকানা :

সি-৩৪, কাননগো পার্ক, গড়িয়া, ২৪ পরগণা

৫ নং বাসরুট, বৈষ্ণবঘাটা ষ্টপ।

জনতাদল কোন পথে

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জয়প্রকাশ নারায়ণ তাই দেশের সঙ্গে দুঃখ করে বলেছেন যে, দেশ গড়ার কাজে জনতা নেতারা ব্যর্থ—তিনি যাঁদের ক্ষমতায় বসিয়েছেন তাঁরা প্রায় সকলেই জাতি গঠনের কাজে নিজেদের অযোগ্যতারই পরিচয় ও প্রমাণ দিচ্ছেন—মোরারজী দেশাই, চরণ সিং বা অন্যান্যের কাহারো দেশ গঠনের ক্ষমতা নেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে। জনতার সৃষ্টি কর্তা নিজেই যখন এই সত্যকে মেনে নিয়ে বলেছেন যে, এই সরকার আমলাতন্ত্রের হাতে বন্দী এবং এঁরা আগেকার সরকারের মত খারাপ পথেই দিয়ে যাচ্ছেন। তখন এই সরকারের কি আর গদীতে আসীন থাকা শোভন ও সঙ্গত? জনতা দলের যদি রাজনৈতিক সততা একটুও থাকে তবে এখনই সরকারের পতন ঘটিয়ে দেওয়ার নির্বাচনে ডাক দিক; অন্যথায় জনতার এমন অবস্থা হবে যে, কোন দিন আর মানুষ এঁদের বিশ্বাস করবে না। এঁরা সাধারণ মানুষের যে অকুণ্ঠ সমর্থন ইতিপূর্বে পেয়েছেন তা আর ভবিষ্যতে কোন দিন পাবেন না, কারণ মানুষ তাঁদের আসল চেহারার যৌলুস ইতিমধ্যে ভালভাবেই প্রত্যক্ষ করেছে। জে, পি, কে নিয়ে "গান্ধিধারা" পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত এক নিবন্ধে জানা যায় যে, জনতা নেতৃত্বে যে সংকট এখনও চলছে তাতে জে,পি, হতাশ এবং তার আশা ভঙ্গ হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন :—জে, পি, কি এই নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত মানুষগুলিকে চিনতেন না—না এঁদের অতীত রাজনৈতিক কার্যকলাপের সহিত পূর্বে পরিচিত ছিলেন না? তিনি ত এঁদের সবচেয়ে ভালভাবেই চিনতেন ও জানতেন বহু পূর্ব হতেই, তবে এই আক্ষেপ ও হতাশার আজ তিনি নিজে মুহ্যমান কেন? বিষয়টি গোপন করে যদি কেউ অমৃত ফলের আশা করেন তবে তাঁকে জে, পির মত বর্তমান অবস্থার পড়তেই হবে—এর কোন ব্যতিক্রম কোন সময়েই হবে না। আজ আর দুঃখ করে লাভ কি? জনতা নেতৃত্ব কঠিন ও নিয়মিত প্রচেষ্টার পর অবশেষে চরণ সিংকে মোরারজী ভাইয়ের মুখোমুখি করতে ও উভয়কে আলাপাচারী করতে সক্ষম হলেন, কিন্তু বহু গলাবো তাতেও সম্ভব হলো না। ফলে দু পক্ষই জোকে কেটে পড়তে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে লোকসভায় ও রাজ্যসভায় জনতা বিরোধীরা সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন এবং কংগ্রেস (ই) রাজ্যসভায় সংখ্যাগুরু সদস্যের বলে বলীয়ান হয়ে মোরারজী-চরণ পত্র গুচ্ছ রাজ্য সভায় প্রকাশ করার জন্য চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকলেন, রাজ্যসভা প্রায় অচল অবস্থায় নীত হতে থাকলো, তবু মোরারজীভাই ঐ পত্রগুচ্ছ প্রকাশে বিন্দুমাত্র ইচ্ছুক নয় দেখা গেল। রাজ্যসভা পরিচালনা অধ্যক্ষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব করে তুললেন সরকারী—তাঁদের দাবী মোরারজী ভাইয়ের পুত্র কান্তি দেশাইয়ের বিরুদ্ধে ও চরণ সিংয়ের পরিবার পরিজনদের বিরুদ্ধে দুটি আলাদাভাবে তদন্ত কমিশন সরকারকে অনতিবিলম্বে বসাতেই হবে যেহেতু চরণ সিং কান্তি ভাইয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগসহ প্রধান মন্ত্রীকে পত্র লিখেছেন এবং প্রধান মন্ত্রীও তার উত্তরে চরণ সিংয়ের পরিবার পরিজনদের দুর্নীতির সম্বন্ধে অভিযোগ এনেছেন ও সেই বিষয়ে চরণ সিংকে পত্র দিয়েছেন বা সংবাদ পত্রে কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছে বলে তার সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে রাজ্যসভা উত্তাল এবং সরকার রাজ্যসভায় এমনই কোনঠাসা যে সরকার চরম বিপদগ্রস্ত হয়ে পত্রগুচ্ছ প্রকাশে বাধ্য হন। তবে সে কেবল রাজ্যসভার অধ্যক্ষের নিকটে বিরোধী দলনেতারা ছাড়া অন্যান্য সদস্যরা দেখতে পাবেন না এবং এঁরা এভাবে দেখতে পাবেন তাঁরা কিন্তু ঐ ব্যাপারের গুরুত্ব বিবেচনায় উহার

দর্শ বাহিরে কোথাও প্রকাশ করতে পারবেন না। এর ফলে রাজ্যসভার অন্যান্য সদস্যরা তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে তুললেন। আর এর প্রতিক্রিয়া লোকসভাতেও প্রতিফলিত হলো। ভারতীয় সংসদ এ নিয়ে উত্তপ্ত ও দুর্নীতির মূলোৎপাটনে বদ্ধপরিকর বলে ঘোষণা গেল এবং রাজনারায়ণ এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে ১৭ই আগষ্ট লোকসভায় তাঁর পদত্যাগ বিষয়ে মোরারজীর বিরুদ্ধে এক সত্য ভাষণের কথা পূর্বাহ্নে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করতে লাগলেন এবং সে সব কথা সংবাদ পত্রের মাধ্যমে এত প্রচারলাভ করলো যে মোরারজী ভাই, চন্দ্রশেখর, লালকৃষ্ণ আদবানি, মধুলিমায়ে, জরজ ফার্নান্ডেজ সকলেই যেন ভীত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন যে চরণকে শান্ত করতে না পারলে চরণসিংহের রাজনারায়ণ যদি লোকসভায় আসল গোপন কথা সব বিরোধী সমক্ষে ফাঁস করে দেয়, তবে জনতাদলের ভাবমূর্তি শুধু ম্লান হবে না, উপরন্তু দুটি আলাদা আলাদা তদন্ত কমিশন বসাতে হবে যার ফলে মোরারজী গদীচ্যুত হতে বাধ্য হবে কারণ পুত্র এতে জড়িত।

প্রধান মন্ত্রীর পুত্রের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বিষয়ে তদন্ত কমিশন বসাতে সরকার বাধ্য হলে, মোরারজী ভাইকে পদত্যাগ করতেই হবে নচেৎ তদন্তে ন্যায় ও নীতি রক্ষিত হবে না এবং এটাই তদন্ত কমিশন বসাতে গড়িমসি হওয়ার প্রধান কারণ, অন্যান্য কারণও থাকতে পারে। রাজনারায়ণের কুক্ষিগীরোচিত আস্ফালন ও ১৭ তারিখের পূর্বেই লোকসভায় তাঁর বক্তৃতা দেবার রকম সকম ও ভঙ্গি এবং বিরোধী কংগ্রেস (ই) সদস্যদের পক্ষে সমর্থন জানানোর প্রচেষ্টা, অবশ্য মোরারজীর ও কান্তিভাইয়ের বিরোধী যে সব আলোচনা চলছিল, সেই সব আলোচনাতেই তা সীমাবদ্ধ ছিল—অন্য ব্যাপারে মোটেই নয়। সন্তাই জনতা দলের ভাবমূর্তি প্রায় নিশ্চিহ্ন করবে, এই দুশ্চিন্তায় চন্দ্রশেখর মোরারজীর সঙ্গে গোপনে দেখা করে এর একটা প্রতিকার করার বাসনা প্রকাশ করেন কিন্তু বুদ্ধি কাঁদ্‌লেন যা মোরারজী কিছুতেই অনুমোদন করতে পারলেন না। চন্দ্রশেখর মোরারজীকে বোঝালেন যে রাজনারায়ণকে এখন শান্ত করতে হলে ও'তার ১৭ তারিখের বক্তৃতার মোড় ঘুরিয়ে দিতে হলে চরণ সিংহের সাহায্য ও সম্মতি ছাড়া কিছুতেই তা সম্ভব নয়। মোরারজী তবুও চন্দ্রশেখরের এবম্বিধ প্রস্তাবে এক কথায় রাজি হতে পারলেন না কারণ প্রস্তাবটি ছিল এই যে, চরণ সিংকে জনতাদলের সভাপতি করা ও চন্দ্রশেখরের পদত্যাগ অথবা আগামী দিনে চরণ সিংকে দলপতি করার প্রতিশ্রুতি, যখনই দলের দলীয় নির্বাচন হবে তখনই, তবে এই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা। কিন্তু মোরারজীর চিন্তায় একটি দুর্ভাবনা এবং সেটা কান্তির বিরুদ্ধে চরণ যে সব মিথ্যা অভিযোগ এনেছে তা যতক্ষণ না সে প্রত্যাহার করে নেয়, ততক্ষণ তিনি চরণকে গ্রহণ করতে অপারগ। চন্দ্রশেখর মোরারজীকে পরামর্শ দেন এসব কথা পরে বললেই হবে সন্ত দিলাপে, এখন আর সময় হাতে নেই—এখন রাজি হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। চন্দ্রশেখর ঘোষণা করলেন, দলের আশু ভাঙন রোধে ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ করতে ও চরণ সিংকে জনতা সভাপতি করতে রাজি এবং এই কার্যে দলের সব পক্ষের সাহায্য ও সম্মতি আশা করেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এর ফলে দলে যে, কিছুকাল যাবৎ মোরারজী বিরোধ ও বিদ্বেষ বর্তমান ছিল তার অচিরেই অবসান হবে। চরণ সিং এই ব্যবস্থা সুখী মনে মেনে নিতে রাজি হলেন—দলের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের চিন্তায়। রাজনারায়ণ পূর্ব পরিকল্পিত বক্তৃতা ১৭ই আগষ্ট তারিখে লোকসভায় দিলেন না কারণ ঐ বক্তৃতায় তিনি মোরারজী ও কান্তির বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনয়ন করতেন তাতে লোকসভায় বিরোধী দল গুলির, বিশেষ করে কংগ্রেস (ই) দলের হাত শক্ত হতো এবং জনতা দলের ভাবমূর্তি আর সঙ্কটে যেন গভীর ভাবে ম্লান হয়ে যেত। চন্দ্রশেখর উক্ত কৌশল ১৭ই আগষ্ট সাময়িক ভাবে কিছু সুফল দিলেও, পরদিনই উক্ত আপস প্রচেষ্টা ও আপসের উপরোক্ত ধরণ জনতা দলের অনেক মন্ত্রি সোচ্চার, বিশেষ করে আইকংগ্রেস, সি, এফ, ডি ও জনসঙ্ঘের কিছু লোকসভা সদস্যের দ্বারা বিফল ও গ্রহণ যোগ্য নয় বলে প্রত্যাখিত হলো। বরং মোরারজী চরণকে

পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিলেন যে, যতক্ষণ চরণ কান্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ গুলি প্রত্যাহার না করে নিচ্ছেন ততক্ষণ মোরারজী আপসের কোন প্রস্তাবেই রাজি হতে পারেন না। চরণ সিং কোন অবস্থাতেই কান্তির বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগ প্রত্যাহারে রাজি নন। অতএব জনতা দল তাদের যে পর্য্যায়ে অবস্থান করছিল তথায় স্থিতাবস্থায় বিরাজমান রহিল। আপসের এই বিশেষ চেষ্টাও নিষ্ফল হলো। এর ফলে চরণ বিরোধীদের, জনতাদলে যোগদান কিছুটা সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো; কিন্তু জনতা দল, দল হিসেবে যে জনতার কাছে মর্য্যাদা হারালো, তা বোধ হয় অনেকেই অনুমান করতে ব্যর্থ হলেন। এদিকে জে, পি, ও জে, বি, হায় হতোস্মি বলে খেদ করছেন, আর ভাবছেন কি ভুল করেই না এই অর্বাচীনদের হিতে দেশ শাসন করার চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। এদের কারোরই দেশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার মত বুদ্ধি ও শক্তি নেই। এখন সাপের ছুঁচো গেলার মত অবস্থায় জনতা দল। না পারছে দলের ঐক্য ও সংহতি ফিরিয়ে আনতে, না পারছে দেশের কোনও কল্যাণের কাজ ত্বরান্বিত করতে—এক কথায় জনতা আজ দিশেহারা ও হতাশাগ্রস্থ একটি দল যার কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতায় বসার লোভ ও আগ্রহ থাকলেও শাসনযন্ত্র সুপরিচালনার যোগ্যতার ও শক্তির একান্ত অভাব আছে—যা সকলেই আজ বুঝতে পেরেছে। চরণ সিং বিরোধী শিবির ধীরে ধীরে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে বলে সংবাদে প্রকাশ। আবার এই কথাও না কি শুনা যাচ্ছে যে শারদ পাওয়ার ও কংগ্রেস (ই) সংসদ সদস্যরা গোপনে চরণ সিং অথবা চরণ সমর্থকদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করছে। যাহা কিছু হোক না কেন জনতাদল যে ধীরে ধীরে ক্রমশ শক্তিহীন ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে সেটাই চরম দুঃখের ও ক্ষোভের কারণ হয়েছে। মানুষ অনেক আশা ও আকাঙ্খা নিয়ে জনতাকে সমর্থন করে গদীতে বসিয়েছিল, এখন সেই জনতা যদি তুচ্ছ আত্মস্বার্থে, গোষ্ঠীস্বার্থে বা পুত্রস্বার্থে এরূপ বিচ্ছিন্ন, শক্তিহীন ও অপদার্থ এবং অকর্মন্য হয়ে পড়ে; তবে এর চেয়ে আর পরিতাপের বিষয় কি থাকতে পারে। জনতার কতকগুলি স্বার্থান্বেষী অদূরদর্শী, অকর্মন্য ও অপদার্থের দল জোটবদ্ধ হয়ে সারা ভারতকে আজ বিপথগামীও বিপদগ্রস্থ করলো—যার কোন ক্ষমা নেই। সারা ভারত আজ উৎকণ্ঠিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। জনতা নিজেও মরছে এবং সারা দেশটাকে উচ্ছন্নে দিচ্ছে, কেবল ব্যক্তি স্বার্থে ও কায়েমী স্বার্থপরদের তল্পিবাহক হয়ে—সে কথা আজ ভারতীয় জনগণ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে। সংবাদ পত্রে জনতাদলে আপসের খবর বেশ ঘটাকরে প্রায়শই ছাপা হচ্ছে, কিন্তু আপস বোধ হয় দূর অস্ত। চরণ ও মোরারজী যে অনমনীয় মনোভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন—তাতে আপস হওয়া বোধ হয় সত্যই অসম্ভব। এদিকে কান্তির অর্থ সংগ্রহ নিয়ে যা চক্ষুস্তাণ্ডব প্রকাশ করেছেন, লোকসভা উত্তপ্ত ও গরগরম। ধীরে ধীরে দুর্নীতির মুখোস একে একে খুলে যাচ্ছে বা খসে পড়ছে। লাল কৃষ্ণ আদবানি তাদের বিলম্ব ঘটানোর যত চেষ্টাই করুন, শেষ পর্য্যন্ত তদন্তের মধ্যে রাখা বিড়ালটি অতি অবশ্যই বাইরে বেরিয়ে পড়বেই। সত্য প্রকাশ পাবেই, আজ অথবা কাল অথবা পরশু। সত্যকে অবরুদ্ধ করা যায় না—সে আপন মহিমায় প্রভাসিত হয়, তার গতি ধীর কিন্তু নিশ্চিত। আপসের অনেকগুলি চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে, এখনও হয়ত হবে, তবে জনতা আপসকারীরা হাল ছাড়েন নাই কারণ তাঁরাও নিজ নিজ স্বার্থে আপস খেলায় মেতেছেন ও এখনও এর সাফল্যের আশায় ডগমগ অর্থাৎ চরম আশাবাদী। জনগণও আপস চায়, কিন্তু আপস হচ্ছে কৈ? আর সাময়িক হলেও তা পরক্ষণেই ভেঙ্গে যাচ্ছে। গলদ অনেক গভীরে তাই উপর উপর দাওয়াই ঠিকমত কার্য্যকর হতে পারছে না। অবস্থা বড়ই সঙ্গীন আকার ধারণ করেছে যা কেউ ইতিপূর্বে কল্পনা করতে পারিনি। সংবাদে প্রকাশ জনতাদলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ মন্ত্রীপুত্র এক নারী ঘটিত ব্যাপারে দিল্লীতে জড়িয়ে পড়েছে এবং বড়ই কুৎসিত ভাবে। পরে অনুসন্ধানে জানা গেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বাবু জগজীবন রামের পুত্র সুরেশ কুমার উক্ত নারী ঘটিত কেলেঙ্কারীতে প্রত্যক্ষভাবে নাকি জড়িত ছিল—এখন সে বিষয়ে পুলিশ তদন্ত করছে এর ফলে জগজীবনরাম ও জনতাদলের ভাবমূর্ত্তি বেশ কিছুটা

হয়ে হলো। জনগণ প্রতি মিনিটেই এরূপ সব সংবাদে গভীর হতাশার মিনর হাতে বাধ্য হচ্ছে অথচ এর প্রতিকার কিছুই হবার আশা দেখা যাচ্ছে না। লোকে এখনও জনতার উপর অনেক আশা ভরসা নিয়ে মঙ্গলের জন্য প্রতিক্ষা করতে প্রস্তুত আছে। জনতা কি ক্রুত দেশ গঠনের কল্যাণের কাজে হাত লাগাবার মত সময় করে নিতে পারবে, না কেবল গোষ্ঠি কলহে লিপ্ত থাকবে ও নানা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে দুর্নীতির মূলোৎপাটনে অনীহা প্রকাশ করবে? তা যদি পূর্বের মত বারে বারে হয়, তবে জনতার দিন সংক্ষেপ বলে ধারণা করলে ভুল হবে না। সুরেশ কুমার ও কুমারী সুষমা চৌধুরী (ছাত্রী) গত ২০ শে আগষ্ট রাত্রে যখন একই গাড়ীতে তাঁদের গন্তব্য স্থলের দিকে যাচ্ছিলেন তখন কালীঘাট গেটের কাছে একদল লোক তাঁদের অপহরণ করে মোটর লরীর দিকে জোর করে নিয়ে যায় বলে, ওরা দুজনেই পুলিসের কাছে নালিশ জানায়। ফলে উক্ত ব্যাপারে জড়িত সন্দেহে পুলিশ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে—এঁদের একজন যুবজনতার সাধারণ সম্পাদক কে, সি ত্যাগী ও অন্যজন তার পার্শ্ব সিং যিনি গর্ব ভারতীয় কুষাণ সম্মেলনের ভারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কর্মী অর্থাৎ এঁরা দুজনেই জনতাদলের নিজস্বলোক ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তাই এর গুরুত্ব বেশ বেড়ে গেছে। রাজনারায়ণ এই পুলিশী গ্রেপ্তারে খুবই ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত। এদিকে কংগ্রেস সরকারীয় দলের নেতা কমলাপতি রায় এই কেচ্ছা কেলেঙ্কারী কোন রাজনৈতিক ঘুনাক্ষর ওঠানো যায় কিনা তা খতিয়ে দেখছেন এবং সরকার সমর্থকদের তাতানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। চরণ সিং শিবিরেও এ নিয়ে জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। অনেকে আবার সংসদে ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনার কথা ভাবছেন। তাঁদের বক্তব্য:—এটাকে শুধু সুরেশ কুমারের ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না—কারণ সুরেশ মাকুন্দপুরের রাজার, যিনি রাজা সভা-সদস্য তার বিরুদ্ধে ব্ল্যাকটি লোয়ার উস্কানে ব্যবহার করেছিল বলে সংবাদে প্রকাশ। তাছাড়া সমগ্র দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নটিও এক্ষেত্রে বিশেষভাবেই জড়িত, কারণ সুরেশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রামের একমাত্র পুত্র ও পিতার খুবই বিশ্বাসভাজন। সুরেশ রাজনীতির ব্যাপারে দীর্ঘ দিন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রতিরক্ষা দপ্তরের অনেক গোপন ও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তাঁর জানা—পিতার মাধ্যমে। কোনও দুর্বল মুহূর্তে সুরেশ প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কোন মূল্যবান ও অত্যন্ত গোপনীয় তথ্য যদি তার প্রেমিকা মেয়েটির কাছে ফাঁস করে ফেলে তবে ঘোরতর জাতীয় অধঃপতির আশঙ্কা থাকবে; কারণ স্বার্থান্বেষীরা এ ব্যাপারে ঐ মেয়েটিকে কাজে লাগিয়ে তা সংগ্রহ করে নেবে অতি সহজেই এবং ফলে জাতির সর্বনাশ সংঘটিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। তাই খুবই সতর্ক থাকার প্রয়োজন জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে। মনে হয় জগজীবন রাম এই ঘটনার পরে খুবই বিমর্ষ ও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল এই ঘটনার বিকৃত ব্যাখ্যা করছেন এবং আসল ঘটনা ধামা চাপা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে ব্যাপারটি যেরূপ ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে—ঘোরতর দুর্যোগের মধ্যে তাতে এটা ধামা চাপা দেওয়া কাহারো পক্ষে সহজে সম্ভবপর হবে না। এ নিয়ে লোকসভা ও রাজ্যসভা তোলপাড় হতে বাধ্য। ফলে জনতার মুখ একটু বেশী করে মসী-লিপ্ত হবে। কাজির পরে সুরেশকুমার এবং এর পর আবার কে জনতার অধোগতি ত্বরান্বিত করবে তা এখনও 'জনতা' ইন্দিরার, সঞ্জয়ের, বন্সীলালের ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করেছেন এবং এখনও করছেন, সেই একই পন্থায় যদি কাজি ভাইয়ের সুরেশ কুমারের ও চরণ সিং আত্মীয় পরিজনের বিরুদ্ধে তাদের কৃত দুর্নীতি ও অন্যায় কাজের তদন্ত ও পরে বিচার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন; তবেই জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জন করতে পারবে, অন্যথায় জনতার কবর অবশ্যম্ভাবী কারণ জনতা মানুষের বিশেষ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে ও ঐকান্তিক কর্ম প্রচেষ্টায় যারা জনতার অধিষ্ঠিত হয়েছিলো। কিন্তু আজ মানুষ দেখলই জনতার কার্যকলাপে ও দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতার স্বরূপ দেখে এবং পদে পদে আত্মকলহে লিপ্ত দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং তারা ভাবছে জনতার পরিবর্তে যদি দর্পণ ভাল হয় কেমন? কেউ কেউ জনতাদলের উপর এতই বিরক্ত হয়ে পড়েছেন যে তাঁরা প্রকাশ্যেই বলে বেড়াচ্ছেন যে, জনতা আর বেশীদিন নয়—যা কেলেঙ্কারী এই বছে

(ক্রমশঃ)

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন চাই

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ ভৌমিক

'বিপ্লবী বাংলার' সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি প্রবুদ্ধ জগদীশ দা (চট্টোপাধ্যায়) অভিযোগ করেছেন দীর্ঘদিন যাবৎ বিপ্লবী বাংলায় লিখিনা। না লেখার প্রধান কারণ সময়ের অভাব, একসময় প্রায় নিয়মিত ভাবেই 'বিপ্লবী বাংলায়' লিখেছি। তখন দৈনিক বসুমতী ছাড়া আনন্দবাজার, যুগান্তরেও মাঝে মাঝে লিখেছি এখন সময় করতে পারিনা। বিপ্লবী বাংলা—বিপ্লবীদের এবং সর্ব্বস্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনের কথা বলে— কাজেই একদা যাঁরা মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের নিকট বিপ্লবী বাংলা খুবই জনপ্রিয়। পত্রিকা চালাতে গিয়ে জগদীশদাকে অনেক ত্যাগ স্বীকারও করতে হয়েছে।

ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য

বাংলাদেশের প্রসঙ্গ বলছি এজন্য আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বাংলাদেশের কথা ভুলতে পারিনা বাংলাদেশের জনজীবনে আজ যে চরম বৈষম্য, সেখানে গণতন্ত্রের সলিল সমাধি ঘটেছে, একথা বিশ্বের মানুষের নিকট তুলে ধরা যে কোন গণতন্ত্রকামী ও স্বাধীনতাকামী মানুষের পবিত্র দায়িত্ব। ভারত চিরকালই নিপীড়িত মানুষের বন্ধুত্ব তুলে ধরেছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা অপরাধ।

ভারতবর্ষ জোট নিরপেক্ষ দেশ, কোন দেশের রাজনীতির দ্বারা ভারতীয় রাজনীতি প্রভাবিত নয়, সকল দেশের সঙ্গেই ভারতের মৈত্রী সম্পর্ক অটুট রয়েছে। শুধু প্রতিবেশী দেশ নয়, বিশ্বের সকলদেশের সঙ্গেই ভারতের উত্তম সম্পর্ক রয়েছে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি, ভারতের ঐতিহ্যভিত্তিক, ভারতের ঐতিহ্যই হল পররাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ না করা। বন্ধুত্ব প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষ সমৃদ্ধশালী এশিয়ার সকলদেশকেই আয়ত্বের মধ্যে আনতে পারত। একসময় মধ্যপ্রাচ্যেও যথেষ্ট সংখ্যায় হিন্দু ছিল, আফগানিস্থান হিন্দুপ্রধান দেশ ছিল—আফগানকে গান্ধার রাজার দেশ বলা হত। রাণী গান্ধারী গান্ধার রাজারই কন্যা। ইন্দোচীন হিন্দুচীন নামে পরিচিত ছিল—ইন্দোনেশিয়া হিন্দুনেশিয়া নামে খ্যাত ছিল। হিন্দুকুশ পর্ব্বত থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্য্যন্ত হিন্দু সাম্রাজ্য ছিল। হিন্দুরাজাদের আত্মকলহের জন্যই বিদেশীদের নিকট হিন্দুরা পরাজিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য এখন ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে অথচ এই প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য কত সমৃদ্ধময়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংস্কৃত সাহিত্য অনুবাদ করে নিজেরা উপকৃত হচ্ছে। জার্মানরা সংস্কৃত ভাষা অধিকমাত্রায় আয়ত্ব করেছে। উহার জার্মানীই সংস্কৃতের কদর করে। রাশিয়া, চীন এবং আমেরিকারও সংস্কৃত ভাষায় খুব কদর। মেঘের আড়ালে লড়াই, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পুষ্পক রথ (বিমান?) রাবণের মারণাস্ত্র এগুলি যদি গল্পও হয়—তাহলেও বলতে হবে হাজার হাজার বৎসর পূর্বেও ভারতীয় চিন্তাশীল

মানুষের কল্পনাও সুদূরপ্রসারী ছিল তাহলে কি সবই বাস্তব বর্জিত হত? হাজার হাজার বৎসর পূর্বে ভারতীয় সংস্কৃতি পৃথিবীর বিভিন্নদেশের সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করেছে। চীনা পরিব্রাজকরা নালান্দার পড়াশুনা করতে এসেছিলেন সম্প্রতি চীনা প্রতিনিধিদল ভারত সফরে আসেন তাদের মধ্যে একজন সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ষড়যন্ত্র

সাম্রাজ্যবাদী সুচতুর ইংরেজ ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করল। কংগ্রেসের উচ্চতম আপোষকামী নেতৃত্ব ও মুসলীম লীগের ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্ব ইংরেজের চক্রান্তে পা দিয়ে ভারতকে বিখণ্ডিত করল। অথচ ১৯৪৬ সাল ব্যাপী সমগ্র ভারত ছিল গণআন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধী "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মথিত করে আগষ্ট বিপ্লবের ডাক দিলেন—আর ১৯৪৩ সালে সুদূর সোনান (সিঙ্গাপুর) থেকে পৃথিবীর বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীকে চরম আঘাত হানলেন—আজাদ হিন্দ ফৌজের স্থাপনের মাধ্যমে—"চলো দিল্লী" শ্লোগানে দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া প্রকম্পিত হল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ চরম প্রমাদে দিশেহারা হয়ে গেল। আজাদী সৈনিকদের আত্মত্যাগের কাহিনী শুনে সারা ভারতবর্ষ—১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে আরও আত্মত্যাগের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করল। সে সময় ইংরেজ "সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই চিন্তাধারায় ভারত ত্যাগ করে খণ্ডিত স্বাধীনতা দিয়ে, ভারতের বাজারে পাকিস্তানের বাজারে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ বজায় রাখার চেষ্টা করল। অথচ সে সময় ছাত্র সমাজ, শ্রমিকরা, কৃষকরা ও সেনাবাহিনী বিপুলভাবে বিক্ষুব্ধ। সাম্রাজ্যবাদ বাঙ্গার আশ্রয় নিলেও—বাঙ্গা সব সময় হতে পারে না এটা সাময়িক বিভ্রান্তি ও ষড়যন্ত্রের প্রতিক্রিয়া মাত্র।

সে সময় আমরা সর্ব ভারতীয় ছাত্র আন্দোলনের পুরোভাগে—১৯৪৫ সালে জেল থেকে বেরিয়ে এসেই আমরা সংগ্রামী ছাত্র আন্দোলনকে সারা ভারতে মাত্র পরিব্যপ্ত করেছি—সে সময় সাম্রাজ্যবাদ বাঙ্গার আশ্রয় নিল। কলকাতার রাজপথে প্রায় প্রতিদিন আমাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিছিল। ১৯৪৫ সালের ২১ শে নভেম্বর লিউ সিনেমার সামনে আমাদের উপর গুলি চলল আমরা প্রথম সারিতে যারা ছিলাম সকলেই লাঠির আঘাতে হাসপাতালে প্রেরিত হলাম—তারপর ট্রিব্যুনালে, তারপর গুলি। এরপর ছাত্র আন্দোলন আরও তীব্রতর আকার ধারণ করে, ভারতীয় পুলিশরা আমাদের উপর গুলী চালাতে অস্বীকার করে—আমি সে সময় নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেসের সম্পাদক ও বঙ্গীয় ছাত্র কংগ্রেসের সভাপতি। আমাদের সময়কার ছাত্র নেতারা এখন অনেকেই দিল্লীতে মন্ত্রী বা এম পি, অনেকে বিভিন্ন রাজ্যে মন্ত্রী, আজ তারা কি করে সে দিনের কংগ্রেসী সংগ্রামীদের ভুলে যেতে পারে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্পর্কে ইংরেজের বিরুদ্ধে সারা দেশ ব্যাপি এমন বিক্ষোভ হয়—সামরিক বাহিনীর লোকেরাও তাদের বিরুদ্ধে কোনও রকম শাস্তিপূর্ণ ব্যবস্থা যাতে না গ্রহণ করা হয় সে জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত ভোটে শতকরা ৯৫ % জন আজাদী সৈনিকদের পক্ষে ভোট দেয়। ইংরেজ তখন

বুঝতে পারে বৃটেন থেকে লক্ষ লক্ষ সৈন্য আমদানী করেও ভারতকে করায়ত্ত রাখা যাবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরেজ তখন ক্লান্ত। সৈনিকরাদেশে ফেরার জন্য অস্থির, কাজেই বৃটেনের তদানীন্তন শ্রমিক সরকার (এটলী সরকার) খণ্ডিত স্বাধীনতা দিতে রাজী হয়। যদিও রক্ষণশীল দল চার্চিলের নেতৃত্বে বিরুদ্ধতা করে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তার পূর্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে বলছেন—যুদ্ধত্তর যুগে ভারত সামগ্রিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হবে দেশ ভাগের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু Interim Govt-এর স্বাদ পেয়ে কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্ব যে কোন প্রস্তাবেই রাজী হয়ে গেল। মাউন্টব্যাটেন ভয় দেখালো—তোমরা রাজী না হলে সুভাষচন্দ্রের হাতে ক্ষমতা দিয়ে যেব। কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্ব জানত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু ঘটেনি কাজেই ইংরেজের ইচ্ছামতই বিপ্লব বিরোধী বুর্জোয়া নেতৃত্ব লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদ্বাস্তু করে দেশ ভাগ করল। নেহেরু, প্যাটেল, লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেনকে ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল বলে মেনে নিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের ছাত্র, কৃষক, শ্রমিকের অবদান অসামান্য

দেশের মুক্তি সংগ্রামে শুধু উপর তলার কিছু বুর্জোয়া নেতার কারাবরণই যথেষ্ট ছিল না। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে যে সংগ্রাম শুরু হয়, ১৯৪৬ সালের গণআন্দোলনের মাধ্যমে তা সার্থক পরিণতি লাভ করে। ভারতের বিপ্লবীরা এমন কি শহীদ ভগত সিং ও সোভিয়েৎ ইউনিয়নের সকল মতেরই বিপ্লবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবোত্তর সোভিয়েৎ ইউনিয়ন দেখে মুগ্ধ হন। নেতাজী কোন দিন সোভিয়েৎ ইউনিয়ন বা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করেন নি। ১৯৪১ সালে দেশত্যাগ করে তিনি সোভিয়েৎ ইউনিয়নেরই সাহায্য চেয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালে নেতাজী কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন তাঁরই চেষ্টায় জাপানী আক্রমনে বিধ্বস্ত চীনে মেডিকেল মিশন প্রেরিত হয়—নেতাজী ভারতীয় প্রতিনিধিদের মাও-সেতুং এর মুক্ত অঞ্চলে কাজ করতে বলেন। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, যতীন দাস, বাঘা যতীন, প্রফুল্ল চাকীর আত্ম দান মাষ্টার দা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিদ্রোহ স্বাধীনতা সংগ্রামকে সঞ্জীবিত করে। আজ মাষ্টারদার চট্টগ্রাম বাংলা-দেশ তাঁদের কথা কি স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ভুলতে পারে।

১৯৪৫ সালের শেষভাগ থেকেই দেশব্যাপী হরতালের ঢেউ উত্তাল হয়। ১৯৪৫ সালের মাঝখানেই অধিকাংশ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কারা-মুক্ত হন। ১৯৪৫ সালে ৮৫০টি হরতাল হয়। এই হরতালে প্রায় ৮ লক্ষ শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে বেনারসে ১৭ জন বর্ষীয়সী শ্রমিক নিহত হয়, দুইহাজার গ্রেপ্তার হয়। ১৯৪৬ সালে ২০ লক্ষ শ্রমিক হরতালে অংশগ্রহণ করে। জোয়ালিয়রে পুলিশের গুলীতে ২৬ জন শ্রমিক নিহত হয়। ১৯৪৬ সালের ৩১ জুলাই কলকাতার ময়দানে বিরাট শ্রমিক, ছাত্র, যুব বিরাণ সমাবেশ হয় আমরাও বক্তা ছিলাম। সভায় দেশভাগে ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা করা হয়। ১৯৪৬ সালের নৌবিদ্রোহের কথা সকলেরই জানা আছে—নৌবিদ্রোহে প্রায় ২৬০ জন নৌসেনা শহীদ হন।

খণ্ডিত স্বাধীনতার ৩১ বৎসর পরও ভারতের বাংলাদেশের, বা পাকিস্তানের কৃষক, শ্রমিক, ও সাধারণ মানুষের কোন সমস্যার সমাধান হয়নি। অথচ দেশের মুক্তি সংগ্রামে তাদের অবদান ও বিপ্লবীদের অবদানই ছিল অসামান্য।

সারা ভারতের বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি ছিল অবিভক্ত বাংলাদেশ এবং পূর্ববাংলায়ই অধিক সংখ্যক বিপ্লবাত্মক সংগ্রাম হয়েছে—কাজেই পূর্ববাংলার কথা ভুলে যাওয়া অপরাধ বাঙ্গালীদের বিপ্লবের ধারাবাহিকতা ছিল, পাঞ্জাব মহারাষ্ট্রে ও বিপ্লবী সংগ্রাম হয়েছে বাংলার তুলনায় এই সব সংগ্রাম নগণ্য। পূর্ববাংলার ৮ কোটি মানুষই বিপর্য্যস্ত তার মধ্যে ১ কোটী সংখ্যালঘুর জীবনের কোন নিরাপত্তাই নেই।

দেশভাগের সময় জাতীয় নেতৃত্বের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে ও পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি:—

খণ্ডিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে জওহরলাল নেহেরু জোর গলায় বলেছিলেন—পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সরকার যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করবে। যারা উদ্বাস্তু হয়ে আসবে তাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে। ধর্মের ভিত্তিতে যখন দেশ ভাগ হল—তখন লোক বিনিময় হওয়া উচিত ছিল—জওহরলাল তা করতে দিলেন না। উভয় পাঞ্জাবের লোক বিনিময় হল, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হিন্দুরা ও সিন্ধু প্রদেশের হিন্দুরা প্রায় সকলেই একসঙ্গে চলে এল। পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানরা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেল—কিন্তু পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে অন্য রকম ব্যবস্থা—বাঙ্গালীর ক্ষেত্রে তথাকথিত সেকুলারইজিম্ বড় করে দেখা দিল।

পূর্ববাংলা থেকে প্রায় এক কোটি হিন্দু সকল রকম সম্পত্তি ফেলে চলে এল—পাঞ্জাবের বেলায় লোক বিনিময় হয়ে সম্পত্তি বিনিময় হল। সীমান্ত প্রদেশকে জোর করে পাকিস্তানে ঠেলে দেওয়া হল—বাদশা খাঁন আবদুল গফফুর খাঁনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হল। সীমান্ত প্রদেশের প্রতিটি জাতীয়তাবাদী ছাত্র নেতাকে মুসলীম লীগ সরকার জেলে পাঠালেন। বাদশা খাঁনের পরিবারের সকলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। জওহরলাল, প্যাটেল রাজা উজীর হলেন। বাদশা খাঁন স্বাধীন সার্বভৌম সীমান্ত প্রদেশ চাইলেন—ইংরেজ ও মুসলীম লীগ রাজী হল না—কংগ্রেস নেতৃত্ব আত্মসমর্পণ করলেন—ক্ষমতার লোভে। ভোট নেওয়া হল—উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানে যাবে না—ভারতে আসবে—বাদশা খাঁন এই ভোট বর্জন করলেন—তিনি বলেছিলেন স্বাধীন পাখতুনীস্তান (স্বাধীন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) সেই ধরণের ভোট হল না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানে গেল।

আজ কেন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিধাগ্রস্থ নীতি—কেন দণ্ডকারণ্য থেকে উদ্বাস্তুরা ফিরে আসছে। ৩০ বৎসর ক্ষমতায় থেকে কেন কংগ্রেস পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন করলেন না—কেন কেন্দ্রীয় জনতা সরকার একই নীতি অবলম্বন করেছেন—এরা বাঙ্গালী এই অপরাধে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতিও মনে পড়ছে না কেন ?

জিয়া-সরকারের হিন্দুবিদ্বেষ নীতি ও গণতন্ত্রবিরোধী নীতি :—

বাংলাদেশে তথাকথিত একটি ভোটের প্রহসন করে জিয়া রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন। দেশের প্রেসিডেন্ট হলে আর দল করা যায় না। আগামী ডিসেম্বর মাসে নাকি বাংলাদেশে সাধারণ নির্ব্বাচন হবে। জিয়াউর কি নির্ব্বাচনে নিরপেক্ষ থাকবেন ? সংখ্যালঘুদের চাকুরী হয় না; মেয়েদের মান ইজ্জত থাকছে না, সংখ্যালঘুরা ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ পায় না তবু জিয়া আমাদের বন্ধু ভারত সরকারকে বাংলাদেশ সম্পর্কিত নীতি ও উদ্বাস্তু সংক্রান্ত নীতির পরিবর্ত্তন করতে হবে। খণ্ডিত স্বাধীনতার পর যে তিন বার পাকিস্তানে গেলাম—তিন বারই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলাম—১৯৪৮, ১৯৫২ সাল (ছয় মাস, দুই বৎসর), ১৯৬২ সালে তাবা আন্দোলনে আমাকে জড়িত করে দুই বৎসর আটক রাখা হল, ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রামে ছাত্র সম্মেলনে যোগদান করতে গিয়ে আমাকে প্রায় ছয় মাস কারা বরণ করতে হল। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে গিয়ে পর পর তিনটি সরকার পরিবর্ত্তন করে জিয়া সরকারের আমলে গ্রেপ্তার করা হয়—পাঁচ হাজার টাকা খেসারত দিয়ে মুক্তি পাই। এই স্বাধীনতাই কি আমরা চেয়েছিলাম। আমরা ভিয়েৎনাম, এঙ্গোলা, মোজাম্বিক, দঃ আফ্রিকা, রোডেসিয়ার মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করেছি—আরো করব—কিন্তু বাংলা দেশের মত হত্যায় নীরব থাকব কেন ?

স্বাধীন বাংলার স্রষ্টা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সপরিবারে সাম্রাজ্যবাদীদের দাসানুদাস ঘাতকদের হাতে নিহত হলেন, বিশ্ব বিবেক নীরব কিন্তু আমরা কি নীরব থাকতে পারি। বাংলাদেশের সেরা জননেতা চতুষ্টয়, তাজুদ্দীন, সৈয়দ নজরুল, মনসুর আলী; কামারুজ্জামান কারাগারে বন্দী দশায় নিহত হলেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ নীরব কিন্তু আমরা কি নীরব থাকতে পারি। বিশ্ব আদালতে দোষী দের বিচার হবে না। বাংলাদেশের বিরোধী দলগুলি আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, বাংলাদেশ সমাজতন্ত্রী দল ও অন্যান্য দলগুলি বলছে :(১) ৩০ হাজার রাজ বন্দীদের মুক্তি দাও (২) হত্যাকারীদের বিচার কর (৩) বাংলাদেশের ধর্ম্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখো :(৪) ভোট নিরপেক্ষতা বজায় রাখো (৫) দ্রব্য মূল্য আয়ত্বের মধ্যে আন—নতুবা নির্ব্বাচন বন্ধকর। তাই বলছি বাংলাদেশ সম্পর্কে আমাদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

ও

সবাইকে পড়ান—

ইতিহাসের পাতা থেকে

[সংকলন]

ঝন্টু দাস।

ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি মানুষ আজ ভুলতে বসেছে যে দেশ একদিন পরাধীন ছিল। অনেক রক্তস্রোত পাড়িয়ে এসে আমরা স্বাধীনতার বেদীমূলে দাঁড়াতে পেরেছি। যারা রক্ত দিয়ে স্বাধীন দেশ গড়ে দিলেন তাদেরকে বাদ দিয়ে তো দেশের ইতিহাস লেখা চলে না। তাদের অবদানকে ভুলে যাওয়াও অন্যায়। বারবার তাদের স্মরণ করতে হবে। তাদের কথা মনে রাখতে পারলে পরাধীন দেশের ইতিহাসও আমাদের মনকে বারবার নাড়া দিয়ে যাবে। তবেই না আমরা রক্ত দিয়ে গড়া সেদিনের স্বাধীনতাকে জাগিয়ে রাখতে পারব। সেই জন্য দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবীগণ সেদিন যা শুনিয়েছিলেন ইতিহাসের পাতা থেকে বারবার তা পড়তে হবে। জানতে হবে। মনে রাখতে হবে।

"নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর। নেতৃত্বের এই পাশব প্রবৃত্তি জীবন সমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়াছে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

"পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে মুক্তি সংগ্রামে বিদেশীদের অপেক্ষা দেশের মানুষদের সঙ্গেই মানুষকে বেশী লড়াই করিতে হয়। এই লড়াইয়ের প্রয়োজন যেদিন শেষ হয় শৃঙ্খল আপনি খসিয়া পড়ে।"

—শরৎচন্দ্র

"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?"

—রবীন্দ্রনাথ

"বন্দে মাতরম্—
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

"মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত,
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপান ভীম রণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।"

—নজরুল ইস্‌লাম

"নেতা যখন সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে চলতে পিছিয়ে পড়বেন, তখন তাঁর একমাত্র পথ হওয়া উচিৎ সরে দাঁড়ানো। তাঁর বদলে তিনি যদি দাবি করেন যে, যেহেতু তিনি নেতৃত্বে আছেন তাঁর জন্য জগতের গতি স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করবে, তাহলে সেই চাহিদা হবে তেমনই, যার বিরুদ্ধে মানুষের বিবেক বা বিচারবুদ্ধি বিদ্রোহ করে।"

—ঋষি অরবিন্দ

"লক্ষ লক্ষ লোক যাহা ভোগ করিতে পায় না, তাহা অর্জনের দৃঢ় অঙ্গীকৃতিই শ্রেষ্ঠতম বিধান।"

—মহাত্মা গান্ধী

"Freedom is my birthright and I demand a recognition of that right not by instalments nor in compertments but whole and entire."

—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

"I was a fighter, one fight more, the last and the best. Death is for all and we shall die the death of a hero.

—রাসবিহারী বসু

"Be earnest. Let freedom be the thought of your day and the dream of your right. Let the sons and daughters of India gather under her national standard and with 'Equality and Fraternity' as their battle cry. March onward, unceasingly, tirelessly, towards the free life of a free India, undaunted by calamity, unmoved by the wrath and repression of the powers that be. Do not despair. Marshall all your forces and no power on earth can resist your triumphant march to the promised land of the Great India of the future, an India welded and federated into a powerful nation"

—দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

"ভুলে যেওনা যে, দাসত্বের চাইতে বড় অভিশাপ আর নেই। ভুলে যেওনা যে, অন্যায় আর দুর্নীতির সঙ্গে আপস করার চাইতে বড় অপরাধ আর নেই। মনে রেখো, জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে পেতে হলে জীবনের বিনিময়েই তা পেতে হবে। মনে রেখো, সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতিকে স্বীকার করে নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।"

—নেতাজী সুভাষ

"If icy hands of death give you a touch before the goal is reached, then give the charge of your further pursuit to your followers as I do to-day. Onward, my Comrades, onward—never fall back".

—মাষ্টারদা সূর্যসেন

"আজকের যুগে দেশের মেয়েরা স্থির প্রতিজ্ঞ যে, তাঁরা আর পিছিয়ে থাকবেন না। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাইদের পাশে এসে তাঁরাও দাঁড়াবেন। যেকোন কাজ করে যাবেন, হোক সে কাজ যতই কঠিন বা বিপজ্জনক। আমি তাই সাগ্রহে কামনা করি যে, আমার বোনেরা আর তাঁদের কে দুর্বল মনে করবেন না। তাঁরা হাজারে হাজারে ছুটে আসবেন দুঃখ-কষ্ট, দুর্যোগ ও ভয়ঙ্করকে বরণ করার আনন্দে।"

—প্রীতিলতা ওয়াদ্দার

"পরাধীন ভারতেও পরম আদরের সন্তানেরা শৃঙ্খলিত মায়ের দুঃখ বেদনা দূর করতে নিজেদের মায়ামর স্নেহময় সংসারকে আপন হাতে চূর্ণ করে দিয়ে নিজেরা অমনি করেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের জন্য স্বর্গ রচিত হোক ইতিহাসের অক্ষয় পাতায়। ত্যাগের পরাকাষ্ঠায় সেই সব শ্রেষ্ঠ সন্তান আমরা যেন ভুলে না যাই।"

—কমলা দাশগুপ্ত

"My subject was to die, and if to die, to die nobly fighting against this despotic system of government which has kept 300 million of people of my country in perpetual subjection to its infinite shame and endless suffering."

—বীণা ভৌমিক

"এ যুদ্ধ থামবে না, যতদিন না সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যতদিন না আজকের প্রচলিত সর্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটিয়ে কল্যাণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। যত দিন না বিশ্বের সমগ্র মানব সমাজে শান্তির যুগের সূচনা হয়। অতি শিগ্‌গীরই এ সমস্যা সমাধানের জন্য শেষ সংগ্রাম শুরু হবে।"

—ভগৎ সিং

"My only prayer to God is that I may be reborn of the same Mother and I may re-die for the same sacred till the cause is successful and she stands Free for the good of humanity."

—মদনলাল ধিংড়া

"I have seen people starving in India under Britis Imperialism. I am not sorry for protesting. It was my duty to do so just for the sake of my country. I do not mind what sentence ten-twenty or fifty years, or be hanged."

—উধম সিং

"আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ভারতে নৈরাশ্য দূর করা ও আশার আলোক-বর্তিকা হাতে নিয়ে দেশ এক বলিষ্ঠ নেতৃত্বের এগিয়ে আসা। যুব সমাজকে এই নেতৃত্ব দিতে হবে। তাই চাই ভারতের মুক্তিপথ যাত্রী পূর্বার অভিযানে আত্মত্যাগ ও বলিষ্ঠ বিশ্বাসের ঐতিহাসিক কাহিনী ও কীর্তিগাথায় যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা।"

—দেবনাথ দাস

"একটা জাতি যখন জাগে, তখন হটাৎ জাগে না। অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালিলে হটাৎ যেমন সমস্ত ঘর আলোকিত হয়, সেই রূপ কোন যাদুমন্ত্রে হটাৎ কোন সুপ্ত জাতির তমিস্রা রজনীর অবসান হয় না। জাতি জাগে ধীরে ধীরে। তার পিছনে থাকে বহু নীরব নিঃস্বার্থপর কর্মীর বহুদিনের সাধনা।"

—মহারাজ ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী

"যার যাবে জীবন চলে
জগৎ মাঝে তোমায় কাজে 'বন্দেমাতরম্' বলে,
বেত মেরে কি মা ভোলাবি,
আমরা কি সেই মায়ের ছেলে?"

—কালিপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

"মানুষকে ভালোবেসে অন্ধকার ভেঙে
সূর্য আনে যেই
দু চোখে তার স্বাধীনতা—স্বাধীনতা
যেন এক অতলান্ত স্বপ্নের ঢেউ।"

—নীরদ রায়

"সংসার সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে
ভয়ে ভীত হ'য়ো না মানব ;
কর যুদ্ধ বীর্যবান যায় যাবে যাক প্রাণ
মহিমাই জগতে দুর্লভ।"

—বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

"ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়
ওদের কাহিনী বিদেশীর খুনে
গুলি বন্দুক বোমার আগুনে
আজো রোমাঞ্চকর।"

—সুকান্ত

ক্ষীরোদ কুমার দত্ত প্রণীত

বিপ্লবী পুস্তকমালা

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১·৫০
২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮·০০
৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২·০০
৪। দৌত্যালী সংগ্রাম কাহিনী—১·০০
৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১·২৫
৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—·৪০
৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—·৮০
৮। স্বাধীনতার শহীদ মা ও মেয়ে—·৩০
৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—·৬০
১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—·৫০
১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—·৪০
১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—·৭৫

হেলিকপ্টারে বন্যা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করে এসে গ্রুপ ক্যাপ্টেন কে, কে, সেন সাংবাদিকদের বললেন "আটাল বহুল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মহীর বাঁধের গ্রামগুলি একেবারে সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। ওখানে কখনো মানুষ বাস করত বলে মনে হয় না।" সাংবাদিক 'তার' পাঠালেন, আটালে পনেরো হাজার অধিবাসী বন্যার জলে ভেসে গেছে [washed away]

সেই সময়টায় লোড শেডিং নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিদ্যুৎ হরণ ঘাড়ে নেওয়ার পর রাত্তিরে তাঁর ঘুমোতে পারেন না। নিত্যি স্বপ্ন দেখছেন বন্যার কবলে ১৫ লাখ টন কয়লা ভিজে গেছে। ব্যাকেল পাওয়ার স্টেশন বন্ধ হয়ে গেছে। গরমে আর দুঃস্বপ্নে, ঘেমে

কল্কি অবতার

শ্রী সতীভূষণ সেন

একেবারে নেয়ে উঠেছিলেন। সকালে কাগজ খুলতে চোখে পড়ল আটালের নিদারুন সংবাদ। কাগজ ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন, হাঁকছেন, কোই হ্যায়। ঘরে ঢুকে আসে সেই চৌকিদারকে যে ১৫ হাজার জলে ভাসা মানুষ গুনেছে বলে মাথা ঠাণ্ডা হওয়ার পরে, ছুরি খুলে তাঁর শেষ অস্ত্র বের করলেন। যুদ্ধ কালীন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে' ত্রাণ কার্যের নির্দেশ দিলেন।

এই একটা কথা আজকাল হরদম শোনা যায়। 'যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে। বন্যা ত্রাণে বলুন, দারিদ্র সমস্যা সমাধানে বলুন, আর বেকারী দূরীকরণেই বলুন, আমাদের নেতারা যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে কাজ করার প্রতিজ্ঞা করেন। পাছে দেশের লোক মনে করে তাঁরা একদল নপুংসক, কাঁকি দিয়ে শাসনভার অধিকার করা ছাড়া, আর কিছু করার মুরোদ নেই তাই সময়ের সামনে পড়লেই হরদম যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেন।

ধরুন এই বন্যাত্রাণের কথা। সর্বত্রই যুদ্ধকালীন জরুরী কাজ হচ্ছে। কোথাও পর্যাপ্ত ত্রাণ হয়েছে বলে শুনিনি, একমাত্র নয়া দিল্লী ছাড়া। তা, রাজধানীর কথা স্বতন্ত্র। সেখানে দেবতাদের বাস। অতি যা হয় তার দশগুণ সাহায্য পৌঁছায়। শুনেছি ত্রাণ সামগ্রীর বন্যায় এখন রাজধানী ডুবুডুবু। আর এদিকে দেখুন আটাল থেকে মালদা গোটা দেশটায় কোটিখানেক মানুষ জলবন্দী, কয়েকটা হেলিকপ্টার উড়ে কয়েক প্যাকেট খাদ্য নিক্ষেপ করলেই কি আর্ত মানুষের পেটের খিদে মরবে, না চোখের জল শুকোবে? সাময়িক বাহিনীকে 'ত্রাণে লগ' বলে অনুরোধ করলেই কি, আপনার কাজটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো? ত্রাণের সামগ্রী কি পৌঁছে দিতে হবে না? 'বিল অব লোডিংএর তিনশো টন, আসল ওজনে অন্ততঃ দুশো টনের কম না হয় সেটাও তো দেখতে হবে।

বন্যা যেমনি হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ নেমে যাবে। যারা অসময়ে আজীবন খাবি খাচ্ছিল, তারা মরে বেঁচে যাবে। যার যে সর্বনাশ হওয়ার ছিল, তা হয়ে চুকে বুকে যাবে। তারপর রিলিফ আসতে সুরু করবে। দলবাজীর অভিযোগ উঠবে, তবু দুর্গত মানুষরা দু মুঠো তো পাবে। কিন্তু দেশব্যাপী যে বিপুল দরিদ্র সমাজ, যাদের কাছে দুদিনের দুর্দশা ও দুর্দিনের সঙ্কটে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, তাদের কথা এখন একবার ভাবুন; নইলে পরে ভুলে যাবেন। এতদিন জনসভায় মঞ্চে উঠলেই তো চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়েছেন, এখন সুস্থ মাথায় ভেবে দেখুন তাদের জন্য কি করেছেন এই দেড়টা বছরে। আপনি আমাদের পালক ভাই আপনাকেই সুধোচ্ছি।

ভেবে দেখুন কি নেই আমাদের দেশে। জনপ্রতি আমাদের চাষের জমি জাপানের পাঁচগুণ; চীনের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। আমাদের খনিজ সম্পদ, কয়লা লোহা ম্যাঙ্গানিজ মাইকা প্রকৃতি সকল, বিশ্বের অন্য দেশগুলির হিংসার উদ্রেক করে। যে জলবিদ্যুৎ এ যুগের শিল্পায়নের মূলভিত্তি বাহন, সেই বস্তুটির প্রাচুর্য আমাদের মত কারও নেই। আমাদের বিজ্ঞানী এনজিনিয়ার ডাক্তার ইকনমিষ্ট ফিলসফার এবং রাজনীতিবিদের শক্তি বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত। কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ড লণ্ডন থেকে শুদ্ধিকে

শিকাগো হারভার্ড পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বাৎসরিক ফলাফলের হিসাবের দিকে চাইলে দেখবেন প্রথম দশজনের মধ্যে আমাদের ছেলেমেয়েদের নাম। ভারতের শ্রমিক ও কৃষক, আমেরিকা বা সোভিয়েট দেশের শ্রমিক বা কৃষকের চেয়ে কোন অংশে খাটো নয়। বরং অনেক বেশী পরিশ্রমী। তবু আমাদের দরিদ্রতা দিন দিন দরিদ্রতর হয় কেন? ভাণ্ডারে নেই কি আমাদের? ধনদৌলত কোথায়?

অবস্থা তো আগে এমন ছিলনা। মধ্যযুগে বিদেশী পর্যটক যারাই এদেশে এসেছেন, তারাই আমাদের প্রশংসা করেছেন। বলেছেন কী কৌশলী এদেশের কারিগর, কী সুন্দর তাদের উৎপন্ন দ্রব্য! কী ফলত নয় সামগ্রী! সে যুগে রোম সম্রাট কন্‌স্টানটাইন জাহাজ বিশ্বাসের অর্ডার দিতেন আমাদের জাহাজী ইয়ার্ডে। ইহুদীদের 'কিং সলোমন' মসিমুক্তা আইভরি বিনতে প্রতিনিধি পাঠাতেন ভারতে। আমাদের মসলিন ইউরোপের সম্রাজ্ঞীদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করত। এদেশের মসলা রোমের বাজারে সোনার দরেই বিক্রয় হত। তবে আজ কেন পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ, বিদেশীর কৃপার পাত্র! কেন আমাদের বেকারের সংখ্যা দিন দিন শুধু বাড়ছেই। কেন আমাদের আর্থিক পরিকল্পনা অবশ্যই সত্ত্বেও যে কয়টি যন্ত্র যারা এদেশে আমাদের প্রবেশ করছে, তাদের অন্তত কাজ দান করতে পারছি না? পঞ্চবার্ষিকী-বেকারিকীর কথা তো কথাই আসে না। কেন, কেন, কেন?

প্রধান মন্ত্রী চার্চিলের প্রশ্ন করার পরে কাঁকালো এক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাষণ দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, যুদ্ধকালীন অবস্থার ভিত্তিতে কাজ আরম্ভ করে দশবছরের মধ্যে দেশ থেকে বেকারী নির্ব্বাসিত করবেন। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করবেন দেশ। এই দেড় বছরে অবস্থার যে কিছুমাত্র উন্নতি হয়েছে- দেখে তো মনে হয় না। আজ জ্যোতিষবাবু বজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। আর আমরা দেখলাম রিলিফের ডিমিসপত্র লড়াইয়ের কারখানায় হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। মোরারজী একখানা মূল্যবান বন্ধন উপহার দিয়েছেন আমাদের, তার নাম ষষ্ঠ পরিকল্পনা। বেকারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রণকৌশল প্রচার করেছেন। দেখছি সেও এক হাওয়াই বেলুন। ও সব হাই ফিনান্সের ব্যাপার, আমাদের মাথায় ঢোকে না। বেলুন আপনি যদি বুঝতে পারেন।

যোজনা পরিষদ প্রস্তাব করেছেন যে সেবার ইনটেনসিভ (Labour intensive) ফ্যাক্টরী স্থাপিত করবার শিল্প-পতিদের উৎসাহী দেওয়া হবে। অতি উত্তম প্রস্তাব, বিশেষতঃ যখন প্রতিটি কর্মীর জন্য দৈনিক মজুরীটাকা হিসাবে ভর্তুকী দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবটি অনুমোদিত হওয়ার পর, আমাদের এক বন্ধু একটি কোম্পানী রেজিষ্ট্রী করবেন বলছেন। দৈনিক দশ টাকা মাইনে মাত্র এক হাজার কর্মী নিয়োগ করবেন। কুড়িটাকা মাইনের রসিদে সই করতে ওঁদের আপত্তি হওয়ার কথা নয়, কাজ যখন কিছুই করতে হবে না। কোম্পানীর দৈনিক দশ হাজার টাকা নিট লাভ হবে। বিশ্বাস না হয় হিসেব করে দেখুন। যে দেশে প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে ভূতুড়ে কর্মী এবং অফিসে অফিসে ভূতুড়ে কোম্পানী বিরাজ করছে, সেখানে এমন সুযোগ কি কেউ ছাড়বেন?

প্রাচীন কাল থেকে ভারতের একটা নিজস্ব অর্থনীতি ছিল, এবং সেখানে এইসব আমদানী জীয়ের দরকার হত না। আমাদের অর্থনীতি কখনো একচেটিয়া কৃষি নির্ভর ছিল না; দেশের জনসাধারণ পূর্ণ মাত্র গ্রামীণ শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনে। এক এক অঞ্চলে এক একটি শিল্প ছিল প্রধান। রপ্তানীর প্রধান দ্রব্য ছিল ধান এবং শিল্পজাত দ্রব্য ছিল সুতী ও রেশমের কাপড় এবং চিনি। দেশের পুরো-পুরি চাহিদা মিটিয়ে এই সব দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হত। রাজা মহারাজা, নবাব বাদিয়রা ছিলেন রপ্তানী ব্যবসায় পেছনে। সবটুকু তারাই খেতেন। বিদেশী পর্তুগীজও ইংরেজ ব্যবসায়ীরাও স্থানীয় জমিদার ও নবাবদের সহায়তায় জলের দামে এই সব মাল ক্রয় করত। উত্তরের বৌথ প্রতিষ্ঠান বিদেশে এই মাল বিক্রয় করে প্রচুর লাভ করত। উত্তরের বৌথ প্রতিষ্ঠান বিদেশে এই মাল বিক্রয় করে প্রচুর লাভ করত। দেশের চাষী ও কারিগরী ন্যায্য দাম পায় নি বলেই আজও তারা গরীব হয়ে গেছে। অথচ

হয়েছেন কয়েকজন মাত্র স্বদেশবাদী, যারা বিদেশী বণিকের দালালী করেছেন।

এই অবস্থা পালটে যাবে দেশ স্বাধীন হলে, এই ছিল আমাদের আশা। নইলে আমরা কেউ লাট সাহেবের গদীতে এঁটে বসবো এটা কল্পনা করিনি। ভেবেছিলাম দেশ স্বাধীন হলে তখন কেউ আর অন্যের ক্ষতি করে নিজের স্বার্থ সাধন করতে পারবে না। আমরা কেউ চাকরী করব কেউ বাণিজ্য, যার যেমন সুযোগ ও অভিরুচি। বেকার কেউ থাকবো না, উপোষও কেউ করব না। অবশেষে একদা আনন্দের পরিবর্তে ত্রাসের মন্ত্র দিয়ে সুরু হল স্বাধীনতার যাত্রা, যেটা অনতিবিলম্বে ভয়াবহতে পর্যবসিত হল।

সাহেবদের আমলে যেসব সরকারী কর্মচারী ছিলেন তাদের অনুগত, পরেও যে আবার চোল বদলিয়ে আমাদের মাথায় ছড়ি ঘোরাবেন, এটা ছিল আমাদের কল্পনার বাইরে। তারা শোষণ করতে জানতেন ঠিকই (তার চিহ্ন এখনো অঙ্গে ধারণ করছি), আর কিছুই জানতেন না। এদের কি উচিত ছিল না খেতাঙ্গ কর্মচারীদের মত নিবেদন করা "পণ্ডিতজী, আমরা শিখেছি আপনাদের বুটের নীচে থাকবার কৌশল, সেলাম করার কায়দা শিখিনি। ও জিনিষটি পেয়ে উঠবো না।" পরিবর্তে আমাদের এরা সমস্বরে চীৎকার করে উঠলেন, "মহাত্মা গান্ধী কি জয় !" গলায় টাই ছিঁড়ে ফেলে খাদির কষ্টী ধারণ করলেন এবং পাতা পেড়ে বসে গেলেন মহোৎসবে। নেহেরুও পদে দিয়ে তাদের উপরেই দেশ গঠনের ভার ছেড়ে দিলেন। তাঁর নিজের কাজ রইল বক্তৃতা দিয়ে দেশে দেশে বেড়ানো। তখন চারদিকে সুরু হল 'পলিটিকস্'-এর পাঁয়তারা। আর আমাদের হারাধনের দশটি ছেলেই একে একে 'পলিটিকস্'-এর পাঁকে ডুবে গেলেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন গণতন্ত্রের সঙ্গে দুর্নীতির অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ। যাকি স্বাধীনতা যে দেশে যত বেশী, দুর্নীতির সেখানে তত প্রাদুর্ভাব। যেমন কিনা আমেরিকায়। দুর্নীতি যে শুধু নিজের পকেট ভারী করা তা নয়। বহু রূপে সেটি বিরাজ করে। এর আর একটা রূপ স্বজন পোষণ। সব দেশেই এ বস্তু কিছু না কিছু আছে, তবে আমাদের দেশের মত কোথাও নেই। আমাদের 'প্রিন্স অব ওয়েলস্'রা যেমন রোজ খবর কাগজের পাতা জুড়ে থাকেন, দুনিয়ার কোথাও অমনটি পাবেন না। আর এক জাতীয় দুর্নীতি হচ্ছে ধনতান্ত্রিক, বিলেতে যাদের ঘৃণা করে বলা হয় fatcat। আমরা আদর করে বলি, 'আয়া রাম গয়া রাম'। শেষ দুর্নীতিটি হচ্ছে কর্তব্যবিমুখতা, যা এদেশে সর্বব্যাপী হয়ে বসেছে। হবে নাই বা কেন, আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের ফিরিস্তি আছে, মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখমাত্র নেই। অথচ রাজনীতির গোড়ার কথাই হল কর্তব্য, তার পরে অধিকারের স্থান। আমরা বিপ্লবীরা এক সময়ে তাই শিখেছিলাম এখন ভুলতে বসেছি।

আমাদের রাজনীতির মধ্যে দুর্নীতির প্রবেশ স্বাধীনতার সেই প্রথম উষাতেই। তবে নেহেরুর সময়ে সেটা সীমার মধ্যে ছিল। ভালপালা ছড়িয়ে মহীরুহ আকার ধারণ করেছে নেহেরুর তিরোধানের পরে। সমাজজীবনের রক্তে রক্তে আজ দুর্নীতির মূল প্রবেশ করেছে। আগে বলেছি পলিটিকসএর সকলের প্রথমে থাকে কর্তব্য, তার পর আসে অধিকার। পলিটিকিং-এ সকলের উপরে অধিকার, কর্তব্য তার অনেক নীচে। তাই দেখতে পাই শিল্পজগতে স্ট্রাইক, লকআউট ও ঘেরাও এর স্থান সকলের উপরে, উৎপাদনবৃদ্ধি নিয়ে কারও দুশ্চিন্তা নেই। ফলে শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হয় না। বেকার শ্রমিক কাজ পায় না, শুকনো মুখে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। কৃষি শ্রমিকেরও ঐ একই হাল। চাষের জমির বেশীর ভাগই একফসলা, বছরে আট মাস পতিত পড়ে থাকে। জল সংরক্ষণ ও সেচের প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না কয়েকজনের পলিটিকস-এর দৌরাত্ম্যে। জাতীয় সম্পদ যে পরিমাণ বাড়ার কথা, বাড়ে না।

ক্ষুব্ধিত উচ্ছৃঙ্খল জনতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। পথে পথে বেরিয়ে পড়েছে বেকার যুবকের দল, তাদের দেহনে দুর্বার ব্যর্থ মধ্যবিত্ত। শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জাতে জাতে

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীকীরোদ দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চন্দননগরে মিলিত বিপ্লবী সংহতিতে বিপ্লবী-দের মধ্যে আলোচনা চলছিল কর্মসূচী নিয়ে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের রাসবিহারী এবং শ্রীশ ঘোষ, অনুশীলনে প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী এবং কাশীর শচীন্দ্র নাথ সান্যাল। রাস-বিহারী কথাটা প্রথমে তুললেন। তিনি বললেন, ১৯০৬ সাল থেকে আমাদের বৈপ্লবীক কার্য্য আরম্ভ হয়েছে এতদিন পর্য্যন্ত আমরা ছোট খাট হত্যাকাণ্ডের মধ্যদিয়ে বৈপ্লবীক আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে চলেছি এবং বৈপ্লবীক সংহতির জীবন রক্ষা করে সম্প্রসারণ কার্য্য চালিয়ে যাচ্ছি। এবারে আমাদের আরও একটি বড় রকম কাজে হাত দেওয়া উচিত। প্রতুল গাঙ্গুলী, শচীন সান্যাল সবাই এপ্রস্তাব সমর্থন করলেন। শ্রীশ চন্দ্র বললেন, বড় কাজ যদি করতেই হয় তবে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজকর্মচারী বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকেই হত্যা করা যাক না কেন। কথাটা বলা মাত্রই সবাই যেন লুফে নিল। মিলিত পরামর্শে অল্পক্ষণের মধ্যে স্থির হল বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকেই হত্যা করা হবে। কিন্তু সন্ধান নিয়ে জানা গেল বড় লাট তখন কলকাতায় নাই। লাটের ভ্রমণ সূচী এনে আলোচনা করে দেখা গেল তিনি কয়েক দিনের জন্য বোম্বাই গিয়াছেন। তিন চার দিন পরে. কলকাতায় ফিরবেন মেদিনীপুরের পথে। প্রস্তাব হল এই পথেই কোন স্থানে লাট সাহেবের গাড়ী বোমার আঘাতে উড়িয়ে দেওয়া হবে। পরিকল্পনা শেষে রাসবিহারী শ্রীশচন্দ্রকে সম্বোধন করে বললেন' "শিরে, তোর বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। ছোটখাট মেরে হাত দুর্গন্ধ করার

[৩২ পাতার শেষাংশ]

সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিন দিন বাড়ছে। লড়াইয়ের উত্তেজনা ও ঘূর্ণিতে সামাজিক জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পেয়ে যাচ্ছি। আইন শৃঙ্খলা, ন্যায় অন্যায়, মানবিকতা ও পাশবিকতা, সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। যে চিরন্তন বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের নোঙর সমাজজীবনকে স্থিতিশীল রাখে, সেটিও আজ ছেঁড়ে পড়বার মুখে।

সাথে সাথে এই রকম গ্লানিরেই কবিদের আবির্ভূত হয়। নাইক হাতে ঘোষণা করেন, "জনগণের দুর্দশা লাঘবের জন্য যে পথ ধরে এতদিন চলেছ, সেই পথকের পথ তোমাদের লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারবে না। ভিন্ন পথ ধরতে হবে, সে পথ আমি চিনি। এসো আমার সঙ্গে।" —সেই উদাত্ত আহ্বান যদি কানে আসে, তখন কি পুরানো আদর্শ-মার্কা নেতাদের হাঁকিয়ে দিয়ে বলব, "চুলোয় যাক তোমাদের গণতন্ত্র আর ব্যক্তিস্বাধীনতা?" তখন কি সেই দুর্ধর্ষ, দৃঢ় সংকল্প, বিচক্ষণ নায়কের পেছনে স্থির পদক্ষেপে অগ্রসর হব, যিনি যে কোন উপায়ে কাজ আদায় করিয়ে নেবার শক্তি রাখেন?

ভারতের সেই দিন কি আগতপ্রায়?

চেয়ে—মারি তো হাতী লুটি তো ভাণ্ডার। লর্ড হার্ডিঞ্জেরই প্রাণ যেন আমরা এই আমাদের সঙ্কল্প। বাল্যবন্ধু শ্রীশচন্দ্রকে রাসবিহারী শিরে বলে ডাকতেন। এরপরে রাসবিহারী তার হাতের ক্ষত স্থানটি উড়ানী দিয়ে হাসতে হাসতে স্থান ত্যাগ করলেন।

এই সময় বিপ্লবী সংহতির সমস্ত বোমা একমাত্র চন্দননগরেই তৈরী হত। এখান থেকেই বোমা প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হত। প্রথমে পরিকল্পনা করা হল চন্দননগর থেকে একটা বোমা নিয়ে কাশী সংগঠনের কর্মী হিরণ্ময় ব্যানার্জীকে মেদিনীপুরের পথে বাঁকিপুরে পাঠানো হবে। হিরণ্ময় ব্যানার্জীকে কাশী থেকে নিয়ে আসা হল তিনি এসে অনুশীলন সমিতির রাজাবাজার কেন্দ্রে ২৯৬/১ আপার সারকুলার রোডে উঠলেন। এই রাজাবাজার কেন্দ্র থেকেই হিরণ্ময় ব্যানার্জী বোমা নিয়ে রওনা হয়ে যান। সাতই ডিসেম্বর বোমা বিস্ফোরণ ঘটল মেদিনীপুর থেকে কিছু দূরে। কিন্তু এই বিস্ফোরণ সফল হল না।

১৯১৩ সালের ২১ নভেম্বর রাজাবাজারে ২৯৬/১ আপার সারকুলার রোড ভবনটি তল্লাসী হল। এখানে অমৃত হাজরা ওরফে শশাঙ্ক হাজরা সারদা গুহ এবং চন্দ্রশেখর দে গ্রেপ্তার হলেন। এর কয়েক দিন পরেই ৬ই ডিসেম্বর কালীপদ ঘোষ ওরফে উপেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী গ্রেপ্তার হলেন কলেজ স্কোয়ারে। তিনি বিপ্লবী দলের স্বাধীনতা পত্র বা লিবার্টি লিফলেট বিলি করছিলেন। এদের নিয়ে রাজাবাজার ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হল হাইকোর্টের বিচারে তিনজন বিচারকই একমত হয়ে বললেন, 'অমৃত হাজরাই এই ষড়যন্ত্রের নায়ক। ভারতের বাইরে তার হাতের তৈরী বোমা ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তার প্রমান নেই কিন্তু ভারতের নানাস্থানে ব্যবহৃত হয়েছে তা নিশ্চিত।" বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেন, "The circumstance that bombs of this particular type have been used in various places in British India as midely seperate from Lahore, Delhi, Sylhet, Mymensingh and Midnapure points to the conclusion that more than one person is engaged in this transactions. The bombs are not the handiwork of one individual though may be the work of one controlling hand".

বাঙলাদেশে স্বদেশী যুগ আরম্ভ হওয়ার আগেই চন্দননগরে সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায় নামে এক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। বহু তরুণ প্রবীণ এই সমিতি ভুক্ত হয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন প্রবর্তক সঙ্ঘ গুরু শ্রীমতিলালরায়। এছাড়া অন্যান্য সদস্য ছিলেন সাগরকালী ঘোষ, ননীলাল দে, সত্যচরণ কর্মকার, শ্রীষচন্দ্র ঘোষ, কানাইলাল দত্ত, নগেন্দ্র নাথ ঘোষ এবং আরও কয়েকজন। চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র রায় সকলকে উৎসাহ দিতেন। স্বদেশী যুগে আরম্ভেই চারুচন্দ্র চন্দননগরের বিভিন্ন স্থানে স্বদেশী সভায় আয়োজন করতে থাকেন। কলকাতা থেকে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী; বিপিন চন্দ্র পাল প্রভৃতি বাগ্মীগণ এই সকল সভায় গিয়ে বক্তৃতা করতেন। চারুচন্দ্র নিজেও তার গৃহে তরুণদের

নিয়ে বক্তৃতায় তাদের উত্তেজিত করতেন। এর কিছুদিন আগেই অরবিন্দ বারোদা থেকে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং তারপরে বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে কলকাতায় পি মিত্রের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারা দুজনেই কলকাতায় এসে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে বৈপ্লবীক কাজকর্ম আরম্ভ করে দিয়েছেন। ১৯০৭ সালের আগষ্ট মাসে অরবিন্দ নিজেই বারোদার চাকুরী ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় এসে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন এবং তাকে সমিতির ভাইস্ প্রেসিডেন্ট করা হল। চন্দননগর থেকে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর অল্পদিন পরেই এসে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিলেন। বারীন্দ্রকুমার উপেন্দ্রনাথের নিকট থেকে চারু-বাবুর কথা জানতে পারেন। ১৯০৭ সালের বিজয়া দশমীর দিনে বারীন্দ্রকুমার চন্দননগরে গিয়ে চারু-বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রথম দিনে বারীন্দ্র-কুমার সন্ন্যাসীর বেশে গিয়েছিলেন। উভয়ের মধ্যে নানা প্রসঙ্গ আলোচনা হয় এবং পরিশেষে নিজের পরিচয় দিয়ে বারীন্দ্র কুমার চারুবাবুকে জানান যে বাঙলা দেশে ব্যাপক বিপ্লব যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে এবং চারুবাবুকে এই যজ্ঞের হোতার আসন গ্রহণ করতে হবে। চারুবাবু সম্মত হলেন এর ফলেই চন্দননগরে প্রথম বিপ্লবী সংহতির সূত্রপাত হয়।

রাসবিহারী ছিলেন চন্দননগরে এই বিপ্লবী সংহতির একনিষ্ঠ কর্মী শ্রীশচন্দ্র ঘোষের বন্ধু। শ্রীশচন্দ্রের বাড়ী ছিল রাসবিহারীর বাড়ীর নিকটেই। দামোদর নদের অপর তীরে বর্দ্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে ছিল উভয় পরিবারের পূর্ব্বনিবাস। রাসবিহারী এবং শ্রীশচন্দ্র দুজনেই ছিলেন সমবয়সী। এবং ফলে রাসবিহারীর সঙ্গে শ্রীশচন্দ্রের শৈশব থেকেই সৌহার্দ্য জন্মেছিল এবং রাসবিহারী শ্রীশচন্দ্রের বৈপ্লবিক কার্য্যেরও কিছু কিছু সন্ধান রাখতেন। কিন্তু রাসবিহারীর পিতা সরকারী সামরিক বিভাগে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন বলে শ্রীশচন্দ্র এবং চন্দননগরে অন্যান্য বিপ্লবীরা বিপ্লবী সংগঠন সংক্রান্ত অনেক ব্যাপারেই রাসবিহারীর কাছ থেকে গোপন রাখতেন। রাসবিহারী নিজেও যে একথা বুঝতেন না তা নয়। কিন্তু বিপ্লবী সমিতির নিয়ম অনুযায়ী তিনি কোনদিন বিপ্লবীদলে প্রবেশ করবার জন্য অতি উৎসাহী হন নাই। তিনি অন্যপথে বিপ্লবী দলভুক্ত হবার চেষ্টা করেন।

নির্বুদ্ধিতা—না—হৃদয়হীনতা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ব্রহ্মদেশ এবং বাংলার বাহিরের অন্যান্য স্থান হইতে চলিয়া আসা উদ্বাস্তুদের ফেরৎ পাঠাইবার বিষয়টি সরকারী কর্তাদের শিরঃপীড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রিফিউজীরা গোড়া হইতেই সরকারের দৃষ্টিতে একটা উৎপাতবিশেষ। অনেক বছর আগে আমাদের এক মন্ত্রী ছিলেন যাঁহাকে সাধারণে বলিত হাফপ্যান্ট মন্ত্রী। শিয়ালদহ ষ্টেশন তখন দিশাহারা রিফিউজীদের ভিড়ে নরকতুল্য। হাফপ্যান্টবাবু একদিন তাহাদের দেখিতে আসিলে প্লাটফর্মে এবং প্লাটফর্মের বাহিরে যতজন গণ্ডাগড়ি যাওয়া রিফিউজীরা তাহাকে বলিল, হুজুর কর্তা, আমাদের একটা গতি করিয়া দেন। তিনি তালিকা তুলিত করিয়া তাহাদের সাফ কথা বলিয়া দিলেন, তোমরা অন্য দেশের লোক, ফরেনার; আমাদের জ্বালাইতে এখানে আসিয়াছ কেন? নিজের দেশে ফিরিয়া যাও। এই যে কিছু ডোল দিতেছি, তাহার দাওয়াই-এর কিছু ব্যবস্থা করিয়াছি, একান্ত দয়াপরবশ হইয়াই এসব করিতেছি। আমরা আমাদের নূতন রাজত্ব বাঁচাইয়া লইতে দিবারাত্র খাটিতেছি, ইহার উপর অযাচিত উৎপাতের মত তোমরা যেমনই এখানে আসিয়া জিনুকের মত ঠিক দাঁড়াইয়া চলিয়াছ। নিজের দেশে ফিরিয়া যাও, আর বিরক্ত করিও না।

রিফিউজীদের অযাচিত উৎপাত বলিয়া গণ্য করিবার এই মনোবৃত্তি যাদুমন্ত্রের মত আজও শাসকদের আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। পর পর যাঁহারা এরাজ্যের শাসনকর্তা হাতে পাইয়াছেন প্রায় সকলেই তাঁহারা এই দৃষ্টিভঙ্গীকে ধ্রুব ন্যায্য মনে করিয়া আসিয়াছেন এবং সরকারী অক্ষমতা ও অকর্মণ্যতার সব দায়দায়িত্ব রিফিউজী সমস্যার নিরাটত্বের উল্লেখ করিয়া পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। ব্যতিক্রমও অবশ্য যে আছে। বিধান রায় এবং তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অসীম সহৃদয়তা ও সহানুভূতির সঙ্গে উৎপাটিত মানুষগুলিকে হৃদয় বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইলেও একথাই বলিয়া আসিয়াছি যে উদ্বাস্তু সমস্যার ভারে পশ্চিমবঙ্গ তার সুস্থ দেহকে খাড়া করিতে পারিতেছে না। অবশ্য দুঃখের বিষয় এই যে পূর্ববঙ্গাগত জ্যেষ্ঠ বিপ্লবীরাও প্রায় কেহই সমাগত রিফিউজীদের পাশে আসিয়া দাঁড়ান নাই। বর্তমানের সরকারী-কর্তারা ঐ একই বাঁধা সুরের রেশ টানিয়া বলিতেছেন, হতভাগা হইতে ফিরিয়া আসা রিফিউজীগুলাকে ফেরৎ না পাঠান পর্যন্ত তাঁহারা শান্তি পাইতেছেন না। তাঁহাদের কথাবার্তার ভাবে প্রকাশ, এই হতভাগা উৎপাত যত শীঘ্র বিদায় করা যায় ততই মঙ্গল।

কেন এই লোকগুলা বিশ বছর ধরে এভাবে চলিয়া আসিল? বিশ বছরেও নিশ্চয়ই ইহাদের সত্যিকারের পুনর্বাসন সম্ভব হয় নাই। ইহারা নিশ্চয়ই পায়ের নীচে শক্ত মাটি খুঁজিয়া পান নাই। ভারত সরকার এই বাবদে এতকাল

যত টাকা খরচ করিয়াছেন প্রবর্ত্তকদি তাহা যে নানা ভেল নালা দিয়ে বিপুলভাবে অন্তর্হিতগামী হয়েছে, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই। মানুষগুলাকে মানুষ বলিয়া কোন সরকার কখনও বিবেচনা করেন নাই; ইহাদের দেখিয়াছেন হিসাবের খাতায় জীবন্ত সংখ্যা হিসাবে, Statistically। মৃত সংখ্যাগুলি অকস্মাৎ জীবন্ত হইয়া এমনভাবে খাতাপত্রের ভবিষ্যৎ তুচ্ছ করিয়া, সব প্ল্যান প্রোগ্রাম ব্যালান্সশীট ছিঁড়িয়া খেলিয়া বেড়াবার মত চলিয়া আসিবে তাহা কেহই কল্পনা করে নাই। আজ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে দশ বছরের চেষ্টা (এবং অপচেষ্টা) সত্ত্বেও মানুষ হইয়া টিকিয়া থাকা একান্ত অসম্ভব হইয়া পড়াতেই ইহারা চলিয়া আসিয়াছেন। জোর করিয়া কেহ পাঠাইলেও আবার চলিয়া আসিতেছেন।

আমাদের মত সাধারণ শিক্ষিত মানুষেরও প্রচুর দোষ আছে। আমরা কি হতভাগ্যদের এবং অন্যান্য বিদেশ বিভূঁয়ে নির্বাসিত সহোদরের পক্ষে কোন স্বাধীনতার যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছি? তাহারা কেমন আছেন, কি ভাবে তাদের জীবন চলিতেছে, কি প্রকার অসুবিধায় তাঁরা দিনযাপন করিতেছেন—এসব খোঁজ কি আমরা কখনও লইয়াছি? এঁদের পুনর্বাসন ব্যবস্থার মধ্যে ত্রুটি অসঙ্গতি কি আছে বা আছে তাহা নিয়া কখনও কি মাথা ঘামাইয়াছি? বর্ত্তমান কালের সমাজ বহু বৃত্তি সমন্বিত। বহু বৃত্তি সমন্বিত সমাজের সমাজত্ব উৎকর্ষ কি ঐ সব নির্বাচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং দূর বিক্ষিপ্তবিচ্ছিন্নভাবে গোটিয়া পাইয়াছেন? উহাদের আবার দেখা পাঠাইবার সময় এসব ভাবিয়া দেখা বিশেষ দরকার। ধরিয়া বাঁধিয়া ফুল আকি দিয়া ছেলে চালাইয়া দিতে পারিলেই যদি অমনি করা হয় যে, হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচা গেল, তবে অন্যায় ভুল করা হইবে।

কয়জন ওখানকার অবস্থা বিবেচনা করিয়া এখানকার অবস্থা আসিয়া স্থান লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন? হয়ত লাখ খানেক হইবে। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা পাঁচ কোটির মত। সমাগতরা হাজারে মাত্র দুজন। এই দুজনকে আবার খেদাইবার জন্যই যত পায়তারা। লজ্জা বোধ হওয়া উচিত। শুধু সরকারের নয়, আপনার আমার সকলের লজ্জিত হওয়া উচিত। লজ্জিতাপেক্ষাধারের আরও বেশী লজ্জিত হওয়া উচিত। হওয়াদ্বয়, মানা ক্যাম্প প্রভৃতি স্থানের সঠিক অবস্থা জানিয়া আমাদের জানাইতে ব্যর্থতায় তাঁদের লজ্জিত হওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ কি ব্রিটিশকী আগমনে ভারাক্রান্ত! উহারা কি পশ্চিমবঙ্গের জীবনধারাকে পিছনে টানিয়া রাখিতেছে? আশেপাশে একটু তাকাইয়া দেখিলে অস্বীকার করার উপায় থাকেনা যে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম কৃষি ও কৃষির শিল্পে এবং শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐ মূল হইতে উৎপাটিত উদ্বাস্তুরাই অগ্রণীর ভূমিকা নিয়াছেন। নিজের শ্রেষ্ঠিত্বের কথা বলিতেছি, ক্ষমুন।

কলিকাতায় কলিজ স্কোয়ার থাকিতাম। ৪৭এর সেপ্টেম্বরে একদিন সংবাদ পাইলাম দেশের (পূর্ববঙ্গের) পিতৃপুরুষের বাড়িঘর হঠাৎ বেহাত হইয়াগিয়াছে, অর্থাৎ আমরা ধনচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি। ডিসেম্বরে পারমন্থলে পূজাবকাশাদি বহু মহীয়ার একটি সচ্ছাৎপন্ন প্রখ্যাত গ্রামের কলিজাস (মুচি) লক্ষীর কিনারে ত্রিশ ছয় পুরে আমিয়া ডেরা বাঁধি এবং সেই হইতেই এখানেই বসবাস করিতেছি। আমরা আসিবার পূর্বে এখানকার জমির দাম ছিল দুটাকা বিঘা, আজনা দু আনা হইতে চার আনা বিঘা। খুব ভাল বছরে প্রত্যেকে কমল উৎপন্ন করিত বিঘা প্রতি সর্বাধিক চার মণ এবং চাষীরা এক, দেড় মণ ছোলা। দুবছর চাষের পর এক বছর জমিটা ফেলিয়া রাখিতে হইবে উর্বরতা সঞ্চয়ের জন্য। ম্যালেরিয়াতে উৎসন্ন এই দেশটায় ত্রিমুখ উদ্বাস্তুরা নানা দিক হইতে আসিয়া বহুসংখ্যায় বসতিস্থাপন করিয়াছেন। অনাবাদী জমি সেসময় অনেক ছিল; এখন কোথাও ছিটাফোঁটাও খুঁজিয়া পাইবেন না। উদ্বাস্তুদের উচ্চ আশের ফসল-চাষের ক্ষেত্রটায় সুরু হইবার অনেক আগেই সমাগত ত্রিমুখদের হাতের ঠোকায় ওই সরু ক্ষেত্রটা বেড়িতে বেড়িতে শস্যশ্যামল হইয়া ওঠে। ফসলের মূল্য বৃদ্ধিপায়, মোট ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় আরও বহুগুণ এবং ওই বর্ধিত ফসলের গন্ধ পাইয়া ব্যাপারী বহাজনরা আসিয়া দোকান আড়ত খুলিয়া আগেকার প্রায় যাত্রাহীন রেলস্টেশনকে ঘিরিয়া গঞ্জ গড়িয়া তুলিয়াছে। (চলবে)

গ্রন্থ সমালোচনা

অগ্নিযুগ। সম্পাদনা—শৈলেশ দে।

পূর্ণ প্রকাশন, ৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯।

দাম : পঁচিশ টাকা।

এমন একটি গ্রন্থ হাতে পাওয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। ভূমিকায় শৈলেশ দে লিখেছেন, 'দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে, বুকের পাঁজরে পুড়ায় হোমানল জ্বেলে যাঁরা একদিন গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কি সে ইতিহাস লুপ্ত হয়ে যাবে? তাঁদের মহামূল্যবান দুষ্প্রাপ্য রচনা সম্ভার কি অজানাই থেকে যাবে আজকের দিনের তরুণ-তরুণীদের কাছে?'

'অগ্নিযুগ' গ্রন্থ সম্পাদনা শৈলেশ দে-র একটি মাত্র প্রয়াস। আজকের যুগের লক্ষ্যহীন, পথভ্রষ্ট, অর্থনৈতিক ও আত্মিক সংকটে জর্জরিত ছেলে মেয়েদের কাছে এই মহামূল্যবান গ্রন্থপাঠ হবে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। বিপ্লবীদের রচনা পাঠে তারা আত্মগ্লানি, হতাশাবোধ কাটিয়ে, নতুনভাবে বেঁচে থাকার প্রেরণা পাবে। তারা জানতে পারবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মহান আত্মত্যাগ, মাতৃভূমি শৃঙ্খল মোচনের জন্যে তাদের অশেষ দুঃখ বরণের কাহিনী।

'অগ্নিযুগ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আছে বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর ইতিহাস। লিখেছেন সুভাষচন্দ্র বসু, রাসবিহারী বসু, অরবিন্দ নারায়ণ, সরোজিনী নাইডু, হেমচন্দ্র ঘোষ, গণেশ ঘোষ, সূর্য সেন, লোকনাথ বল, ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার, কমলা দাশগুপ্ত, বীণা ভৌমিক, প্রমুখ দেশ বরেণ্য বিপ্লবী চিন্তাবিদরা। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে নেতাজী ও স্মৃতিচারণ। শ্রীঅরবিন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, কমরেড মুজফ্ফর আহ্‌মেদ, লীলা রায়, অধ্যাপক নলিনী গুহ, ডঃ ভূপাল বসু জ্যোতিষ ঘোষদস্তিদার, কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রমুখ মণীষীদের মূল্যবান রচনায় এ খণ্ডে সমৃদ্ধ। তৃতীয় খণ্ড রচিত হয়েছে কবি, সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কদের জ্ঞানগর্ভ রচনায়। লিখেছেন—মানবেন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, অন্নদাশঙ্কর রায়, ডঃ রমা চৌধুরী, জলধর সেন, ত্রিপুরা শঙ্কর সেনশাস্ত্রী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন বক্সী, কাশীকান্ত মৈত্র' শৈলেশ দে প্রমুখ।

এই গ্রন্থ প্রয়াস উপলক্ষে প্রকাশক কর্তৃক বই পাড়ায় একটি বিপ্লবী সমাবেশ হয়েছিল গত ১৪ই আগষ্ট। গ্রন্থের হেমচন্দ্র ঘোষকে স্বচক্ষে দেখা আমার কাছে সেদিন একটি পুণ্য কাজ বলে মনে হয়েছিল। গণেশ ঘোষ সেদিন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন যে, একজন ইংরেজীর তরুণ অধ্যাপক নাকি তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন—বাঘা যতীন কে? আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটি অবিশ্বাস্য মনে হবে হয়ত অনেকের কাছে। নিজের কানে না শুনলে ব্যাপারটা হয়ত আমার কাছেও খটকা লাগতো। নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের অবহা দোষারোপ করে লাভ নেই! এই গ্রন্থ যদি তাদের মনে বিপ্লবীদের সম্পর্কে কিছুমাত্র উৎসাহ ও শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলতে পারে—সেটাই হবে সংকলক শৈলেশ দে-র পরম পাওনা। সবশেষে ধন্যবাদ জানাই প্রকাশক রবীন্দ্র নাথ বিশ্বাসকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য।

'অগ্নিযুগ' গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

সুভাষ সিংহ

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Dist—24-PARGANAS		
Bose Ajit Kumar	Sukantanagar, P.O. Michaelnagar P. S. Dum Dum Airport	200	1. 4. 75
	Dist—MIDNAPORE		
Gayen Sunil Baran	Battala, P. O. Gopichak P. O. Khejuri	200	23. 3. 75
Giri Smt. Kusum Kumari w/o Late Debendra N. Giri	P. O. Subdi. P. S. Nandigram (Arrear dues a/c husband 15. 8. 72)	200	7. 12. 74
Gola Sarat Chandra	Tikashi Bar Paschimtalla, P. O. Henria	200	23. 3. 75
Maity Raghunath	P. O. Maheshpur, P. S. Egra	200	15. 8. 72
Mondal Smt. Satyabhama w/o Late Arun Ch. Mandol	P. O. Bahadurpu	100	10. 2. 77
	Dist—HOOGHLY		
Banerjee Balaram	Brahmanpara P. O. Dhaniakhali	200	12. 10. 73
	WIDOW'S PENSION		
Banerjee Smt. Niyati w/o Late Kalipada Banerjee	19B, Abdul Latif Street Calcutta-56	100	14. 2. 77
Maji Smt. Kishori Bala w/o Shyama Charan Maji	Chakrimulia, P.O. Mahisadal	100	8. 9. 75
	SUSPENSION		
Abanti Kumar Patra	Vill Sharpur, Etwaribar. ;P. O. Contai Midnapur		
	ENHANCEMENT		
Banerjee Niranjan	14B, Panchu Khansama Lane (Now Dr. Debedra Mukherjee Row) Calcutta-9	200	1. 10. 76

Name	Address	Amount Rs.	Date
	ENHANCEMENT—Contd.		
Bhattacharji Asit Chandra	Jan Kalyan, Nimta, Cal-49	200	1. 10. 76
Bose Smt. Manindra w/o Late Mukul Krishna Bose	D-39 Ramgarh Colony	150	1. 10. 76
Chaudhuri Sailendra Kumar	P-69 Naktala-1, Calcutta-47	200	1. 10. 76
De Smt. Kamala Rani w/o Late Sarada Kanta De	Raipur Road, Naktala, Calcutta-47	200	,,
Debi Smt. Nirupama w/o Late Ananth Chakraborty	12/3/C Jumir Lane, Calcutta-19	150	,,
Ghosh Niranjan	6/18/1 Bejoygarh, Calcutta-32	200	,,
Ghosh Himangshu	F-31. Jajodia Garden Lane P. O. Belurmath. Howrah	200	,,
Ghosh Harendra Nath	7, Kshetra Banerjee Lane Shibpur, Howrah-2	200	,,
Mazumdar Jogesh Chandra	54/27-Q Road, P. O. Dasnagar Howrah	200	,,
Singh Balai Chandra	56/11 Jaynarayan Babu Ananda Dutta Lane, Howrah	200	,,
Devi Sunity Bala w/o Sri Manoranjan Mukherjee	Mansatala Mandalpara	200	,,
Sri Manoranjan Mukherjee	P.O. Shyamnagar, Mansatola Basudebpur, 24 Parganas	200	,,
Chakraborty Smt. Sabitri w/o Late Sachindra Chakraborty	31 Regent Colony, P.O. Regent Park, Calcutta-40	200	,,
Devi Smt. Lakshmi Priya w/o Late Bibhuti Bh. Deb Roy	87A/B Bosepukur Road, Masterpara Kasba, Calcutta-42 Present Address : Vill Strepur (Ramlal Bazar) P. O. Haltu (24 Parganas)	150	,,
Kar Debendra Nath	Srikrishnapore P. O. Barada Midnapore	200	,,

---

বিজ্ঞপ্তি

৺দুর্গা পূজা উপলক্ষে আগামী দু'সপ্তাহ বিপ্লবী বাংলা প্রকাশিত হইবে না।

সম্পাদক—বিপ্লবী বাংলা।

RgcdNo. R. M .24911/71 Diplabi Bangla Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—[illegible].০০ টাকা ষান্মাসিক :—৮.০০ টাকা মূল্য—১.০০ টাকা

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুলক চ্যাটার্জী, শ্রীবারীণ রায়।
সম্পাদক—শ্রীসাজি শরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতারা—শ্রীমধুগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীমতীন্দ্র গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

18 OCT 1978

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

অষ্টম বর্ষ	শনিবার, ১০ই কার্ত্তিক, ১৩৮৫ ২৮শে অক্টোবর, ১৯৭৮	৫-৬ষ্ঠ সংখ্যা

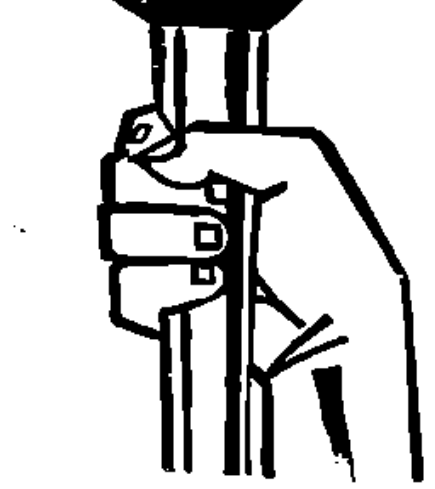

CALCUTTA POLICE

এই সংখ্যায়

নব যুগের দধীচি

। হরিপ্রসাদ পাল ।

নির্বুদ্ধিতা—না—হৃদয়হীনতা

। শৈলেশ্বরনাথ দাশগুপ্ত ।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিকল্পিত প্রতিক

। জীবনতারা হালদার ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক মলিনী মোহন দাশগুপ্ত ।

সি, পি, এম, কৌশল পাল্টেছে

। বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বিপ্লব ও বিপ্লবীদের দর্শন

। প্রবোধ মজুমদার ।

দুইটি জিনিষ হইতে বিশেষ সাবধান থাকিবে—ক্ষমতাপ্রিয়তা ও ঈর্ষা। সর্বদা আত্মবিশ্বাস অভ্যাস করিতে চেষ্টা কর।

—স্বামী বিবেকানন্দ

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Dist—24-PARGANAS		
Dutta Paresh Chandra	C/o Paduka Pratisthan, P. O. Kanchrapara	200	1. 2. 77
Ghosh Promoda Ranjan	537/4 Ashokenagar 24-Parganas	200	15. 72
	Dist– HOWRAH		
Bhattacharyya Prakash Chandra	P. O. Maju P. S Jagatballavpur	200	15. 8. 72
Pradhan Lakshmi Kanta	Sadasibpur, P. O. Sasti P. S. Shyampur	200	30. 3. 74
Sur Rashamoy	P. O. Bhattanagar	200	1. 4. 75
	Dist—MIDNAPORE		
Das Harekrishna	Sillaberia, P. O. Boga P. S. Khejuri	200	3. 6. 75
Das Barendra Nath	Radhapur, P. O. Madhabpur	200	14. 8. 72
Das Gupta Subodh Ch.	Chottobuzar, P. O. Midnapur	200	..
Majhi Dibakar	Bhupatinagar, P. S. Bhagwanpur	200	4. 6. 74
	WIDOW'S PENSION		
Das Sarma Smt. Kamala w/o Late Benoy Krishna Das Gupta	139/5 Kasba Road, Cal. 42	200	3. 1 77
Barman Smt. Kiran Bala w/o Late Suresh Ch. Barman	2/67 Naktala, Cal. 47	100	3. 4. 77
Ghosh Sushama w/o Late Kshitindra Nath Ghosh	26 Deodar Street, Cal 19	200	17. 12. 76
Barman Smtj Madhyamani w/o Late Gandhi Barman	Dang-Malancha, P. O. Tilon	200	15. 8. 72
Bhattacharyya Smt. Kshetramoni w/o Late Ashutosh Bhatta.	Kamdabari, P. O. Garia, 24 Parganas	100	30. 3. 74

(Contd. on 3rd Cover)

নব যুগের দধীচি

অসুরের হাত হইতে স্বর্গরাজ্য উদ্ধারকার্য্য দেবগণের সাহায্যার্থ আপন অস্থিদান করিয়া ছিলেন দধীচি। এ যুগে মানুষের মধ্যে সেই আদর্শ স্থাপন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন এই বাংলা দেশের এক নবীন যুবক।

ইংরেজী ১৯০৪ সালে কলিকাতা মহানগরীতে যতীন্দ্র নাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ব্রজেন্দ্র বিহারী দাস। পিতামহ মহেন্দ্রদাস ছিলেন মুন্সেফ। বাল্যকালে পড়াশুনায় যতীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল। ১৯২০ সালে ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউশন হইতে প্রবেশিকা পাশ করিয়া তিনি ভবানীপুরেই আশুতোষ কলেজে ভর্ত্তি হন। কালী-ঘাটের নিকট একটি ক্ষুদ্র গৃহে দাস পরিবার বাস করিত।

যতীন্দ্রনাথ যখন আশুতোষ কলেজে আই এ ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, মহাত্মা গান্ধী ঐ সময় অসহযোগ

শ্রীযতীন্দ্র নাথ দাস

আন্দোলন আরম্ভ করেন। ছাত্র সম্প্রদায়কে তিনি গোলামখানা ত্যাগ করিয়া আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিলেন। যতীন্দ্রনাথের অন্তর এ আহ্বানে সাড়া না দিয়া পারিল না। যতীন্দ্রনাথ অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তিনি দক্ষিণ রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য হইলেন। ১৯২২ সালে বড় বাজারে পিকেটিং করার অপরাধে ধৃত হইয়া তিনি তিন মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯২৩ সালে চৌরীচৌরা হত্যাকাণ্ডের পরে মহাত্মা গান্ধী অপ্রত্যাশিত আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলেন। জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া যতীন্দ্রনাথ তখন কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। হঠাৎ আন্দোলন বন্ধ হইতে দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইলেন। পিতামাতার আগ্রহাতিশয্যে যতীন্দ্র পুনরায় আশুতোষ কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সমিতির সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিন্ন হইল না। ১৯২৪ সালে যতীন্দ্রনাথ দক্ষিণ কলিকাতা, রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন।

১৯২১ সালে মহাত্মাজী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিলে বিপ্লবীরা অনেকেই গণ সংযোগের এই সুযোগ গ্রহণ করিলেন। পুলিন বিহারী দাস প্রমুখ কয়েকজন ইহার ব্যর্থতা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু আন্দোলনের প্রবল বন্যায় দেশবাসীর নিকট এসব গৃহীত হইল না। ফলে বিপ্লবীরা বিপুল সংখ্যায় এ আন্দোলনে যোগ দিয়া আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর নির্দেশে আন্দোলনের গতি অকস্মাৎ রুদ্ধ হওয়াতে যতীন্দ্রনাথের ন্যায় অন্যান্য তরুণ বিপ্লবীরাও অনেকেই ক্ষুব্ধ হইলেন। তাহারা সশস্ত্র বিপ্লব পথে পরাধীনতা মুক্তির জন্য অগ্রসর হইলেন। বিভিন্ন প্রকার অর্থ সংগ্রহের আয়োজন করেন। শাঁখারীটোলা ডাকঘরে অর্থসংগ্রহ ব্যাপার পোষ্টমাষ্টার নিহত হইল। এই ব্যাপারে সরকার কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করিয়া দ্বিতীয় আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ করিলেন। ইহা যতীন দেওঘরের বোমা প্রস্তুত কারখানা আবিষ্কৃত হইল। এই সম্পর্কে বিভিন্ন স্থান হইতে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হইল। দক্ষিনেশ্বর বোমার মামলায় কয়েকজন দণ্ডিত হইল। সরকার বুঝিলেন, শুধু মামলা করিয়াই বিপ্লবান্দোলন দমন করা যাইবে না। সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্য মোহন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ডেফনাটিক বাঘাযতী বিপ্লবী ও যুবকদের পুলিশ গ্রেপ্তার করিল। এই সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথকেও পুলিশ ১৯২৪ সালের এই নভেম্বর গ্রেপ্তার করে। যতীন্দ্রনাথকে প্রথমে প্রেসিডেন্সী জেলে আটক রাখা হয় এবং সেখান হইতে তাহাকে মেদিনীপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে কয়েক সপ্তাহ থাকার

পরেই যতীন্দ্রনাথ অসুস্থ হইয়া পড়েন। তখন তাহাকে ঢাকা জেলে পাঠানো হয়।

ঢাকা জেলে গিয়া যতীন্দ্রনাথ জেলে অন্যান্য ও অসুবিধার প্রতিবাদ করিয়া জেলকর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিলেন। কিন্তু বন্দী অভিযোগ করিবে অভিযোগ করিয়া প্রতিকার চাহিবে—ইহা জেলকর্তৃপক্ষের নিকট এক অদ্ভুত ব্যাপার তাহারা প্রতিকার ত করিলেন না, এমন কি কোন উত্তর ও দিলেন না যতীন্দ্রনাথ বাধ্য হইয়া অনশন সুরু করিলেন। একটানা ষুড়ি দিন ধরিয়া অনশন চলিল। কর্তৃপক্ষ অনশন ভাঙিবার নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। যতীন্দ্রনাথের শরীর ক্রমশই খারাপ হইয়া পড়িতে লাগিল। জেল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া ত্রুটী স্বীকার করিলেন এবং অভিযোগ প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দিলেন। যতীন্দ্রনাথ অনশন ত্যাগ করিলেন।

১৯২৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর যতীন্দ্রনাথ জেল হইতে মুক্তি পান। কারাগারে যাইবার পূর্বেই তিনি আই এ পাশ করিয়া ছিলেন। এবারে মুক্তি পাইয়া পড়িবার জন্য বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হইলেন। এই সময়ে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসে অধিবেশনের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের ভার ছিল সুভাষচন্দ্রের উপর। একার্যে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী।

বিপ্লবী হিসাবে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন অনুশীলন সমিতির কর্মী। বাংলার বাহিরে বিভিন্ন প্রদেশে এই দলের বহু শাখা-প্রশাখা ছিল। পাঞ্জাব শাখার নায়ক ভগৎ সিংহের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। কলিকাতা কংগ্রেসের যখন অধিবেশন হয়, লাহোরের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট স্যাণ্ডার্স হত্যা সম্পর্কে ভগৎসিংহ তখন জেলে ছিলেন। এই জেলের অবস্থায়ই তিনি কলিকাতা কংগ্রেসে যোগ দেন। কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের পর রংপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। ভগৎ সিংহ এখানে দলীয় কয়েক বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। যতীন্দ্রনাথ ও উপস্থিত ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের জন্য পিস্তল সংগ্রহ করিয়া দিবার এবং বোমা তৈরী পদ্ধতি শিক্ষা দিবার ভার লইলেন।

১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল ভগৎ সিংহ ও বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লীতে পরিষদ ভবনে বোমা নিক্ষেপ করিয়া গ্রেপ্তার হইলেন। ইহার পূর্বেও কয়েকটী বৈপ্লবিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে পুলিশ অপরাধীদের সন্ধান করিতেছিল। এবারে ব্যাপক ধর পাকড় আরম্ভ হইল। যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বিহারের বহু যুবককে গ্রেপ্তার করা হইল। কলিকাতায় যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিয়া লাহোর জেলে পাঠানো হইল। ধৃত বিপ্লবীদের আসামী করে সরকার লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা সুরু করিলেন।

জেল কর্তৃপক্ষ ছিলেন বন্দীদের প্রতি বিরূপ। তাহাদের বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে তাহারা ছিলেন উদাসীন। বন্দীরা অভিযোগ জানাইয়া বহু আবেদন করিলেন কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে তাহারা অনশন করাই সিদ্ধান্ত করিলেন। অনশন ভঙ্গের চেষ্টা চলল। সামান্য দুই একটি অভিযোগ সম্পর্কে জেল কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকার করিলেন। ফলে বন্দীদের মধ্যে একে একে সকলই শেষ পর্যন্ত অনশন ত্যাগ করিলেন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ অটল। তিনি সুস্পষ্টস্বরে জানাইয়া দিলেন, বন্দী জীবনে আমরা সরকারের নিকট মানুষের মত ব্যবহার চাই। এই দাবী সরকারকে পরিপূর্ণ ভাবেই মানিয়া লইতে হইবে। নতুবা আত্ম বিসর্জনের জন্য আমি প্রস্তুত।"

কারাবন্দীর মুখে এই স্পর্দ্ধার বাণী মানিয়া লইতে সাম্রাজ্য বাদী সরকার প্রস্তুত ছিলেন না। তাহারা বলপূর্বক যতীন্দ্রনাথকে খাওয়াইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। যতীন্দ্রনাথ সমস্ত শক্তি দিয়া সরকারী চেষ্টা প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। ফলে প্রতি দিনই তাঁহার অবস্থা খারাপ হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে বিশিষ্ট ডেপুটেশনও যতীন্দ্রনাথের প্রাণনাশের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। যতীন্দ্রনাথকে আহার গ্রহনের জন্য তাহারা অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কোন কথাই

যতীন্দ্রনাথ কর্ণপাত করিলেন না। তাহার এককথা—সরকারকে বন্দীদের দাবিপূর্ণ দাবী মানিয়া লইতে হইবে। শরীর আরও খারাপ হইতে লাগিল, ক্রমে তাহার মৃত্যু অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহাকে ঔষধ সেবনের চেষ্টা হইল কিন্তু তিনি ঔষধ গ্রহণেও সম্মত হইলেন না। সরকারের অনুরোধে পাঞ্জাবের বিশিষ্ট নেতা ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব যতীন্দ্র নাথকে ঔষধ সেবনের জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু যতীন্দ্র নাথ নিরুত্তর রহিলেন। তাহার কঠোর সংকল্প বিন্দু মাত্র শিথিল হইল না। ক্রমে মৃত্যু নিশ্চিত হইয়া উঠিল। কর্তৃপক্ষ তখনও তাঁহাকে ওষুধ এবং পানীয় গ্রহণ করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু মুমূর্ষু অবস্থাতেও যতীন্দ্রনাথ ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—আমার মৃতদেহ লইয়া তোমরা যাহা ইচ্ছা করিও, কিন্তু আমার জীবনের উপর কোন কিছু করিবার শক্তি তোমাদের নাই।"

যতীন্দ্রনাথের অবস্থার ক্রমেই অবনতি ঘটিতে লাগিল। কর্তৃপক্ষ পিতাকে সংবাদ দিলেন। কিন্তু পুত্রের মনোবল পিতা ভালভাবেই জানিতেন। তিনি তাঁহাকে আহার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন না। কনিষ্ঠ পুত্র কিরণকে পাঠাইয়া দিলেন মৃত্যুকালে শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিবার জন্য। সাম্রাজ্যবাদী ব্রাহ্মিক সরকার যতীন্দ্রনাথের অনশন ভঙ্গের চেষ্টা করিলেও তাঁহার দাবী পূরণের কোন ব্যবস্থাই করিলেন না। অবশ্য, সে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাঁহার মৃত্যুর পরে।

এইভাবে যতীন্দ্রনাথের জীবন দিনে দিনে মৃত্যুর দিকে আগাইয়া চলিল। অবশেষে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ৬২ দিন অনশনের পর ১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার বেলা ১টা পাঁচমিনিটের সময় আধুনিক ভারতের এই তরুণ ঋষিটি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করিলেন।

কর্তৃপক্ষ যতীন্দ্রনাথের প্রাণহীন দেহ পান্‌জাবের নেতৃবৃন্দের হাতে সমর্পণ করিলেন। শহীদের অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য প্রায় দশ সহস্র জনতা সমবেত হইল জেল গেটে। লাহোরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হ্যামিল্টন্ হার্কিং সদাশয়ের সম্মুখে আসিয়া টুপী খুলিয়া অভিবাদন করিলেন।

মৃত্যুর পূর্বে যতীন্দ্রনাথ জানাইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার মৃতদেহ যেন বাংলায় আনিয়া শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। সুভাষচন্দ্র এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের চেষ্টায় তাঁহার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। ১৫ই সেপ্টেম্বর যতীন্দ্রনাথের শবদেহ লাহোর এক্সপ্রেসে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। এই সময় এলাহাবাদে আনন্দ ভবনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন চলিতেছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ষ্টেশনে আসিয়া শবাধার স্পর্শ করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করিলেন। মৃতদেহ হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিলে সেখান হইতে শোভাযাত্রা করিয়া প্রথমে টাউনহলে আনা হয়, এবং পরে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হয়।

শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য ১৫ই সেপ্টেম্বর স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন করিল। সুভাষচন্দ্রের পরিচালনাধীনেই এক বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া মৃতদেহ কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হয়। শোকযাত্রা এত দীর্ঘ হইয়াছিল যে কলিকাতা সহরে এরূপ পূর্বে আর দেখা যায় নাই। বেলা আটটায় সময় টাউন হল হইতে শোভাযাত্রায় যাত্রা আরম্ভ হয় কিন্তু যখন কেওড়াতলা পৌঁছিল, তখন দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। অগণিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে পুষ্পসজ্জিত পুণ্যদেহে পুষ্পমাল্য ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। বিপুল জনতার অশ্রুসিক্ত মধ্যে মহাশ্মশানে মহাসাধকের দেহ ভস্মীভূত হইল। বিদেশী আধিপত্যের সমস্ত উৎপীড়নকে উপেক্ষা করিয়া সংগ্রামরত জাতির সম্মুখে পরাধীনতার কলঙ্কমোচনের পথ প্রদর্শন করিয়া নবযুগের ঋষিটি মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমরত্ব লাভ করিলেন।

———

নির্বুদ্ধিতা—
না—
হৃদয়হীনতা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যেখানেই ক-ঘর উদ্বাস্তু আসিয়া বসিল সেখানেই গজাইয়া উঠিল প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয় এবং বালিকা বিদ্যালয়। আমাদের এই অঞ্চলের সর্বশ্রেণীর উদ্বাস্তুদের মধ্যে তথাকথিত নিম্ন বর্ণীয়রা, যাদের শিডিউল্ড্ কাষ্ট বলা হয় তারা, সংখ্যা-গরিষ্ঠ হইলেও আমাদের সকলের মধ্য হইতে নিরক্ষরতা একেবারে নির্মূল হইয়াছে। কিন্তু স্থানীয় দরিদ্র কৃষিজীবীদের মধ্যে সাক্ষরতা আনার সব চেষ্টা কার্যত এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে আমার বাড়ির পাশে ২৯। ৩০ ঘর মুচি বাস করে আছে তাদের ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক পাঠশালায় পাঠাইয়া সাক্ষর করার সব চেষ্টা এই ত্রিশ বৎসর যাবৎ ফলপ্রসূ হয় নাই। অথচ নিম্নতম বর্ণের দরিদ্রতম উদ্বাস্তু চাষীদের মধ্যেও সন্তানদের শিক্ষিত করার আকাঙ্খা এত প্রবল যে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

দুই শত বৎসর যাবৎ পতিত, অর্থাৎ জলবদা একটী বিস্তীর্ণ জমিতে কিছু ব্যবস্থাপন্ন নমঃশূদ্র (যাদের আগে বলা হইত চণ্ডাল) কৃষক প্রথম আসিয়া ঘর বাঁধিয়া বসিল ৪৮। ৪৯ সালে। যে জমিতে স্মরণ কালের মধ্যে এখানকার মুসলমান দক্ষ কৃষকরাও কখন লাঙ্গল নিয়া নামে নাই, সেই চাপবাঁধা শক্ত পতিত মাটি ভাড়াকরা ট্রাকটরের সাহায্যে প্রথমবারের মত চাষিয়া লইয়া ঐ নবাগত অজ্ঞাত শ্রেণীর কৃষকরা সোনার ফসল,—প্রচুর ধান আর পাট ঘরে তুলিল। এই ফসলেরই গন্ধে নানা দিক হইতে নানান ধরণের দোকানদার ও আড়তদাররা যে ধীরে ধীরে আসিয়া বাজার জমাইয়া বসিল একথা পূর্বে বলিয়াছি।

প্রথমবার ফসল তুলিয়াই এই চাষীরা সঙ্কল্প গ্রহণ করিল 'আমরা চিরকাল মুখ্যুসুখ্যু কুজাত মানুষ, বাবুদের হাকথু শুনিয়া বড় হইছি, এই নতুন দেশে আইসা আমাগো পোলাপানগোরে আর মুখ্যু থাকতে দিমুনা। এহানে আইসাই পাঠশালা খুলছি, এখন হাইস্কুল করম'। করিবেও। নিজেদের হাতে ঘর তুলিল; কাঠমিস্ত্রির কাজ অনেকে জানিত, তারা টেবিল বেঞ্চি বানাইল, প্রথম পাওয়া ধানপাটের চাঁদা তুলিয়া শিক্ষক নিয়োগ করিয়া ইস্কুল বসাইল। যে জমিখণ্ডের উপরে প্রথম স্কুলগৃহ নির্মাণ করিয়াছিল, জমিদারের প্রয়োজনায় স্বপ্নের এবং উৎখাতের মামলা হাজির করিল জমিদারের এক সাবেক প্রজা। প্রায়ই ওদের ওখানে তখন যাইতাম। একদিন গিয়া দেখি পূর্বদিন যেখানে স্কুলঘর দেখিয়াছিলাম। এদিন সে যায়গাটা ফাঁকা পড়িয়া আছে। শুনিলাম মামলার অবস্থা বিবেচনা করিয়া উহাদেরই একজন নিজ ভিটার জমি ইস্কুলের নামে লিখিয়া দিয়াছে এবং সকলে মিলিয়া রাতারাতি স্কুলঘরটী সেখান হইতে তুলিয়া নিয়া নূতন করিয়া তুলিয়াছে। দেখিয়া ও শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মনে সেদিন একটা কথাই বার বার খেলা দিতেছিল,—সাবাস!

বাংলাদেশে যেখানে যত হাইস্কুল স্থাপিত হইয়াছে জমিদার ও ধনী মহাজনদের দানে ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সরকারী সাহায্যে। আমাদের নোয়াপাড়ার এই স্কুলটীই সমগ্র বাংলাদেশে প্রথম স্কুল যাহা জমিদার, ধনী মহাজন ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া শুধুমাত্র অজ্ঞাত ছেলে চাষীদের মনের ও হাতের জোরে স্থাপিত হইয়াছিল। সেটা

ছিল, যতদূর মনে পড়িতেছে, ৫০ সাল। পরে অবশ্য এই স্কুলটী সরকারী সাহায্য ও স্বীকৃতি পাইয়াছে। ক্রমে এই অঞ্চলে এরাই গড়িয়া তুলিয়াছে আরও একটী উচ্চ-বিদ্যালয় এবং একটী উচ্চবালিকা বিদ্যালয়। কল্পনা করিতে পারেন? এই হাজার এক পরিমাণ নূতন উপ-নিবেশের উত্তরে দক্ষিণে স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানদের বসতি অনেকগ্রাম আছে। শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা ঐসব গ্রামে ত্রিশবছর পূর্বে যাহা ছিল এখনও প্রায় তাহাই আছে: দুই চারিটা প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ত নতুন হইয়াছে।

বালিকাদের প্রথম উচ্চবিদ্যালয়টী অবশ্য হইয়াছিল অতিসম্প্রতি নিম্নবিত্ত উচ্চশ্রেণীর অক্লান্ত চেষ্টায় হেলটেশনের কাছাকাছি। উচ্চশ্রেণীর যাহারা এ অঞ্চলে ছড়াইয়া ছিটাইয়া বসবাস করিতেন, মেয়েদেরও শিক্ষিত করার প্রয়োজন যে আছে ইহা তাহাদের জীবনকল্পনায় কখনও স্থান পায় নাই। এজন্য বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনে তাহা-দের অধিকাংশের নিকট হইতে তেমন কোন উৎসাহ ও সাহায্য পাওয়া যায় নাই। উচ্চবালিকা বিদ্যালয় তথাপি স্থাপিত হইয়াছে প্রধানতঃ ঝিনুঝিদের প্রয়োজনে ও চেষ্টায়। এই স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা এখন সাত শ' ছাড়াইয়া গিয়াছে। ঝিনুঝিরা পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতিতে কতখানি বাধাস্বরূপ, ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখুন।

এই ত্রিশ বছরে আরও অনেক কিছু ঘটিতে দেখিয়াছি। অন্ততঃ আমাদের এধিকৃকায় নরঃসূত্ররা এখন আর অজুত চাঁড়াল নাই। জাতপাতের ভেদাভেদ উদারতা উপড়াইয়া ফেলিয়াছেন তাহাদের নূতন করিয়া গৃহ-গ্রাম-গঞ্জ নির্মাণের স্বাভাবিক গতিতে। সাম্প্রদায়িকতাও ইহারা নিশ্চিহ্ন করিয়াছেন। স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীরা এবং নবাগত ঝিনুঝিরা প্রথমাবধি মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতেছেন স্বাভাবিক প্রতিবেশিতায়, কোনরূপ ছন্দপতন না ঘটাইয়া মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলাফেরাকে ঝিনুঝিরা স্বাভাবিক ও সহজ করিয়া লইয়াছেন। স্থানীয়দের অবশ্য সমাজেও এসবের প্রতিফলন অবশ্যই হইতেছে। স্থানীয়রাও পরমনবাসত জীবন-রীতি লইয়া বসিয়া থাকিতে পারি-তেছেন না।

সরকারের লাভ-ক্ষতির দিকটা একবার দেখা যাক। পূর্বে এসব অঞ্চল হইতে সরকারের আয় প্রায় কিছুই হইত না। জমিদারীর আয়ও ছিল অভিনগণ্য। খাজনা চার আনা বিঘা হইলে আয় আর কতই বা হইতে পারে? উদ্বাস্তুদের সমাগমের পরে ভূমিরাজস্ব প্রভূত বৃদ্ধি পাইয়াছে। দলিল রেজিষ্ট্রী করার আয় এত বাড়িয়াছে যে এই গ্রামেও একটী রেজিষ্ট্রী অফিস বসাইতে হইয়াছে। যে বিঘা দুই পূর্বে ২টাকা ছিল ঝিনুঝিরা সে জমিতে সোনার ফসল তুলিতে সুরু করিলে ঐ জমির দামই বাড়িয়া হইয়াছে একশেড় দু-হাজার টাকা। দলিল মারফত লেনদেন টাকার অঙ্কে আকাশ ছুঁইয়াছে এবং সেজন্য সরকারের ষ্ট্যাম্প আয়ও কল্পনাতীত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমৃদ্ধিক্রমগত বাড়িয়া চলাতে বিক্রয়কর আয়কর প্রভৃতি বাবদেও সরকারের প্রচুর অর্থাগম হইতেছে। পূর্বে এসব খাতে আয়, বলিতে গেলে, কিছুই ছিল না। রেলের আয় বাড়িয়াছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম সময়ের তুলনায় বহু গুণ। পাঁচশালের পূর্বে এসব রেল ষ্টেশনে যাত্রী ওঠানামা করিত সামান্য দুচার জন। এখন ভিড়ের চাপে ট্রেনের টিকিট কাটা অনেকসময় অসম্ভব হইয়া ওঠে। অতিরিক্ত ভিড়ের জন্য মালের কেরায়ে অল্পখরচে যাতায়াতের ব্যবস্থা একটা স্থায়ী আয়প্রদ ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। টিকিট বিক্রীকরার এবং চেক করার আয়ও সুব্যবস্থা রেল কর্তৃপক্ষ করিতে পারি-তেছেন না বলিয়া এবং যে আয় এখন হইতেছে তাহা যথেষ্ট প্রচুর বলিয়া এসব সাইড ব্যবসা চালু হইয়াছে, এবং ভাল চলিতেছে।

এসব দেখিয়া কি বলা যায় যে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের ভারস্বরূপ? এই অনুচিত অযৌক্তিক কথাটাই কিন্তু বলিয়া চলিয়াছেন যাহারা যখন যেখানে বসিতেছেন তাহারা নিজের কর্তাদের অজ্ঞাতে এবং তাহাদের সাহায্য ছাড়া যে অত্যাশ্চর্যে কৃষিবিপ্লব, সমাজবিপ্লব, সাংস্কৃতিক বিপ্লব

ঘটিয়া চলিয়াছে ঐ রিফিউজিদের নূতন করিয়া নিজেদের জীবিকা ও জীবনরীতি গুছাইয়া লইবার প্রচণ্ড পরিবেশে ইহা কর্তারা দেখিয়াও দেখিতে চান না, স্বীকার করিতে চান না কেন? সম্ভবতঃ এই কারণে যে, তাহাতে তাহাদের তাত্ত্বিক এবং নেতৃত্বের গৌরব ম্লান হইয়া পড়ে।

এখানে সেদিন এক কায়স্থপুত্র (উদ্বাস্তু) স্থানীয় মুচী কন্যাকে ঢাকঢোল পিটাইয়া, অঘোরাত্র মাইক বাজাইয়া বিবাহ করিল। আমার বন্ধুস্থানীয় এক নমঃশূদ্র স্থানীয় ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভবা পুত্রবধূ একটী উচ্চবালিকা বিদ্যালয় চালাইতেছেন। চায়ের দোকানে যাহারা চাপান করিতেছেন তাহারা হিন্দু না মুসলমান, ব্রাহ্মণ না মুচি, এসব প্রশ্ন আমাদের এই উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চলে কাহারো মনে ক্ষণিকের জন্যও কিছুমাত্র রেখাপাত করে না। উনবিংশ শতকের কবি মনীষীরা যে ভাবে সমাজকে বদলাইতে চাহিয়াছিলেন শতাধিক বৎসরেও তাহা সাধ্য হয় নাই। কিন্তু ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের অস্থির উদ্বেল স্রোতের ধাক্কায় তাহাই নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং হইতেছে স্বল্পকাল মধ্যে উদ্বাস্তু জীবনের সহজ স্বাভাবিক গতিতে। পশ্চিমবঙ্গকে উদ্বাস্তুরা পিছনে টানিয়া ধরে নাই, ঠেলিয়া আগাইয়া নিয়া চলিয়াছে। কথাটা ঠিক কিনা তা বলা দেখুন।

সেই গোড়ার প্রশ্নটা আবার তুলিতেছি। হাজার জনের মধ্যে আরও দুজনের স্থান কি হইতে পারিত না? জনবসতির ঘনত্ব ইহাতে কতটুকু বাড়িত? কেরলের জনঘনত্ব পশ্চিমবঙ্গের চাইতে বেশী। কেরলের মানুষ পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের তুলনায় নিকৃষ্ট অবস্থায় আছে, একথা আজ পর্যন্ত কাহাকেও বলিতে শুনি নাই।

ভারত সরকারের মন্ত্রী ভয়ক্তি দিয়াছেন, পুনর্বাসন দপ্তর এবার স্থাপবদ্ধ করিবে। অতি উত্তম কথা। সরকারী হেঁয়াচ যেখানে যত বেশী লাগিয়াছে, লওভণ্ড অবস্থাও সেখানে তত বেশী ঘটিয়াছে। আমার বাড়ির পাশে অনেক টাকা খরচ করিয়া এবং অনেক মাথা খাটাইয়া প্ল্যান করিয়া হাজার একরের একটা বৃহৎ সরকারী কলোনী স্থাপন করা হইয়াছিল ৫০/৫১ সালে। এই এলাকায় আরও বহু পল্লী ও গ্রাম নবাগতদের নিজেদের চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে এবং মিশ্র শ্যামল রূপ ধারণ করিয়াছে। ঐ সরকারী কলোনীটার দিক তাকাইলে কিন্তু আজ মনে হয়, এই স্বাস্থ্যবান নব জনপদের দেহে ওটা যেন একটা ঘা।

[চলবে]

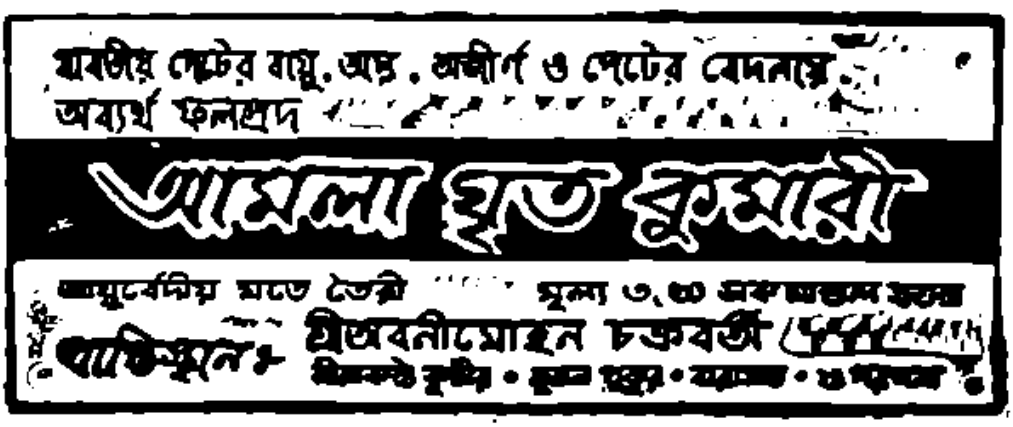

(S E A L)

১৯১৩ সালে বাংলার বিপ্লবীরা স্বাধীন ভারতের যে প্রতীক প্রবর্তন করেন উপরে তাহার প্রতিকৃতি দেওয়া হল।

অনুশীলন সমিতির (কলিকাতা কেন্দ্রের) একজন সভ্য এই সীল মোহরের পরিকল্পক ও উদ্ভাবক। তাঁহার নাম যতীন্দ্রলোচন মিত্র। পরীক্ষা, বন্ধু ও অনুরাগী মহলে তিনি 'লোচন' বা 'লোচনদা' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন।

অতি অল্প বয়সে তিনি অনুশীলন সমিতির সকলের পি মিত্র ও প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসুর প্রভাবে সমিতিতে যোগ দেন ও ক্রমশঃ বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ছাত্রাবস্থায় যে-আইনী 'যুগান্তর' (বিপ্লবী গোষ্ঠীর মুখপত্র) পুনর্মুদ্রিত করে তিনিও নাতনী মোহন মিত্র প্রকাশ করতে থাকেন। ইহারা উভয়েই বিপ্লবী নেতা যাদুগোপাল মুখার্জীর কনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। বলাবাহুল্য লোচনদার আবাসস্থল ২ নং জগদীশনাথ রায় লেন (কলিকাতা-৬) সেই যুগে বিপ্লবীদের একটি গুপ্ত কেন্দ্র ছিল। বিপ্লবীদের অস্ত্রাগার ও অস্ত্র মেরামতির কারখানা তিনিই পরিচালনা করতেন—উহা বিপ্লবীদের নিকট লোচনমিত্রীর কারখানা নামে পরিচিত ছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীদের পরিকল্পিত স্বাধীন ভারতের প্রতীক

শ্রীজীবনতারা হালদার

ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় রাসবিহারী ২১ শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৫ সালে সারা ভারত ব্যাপী যে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন—পূর্বাঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত বাঘা যতীনের অনুরক্ত, অনুগামী ও সহকর্মী যতীন্দ্র লোচন এই পরিকল্পনার সহিত যুক্ত ছিলেন। ঐ অভ্যুত্থান এক বিশ্বাস ঘাতকের জন্য ব্যর্থ হয়। অতঃপর বাঘা যতীনের নেতৃত্বে ভারত ব্যাপী ষড়যন্ত্রে কনিষ্ঠ ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। বিদেশ হইতে বৈপ্লবিক উদ্যোগে যে অস্ত্র-শস্ত্র আমদানির আয়োজন হয়েছিল তাহার কিয়দংশ বাংলার উপকূলে নামাইবার কথা ছিল। সুন্দরবন হয়ে মজুত অঞ্চলে তাহা খালাস করিবার জন্য অন্যান্যদের সহিত লোচনদা কয়েকদিন জঙ্গলে অতিবাহিত করেন ও গাছের উপর দিনরাত বসে থেকে দূরবীণের সাহায্যে সমুদ্র নিরীক্ষণ করতে থাকেন।

রাসবিহারী বসুর বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে যাদুগোপাল মুখার্জীর নির্দেশে অনুশীলন ও যুগান্তর বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে তিনিই রাসবিহারী বসুর সাথে যোগাযোগ করেন। এই সাক্ষাৎকার ঘটে বৈহাটীর কাছে জানবগরে।

পরে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রকে জাপানে পাঠাবার জন্য যখন রাসবিহারী বসু এক জরুরী বার্তা পাঠান তা লোচনদার মারফৎ সঠিক স্থানে পৌঁছায়।

১৯১৪ সালে পাঠ্যাবস্থায় হেরম্ব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (শিবপুর) থেকে

হত্যা কোম্পানি হইতে অপহৃত দুইটি পিস্তল সহ তিনি ধরা পড়েন ও কারারুদ্ধ অবস্থায় কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ঐতিহাসিক অনশনধর্মঘটে (ভারতের জেল ইতিহাসে সর্বপ্রথম) তিনি অন্যান্য বিপ্লবী নেতা কিরণচন্দ্র মুখার্জী, যতীন সেঠ, মনোরঞ্জন গুপ্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ প্রমুখদের সাথে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে কারামুক্তির পর তাঁকে বিভিন্ন স্থানে বহু বৎসর অন্তরীণ অবস্থায় কাটাতে হয়।

স্বাধীনতা লাভের পরও তাঁহার বাসস্থান বিপ্লবী সতীর্থদের মিলন কেন্দ্র ছিল। রাঁচি হইতে কলিকাতায় আসিলে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় কয়েকবার ঐ বাড়ীতে ছিলেন। এবং সেই সময় ভূপতি মজুমদার, অতুল কৃষ্ণঘোষ, কাশীচরণ ঘোষ, এবং লেখক প্রমুখ অনেকেই তথায় সমবেত হইতেন।

ব্যবহারিক জীবনে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রতিযশঃ কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ার ও আর্কিটেক্ট ছিলেন। তিনি মহাজাতি সদনের পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে ডিজাইন ও প্ল্যানিং এর সাথে যুক্ত ছিলেন।

বিপ্লবী সতীন্দ্রলোচন মিত্র ১৮৯৯ সালের ১১ই এপ্রিল কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯৬৮ সালের ২০শে জুন স্বগৃহে পরলোক গমন করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র সমরলোচন মিত্র ও বর্ত্তমানে সমিতির একজন বিশিষ্টকর্মী। উল্লিখিত তথ্যগুলির অধিকাংশ তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত।

এই অবসরে বিপ্লবীদের অগ্নিযুগের গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্রের জন্য তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাই।

শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি সম্পন্ন—বিখ্যাত 'ফলিতজ্যোতিষ' গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীহরিহর জ্যোতিশাস্ত্রী

বি, এ, এল, এল, বি (কলি :) এ, সি, আই, আই (লণ্ডন)

প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে ১১টা এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার ব্যতীত অন্যদিন বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বপ্রকার জ্যোতিষী কার্য্য করেন।

কোষ্ঠী বিচারের পারিশ্রমিক ন্যূনাপক্ষে ২০ টাকা।

চেম্বারের ঠিকানা :

পি-৩৪, কাননগো পার্ক, পড়িয়া, ২৪ পরগণা

৫ নং বাসরুট, বৈষ্ণবঘাটা ষ্টপ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

ইংল্যাণ্ডে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

অনুযোদন প্রত্যাহার করে নেওয়ার আদেশটা অবশ্য তখনও পর্যন্ত সুপারিশের পর্যায়ে ছিল। ভারত সরকার কর্তৃক উহার চূড়ান্ত করণ বাকী ছিল। এখানেই একটু-খানি আশার আলো দেখা গেল। এই রকম ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে আর কখনও না ঘটে, সেজন্য আমরা সব প্রকার গ্যারান্টি প্রস্তাব দিয়ে ভারত সরকারের নিকট আবেদন করলাম। বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠান হল। সিনেট কর্তৃক সেই গ্যারান্টি মেনে নেওয়া হল। আনুগত্যের সহিত সেই গ্যারান্টি প্রতিপালিত হল। এই ভাবে সেই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির পরিসমাপ্তি ঘটল। এর পরে আংশিক ভাবে পুনর্গঠিত হয়ে রিপণ কলেজ তার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয় কর্তব্য সাধন করে নিজেকে রক্ষা করে আসছে।

কলেজের এই ঘোর বিপদের সময় যারা সাহায্য করেছেন তাদের কথা উল্লেখ না করে এই প্রসঙ্গ থেকে বিদায় নিতে পারছি না। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে গণ্য হচ্ছেন স্বর্গত স্যার তারকনাথ পালিত। তাঁর কথাই আগে বলতে হয়। ১৮৬৮ সাল থেকেই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। আমার পিতার সঙ্গে তারকনাথের পরিচয় ছিল। আমার পিতার প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রথম দেখা হয় ইংল্যাণ্ডে এবং সেখানেই আমাদের বন্ধুত্ব ঘটে আজ তিনি আর বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর সুমধুর ও পবিত্র স্মৃতি এখনও বহন করছি। যত উৎসাহী ও হৃদয়বান পুরুষ দেখেছি, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। জীবনে পছন্দ অপছন্দ দুটি বিষয়েই তাঁর মন ছিল দৃঢ়। তাঁর চরিত্রের মধ্যে একটা বিরাট ঋজুতা ছিল। সুস্পষ্টভাবে এবং দৃঢ়তার সহিত নিজ মত ব্যক্ত করতে তিনি কখনও ইতস্তত করতেন না। এ ব্যাপারে অন্যে কি ভাবতে পারে সময় সময় সেদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। বন্ধুদের প্রতি তিনি উদার হৃদয় হলেও নিজের পাওনাটা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিতেন। সামাজিক জীবনে অনেক প্রচলিত রীতি-নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা সময় সময় অসুবিধায় পড়ে। কিন্তু তিনি তাঁর ব্যবহারের মধ্যে এ সমস্ত রীতি-নীতির বড় একটা ধার ধারতেন না। তাই এদিক থেকে তাঁর মত লোক খুব কমই দেখেছি। সারা জীবন তিনি স্বদেশী আন্দোলনের একজন উৎসাহী বন্ধু ছিলেন। স্বদেশবাসীগনের প্রতি তাঁর সমবেদনা এত অধিক ছিল যে তিনি তাদের জন্য যে রাজকীয় দান রেখে গেছেন তাতেই তা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর যথাসর্বস্ব তিনি বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য দান করে গেছেন। তিনি রিপণ কলেজের ব্যাপারে এগিয়ে এলেন তাঁর হৃদয়ের সমস্ত উদার দৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে এবং স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রকেও এ কাজে আগ্রহী করে তুললেন।

স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্রের সাহায্য ও সহযোগিতাও ছিল অতি মূল্যবান। এই সময়ে আমি তাঁর সঙ্গে—আমি বলিই সংস্পর্শে আসি। তাঁকে আমি যতই দেখেছি ততই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাকৃষ্ট হয়েছি। তিনি ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং প্রচুর অসামান্য ও দুর্লভ সাধারণজ্ঞানের অধিকারী। আমার সর্বদাই মনে হত আমাদের বাঙ্গালী-দের মধ্যে তিনি ছিলেন এক সুন্দরতম দৃষ্টান্ত পুরুষ। তিনি যে কেবল মাত্র একজন উচ্চস্তরের বিচারকই ছিলেন, তা নয়। একজন মহৎ প্রাণ ব্যক্তি ও ছিলেন তিনি।

আর এক বন্ধু যিনি আমাকে এই সময় সাহায্য করে-ছিলেন তিনি হলেন মনোমোহন ঘোষ। তাঁর সম্পর্কেও আমি দু-একটি কথা বলতে চাই। তাঁর স্বনামধন্য ভ্রাতা লালমোহন ঘোষের মত এত বড় প্রতিভাধর তিনি ছিলেন না বটে; কিন্তু মানবীয় চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষের দিক থেকে তিনি ছিলেন আরও বেশী উন্নত। অভাবে পড়ে যারাই তাঁর কাছে যেতেন তাদের সঙ্গেই তিনি বন্ধুর মত ব্যবহার করেছেন। অনেক নির্দোষ ও নিরীহ ব্যক্তি তাঁর দয়ায় এবং বিনা পরিশ্রমকে সওয়াল করায় জীবন ও মুক্তি পেয়েছে। তাঁর সম্পর্কে একটি কাহিনী শুনে-ছিলাম, যেটি আমার এখনও মনে আছে, যে বন্ধুর কাছে এই কাহিনীটি শুনেছিলাম তিনি একদিন মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে যান। কিন্তু তিনি তখন বাড়ীতে ছিলেন না, বন্ধুটি দেখলেন যে অন্য একজন বৃদ্ধ লোক তার অফিস ঘরে বসে আছেন। বন্ধুটি তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। সেই বৃদ্ধ লোকটি তাকে বললেন যে হত্যার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা আনা হয়েছিল কিন্তু মনোমোহন ঘোষের চেষ্টায় তিনি ফাঁসির দড় থেকে মুক্তিলাভ করেছেন। তিনি একজন দরিদ্র ব্যক্তি, মনোমোহন ঘোষকে তিনি কিছুই দিতে পারেন নি; আর তিনি তার কাছে কিছু চানও নি। তাই [illegible]

পর বছর ধরে এই মহান এডভোকেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আসেন। পরম হিতকারী মনোমোহন ঘোষ তার কাছে ছিলেন একজন দ্বিতীয় পিতার মত যিনি তাকে ফাঁসির মঞ্চ থেকে বাঁচিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই দরিদ্র বৃদ্ধ লোকটি আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে শিশুর মত কান্নায় ভেঙে পড়ে। এই মৃত্যু সংবাদ তার কাছে একটা প্রচণ্ড আকস্মিক আঘাতের মত এসে পড়ল। কিছুক্ষণের জন্য লোকটি একেবারে সাধনার বাইরে চলে চলে গিয়েছিল।

আজ এরকম আইনজীবী কোথায় যিনি তার সহৃদয়তার দ্বারা মক্কেলের চিত্ত জয় করেছেন, মক্কেলের সেবা করেছেন বা তাঁকে বাঁচিয়েছেন? একথা আমার স্মরণে আছে যে মনোমোহন ঘোষ এই রকম বেশ কয়েকটি মামলায় কোন পারিতোষিক গ্রহণ করেন নি বা কোন প্রকার পারিশ্রমিকেরও আশাপোষণ করেন নি, কিন্তু আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গেই সে কাজ করেছেন। তাঁর এই চিত্তবৃত্তি তাঁর আইন জীবীর বৃত্তি-পক্ক কোঠা থেকে অনেক উর্ধ্বে তুলে দিয়েছে। একজন কৃত-কর্মা এডভোকেট হিসাবে তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেছেন যদিও করে তিনি ওঁর অন্যান্য বন্ধুদের মত অতবড় ধনশালী হতে পারেন নি। কিন্তু তিনি যাদের সেবা করেছেন সেই নিরীহ, গরীব ও বিবেকহীন পুলিসের দ্বারা উৎপীড়িত মফঃস্বলের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার অমূল্য সম্পদ তিনি কুড়িয়েছেন।

ফৌজদারী মামলার আসামীদের পক্ষ সমর্থনে এক নিজস্ব পরিকল্পনা তিনি অনুসরণ করতেন। তিনি বুঝেছিলেন যে সংবাদপত্র গণ-স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে একটা দুর্গ প্রকার বিশেষ। তাই যখনই কোন বড় রকমের ফৌজদারী মামলা পরিচালনায় তিনি হাত দিতেন, তিনি কোর্টে একজন সংবাদপত্রের সংবাদ দাতাকে সঙ্গে নিতে ভুলতেন না যাতে মামলার শুনানীর পূর্ণ বিবরণ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। এই কারণে মফস্বলের কুবুদ্ধিপরায়ণ ম্যাজিষ্ট্রেটদের কাছে তিনি এক আতঙ্ক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মূর্তির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে একথা বলা যেতে পারে যে ম্যাজিষ্ট্রেটদের খাস খেয়ালী চাল করার ব্যাপারে তাঁর একটা সুনিয়ন্ত্রিত ভূমিকা ছিল। ফৌজদারী মামলার এডভোকেট হিসাবে তিনি যে অনন্য সাধারণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তার ফলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ফৌজদারী মামলার বিচারে প্রশাসনিক ক্ষেত্র থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করা একান্ত প্রয়োজন। সময়ে অসময়ে সর্বদাই তিনি এইরূপ সংস্কার সাধনের কথা বলতেন। প্রধানতঃ তাঁরই জন্য এই সংস্কারের প্রশ্নটি সক্রিয় রাজনীতির সম্ভাবনীয়ের মধ্যে এসে পড়ে। বিচার বিভাগীয় সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি এক অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে চলছেন। তাঁর অকাল মৃত্যু-জনিত শোক সেই নিষ্ঠাকে পবিত্রতা দান করেছে।

দারুণ সন্ন্যাস রোগ কিভাবে তাঁকে জগত সংসার থেকে নিয়ে গেল সে ঘটনাবলীর বিবরণ এখানে দিচ্ছি। তিনি তখন তাঁর কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে ছিলেন। বাড়ীটি তিনি পুনর্নির্মান করে খুব সাজিয়েছিলেন এক রাজ-প্রাসাদের মত করে স্থির হয়, তিনি মাদ্রাজে তাঁর পুত্রকে দেখতে যাবেন। তাঁর পুত্র তখন মাদ্রাজ সিভিল সার্ভিসে কাজ করতেন। মাদ্রাজের পথে তিনি কলকাতা রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। একটি ইংরেজী পত্রিকায় সদ্য প্রকাশিত বিচার বিভাগকে প্রশাসনিক বিভাগ থেকে আলাদা করা সম্পর্কে স্যার চার্লস ইলিয়টের লেখা একটি নিবন্ধের বিষয় নিয়ে সেদিন সকাল বেলায় একটা তপ্ত আলোচনা হয়। এ ব্যাপারে তাঁর অনুভূতি ছিল খুবই তীক্ষ্ণ। তিনি মনে করলেন যে স্যার চার্লসের সমালোচনার এক পুরা ও সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেন এই চিন্তাই তাঁর মনকে পেয়ে বসে এবং অস্বাভাবিকভাবে উত্তেজিত করে তোলে। সেই অবস্থায় তিনি স্নানের ঘরে যান এবং সেখানে সাংঘাতিক সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত সংবাদটি সমস্ত শিক্ষিত মহলে ছড়িয়ে পড়ল। তারা সকলে এই রকম একজন সৎ, খাঁটি ও স্বদেশ প্রেমিক ব্যক্তি জন্য আন্তরিক ভাবে শোক প্রকাশ করেন। ১৮৯৬ সালের সেই অক্টোবর মাস কবে চলে গেছে। কিন্তু তাঁর দেশবাসিগণ কোন সভা-সম্মেলনে তাঁর নাম স্মরণ করতে গিয়ে গভীর আবেগে অভিভূত না হয়ে পারেন না।

(চলবে)

সি, পি, এম, কৌশল পাল্টেছে

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার শীর্ষে আসন পাবার পর হঠাৎ ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারের প্রধান ও ক্ষমতাশালী শরিক হিসাবে সি. পি. এম্ শাসন ক্ষমতা দখল করেছে এবং এই রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তার নিজস্ব নীতিই প্রাধান্য পাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও সি. পি. এম দল-নেতা প্রমোদ দাসগুপ্ত মহাশয় যৌথ দায়িত্বে ও নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ শাসন করছেন। অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি সঙ্গে সাথে আছে এই পর্য্যন্ত। দলীয় সভায় প্রমোদবাবুই সর্ব্বেসর্বা তাঁর নীতি ও নির্দ্দেশেই রাজ্যের শাসনকার্য্য চলছে এবং চলবে বলে মনে হয়। সি. পি. এম দলের সংগঠনীশক্তি ও ক্যাডারদের শৃঙ্খলাপরায়ণতা এবং দলের প্রতি আনুগত্য সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু বর্ত্তমানে সি, পি, এম-এর শ্রমিক ফ্রন্টের কর্ম্মীদের মধ্যে দলের প্রতি কিছু কিছু বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাচ্ছে, কারণ এতদিন যে নিতিতে সিটুর শ্রমিক সংগঠনগুলি কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল সে নীতি মার্কি দল ও জ্যোতিবাবু, দলের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে পরিত্যাগ করতে পরামর্শ দিচ্ছেন। দল গণতন্ত্রের ধ্বজা ধরে ও গণতন্ত্রের ধুয়া নিয়ে ও অন্যান্য গণ-তন্ত্রী দলের সহিত লোকসভা নির্ব্বাচনে আঁতাত করেও তাহাই ফলশ্রুতিতে তবে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে পশ্চিম বঙ্গে ও ত্রিপুরায়। গণতন্ত্রই সি, পি, এম কে ক্ষমতায় বসিয়েছে মনে কোনও আশা ছিল না। অতীতের স্বৈরতান্ত্রিক নীতি যা অন্ধ্রের তেলেঙ্গানায়, পশ্চিমবঙ্গের তাক-দ্বীপ ও দক্ষিণবাড়ী—রাজাপুরে অনুসৃত হয়েছিল বিপ্লবের ধুয়া ধরে আর লাল ঝাণ্ডা তুলে ধরে তা জনগণের মনে সমাক সাড়া জাগাতে পারে নি, অপরপক্ষে তা জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি কোরে চরম ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছিল—সে কথা কে না জানে? জ্যোতিবাবু ও প্রমোদবাবু তাই এবারে লাইন পরিবর্তন করে কৌশল পাল্টেছেন। তাই ভূতের মুখে রামনাম শুনা যাচ্ছে। এখন সি, পি, এম রাতারাতি গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ পূজারী বলে নিজেকে সদা সচেষ্ট দেখা যাচ্ছে। এঁদের এখন সবচেয়ে বড় শত্রু শ্রীমতী গান্ধী—যাঁকে এঁরা স্বৈরতন্ত্রী আখ্যায় ভূষিত করে জনতাদলের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে ভারত শাসন ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে মগ্ন ও বিভোর। মোরারজী ভাইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কেবল দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির আশায় যদিও নীতিগত ভাবেই এই সি, পি, এম মোরার-জীর চরম বিরোধী এবং মোরারজী ভাইও চরম সি, পি, এম বিরোধী। সি. পি, এম মূলতঃ স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী, কিন্তু কার্য হাসিলের জন্য মুখে গণতন্ত্রী সেজে ভারত গ্রাস করতে উদ্যত তাই সে গণতন্ত্রের মুখোস পরে শনৈঃ শনৈঃ সারা ভারতের সকল রাজ্যেই যেনতেন প্রকারেণ লোকসভার আসন যত অধিক সংখ্যায় দখল করা যায় তত অধিক সংখ্যায় দখল করার আগ্রহে 'ডবল কুইক মার্চ্চ' করে এগিয়ে যাবার চেষ্টায় আছে। তবে ভারত দখলের আশা সুদূর পরাহত কারণ পশ্চিমবঙ্গে বা ত্রিপুরায় সাধারণে শ্রীমতী

গান্ধীর উপর বিরূপ হয়ে বিকল্প কিছু না পেয়ে এবং সি, পি, এম এর ধোঁকাবাজীতে বিভ্রান্ত হয়ে ভুল করে সি, পি, এমকে ভোট দিয়েছিল। সে ভুল আজ তোদের সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গেছে। সি, পি এম এর দলবাজী ও কেবল দলীয় লোকদের সুযোগ সুবিধা একচেটিয়া ভাবে দেওয়ার ব্যাপার দেখে মানুষ, বিশেষ করে যারা কোন রাজনীতিতে জড়িত নয় তারা বীতশ্রদ্ধ ও হতাশ—একথা বেশ লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে ও ত্রিপুরায় সি; পি, এম তার দল বাড়াবার কন্সিতেই যা কিছু কাজ, তাই করছে। জনকল্যাণ বা দেশকল্যাণ তার কাম্য নয়। দলকে সুগঠিত ও সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই প্রমোদ বাবুর একমাত্র লক্ষ্য—আর সেই জন্যই দলীয় লোকদের বেকারভাতা দেবার রাজকীয় ব্যবস্থা। দল ছাড়া এইদেশে যে অগণিত মানুষ আজও দারিদ্রের শেষ সীমায় উপনীত হয়ে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন, শিক্ষাহীন, আশ্রয়হীন, ও মর্য্যাদাহীন অবস্থায় দিন যাপনের চরম গ্লানি বহন করতে বাধ্য হচ্ছে—সে কথা প্রমোদবাবু ও জ্যোতিবাবুরা কি জানেন না? সবই তাঁরা জানেন এবং বেশ ভালভাবেই জানেন। দেশের মানুষের চেয়ে দলই বড়—আর এই দুঃস্থ মানুষের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আরো সহজ কারণ এদের দারিদ্র অন্তর্হিত হলে সর্ব্বহারার তথাকথিত দল সর্ব্বহারা পাবে কোথায় যে মুখে-রোচক বুলি আওড়ে ধাপ্পাবাজী করে ধোঁকা দিয়ে গরীবদের সমর্থন আদায় করা যাবে কি ভাবে? ভারী সুন্দর কৌশল ও কায়দা—কিন্তু অনন্তকাল এই কায়দা ও ছলনা নিশ্চয় আজিকার মত সচল থাকবে না।

ইতিপূর্বে ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে যুক্ত ফ্রন্টের পতাকাতলে সি, পি, এম ক্ষমতায় শীর্ষে বসেছিল এবং সে সময়ে শাসন ক্ষমতায় বসে থেকে পুলিসকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে রেখে দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে রাজ্যশাসনের অভিনব পন্থায় সাধারণ মানুষকে সন্ত্রস্ত ও বিভ্রান্ত করে এক ভীতি ও অরাজকতার রাজ্য শাসন পদ্ধতি সি, পি, এম, চালু করে ছিল যার ফলে যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় মুখোপাধ্যায়কে ঘোষণা করতে বাধ্য করেছিল যে, এ সরকার বর্ব্বরের সরকার, কোন সভ্য দেশে এমন বর্বরোচিত সরকারের গদীতে থাকার অধিকার থাকা অন্যায় ও অনুচিত। গত দুইবারের অভিজ্ঞতায় জ্যোতি বাবু যে শিক্ষা পেয়েছেন তাতে এবারে তিনি সেই পূর্ব্বের বর্ব্বরোচিত আচরণের মাধ্যমে তাঁদের দলীয় উচ্ছৃঙ্খল কর্মীদের দিয়ে শাসন ব্যবস্থাকে কলুষিত করার সাহস পান নি। এটা সত্যই শুভ লক্ষণ, তবে গ্রামে গঞ্জে খেতে খামারে মেহো-ভেড়ীতে, পূর্ব্বেকার মত খুন, জবর দখল লুঠ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা লেগেই আছে। যে সব গ্রাম এলাকা গুলি থানা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত সেই সব এলাকাগুলিতেই সি, পি, এম এর দুবৃত্ত শ্রেণীর সমর্থকরাই উক্তরূপ জঘন্য ও নক্কারজনক অত্যাচার চালিয়ে জনজীবনকে অতিষ্ট করে তুলেছে। প্রতিকারহীন চরম দুর্দ্দশার মধ্যে সাধারণ মানুষ অকথ্য কষ্ট ও লাঞ্ছনার শিকারে পরিণত হতে বাধ্য হচ্ছে কারণ পুলিস প্রায় সর্ব্বত্রই নিষ্ক্রিয় দর্শক রূপে বিরাজমান আজ আইন পুলিশের হাত থেকে নিয়ে প্রমোদবাবু দের ক্যাডারের হাতে তুলে দিয়েছেন। অতএব যারা ছোটচাষী বা প্রান্তিক চাষী তারা যদি সি, পি, এম এর

সমর্থক না হয়, তবে আর তাদের রক্ষা নাই—আর জোতদার বা বড় চাষী যদি সি, পি, এম এর সমর্থক বা দলীয় লোক হয় তবে তার সাতখুন মাপ। এমন দলীয় রাজত্ব অর্থাৎ দলপতির হুকুমই রাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধারের হুকুম ইতিপূর্ব্বে ১৯৭৬ ও ১৯৬৯ সালে ছাড়া আর সুদূর অতীতে এদেশে দেখা যায় নি, এরই নাম কি সি, পি, এম মার্কা গণতন্ত্র? এ যদি গণতন্ত্র বলে আখ্যাত হয়, তবে স্বৈরাতন্ত্রী কি জিনিষ? এঁরা আবার ইন্দিরাকে স্বৈরতন্ত্রী বলে নিন্দা করেন—কি অদ্ভুত পরিস্থিতি? পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের চেয়ে এবারের কৌশল ভিন্ন প্রকারের। ভূমি ও ভূমি সংস্কার ব্যাপারে পূর্ব কৌশলই এখনও অনুসৃত হচ্ছে এবং গ্রামে গঞ্জে ত্রাসের সরকার ক্রমশই বর্দ্ধিত আকার ধারণ করছে; নাচেৎ প্রফুল্লসেন প্রায় চার হাজার অগ্নাধ, জুলুম ও অত্যাচারের প্রতিকার মানসে জ্যোতিবাবুর কাছে আর্জি পাঠাতে সক্ষম হতেন না—আর এর মূলে সি, পি, এম কর্মী ও সমর্থক দের দৌরাত্মের সংবাদই পাওয়া গেছে। যদিও কলে কারখানায় এবারে ঘেরাও, ধীরে চলো নীতি (slow down) নিয়মমাফিক কাজ, ধর্মঘট ও মালিক, ম্যানেজার ও সুপার ভাইজারের উপর কায়িক নির্যাতন ইত্যাদি ব্যাপারে সি, পি, এম নেতৃত্ব প্রশ্রয় দিতে নারাজ বলেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সিটুর ইউনিয়ন নেতারা এর ফলে বেশ বিক্ষুব্ধ ও দলের হঠাৎ এরূপ মতিগতির সম্বন্ধে বিরক্তি নিয়ে বিরুদ্ধাচরণের পথে এগিয়ে যেতে প্রয়াসী ও বদ্ধ পরিকর। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এতকাল শিল্পে ধীরে চল নীতি, অল্প কাজে অধিক বেতনের দাবী, অহেতুক ধর্ম্মঘট ইত্যাদির মাধ্যমে যে উৎপাদনকে ব্যাহত ও বিপর্য্যস্ত করে রাজনৈতিক মুনাফা লুঠছিলেন সে পথের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন আজিকার প্রমোদ জ্যোতি সরকার। প্রমোদবাবু এখন পশ্চিমবঙ্গের বা ত্রিপুরার শাসনকার্য্য নিয়ে তত চিন্তিত নয় যত চিন্তিত ভারত শাসনের চাবিকাঠি-টি গণতন্ত্রের মিথ্যা ভেক ধরে কি ভাবে কোন পথে আয়ত্ত করা যায় তাই নিয়ে। কাজেই তাঁর দলের শ্রমিক ফ্রন্টের নেতাদের কিছু উষ্মাকে আমল দিতে গেলে আখেরে আসল লক্ষ্যে পৌছান অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে এই কারণে মহা মুস্কিলে পড়েছেন প্রমোদ জ্যোতি সরকার।

বিদ্যুৎ ঘাটতির ফলে ব্যাপক লোডশেডিং শুধু কলিকাতায় বা তার পার্শ্ববর্তী সহরাঞ্চলে নয় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এমনই নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে যে কলকারখানাগুলি প্রায় অচল, ছেলেমেয়ে দের পরীক্ষার পড়াশুনা শুরু ও বিরাট ক্ষতিগ্রস্থ, সেচের জন্য ডীপ্ টিউবওয়েল বন্ধ, হাসপাতালে রোগীদের চরম দুর্গতি, ছাপাখানাগুলি প্রায় বন্ধ ও চারিধারে অন্ধকারের বিভীষিকা মানুষকে যেন গ্রাস করতে আসছে এবং শ্রমিক কৃষক কর্ম্মহীন, কাজ রোজগারহীন জীবনের সামনে সম্মুখীন হতে বাধ্য হচ্ছে বিগত চোদ্দ পনের মাস ধরে—এর কোন স্থায়ী প্রতিকার আজও হলো না অথচ এই বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্য জ্যোতিবাবুর ১৯৬৯ সালের অদূরদর্শী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই সম্পূর্ণ দায়ী। শুধু তাই নয় সিটুর ইউনিয়ন কর্ম্মিরা পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে যানচাল করে চলেছে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই এবং সেই অবস্থা আজো চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে বলে অনুমান হয়। জ্যোতিবাবু বা প্রমোদবাবুরা বিদ্যুৎকর্মিদের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াইয়ে বারে বারে পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হচ্ছেন, কারণ সিটুর নেতৃত্ব

ধ্বংস ছাড়া কোন কিছু গড়ার কথা ভাবে না বা ভাবতে চায় না। তারা সেই সাবেকীচালেই চলতে অভ্যস্ত যাতে ভাঙ্গন ধরানই যায়, শিল্প বাণিজ্যের ক্ষতি করাই যায় কিন্তু গঠনমূলক কোন উন্নয়নই তাদের দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। প্রমোদ-জ্যোতি বাবুর সরকার যত সহযোগীতা ও সাহায্য তাদের কাছে চান না কেন, তারা কোন মতেই সে সাহায্য বা সহানুভূতি দেবে না ও দেখাবে না, দোষ কারো নয় ত মা / আমি স্বধাত-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা। —এই হলো আজ সি, পি, এম এর বাস্তব অসুবিধাও হলে চরম অব্যবস্থা। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমনিমজ্জমান—এর উদ্ধারের পথ সি, পি, এম এর জানা নেই। রাষ্ট্র দখল করা যত সহজ রাষ্ট্র পরিচালনা করা তত সহজ নয়—একথা আজ হাড়ে হাড়ে প্রমোদ-জ্যোতি সরকার প্রতিদিনই বুঝতে পারছে আর তাই যত দোষ নন্দ ঘোষ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের দোষেই পশ্চিমবঙ্গে যত অনাসৃষ্টি। হায় চালাকি দ্বারা কোন মহৎকার্য্য সম্পাদন করা সম্ভব নয় একথাটাও কি প্রমোদ জ্যোতি সরকার জানে না? না জেনে শুনে জ্ঞানপাপী বলেই এত ছলনার এত কপটতার ও এত মিথ্যার বেসাতিতে সি, পি, এম সিদ্ধহস্ত?

সি, পি, এম বিগত ত্রিশ বৎসরকাল প্রশাসনিক কর্ম্মিদের মধ্যে প্রচার করে এসেছিল যে, বুর্জ্জোয়া শাসন ব্যবস্থায় সর্বহারাদের কল্যাণ সম্ভব নয়। অতএব প্রশাসনকে স্তব্ধ ও বানচাল করার জন্য তারা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মাধ্যমে তাদের কর্ম্মি ও সমর্থকদের সব সময়েই গয়ং গচ্ছ গতিতে ও নিয়ম মাফিক কাজের পদ্ধতিতে চলতে ও প্রশাসনকে প্রায় অচল করার মতলবে পন্থা গ্রহণে উৎসাহীত করে এসে ছিল। কিন্তু আজ মিন্তেরা শাসন ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছে যে প্রশাসনকে গতিশীল করতে না পারলে সরকার ভেঙ্গে পড়বে। তাই সরকারকে বাঁচাবার তাগিদে জ্যোতিবাবু ও প্রমোদবাবু একই সুরে প্রশাসনিক কর্ম্মিদের জোর কদমে কাজ চালাতে পরামর্শ ও আদেশ দিচ্ছেন। দীর্ঘদিন যারা প্রায় কাজ না করে বা খুবই অল্প কাজ করে বেশ মোটা বেতন পেয়ে আসছিল তারা এতে মুখে সায় দিলেও মনে সায় দিতে পারছে না এবং যৎ পরোনাস্তি বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হচ্ছে আর ভাবছে—এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে রঘুরাজ। হঠাৎ এই লাইন পরিবর্ত্তনে নেতাদের প্রয়োজন মিটতে পারে, কিন্তু কর্ম্মি ও সমর্থকরা এতে বিরক্ত ও বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হলে কি তাদের দোষ দেওয়া যায়? বহুদিনের আয়েসী সরকারী কর্ম্মচারীরা আজ হঠাৎ কর্ম্মচঞ্চল হয়ে উঠবে এ আশা প্রমোদ-জ্যোতি সরকার করে কোন ভরসায় বুঝা কঠিন। তবে আজ অতীতের অন্যায় ও কুমতলবগুলি নিজেদের পথে কাঁটা বিছিয়ে দিলে করার কিছু নেই। সুতরাং যে নিশ্চিতভাবেই হবে, তা কি তাঁরা জানতেন না? ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ এবং এর হাত থেকে কারো নিস্তার নেই। উদ্বাস্তুদের 'ডোল' বন্ধ করার মত হৃদয়হীন কাজে সি. পি. এম আনন্দ পায় এবং এরা আবার বড়াই করে কি নিষ্ঠুর চিন্তা ও কর্ম? ধিক এই হৃদয়হীন পাষণ্ডদের। এঁদের মুখেই দরিদ্রের কল্যাণের গল্প, কিন্তু কাজে আত্মকল্যাণ, গোষ্ঠীকল্যাণ এবং সর্ব্বোপরি দল কল্যাণ ছাড়া আর কোন চিন্তা বা কাজ নেই যে তা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে।

(চলবে)

বিপ্লব ও বিপ্লবীর দর্শন

সুবোধ মজুমদার

আজ সমাজের দিকে দিকে দেখা দিয়েছে বিপ্লবের প্রয়োজন। যদি সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ঘুষ নেওয়া বন্ধ হয়ে যায় তাহলে লোকে মনে করবে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে তাদের মধ্যে। যদি শিক্ষকরা যথাযথভাবে বিদ্যা অর্জন ও দান করেন তাহলেও লোকে বলবে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে তাঁদের মধ্যে। যদি পরীক্ষার্থীরা নকল না করে তাহলেও একই কথা বলবে লোকে। যদি চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, প্রভৃতি বন্ধ হয়ে যায় সমাজে তাও হবে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন যদি সর্বপ্রকার নেশার প্রতি আসক্তি লুপ্ত হয়ে যায় সমাজ থেকে তাহলে সেটাও হবে একটা বিরাট বৈপ্লবিক ঘটনা। যদি আলস্য ও লোভের প্রতি বিমুখ হয়ে যায় মানুষের মন তার চেয়ে বড় বিপ্লব আর কিছু হতে পারে না। যদি জীবনযান বাড়াবার বেপরোয়া আকাঙ্খা আর অর্থের প্রতি অন্ধ অনুরাগ মুছে যায় সমাজবাদীর মন থেকে তাহলে সেটাও হবে একটা বিপুল বিপ্লব। এই সবকিছু বিপ্লবের মূল বিপ্লব বলে ধরা হয় রাষ্ট্র বিপ্লবকে। যেহেতু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে নিতে পারলে বিপ্লবীরা অন্যসব বিপ্লবগুলোকে ঘটিয়ে দিতে পারেন অতি সহজেই।

কথাটা খুবই সত্য, যদি বিপ্লবের নেতাদের মধ্যে থাকে একটা পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবী জীবনদর্শন। যদি তাঁরা জানেন বর্তমানে প্রচলিত সমাজবিরোধী কাজকর্মগুলির মূল কারণ কী তাহলেই তাদের পক্ষে সম্ভব মূল কারণ দূরীভূত করে বিভিন্ন বিপ্লবগুলো ঘটানো। মূল কারণটি হচ্ছে ভ্রান্ত জীবনদর্শন, অর্থাৎ অবাস্তববাদী জীবনদর্শন।

জনসাধারণের সেবক সরকারী বা বেসরকারী উচ্চস্তরের কর্মচারীরা ঘুষ গ্রহণ করে লোভের বশবর্তী হয়ে। বহুকাল অনুশীলনের ফলে এই লোভই পরিণত হয়েছে মুদ্রা-বিকারে। ঘরে ঘরে, দেশে দেশে দেখা দিয়েছে এক বীভৎস মহামারী। ক্যাপাসিটর মহামারী—টাকা চাই, আরও টাকা চাই। বিদ্যের জন্য টাকা চাই সেটা বড় কথা নয়, টাকা চাওয়াটাই হচ্ছে বড় কথা। টাকা, টাকা, টাকা, আরও টাকা। টাকার জন্য সবকিছু দিয়ে দাও। উপযুক্ত টাকা পেলে প্রেম দাও, বুদ্ধি দাও, বিদ্যা দাও, সময় দাও, মান দাও, সুখ দাও, আনন্দ দাও, ভক্তি দাও। স্নেহ, ভালবাসা, সততা, সরলতা, সাধন, সুনীতি, সবকিছু বিক্রি করে দাও টাকার বিনিময়ে। ব্যক্তির সঙ্গে সরকারও বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠেছে টাকার জন্যে। চাই দেশী মুদ্রা, চাই বিদেশী মুদ্রা, কারণ ভ্রান্ত অবাস্তব জড়বাদী জীবন দর্শন অনুযায়ী দেশের সম্পদ দিয়ে বিদেশের মুদ্রা অর্জন রাষ্ট্রি দেশের পক্ষে কল্যাণকর।

ব্যক্তি মানুষ তার টাকা বাড়াতে চায়—(১) তা খরচ করে জীবন যান উন্নত করার জন্য, (২) তা সঞ্চয় করে ভবিষ্যত জীবন নিরাপদ করার জন্য, এবং (৩) এই উভয় পথে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য। কিন্তু এই তিনটে উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে একথা বুঝেও বুঝতে চায় না আধুনিক জড়বাদাচ্ছন্ন মন। প্রকৃত জীবন মানের অর্থ হচ্ছে—সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন নিয়ে আনন্দময় জীবন যাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সমাবেশ ও ব্যবহার। কিন্তু জড়বাদাচ্ছন্ন মন জীবনমান বলতে বোঝে যথাসম্ভব বেশী দ্রব্যের সমাবেশ এবং যথাসম্ভব বেশীপরিসেবা গ্রহণ। এই-দুটোই যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুখের অন্তরায়, এ-দুটোই যে দেহ ও মনের সুস্থতা নষ্ট করে একথা বুঝেও মেনে নিতে পারে না সে। কর্মচারীদের নিষ্ঠাবান ও কর্তব্যপরায়ণ করে তুলতে হলে মার্ক্সবাদী সরকারকে স্বীকার করতেই হবে জড়বাদের অপকারিতা।

ভ্রান্ত জীবনমানের ধারণার সঙ্গে জড়িত আছে বাহিরমুখিতা। জড়বাদ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুকেই সত্য ও প্রধান

মনে করে, তাই জড়বাদ-প্রচারিতরা অন্তরকে উপেক্ষা ক'রে শুধুমাত্র বাহিরটাকেই সর্বস্ব মনে করে। ভিতরে বিদ্যা না রেখে বাইরেটাকে বিদ্যার সার্টিফিকেট দিয়ে সাজাতে দ্বিধা করে না তারা। এই মনোভাব থেকেই নকল-টোকাটুকি বা অন্যান্য অসদুপায়ের আশ্রয় নেয় পরীক্ষার্থীরা। যদি বাস্তবমুখী আদর্শবাদ দ্বারা জড়বাদের বাহির-সর্বস্বতা বিলুপ্ত করা যায় মানুষের মন থেকে তাহলে সকল প্রকার দুর্নীতিই বিদূরীত হবে সমাজ থেকে। তখন কেউ ঘুষও নেবে না, চোরাকারবিও করবে না। শিক্ষকরাও তখন যথাযথভাবে বিদ্যা অর্জন ও দান করবেন। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, চোরাকারবার, কালোবাজার কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না তখন। অলসতা, লোভ, আলস্য মানুষের কাছে ঘৃণীচিকাসম মনে হবে তখন।

তবে সাধারণ মানুষকে বাস্তবমুখী ও আদর্শবাদী করতে হলে নেতাদের আগে হয়ে নিতে হবে বাস্তবমুখী ও আদর্শবাদী। সরকার নিজে একদিকে দেশের লোককে লটারির টিকিট কিনতে বলবে, অন্যদিকে তাদেরই বারণ করবে জুয়া খেলতে—এর চেয়ে বিসদৃশ আর হতে পারে না কিছু। সরকার নিজে অপর দেশের সম্পদ হরণ করার চেষ্টা করবে, আর সাধারণ লোককে বলবে চুরি-ডাকাতি করো না—সে কথা কখনও শুনতে পারে না তারা। বিপ্লব ঘটানোর আগে শাসকদের হতে হবে দার্শনিক; হতে হবে সাম্যবাদী।

দর্শন কেন?

প্রাসাদে মানুষ বাস করে। নিজের আরাম ও বিলাসের প্রয়োজনে সে নানা প্রকারে সাজায় প্রাসাদকে। প্রয়োজন মতো মেঝে, ছাদ, দেয়াল প্রভৃতি শক্তপোক্ত করে সে। হঠাৎ একদিন একটি সুরম্য প্রাসাদ প'ড়ে গেল ভেঙে। প্রাণহানি হলো বহু লোকের। কারণ খুঁজে বিশেষজ্ঞরা বললেন ভিতটা শক্ত ছিল না প্রাসাদের। বহুকালের অদর্শনে ভিতটাকে ভুলে গিয়েছিল সবাই তাই ভিতর শুকতের কথা শুনে চমকে উঠল যেন তারা। আজ সমাজ-ব্যবস্থার ভিত যে জীবনদর্শন তার কথা শুনেও চমকে ওঠে বহুলোক।

সমাজ ও রাষ্ট্র যখন বিকৃত হয় তার ভিতের কথা তখনই উৎকট হয়ে ওঠে সকল প্রকার সামাজিক দুর্নীতিগুলি। তার সঙ্গে শুরু হয় রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা। তখন একটা পাপচক্র সৃষ্টি হয় সমাজে। তার চাপে পড়ে প্রায় সকল সমাজবাসীই বাধ্য হয় কম বেশী দুর্নীতিতে লিপ্ত হতে। এই পাপচক্রকে বিনষ্ট না ক'রে সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব নয় কারও পক্ষে। আবার বিপ্লব ব্যতীত কেউ পারে না পাপচক্র বিনষ্ট করতে। কিন্তু বিপ্লবীকে আঘাত করতে হবে একেবারে পাপচক্রের কেন্দ্রবিন্দুতে। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন সময়ে পাপচক্রটাও ধারণ করে বিভিন্ন আকার। ফলে তার কেন্দ্রবিন্দুও হয় বিভিন্ন। বিজ্ঞানসম্মত দার্শনিক দৃষ্টি ব্যতীত বোঝা যায় না পাপচক্রকে বা তার কেন্দ্রবিন্দুকে। তাহলে আজ বিশ্ব সমাজের তথা ভারতীয় সমাজের পাপচক্রটাই বা কী, আর কেন্দ্রবিন্দুটাই বা কী? (চলবে)

পরলোকে বিপ্লবী বিনু বিশ্বাস

প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনু বিশ্বাস গত ১০ই অক্টোবর মঙ্গলবার পরলোক গমন করেছেন। তিনি বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শৈশবেই যুগান্তর দলের সভ্য হন। অধুনা বাংলাদেশের টাঙ্গাইলে তিনি ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স হইয়াছিল ৬০ বৎসর তাঁর স্ত্রী ও তিন পুত্র বর্তমান। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি ও পরিবার বর্গকে জানাই আমাদের আন্তরিক সমবেদনা।

(Contd. from 2nd Cover)

Name	Address	Amount Rs.	Date
Das Smt Shanta Bala w/o Late Gopinath Das	P. O. Tilkhoja P. S. Moyna Disi. Midnapore	200	4. 1. 77
Ojha Smt. Sajani Bala w/o Late Gopal Ch. Ojha	Prajabar, P.O. Ramchandrapur Anchal-3. P.S. Moyna, Dt. Midnapur	100	15. 8 72
Panja Das Smt. Nilima w/o Late Bhupati Panja Das	P. O. Sirulia, P. S. Nandigram Dt. Midnapur	150	23. 4. 75

ENHANCEMENT

Das Surendra Nath	93 Ganguli Bagan, Raipur Rd., Cal-47	200	1. 10 76
Das Gupta Smt. Provabati (For husband Sri Rajendra Kr.	S P: Block, A/11/A Chittaranjan Colony, Calcutta 32	200	,,
Ganguli Nishi Kanta	61 Sova Bazar Street Cal. 5	200	,,
Roy Phani Bh. alias Haripada	38/48 S.KJ Deb Rd. (1st Flr.) Cal. 48	200	,,
Roy Choudhury Kalipada	43 Regent Colony, Cal. 40	200	,,
Seal Baidyanath	14 1A Siddheswar Ch. Lane, Cal. 12	200	,,
Some Shanti Ranjan	P 229/C Darga Road, Col 17	200	,,
Das Smt. Lilabati w/o Late Rajani Kanta	Kayasthapara P.O. Haltu 24 Pargs.	200	,,
Dasi Smt. Swarna Prova w/o Late Mohendra Das	North Natagarh Canalside. P O. Pansila. Sodepur, 24 Pargs.	200	,,
Dutta Smt. Naresh Nandini w/o Late Sachindra N. Dutta	657/3 Ashokenagar 24 Parganas	200	,,
Debi Chaudhuri Smt Charusila w/o Late Mahini K Chaudhuri	Saktipur, P.O Agarpara	200	,,
Ghosh Smt Maya w/o Late Subodh Ghosh	P-67 Bansdroni New Govt. Colony P O Bansdroni, 24 Pargs.	200	,,
Ghosal Smt. Uma Rani w/o Late Tarapada Ghosal	Chanditola (Ghola) Sodepur 24 Parganas	100	,,
Kali Smt. Amiya w/o Late Chittaranjan Kali	Rathtala, P. O. Balurghat West Dinajpur	100	,,

Regd.No. R. N .24511/71 Biplabi Bangla Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—পঞ্চাশ ১৫.০০ টাকা ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা মূল্য—১.০০ টাকা

134

3 NOV 1979

সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীঅমিয় মুখোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীসুনীল চ্যাটার্জী, শ্রীবারীন রায়।
সম্পাদক—শ্রীঅমিয় কমল রায়চৌধুরী
বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বোম্বাই—শ্রীমনমোহন পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅমিয় সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীঅশোক গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪৯এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২
মুদ্রণে :—ডিলাইট প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

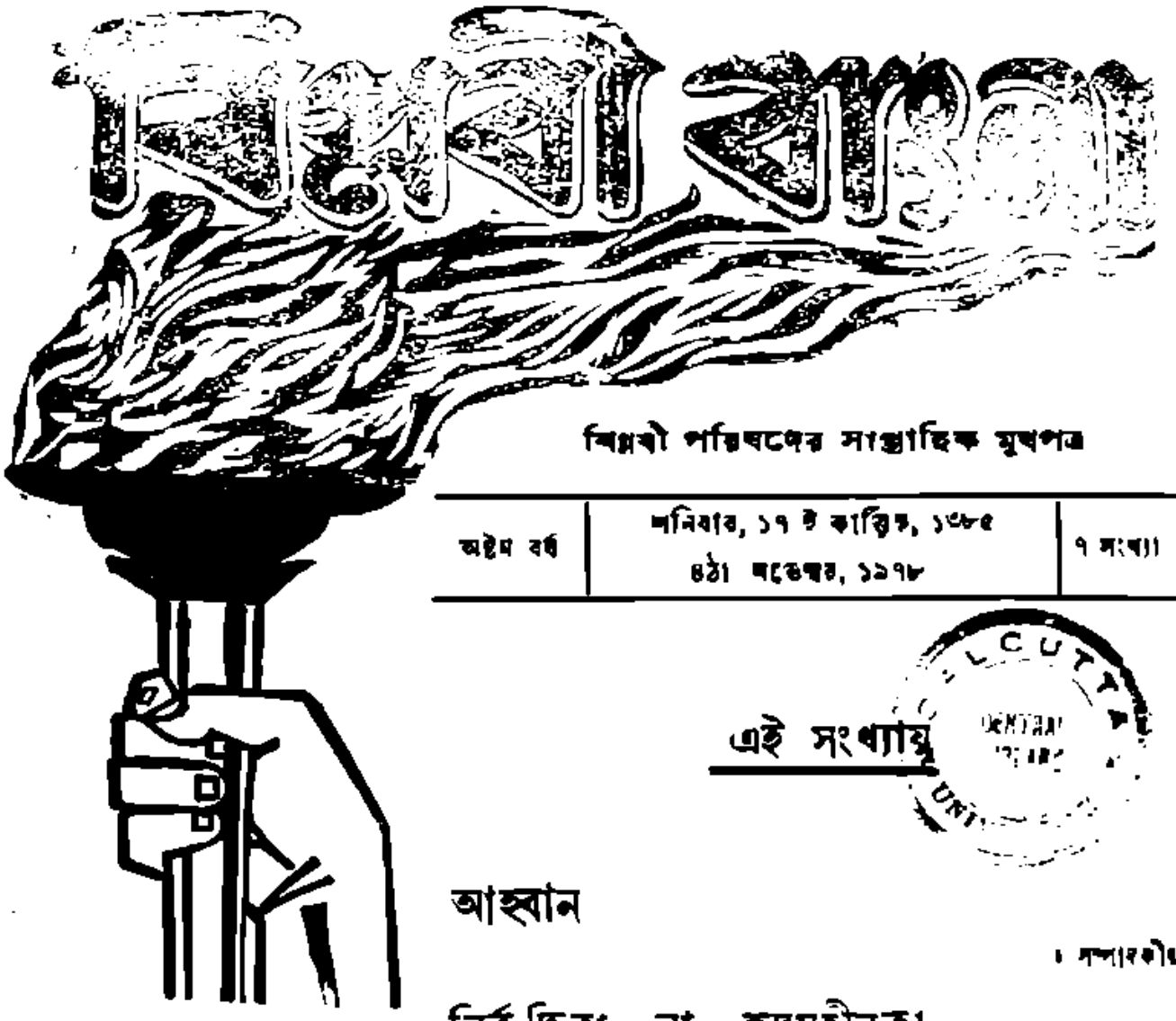

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

অষ্টম বর্ষ	শনিবার, ১৭ ই কার্ত্তিক, ১৩৮৫ ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭৮	৭ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

এই সংখ্যায়

আহ্বান

। সম্পাদকীয় ।

নির্বুদ্ধিতা—না—হৃদয়হীনতা

। শৈলেশ্বর ঘোষ গুপ্ত ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। অবোধ বসু ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক মতিনী মোহন ঘোষগুপ্ত ।

সি, পি, এম, কৌশল পাল্টেছে

। বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বিপ্লব ও বিপ্লবীদের দর্শন

। সুবোধ মজুমদার ।

লক্ষ লক্ষ লোক যাহা ভোগ করিতে পায় না, তাহা অর্জনের দৃঢ় অস্বীকৃতিই শ্রেষ্ঠতম বিধান।

—গান্ধীজী

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	CALCUTTA		
Chattarjee Amiya Kumar	63 Santoshpur Avenue, Cal. 32	200	1. 4. 77
Biswas Smt. Kalpana w/o Late Ashit Kr. Biswas	21 Ramnath Biswas Lane Calcutta-9	150	12 10. 77
Dhar Smt. Lila w/o Late Jitendra Ch. Dhar	144 Gandhi Colony, Cal. 40	150	29. 4. 73
Dutta Nikhil	108/4 Uttadanga Main Road Block - 8, Room—29 Cal 4	200	20 3. 74
Dutta Smt. Nirmala Bala w/o Late Charu Chandra	101/D Karaya Road, Cal. 19	150	27. 2. 78
Dutta Umesh Chandra	128 Rash Behari Avenue Calcutta-29	200	1. 10 76
Ganguly Smt. Nilima w/o Late Labanya Kr	P-24 Bama Charan Road Calcutta 34	100	5. 2. 78
Ghosh Joydeb	18 Dehi-Serampore Road Calcutta 14	200	1. 10. 76
Guha Smt. Tarulata w/o Late Tarakeswar	39A, Jubilee Park, Calcutta 33	100	2 1. 76
Sanyal Kumar Sima d o Late Bhabesh Sanyal	85-D Raja Dinendra Street	100	11. 1. 73
Sarkar Smt Bina	w/o Late Suresh Ch. Sarkar	100	14. 6. 78
Dey (alias) Hem Ch / Sarkar	45 Prafullanagar, Bokery Rd Cal. 56		
Sen Jitendra Lal	3/4/2 St George Terrace, Calcutta 22	200	1. 10. 76
Dutta Smt. Jyotsna w/o Late Monoranjan Dutta	2/12 Netajinagar, Cal. 40	100	16 7. 78

(Contd on 3rd Cover)

সম্পাদকীয়

আহ্বান

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মর্মন্তুদ দুর্যোগের করুণ অভূতপূর্ব ক্ষয়ক্ষতির আঘাত এসেছে। এই দুর্যোগ কতটা প্রকৃতির অবদান, কতটা মানুষের সৃষ্টি, তা নিয়ে আলোচনা করে ক্ষান্ত থাকলেই চলবেনা। সে বিচার অবশ্যই করতে হবে, ভবিষ্যতে এমনিতরো দুর্যোগের পুনরাভিনয় না ঘটবার জন্য। লক্ষ লক্ষ ঘর বাড়ী ধ্বংস হয়েছে, লক্ষ লক্ষ গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটেছে, চাষবাসের জমির প্রায় অপূরণীয় ক্ষতি সাধন হয়েছে। হাজার হাজার মানুষের প্রানহানি ঘটেছে। কিন্তু এটাই বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্য নয়। বন্যাজনিত দুর্বিপাকের পর এখনও যারা বেঁচে আছেন প্রায় অর্দ্ধমৃত ভাবে, তাদের পুনর্বাসনের কাজ সুষ্ঠু এবং সুপরিকল্পিত কার্যক্রমের মাধ্যমে অতি দ্রুত রূপায়ন করতে না পারলে, এই ক্ষয় ক্ষতির পরিমান আরো বহুগুন বেড়ে যাবে। তাই প্রয়োজন সর্বস্তরের মানুষের সর্বাত্মক সাহায্য এবং সহযোগিতা। দুঃখের কথা সন্দেহ নেই যে ত্রান ও পুনর্বাসনের কাজ নিয়ে দলবাজীর অভিযোগ উঠেছে। প্রয়োজন সেই অপচেষ্টাকে বন্ধকরা, প্রয়োজন আর্ত্ত এবং সর্বহারা মানুষের দরজায়, সাহায্য ও প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধপত্রাদি পৌঁছে দেওয়া। সরকার যদি মনে করে থাকেন যে একমাত্র তারাই, নিজেদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই বিরাট সমস্যার সমাধান করতে পারবেন সফলভাবে, অন্যমানুষের সাহায্য না নিয়েই, তবে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন বলেই প্রত্যেকটি চিন্তাশীল মানুষ মনে করেন। আমরা মনে করি এই যুগসন্ধিক্ষনে বাংলা দেশের মধ্যে এখনও যে বহুসংখ্যক বিপ্লবীরা বেঁচে আছেন, তাদের উপর একটি গুরুত্বর দায়িত্ব এসে পড়েছে। তাদের আমরা এগিয়ে আসতে অনুরোধ করি তাঁদের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য নিয়ে, আদর্শ নিষ্ঠা নিয়ে, সততা নিয়ে, সেবা-পরায়নতা, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও দেশ প্রেমের মহান আদর্শ নিয়ে। অতীতে সফলালাভের জন্য যে বে-হিসাবী অনাশক্তি বা নিস্পৃহতাও জীবনদানের সঙ্কল্প নিয়ে জীবনের পথপরিক্রমায় দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে সম্ভব ও ত্বরান্বিত করেছিলেন, আজকে প্রয়োজন সেই মানসিকতা নিয়ে সেবাকার্য্যে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-

নিবেদন করা। মুমূর্ষু মানুষকে পুনর্জ্জীবিত করা, তাদের মনে আশার সঞ্চার করা, তাঁদের মনোবলকে বাঁচিয়ে রেখে সামনের কঠিন সংগ্রামের সঙ্গে লড়াই করার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা। তাঁরা যে যেখানেই থাকুন না, তারা যদি এইভাবে কর্মযজ্ঞ সুরু করেন, তবে পুনর্বাসনের পথের বাধা অপসারিত হবে, তাদের দৃষ্টান্তে অন্তরা উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন ও মতলব বাজীর চক্রান্তও দূরীভূত হবে। দেশের এই দারুন দুর্দ্দিনে যদি তাঁরা এগিয়ে না আসেন, তবে দেশের মানুষের কাছে তাদের শ্রদ্ধা, সম্মান, এক কথায় তাদের উজ্জ্বল ভাবমূর্ত্তিও বিনষ্ট হবে। তাই তাদের নিকট আবারো আমরা আবেদন করি তাঁরা জীবনের প্রান্ত সীমায় তাঁদের গৌরবের মুকুটে আরো একটী পালক পরিয়ে দেবার সুযোগ যেন না হারান। তাঁদের প্রভাবে দিশাহারা মানুষ এবং সরকারকেও নতুন আদর্শে সঞ্জীবিত করে তুলুন, অন্যথায় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের নিকট দেবার মত কোন কৈফিয়ৎ তাদের থাকবেনা। বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেরই চলে যাবার সময় আগত। চলে যাবার আগে আর একবার যেন তারা ঘনতম অন্ধকারের মধ্যে আলোবর্ত্তিকা জ্বেলে দিয়ে যান, শ্রম দিয়ে, সেবা দিয়ে, আত্মত্যাগ দিয়ে, সঠিক পথনির্দ্দেশ দিয়ে, বিপ্লবী মানসিকতার আগুন জ্বেলে দিয়ে। আমরা একান্তভাবে বিশ্বাস করি আমাদের আবেদন ব্যর্থ হবে না। সর্বশেষে যেখানে যে স্তরেই থাকুন না কেন, সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে দেশের মঙ্গলঘট পূর্ণ করুন, এই আমাদের ঐকান্তিক প্রত্যাশা।

বিপ্লব দীর্ঘজীবি হক।

———

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীকৃষ্ণোদ দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯০৬ সালের মার্চ মাসে মুরারীপুকুর উদ্যানে যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশিত হলে ঐ পত্রিকার মাধ্যমে রাসবিহারী জানতে পারেন যে মুরারীপুকুরে বিপ্লবের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হয়েছে। তিনি সংবাদ নিয়ে উল্লাসকর দত্তের নিকট দুইখানি পত্র লিখে সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯০৮ সালের ২রা মে মুরারীপুকুর বাগানে তল্লাসীর সময় রাসবিহারীর পত্র দুখানি ধরা পড়ে। এর ফলে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় রাসবিহারীর গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই সময় অনুশীলন সমিতি গঠনে পি. মিত্রের অন্যতম সহায়ক শ্রীশচন্দ্র ভূষণ রায় চৌধুরী ঠাকুর বাড়ীতে গৃহ শিক্ষকতা করতেন। প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের পুত্রদের সঙ্গে গৃহ শিক্ষক কিছুদিন দেরাদুনে গিয়ে কাটাবার কথা ছিল। তিনি রাসবিহারীকে এই কাজ দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। রাসবিহারী পরে দেরাদুনে বনবিভাগে একটি সরকারী চাকুরী সংগ্রহ করে নেন।

১৯১১ সালের শেষ দিকে রাসবিহারীর দায়িত্ববোধ হলে তিনি দেরাদুনের চাকুরীতে ছুটি নিয়ে কিছু দিনের জন্য চন্দননগরে চলে আসেন। এই সময় চন্দননগর ও অনুশীলন মিলিত সংহতির কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলছিল। রাসবিহারী শ্রীশ চন্দ্রের মাধ্যমে এই মিলিত সংহতির কার্য্য-কলাপের সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় লাভ করেন। প্রবর্তক সংঘ গুরু মতিলাল রায় এই সময় রাসবিহারীকে গীতার যোগ-তত্ত্ব শিক্ষা দেন। মতিবাবু রাসবিহারীকে বুঝিয়ে দেন যে মানুষ নিজে কিছুই করে না সবই ভগবানের ইচ্ছায় হয়। ভগবানই মানুষের অন্তরে থেকে মানুষকে প্রেরণা দিয়ে সব করাচ্ছেন। তিনি রাসবিহারীকে বলেন আমরা যারা ভারতের স্বাধীনতার চেষ্টা করছি আমাদের এই প্রচেষ্টাও ভগবানের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। ভগবানই বিপ্লবীদের মাধ্যমে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করছেন। মতিবাবুর কথায় রাসবিহারী অনুপ্রাণিত হলেন। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে চন্দননগরের মিলন সংঘটিত হবার পরে অনুশীলন সমিতিতে এই সময় যোগ সংক্রান্ত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। এই সংক্রান্ত দুইখানি টাইপ করা বই ১৯১৩ সালে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী গিরীন্দ্র দাসের সঙ্গে ধরা পড়ে। ষড়যন্ত্র মামলার রায়ে এই সম্পর্কে বলা হয় "বাঙলার বিপ্লবী সংহতি একটা Religious Organisation এবং এদের highly terrorist phylosopby এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ আছে"। যে দিন রাসবিহারী মতিলাল রায়ের কাছ থেকে এই শিক্ষা পেলেন পরদিনই শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে আবার এসে মতিলাল রায়ের নিকট উপস্থিত হলেন। এ দিনও অনেক কথা হল মন দিয়ে সব কথা শুনে রাস-বিহারী মতিবাবুকে বললেন, 'তোমার আত্মসমর্পণ যোগের অর্থ একটা Automation ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। যা কিছু হচ্ছে ঈশ্বরই করাচ্ছেন এই অর্থে Automation. এই Automation-এর দ্বারাই আমি বুঝছি ভারতের বিপ্লব সাধন আমার লক্ষ্য ও আদর্শ। ভারতের স্বাধীনতাই আমার ভিতর দিয়ে ঈশ্বর চাইছেন। আজ আমি তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি তোমাদের এ বিপ্লবকর্মে আমাকে তোমরা পুরোপুরি ভাবেই পাবে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় রেখ না।' মতিবাবু বলেন, 'রাসবিহারীর বৈপ্লবিক দীক্ষা এই দিন সম্পূর্ণ হল।'

এর আগেই দেরাদুনে অবস্থানকালে রাসবিহারী উত্তর ভারতের এক বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে এসেছিলেন। লালা-হরদয়াল নামে দিল্লীর অধিবাসী জনৈক ছাত্র পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। তিনি দিল্লীতে ও পাঞ্জাবে এক বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে সরকারী বৃত্তি নিয়ে হরদয়াল ইংল্যাণ্ডে গিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ইংল্যাণ্ডে তিনি ভারতীয় বিপ্লবী শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, চন্দ্রসিংজী রাণা, মাডাম কামা প্রভৃতির সংস্পর্শে এসে পড়াশুনা বন্ধ করে সম্পূর্ণ ভাবে বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। কিছুদিন পরে তিনি আমেরিকায় গিয়ে সোহনলাল ভাখনার প্রভৃতির সঙ্গে মিলে গদর বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন। হরদয়াল যখন

বিদায় নেন তিনি তার উত্তর ভারতের বিপ্লবী সংগঠনের ভার জীতেন্দ্রমোহন চ্যাটার্জী নামক অনৈক বাঙালী যুবকের উপর অর্পণ করে যান। জীতেন্দ্রমোহন তার শ্বশুরবাড়ির দিয়ে উপলক্ষে একবার দেরাদুন যান এবং সেখানে রাস-বিহারীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। বৈপ্লবিক আন্দোলন সংগঠন ব্যাপারে উভয়ে উভয়ের বৈপ্লবিক অন্তরের পরিচয় পেলেন এবং এরপরে দুজনেই দুজনকে সাহায্য করতে থাকেন। এর কিছুদিন পরে জীতেন্দ্রমোহন ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্য বিলাতে চলে যান এবং তিনি তার পাঞ্জাব ও দিল্লীর বিপ্লবী সংগঠনের ভার রাসবিহারীর হস্তে অর্পণ করে যান।

যথা সময়ে চন্দন নগরে রাসবিহারীর শ্বশুরশ্রাদ্ধ শেষ হয়ে গেল। তার চাকুরীর ছুটিও ফুরিয়ে গেল। পূজার ঠিক আগে দেরাদুন ফিরে যাবার সময় তিনি মতিলাল রায়কে বলে গেলেন সেপ্টেম্বর মাসে পূজার ছুটি নিয়ে আবার তিনি চন্দননগরে আসবেন। তখন ভারতের কয়েকজন বিপ্লবীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে তিনি তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। হার্ডিঞ্জ হত্যার পরিকল্পনার কথা তিনি তোলেন নাই যাবার সময় মতিবাবুকে বলে গেলেন, "তোমার অনুশীলন সমিতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে। আমি দুজন সাহসী তরুণ চাই যারা উত্তর ভারতে বিপ্লব সংহতির কাজে আত্মদান করবে।" এইভাবে চন্দননগর সংগঠন এক ঢাকা অনুশীলন সমিতি এবং উত্তর ভারত বিপ্লব সংগঠন এক হয়ে গেল।

বকীয়া ষ্ট্রীট থানার পাশে এক বস্তীতে ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় কর্মী শশাঙ্ক ওরফে অতুলাল রায়রা বাস করতেন। চন্দননগর এবং অনুশীলনের কর্মীদল এখানে মিলিত হতেন। এ সম্পর্কে শ্রীযতিলাল রায় বলেন, "বাদুড়বাগান বস্তীতে আমাদের বিপ্লবীদের এক শক্তিশালী সংঘটি স্থাপিত হয়েছিল। এইখানে বসিয়া আমরা বাংলার বিপ্লবের আগুন ছড়াতাম। এইখান হইতেই যোগীন্দ্রনাথ মৌলবী বাজারে ম্যাজিষ্ট্রেটকে হত্যা করার জন্য বোমা লইয়া প্রস্থান করেন। এইখানে বসিয়া প্রফুল্ল সাহনী, শচীন সান্যাল, রাসবিহারী ও শ্রীশচন্দ্র ভারতব্যাপী বিপ্লবের চক্রজাল রচনা করিত। রাসবিহারী তাঁর কথামত সেপ্টেম্বর মাসে ছুটি লইয়া চন্দননগরে ফিরিয়া আসেন। সে জানাইল যে চারিমাসের ছুটিতে সে এবার বাঙলায় আসিয়াছে। এইসময়ের মধ্যে বিপ্লবের কিছু কাজ তাহাকে করিতে হইবে। তাহার অসাধারণ উৎসাহে সকলেই উদ্বুদ্ধ হইল এবং বাদুড়বাগানে আমরা সকল বিপ্লবী দল মিলিত হইয়া কার্য্য নির্ধারণে ব্যাপৃত হইলাম। (আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী পৃষ্ঠা-১০১)।

অনুশীলন সমিতির কলকাতা সংগঠনের প্রবীন নেতা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বহুবাজারে শ্রমজীবি সম্প্রদায় নামে এক বিপণী স্থাপন করেছিলেন। বিভিন্ন স্থান থেকে এসে বিভিন্ন দলের বিপ্লবীদল এখানে মিলিত হতেন। পরে শ্রমজীবি সম্প্রদায় কলেজ ষ্ট্রীটে উঠে আসে। অমরেন্দ্র নাথের সঙ্গে তার উত্তরপাড়ার বাড়ীতে বসন্তকুমার বিশ্বাস ও মন্মথকুমার বিশ্বাস নামে দুই ভ্রাতা বাস করতেন। বিশ্বাস ভ্রাতাদের নিবাস ছিল নদীয়া জেলার কোরাগাছা গ্রামে। মতিলাল রায় মাঝে মাঝে এসে অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে উত্তরপাড়ার গৃহে এই দুই ভ্রাতার সঙ্গে মিলিত হতেন। একদিন তিনি কলেজ ষ্ট্রীটে শ্রমজীবি সম্প্রদায়ে উপস্থিত হলে অমরেন্দ্রনাথ দুই ভ্রাতাকে তার হস্তে অর্পণ করে বলেন, "দেশ মন্ত্রে এই দুইজন তরুণ জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত তুমি এদের দুজনকে চন্দননগরে রেখে বিপ্লবের কার্য্য নিরাপদে নিরোপ করতে পার।" এইদিন থেকে দুই বিশ্বাস ভ্রাতা মতিলাল রায়ের সঙ্গে তারই বাড়ীতে এসে বাস করতে থাকেন। রাসবিহারী ছুটিতে চন্দননগরে থাকার সময় প্রতিদিনই তিনি সন্ধ্যার পরে তার গৃহে মিলিত হতেন। ঐ সময় দুই ভ্রাতার সঙ্গে তারও পরিচয় হয়।

রাসবিহারী চন্দননগরে ফিরে আসার পরে ক্রমে হার্ডিঞ্জ হত্যার পরিকল্পনা পাকাপাকি ভাবেই স্থির হল। রাসবিহারী ছুটিতে দিল্লী সংগঠনের আমীর চাঁদ এবং অবধবিহারীকে নিয়ে এসে বাঙলার বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমীর চাঁদ দিল্লীতে ফেরবার

বাকি অংশ ১৬ পাতায় দেখুন

সি, পি, এম, কৌশল পাল্টেছে

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এঁরা আবার গণতন্ত্রের বুলি আওড়ায়, সর্ব্বহারাদের বন্ধু সাজে আর কাজের বেলায় যত হীন, জঘন্য ও অন্যায় কাজ করে সাধারণ মানুষকে উত্যক্ত, বাস্তহারা ও বিপদগ্রস্থ করে বিপথগামী করতে সদা ব্যস্ত। সি. পি. এম এর বর্ত্তমান নীতি উদ্বাস্তুদের পক্ষে বড়ই বিপদজনক বলে প্রতীয়মান হয়। যে উদ্বাস্তুদের নিয়ে পঞ্চাশের দশকে সি. পি এম রাজনৈতিক মুনাফা লুঠেছে, আজ সেই উদ্বাস্তুদের জ্যোতি-প্রমোদ সরকার চরম অবহেলা ও ঘৃণা ছাই করছে।

সি, পি, এম এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে আসীন সম্পাদক ই, এম, এস, নাম্বুদ্রিপাদ ভেবেচিন্তে ইন্দিরাকে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে সরাবার অভি-সন্ধি নিয়ে এক উদ্ভট ও বেআইনী প্রস্তাব আনলেন যে—ইন্দিরার নুরেমবার্গ ধরণের বিশেষ আদালতে বিচার হোক। তাঁর উদ্দেশ্য জনতা-দলকে দিয়ে ইন্দিরাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চিরতরে খতম্ করা এবং তাঁর হিসাবে এ বেশ চমকপ্রদ ঘটনা ঘটবে যাতে এক ঢিলে দুই পাখী মারা সম্ভব হবে। তিনি ধূর্ত শৃগালের মত বোধ্ আর সিংহের লড়াইয়ের শেষে উভয়ের পরিত্যক্ত মাংস খণ্ডটি মুখে পুরে মিটিবাদে শুরু করবেন। আশা কম নয়—বামনের চাঁদে হাত দেবার দুরাশা মাত্র। তাঁর আশা ছিল ইন্দিরাকে ছলে বলে ও কৌশলে যদি একবার রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়, তবে 'জনতায়' ভাঙ্গন অনিবার্য্য কারণ ইন্দিরা-ভীতিই পাঁচ মিশালী দল জনতাকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে, ইন্দিরার অপসারণের পরই পাঁচটি দলে পরস্পর উচ্চাকাঙ্খার প্রতিযোগীতার ও সংঘর্ষের ফলে অতি শীঘ্র জনতা দল ক্ষমতাচ্যুত হতে বাধ্য হবে এবং এই অবসরে নাম্বুদ্রিপাদ বাম ঐক্যের ধুয়া ধরে কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতায় সি, পি, এম, কে বসাবার ব্যবস্থা পাকা করে নেবেন অথবা লোক সভায় সি, পি, এম, এর ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে যাতে অদূর ভবিষ্যতে সি, পি, এম কেন্দ্রীয় শাসন যন্ত্রটি দখল করতে পারে। জনতা দলে এখনই যে বিরোধ দানা বেঁধেছে, সেই বিরোধের ক্ষেত্র যাতে প্রসারিত হয়ে জনতা দলে ভাঙ্গনকে নিশ্চিত না করে তোলে তার জন্য নাম্বুদ্রিপাদ আদা ছোলা খেয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন কারণ তিনি জানেন এখনই জনতায় ভাঙ্গন মানেই ইন্দিরার পুণরুত্থান এবং ফলে সি, পি, এম, এর পুনরায় গঙ্গা প্রাপ্তি। নাম্বুদ্রিপাদ ভাল মতই জানেন যে জনতা-দল দেশে কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহক এবং ঘোরতর ভাবে সি,পি,এম, বিরোধী তবুও তিনি এই জনতাদলের ভাঙ্গনের বিরুদ্ধে কাজ করছেন কেন? ইন্দিরাভীতিই এর একমাত্র কারণ। ইন্দিরার ব্যাঙ্ক জাতীয় করণ, রাজন্যভাতা বিলোপ, বাংলা দেশের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নীতি, চরিত্র ও অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন, জাতীয়

উন্নয়নমূলক বহুবিধ কাজ, বলিষ্ঠ পররাষ্ট্রনীতি ও সর্ব্বোপরি বিশ্বের দরবারে ভারতের বিশিষ্ট মর্য্যাদার আসন ইত্যাদি শ্রীমতী গান্ধীকে জনমনে যে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে সে আসন থেকে তাঁকে নামিয়ে আনতে সি, পি, এম, এর গালভরা সর্ব্বহারা দুঃখ-কাতর বুলি কোন দিনই পারবে বলে মনে হয় না। প্রশ্ন হতে পারে—তবে ইন্দিরা গদীচ্যুত হলেন কেন? সে তাঁর পুত্র সঞ্জয়ের কতকগুলি হটকারী বিশৃঙ্খল ও জনবিরোধী কাযের ফলে যা সাধারণ মানুষকে বেশ হতাশ ও উত্যক্ত করেছিল বলে, আর ইন্দিরাজী পুত্রস্নেহে অন্ধ ছেলেকে শাসন করতে পারেন নি। কিন্তু সাধারণ নির্ব্বাচনের পরই তাঁর জয়যাত্রা অব্যাহত গতিতে অগ্রসরমান এবং তিনি ধীরে ধীরে তাঁর পূর্ব্ব মর্য্যাদার শীর্ষে পুনরারোহণ করছেন বলেই প্রতীয়মান হয়। সি, পি, এম, সারা ভারতের বর্ত্তমান কালের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে একমাত্র ইন্দিরাকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে এবং তাই এই অহেতুক ভীতি ও পরিণামে তাঁর ক্ষতি করার জন্য সি, পি, এম, বদ্ধপরিকর; নচেৎ সি, পি এম, এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে বসার আশা ভরসা সবই ব্যর্থ হবে—এ বিষয়ে সি, পি, এম, এর বঙ্গীয় ও সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্ব একমতে ও একপথে চলার কৌশল অবলম্বন করে বারে বারে মোরারজী ভাইয়ের হাত শক্তকরার কথা উচ্চারণ করছে অথচ মোরারজী ভাইয়ের উপর সি, পি, এম মোটেই প্রসন্ন নয় বরং নীতিগতভাবে তাঁর চরম বিরোধী ও অমঙ্গলকামী। সি, পি, এম হাতে কিছু সময় চায় সর্বভারতীয় রাজনীতিতে গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের তাগিদে—তাই এ ভনিতা, বেশ বুঝাযায়।

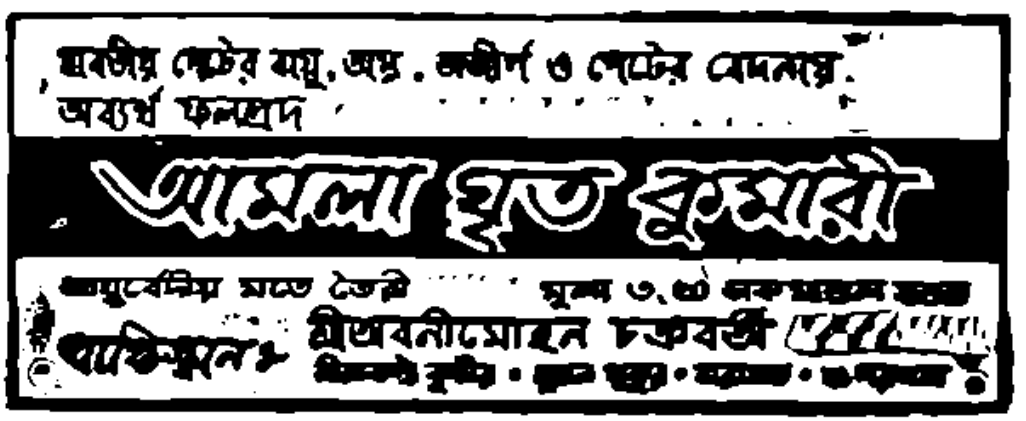

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

ইংলাণ্ডে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

রিপন কলেজের সমস্যার ব্যাপারে আমার এ কথাও বলা উচিত যে স্যার হেনরি হ্যারিসন এবং স্যার হেনরি কটনের কাছ থেকে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সাহায্য পেয়েছি সেজন্য তাদের কাছে আমি ঋণী। স্যার হেনরি কটনকে আমি বিগত চল্লিশ বছর ধরে জানি। আর স্যার হেনরি হ্যারিসনকেও তার কলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হওয়ার সময় থেকে বিশ বছর ধরে জানি। আমি সে সময় কলকাতা কর্পোরেশনের একজন মেম্বার ছিলাম। ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গে আমাদের দেশের লোকের সম্পর্ক অনেকক্ষেত্রেই ছিল একটা রীতিগত ব্যাপার মাত্র। তবে একথা বলা যায় যে সে সম্পর্ক ক্রমেই ভালোর দিকে গড়ে উঠেছে। কিন্তু স্যার হেনরি কটন ও স্যার হেনরি হ্যারিসন, উভয়ই আমার সম্ভ্রম ও প্রীতির আসনে এক বিরাট অংশ জুড়ে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। সারা জীবনে আমি যত জন সৎ বন্ধু পেয়েছি তাদের মধ্যে এরাও ছিলেন। রিপন কলেজকে বাঁচাবার জন্য তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদেরই প্রভাবে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার কুমার পাখেরাম এই ব্যাপারে আকৃষ্ট হন। সেই দিনে প্রধান বিচারপতির সিনেটের সভায় উপস্থিত থেকে কোন কিছুর সমর্থন করা একটা মস্ত বড় ব্যাপার ছিল। সিনেটের সভায় আইনজীবী সদস্য যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের অধিকাংশই আমরা যে প্রস্তাবটি দিয়েছি তা স্বীকার করে নিয়ে সাময়িকভাবে অনুমোদন বাতিলের যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল তা প্রত্যাহার করে নেওয়ার পক্ষে ভোট দেন।

রিপন কলেজের সমস্যা এবং তার সঙ্গে কংগ্রেসের কাজ—যে কংগ্রেসের অধিবেশন ১৮৯০ সালে কলকাতায় বসবে আমাকে এই সময়টায় অত্যন্ত শ্রান্ত ও দুর্ভাবনা-গ্রস্ত করে ফেলে। ফলে আমি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। এই আক্রমণটা আসে অতি আকস্মিক ভাবে। এ রকম একটা আকস্মিক রোগ এসে আমাকে ধরবে তা আমি ভাবতেই পারিনি। এমনকি শ্রীযুক্ত সরলা ঘোষালের বাড়ীতে ডিনার পার্টির নিমন্ত্রণে যাওয়ার জন্য আমার সাজ-পোষাক করতেও নির্দেশ দেই। সরলা দেবী ছিলেন স্বর্গত জানকীনাথ ঘোষালের স্ত্রী একজন লেখিকা হিসাবে তিনি সুপরিচিতা ছিলেন। যখন ডিনার পার্টিতে রওনা হতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময় আমার জ্বর জ্বর বোধ হল। একজন স্থানীয় ডাক্তারকে ডাকা হল। তিনি বাড়ী দেখে বললেন, আমার জ্বর হয়েছে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি খাস কষ্ট বোধ করতে লাগলাম। আমার বন্ধু ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ রায়কে ডাকা হল। তিনি এসে দেখে বললেন যে এটা অ্যাকউট ব্রোঙ্কাইটিসের কেস। আমাকে শুয়ে থাকতে পরামর্শ দেওয়া হল, সেই থেকে মাসাধিক কাল যাবৎ আমি নিউমোনিয়া রোগে অসহায় অবস্থায় শয্যাগত থাকি। আর সেই সময় আমার সহযোগী বন্ধুগণ আসন্ন কংগ্রেসের অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কঠোর ভাবে কাজ করতে থাকেন। আমার এই রোগ যন্ত্রনা ও দুর্বলতার উপর আর একটা উপসর্গ এসে দেখা দিল, তা হল আমার মানসিক যন্ত্রণা। আমি যে আমার স্বাভাবিক কাজের আনন্দ থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হচ্ছি, এই নৈরাশ্য বোধই আমার সেই যন্ত্রণার কারণ। আমার

বন্ধুরা টাউন হলে সভা করলেন ; কিন্তু সে সভায় আমি যেতে পারিনি। আরও একজন সে সময়ে রোগশয্যায় ছিলেন। তার অনুপস্থিতিও বন্ধুরা দারুণ ভাবে অনুভব করেছেন। তিনি হলেন মিঃ জে. সি. ব্যানার্জি। মিঃ ব্যানার্জিও এই সময়ে সিরিয়াস ভিসাবে শয্যাগত হয়ে পড়েন।

সভায় উপস্থিত হওয়ার মত সুস্থ হলে পরে কংগ্রেসের একটি সভায় আমি যোগদান করি এবং সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ নির্দেশে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে থেকে ছোট একটি বক্তৃতা করি যা ছ-লাইনের সীমা অতিক্রম করেনি। আমার রোগমুক্তির জন্য আমি স্বর্গত ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায়ের সবর ও সতর্ক প্রয়াসের নিকট ঋণী।' ১৮৮৮ সাল থেকে আমি তাঁকে জানি। সেই সময়ে তার ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করার জন্য আমার সঙ্গেই ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার যাওয়ার পক্ষে একটা অসুবিধা দেখা দেয়। মিঃ মনোমোহন ঘোষ—যাকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত আখ্যা দিয়েছিলেন আমাদের বিদেশগামী ভারতীয়দের বেসরকারী রক্ষক বলে—তার ভ্রাতা রায় যদুনাথ রায় বাহাদুরের অগোচরে ও বিনানুমতিতে তাকে বিলেত যেতে সাহায্য করতে চাইলেন না। যদুনাথ রায় ছিলেন তখন কৃষ্ণনগরের জননেতা। তিনি তাঁর বিলেত যাওয়ার প্রস্তাবে আপত্তি করলেন। সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে তখন জাতির মধ্যে যে সংস্কার বলবৎ ছিল, রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর তার ঊর্দ্ধে উঠতে পারেন নি। যা হোক, আমার বন্ধু ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ রায় কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হলেন এবং সরকারী চাকরীতে যোগদান করে ডাক্তার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। অবসর গ্রহণ করার পরে যখন কলকাতায় তিনি স্থায়ী ভাবে বাস করতে থাকেন তখন চিকিৎসা ব্যবসায়ে তার পসার হয় এবং তিনি বেশ অর্থোপার্জন করেন। তিনি সুনিপুন চিকিৎসক ছিলেন, কিন্তু তার চেয়েও মানুষ হিসাবে তার চরিত্রের উল্লেখযোগ বৈশিষ্ট্য হল, তার সদানন্দ ভাব। নিজে কিন্তু তিনি বহুমূত্র ও হাঁপানি রোগে ভুগছিলেন। কিন্তু তার সদানন্দময় প্রকৃতিকে বা আশাবাদকে তা কখনও ক্ষুণ্ন করতে পারেনি তার চোখের দৃষ্টিতেই তার আশাবাদ এবং আত্মবিশ্বাস এমনভাবে ফুটে উঠতো যে তার অসংখ্য রোগীর কাছে তাই ছিল সর্বদার এক এক সান্ত্বনার উৎস স্বরূপ। ১৯০৯ সালে তিনি অকালে কাল গ্রাসে পতিত হন। তার বিরাট বন্ধুমণ্ডল ও গুণগ্রাহীরা তার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি যে কেবলমাত্র একজন খ্যাতনামা চিকিৎসকই ছিলেন, তা নয়। তিনি একজন সক্রিয় শিক্ষাব্রতীও ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিটের তিনি একজন সদস্য ছিলেন। সিনেটের সদস্যরূপে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ভাল কাজ করে গেছেন।

(ক্রমশঃ)

পরলোকে বিপ্লবী যতীন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বিপ্লবী যতীন্দ্র নাথ শুকলাল কারমানী হাসপাতালে মারা যান। তিনি ১৯০১ সনে ফরীদপুর জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। কিশোর বয়সেই বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিপ্লবী বিপিন গাংগুলির দলে যোগ দেন এবং পরে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হতে তিনি ৺সন্তোষ মিত্রের সহকর্মী হিসেবে নতুন করে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯৩০ সনে ধরা পড়ে দীর্ঘদিন বন্দী, দেউলী প্রভৃতি জেলে আটক থাকেন।

এই বিশিষ্ট বিপ্লবীর মৃত্যুতে আমরা আমাদের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে হারালেম। তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তার শোক-সন্তপ্ত পরিবার বর্গকে আমরা আমাদের আন্তরিক সহবেদনা জানাই।

নির্বুদ্ধিতা—
না—
হৃদয়হীনতা

শৈলেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর).

জ্যোতিষবাবু এবং রাধিকা মশায় কেন যে বাজারে দু-জনকে খেদাইতে এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন বুঝা শক্ত। থাকুক না ওরা। মরিয়া হাজিয়া শেষ পর্যন্ত নিজেদের ব্যবস্থা ওরা নিজেরাই করিয়া লইতে পারিবে এবং তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ সমৃদ্ধই হইবে। ইউরোপের দরিদ্ররা প্রাচীন মূল উপড়াইয়া দেশান্তরী হইয়া আমেরিকায় অতি সমৃদ্ধ ও বলবান রাষ্ট্র আজি গড়িয়া তুলিয়াছে। বিলাতের অবাঞ্ছিত ছিন্নমূল মানুষরা তাড়া অষ্ট্রেলিয়ায় নূতন বসতি স্থাপন করিয়া অতি সমৃদ্ধ একজাতিতে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন অভ্যাস ও সংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া ছিন্নমূলরা যে নূতন প্রগতিশীল সমাজ রচনা করিবে ইহাই ত স্বাভাবিক। পশ্চিমবঙ্গকে যদি পিছাইয়া রাখিতে চান তবে আপদগুলাকে খেদাইবার চেষ্টা দেখুন। পারিবেন যে তাহা মনে হয় না। বিশ বছর বাদে যথেষ্ট কারণ থাকিতেও দণ্ডকারণ্য উদ্বাস্তুরা ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিয়া আসেন নাই। বিশ বছর ওদের খোঁজ আমরা লই নাই। ওরা কেমন ভাবে কাল কাটাইতেছেন জানিবার চেষ্টা করি নাই। অসহ্য হইয়াছে বলিয়াই তো ওরা এভাবে চলিয়া আসিয়াছেন। থাকুক ওরা আমাদের মধ্যে ছড়াইয়া। যখন আসিয়া পড়িয়াছেন তখন আর দূর দূর করিয়া খেদাইয়া দিতে পারিব না। আমাদের অলক্ষিত সমাজবিপ্লবে ইহারা আমাদিগকে আরও একধাপ আগাইয়া লইয়া যাইবে এরূপ সম্ভাবনা আছে। বই কেতাবে লেখে যে ক্ষুদ্র কৃষকরা শ্রমজীবী হইয়া সমাজকে আধুনিক শিল্পক্ষেত্রে টানিয়া লয়। দণ্ডকবাসীরা কৃষিতে জীবিকার সংস্থান করিতে না পারিলে—পারিবার সম্ভবনা অল্প—শ্রেণী পরিবর্ত্তন করিয়া কলকারখানায় জীবিকার উপায় খুঁজিবে ইহাই স্বাভাবিক। এরূপ শ্রেণী পরিবর্ত্তনের কাজ অবশ্যই চাপে কিছুটা শ্লথ হইয়া গিয়াছে। দণ্ডকবনে চাষ করার চেষ্টা ত্যাগ করিয়া যাহারা চলিয়া আসিয়াছেন তাহাদের জীবিকার্জন চেষ্টা কলকারখানার দিকে ঘুরাইয়া দিলে তাহা দূরদৃষ্টির পরিচায়ক হইবে।

কর্ত্তাব্যক্তিরা এরূপ চেষ্টা না করিয়া বলিতেছেন, যাহা এই দণ্ডত্যাগীদের কাজে নিয়োগ করিবেন তাহারা সরকারী রোষে পড়িবেন। ওনারা বলিতেছেন, খবরদার, কেউ ওদের খাটাইয়া জীবিকার্জনের সুযোগ দিও না।—ইহার চাইতে নৃশংস এবং নির্বোধ নির্দেশ আর কি হইতে পারে? এসব হুকুমনামা আমাদের মনে জ্বালা ধরাইয়া দেয়, যেমন জ্বালা লাগাইয়াছিল ত্রিশ বছর পূর্বের সেই হাকপ্যান্ট মন্ত্রীর কথাগুলি।

জ্যোতি-রাধিকা মশায়দের আরও দু-একটী কথা স্মরণ করিতে বলি। দ্বিতীয় বিশ্ব লড়াইএর শেষ দিকে সেকালে ভারতে লেনিন বলিয়া প্রচারিত সুবর্ণচাঁদ মশায় দেশ ভাগাভাগির মানচিত্র সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া দেশবিভাগকে জোর সমর্থন জানাইয়াছিলেন। এনাদের দলও দেশবিভাগকে স্বাভাবিক ও ন্যায্য বলিয়া তখন ঘোষণা করিয়াছিলেন। উদ্বাস্তুরা এই অপ্রাকৃত ভাগাভাগির ফসল। যে ঘটনাকে আপনারা আহ্বান জানাইয়াছিলেন তাহার যাবতীয় সুফল ও কুফল আপনাদের অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে; উদ্বাস্তুদের সব ভার শুভচিত্তে আপনাদেরই বহন করিতে হইবে।

আমরা অনেকে কিন্তু দেশবিভাগকে স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লইতে পারি নাই, অবস্থার চাপে মানিয়া

লইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। উদ্বাস্তু প্রবাহকেও দেশ-বিভাগের একান্ত স্বাভাবিক ফলশ্রুতিরূপ আমরা গ্রহণ করিয়াছি। এখন দাঁড়াইতেছে দুইটি :— ১) বিপুল সংখ্যায় আগত উদ্বাস্তুদের স্থান সঙ্কুলান পশ্চিমবঙ্গে হইবে কি করিয়া? এবং ২) ইহাদের আগমনে পশ্চিমবঙ্গ কত-খানি ভারাক্রান্ত হইয়াছে এবং এ রাজ্যের প্রতি কতটা বিঘ্নিত হইয়াছে?

দুইটী প্রশ্নেরই উত্তর গত ত্রিশ বছরে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই স্পষ্ট উত্তর সকলেই আমরা জানি। আগত উদ্বাস্তুদের স্থান সঙ্কুলান যে হইয়া গিয়াছে ইহা ত বাস্তব চাক্ষুষ ঘটনা। উদ্বাস্তু সমাগমে পশ্চিমবঙ্গ ভারাক্রান্ত ত হয়ই নাই, পরন্তু সর্ববিষয়ে এমন এক প্রাগ্রসর সমাজ এ রাজ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে অন্য কোন রাজ্যে যাহার তুলনা মিলিবে না। উদ্বাস্তুরা ভারতের এই রাজ্যটিকে অন্যন্য মর্যাদার অধিকারী করিয়াছে। অনন্যতার কয়েকটী লক্ষণ উল্লেখ করিতেছি।

১) আমাদের সমাজে জাতপাতের সঙ্কীর্ণ বিচার ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া হারাইয়া যাইতেছে।

২) সাম্প্রদায়িক মনোভাব কার্যতঃ উঠিয়া গিয়াছে।

[অবশ্য সিডিউলড্ কাষ্ট এবং আইনবিটিল-এর বিশেষ অধিকারের প্রশ্ন আজে আজে তুলিয়া সবদলেরই মাথা খাওয়া ব্যক্তিরা জাতপাত এবং সাম্প্রদায়িকতা যাহাতে বজায় থাকে সেজন্য সর্বদা মুখর থাকিতেছেন। যে সব প্রশ্ন আপনা হইতে অবান্তর হইয়া যাইতেছে সেগুলিকে চাঙ্গা করিয়া রাখিয়া মুরুব্বী হইবার লোভ ইহারা ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। হয়ত উহাতে কায়েমী আছে]

৩) এ রাজ্যে গ্রামের মেয়েরাও প্রায় সর্বত্র এবং প্রায় সম্পূর্ণ মুক্তির সন্ধান পাইয়াছেন।

৪) আরও বড় কথা হইল উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এই সমাজে কৃষকদের এবং মিশ্রবিত্তদের সন্তানরা পূর্বপুরুষের শ্রেণীবোধ এবং শ্রেণী সংস্কারগুলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া ক্রমে অধিক সংখ্যায় শ্রমিক শ্রেণীতে স্থান লইতে নির্দ্বিধায় আসিতেছেন।

এই প্রকার শ্রেণী পরিবর্তনের গুরুত্ব বাঙালী সমাজে অসীম। ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে বঙ্গসমাজে কৃষীজীবীদের সংখ্যা ছিল শতকরা পঁচাশির কম, বিবিধ শিল্পকর্মে নিযুক্ত-দের সংখ্যা ছিল শতকরা ত্রিশ এবং রাজা জমিদার পাইক বরকন্দাজ সেপাই শান্ত্রী নায়েব গোমস্তা পুরুত ঘাটল ভিক্ষুক প্রভৃতি অনুৎপাদক উপজীবীদের সংখ্যা ছিল শতকরা কুড়ির মত। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের পরে ইংরেজ বণিকরা শুধু এদেশজাত পণ্য ক্রয় করিয়া স্বদেশে রপ্তানী করার পরিবর্তে দেশের শিল্পজাত পণ্য এদেশে আমদানীর উপরে বেশী জোর দিতে যখন সুরু করিল তখন হইতে এদেশের কুটীর শিল্পীরা বৃত্তিচ্যুত হইয়া কৃষকে পরিণত হইতে বাধ্য হইল। এভাবে কৃষিজীবীদের সংখ্যা সমাজে শতকরা পঁচাশি হইতে বাড়িয়া ইংরেজ আমলের শেষ দিকে প্রায় আশীর কোঠা (শতকরা) স্পর্শ করিল। এরূপ সমাজ একান্ত ভারসাম্যহীন। ইহার প্রধান লক্ষণ, এভাবে প্রসারিত কৃষক সমাজে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি। এতদিন পরে উদ্বাস্তু সমাগমের চাপে বাঙালী সমাজে আবার শ্রমিক শ্রেণীর প্রকাশ ঘটিতেছে। কুটির শিল্পী এবং আধুনিক শিল্প শ্রমিকের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য অবশ্যই আছে। কৃষি শিল্পে নিযুক্তির সুযোগ অবশ্যই কিছুটা আছে। কিন্তু তাহা বেকার, শ্রমপ্রার্থী সকলকে গ্রহণ করিতে পারে না। কুটির শিল্পে প্রত্যাবর্তন সমাজের জীবিকার প্রয়োজনকে আংশিক এবং কিছু কালের জন্য মিটাইতে পারে। আধুনিক শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকরূপে স্থান পাওয়াটা বাঙালী সমাজে একান্ত অপরিহার্য। কোন মহৎ নেতারা বাঙালীকে এদিকে অগ্রসর হইতে তেমন কোন সাহায্য করিতেছেন না। কৃষিক্ষেত্রে এবং কুটির শিল্পের বাহিরে তাহাদের দৃষ্টি যায় না। তথাপি অবস্থার চাপে আধুনিক শিল্পের ক্ষেত্রে বাঙালী শ্রমিকরা ধীরে ধীরে স্থান লইতেছে এবং বাঙালী সমাজের শ্রেণী বিন্যাসকে কিছু কিছু করিয়া সুষম করিয়া তুলিতেছে। এক কথায় এযাবত

কালের রক্ষণশীল গতানুগতিক সমাজে শ্রেণী পরিবর্তন, প্রায় হইয়াছে।

ধনক প্রত্যাগতদের হট যাও বলিয়া খেদাইয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া এই রাজ্যেরই কলকারখানায় তাহাদের স্থান করিয়া লইবার সুযোগ করিয়া দিলে তাহাতে বাঙ্গালী সমাজের মঙ্গল হইত। প্রত্যাগতরাও জীবিকার পথ পাইত। এখানে একটি কথা ভাবিয়া দেখিবার আছে। দেশ বিভাগের পরে যত পরিবারকর্তা উদ্বাস্তু হইয়া সীমান্তের এদিকে চলিয়া আসিয়াছেন তাহার চাইতে বেশী সংখ্যক পরিবার কর্তা অন্য রাজ্যের কৃষক সমাজ হইতে এই রাজ্যে আসিয়া বিবিধ অকৃষক বৃত্তিতে নিজেদের নিযুক্ত করিয়া দানাপানি সংগ্রহ করিতেছেন। এ রাজ্যে কংগ্রেস এবং কম্যুনিষ্ট যে দলই যখন গদী পাইয়াছেন তাহারা সবাই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের একই ভ্রান্ত ফর্মুলা অনুসরণ করিয়া পুনর্বাসনকে সুস্থ হইতে দেন নাই। কৃষক পুত্রের জন্য তাঁহারা জমি খুঁজিয়াছেন। অন্য সন্তানদের জন্য মাষ্টারী ও কেরানীগিরির ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। শিল্পক্ষেত্রে পুনর্বাসনের কথা ইহাদের বিবেচনায় স্থান পাইয়াছে এরকম মনে হয় না। আমাদের চরম দুর্ভাগ্য এই যে অন্য রাজ্যের কৃষকরা এ রাজ্যে আসিয়া শ্রমিক হয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গ হইতে আগত কৃষক সন্তানদের পাঠান হয় অন্যরাজ্যে প্রতিকূল পরিবেশে চাষ করার জন্য। কর্তারা যদি উদ্বাস্তু কৃষক সন্তানদের সকলকে জমি দিবার নির্বোধ চেষ্টা না করিয়া এ রাজ্যের প্রসারমান শ্রমবর্তনে স্থান করিয়া লইতে তাহাদের সাহায্য করিতেন তাহা হইলে বর্তমানের উদ্ভট উদ্বাস্তু সমস্যার উদ্ভব হইত না। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের নামে এযাবৎ যাহা বলিয়া আসিয়াছে সবই যেন মুখের দায়সারা কাজ।

আরও একটি লক্ষ্য করিবার মত ব্যাপার আছে। কৃষক সন্তানকে কৃষকই রাখিতে হইবে এই দৃঢ় সংকল্প লইয়া সব দলেরই গরিষ্ঠান কর্তাব্যক্তিরা বছরের পর বছর উদ্বাস্তু কৃষক পরিবার গুলিকে ট্রানজিট ক্যাম্পে আটক দিয়া পুষিয়া রাখিয়াছেন। এই ব্যবস্থা ছোট বড় সরকারী বাবুদের ভাইনে বাবে রোজগার বেশ ভালই হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে বলিষ্ঠ কৃষক বলিয়া অকর্মণ্য যেতো বুদ্ধে পরিণত হয় এবং তাহার সন্তানরা দাদনে অনভ্যস্ত থাকিয়া অবশেষে যখন এতদিন জমি পাইল তখন দেখিতে পাইল তাহারা চাষ করিতে পারে না। কর্তাদের নির্বুদ্ধিতার ফসল ইহাছাড়া আর কিরূপ হইতে পারে?

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

ও

সবাইকে পড়ান—

বিজ্ঞপ্তি

বিঃ দ্রঃ—গত সংখ্যায় 'নব যুগের দধীচি'-এর লেখক যতীন্দ্র নাথ দাসের-এর স্থলে শ্রীযতীন্দ্র নাথ বাস ভুল বসতঃ ছাপা হওয়ায় আমরা দুঃখিত।

সংবাদ—

বন্যার মহাপ্লাবনে
বিপ্লবীদের প্রতিষ্ঠিত নিবেদিতানগর ধ্বংশের পথে—

হাওড়া হতে যে কর্ড রেল লাইনটি বর্দ্ধমান গিয়েছে, তারই ডান দিকে হুগলী জেলার জনাই রোড্ ষ্টেশনের পূর্ব্বপ্রান্ত হতে দিল্লী রোড পর্য্যন্ত এক বিস্তীর্ণ নিচু অঞ্চলের গ্রামগুলি চিকরন্ত, নিবেদিতানগর, ডান পতিপুর, পাঁচঘড়া মোল্লার বেড়, তাহুয়া প্রভৃতি বন্যাপ্লাবনে বিধ্বস্ত ও সর্বনাস্ত। হত-দরিদ্র অনুন্নত শ্রেণী অধ্যুষিত এই অভিশপ্ত গ্রামগুলির সঙ্গেই বিরাট ডানকুনী বিল। এখনও এই এলাকাটি ৮।১০ ফুট বদ্ধ, দূষিত জলে নিমগ্ন। এই মারাত্মক দূষিত জল অবিলম্বে নিকাশের ব্যবস্থা না হলে গ্রামগুলির ধ্বংশ অনিবার্য্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য যে এই অঞ্চলের ৭৫% অধিবাসীই হত দরিদ্র তফশিল ও তফশিল উপজাতিভূক্ত (লোধা শ্রেণী) মানুষ।

প্রকৃতির রুদ্র রোষের আঘাতে সর্ব্বগ্রাসী সর্ব্বনাশের হাত হতে রক্ষা করার জন্য মৃত্যুমুখী হতভাগ্য লোকগুলির করুণ আবেদন মর্মান্তিক।

এক ভয়াবহ জলচ্ছবি ঘিরে আছে গ্রামগুলিকে—এই এলাকার নিরক্ষর ও অনুন্নত শ্রেণীর ছেলে মেয়েদের প্রিয় বিদ্যালয় "বিপ্লব সাধক ত্রৈলোক্য মহারাজ বিদ্যানিকেতন" অথৈ জলের তলে বিলুপ্ত হতে চলেছে। সমস্ত মাটির ঘর ও কুড়ে ঘরগুলি বন্যায় বিধ্বস্ত ও ধ্বংস।

এই দরিদ্র গ্রামগুলির জন্য রোগ, মৃত্যু, অনাহার ও নিরাশ্রয়তার ভয়াবহ অভিশাপ এগিয়ে আসছে। আজ এই অসহায় মৃত্যুমুখী মানুষগুলির প্রশ্ন ও আর্তক্রন্দন—কে এই বিধ্বংসী বন্যার পরবর্তী অবস্থা হতে বিপন্নদের উদ্ধার করবে? ক্ষুধার্তদের খাদ্য দেবে? এবং নিরাশ্রয়-দের মাথা গোজার ঠাঁই দেবে? আগামী দিনের আগত ধ্বংস ও মহামারীর হাত হতে কে তাদের রক্ষা করবে?—এই নিশ্চিহ্ন-প্রায় গ্রামগুলিতে খাদ্য নেই, পানীয় জল নেই, ওষুধ নেই, পারাপারের নৌকা নেই, ওষুধ নেই ডাক্তার নেই।

এদের বাঁচাতে হলে চাই অবিলম্বে সরকারী ও বেসরকারী মুক্ত উদার সাহায্য—চাই মানবতাবোধ নিয়ে, নি-স্বার্থভাবে সেবার মন নিয়ে এদের পাশে এসে দাঁড়ান। বিশেষ করে অবিলম্বে চাই গ্রামের রোগাক্রান্তদের জন্য ও রোগাক্রান্ত হতে রক্ষার জন্য <u>একটি অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র বা ইউনিট স্থাপন</u>।

নিবেদিতা সার্কিল সোসাই ও স্থানীয় কর্মিরা সেবার কার্য্যে এগিয়ে এসেছেন কিন্তু তাঁদের সুযোগ-সুবিধা সীমিত।

'অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর'

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলছি—এই অঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর।

নিবেদিতা নগরের হতভাগ্য অধিবাসীবৃন্দ।

বিপ্লব ও বিপ্লবীর দর্শন

সুবোধ মজুমদার

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বিশ্বব্যাপী এই পাপচক্রের দেহ হচ্ছে অর্থনৈতিক কাঠামো, আর তার আত্মা বা কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ভ্রান্ত জীবন-মানবোধ। যে-কোন একটা সাধারণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেই স্পষ্ট জীবন্ত হয়ে উঠবে বিষয়টা। একজন সাধারণ লোক থানায় গিয়ে অভিযোগ করল তার ওপর পীড়ন করা হয়েছে অন্যায়-ভাবে। দারোগা তার অভিযোগের কোন প্রতিকার করতে চেষ্টা করল না, এমনকি তার অভিযোগ নথীভুক্তও করল না। এই কর্তব্যচ্যুতির মূলে আছে দুটি কারণ—(১) কর্তব্য করতে অনিচ্ছা; এবং (২) উৎকোচ গ্রহণের ইচ্ছা। কর্তব্য পালনে অনিচ্ছার কারণ আলস্যও হতে পারে, আবার ভ্রান্ত সম্মান বোধও হতে পারে। এ-দুটোরই মূলে আছে ভ্রান্ত জীবন-দর্শন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্তব্যচ্যুত কর্মচারীরা পরিচালিত হয় উৎকোচ গ্রহণের ইচ্ছা দ্বারা। এই ইচ্ছের মূলেও রয়েছে দর্শন-বিহীন মনের ভ্রান্ত জীবনমানবোধ।

একজন বন্ধুস্থানীয় মধ্যবিত্ত রাজকর্মচারীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ঘুষ নেন কেন?

অমনি তিনি উত্তর দিলেন, ঘুষ নিই শুধু অভাবের তাড়নায়।

অন্যায় উপার্জনের ফলে যে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ও মহার্ঘতা বাড়ে তা তিনি বুঝেও বুঝলেন না। নৈতিক অন্যায়টাকেও তিনি পুরোপুরি মেনে নিতে পারলেন না। অন্যান্য শত শত ঘুষখোর কর্মচারীর মতোই তিনি ধ'রে নিলেন,—একটু ভাল বাড়ীতে থাকতে না পারলে, ভাল আহার-কাপড় পরতে না পারলে, ছেলেমেয়েদের ভাল স্কুলে পড়াতে না পারলে, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যথা-যথিকতা করতে না পারলে ছোটলোকের মতো বেঁচে থেকে লাভ কী?

বললাম, দেশের সাধারণ লোকের চেয়ে আপনার আয় অনেক বেশী। নিজের জন্য ব্যয়ও করেন অনেক বেশী আর কতটা ভালো বাড়ীতে আপনি থাকতে চান, কতটা ভাল স্কুলে আপনি ছেলেমেয়ে পড়াতে চান, কী উদ্দেশ্যে কতটা সামাজিকতা আপনি আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে করতে চান?

অনেক চিন্তা ক'রেও বুদ্ধিমান বিদ্বান বন্ধুটি কোন সঠিক উত্তর দিতে পারলেন না এই সহজ প্রশ্নগুলির। তাঁর মতো বিদ্বান বুদ্ধিমান আরও অনেক কর্মচারীকে একই প্রশ্ন ক'রে কোন সঠিক জবাব পাইনি আমি। একজন বন্ধুস্থানীয় ধনী ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞেস করলাম, এত ধন-সম্পদের মালিক হয়েও কেন আপনি আরও অর্থোপার্জনের জন্য এমন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন?

ভদ্রভাবে বাঁচতে হলে আরও টাকার প্রয়োজন, বললেন তিনি। সমাজের পাঁচজনের একজন হয়ে স্বচ্ছন্দে না থাকতে পারলে বেঁচে থেকে আর লাভ কী? অভাবের মধ্যে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল নয় কি?

জিজ্ঞেস করলাম, কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে পাঁচজনের একজন হয়ে স্বচ্ছন্দে থাকা যায়? কী কী দ্রব্যের জন্য কতটাকা আপনার প্রয়োজন?

কোনো উত্তর দিতে পারলেন না তিনি। আরও অনেক ধনীকে এসব প্রশ্ন ক'রেও কোন সঠিক জবাব পাইনি তাঁর কাছ থেকে। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এত লটারির টিকিট কেনেন কেন?

তিনি বললেন, বড়লোক হবার জন্য, দারিদ্র্য সহ্য হয় না আর।

জিজ্ঞেস করলাম, মাসে যে কুড়ি পঁচিশ টাকা লটারিতে নষ্ট হচ্ছে সে-টাকাটা সংসারে ব্যয় করলে আর একটু স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন না কি?

উত্তর এলো, পারি, কিন্তু একটা বড় আশা নিয়ে একটু কষ্ট করা ভালো।

কীসের আশা? —প্রশ্ন করলাম।

উত্তর,—যদি একবার লটারী লেগে যায় তাহলে চিরদিন বাঁচতে পারব ভদ্রভাবে।

কী কী জিনিষের জন্য কত খরচ করলে ভদ্রভাবে বাঁচা যেতে পারে?

আর পাঁচজন বড়লোক যা করে।

উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সবারই অবস্থা এক। সবাই চায় তার চেয়ে বড় আর পাঁচজনের মতো হতে, কিন্তু কেউ জানে না সেই বড়র স্বরূপটি কী। এর কারণ জীবনদর্শনের অভাব। দর্শনের অভাব থেকে জন্ম নেয় আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। আর আত্মপ্রত্যয়হীনতা থেকে জন্ম নেয় পরানুকরণ প্রবৃত্তি। এই মারাত্মক প্রবৃত্তি আজ জন্ম নিয়েছে ধনী, দরিদ্র, শ্রমিক, মালিক, চাষী, জোতদার, উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক, ছাত্র, পুরোহিত, যজমান, বিচারক, অভিযুক্ত, গৃহী, সন্ন্যাসী, নেতা, কর্মী সবার মধ্যে। সকলে একই সঙ্গে চলেছে—অন্ধভাবে ছুটেছে—এক সুদূরাগত, অনির্দেশ্য, অ-বোধ্য জীবন-যানের পেছনে পেছনে। তারা ভালমতোই বুঝতে পারে যে সমাজে থেকেও মনে মনে তারা সকলেই অতীব অসামাজিক, আর এই পাপের ফলে দুঃখ তাদের বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন। তথাপি একটা অদৃশ্যকল্পিত সুরকেন্দ্রের চাপে প'ড়ে তারা বিরত থাকতে পারে না এ-পাপ থেকে। গ্রামের লোক চায় তার কল্পিত এক কলকাতার ফ্যাশান অনুযায়ী চলতে, কলকাতার লোক চায় তার কল্পিত এক দিল্লীর ফ্যাশান অনুযায়ী চলতে, দিল্লীর লোক চায় তার কল্পিত এক লণ্ডন বা ওয়াশিংটন বা মস্কো বা পিকিংয়ের ফ্যাশান অনুযায়ী চলতে। সকলেই তারা ভুলে নিয়েছে—তাদের সকলের মধ্যে রয়েছে শ্রমবিমুখতা, কর্তব্যের প্রতি অনীহা, অতিরিক্ত মানবোধ, বিনা প্রতিদানে বেতন গ্রহণের ইচ্ছে, অন্যায় উপার্জনের প্রতি লোভ, বিশেষ বিশেষ অপরিহার্য কর্তব্যের প্রতি ঘৃণা, যথাসম্ভব বেশী সম্পদ ও দ্রব্যের মালিক হওয়ার বাসনা, ইত্যাদি। একটা বিষব্যাপী বিপুল পাপচক্রের অংশ রূপে কাজ ক'রে যাচ্ছে তারা সবাই।

এই মারাত্মক অবস্থা থেকে সমাজবাসীকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র সঠিক জীবনদর্শন—অর্থাৎ বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক জীবনদর্শন। এই জীবনদর্শনটি হচ্ছে বাস্তবমুখী আদর্শবাদ। যে-আদর্শবাদ বাস্তবকে উপেক্ষা করে এবং যে জড়বাদ অপ্রত্যক্ষকে অস্বীকার করে উভয়ই সমান অনুপযোগী প্রকৃত বিপ্লবীর কাছে। বিপ্লবীকে শুধুমাত্র দর্শন-প্রচারক হলেই চলবে না, নিজের জীবনে দর্শন অনুশীলনও করতে হবে তাকে। অর্থাৎ বাস্তবমুখী আদর্শবাদ যে-শ্রেয়োনীতি সমর্থন করে সে-শ্রেয়োনীতি অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে তাকে।

সমাজের সুমুখে আজ রয়েছে দুটো মূল জীবনদর্শন—জড়বাদ ও আদর্শবাদ। জড়বাদের প্রধান ত্রুটি হচ্ছে তার কোনো শ্রেয়োনীতি নেই। অথচ একটা শ্রেয়োনীতি কাঠামো ছাড়া কোনো সমাজ পারে না সুসংগঠিত হতে। কারণ সুসংগঠিত সমাজ জীবনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে কতকগুলি মূল্যবোধের। সততা, সমতা, সরলতা, মমতা, বিশ্বস্ততা, সংযম, আত্মত্যাগ, পরোপকার প্রভৃতি কতকগুলি সামাজিক মূল্যবোধ যদি না থাকে সমাজবাসীদের মনে তাহলে সমাজজীবন চলতে পারে না সুষ্ঠুভাবে। আর মূল্যবোধগুলো হয়ে যায় অকেজো যদি তাদের ভিত্তিটি না থাকে অতীন্দ্রিয় জগতে। যেমন, সততা মূল্যবোধটির সংঘর্ষ বেধে গেল আমার ঘুষ খাওয়ার সঙ্গে, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় জগতের আশার, আর প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রলোভনের মধ্যে। প্রত্যক্ষ জগতের সুযোগ আমাকে ডেকে বলছে—নিজের ইন্দ্রিয়সুখের ব্যবস্থা ক'রে নাও জীবনকালীন চেষ্টার পাবে না। অপর পক্ষে মূল্যবোধ বলছে—সকল লোভ সংবরণ ক'রে স্থায়ী সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করো। জড়বাদী মনে ক'রে ইন্দ্রিয়-সুখই হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য, অতএব মূল্যবোধের আবেদন কোন রেখাপাত করতে পারে না তার ওপর। আদর্শবাদী মনে করে জীবনের পরম লক্ষ্য যে সুখ-শান্তি তা নির্ভর করে মূল্যবোধের পরিতৃপ্তির

ওপর। অতএব দেহ তথা পাপে ইন্দ্রিয়সুখকে অগ্রাহ্য ক'রে মূল্যবোধের আবেদন রক্ষা করতে। আমি যদি আদর্শবাদী হই তবেই শুধু পাপের ঘুষ না খেয়ে কর্তব্য করতে। আজ যে দুর্নীতির পাপচক্রের কবলে সমাজ পড়েছে তার থেকে আদর্শবাদই তাকে উদ্ধার করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ সমাজ-বিকাশের গতিরোধকে বিশ্লেষণ করতে জড়বাদীরা অবৈজ্ঞানিক কার্যকারণতত্ত্ব অসৎকার্যবাদকে ব্যবহার ক'রে। ন্যায়দর্শন প্রস্তাবিত অসৎকার্যবাদ ব্যবহার ক'রে মার্ক্স প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর বাস্তব জড়বাদকে। বিবর্তনশীল সমাজকে তিনি—থিসীস, এন্টিথিসীস ও সিনথেসীস—এই তিন পর্যায়ে বিভক্ত ক'রে বলেছেন একটা পর্যায় ধ্বংস হয়ে গেলে পর আর একটা পর্যায় শুরু হয়। অর্থাৎ কারণ সম্পূর্ণ ধ্বংসীকৃত হয়ে গেলে পর উদ্ভূত হয় কার্য বা ফল। অথচ আধুনিক বিজ্ঞান গ্রহণ করেছে সাংখ্যদর্শন প্রবর্তিত ও বেদান্তদর্শন গৃহীত কার্য-কারণতত্ত্ব সৎকার্যবাদ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কারণ ধ্বংস না হয়ে পরিণতি লাভ করে কার্যের মধ্যে। অর্থাৎ থিসীস-এর যত পরিণতি হচ্ছে এ্যান্টিথিসীস, আর পূর্ণ পরিণতি হচ্ছে সিনথেসীস। বাস্তবমুখী আদর্শবাদও এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করে।

তৃতীয়তঃ পরিবেশের প্রভাবকে ব্যাখ্যা করতে জড়বাদী তথা মার্ক্সবাদীরা গ্রহণ করে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব। এই তত্ত্ব বলে সমাজের বিকাশ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা, মানুষের কোন হাত নেই এর মধ্যে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বলে মানুষের ইচ্ছা-শক্তি ও প্রচেষ্টা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত করে প্রাকৃতিক পরিবেশের কাজকে।

বর্তমানের বিপ্লবী কর্মীরা যদি আধুনিক বিজ্ঞানকে স্বীকার ক'রে বাস্তবমুখী আদর্শবাদ ও বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদকে জীবনদর্শন হিসাবে অবলম্বন করেন তবেই তাঁরা উন্নয়নশীল বিপ্লব ঘটাতে পারবেন আধুনিক সমাজে মনীষী দার্শনিক প্লেটো বহু পূর্বেই বলেছিলেন দার্শনিক শাসকের কথা। নেতাজী সুভাষচন্দ্রও চাইতেন শাসক হবেন সাম্যবাদী ও দার্শনিক। এসব কথা স্মরণ ক'রে আজকের বিপ্লবী শাসককেও হতে হবে দার্শনিক ও সাম্যবাদী। নতুবা দুর্নীতির পাপচক্রের চাপে পিষ্ট হয়ে যাবেন তাঁরা

———

শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি সম্পন্ন—বিখ্যাত 'ফলিতজ্যোতিষ' গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীহরিহর জ্যোতিশাস্ত্রী

বি, এ, এল, এল, বি (কলি °) এ, সি, আই, আই (লণ্ডন)

প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে ১১টা এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার ব্যতীত অন্যদিন বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্বপ্রকার জ্যোতিষী কার্য্য করেন।

কোষ্ঠী বিচারের পারিশ্রমিক ন্যূনাপক্ষে ২০ টাকা।

চেম্বারের ঠিকানা :

সি-৩৪, কাননগো পার্ক, গড়িয়া, ২৪ পরগণা

৫ নং বাসরুট, বৈকুণ্ঠবাটা ষ্টপ।

৪ পাতার শেষাংশ

স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। পূর্ব বৎসর ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতে এসে বঙ্গভঙ্গ যখন রহিত করে যান সম্রাট কলকাতা নগরীতে এক দরবার করে ছিলেন। ভারতীয় রাজন্যবর্গ এবং ভারতের জনতা এই দরবারে রাজকীয় পদে তাদের রাজভক্তি উপঢৌকন দিয়ে ধন্য হন। রাসবিহারীর নিকট এটা ভারতের পক্ষে অপমানের বিষয় মনে হয়েছিল। তাই এবারে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে যখন দিল্লীতে স্থানান্তরিত হচ্ছে তখন দিল্লীতে এই দরবারের পুনরাবৃত্তি রাসবিহারীর নিকট অসহ্য মনে হল। তিনি স্থির করলেন এই রাজকীয় উৎসবেই তিনি বিশ্বের নিকট ভারতবাসীর অন্য এক পরিচয় ঘোষণা করবেন বিশ্ববাসীকে তিনি জানিয়ে দিবেন ভারতবাসী শুধু রাজ-ভক্তিই উপঢৌকন দেয় না ভারতবাসীর অন্য একরূপ পরিচয় ও আছে। ভারতবাসী বিদ্রোহ করতেও জানে। রাস বিহারী স্থির করলেন যে রাজকীয় উৎসবে তিনি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করবেন।

প্রভুলচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র, অমৃতলাজরা, আমীরচাঁদ, আউধ বিহারী প্রভৃতি সকলেই এই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। রাসবীহারীর ছুটি তখন ফুরিয়ে গিয়েছিল। তিনি চন্দন নগর থেকে দিল্লী হয়ে দেরাদুন যাবেন স্থির করলেন। যাওয়ার সময় বসন্ত বিশ্বাসকে সঙ্গে নিলেন। চন্দননগরে এই সময় যতীন্দ্র নাথক এবং অমৃত হাজরার উদ্‌যোগে বোমা তৈরী হত। রাসবিহারী একটি বোমাও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। চন্দননগর ত্যাগ করার সময় তিনি বললেন, "বাংলার বিপ্লবীদের দ্বারাই হার্ডিঞ্জ হত্যাকাণ্ড সিদ্ধ করতে হবে। পাঞ্জাবী বিপ্লবীগণ তাহলেই বাংলার প্রতি আকৃষ্ট হবে। এর ফলে শুধু দিল্লী নয়, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র প্রদেশের সঙ্গেও বাংলার বিপ্লবী সংহতির ঘনিষ্ট সংযোগ ঘটবে। চন্দননগরের সঙ্গে এই সকল বিপ্লবী নেতাদের সম্বন্ধ দৃঢ় হলে ভবিষ্যতে ভারত-ব্যাপী বিপ্লবের কাজ অধিকতর প্রশস্ত হবে।" সকলেই রাসবিহারীর প্রস্তাব সমর্থন করলেন। বসন্ত বিশ্বাস ও রাসবিহারীর দিল্লীর যাত্রার দিনে বোমাটি গাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এলেন চন্দননগরের বিপ্লবী কর্মী যতীন্দ্রচন্দ্র দত্ত। এই বোমা তৈরী করেছিলেন। অরুণ চন্দ্র দত্ত এবং এর সম্পূর্ণতা সম্পাদন করেছিলেন অমৃতলাল হাজরা।

স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং বিপ্লব আন্দোলনেও রাসবিহারীর ইতিহাস সুদীর্ঘ ৪০ বৎসরের। স্বাধীনতা সংগ্রামে রাসবিহারী ছিলেন একজন খাঁটি নায়ক। বিপ্লবী নেতৃত্ব তাঁর নিকট আপনা থেকেই এসেছিল। নাম যশের কোন আকাঙ্খা নিয়ে তিনি কাজ করতেন না। তিনি কাজ করতেন প্রাণের টানে। জীবনে একদিনের জন্যও তিনি নাম যশকে গ্রাহ্য করেননি।

(চলবে)

ক্ষীরোদ কুমার দত্ত প্রণীত

বিপ্লবী পুস্তকমালা

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১·৫০
২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮·০০
৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২·০০
৪। সোহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১·০০
৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১·২৫
৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—·৪০
৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—·৬০
৮। স্বাধীনতার শহীদ মা ও মেয়ে—·৪০
৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—·৬০
১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—·৫০
১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—·৪০
১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—·৭৫

Contd. from 2nd Cover)

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Dist—24-PARGANAS		
Chakraborty Smt. Basanti w/o Late Shyamapada	87 Gobinda Basu Lane, Puyba Baruipara P. O. Halisahar	150	11. 7. 78
Chatterjee Lalit Mohan	Vill Kartickpur P. O Deganga	200	1 10. 76
Dam Smt. Kusum Kumari w/o Late Ananga Mohan	Block No. 2 Flat-6 Govt Housing Estate P. O. Sodepur	150	7. 1. 78
Das Sushil Ranjan	159/4 Ashokenagar P.O Ashokenagar	200	1. 4. 78
Sutradhar Smt. Shyam Dasi w/o Late Premananda Sutradhar	Vill Chandanpukur (Wirelesspara) P. O. Barrackpore	150	1 10. 76
	ENHANCEMENT		
Sarkar Km Lilima Rani d/o Late Prafulla Kumar	P O. Kazinagar P. S. Bijpur	100	7. 12. 77
	Dist HOWRAH		
Chakr borty Smt. Kiron Bala w/o Late Dinesh Chandra	Belgachia Colony 309 K. Road, P. S. Lilua, Howrah	200	24 2. 78
Hazra Smt. Bibharani w/o Late Sukesh Prasad Hazra	22/4 Bellilious Road P. O. & Vill Khalna	200	23. 7 78
Jaty Pulin Behari	P. O. & Vill Joypur Phakirdas P. S. Amta (in place of 1. 4 75 Amendment)	200	1. 10. 78
Mukherjee Smt Sabita w/o Late Anil Mukherjee	6/6 Ganesh Chatterjee Lane P. O. Shibpur	100	18 2 78
Sarkar Mani Mohan	2/8 Hazarhat Kalitola Lane P. O. Santragachi	200	1: 4, 71
	Dist—HOOGHLY		
Bose Smt Usha w/o Late Nitish Chandra	6D Raja Peari Mohan Road Uttarpara	150	16. 12 77
Bhattacharjee Smt. Urmila w/o Late Banku Behari	P. O. & Vill Churait P. S. Arambagh	10.	

RgedNo. R. N .24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

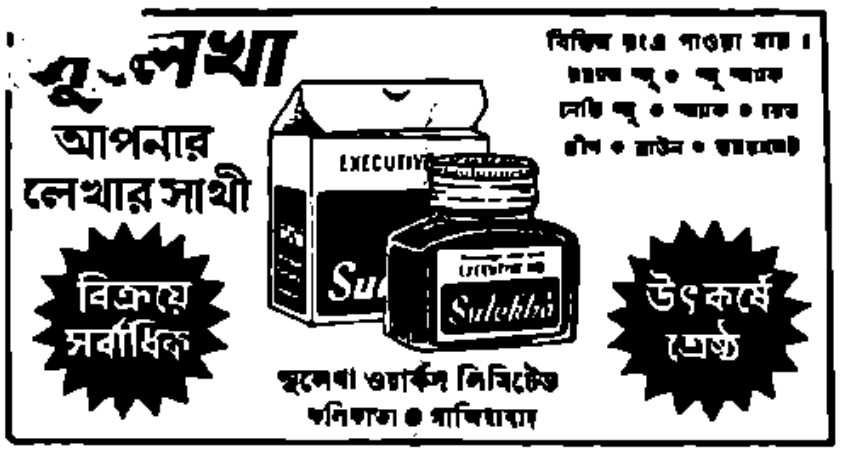

13 NOV 1978

— সম্পাদকমণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী, শ্রীবারীণ রায়।
সম্পাদক—শ্রীশান্তি পদ চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বোম্বাই—শ্রীমনগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীমতীন্দ্র গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৩৭ বলরাম ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১১ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

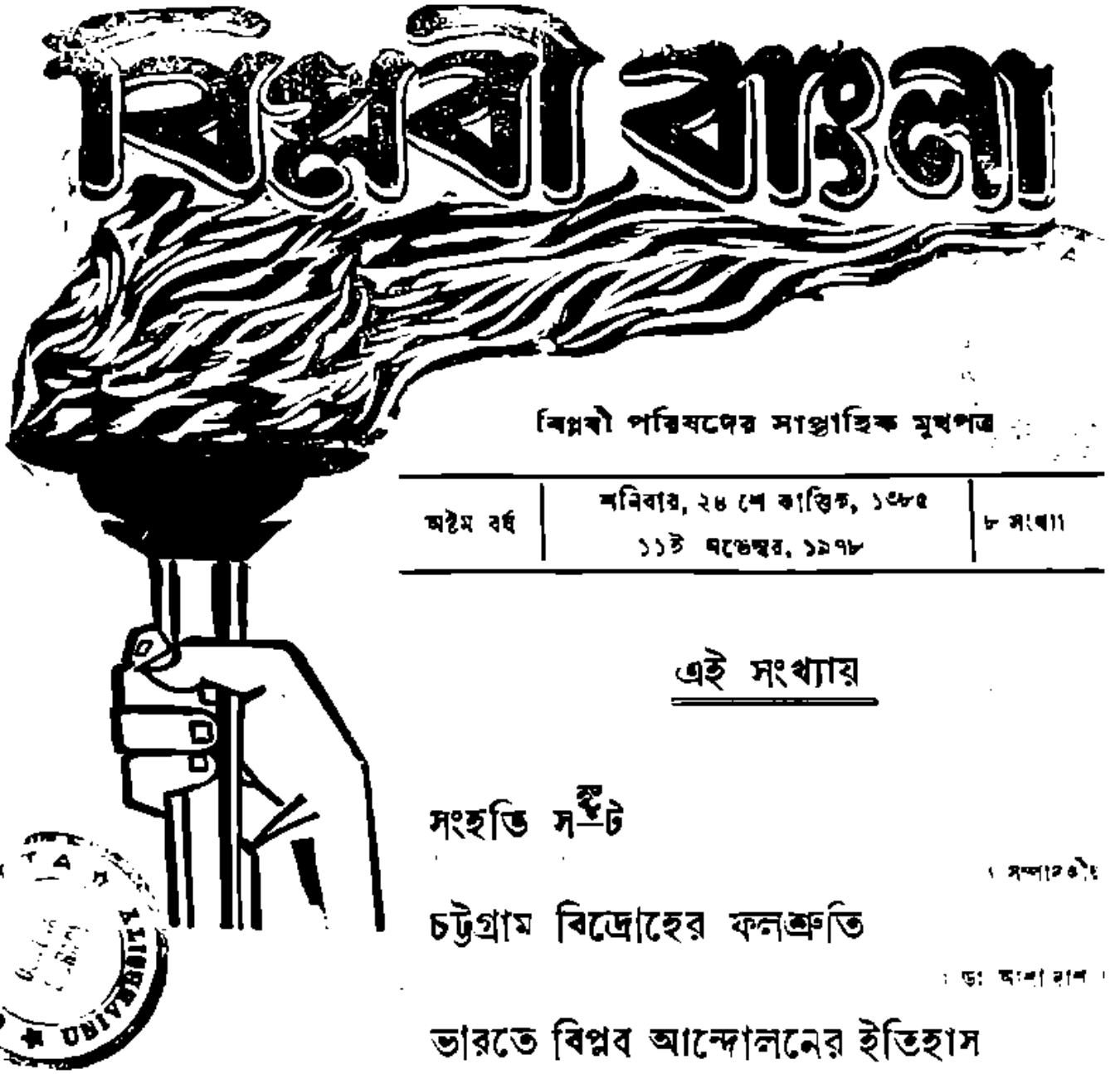

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

অষ্টম বর্ষ	শনিবার, ২৪ শে কার্ত্তিক, ১৩৮৫ ১১ই নভেম্বর, ১৯৭৮	৮ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

সংহতি সম্মেলন

(সম্পাদকীয়

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের ফলশ্রুতি

(ডঃ আশা রাণ

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

(ক্ষীরোদ দত্ত

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

(অধ্যাপক নলিনী মোহন দাসগুপ্ত

জনতাদল কোন পথে

(বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবীণ বিপ্লবীর পত্র

পথের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন পন্থা নাই।

—বঙ্কিমচন্দ্র

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Dist—HOOGHLY		
Chatterjee Amulya Chandra	Bidhan Palli, P: O. Bara Bahera	200	1. 10. 76
Dutta Smt. Ava Rani w/o Late Pramatha Nath	55, N C. Chakraborty Lane, Chatra, P. O. Serampore	200	18. 4. 78
Majumdar Sushil Ch.	c/o Ranjan Majumdar Mallik Gali P O. Chinsura	200	1. 10 76
Pal Satya Kinkar	P. O. & Vill Nandanpur	200	1. 10. 76
Sarkar Smt. Maya Rani w/o Late Rebati Mohan	115 Rishi Bankim Avenue P. O. Bhadreswar	200	3. 8. 78
	Dist—BURDWAN		
De Smt. Kanaklata w/o Late Phanindra Nath De	P O & Vill Mestala	100	28. 3. 78
Singha Smt. Sabria Rani w/o Late Gopen Mohan	P. O. & Vill Jhawdanga P. S. Purbasthali	150	9. 5. 78
	Dist—BANKURA		
Bit Smt. Lilabati w/o Late Harimoy Bit	P. O. & Vill Sonamukhi	100	13. 1. 78
Batabyal Fakir Chandra	Vill Bhaktabandha P O Kesiara, P.S Gangajal Ghat	200	1. 4. 74
	Dist—NADIA		
Chakraborty Smt. Priti w/o Late Gopal Chrkraborty	111, Netaji Subhas Road P. O. Santipur	200	7. 6 78
Dhar Sudhir	P. O. Taherpur	200	1. 10. 76
Roy Smt. Labanya Prova w/o Late Ramesh Ch. Roy	Vill Halalpur, P. O Hijli P. S. Ranaghat	100	2. 7. 73

(Contd. on 3rd Cover)

সম্পাদকীয়

সংহতি-সঙ্কট

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে একটা অমঙ্গলসূচক মেঘের যে গুরু গুরু ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, সময়মত সাবধান না হলে ঐ মেঘের বর্ষণ দেশকে প্লাবিত করে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে। সে প্লাবন প্রাকৃতিক প্লাবনের থেকে অনেক ভয়ঙ্কর হবে। দেশ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে, জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তজ্জনিত ক্ষয়ক্ষতি হবে অপূরণীয় ভাবে। গভীর দুঃখের কথা যে রাষ্ট্রনায়কেরা এই ঘনায়মান সমস্যার সমাধানের জন্য না হচ্ছেন অবহিত, না সচেষ্ট হচ্ছেন এই সর্ব্বনাশকে রুখে দিতে কোন সর্ব্বাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। রাষ্ট্রনায়কদের ভুলের ফলে এক একটা জাতিকে কি মর্মন্তুদ ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয় কয়েকটি প্রজন্ম ধরে, তার উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। ভারত বিভাগ তার একটি সাম্প্রতিকতম উদাহরণ।

ভারতবর্ষ একটি বিরাট দেশ। এখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন জাতির মানুষ বাস করে। কিন্তু এই বিভেদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় ঐক্য যখন বজায় থেকেছে, তখনই এই দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ও আত্মকলহ যখনই প্রকাশ পেয়েছে, তখনই এই দেশ পিছিয়ে পড়েছে, এমনকি দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন, এমনকি নষ্ট হয়েছে। কাজেই রাষ্ট্র শাসন যারা পরিচালনা করেন, তাদের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। জাতীয় নীতি ও কর্ম্মপন্থা প্রণয়ন করতে হবে। অন্যথায় আমরা আবার গভীর তমসাবৃত হয়ে ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হব।

গত সাতাত্তর সালের নির্ব্বাচনের পর পাঁচটি দল উপদল যখন একত্র হয়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করল, তখন অনেকের মনে এই আশা জেগেছিল যে তারা একটা স্থিতিশীল সরকার গঠন করে দেশের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে পারবেন। তারাও ডঙ্কা বাজিয়ে ধরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। একথা বলাই বাহুল্য, দেশের অগ্রগতির প্রধান ভিত্তি হচ্ছে জাতীয় সংহতি। বিচ্ছিন্নতামুখী হয়ে, প্রাদেশিক স্বার্থ, ধর্মগত, জাতিগত, ভাষাগত দৃষ্টিভঙ্গী যে পরিমাণে প্রশ্রয় পাবে, সর্ব্বভারতীয়ত্ব বোধ সেই পরিমাণে ক্ষুন্ন হতে বাধ্য এবং জাতি দুর্ব্বলতর হয়ে পড়বে নিশ্চিতভাবে। ইংরেজ বণিকেরা নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্য, প্রথম আমাদের দেশে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদের বীজ বপণ করে তাকে লালন পালন করেছিল। আমাদের তখনকার নেতৃবৃন্দ এই কৌশল ধরে ফেলেছিলেন

এবং সমগ্র দেশের মধ্যে প্রতিষেধক হিসেবে সর্ব্বভারতীয় মানসিকতা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন সফলভাবে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য। নির্ব্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতা দখলের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আধুনিক কালে আমরা উল্টো দিকে চলেছি। আমাদের নেতারা ক্ষুদ্র স্বার্থের শিকার হয়ে বিচ্ছিন্নতামুখী ভাবধারাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। অবশ্য এটা সহজেই জানতে পারা যায় যারা ক্ষমতা দখলের জন্য নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া বিবাদ সুরু করেন, তাঁরা দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। রাজনৈতিক দলগুলির এই কাজকর্মের ফলে দেশের মধ্যে একটা কুপ্রভাব বিস্তারিত হয় এবং তার ফলশ্রুতি খারাপ, অন্ত ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিরাও বিভিন্ন সম্প্রদায়, ভাষাভাষী, জাতি গোষ্ঠীকে উত্তেজিত করে। ঘোলা জলে মাছ ধরার কৌশল অবলম্বন করেন। মুসলমান প্রধান অঞ্চলে, সর্বত্রই মুসলমান প্রার্থী ভিন্ন অন্য কাউকে দাঁড় করাতে সাহস পান না নির্ব্বাচনের সময়। ঠিক একইভাবে ভাষা এবং জাতির সংখ্যা অনুসারে দাঁড় করান নিজ নিজ দলের প্রার্থীকে। এর ফলে ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রাধান্য পায়, নিজেদের গণ্ডীর বাইরে দৃষ্টিপাত করতে আঞ্চলিক মানুষ অসমর্থ হয় এবং এই কারণেই অতি ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য লাভের জন্য হামেশাই ঘটে দাঙ্গা, রক্তপাত ও জীবনহানি। অনৈক্যের শনির প্রবেশ পথ খোলা রাখলে সেই রন্ধ্র দিয়ে একদিন প্রলয়ঙ্কর দৈত্যেরা মুখব্যাদান করে দেশের সংহতিকে বিনাশ করবে, এতে অন্যথা হবার কিছু নেই। একমাত্র অন্ধ ছাড়া এই পরিণাম সকলের নিকটই সুস্পষ্ট হচ্ছে। চিন্তার কথা, ভাববার কথা, উদ্বেগের কথা এটা। এই আত্মঘাতী নীতি পরিহার করে বলিষ্ঠ মঙ্গলজনক নীতিকে বাস্তবায়িত করতে না পারলে, গোটা দেশটাই যে সর্বনাশের অতল তলে তলিয়ে যাবে। তাই প্রয়োজন আত্মসমীক্ষার, প্রয়োজন আত্মশুদ্ধির, প্রয়োজন সৎসাহস ও সততার, আদর্শনিষ্ঠা ও চরিত্রবল এবং নির্ভেজাল দেশপ্রেমের।

লম্বা চওড়া মৌখিক প্রতিশ্রুতির ধোকায় মানুষকে সাময়িকভাবে ভুলানো গেলেও দেশের সর্বনাশ ঠেকান যাবেনা। হাজার কমিশন বসিয়েও নয়, লক্ষ কথার ফুলঝুরি ছড়িয়েও নয়, বিশ্ব দুনিয়ার জন্য নকল দরদ প্রকাশ করেও নয়। দেশ না বাঁচলে কেউ বাঁচবে না, এই সত্য উপলব্ধি যত তাড়াতাড়ি করেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল উপদল ও দেশের মানুষ, ততই সেটা মঙ্গলজনক হবে সবার পক্ষে। অন্যথায় কারো পরিত্রাণ নেই। যে দল ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে, ক্ষমতালাভের মারফৎ কিছু করার ভোলায় হীন মানসিকতা বর্জ্জন করে গোটা দেশের স্বার্থকে সবার উর্দ্ধে স্থান দিয়ে, আদর্শনিষ্ঠা নিয়ে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতমাতার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করবেন, তাদেরই, একমাত্র দেশের মানুষ স্বাগত জানাবে। এর ফলেই দেশের সংহতি-সঙ্কট মোচন করা সম্ভব হবে।

———

জনতাদল কোন পথে

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

* UNIVERSITY

অবশেষে জনতা সংসদীয়দলের তিনদিনের বৈঠক ৬ই অক্টোবর শেষ হয়। উক্ত বৈঠকে চন্দ্রশেখর যে কেন গরহাজির থাকেন তার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মধুলিমায়ে ৭ই অক্টোবর সাংবাদিকদের কাছে বলেন যে, কিছু কিছু ব্যাপার সংবাদপত্রে ঠিকমত প্রকাশিত হয় নি। রবি রায়, মৃণাল সোমে এবং তিনি নিজে চেয়েছিলেন যে, অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনার আগে সর্বপ্রথম সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীগুলি নিয়ে আলোচনা হোক। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। সভাপতি চন্দ্রশেখরও একই অনুরোধ করেন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছাকেও অগ্রাহ্য করা হয় এবং তিনি মোটেই মোরারজীর কাছে আমল পান নি। ফলে ঐ বৈঠকে যোগদানে তিনি বিরত থাকেন। তাঁর মতে এ শুধু সময়ের নিছক অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নয়। লিমায়ে আরো বলেন, জনতা সংসদীয়দলের সচিব সাংবাদিকদের কাছে যা যা বলেছিলেন তা খুবই একপেশে। যে ভাবে সংসদীয়দলের সাধারণ সভা হয়েছে, তা জনমনে কোন দাগ কাটতে পারেনি, বরং একটা খারাপ মনির সৃষ্টি করল। কান্তিদেশাইয়ের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে লিমায়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে বলেছিলেন—তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তা সুপ্রিম-কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে পেশ করা হোক। তখন আমি জানতে চাইলাম, প্রধান বিচারপতি কোন অধিকারে তদন্ত করবেন? কিসের ক্ষমতায় বা দলিলপত্র ও সাক্ষীদের তলব করবেন তিনি? তা ছাড়া তিনি কি এই ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছেন? আমার এসব প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন—দলিলপত্র বা সাক্ষী টাক্ষী কোন কথা নয়। এই শুনে আমি বললাম—কাজির ব্যাপারে প্রধান বিচারপতি কোন আনুষ্ঠানিক অনুরোধ এবং আইন সম্মত অধিকার ছাড়া মতামত দিতে রাজি হলে সমালোচনার ঝড় উঠবে। প্রধানমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে চেন্নাপল্লীর রাজার দু হাজার একর জমি ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার সকল এক্তিয়ার থেকে রেহাই দিতে বলেছিলেন এবং এ ব্যাপারে আইনমন্ত্রকের মতামতও নিয়েছিলেন। লিমায়ে এই বিবৃতিরও সমালোচনা করেন। লিমায়ে আইনমন্ত্রী শান্তিভূষণের কাছে জানতে চান, এই বিষয়ে কোন্ আইন কানুনের বলে আপনি মতামত দিলেন? এতে রাজ্যের এক্তিয়ারের ক্ষেত্রের অনধিকার ও অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ হচ্ছে না কি? ভূমিসংস্কারের ব্যাপারে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের পরামর্শ এতে খেলাপ করা হবে না কি? তাছাড়া, জনতাদলের নির্বাচনী ইস্তাহারে ভূমিসংস্কারের যে সব ফাঁক বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি জনগণকে দেওয়া হয়েছিল তাও বরবাদ করা হবে না কি? বড় বড় জোতদারদের ব্যাপারে কোনরূপ মতামত দেওয়াটা আইনমন্ত্রীর কাজ নয়। রবিরায় সংসদীয় দলের বৈঠকের ব্যাপারটা অন্যদৃষ্টিতে দেখেছেন, তাঁর মতে, এই প্রথম জনতা এম্, পি, রা নির্ভীক ভাবে সংসদীয় বৈঠকে স্বাধীন মতামত জানাতে পারলেন—এর একটা মূল্য নিশ্চয় আছে—এটা কম ব্যাপার নয়। পর্দার আড়ালে কিন্তু পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে, চন্দ্রশেখর, মধুলিমায়ে, রবিরায় ও এঁদের কট্টর সমর্থকরা কেউই মোরারজীভাইয়ের সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের কাছে মোটেই পাত্তা পান্নি—তাই এই উষ্মা ও সাংবাদিকের কাছে কাঁদুনি গাওয়া, এ ছাড়া আর কিছুই নয় মোরারজী ওঁদের সকল কথা বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন, কিন্তু কোনরূপ ঘুলাই তার দেননি। 'অমৃতম্ যাচিতম্' বলে হেঁসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন তাই এঁরা এত গায়ের জ্বালা এটা বোঝা যায়। অপরপক্ষে, জনতা

পার্টির সভাপতি চন্দ্রশেখর উক্ত বৈঠকে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সংবাদিকদের কাছে বলেন, ঐ বৈঠকে ব্যক্তিগত যোগ্যতা প্রাধান্য থাকায় তিনি যাননি, যেহেতু এই ব্যাপারে তাঁর করণীয় কিছুই ছিলনা। তিনি স্বীকার করেন যে জেলাইয়ের সঙ্গে তাঁর কোন মৌল মতবিরোধ নেই। সংবাদে প্রকাশ যে চন্দ্রশেখর জেলাইকে বলেছিলেন, অভিযোগ পালটা অভিযোগ ঐ বৈঠকে না তুলে যদি দেশের সামনে যে সব সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি আছে তা নিয়েই সভায় পুরো সময় আলোচনা হয় তবে অথবা সময় নষ্ট না করে যথাযথ একটা কাজের কাজ করা হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে তাঁর অসুবিধার কথা জানিয়ে বলেন, যেহেতু এটা একটা জরুরী সভা, সুতরাং বিভিন্ন অভিযোগের ব্যাপারে সভায় আলোচনার অনুমতি না দিয়ে তিনি পারেন না এবং সেটা অন্যায় করা হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। গঠনমূলক কাজকর্মে পুরোপুরি আত্ম-নিয়োগের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নানাজীদেশমুখ, তা সময়োপযোগী এবং সত্যই প্রশংসাজনক বলে চন্দ্রশেখর মত প্রকাশ করেন। তিনি ভবিষ্যতে আর দলের সভাপতির পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবেন না বলে জানান। একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, জনতাপার্টি কোনমতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় শ্রীমতী গান্ধীকে চিক-মাগালুর লোকসভা আসনটি ছেড়ে দিতে পারেন না, কারণ তাঁর মতে শ্রীমতী গান্ধী হলেন সমস্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের হন্তারক। জনতাপার্টির কর্ণাটক শাখা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন্দ্র পাতিলকেই যোগ্য প্রার্থী বলে মনে করে এবং তাঁকেই জনতার মনোনয়ন দেবার জন্য চন্দ্রশেখরের কাছে তারা অনুরোধ জানিয়েছে। কিন্তু পাতিল নিজে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে সাহসী হচ্ছেন না বলে সংবাদে প্রকাশ। অবশ্য জনতাদল পাতিলকে রাজি করিয়ে প্রার্থী করেছে।

আবেদন

আমাদের সহকর্মী বিপ্লবী নেত্রী শ্রীযুক্তা বিভা চৌধুরীর (করুণাময়ী অধিকৃত) গুপ্তিপাড়া প্রতিষ্ঠান স্কুল ও আশ্রম সকলই বন্যায় জন্য ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা :—

শ্রীযুক্তা করুণাময়ী অধিকৃত
শ্রীশ্রী বিদ্যা প্রনবানন্দ মঠ, পাঠমহল
পোঃ—গুপ্তিপাড়া
জেলা—হুগলী।

প্রবীণ বিপ্লবীর পত্র

জগৎ কর্ম্মের প্রবাহে যৌবন জ্ঞানবুদ্ধি মত শক্তির আলোড়ন তোলে। যৌবন চলিয়া গেলে আসক্ত মনে থাকে স্মৃতি। বর্ত্তমানের তুলনায় তাহার মর্য্যাদা অধিক বলিয়া মনে হয়। অথচ মজা এই যে জগৎ প্রকৃতির এ চরিত্র চিরন্তন। আমাদের পিতৃপুরুষগণ আমাদের আচরণ পছন্দ করেন নাই। তাঁদের যৌবনের আচরণ তাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ পছন্দ করেন নাই। আমরা আমাদের পরবর্ত্তীদের তেমন পছন্দ করিতেছি না। তাতে কি প্রবাহ ঠেকবে? যা গেছে তাকে ছাড়িয়া দিয়াই সুখ। ঠেকাইতে গিয়া গঙ্গার স্রোতে ইন্দ্রের ঐরাবত ভাসিয়া যায়। আমরা বৃদ্ধ মানুষ। তাই বলিতে ছিলাম,.....(অতীতের) সেদিনকে....বিসর্জ্জন দিয়া বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতের দিকে তাকাইব না কেন?

.....যতদিন আমরা শুধু অতীতের সূত্র ধরিয়া বাঁচি ততক্ষণ আমরা ক্ষুদ্র। কারণ অতীতের বৃদ্ধি নাই। সে সেদিনের কর্ম্মের চৌহদ্দিতে আবদ্ধ। আমরা তার আওতায় বন্দী। কিন্তু যদি অনাবলম্বন আনন্দ ধরিয়া বাঁচি তবে আমরা হই মহৎ অর্থাৎ বড়। জলের তরঙ্গের মত আনন্দের তরঙ্গ দিকদেশে ভাসিয়া যায়, আমরা যা জানিয়াও তার সঙ্গে বিস্তৃতি লাভ করি। এই আনন্দ প্রবাহকে প্রত্যক্ষ করার জন্য যদি কোন রেডিও বা টেলিভিশন আবিষ্কৃত হইত তবেই জানা যাইত আনন্দের অবাধ প্রসার সীমাহীন। শুধু ওটা (অতীতটা) অন্ততঃ আমার কাছে এখন অর্থহীন ইতিহাস। কেবল আমার জন্য নয়, সকলের জন্যই আমি অতীত হইতে আলাদা হওয়া আবশ্যক মনে করি। তা ছাড়া এটাও বন্ধন তো! স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, বিষয় আশয় লইয়া আটকা পড়ি বন্ধুর বন্ধনে। আর অতীত কর্ম্মের স্মৃতি, লাভ-লোকসান, ভালমন্দ, জয়পরাজয়ের সুখ-দুঃখ বাঁধে ভাবের বন্ধনে। মুক্তির সাধক যে বিপ্লবী সে স্বেচ্ছায় বা পরেচ্ছায় বন্ধনকে বরণ করিবে কেন?

———

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীক্ষীরোদ দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৮৮১ খৃঃ ২৭শে মে বর্ধমান জেলার রাইনা থানার অন্তর্গত সুবলদহ গ্রামে রাসবিহারী জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রামটি কালনা ষ্টেশনের ৩।৪ মাইল পশ্চিমে দামোদর নদের তীরে অবস্থিত। রাসবিহারীর পিতা বিনোদ বিহারী বসু সিমলাতে সরকারী ছাপাখানার প্রধান সহকারী ছিলেন। রাসবিহারীর বয়স যখন ছয় সাত বৎসর তখন তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। পিতা এর পরে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। সুবলদহ গ্রাম প্রায় প্রতি বৎসরই দামোদর নদের বন্যায় ভেসে যেতো। এইজন্যে বিনোদ বিহারী প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরেই চন্দননগরে এসে কটক গোড়ায় এক বাড়ী নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। রাসবিহারী চন্দননগর ডুপ্লে কলিজিয়েট স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী, বর্তমান ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিলেন, স্কুলের পাঠ বেশী দূরে অগ্রসর না হলেও তিনি ইংরেজী বাংলা উত্তমরূপে লিখতে ও পড়তে পারতেন। পরবর্তী কালে তিনি ইংরেজী, ফরাসী, হিন্দি, উর্দু, গুরুমুখী, মারাঠী এবং গুজরাটী প্রভৃতি ভাষা উত্তমরূপে শিখেছিলেন। তাঁর রচিত বহু ইংরেজী প্রবন্ধ এবং পুস্তিকা আছে। দেরাদুন অবস্থানকালে রাসবিহারী অমৃত বাজার পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। বিপ্লবী জীবনে রাসবিহারীর আর একটা গুণ ছিল বেশ বদলের ক্ষমতা। পুলিসের চক্ষে ধূলা দেবার জন্য তিনি এমনভাবে পোষাক বদলে ফেলতে পারতেন যে তাঁর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ব্যক্তিও তাঁকে চিনতে পারতেন না। চন্দননগরে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার পরে তিনি মাঝে মাঝে পিতার নিকট সিমলাতে আসতেন। সিমলাতে এই সময় ভারতের নানা প্রদেশের লোকের আনাগোনা ছিল। এদের সঙ্গে মেলা-মেশার সুযোগ পেয়ে তিনি নানা ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হন। পরবর্তী কালে বিপ্লবী জীবনে বেশ বদলের সঙ্গে এটাও তাঁর অনেক কাজে লেগেছিল।

দেরাদুনে' রাসবিহারী প্রথমতঃ পি-এল ঠাকুরের গৃহে গৃহশিক্ষকতা করতেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বন বিভাগের গবেষনা বিভাগে একটী সরকারী চাকুরীর ব্যবস্থা করে নিলেন, বন বিভাগের সাহেব কর্মচারীরা এবং কয়েকজন দেশজ সামরিক কর্মচারী রাসবিহারীর নিকট হিন্দি ও বাংলা শিখতেন। এতে রাসবিহারীর বেশ দু পয়সা আয় হতো। Forest Research Office এ তিনি বেতন পেতেন মাসিক ১০০ টাকা। ১৯১১ সাল থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত তিনি দেরাদুনে শঙ্কর লাল মুদির চৌরাস্তায় বাস করতেন। তিনি যে অর্থ আয় করতেন তার মাত্র ২০৲ টাকা নিজের কাছে রেখে বাকী সবই দুঃস্থ নরনারীর জন্য ব্যয় করতেন।

বসন্ত বিশ্বাসকে যখন রাসবিহারী নিয়ে যান তার বয়স ছিল ১৫/১৬ বৎসর মাত্র। দেখতে খুব সুন্দর ও শ্রী ছিল। রাসবিহারী স্থির করলেন তাকে মেয়েদের পোষাক পরিয়ে শোভাযাত্রার দিনে মেয়েদের মধ্যে রাখবেন। বসন্ত সেখান থেকে বোমা নিক্ষেপ করবেন। রাসবিহারী বসন্তকে যখন নিয়ে আসেন তখনও দিল্লীর শোভাযাত্রার তিন মাস বাকী। তিনি বসন্তকে কয়েকদিন দেরাদুনে রেখে বালমুকুন্দকে বলে লাহোরে তার চাকুরী করে দিলেন। বালমুকুন্দ, রঘুবর-শর্মা, বালরাজ, হনুমন্ত সহায়, জীবনাথ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি দিল্লী বিপ্লবী সংগঠনভুক্ত ছিল। এদের মধ্যে কেউ দিল্লী অধিবাসী কেউবা পাঞ্জাব অধিবাসী ছিলেন। বালরাজের পিতা ছিলেন আর্য সমাজের অধিনায়ক। লাহোরে তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বালরাজ পিতাকে বলে বসন্তকুমারকে

লাহোরে লালা অমরনাথের পড়ুয়ার কার্যেসিদ্ধে কম্পা-উণ্ডারের কাছে ভর্তি করে দিলেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর। ভারতের রাজধানী এই দিন কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হচ্ছে। রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ সস্ত্রীক শোভাযাত্রা করে মোগল ইতিহাস প্রসিদ্ধ দেওয়ান আমের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে সাড়ম্বরে চলছেন ভারতের রাজন্যবৃন্দ এবং বিপুল জনতা। নূতন রাজধানীতে এইদিন তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। ভারতের অপর সব রাজা মহারাজা ব্যতীত সঙ্গে রয়েছেন সরকারী কর্মচারীবৃন্দ। সঙ্গে চলেছে সৈন্যবাহিনী কুচ্ কাওয়াজ করে। লর্ড হার্ডিঞ্জ ও তাঁর স্ত্রী চলেছেন সুইল গার্ডেন হয়ে হাতিতে চড়ে। সঙ্গে রয়েছে বাদ্য বাজনা। রাজপথের সকল গৃহের সকল কক্ষে এবং ছাদে নরনারীর ভীড়। সকলেরই দৃষ্টি হাতীর পিঠে সস্ত্রীক লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কটি তিনতলা। এখানে দোতলার একটি কক্ষে প্রায় তিনশত মহিলার বসবার স্থান রয়েছে। দোতলার বারান্দাও নির্দিষ্ট রয়েছে মহিলাদের বসবার জন্য রাসবিহারী এই বারান্দাতেই বসিয়ে দিয়েছেন মহিলাবেশী বসন্ত বিশ্বাসকে। বসন্ত এখানে তার মহিলা পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে বোমা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। উপযুক্ত সময়ে তিনি বোমা নিক্ষেপ করবেন রাজপ্রতিনিধির উপর।

১৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বসন্ত লাহোরেই ছিলেন। ১৯শে ডিসেম্বর রাসবিহারী নিজে গিয়ে তাকে দিল্লীতে নিয়ে আসেন। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে মহিলা জনতার মধ্যে বসন্তকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। সকলেরই দৃষ্টি ছিল বাইরের শোভাযাত্রার দিকে। বসন্তর হাতের মধ্যে লুকায়িত বোমা কেহই দেখিতে পায় নাই। শীতকাল বলে দিল্লীর নিদারুণ শীতে সবারই শরীর গরম বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল। বসন্তও মূল্যবান শীতবস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন। অভিজাত গৃহের মহিলা বলেই তাকে মনে হচ্ছিল। তাই ২/১ জন মহিলা তার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন,—"তোমার নাম কেয়া বহিন?" রাসবিহারীর শিখানো মতো বসন্ত উত্তর দিলেন,—"মেরা নাম লীলাবতী। মেয়েটি এরপরে আবার শোভাযাত্রা দেখতে লাগল। বসন্ত বেশী কথা বললেন না। একমনে শোভাযাত্রার আগমনের জন্য প্রতিক্ষা করতে লাগলেন।

শোভাযাত্রায় খুব বেশী প্রহরার ব্যবস্থা ছিল না। বড়লাট এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন বঙ্গবিভাগ রদ করে তারা ভারতবাসীর বিক্ষোভ দূর করতে সমর্থ হয়েছে। বাঙালী বিপ্লবীদের অসন্তোষের কারণও দূর হয়েছে। তাই লর্ড হার্ডিঞ্জ সেজন্য হার্ডিঞ্জের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে বলতে শোভাযাত্রার গতি পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ক্রমে বড়লাটের হস্তী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সামনে এলো। একজন মহিলা তার দিকে চেয়েছিল। অন্য সবারই দৃষ্টি শোভাযাত্রার দিকে। লীলাবতী বেশী বসন্ত তাকে বললেন, "বড়া আজব হোগা বহিন।" মেয়েটি সেইমাত্র বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়েছে বসন্ত বড়লাটের হস্তী লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করলেন। কে বোমা থেকে বোমা ছুড়লো সঠিক কেউ লক্ষ্য করতে পারল না। স্বয়ং লর্ড হার্ডিঞ্জ ও তাঁর স্ত্রী বুঝতে পারলেন না। কিছু লোক দেখলেন লাট ও লাটপত্নীর ভিতর দিয়ে কি একটা গিয়ে পিছনে হাতীর চোপদারকে আঘাত করলো। চোপদার সঙ্গে সঙ্গেই ঢলে পড়লো। লর্ড হার্ডিঞ্জও সেদিকে একবার তীব্র দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিন্তু বড়লাটের পৃষ্ঠদেশেও বোমা ছিটকিনি লেগেছিল। অল্পকালের মধ্যেই তার দেহ কাঁপতে লাগল। তিনিও অজ্ঞান হয়ে হস্তীপৃষ্ঠে ঢলে পড়লেন। চারিদিকে হুলুস্থুল পড়ে গেল। শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হল। যে যেদিকে পারল ছুটতে লাগল। মাহুত হাতী থামাল। শোভাযাত্রা সরকারী ভাবেই বন্ধ করে দেওয়া হল। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বড়লাটকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হল। অস্ত্রোপচার করে বড় লাটের দেহ থেকে বোমার টুকরা সমূহ বার করা হল। তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।

সমস্ত রাত্রি অস্থির অবস্থার মধ্যে কাটালেন। Sir Guy Fleet Wilson কোন রকমে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন।

বোমা নিক্ষেপের সময় রাসবিহারী রাজপথে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। তিনি দেখলেন বসন্তর বোমা হস্তীপৃষ্ঠের উপর এসে পড়ল এবং বড়লাট চলে পড়লেন। পরিকল্পনার সাফল্যে তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। তিনি আত্ম সংবরণ করতে পারলেন না। আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে বলে উঠলেন, সাবাস! মার দিয়া" কথাটা অনেকেরই কানে গেল। কিন্তু সবাই তখন যে যার প্রাণ নিয়ে ব্যস্ত। কে কি বলছে সেদিকে লক্ষ্য দেবার সময় কোথায়? রাসবিহারীর কথাটা শোভাযাত্রার প্রহরীদেরও কানে গিয়েছিল। একজন পেতাব পদস্থ কর্মচারী দিল্লীর ষড়যন্ত্র মামলায় তার সাক্ষ্যে এই কথা বললেন। কিন্তু ভীড়ের মধ্যে কণ্ঠস্বর কোন দিক থেকে আসছে নির্ণয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

কথাটা বলে ফেলেই রাসবিহারী একটু অপ্রতিভ হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন ভুল করে একটা অন্যায় তিনি করে ফেলেছেন। তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে সরে পড়লেন। এ ছাড়াও তাঁর কর্তব্য রয়েছে যে। বসন্তকে উদ্ধার করে আনতে হবে। তাই কালবিলম্ব না করে তিনি চলে এলেন পান্‌জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পিছনের দরজায়। বোমা নিক্ষেপের পরেই সেখানেও মহিলাদের মধ্যে ব্যস্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। মহিলারা সকলেই নেমে এসেছিলেন যে যার পুরুষ সঙ্গীর খোঁজে। বসন্তও তাদের সঙ্গে নেমে এলেন পিছনের দরজায়। দেখলেন অদূরে রাসবিহারী দাঁড়িয়ে তাঁর জন্যেই অপেক্ষা করছেন। যথাস্থানে এসে রাসবিহারী বসন্তের পোষাক পরিবর্তন করে তাকে লাহোরের গাড়ীতে তুলে দিলেন। এর পরে নিজেও দেরাদুনে চলে এলেন।

কিন্তু রাসবিহারীর বিপদ এখানেই শেষ হল না। চিকিৎসার পরে বড়লাট আম্বালা উদ্দেশে রওনা দেবার পর রাসবিহারী লাকিট হাউসে এসে কিছুদিন অবস্থান করেন। তাই রাসবিহারীর আরও একটু সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন হলো। এ দিক দিয়ে রাসবিহারীর একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগও জুটে গেল। দেরাদুনে বড়লাটের মিলিটারী সেক্রেটারী যিনি, তিনি কিছুদিন আগে দেরাদুনে অবস্থান করলে রাসবিহারীর কাছে বাঙলা শিখতেন। তার সঙ্গে পুনঃ সাক্ষাতের সুযোগে রাসবিহারী সার্কিট হাউসে ঘন ঘন যাতায়াত করতে লাগলেন। বড়লাটের প্রতি বোমা নিক্ষেপের অব্যবহিত পরেই দেরাদুনে পেতাব ও হুকাব কর্মচারীদের উদ্যোগে এর নিন্দা করে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমবেত অনুরোধেই রাসবিহারীকেই এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করতে হয়। রাসবিহারী তাঁর সভাপতির ওজস্বিনী ভাষায় এই নৃশংস কার্যের তীব্র নিন্দা করেন। রাসবিহারী যথারীতি অফিসে যান। সাহেব সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের বাংলা পড়ান। এত বড় একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল কিন্তু এর সঙ্গে যে রাসবিহারী জড়িত কেউ তা বুঝতে পারলো না। সরকারী কর্তৃপক্ষ বহু চেষ্টা করেও বুঝতে পারল না কে এই কাজ করেছে।

উত্তরপ্রদেশে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল P. Barmely এই বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে বলেন, "I heard a loud explosion behind me but almost immediately. I heard a shout from balconies the ward "Maro" preceded by an exclamation which might have been 'Yah' or 'Sabash' I was very much struck at the time that the shout was one of the approval and it was brought home to me that something serious had happened."

বোমাটি যে পান্‌জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং সেখানে যে শুধু মহিলারাই ছিলেন এ সম্পর্কে ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ খান বাহাদুর আহমদ বলেন, I run to the Punjab National Bank and got hold of Nisar Ahmed Munsiff and went into the Bank. I left Nisar

১৩ পাতায় দেখুন

Contd. from 2nd Cover)

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Dist—MIDNAPORE		
Bhunia Bishoupada	P. O. Dayaldasi, Vill Churakhali (Address Amended)	200	99. 9. 73
Das Smt. Kiran Bala w/o Late Ram Pada Das	P. O & Vill Sarada	100	3. 7. 78
Das Kshitish Chandra	Vill Nangraj P. S. Argoal	(Pension restored)	
Das Smt. Sumitra w/o Late Gobinda Ch. Das	Vill Kulup, P. O. Asbrutioobati	100	1. 10. 76
	Dist—JALPAIGURI		
Chakraborty Smt. Renuka Bala w/o Late Taranikanti	31, Deshbandhunagar, Pandapara Colony, P. S. Kotwali P. O. Jalpaiguri	150	21. 7. 78
	Dist—WEST DINAJPUR		
Devi (Das) Smt. Kumud Bala w/o Late Bibhuti Bhusan Das (alias Bibhananda)	Vill Jote Teor, P. O. Teor	100	16. 5 78
Deshi Smt. Felobalas w/o Late Sadru Deshi	Vill Narayanpur P. O. Dukdebpur P. S. Gangaramapur	100	9. 1. 78
Sarkar Bipra Charan	Vill Dakshin Khanpur P. O. Amrita Khanda	200	26. 11. 76
Sarkar Smt Usha Rani w/o Late Makhanlal Ssrkar	Vill Apair, P. O. Killi	150	1. 10. 76
	CALCUTTA		
Bose Nayan Ranjan	62. Peary Mohan Roy Road, Calcutta-27	200	15. 9. 75
Chanda Atul Chandra	16C, Raja Lane Calcutta 9	200	20. 3. 74
Chattopadhyay Kalidas	16, Deshpran Sha mal Road Calcutta-33	200	28. 8. 73
Datta Smt. Dolly w/o Late Haripada Datta	74, Park Street, Cal-17	100	19 2. 78

Rgd No. R. N. 24511/71 Siplabi Bangla Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা ষাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা মূল্য—৩০ পয়সা

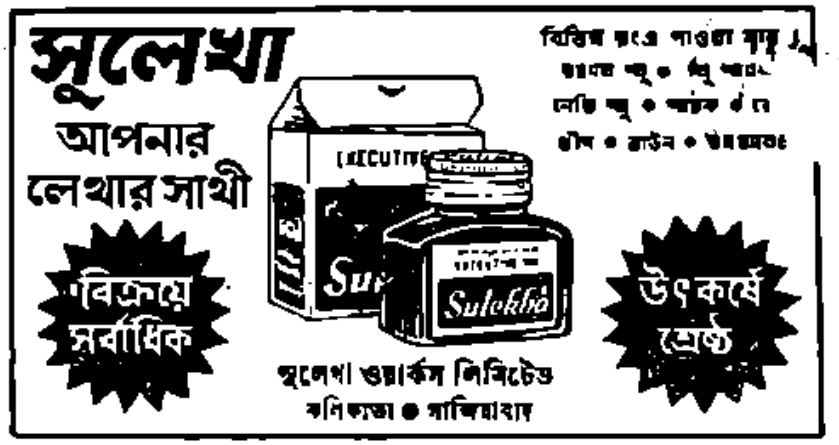

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীহরপদ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী, শ্রীবারীন রায়।
সম্পাদক—শ্রীশান্তি শরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেংগালা—শ্রীনন্দগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীকীর্তি গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৯নং বন্ধুদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৬ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

২৫ বর্ষ	শনিবার, ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ ২৫শে নভেম্বর, ১৯৭৮	১০ সংখ্যা

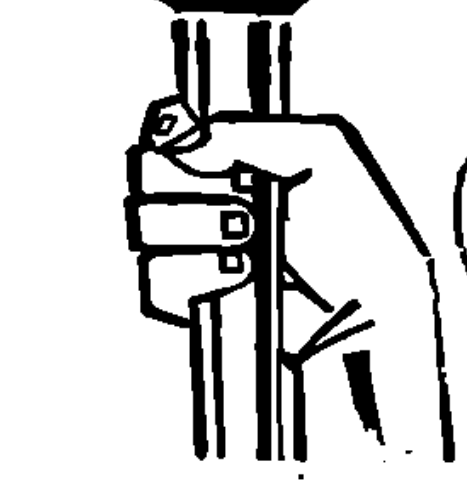

CALCUTTA UNIVERSITY CENTENARY LIBRARY

এই সংখ্যায়

ভীষণ পরিণাম

সম্পাদকীয়।

এবার ঘরে ফেরার পালা

। মিহির বর্মকার ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। ক্ষীরোদ দত্ত ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক রমিনী মোহন দাসগুপ্ত ।

ব্যর্থতা ঢাকতে চক্রান্তের দোহাই

। বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বিপ্লবীদের বোমা তৈরীর পালা

। ত্রৈলোক্য চন্দ্র দাস ।

ভারতবাসীর নানা জাতি একমত,
এক পরাধীন, একতাভোগী না
হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই।

—বঙ্কিমচন্দ্র

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Dist—MIDNAPORE		
Bhowmik Smt. Sindhubala w/o Late Haripada Bhowmik	Dakshin Arjinda, P. O, Kaluvihara, P.S. Panskura	100	13. 5. 75
Nanda Smt. Mani Kanika w/o Late Bibhuti Bh. Nanda	Vill Chandanpur P. O. Brenda, P. S. Egra	200	2. 6. 78
	Dist—MALDA		
Mishra Satish Chandra	P. O. & Vill Bhakersbazar P. S Harishchandrapur	200	12. 9. 73
	Dist—DARJEELING		
De (Dey) Bibhuti Bhusan	Plot 48, Dubgram-I P. O. Siliguri	200	1. 10. 76
De (Dey) Jogesh Chandra	Deshbandhupara P. O. Siliguri	200	1. 10. 76
Ghosh Surendra Nath	Deshbandhupara P. O Siliguri	200	1 10. 76
Sarkar Smt. Hemlata w/o Late Nagen Sarkar	Civil Defence Office P O. Siliguri C/o S. C Sarkar (RWC)	10	15 8. 72
	Dist—WEST DINAJPUR		
Saha Smt Kalyani	(Ex-Andaman Political Prisoner)	100	11. 3. 78
	CALCUTTA		
Banerjee Adhir Ranjan	L-204, Netaji Colony Calcutta-50	200	1. 10. 76
Chowdhury Smt. Tapati w/o Late Rampopal Chow.	72A, Akhil Mistri Lane Calcutta-9	200	8. 7. 78
Das Smt. Ashalata w/o Late Surendr K. Dbs	108/8D, Mahatma Gandhi Road Paschim Putiary, Calcutta-41	100	25. 7. 78
Debi (Mukherjee) Smt. Haimabati w/o Late Parikshit Mukherjee	42/1/C, Sankaritola Street Calcutta-14	100	1. 10. 76

(Contd on 3rd Cover)

সম্পাদকীয়

ভীষণ পরিণাম

চিকমাগালুরের উপনির্বাচনের পর আশা করা গিয়েছিল যে ক্ষমতাসীন জনতাদল ও অন্যান্য গাটছড়া বাঁধা দলগুলি গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দেবেন এবং নিজেদের ভুলত্রুটী সংশোধন করে দেশের মধ্যে একটা স্থিতিশীলতা বজায় রেখে দেশের পক্ষে কল্যাণ মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে তাকে বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু সে আশা ক্রমশই ভেঙ্গে পড়ছে। এই সব দল ও নেতারা জনতার আদালতে পরাজয়কে যেন কিছুতেই সহজভাবে নিতে পারছেন না। সন্তরথী মিলে অভিমন্যুকে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করার মত। ইন্দিরাজীকে পরাজিত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেও তারা সফল হতে পারেন নি। বিভিন্ন দলীয় নেতারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা ভোটের রণাঙ্গনে সমবেত হয়েছিলেন। সত্য, অর্দ্ধ সত্য। মিথ্যা প্রচারের বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়েছিল সেখানে 'যেন তেন প্রকারেন' জয়লাভ করার জন্য। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্নান আহার ভুলে, নিজের দপ্তরের কাজকর্ম না করে, দেশের স্বার্থকে শিকায় তুলে দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। এই দীর্ঘদিন সরকারী দপ্তরে অনুপস্থিত থাকায় জন্য তার বেতন কাটা হবে কি না জানা যায়নি। তবে এটা যে অত্যন্ত অসঙ্গত কাজ, এ সম্বন্ধে দেশের মানুষ ভিন্ন মত হবেন বলে মনে হয় না। নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতির সঠিক সমীক্ষা না করে, তাদের ব্যর্থতার কারণ হিসাবে নানা রকম অদ্ভুৎ তৈকিয়ৎ সৃষ্টি করে চলেছেন। যে নির্বাচন কেন্দ্রগুলির নির্বাচন সংক্রান্ত সব ব্যবস্থাই নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। নির্বাচনের পর নির্লজ্জভাবে অভিষেচকের মত জাল ভোট কারচুপি ইত্যাদি প্রচারের দুর্বোধ্য প্রশ্ন তুলছেন। এমন কি ওখানে মিথ্যা কথা বলে ইন্দিরাজী ভোটার তালিকায় নাম তুলতে চেয়েছেন বলে মামলাও দায়ের করেছেন দলীয় লোকেরা। মামলাটি বিচারাধীন বলে কোন প্রকার মন্তব্য করা চলে না। তবে কোন কোন পত্র পত্রিকায় সইটা ইন্দিরাজীর নয় বলে ফটোষ্ট্যাট কপি প্রকাশ করেছেন। এইভাবে কি আত্মপ্রসাদ লাভ করা সম্ভব হবে?

গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে একমাত্র ইন্দিরা বিদ্বেষই তাদের দৃষ্টিকে করে রেখেছে আচ্ছন্ন বিচার বুদ্ধি করেছে মলিন, মানসিকতাকে করে রেখেছে বিকার গ্রস্থ। কাল্পনিক অভিযোগ তুলে কমিশন নিয়োগ করলেই যে কাউকে বিপদগ্রস্ত করা যায় না। তার প্রমাণ পেয়েও জনতাদল শিক্ষালাভ করছেন না, এটাই অদ্ভুদ মনে হচ্ছে। "ষ্টেট ব্যাঙ্কের বাইশশ টাকা ইন্দিরাজীরই" এ কথা বলেছেন ভারতের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী সাক্ষ্যদান কালে। কিন্তু কমিশন বলেছেন টাকাটা ইন্দিরাজীর নয়। প্রধানমন্ত্রী যিনি নিজেকে নৈতিকতার গর্ববোধ করেন, এখন তো তার ক্ষমা প্রার্থনা করাই উচিৎ বলে যদি ভদ্রলোকেরা মনে করেন, তবে সেটা কি খুব অযৌক্তিক হবে? নাগর ওয়ালা হত্যা ব্যাপারেও ইন্দিরাজী যা

তার দলীয় লোকেদের হাত ছিল বলে যে কুৎসিত প্রচার অভিযানের মাধ্যমে, কমিশন ও তাও নাকচ করে দিয়েছেন। মানুষ এখন মিথ্যা বিবরণ দেওয়ার মামলার রায় কোনদিকে যায়, সেজন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এ সব দেখে শুনেও তাদের শিক্ষা হচ্ছে না কেন এটা বোধগম্য নয়। নিজেদের অকৃত কার্যাবলী জনতা দলের বিপদ ডেকে আনছে এবং আনবে। শুধু হিংসা, ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচার চরিত্র হননের আবহাওয়ায় মূলধন করে কোন রাজনৈতিক দল কোন দেশে কোনদিন সফলতা লাভ করতে পারে নি। জনতাদলের ও তাদের সহযোগী দলের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হবে, এ কথা মনে করা মূর্খের স্বর্গে বাস করার সামিল হবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এরা সঠিক পথে পদক্ষেপ করছেন না। কেন জনমত ই দলটার পক্ষে রায় দিল, তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করছেন না বা করতে চাইছেন না। সরকারের ভাবমূর্তি অনকলঙ্কিত, দেশের লোকের নিকট বহুলাংশে বিনষ্ট হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হরিজন আদিবাসী ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপর অবিচার ও অত্যাচারের ধারা অব্যাহত রয়েছে। সেজন্য এরা তাদের আস্থা হারিয়েছেন। দারা দেশের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। ঘুষ, স্বাহাজানি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেড়েই চলেছে। আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গী মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। রাজনৈতিক ফয়দা তুলবার জন্য, জরুরত "সংরক্ষণ নীতি" চালু করার ফলে দেশের মধ্যে কোন কোন স্থানে অশান্তির আগুন জ্বলছে। গোটা দেশেরই যদি সর্বনাশ হয়, তবে কেউ বাঁচবে না—এই সহজ সরল সত্য উপলব্ধি করার মত কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেললে, সব ক্ষমতাসীন দলেরই ধ্বংস অনিবার্য্য।

সর্বোপরি, ইন্দিরা-জুজুর ভয় যদি সকলের সমস্ত সময়, শক্তি ও উদ্যমকে গ্রাসগ্রস্ত করে ফেলে, তবে কি ভীষণ পরিণাম তাদের জন্য অপেক্ষা করছে, তা একমাত্র হস্তীমূর্খ ব্যতীত সকলেই বুঝতে পারছে।

গণতন্ত্রের সফল রূপায়ণের জন্য শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব একান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং এই শুভ সম্ভাবনাকে সৎ, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, দেশের কল্যাণকামী সব রাজনৈতিক দলেরই স্বাগত জানান উচিৎ। কেন তবে এরা আৎকে উঠছেন। ইন্দিরাজীর নির্বাচন সাফল্যে, "গেল, গেল, সব গেল" বলে পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছেন, সেটা সাধারণ অসমঝ। আমরা মনে করি, জাতীয় স্তরে সংঘর্ষের পথে নয়, সমঝোতার পথেই প্রকৃত কল্যাণ হতে পারে দেশের। ভারতের রাষ্ট্রপতি এ কথা বলেছেন বলে প্রকাশ যে দেশের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন "A Policy of national reconsilation, not a policy of national confarmation."

After me, the deluge, এই নীতিই যদি এরা আঁকড়ে থাকতে চান, তবে আলাদা কথা। কিন্তু একথা স্মরণে রাখা ভাল যে না জেনে না বুঝে আগুনে হাত দিলে হাত কিন্তু পুড়বেই।

———

ব্যর্থতা ঢাকতে চক্রান্তের দোহাই

শ্রীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মানুষ এঁদের আজ আর তাই বিশ্বাস করে না। যেটুকু ক্ষমতা আছে তাকেও কাজে লাগাতে পদে পদে ব্যর্থ হচ্ছেন কেন? তাই ছেলেরা তামাশা করে অনেক বেলুনে লিখে চলেছে—"রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা ও ডায়রিকেন চাই।" জ্যোতিবাবুদের চরম ব্যর্থতার ওপর এই কটাক্ষ বোধহয়। কি মারাত্মক ও হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা আজ সর্বত্র বিরাজমান। পশ্চিমবঙ্গ যে তিমিরে সেই তিমিরে আজও, কোন সুরাহার ব্যবস্থা এখনও হলো না সরকারের ব্যর্থতায়। এর পরেও যদি জনগণ জ্যোতিবাবুদের গালভরা বড় বড় কথার বিরক্তি প্রকাশ করে, তবে সেটা কি তাদের দোষ? মানুষ চোখের সামনে, রোজই দেখছে, তেল, চাল, চিনি, কয়লা, মাছ, তরিতরকারি, সুতিবস্ত্র, ঔষধপত্র, কাগজ বই খাতা সবেরই মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি লাগামের ঊর্ধ্বে গতিশীল নিত্যই, এর কোন প্রতিকার নেই বরং ক্রমশঃই আরো ঊর্ধ্বে সক্রিয়মান। রাজ্য-সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ও দর্শক-সুলভ মনোভাব নিত্যই। দরিদ্র মানুষরা সি. পি. এম-কে দোষারোপ করে বলছে "টকের জ্বালায় দেশ ছাড়লাম, এ যে চৈতুল তলায় বাস হলো, হায় ভগবান এ কি হলো?" সরল বিশ্বাসী মানুষের দল সি. পি. এম-এর ধোঁকায় পড়ে ভোট দিয়ে গভীর ক্ষোভে ও দুঃখে কপাল চাপড়াচ্ছে আর অতীতের সুখের জন্য আক্ষেপ ও অনুশোচনা করে বলছে "এর চেয়ে কংগ্রেস ঢের ভাল ছিল। বাবুদের ভাঁওতায় ভুলে নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করেছি" এই হলো বাস্তব অবস্থা। এরপরও সি. পি. এম-এর গাল ভরা বুলি কি কেউ শুনবে না ভবিষ্যতে বিশ্বাস করবে?

সি. পি. এম-এর শ্রমিক সংগঠন "সিটু" (C I T U) বোধহয় জ্যোতিবাবুর সঙ্গে বিদ্যুৎশক্তি চালু রাখার ব্যাপারে যথাকর্তব্য সহযোগীতা করছে না। সিটু যদি প্রকৃতভাবে সরকারের সঙ্গে সহযোগীতার ক্ষেত্রে জোরকদমে এগিয়ে যায়, তবে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে বোধহয় আর এত অভাব থাকে না। সি. পি. এম ও তার পরিকল্পনাগুলির শ্রমিক সংগঠনগুলি সরকারের সঙ্গে যথোপযুক্ত সহযোগীতা ও সাহায্য করছে না বলে অনেকেই সন্দেহ করছেন। যদি তাই হয়, তবে ঘোর বিপদ আসন্ন —পশ্চিমবঙ্গে অন্ধকারের রাজত্ব চির কায়েম হবে—সে বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। তাছাড়া পুলিশ প্রশাসনে অকর্মণ্যতা, অযোগ্যতা ও নিষ্ক্রিয়তা সর্বত্র প্রকট বলেই বোধহয় ঠিক বলা হয়। প্রমোদবাবু পুলিশের বিরুদ্ধে বারে বারেই সে কথা ঘোষণা করছেন। ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে প্রায়শই যে সব অভিযোগ সবিস্তারে প্রকাশ করছেন তাতে পুলিশ ভয়ে থাকো নিষ্ক্রিয় ও 'কং-কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে, সাধারণের পক্ষে বিপদজনক হয়ে উঠছে এবং লোকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছে। যাফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে পুলিশ সহযোগীতা করছে না বলা হচ্ছে, অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে পুলিশ সি. পি. এম কর্মী ও সমর্থকদের সব অন্যায় ও বেআইনী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে থানায় ডাইরী বা প্রথম এত্তেলা (F I R) নিতে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না বলে সংবাদে প্রকাশ। পুলিশ যেখানে এত ভীত ও সন্ত্রস্ত, সেখানে সাধারণ মানুষজন যে খুবই ভীত ও বিপন্ন তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু জ্যোতিবাবু সর্বদাই পুলিশ, সাধারণ প্রশাসন ও অন্যান্য সরকারী বিভাগগুলিকে সক্রিয়, শক্তিশালী ও গতিশীল করার কথা বলছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। তবুও কেন যে মানুষের দুর্গতির অন্ত নেই আর সদা সন্ত্রস্ত হয়ে মানুষ এখানে প্রত্যহ জীবন যন্ত্রণা ভোগ করছে তা রহস্যাবৃত। সব-কিছুর মূলে অতীতের তিক্ত ও মর্মান্তিক দুঃখজনক অভিজ্ঞতা ক্রিয়াশীল বলেই বোধহয় প্রতীয়মান হয়। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ—বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্য এবং তার ফলে সকলেই আর্থিক, সামাজিক, শারীরিক, নৈতিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি

স্বীকারে বাধ্য হচ্ছে, তা সরকারী ব্যর্থতার জলন্ত প্রমাণ। মুখে সরকার যতই আশা ও আশ্বাস দিক না কেন, বাস্তবে যে সবই ফাঁকা তা যেন প্রকাশমান। এর পরিণাম চরম অস্বস্তিকর, অপূরণীয় ক্ষতিকারক ও অসহ্য, কারণ বিদ্যুৎ বাইহিতে সকলেই ব্যতিব্যস্ত। অন্ধকারের সুযোগে সমাজ-বিরোধীরা সদা সক্রিয় এবং ফলে তাদের দৌরাত্ম্যে সবাই অতিষ্ঠ আর মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। সংবাদ পত্রের পাতা ওল্টালেই রোজ দেখা যায় নিত্যই চার-পাঁচটি খুনের ঘটনা, আট-দশটি রাহাজানির, দুই-তিনটি ডাকাতি, দুই একটি লুঠতরাজের নারীধর্ষণের ঘটনার আর ছেলেছাপন তো লেগেই আছে এছাড়া গ্রামাঞ্চলে জোর-জবরদস্তি করে ফসল কেটে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ও তো অগণন। মিথ্যা এজাহার দিয়ে গ্রামের চাষের জমি শ্যামের নামে জে এল, আর তাকে দিয়ে দলবাজীর মাধ্যমে রেকর্ড করান, ফলে মামলা পেলেই খুন খারাপী, মারামারি দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রায়দিনই চারদিকে লেগেই আছে। এক কথায় সি, পি, এম ও তার সমর্থকদের এখন পোয়াবারো। বিচার ব্যবস্থার ওপর হাত দিতে সি, পি, এম খুবই নিপুণ হয়ে এবং সরকারও তাই চায় একথা ইতিপূর্বেই প্রমাণ হয়ে গেছে। কাজেই গ্রাম গঞ্জের মানুষ ক্রোধে ফুলছে ও ফুঁসছে এবং প্রতিকারের আশায় দিন গুনছে। গ্রামের শান্ত নিশ্চল জীবনযাত্রায় আঘাতের পর আঘাত হানা হচ্ছে ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি পঙ্গু ও দুর্বল হয়ে সকলকেই বিপন্ন-গ্রস্ত করছে। সরকার নির্বিকার। শান্তি শৃঙ্খলার রক্ষকরাই শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হতে সাহায্য করছে। চারিদিকে বিরাট নৈরাশ্যে ও হতাশায় মানুষ কিন্তু উত্তেজিত ও দিশেহারা হয়ে সরকারের ব্যর্থতার জন্য ধৈর্যহারা ও বিরক্ত হয়ে সরকারকে অভিশম্পাৎ দিচ্ছে তার দলবাজী ও অরাজকতার জন্য যার বিষময় ফল ফলতে শুরু হয়েছে গত এক বৎসর কাল।

একেতো সরকারের এই অবিমৃষ্যকারীতা, তার ওপর আবার গ্রামাঞ্চলে দলবাজী ও নীতিহীন অরাজকতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও সর্বোপরি প্রকৃতির প্রতিশোধে নদীগুলির হঠাৎ জলস্ফীতি; ফলে মালদা-মুর্শিদাবাদে প্রবল বন্যা—যা মানুষকে সর্বদিক দিয়ে চরম বিপদের মুখে এনে ফেলেছে—চারিধারে আহি আহি রব উত্তরবঙ্গের আকাশ বাতাসকে প্রকম্পিত করছে। জলস্ফীতি হাজার হাজার মানুষ ও সঙ্গে অগণিত নিরীহ গৃহপালিত পশুগুলি যে দৈবদুর্বিপাকে পড়েছে তার তুলনা বিরল। বন্যাপীড়িত মানুষজন সরকারী ও বেসরকারী ত্রাণের আশায় কোন রকমে প্রাণ ধারণের জন্য কঠিন সংগ্রাম করে চলেছে দিনের পর দিন। বহুকদিন পরে ত্রাণ সামগ্রী কিছু কিছু পৌঁছান ঘটে—বেসরকারী প্রচেষ্টায়, কিন্তু তা এতই অপ্রতুল যে মানুষের হতাশা আরো বেড়ে যেত। তা ছাড়া সরকারী ত্রাণসামগ্রী বিলিবন্দোবস্ত করার ব্যাপারে যে সব দলবাজী শুরু হলো বলে সংবাদে প্রকাশ তা সত্যই অভূতপূর্ব ও সর্বথা নিন্দনীয়। বন্যাপীড়িতদের ওপর সরকার যদি সমদৃষ্টি দিতে না পারেন, উদার মনোভাব না দেখাতে পারেন, তবে হতভাগ্য ব্যক্তিরা সাহায্য ও ত্রাণের জন্য কাদের দিকে দাঁড়াবে? সরকার বিরোধী নেতারা বন্যাদ্রিষ্ট মানুষের কাছে হাজির হয়ে ও সরজমিনে তদন্ত করে এসে সংবাদ পত্রে বিবৃতি দিয়ে যা যা জানালেন তা সত্যই তদন্ত বিদারক। সরকারের দলবাজীর কথাও তাঁরা বললেন যা চরম অন্যায়। বন্যা ত্রাণে এদেশের সকল শ্রেণীর মানুষ, সকল রাজনৈতিকদল, মিশনারী সংস্থাগুলি, সমাজ-সেবী সংস্থাগুলি, রেডক্রস, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণমিশন, বিদেশী মানব কল্যাণকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যদি সকলে একযোগে, একমন-একপ্রাণ-একতা সহকারে এগিয়ে যেতে না পারেন তবে দুর্গত মানুষেরা বাঁচে কি করে? এঁদের সকলের সাহায্যেই বন্যাদ্রিষ্ট মানুষরা বাঁচার পথ দেখতে পাবে। ভারতসেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন, রেডক্রস, যথেষ্ট সেবা ও ত্রাণ দিয়ে উত্তরবঙ্গের মানুষের পরিত্রাণের কাজে সহায়ক হয়েছে। এরা সবাই নমস্য।

এই বন্যা কিছুটা প্রশমিত হতে না হতেই, এদিকে আর এক বিপদ দেখা দিল—যা প্রকৃতির রোষ ও মানুষের দোষের সম্মিলনে অবাধ বন্যাতে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমান, হাওড়া, বীরভূম, চব্বিশ-পরগনা, নদীয়া জেলাগুলির বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন করে

মানুষজনকে জলপ্লাবনে মৃত্যুহারা, জলবন্দী ও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করাল। অনেক লোক প্রাণ হারাল যার সংখ্যা এখনও সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নয় গবাদি পশু প্রায় দুইলক্ষ মারা পড়লো। স্বাধীনতাউত্তরকালে এরূপ ভয়ঙ্কর ও প্রলয়ঙ্কর বন্যার কথা শুনা যায়নি। এই বিপর্যয় পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে কান্নার রোল তোলে। মানুষ দিশেহারা হয়ে ইতস্তত সাহায্যের আশায় ধাবমান হওয়ার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু এ বন্যা ঐতই ব্যাপক ও বিরাট এবং অভূতপূর্ব যে এর হাত থেকে নিস্তার পাবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এখন ত্রাণকার্য সুষ্ঠুভাবে চালাতে না পারলে, বন্যাপীড়িত প্রায় কোটি লোককে, কিভাবে রক্ষা করা যায়—তা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য এর ভুল চিন্তার কঠিন বিষয় মানুষের কাছে কি আছে? সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক জীবনের শেষ সীমায় উপনীত। এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার, উদ্ধার হওয়ার পথ কি এবং কোথায় তাই চিন্তা ভাবনা করে সকলকে দেখতে হবে। একেত অবিশ্রান্ত বৃষ্টি দিনের পর দিন চলেইছে তার উপর সংশ্লিষ্ট নদীগুলিতে প্রবল জলস্ফিতি প্রলয়োকর বন্যার সৃষ্টি করলো তার উপর আবার ডি, ভি, সির, ও কংসাবতীর লক্ষ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ার দরুণ এই বিপর্যয়কারী বন্যা ও জলস্তর পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে কান্নার রোল তোলে। জলের স্রোত এত ভীষণ আকার ধারণ করে যে বহু মানুষ জলের তোড়ে ভেসে যায় প্রাণ হারায়, গবাদি পশু বিনষ্ট হয় হাজার হাজার। অসহায় ও নিরুপায় হয়ে অনেকেই এ দৃশ্য দেখে, কিন্তু প্রতিকার করতে ভরসা পায়না। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল এলাকা যখন এই ভীষণ আকস্মিক প্রাণহরণকারী প্রবল জলপ্লাবনের করাল গ্রাসে প্রায় বলি প্রদত্ত, লক্ষ লক্ষ মানুষ ও গবাদি পশু—উদ্ধারের আশায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে ইতঃস্তত ছিন্নিক্ষ ও পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, ত্রাণের ও সাহায্যের আশায় দিন গুনছে, তখনও যুগান্তরী বন্যাকবলিত এলাকাগুলি সরজমিনে পরিদর্শনের পরিবর্তে গত ৭ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় এক জনসভায় ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের গন্ধ পেয়েছেন বলে বেশ মুখরোচক খোরাবাহিত ভাষণ দেন এবং তাঁর সেই ভাষণে তাঁর বক্তব্য থেকে একথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ধারাবাহিক ব্যর্থতাগুলি তাড়াতাড়ি ঢাকা দেবার তাগিদে এক অভিনব মন্ত্রের অবতারণা করে, দুই কংগ্রেস, জনতা, ও এস, ইউ, সি দলগুলির বিরুদ্ধে তিনি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেন। রাষ্ট্রপতিশাসনের সমর্থনে ও তথাকথিত ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে জনমতকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে তিনি সভা আহ্বান করে সি, পি, এম ও তার সহযোগীগুলি—উদ্দেশ্য নিষেধের গলদগুলি ঢাকা দেওয়ার ও অন্যের বিরুদ্ধে মানুষের মনে মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা—বিশেষ করে কংগ্রেস, জনতা ও এস, ইউ, সি প্রভৃতির বিরুদ্ধে জনমনে ভ্রান্ত ও মিথ্যা ধারণার বীজ বপন করা। সি, পি, এম "গোরেবলস" মিথ্যাচারীতে পরম বিশ্বাসী ও তাই মাঝে মাঝে এরূপ জনসভা করে নিজে বাঁচার রসদ যোগাড় করে ও পরের গায়ে কাদা ছিটায় আর এটাই ওদের সহায় ধন। ব্যর্থতা ঘাড়েতেই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের গন্ধ কাঁদা এবং ইহাই রাজনৈতিক হাট —যা বিচিত্রভাবে চিরকাল অভ্যাসবশে চালিয়ে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিন্তু এ চালাকি ১৯৬৯ সাল থেকেই ভালভাবেই বুঝে ফেলেছে। সবাই এখানে জানে যে যখনই সি, পি, এম হালে পানি পায় না—বিশেষ করে রাজ্য প্রশাসন পরিচালনার কাজে তখনই জনসভা, মিছিল, হরোড়বাজী, দলবাজী ইত্যাদির মাধ্যমে সস্তা ও বিভ্রান্তিকারী রাজনীতির আমদানী করে মানুষজনকে বোকা ভেবে ধোঁকা দিয়ে, আসর সরগরম রাখতে প্রয়াস পায়। মানুষ হাসে আর আড়ালে বলে শুনি, সি, এম-এর গদাযাত্রা আসন্ন প্রায়, তাই এই অপচেষ্টা। বাস্তবক্ষেত্রে তাই শেষ পর্যন্ত ঘটতেও দেখা যায়। সব ক্যাপ্টেনরাই দু' হাত তুলে নাচে, বাহবা দেয় আর নেতারা তাতেই খুশীতে ডগমগ। এ খেলা আর কতদিন পশ্চিমবাংলার শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তের জনসাধারণ বরদাস্ত করবে? সাম্প্রতিক যে

তথাকথিত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের স্বপ্ন তারা দেখতেন, তা কি কেবল নিজেদের মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য না বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে লোকচক্ষে অথবা হেয় প্রতিপন্ন করার হীন প্রচেষ্টায়? মিথ্যা ও উদ্ভট প্রলাপোক্তি এই অসার প্রচেষ্টা আর কতকাল ধরে চলবে? এদিকে বন্যা ত্রাণের ব্যাপারে যে দলবাজী, অসৎ ঘটন, অন্যায় ও অযৌক্তিক সব কার্যকলাপ নানা জায়গায় ধরা পড়েছে তা কি এভাবে ধামাচাপা দিয়ে মিথ্যার সাহায্যে ঢেকে দেওয়া সম্ভব হবে? ঝুড়ি থেকে মাঝে মাঝে যে বিড়াল বেরিয়ে পড়ছে তা কি তারা জেনেও জানতে পারছে না? বুঝেও বুঝতে চাইছে না? সবচেয়ে মজার গল্প ফেঁদেছেন অর্থ-মন্ত্রী শ্রীযশোদ মিত্র মহাশয়। তিনি নাকি ঐ জন-সভায় বলেছেন যে, "কম্যুনিস্ট সরকার বন্যাত্রাণে ব্যাপৃত, তখন বিধানসভায় বিরোধী নেতারা আনন্দে নৃত্য করছেন।" তিনি তাঁর নিজের অক্ষমতা ঢাকতে বিরোধী পক্ষের ওপর কাদা ছেড়েছেন—এরই নাম দক্ষতা? শাক দিয়ে মাছ কতদিন আর ঢেকে রাখা সম্ভব হবে? বস্তুতঃই এলাকার বিধানসভা সদস্যরা যেদিন বিধান সভায় বসে সরকারী অব্যবস্থা দলবাজী, ত্রাণ কাজে গাফিলতি, রেশনে ত্রাণ ব্যবস্থা চালু, ত্রাণ সামগ্রির নিম্নমান ও দলীয় পক্ষপাতদুষ্ট ত্রাণ পাঠান ইত্যাদি ব্যাপারে সব সত্য তথ্য প্রকাশ করে দেবেন অথবা ঐ সব ব্যাপারে সংবাদপত্রে সঠিক অবস্থা প্রকৃত স্বরূপ জনগণ সম্যকরূপে জানতে ও বুঝতে পারবে। তারা যে সত্য সত্যই বন্যার সময়ে ত্রাণ কাজে যোগ না দিয়ে জনসভায় ও পথের ধারে অথবা দোষারোপ করে নিজেদের চামড়া বাঁচাবার জন্য মিথ্যা বেসাতিতে মত্ত হয়ে মসগুল ছিলেন তা সাধারণ্যে পরিষ্কার ভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। সবচেয়ে বড় অন্যায় ব্যাপার যে সরকার তাঁর নিজের প্রশাসনের অংশ বিশেষকে দোষী সাব্যস্ত করে নিষ্ক্রিয়ে কেবল নিজ দলের প্রশস্তি গেয়ে চলেছেন এবং ফলে প্রশাসন যন্ত্র শুধু অকেজো নয়, প্রায় কার্যক্ষমতা এসে যে পৌঁচিয়েছে, এখনও মন্ত্রীদের পর্যন্ত সে হুঁস নেই। অপর দলগুলিকে ছলিয়াবাজী দেওয়ার পরিবর্তে বামফ্রন্ট সরকার যদি তাঁর পরিচালন-বিভাগ করে সি. পি. এম-কে একটু হুসিয়ার হতেন এবং একটু সৎ ও সংযত হয়ে চলতে যদি উপদেশ দেন, তবে দেশে এখন যে সব চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, মাঠের ভেরী লুঠ, অপরের জমি জবর দখল (জোর জুলুমের মাধ্যমে), রেল ডাকাতি রেশন দোকান লুঠ, খাদ্যশস্য ছিনতাই, খুন-জখম, ও মধ্যে মধ্যে নারীধর্ষণ প্রভৃতি যে সব অমানুষিক অপরাধমূলক কাজগুলি প্রায়দিনই ঘটছে তা কিছিৎ প্রশমিত হবে বলে অনেকেই মনে করে। কিন্তু জনসভায় এই সেপ্টেম্বরের তাণ্ডব হয়ত ঠিক নোয়া ও ইন্দ সমাজ বিরোধী কার্যকলিকে সংযত করার ব্যাপারে উপশমের বদলে হয়ত বা ইন্ধন যোগাবে বলে কিছু নিরপেক্ষ ব্যক্তি পথে-ঘাটে মন্তব্য করছে। তাঁদের অভিমত সরকার সি. পি. এম-এর দলবাজী বন্ধ করে যদি দেশের মানুষের আশু কল্যাণের কাজে সত্যই আন্তরিকতার সঙ্গে নেমে পড়েন, তবে এদেশের চেহারা সত্যই পাল্টে যাবে আর যদি সত্য সত্যই কেউ বা কোন দল ষড়যন্ত্রকারী বা চক্রান্ত-কারীর ভূমিকায় নেমে থাকে, তবে জনগণই তাদের পরিত্যাগ করবে—অথবা এত ঘটা করে সভা ও জনসমা-বেশের আর প্রয়োজন হবে না। সরকার যদি এখনও ঠিক ঠিকভাবে দলকল্যাণ, গোষ্ঠীকল্যাণ বা ব্যক্তিকল্যাণের পরিবর্তে প্রকৃত জনকল্যাণের কাজে আন্তরিকতা ও বুদ্ধি-মত্তার সাথে সদিচ্ছা নিয়ে নেমে পড়েন, তবে বন্যা-কবলিত দুর্গত মানুষজন এখনও পানীয় জলবাহিত, মহামারী বিপদে ও অনশনজনিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে পুনর্বসতির মাধ্যমে এরা আবার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। এর পরের আসা কাজ নির্ভর করে সরকারের সদবুদ্ধি, সদিচ্ছা আন্তরিকতা ও সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থার উপর, বাকী এক আনা অদৃষ্টের উপর। সরকার বলতে রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকার সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য। পশ্চিমবঙ্গ এবারে বন্যায় বন্যাজনিত নানান বিপর্যয়ে যেরূপ প্রান্ত হইলে, তারত রাষ্ট্রের ও বিরাট ক্ষতি। তাই আশা করি কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই বন্যা-বিধ্বস্ত বিপন্ন মানুষ ও আহতদিক চাষ-আবাদ, গবাদি-পশু সব-কিছু রক্ষা করার জন্য বিপুল উৎসাহ নিয়ে কাজে নামবেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব তত্তই মঙ্গল—আর সাথে সাথে পুনর্বসতির ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নেবেন। (সমাপ্ত)

এবার ঘরে ফেরার পালা

মিহির বর্মকার

বন্যাত্রানের ঘরর এখন বাসি হলেও, আমাতে সৃষ্ট ঘা এখনো শুকোয় নি। চারিদিক থেকে জল নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে ঘরে ফেরার পালা। ঘর বাঁধার পালা। নতুন করে জীবন শুরুর প্রয়াস। বিমান থেকে খাদ্য ফেলার কাজ ইতিমধ্যে বন্ধ করা হয়েছে। কোথাও কোথাও চলছে খয়রাতি সাহায্য, আবার কোথাও খাওয়ানো হচ্ছে রান্না করা খাবার— খিচুড়ী। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ লোককে দীর্ঘদিন এভাবে ত্রিপলিক দেয়া সম্ভব হবে না। তাদেরকে পুরোনো সেই পেশা ও জীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে। আর এ জন্য সরকারের প্রচেষ্টার সঙ্গে মদত জোগাতে হবে সকলের। এবং সরকারকেও চাইতে হবে সকলের সহযোগিতা।

বন্যার জল নেমে গেলেই দুঃখ ঘুচে যায় না। তখন শুরু হয় নতুন দুঃখের নতুন বেদনার। ভেঙে যাওয়া ঘর আবার তুলতে হবে। ভেসে যাওয়া গরু-ছাগল আবার কিনতে হবে। শুরু করতে হবে চাষাবাস; দোকান বাণিজ্য। কিন্তু সেই স্বাভাবিক প্রাণস্পন্দন ফিরিয়ে আনতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন যথার্থ নীতি গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন। বন্যার জল নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চাষাবাদের জন্য যদি সমবায়িক প্রথা গড়ে তোলা সম্ভব হয়, তাহলে ছোট চাষী ও সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের উপকার হবে আশাতীত এবং রাজ্যের খাদ্য ঘাটতি পূরণেও এর অবদান থাকবে প্রচুর। গ্রাম বাংলায় এখন অনেক কৃষকের বলদ নেই, লাঙল নেই, বীজ নেই। এমতাবস্থায় যদি সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাসের শুণাশুণ বুঝিয়ে কৃষিকাজে নিয়োজিত করানো সম্ভব হয়, তাহলে আগামী ফসল খুব ভালো উঠবে। এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকারী প্রশাসনকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, কাশী বিশ্বনাথ সমিতি, ভারত সেবক সমাজ প্রভৃতি জনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন দিনগুলিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবক সমাজ এখনো বিভিন্ন জেলায় হাজার হাজার মানুষকে নিয়মিত রান্না করা খাবার বিতরণ করছে। মানুষের দুঃসময়ে এসব প্রতিষ্ঠান যথার্থ উল্লেখযোগ্য অবদান তুলিয়ে আসছে।

এ সব প্রতিষ্ঠানগুলো ইতিমধ্যেই পুনর্বাসন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। রাজ্য সরকার গৃহ নির্মাণ বাবদ অর্থ সাহায্য ও ঋণ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন কাজের বিনিময়ে খাদ্যের মাধ্যমে পুনর্বাসন কর্মসূচী সফল করা যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য (গম) তারা সরবরাহে রাজী আছেন। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও এগিয়ে এসেছে পুনর্বাসনের এই মহাকর্মযজ্ঞে।

পশ্চিমবঙ্গের এই বিষাদময় ক্ষণে চারিদিক থেকে যতোটুকু আশার বাণী আমরা শুনতে পাচ্ছি তার মধ্যে নিশ্চিতভাবে উল্লেখ্য রাজ্য সরকার কর্তৃক 'সর্বদলীয় কমিটি গঠন'

দেরীতে হলেও রাজ্য সরকার এই কমিটি গঠন করে তাদের সদিচ্ছার পরিচয় দিয়েছেন। এখন প্রয়োজন এক কমিটির সমন্বয় সাধন এবং সম্মিলিত ভাবে কাজ করা।

ত্রাণ ও পুনর্ব্বাসন নিয়ে ইতিপূর্বে এ রাজ্যে বহু দলাদলি হয়েছে। সে সব ইতি কাহিনী দুঃখজনক হলেও ভুলে যাবার নয়। তারই আলোকে আজকে প্রতিটি নাগরিককে সতর্কতার সাথে পুনর্ব্বাসন প্রশ্ন বিবেচনা করতে হবে। জনগণের দুঃখ দুর্দশাকে পুঁজি করে রাজনীতি করা ও মওকা লুটে নেবার ক্লাসিক অভ্যেস এদেশে সর্ব্বত্র বিরাজমান। দিন ক্রমেই পাল্টে যাচ্ছে, কিন্তু এ অভ্যেস পাল্টেছে এ দাবী করার সময় এখনো আসে নি।

তাই আজ আমরা দাবী জানাই বন্যা প্রপীড়িত মানুষের পুনর্ব্বাসনের প্রশ্নে দলমত নির্বিশেষে সকল সামর্থ মানুষ ও প্রতিষ্ঠান সংঘবদ্ধ হোন এবং বিষয়টি রাজনীতির উর্দ্ধে রেখে সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতা করুন। চাষাবাসের প্রশ্নটি সমবায় প্রথায় সুসম্পন্ন করার বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক নীতি প্রনয়ণের বিষয়টি যথার্থ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার। সর্ব্বোপরি নদীর স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ করে সৃষ্ট বিভিন্ন বাঁধ ও প্রকল্পের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা পুনমূল্যায়ণ করার সময় এসেছে। চীন, মিশর ও ব্রাজিল তাদের অশান্ত অবাধ্য নদীকে বশে এনে দেশকে সুজলা সুফলা করতে সমর্থ হয়েছে। অথচ আমরা পারছি না। কেন পারছি না, গলদ কোথায় তা আজ ভেবে দেখা অত্যন্ত জরুরী। চলছে—চলবে—চলুক নীতি এখন পরিহার করতে হবে। সার্বিক বিষয় বিবেচনার সময় জনস্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থকে সামনে রেখে নীতি নির্ধারণ করা উচিৎ।

ত্রাণ কাজে ভারত সেবক সমাজ

নিজস্ব সংবাদ দাতা: ভারত সেবক সমাজ মেদিনীপুর জেলার মহনা, পিংলা, পাঁশকুড়া ও তমলুক ব্লকে ২৮টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪১০০০ লোককে প্রতিদিন রান্না করা খাবার বিতরণ করছে। প্রাদেশিক সেক্রেটারী শ্রীগঙ্গাধর সখা ও সংগঠক শ্রীপি, বসু এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত এই কর্মসূচী চলবে এবং এর আওতায় আরো এক লক্ষ লোককে আনা হবে।

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে পুনর্ব্বাসন কাজে ভারত সেবক সমাজ এক দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী খুব শীঘ্রই হাতে নেবে বলে তারা জানিয়েছেন। শ্রীসখা জানান, পুনর্ব্বাসন, বিশেষ করে গৃহ নির্ম্মাণের বিষয়টি এখন আমরা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

আমার আইন পরিষদীয় কাজ কর্ম

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

আমি সিলেক্ট কমিটির একজন মেম্বার ছিলাম। তিন মাস ধরে দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করে আমরা আমাদের রিপোর্ট পেশ করি। এক পক্ষের অধিককাল ধরে প্রতিদিন কাউন্সিলের অধিবেশন বসত এই রিপোর্ট এবং উপস্থাপিত সংশোধন প্রস্তাবগুলি বিবেচনার জন্য। কাউন্সিলের বৈঠক বসত বেলা ১১টায়, চলত বিকেল ৫টা পর্যন্ত ; মাঝে লাঞ্চের জন্য একটুখানি বিরতি থাকত। বহু বছর আমি কাউন্সিলের মেম্বার ছিলাম ; কিন্তু এ রকম কঠিন কাজের মধ্য দিয়ে আর কখনো যেতে হয়নি। এই কঠিন কাজ আমাকে আমার আই. সি. এস পরীক্ষার প্রতিযোগীতা কালের নয়টাকে স্মরণ করিয়ে দিত। সময় সময় আমাকে রাত একটা পর্যন্ত জেগে থেকে কাউন্সিলের কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হত ; কাউন্সিল বসত পরের দিন বেলা এগারটায়। কাজ এবং তার ফলস্বরূপ যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তা শেষ হয়ে গেলে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। আমি মস্তিষ্ক প্রদাহ রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়লাম। আমি বরাবর যত কঠিন-তম রোগে ভুগেছি, তার মধ্যে এই মস্তিষ্ক প্রদাহ রোগটি অন্যতম। কাউন্সিলে বিলটি নিয়ে বিতর্কের শেষদিন ছিল ২৭শে সেপ্টেম্বর। সেই দিনই বিলটি পাশ হয়ে গেল। এই দিনটি ছিল মহান রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু-বার্ষিকী দিবস। কাউন্সিল চেম্বারে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় আমার হাতে সেই মৃত্যু-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য এক নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হল। পত্রখানা পাওয়ার আমার মনে এক চরম দুঃখের আবেগ জেগে উঠলো এবং শেষ রাতের মত বিলটির বিরোধিতা করে বললাম :

"আজ সকালে কাউন্সিলে আসার সময় একখানা পত্র পেয়েছি। সেই পত্র আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে আজ রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু-বার্ষিকী দিবস। আমার মনে হচ্ছে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালীর মৃত্যু-বার্ষিকী দিনটি এমন একটি দিনের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে যে দিনটি ভবিষ্যৎ বাঙালী সমাজ সেই মহান নেতার চির বাসভূমি ও কর্মস্থল এই মহানগরীর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন লোপের দিন বলে স্মরণ করবে।"

এই প্রসঙ্গ ছেড়ে দেওয়ার আগে সিভিল সার্ভিসের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি মিঃ ই. এন. বেথার সম্পর্কে দু একটি কথা বলা উচিত ও সঙ্গত। এই বেথার সাহেব ছিলেন বিলটির পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত। তিনি পরে স্যার এডওয়ার্ড বেথার হন। আমি তাঁকে ১৮৯০ সাল থেকে জানি। তিনি তখন ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আমি ছিলাম উত্তর বারাকপুর মিউনিসি-প্যালিটির চেয়ারম্যান। আমাদের মধ্যে একটু মত পার্থক্য ছিল। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি এবং আমাদের মধ্যে যে মত-পার্থক্য ছিল আধ ঘন্টার মধ্যে তার মীমাংসা হয়ে গেল। এই পরিচয় ক্রমে গাঢ় ব্যক্তিগত বন্ধুত্বে পরিণত হয় এবং সে বন্ধুত্ব কোন কঠিন মতান্তরের দ্বারা বিনষ্ট হয়নি। আমরা পরস্পরকে সম্মান করতাম, মর্যাদা দিতাম। কার্যতঃ তিনি একজন আমলা কর্মচারী হলেও একজন উদার প্রকৃতির ও সহানুভূতিশীল হৃদয়বান ইংরেজ ছিলেন। তিনি জুরি [নোটিফিকেশনের বিরুদ্ধে লিখেছেন এবং ভাইসরয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বার হিসাবে শাসন-সংস্কার আন্দোলনের এক রকম একজন প্রাণ-পুরুষ-রূপে কাজ করেছেন, যার ফলে মিন্টো মর্লি পরিকল্পনার উদ্ভব হয়। বহু বছর তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের

দেবার থেকে মিউনিসিপ্যাল্ আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁর সহানুভূতি প্রকৃতপক্ষে আমাদের দিকেই ছিল; এবং তিনি বিলটি পছন্দ করতেন না। কিন্তু চাকরির খাতিরে তাঁকে আদেশ পালন করে যেতে হয়েছে; পোস্টার দিকে বিলটি উত্থাপন করেছিলেন তৎকালীন মিউনিসিপ্যাল্ সেক্রেটারী স্যার রবার্ট হিস্লপ। কিন্তু তিনি ভারত সরকারের হোম সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়ে দিল্লি চলে যাওয়ায় তাঁর স্থলে মিঃ বেকারকে ঐ বিলের ব্যাপারটা পরিচালনা করার ভার দেওয়া হয়। মজটা তাঁর ভাল ছিল এবং তাঁর প্রতি যে নির্দেশ ছিল তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে বিরোধী পক্ষের মতের সঙ্গে মিল রেখে চলতে ইচ্ছুক ছিলেন। তবে একথা ঠিক যে তিনি তাঁর সে ইচ্ছা একটা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে নিয়ে যাইতে পারতেন না।

আমি পেবারের মত যখন কাউন্সিলে আমার বক্তৃতা করি, তার পূর্বে তিনি একবার আমার কাছে এলেন এবং বললেন, "সুরেন্দ্রনাথ, এমন কোন কথা বলো না, যা পরে আর সংশোধন করতে পারবে না।" একথার অর্থ হল এই যে আমি যেন এমন কিছু না বলি যা এই নতুন অ্যাক্ট অনুযায়ী কর্পোরেশন পুনর্গঠিত হলে সেই কর্পোরেশনের কাছে আমার আদৌ কোনরূপ সুখে গ্রহণ করা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকৃতি হয়ে দাঁড়ায়। আমি বললাম, "তা অসম্ভব;" এবং ১৮৯৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে—যেদিন ২০ জন কমিশনার পদত্যাগ করলেন—কর্পোরেশনের বাইরেই থেকে গেলাম। সুরেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য বিহারী সরকারের মত ব্যক্তিগণ আমাকে দু-একবার আমাকে আমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করার জন্য চাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকি। এটা একটা বিস্ময়কর ভাগ্যেরই হাসি বলতে হবে যে যেকোন অ্যাক্টকে পরিবর্তন করে কর্পোরেশনের গঠনতন্ত্রকে গণতান্ত্রিকরূপ দেওয়ার কাজের ভার আমার উপরই পড়েছিল।

১৮৯৩ সালে আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। এই সালের বড়া জুন তারিখে মিঃ হার্বার্ট হাউস অব কমন্সে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা একই সময়ে গ্রহণের পক্ষে এক প্রস্তাব আনেন। মিঃ দাদাভাই নৌরজি তখন পার্লিয়ামেন্টের সদস্য ছিলেন। তিনি প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন এবং প্রস্তাবটি গৃহীত হল: পার্লিয়ামেন্টে প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ায় তা যেন এদেশের সরকারী মহলে একটা বোমা বিস্ফোরণের মত ঘটনা বলে মনে হল। ইণ্ডিয়া অফিস এর প্রতিবাদ করতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করল না। স্যার হেনরি কাটনার ছিলেন তখন ভারত সচিব। এই রাজনীতি-বিদ্ ইর্ষ অনির মধ্যে পার্লিয়ামেন্টে ঘোষণা করেছিলেন যে পার্লিয়ামেন্টের প্রত্যেকটি সদস্যই হচ্ছেন একজন ভারতের পক্ষের সদস্য। তাঁর এই ঘোষণাকে ভারতে আমরা কিন্তু এই অর্থেই বুঝে নিয়েছিলাম যে সকলের জন্য যে কাজ সে কাজ কারোর নয়। তিনি ধরে নিলেন এটা একটা বাপছাড়া রকমের ভোটদান হয়েছে। এই ভোটের জন্য হাউস অব কমন্সের বিচার-বুদ্ধি প্রকাশ পায়নি; তাই গভর্নমেন্ট এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য নয়। কিন্তু ভোট তো হয়েই গিয়েছে: এখন কি করা যায়। ভারত সচিব তখন ভারত সরকারের কাছে বিষয়টি বিবেচনার জন্য তুলে ধরে সিদ্ধান্তটিকে অকেজো করে দেওয়ার চেষ্টা করেন; ভারত-সরকার ও স্থানীয় সরকার-সমূহের মতামত চেয়ে পাঠান হল। তাদের মতামত যে কি হবে তা সকলেরই জানা ছিল। কেবলমাত্র মাদ্রাজ সরকারই ঐ ভোটের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন। মাদ্রাজ সরকার যে তাদের উদার মনোভাবের জন্য এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তা নয়। লর্ড লিটনের আমলে যখন ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট আইনবদ্ধ হয় তখনও ডিউক অব বুকিংহামের অধীনে মাদ্রাজ সরকার সেই আইনে আপত্তি জানিয়েছিলেন। ফলে সেই আইন মাদ্রাজে প্রযোজ্য হতে পারেনি।

বিলটি নিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন স্যার এডমি ম্যাক্তোনেল অস্থায়ীভাবে লেপ্টেন্যান্ট গভর্নরের কাজ করছিলেন। কারণ স্যার চার্লস্ ইলিয়ট ছয় মাসের জন্য ছুটিতে গিয়েছিলেন। মিঃ ম্যাক্তোনেল আমাকে ডেকে

পাঠালেন। "বেলভিডিয়ারে" তার সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়। তার সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল, যতটা সম্ভব তার কিছুটা এখানে তুলে ধরছি। লেপ্টেন্যান্ট গভর্নর এবং আমার মধ্যে যে বাক্য বিনিময় হয় সেই বাক্যের আকারেই তা উদ্ধৃত করা বোধহয় ভাল হবে। তাই করছি :

লেঃ গভর্নর : মিঃ বানার্জি, তুমি কেন একই সঙ্গে সব পরীক্ষাগুলি গ্রহণের ব্যাপারে এত আগ্রহী ?

মিঃ বানার্জি : ইয়োর অনার, কারণ মনোনয়নে আমরা সব বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি ; কারণ আমরা মনে করি একই সময়ে পরীক্ষা হলে আমরা ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের ব্যাপারে ন্যায্য অংশ পাব এবং তাতে মহারাণীর ঘোষণা বাণীতে যে অঙ্গীকার আছে তা পালিত হবে।

লেঃ গভর্নর : কিন্তু পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তোমার যোগ্যতার জন্য প্রাদেশিক চাকরীর ক্ষেত্রে কয়েকটি নিয়োগের ব্যবস্থা নিদিষ্ট করে রাখা হয়েছে। তা ছাড়া, তোমরা ইংল্যাণ্ডেও প্রতিযোগিতা করতে পার।

মিঃ বানার্জি : ইয়োর অনার, আমি আবারও বলছি, মনোনয়ন আমাদের খুশী করতে পারে না, পারবেও না। ১৮৮০ সালের ইণ্ডিটিউটে এটা ধার্য হয়েছিল যে ভারতীয়গণের মধ্যে যারা যোগ্যতা ও সামর্থ্যের প্রমাণ দিতে পারবেন, তাদের এই উদ্দেশ্যে যে সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রণীত হবে তার আওতার মধ্যে এনে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ করা হবে। ১৮ বছর লেগে গেছে সেই নিয়ম-কানুন তৈরী করতে এবং তারপরেও তোমরা ইণ্ডিটিউটের প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করতে মন্থর গতি চলে।

লেঃ গভর্নর : কিন্তু তোমরা তো এখন বেশ শক্তি অর্জন করেছো—এখানে এবং ইংল্যাণ্ডেও। তোমরা ভারতীয় জনমত গঠন করেছ, আবার তোমাদের স্বার্থ দেখার জন্য লণ্ডনেও তোমাদের একটি ব্রিটিশ কমিটি রয়েছে।

মিঃ বানার্জি : তা সত্ত্বেও গভর্নমেণ্টের কাউন্সিল-গুলিতে ভারতীয় জনমতের কোন কার্যকরী শক্তি নেই। লড়াই করে আমাদের অধিকার দাবিয়ে করতে হয়। আর দাবী আদায়। সে তো অত্যধিক পরিমানে ঘৃণা এবং অনুকম্পার ব্যাপার।

এই বাক্যালাপ ঘটে ১৮৯৩ সালে। ১৯০১ সালে যখন লর্ড ম্যাকাডোনাল্ডের সঙ্গে আমার আবার সাক্ষাৎকার হয়, তখন আমার মনে হল যেন তার মনোভাবের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে এবং তিনি একই সময়ে পরীক্ষা গ্রহণের নীতির দিকে একটু ঝুকেছেন। এই সাক্ষাৎকার হয়েছিল কার্জন উইলের হত্যাকাণ্ডের পরে। সেই সময় তার অভিমত ছিল যে ভারতীয় ছাত্রদের বেশী সংখ্যায় ইংল্যাণ্ডে আসার উৎসাহ দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তার আরও অভিমত ছিল যে ব্যারিষ্টারী এবং আই. সি. এস. দুটী পরীক্ষাই ভারতে এবং ইংল্যাণ্ডে একই সময়ে নেওয়া উচিত।

(চলবে)

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

ও

সবাইকে পড়ান—

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীঅমিয়ভূষণ দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হার্ডিঞ্জের উপর এই বোমা নিক্ষেপ সম্পর্কে বীর সাভারকার বলেন, "On the breast of my motherland a carpet of National humiliation was spread out and dancers moned on it. For the nation it was a funeral procession. Naturally when others in Chandichowk showered flowers and the coconut, the representative of those who had felt the insult burled bomb which routed the elephant, killed one of the A. D. C's and gave a blood-bath to the Viceroy. For five minutes every body believed that Lord Hardinge was dead. Verily the triumphant procession was turned into a funeral.

আমাদের এইট জেলার মৌলভী বাজারে স্বামী সচ্চিদানন্দের এক আশ্রম ছিল। আশ্রমটি ভগৎ এই আশ্রম নামে প্রসিদ্ধ। শচীন্দ্র নামে এক ১৬।১৭ বৎসরের বালক এই আশ্রমে যাওয়া আসা করত। কিছুদিন পরে আশ্রমের সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বালক আশ্রমেই এসে বাস করতে থাকে। বালকের পিতা আদালতে অভিযোগ করেন যে স্বামীজী বালককে অপহরণ করেছেন। আদালত থেকে আশ্রম তল্লাসীর পরওয়ানা বার হয়। মৌলভী বাজারের সে. ডি. ও মিঃ গর্ডন একদল পুলিশ নিয়ে আশ্রম তল্লাসী করতে যান। আশ্রমবাসীরা তল্লাসীতে বাধা দিলে উভয় দলের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। পুলিশের গুলিতে অনেক যে নামে আশ্রমের অনেক বিশিষ্ট কর্মী নিহত হন এবং অনেক লোক আহত হন। প্রায় ৫০ জন সন্ন্যাসী আহত হন। এ ঘটনা ঘটে ১৯১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। রাসবিহারী এই সময় কলকাতায় ছিলেন। রাসবিহারী প্রতিদিন অনুশীলনের চাকাবাজার কেন্দ্রে অমৃত বাজারের সঙ্গে মিলিত হতেন। আশ্রমে ধর্ম কর্মের সন্ন্যাসীদের প্রতি এই অত্যাচার সংবাদ পত্রে তখন তোলপাড় হচ্ছিল। রাসবিহারী প্রস্তাব করলেন যে, এ অত্যাচারের প্রতিবাদে মি. গর্ডনকে হত্যাকরা হলে বিপ্লবী সংস্থার পক্ষে জন সমর্থন লাভ সহজ হবে। কথাটা অনুশীলন চন্দননগর মিলিত সংহতির সকলেই অনুমোদন করলেন।

অনুশীলনের যোগীন্দ্র চক্রবর্তী এবং অন্য দুজন বিপ্লবীকে মৌলভী বাজারে পাঠানো হল গর্ডনকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু বোমা হাতে গর্ডন সাহেবের বাংলোর প্রাচীর ডিঙাতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে যোগীন্দ্রনাথ নিহত হন। ফলে এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। যোগীন্দ্রনাথের সঙ্গীগণ ঢাকা চলে আসে। তাদের ধরিয়ে দেবার জন্য ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়। কিন্তু তাদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নি। গর্ডনের উপর বিপ্লবীদের এই আক্রমণের বিষয় জানতে পেরে-এর পরে তার চাক্ষুষীয়ন আসাম থেকে সুদূর লাহোরে স্থানান্তরিত করা হলো। কিন্তু ব্যর্থতা মেনে নিয়ে নীরব হয়ে বসে থাকার মত ব্যক্তি রাসবিহারী ছিলেন না। মিঃ গর্ডন এই সময় লাহোর সেক্রেটারিয়েট গার্ডেনে বাস করতেন। ১৯১০ সালের মার্চ মাসে তাকে এখানে হত্যার জন্য রাসবিহারী চন্দননগর থেকে কয়েকটি বোমা নিয়ে আসেন। ১৭ই মে এরই একটি বোমা দিয়ে তিনি বড়লাট বিশ্বাসকে সেক্রেটারিয়েট গার্ডেনে পাঠান পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্ধান নিয়ে দেখা গেল বোমাই অধিক রাত্রিতে লাটের গৃহে ফেরেন। তাই ঐ দিন সন্ধ্যার পরেই বাগানের

রাস্তার মধ্যে বোমাটি স্থাপন করে আসা হল। কিন্তু সাহেবের প্রত্যাবর্তনের আগেই অন্ধকারের মধ্যে পথ চলতে গিয়ে বাগানের দরোয়ান রামরূপাল নিহত হল। বসন্ত বোমাটি স্থাপন করে বাগানের বাহিরে রাস্তার অপেক্ষা করছিলেন। তাকে গ্রেপ্তার করা হল।

বসন্ত গ্রেপ্তার হলেও এই হত্যা প্রচেষ্টার মূল কোথায়, কে এই কাজ করেছে কয়েক মাস পর্যন্ত নির্ণয় করা যায় নাই। ১৯১৩ খৃঃ ২১ শে নভেম্বর ২৯১/১ আপার সারকুলার রোড, অনুশীলন সমিতির রাজাবাজার কেন্দ্র তল্লাসী হয়। অমৃত হাজরা, ইন্দ্রেশ দাশগুপ্ত, সারদা গুহ এবং চন্দ্রশেখর সে এখানে গ্রেপ্তার হন। এর পরেই ৩রা ডিসেম্বর কলেজ ষ্ট্রীটে নিবাট পত্রিকা সহ কালীপদ ঘোষ ওরফে উপেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী গ্রেপ্তার হন। এদের আসামী করে আলিপুরের সব সহকুমা হাকিম মিঃ ডিকের অধীনে রাজাবাজার ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হলো। রাজা বাজারে প্রথমেই এসে হাসবিহারী অমৃত হাজরার সাথে কথা বলে গেছেন। ২১ শে নভেম্বর শেষ রাত্রিতে পুলিশ যখন এখানে হানা দেয় রাত্রি প্রায় ১ টা পর্যন্ত হাসবিহারী এখানে ছিলেন। তিনি বিদায়ে আসার চাঁদের নিকট একখানা চিঠি দেন এবং টাইপ রাইটারের সাহায্যে কালি শুকিয়ে দেন।

(ক্রমশঃ)

শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি সম্পন্ন—বিখ্যাত 'কলিতজ্যোতিষ' গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীহরিহর জ্যোতিশাস্ত্রী

বি, এ, এল, এল, বি (কলি :) এ, সি, আই, আই (লণ্ডন)

প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে ১১টা এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার ব্যতত অন্যদিন বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বপ্রকার জ্যোতিষী কার্য্য করেন।

কোষ্ঠী বিচারের পারিশ্রমিক মূল্যসহ ২০ টাকা।

চেম্বারের ঠিকানা :

সি-৩৪, কাননগো পার্ক, গড়িয়া, ২৪ পরগণা

৫ নং বাসরুট, বৈকুণ্ঠবাটা ষ্টপ।

বিপ্লবীদের বোমা তৈরীর সাধনা

—ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস

বিপ্লবীদের বোমা তৈরীর সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করলেই প্রশ্ন উঠতে পারে বোমা তৈরীর জন্য সাধনার কি প্রয়োজন? আজকাল পথে ঘাটে বোমার ব্যবহারে আমরা আতঙ্কিত ও অত্যস্ত। পাড়ায় পাড়ায় সার্কাসে, দলে দলে সার্কাসে, ছিনতাইকারী ও ওয়াগন ব্রেকার-দের আত্মরক্ষায় হামেশাই বোমা ব্যবহার করা হয়। কাজেই বোমা তৈরী কৌশল শিক্ষা বর্ত্তমানে অত্যন্ত সহজলভ্য। সহজলভ্য বলেই এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক শিক্ষা না থাকার ফলে—এই শিক্ষা সমাজ বিরোধী কার্য্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজকে দেশ হতে বিতাড়ণ করার জন্য বোমা তৈরী শিক্ষা করতে বিপ্লবীদের নিরবচ্ছিন্ন অক্লান্ত প্রয়াস; নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ভুলে ধরলে বুঝা যায় ইংরেজ আমাদিগকে কিঅবস্থায় রেখেছিল। সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

১৯০৬ সালের ৭ই আগষ্ট ব্রহ্ম-বান্ধব পত্রিকা প্রকাশ করেন। সন্ধ্যার দুইটি প্রবন্ধের জন্য ব্রহ্ম-বান্ধব অভিযুক্ত হন। ব্রহ্ম-বান্ধব কোন বিপ্লবী দলভুক্ত ছিলেন না। সন্ধ্যার প্রকাশিত প্রবন্ধে জনগণের মধ্যে সাড়া পরিলক্ষণ করেই সম্ভবতঃ ৭/৮ মাস পর অনুশীলনের তরুণ-বিপ্লবীরা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) সম্পাদনায় যুগান্তর পত্রিকায় ঘোষণা করা হয়েছিল প্রকৃত পক্ষিসম্পন্ন বোমা তৈরী হয়েছে, এ বোমা করে রাখা প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য। এই সমস্ত বিপ্লবাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশ করায় যুগান্তর সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৯০৭ সালের ৭ই জুলাই। অবশ্যে আর বেশী দিন বিপ্লব প্রচার সম্ভব নয় মনে করে ছোট লাট এডু ফ্রেজারকে বোমার আঘাতে হত্যা করা পরিকল্পনা করে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি বোমা তৈরী করার আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। এই কাজের প্রধান দায়িত্ব উল্লাস কর দত্তের উপর অর্পণ করা হল। উল্লাসকর দত্ত তখন তাহার পিতা বিশ্বনাথ দত্তের সঙ্গে বাস করতেন। বিশ্বনাথ দত্ত শিবপুর—ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। উল্লাসকর দত্ত কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন। ইংরেজ অধ্যাপক র‍্যাটেল বাঙ্গালী ছাত্রদের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করায় উল্লাসকর দত্ত ও কয়েকজন সহপাঠী মিলে র‍্যাটেলকে উত্তম মধ্যম দিয়ে "বন্দেমাতরম" ধ্বনী দিতে দিতে কলেজ প্রাঙ্গণ ত্যাগ করেন। উল্লাসকর দত্ত সরকারী স্কোলারশীপ খানায় আর ফিরে না গিয়ে শিবপুর বাড়ীতে গোপনে ল্যাবরেটরী করে বিস্ফোরক সম্পর্কে উচ্চ-পর্যায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষায় অধিকতর মনোনিবেশ করেন। নাইট্রো গ্লিসারিন ও ফ্যালমিনেট অব্ মার্কারী তাঁর পরীক্ষাগারে করতে সক্ষম হন এবং জেলিগনাইট ও পিক্রিক অ্যাসিডের বোমা সহযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেন। বসিরহাট ডিসট্রিক্ট পাবনাতে তাঁর তৈরী বোমা পরিক্ষাকালে রংপুরের প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীর দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। উল্লাসকর নিজেও মারাত্মক আহত হন। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে গোপনে বসিরহাট হতে কলিকাতায় এনে ডাঃ সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের চিকিৎসায় সুস্থ করা হয়। বাঙ্গার বৈপ্লবিক প্রস্তুতির প্রথম শহিদ প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী। ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর ছোট লাট এডুফ্রেজারের স্পেশাল গাড়ী উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। এই বিস্ফোরণে লাটের গাড়ীর কিছু ক্ষতি হয়। কিন্তু লাটসাহেব স্বয়ং অক্ষত ছিলেন। বিপ্লবীরা স্থির

করেন আরও উন্নত ধরণের বোমা তৈরীর প্রণালী শিক্ষার জন্য উল্লাসকর দত্তকে বিদেশে পাঠান হউক; কিন্তু উল্লাসকর দত্ত বিদেশে যেতে আপত্তি জানান। সেই সময় হেমচন্দ্র কানুনগো করাসী দেশে যাওয়ার জন্য ও প্যারিসে কৃষ্ণ, বর্মার সাহায্যে বোমা তৈরীর প্রণালী আয়ত্ত করা শিক্ষার ছিলেন। হেমচন্দ্র কানুনগো পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে বোমা তৈরী শিক্ষার জন্য ১৯০৫ সালের আগষ্ট মাসে বিদেশে যাত্রা করেন এবং ১৯০৭ সালে আগষ্ট মাসে দেশে ফিরে আসেন। হেমচন্দ্র কানুনগো বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না, কাজেই বোমা তৈরীতে তেমন পারদর্শী হতে পারেন নাই। হেমচন্দ্র কানুনগো কলিকাতায় ফিরে আসার আগেই মুরারীপুকুর (মানিকতলা) বাগান বাড়ীতে নতুন করে বিপ্লব কেন্দ্র স্থাপিত হয়। মানিকতলা বাগানে বিপ্লব কেন্দ্র স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সেখানে গোপনে বোমা তৈরী করা। হেমচন্দ্র কানুনগো যে বোমার ফর্মুলা নিয়ে এসেছিলেন তাতে ছিল বোমার নীতি, প্রস্তুত প্রণালী এবং প্রয়োগ কৌশল। হেমবাবু কখনও বাগানে বোমা তৈরী করেন নাই। হেমচন্দ্র কানুনগো ও উল্লাসকর দত্তের যৌথ প্রচেষ্টায় লাউতলা-সর্পসমূলিত অঞ্চলে (বর্তমানে ঢাকুরিয়া) এক পোড়ো বাড়ীতে বোমা তৈরীর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা সুরু হয়। ১৯০৮ সালের ১১ই এপ্রিল হেমচন্দ্র কানুনগোর তৈরী বোমা দ্বারা চন্দননগরের মেয়রকে হত্যা করার চেষ্টা হয়। মেয়র যখন রাত্রে পত্নীর সঙ্গে নৈশ ভোজ করিতেছেন তখন মণোরঞ্জনের ইন্দুভূষণ রায় বোমাটী জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু বোমা প্রস্তুতে ত্রুটি থাকায় বোমাটী বিস্ফোরিত হয় নাই। মানিকতলা বিপ্লবীদের বিশ্বাসঘাতক বিশ্বাসঘাতকের শেষ অধ্যায় অন্তরীণপুরে, মোজাফ্ফরপুরের ক্ষুদিরাম বসু ও বরদার প্রফুল্ল চাকীর ফিসফোর্ড সাহেবকে হত্যা করার প্রচেষ্টার ১৯০৮ সালের ১লা মে ভোর রাত্রিতে মুরারীপুকুর বাগান বাড়ী পুলিশ ঘিরে ফেলে, অরবিন্দ ঘোষ এবং বারীন্দ্র কুমার ঘোষ উল্লাসকর দত্ত ও অন্যান্যকে গ্রেপ্তার করে। কেহ কেহ বাগান বাড়ীতেই গ্রেপ্তার হন, অন্যান্য স্থানেও গ্রেপ্তার হন। তাঁদের গ্রেপ্তারের পরও বোমা তৈরীর কাজ বন্ধ হয় নাই। চন্দননগরে বোমা তৈরির প্রয়াস শুরু হয়। মনীন্দ্রনাথ নামেকই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন তখন মনিন্দ্র নামেক কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের বি, এস, সি, ক্লাসে অধ্যয়ন করেন মনীন্দ্র নাথ নামেক ডাঃ ঘোষ কিছুদিন পর এই বিষয়ে অগ্রসর হতে অস্বীকার করায় শ্রীশ চন্দ্র ঘোষ কলিকাতার ডফারীন মেডিক্যাল কলেজের (বর্তমান সুরেন্দ্র নাথ কলেজ) অধ্যাপক সুরেশ চন্দ্র দত্তের নিকট মনীন্দ্র নামেককে লইয়া যান। সুরেশ চন্দ্র দত্তের নিকটই মনীন্দ্র নামেক বোমা প্রস্তুতের যৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। সুরেশ বাবু মনীন্দ্র বাবুর বাড়ীতে আসিয়াও বোমা তৈরীর কার্যকরী শিক্ষা দিতেন। মতিলাল রায়ের ব্যবস্থানুযায়ী বেতাই নিবাসী শ্রীশ চন্দ্র ঘোষের ভাড়া বাড়ীতে বোমা প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় উপাদান ও সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত হতে থাকে। এই কার্যে আশুতোষ বিশ্বাসী, ও সাগরকালী ঘোষ নানাভাবে মনীন্দ্র নামেককে সাহায্য করতেন। ১৯১১ সালের কালীপূজার দিন তাঁদের তৈরী একটী ছোট আকারের বোমা নিক্ষেপ করে পরীক্ষা করা হয়। তাহার পর এই সব সরঞ্জামের সাহায্যে বড় বড় বোমা তৈরী হয় এবং পরীক্ষার জন্য ১৯১২ সালের চই নভেম্বর একটী বোমা রাসবিহারী বসু, জ্যোতিশ চন্দ্র সিংহ এবং শ্রীশ চন্দ্র ঘোষের উপস্থিতিতে রাসবিহারী বসুর বাটীর অনতিদূরে একটী বাঁশবাগানে বিস্ফোরণ করা হয়। উপস্থিত বিপ্লবীরা বোমা কার্যকরী হয়েছে বলে মনে করেন।

বারীন্দ্র কুমার প্রভৃতির গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের পর অনুশীলনের মানিকতলা বাগানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপ্লবীদের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পায় এবং চন্দননগর অনেকটা নিরাপদ হয়ে পড়ে। ঠিক এই সময়েই পূর্ববঙ্গ অনুশীলন সমিতির সঙ্গে তাদের মিলন হয়। তখন ১৯১৪ সনে আপার সার্কুলার রোডে অবস্থিত হাজরা পার্ক করতেন ইহাই ছিল অনুশীলন সমিতির কর্মকেন্দ্র অমৃতবাবু এই কেন্দ্র হতেই চন্দননগরে যাতায়াত করতেন। বোমা প্রস্তুত

প্রণালী ও প্রয়োগ বিষয়েও চন্দননগরের বিপ্লবীদের সঙ্গে অমৃতবাবুর আলোচনা হয় বলে অমৃত বাজারের উপর বোমা প্রস্তুতের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ক্রমে চন্দন নগর ও অনুশীলন দলের মিলিত সংগঠনের বোমার খোল নির্মাণের ভার বিপ্লবী গ্রহণ করেন। অমৃতবাবু নিজ উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে বোমা নির্মাণ প্রণালীর বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। এতদিন টিনের কৌটায় পিক্রিক এ্যাসিড ভরে তার ওপরে বোমা তৈরী হত। অমৃতবাবু টিনের কৌটার পরিবর্তে কাষ্ট আয়রণ (Cast Iron) খোল ব্যবহারের ব্যবস্থা করলেন। ইহাতে বোমার শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। অমৃতবাবুর হাতে তৈরী বোমা সম্পর্কে সিডিশন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে একটী বোমা অর্ধেক রেজিমেন্ট ধ্বংস করতে সক্ষম। চন্দননগর ও অনুশীলন সমিতির মিলিত সংগঠন এরপর এই বোমাই ব্যবহার করত। এইরূপ একটী বোমাই বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এই বোমা নিয়েই যোগীন্দ্র চক্রবর্তী শ্রীহট্টে গভর্নরকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন। এই বোমাই সারা ভারতের বিপ্লবীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী সারা ব্রিটিশ ভারত ব্যাপি অভ্যুত্থানের প্রথম আক্রমণের হাতিয়ার ছিল এই বোমা। বাংলার বিপ্লবীদের দ্বারা তৈরী এই বোমাই বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হত।

১৯২৮ সালের পরও বিপ্লবীরা বোমা ব্যবহার করেছে কিন্তু এই বোমা তৈরীতে আগের দিনের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার তেমন প্রয়োজন হয় নাই, কারণ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারতার সঙ্গে বিপ্লবীরাও বোমা তৈরীর সুযোগ গ্রহণ করতে দ্বিধা করে নাই।

বিপ্লবীরা বোমা তৈরী প্রণালী শিক্ষা করতে যে নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, ত্যাগ, আত্মবলিদানের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, সেই গুণাবলী বর্ত্তমান যুবকদের চরিত্রে ফুটে উঠুক, দেশ গঠনের কাজে প্রয়োগ হউক; তবেই তাঁদের নিষ্ঠা সফল হবে; তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান হবে।

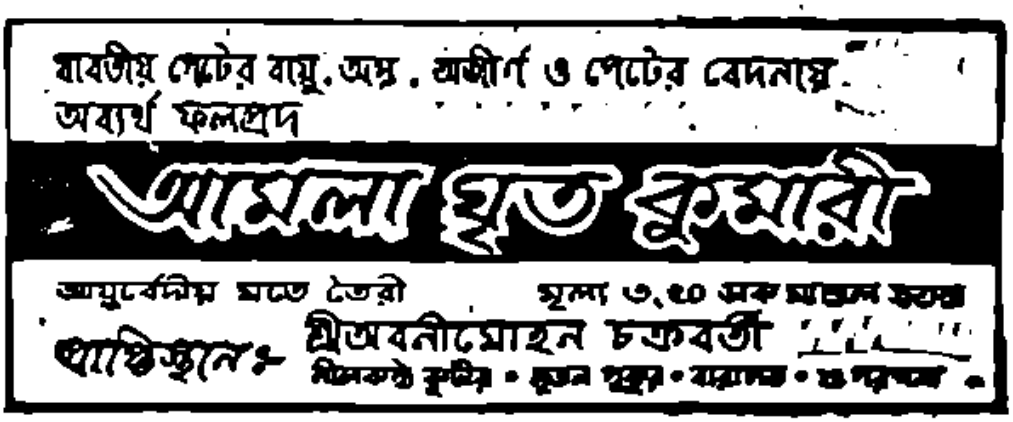

Contd. from 2nd Cover)

Name	Address	Amount Rs.	Date
	CALCUTTA—Contd.		
Mukherjee Smt. Jayanti w/o Late Uma Sankar	1/32 Sarsuna Main Road Calcutta-61	100	24. 3. 74
Sinha Roy Smt. Amiya Bala w/o Late Surendra Nath	12 Sastitola Road Culcutta-23	200	1. 10. 76
	Dist—24-PARGANAS		
Banerjee Smt Santibala w/o Late Pramathanath	5/1/4 Jatindasnagar Calcutta-56	200	28. 5. 78
Basu Jagadananda	Bishnupriya Bhaban, Gournagar P. S. Thakurpukur	200	5. 4. 74
Basu Sarbedhikari Bimal	Sodepur Railway Park P. O. Sodepur	200	1. 4. 78
Bhattacharjee Smt. Dulali w/o Late Haripada	Saktigar, P, O. Bongaon	100	21. 12. 77
Bhattacharjee Monoranjan	Madhab Nivas, P.O. Mana Chandanpur, Barrackpur	200	15. 8. 72
Das Mohini Mohan	Vill Alakulipur, P.O. Gopalnagar P. S. Bongaon	200	1. 10. 78
Maitra Smt. Uma Rani w/o Late Sailendra Nath Maitra	Vill Usumpore, P. O. Acarpara	100	12. 12. 74
Mitra Smt. Bina Rani w/o Late Prafulla Ch. Mitra	Sibbari Samiddarpara P O Gobardanga	200	19. 11. 77
Roy Batadal	509B, Ashokenagar	200	15. 9. 76
Roy Choudhury Smt. Shephalika w/a Late Hiron Roy Choudhury	1417/4, Kalyangarh P. O. Kalyangarh	150	22. 3. 78
	Dist—HOWRAH		
Ganguly Smt. Angur Bala w/o Late Sishir K. Ganguly	Shyamsundar Chak Govt. Colony P O. Santoshpur, P.S. Uluberia	100	18. 2. 77
Mukherjee Chandra Nath	2, Tarapada Bose Lane Ramkrishnapur, P.O. Sibpur	200	1. 4. 73
Mukherjee Subodh Kumar	P. O. & Vill Baburbati	200	1 4 77

RgedNo. R. N .24511/71 Biplabi Bangla Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা মূল্য—৩০ পয়সা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী, শ্রীবারীন ঘোষ।
সম্পাদক—শ্রীসাজি শরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতালা—শ্রীমধুগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীঅমীন্দ্র গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বন্ধুদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাঙলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭১

অষ্টম বর্ষ	শনিবার, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ ২রা ডিসেম্বর, ১৯৭৮	১১ সংখ্যা

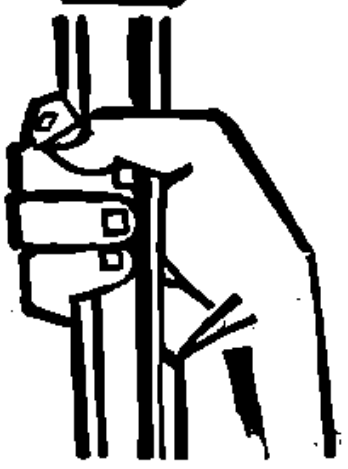

এই সংখ্যায়

চিরস্মরণীয় ৮ই ডিসেম্বর
। সম্পাদকীয় ।

ফাঁসির মঞ্চে মাল্যদান
শহীদ তত্ত্ব
। স্বপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় ।

পাগল আমার ভাই
। শ্রীসতীকুমার সেন ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস
। ক্ষীরোদ দত্ত ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক মলিনী মোহন দাশগুপ্ত ।

বন্যা বিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গ
। ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ধ্বংস দেখে ওর কেন ভোর?
প্রলয় নূতন সৃজন বেদন!
আসছে নবীন—জীবন-হারা
অন্তরে কাজে ছেদন!

—নজরুল

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Dist—HOWRAH		
Paral Shri Panchanan (alias Dulal Chowdhury)	P. O. & Vill Khila	200	15. 8. 72
Samanta Krishna Pada	P- O. & Vill Bankura P. S. Amta	200	1. 10. 76
	Dist—HOOGHLY		
Bose Ratneswar & Smt. Nirmala	Probasnagar, Serampore	400	1. 10 76 (arrears due from 15. 8. 72)
Chatterjee Ramapati	Rajyadharpur Govt. Colony P. O. Malikpara, Serampore-3	200	1. 10. 76
Roy Karmakar Satish Ch.	Aswini Duttanagar, P.O. Hind Motor Kotrong	200	1. 10. 76
Roy Smt. Milan w/o Late Rabindra Nath Roo	10A, Sashi Bhusan Banerjee Lane P. O. Rishra	200	1. 10. 76
	Dist—MIDNAPORE		
Barik Atul Chandra	Vill Seorah, P. O. Jankrai	(arrear due from 1. 2. 74)	
Das Smt. Sindubala w/o Late Bishnupada Das	P. O. & Vill Changra	200	16. 9. 76
Das Adikari Haripada	Vill Taniabila, P.O. Bamanbar	200	30. 9. 76
Mahata Smt. Sumitra w/o Late Jagannath	Vill Thakurthan Bonkati P. O. Rajabasha	100	15. 3. 78
Maity Sushil Kumar	Vill Joynagar P. O. Darajoynagar, P.S. Durgechak	200	15. 8. 72 (instead of 27.8.73)

(Contd. on 3rd Cover)

সম্পাদকীয়

চিরস্মরণীয় ৮ই ডিসেম্বর

জাতির জীবনে এক একজন মানুষ আসেন, তিনি তাঁর কীর্তিকলাপের মাধ্যমে ইতিহাসের গতানুগতিক ধারাকে শুধু প্রভাবিতই করেন না, তিনি নতুন করে ইতিহাস রচনা করেন। বিনয়-বাদল-দীনেশ তিন জনেই এই জাতের মানুষ। ১৯৩০ সালে ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ শক্তির ভারতস্থিত অন্যতম প্রধান দুর্গে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংসে এর মধ্যে অলিন্দ যুদ্ধে রাজশক্তির মেরুদণ্ডে ভয় ও পরাজয়ের শিহরণ সৃষ্টি করেছিলেন

দীর্ঘদিন ধরে বাংলা, তথা ভারতের বিপ্লবীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের লুপ্ত স্বাধীনতাকে পুনরুদ্ধার করবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আলিপুর বোমার মামলা, বালাশোরের যুদ্ধ, গৌহাটীর সংগ্রাম, কলতা বাজারের যুদ্ধ, চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার দখল করার মত দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড ও দেশব্যাপী বিপ্লবী সংগঠনের মাধ্যমে একদিকে বিপ্লবীরা দেশের মানুষদের ভয়শূন্য করে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। অন্যদিকে ব্রিটিশ সিংহের দুর্গে আঘাত হেনে সাম্রাজ্যবাদের ভিতকে শিথিল করে দিয়েছিলেন। মানুষকে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করে, মানুষকে অভীঃমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। ভারত ইতিহাসে তাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

দেশব্যাপী অবিচার, অত্যাচার, শোষণ পীড়নের রাজত্বকে জোরে করার কাজে নতুন পথে স্বাধীনতা আন্দোলনকে পরিচালিত করতে নতুন নেতৃত্ব দিয়ে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে ইংরেজ রাজশক্তি কাপুরুষোচিতভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মানুষদের লাঠিচার্জ জেল জরিমানা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, গুলিবর্ষণ করে এক বর্বরভাবে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল। ইতিপূর্বে বিপ্লবীদের উপরও অকথ্য অত্যাচার চালান হয়েছিল। তাদের দীর্ঘদিন অন্তরীণাবদ্ধ করে, আন্দামানে দ্বীপান্তরিত করে, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিতেও পরদেশী শাসক কার্পণ্য করেনি। ১৯৩০ সালে সশস্ত্র এবং অহিংস আন্দোলনের দুই ধারা গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের মত মিলিত হল। যারা বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী বিশেষণে ভূষিত করতে চেয়েছিল (দেশের মধ্যেও

এমন মানুষ ছিল) তারা বিপ্লবী আন্দোলনের মর্মার্থ, প্রভাব ও শক্তি সম্বন্ধের অবদানের সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের এই দ্বিমুখী ধারা একে অন্যের পরিপন্থী নয়, একে অন্যের পরিপূরক ছিল। আজ এই দিনে এই সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে বিনয়-বাদল-দীনেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের পাতায়, রক্তদিয়ে যে আলেখ্য রচনা করে গিয়েছেন, তাতে শুধু তাঁদেরই ভাবমূর্তি কালের কপোলতলে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে না। আগামী দিনের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের স্বাধীনতাকামীদের প্রাণে যোগাবে প্রেরণা, উদ্দীপিত করবে স্বদেশ প্রেম, দীক্ষা দেবে দেশের জন্য সর্বস্বত্যাগের মন্ত্রে, তাঁদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সকলের তমসাচ্ছন্ন মনের মধ্যে "নব অরুণোদয়" সৃষ্টি করবে নিরবধিকাল। বিনয়-বাদল-দীনেশ "রক্তগঙ্গা বহাবার মেকী ভগীরথ" ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন "নবযুগের দূত।" নিজেদের পাঁজরের অস্থি জ্বালিয়ে তারা হয়েছেন আধুনিক যুগের দধীচি। নিজেদের চরিত্রের আরক রসে জারিত করেছেন বহু মানুষকে তাঁদের আত্মদান বহু মানুষকে সৃষ্টি করবে নতুনভাবে। তাই তাঁদের উদ্দেশ্যে সকলের সঙ্গে আমরাও আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে ধন্য হব।

বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে এই সব বীর শহীদদের স্মৃতিচারণ করার সময় স্বভাবতই আমাদের ক্লিষ্ট করে, ব্যথিত করে, লজ্জিত করে যখন দেখা যায় যে তাদের ধ্যানের ভারতবর্ষ আজো গড়ে ওঠে নি। এই সব সময়ে তাঁদের উত্তর সূরীদের ভাবতে হবে, সেই ভারতবর্ষকে গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাঁদের স্বপ্নকে যদি সার্থক করে তোলা যায়, তবে ঋণ কিছুটা পরিশোধ করা হবে এবং সত্যিকার শ্রদ্ধা জানান হবে।

ফাঁসির মঞ্চে মাল্যদান

ফাঁসির মঞ্চে মাল্যদান করতে হলে অনেক ভাগ্যের দরকার, অনেক পুণ্যের দরকার। আমার তেমনি একটা সুযোগ ঘটেছিল গত ১৯৬৭ সালের ১১ই আগষ্ট বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির মঞ্চে মাল্যদান করার। সৌভাগ্য ঘটেছিল, অনেক শ্রদ্ধেয় বিপ্লবীর শুভ আশীর্বাদের ফলে। "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউথ ফ্রন্ট"-এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি গিয়েছিলাম মজঃফরপুর সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে। মঞ্চখানি সেদিন খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল—ফুল চন্দন আর ধূপ-ধুনো দিয়ে। সকাল ৯ ঘটিকায় মাল্যদানের শুভ অনুষ্ঠানের সূচী ছিল। জেলখানার সন্তাধিক কয়েদী তাদের বন্দীজীবনের মধ্যেও ক্ষুদিরামের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কুণ্ঠিত হয়নি, তাই তারা পূর্ব থেকেই অপেক্ষা করছিল এক একখানি মালা হাতে নিয়ে। সেদিন প্রত্যেকেরই চোখে একটা ভাবগম্ভীর চিহ্ন খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

আমিই মাল্যদানের প্রথম বাকি ছিলাম, খালি পায়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রথম নিবেদন করলাম অন্তরের ভক্তি, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে শহীদের আত্ম বলিদানের বেদীটির প্রতি একবার তাকালাম, পলকের মধ্যে আমার চোখ দু'টি ভরে গেল জলে। আমি খুব কেঁদেছিলাম, কেন কেঁদেছিলাম তা জানিনা; কিন্তু তবুও আমার চোখ দুটো জলে ভরে গিয়েছিল। এই অবস্থাতেই "বন্দেমাতরম্" বলে ধ্বনি দিলাম, আর সেই সঙ্গে মালাখানি পরিয়ে দিলাম ফাঁসির মঞ্চে। মালা ছিল অনেকগুলি।

আমাদের সংগঠন, বিপ্লবী বাঙ্গালী [বিপ্লবী পরিষদ], অনুশীলন ভবন, ক্যালকাটা ক্যান-এর সত্বাধিকারী শ্রীশান্তিরঞ্জন গাঙ্গুলী, সরস্বতী প্রেস-এর তরফ হতে শ্রীশৈলেন সরকার, বিভিন্ন বয় শহীদ ও দেশসেবক সমিতি ও আরও অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে, একে একে সবগুলি মালা পরিয়ে দিলাম ফাঁসির মঞ্চে।

আমি রাজনীতির মারপ্যাঁচ বুঝিনা, আমি সামান্য মাত্র একজন দেশসেবক ও শ্রদ্ধেয় বিপ্লবীগণের প্রতি আন্তরিক ভক্তিমান একজন কর্মী মাত্র, কিন্তু আমার মনে ছিল একটা আন্তরিক প্রেরণা, ঐ প্রেরণা কেউ আমাতে জাগিয়ে তোলেনি। আপনাকে আপনই জাগ্রত করে নিয়েছিলাম। আমি বিশ্বাস করি যে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বিনয়, বাদল, দীনেশ, মাষ্টারদা [সূর্য সেন], শহীদ আসফাক উল্লা, বাঘাযতীন [যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী] প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমুখ যাঁরা দেশ প্রেমিকগণের স্মৃতিপূজা নিষ্ঠার সঙ্গে করে যেতে পারলে তার সুফল পাওয়া যাবেই।

যুবক সম্প্রদায় আজ উচ্ছৃঙ্খল, সত্যিকারের স্বদেশ সেবায় তাদের মন বসছে না। কিন্তু এজন্য তাদের দোষারোপ করা যায় না, করে লাভ নেই। তাদের সকলের নিকট আমাদের শ্রদ্ধেয় বিপ্লবীগণের বাণী পৌঁছতে পারেনি। যুবকগণের মধ্যে এখনও অনেক আদর্শবান ও চরিত্রবান বর্তমান রয়েছে। তাদের অন্তরে স্বামী বিবেকানন্দের অমৃতের কথা ঢেলে দিতে হবে, ভারত বিপ্লবের পুরোহিত ঋষি অরবিন্দ যেমন ছোট ভাইকে কালী-প্রতিমার সম্মুখে একহাতে শিওল ও অপর হাতে আয়োধ (বিষ) দিয়ে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলেছিলেন, ঠিক তেমনি আয়োজন ও প্রস্তুতি নিতে হবে।

এখনও এই দেশের যুবক-যুবতী অতি পবিত্র মনে মা-কালীর মন্দিরে পূজা দিতে যায়; এখনও সূর্য প্রণাম করে শক্তি সঞ্চয় করে।

স্বদেশ সেবায় মনোনিবেশ করবে না, শহীদকুলের আত্মবলিদানের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুসন্ধান করবে না, আপন দেশকে 'মা' বলে ডাকবে না, এ বিশ্বাস আমার নেই। আমি দৃঢ়বিশ্বাসী যে, যে দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছেন, সে দেশের মাটি, জলবায়ু ও ধ্যান-ধারণায় পূর্ণ-আবদ্ধ সকল মানুষ, ক্ষণিকের উত্তেজনায় কিছু সংখ্যক হয়ত বা এ আবদ্ধতা হতে সরে যেতে পারে; কিন্তু ঠিক সময় মতন মাতৃ-স্তন পান করে, অমৃতের সন্তান বল আবার মায়ের সেবায় মনোনিবেশ করবেই।

ভয় নেই ভরসা রেখো
শ্রদ্ধা জানাও সবারে
শক্তি পূজায় সাধনা করো
জাগবে দেশ জাগবেরে।

বন্দেমাতরম্

শহীদ তত্ত্ব

ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়

আমরা সকলেই জানি যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেই সেই সঙ্গে মৃত্যুদিনও ধার্য হয়ে থাকে। আমরা এও জানি যে, মৃত্যু স্বাভাবিক বস্তু হলেও তেমনই তাকে বরণ করতে উৎসুক নয়। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও দেখা যায় মানুষের ইতিহাসে। সেখানে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ মৃত্যুকেও রমণীয় করে তোলে। যাঁরা কোন বৃহৎ আদর্শের জন্য যথাসর্বস্ব দান করে ধন্য হতে চান, তাঁরা সে দানের তালিকায় আপনার প্রাণটিকেও যুক্ত করে নেন। তাঁরাই সজ্ঞানে ও সইচ্ছায় মৃত্যু বরণ করে 'মৃত্যুঞ্জয়ী' হয়ে ইতিহাসে অমর হয়ে থাকেন। বরণীয় এই মৃত্যুঞ্জয়ীদেরই আমরা 'শহীদ' আখ্যা দিয়ে থাকি। মানব-কল্যাণে ধর্মের জন্য, সমাজের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, বৃহৎ কোন কার্যে আত্ম-বলিদানে প্রস্তুত থাকে মৃত্যুঞ্জয়ীরা। যথার্থ শহীদের আদর্শ তাই পরের হিতে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করে কর্মাহুতি হওয়া। এই কর্মই তাঁদের ধর্ম, রক্তের কামনা। এই ধর্ম পালনের প্রয়োজনে মৃত্যুকে প্রিয়তম জ্ঞানে গ্রহণ করতে তাই তাঁদের ভয় নেই। তাঁরা স্থিরপ্রজ্ঞ।

শহীদের সংখ্যা জাতির ইতিহাসে খুব বেশি হয় না—যদিও বৃহৎ কার্যে মৃত্যুলাভ বহু সংখ্যকেরই ঘটতে পারে।

সর্বমুখী রক্তশক্তির উদ্বোধনে, মৃত্যুভয়হীন প্রশান্ত পদ-যাত্রায় আত্মদানের চরম রূপ নির্ণীত থাকে। এ যেন আত্মদানে সমুদ্যত মৃত্যুঞ্জিৎদের পানে বিস্ময়ে তাকিয়ে কবি বলে উঠলেন :

"ওগো আকাশে আকাশে যাহারা ফিরিল
আপন নাম
চেন কি তাদের তাই ?"

কিন্তু কবির কথা আমাদের কানে পৌঁচেছে কি? আমরা কি সত্যি 'শহীদ'কে চিনতে পেরেছি? শহীদ বরণের ক্ষমতা আমাদের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে কি?

'শহীদ' চিনতে হলে শহীদের স্বরূপ বুঝতে হয়, শহীদ-ধর্মের মর্ম উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হতে হয়। মানব কল্যাণকে পরমরূপে গ্রহণ করে একমাত্র আদর্শের সন্ধানেই যিনি জেনে যে পথ জীবনের পথ রচনা করলেন, তাঁর পথে ফিরবার সত্তা বলে কিছু থাকলো না। তিনি এক সত্যের সন্ধানী পুজারী। বিরুদ্ধবাদী তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করতে পারে, 'হ্যামলকবিষ' পান করাতে পারে, যাতক ডেকে হত্যা করতে পারে কিংবা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাতে পারে। কিন্তু সে মৃত্যু সেই মহাযাত্রিকের ললাটে পরিয়ে দেবে অমরের তিলক। সেই পুরুষই চিরযুগের মানবপুত্র। তিনিই মহাত্মা। তিনিই নীলকণ্ঠ। তিনিই সত্যাশ্রিত সর্ব-যুগের শহীদ।

আবার সত্যমুখী রাজোগুণাশ্রিত মৃত্যুঞ্জয়ী যাঁরা তাঁদের পথযাত্রা রক্তশক্তিকে বরণ করে শুরু হলেও মৃত্যুভয়-বিবর্জিত চিত্তে দেশ ও জাতির কল্যাণকে পরম রূপেই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আপন আদর্শের মহান্ সত্যকে উদ্ঘাটিত করার কাজে তাঁরা যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হন, তখন তাঁদেরও প্রবেশ ঘটে 'সত্যাশ্রিত' শহীদের স্তরে। ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করলেন যে তরুণ কিশোর তাঁর মধ্যেকার 'মহামানব' ক্রুশবিদ্ধের মধ্যেকার মহামানব থেকে আলাদা কোন সত্তা নয়।

বহুর কল্যাণের জন্য নিজেকে বিলুপ্ত করে পথ চলবার যে নিষ্কাম সাধনা, তার সিদ্ধি চূড়ান্ত ভাবে লাভ হয় 'শহীদের-মৃত্যু' লাভের সৌভাগ্য হলে। সুতরাং এই সাধনাকে বুঝবার চেষ্টা না করলে 'শহীদ'কে বোঝা যায় না, তাঁর জীবনদর্শনও অজ্ঞাত থেকে যায়।

যাঁটি শহীদের আত্মবলিদান তথা জীবনাদর্শ সর্বকালের মানুষের কাছেই বরণীয়, এবং বিস্ময়ে সুন্দর। শহীদ

বরণের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য শহীদের তরফ থেকে কিছুই নেই, এর প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে রয়েছে শহীদের পেছনে পড়ে-থাকা মানবগোষ্ঠীর।...

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতবর্ষে একদল শহীদ জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের কর্মকাণ্ড রক্তোজ্জ্বল। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুবরণ সত্যসত্যই মহিমময়। তাই ভারতের প্রথম বিপ্লবী শহীদ বাসুদেব চাপেকার ফাঁসির মঞ্চে আরোহণকালে (খ্রীষ্টীয় ১৮৯৮ সালের ১৮ই এপ্রিল) প্রশান্ত চিত্তে নারায়ণের স্তবমন্ত্রিতোত্তমর্ণ হয়ে নিলেন। বুকে তাঁর ছিল ভাগবদ্গীতা। ফাঁসির রজ্জু থেকে দেহ ঝুলে পড়েছে, কিন্তু হাত থেকে বলগুরু গীতা' খসে পড়েনি!...তাই আবার দীনেশ গুপ্ত ফাঁসির মঞ্চে বসে বলতে পারলেন: "ভালবাসা হিসেব জানে না আপনাকে বিলিয়ে দিতে সে চায়। প্রতিদানে কিছুর কথা পাবার দুর্বুদ্ধি তার নেই। তাই সে শুধু, অকৃপণভাবে দিয়েই যায় সে, নেয় না কখনো।" দীনেশ দেশকে ভালবেসেছিলেন। সে ভালবাসায় এতটুকু ফাঁক ছিল না। কাজেই দেশের জন্য তিনি দিয়েই গেলেন, নিলেন না কিছুই। ...আর একটি কিশোর—প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য তাঁর নাম—ফাঁসি অবধারিত জানবার পরমুহূর্তেই ছোটে দেশবাসীকে বললেন: "দুঃখ কিছু নেই। মৃত্যুর ছায়া আমার কানের কাছে শুনায় অমৃতের গীত।

এই যে দানলর বাণী, এ বাণীই ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাষায় মহারাজা নন্দকুমার বা মঙ্গল পাঁড়ে থেকে ক্ষুদিরাম-কানাইলাল, প্রফুল্ল চাকি, গোপীনাথ, প্রীতিলতা, বলিনী বাগচী, যতীন দাস, ভবানী ভট্টাচার্য প্রমুখ শহীদ-কুলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে আছে। তাঁরা প্রত্যেকে দানলরূপে দেশকে গ্রহণ করেছিলেন। সে অপূর্ব মহের প্রভাবে তাঁরা সমগ্র বিশ্বসত্তাকে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। তাই 'শহীদের মৃত্যু হলো সাধারণের মৃত্যু। হঠাৎ কোন বিপুল উত্তেজনার বশে হয়ে তাঁরা দান করে 'শহীদের' জীবন দান নয়। শহীদের 'দানে'তে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁকে বরণ করার বিদ্যা লাভ করলেই আমরা বুঝবো যে 'শহীদ' আপন তপস্যা বলে জন্মগ্রহণ করেন, শহীদকে খুনিরা মারতে পারে না। রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক হিংসা দেকোবাজির দ্বারা রাজা-উজির সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু শহীদ সৃষ্টি সম্ভব হয় না। কালের আবর্তে 'মেকি' শহীদ বিলুপ্ত হয়ে যায়, কারণ তিরকাল বেঁচে থাকার মত সকল নিয়ে তাঁর 'মৃত্যু' ঘটেনি।...

বিপ্লবের অবদান 'শহীদ', শহীদের অবদান 'বিপ্লব'। বহুর তপস্যায় বিপ্লব সংঘটিত হয়, ব্যক্তির শৌর্য-বীর্যের শহীদের কৃপায়ণ। এখানে ফাঁকি নেই, ফাঁক নেই। এক তপস্যা আত্মদানে দুর্জয়, মহত্বে অপরূপ। এ তত্ত্ব উপলব্ধি না ক'রে বহুর কল্যাণ সাধন করা বা দেশের স্বাধীনতা অর্জনের বা রক্ষা করার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়। আজ আমাদের এইটুকু অন্তত বুঝতে হবে।

যকৃতীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ একমাত্রার জন্য
প্রাপ্তিস্থান: শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
শিলকুঠি • কুমার খুড়ি • আগরতলা • ত্রিপুরা

পাগল আমার ভাই / শ্রীসতীভূষণ সেন

ছেলেবেলায় যাকে একবার ম্যালেরিয়ায় ধরেছিল, সে যদি বুড়ো-বয়সেও পানা পুকুরে একটিবার ডুব দেয়, অমনি ম্যালেরিয়া ছুটে উঠে। 'কম্প' দিয়ে জ্বর আসে। স্নায়ুমণ্ডলীও তেমনি নাড়োড়বান্দা। কি দরকার ছিল সুরাজের, বালার সেই পাগল ঘড়িঅলা দেখে গিয়ে ঝক্কির ছবার। বেরিয়ে ছিল দারা দেশটা দেখতে, আটকে গেল লাগর পাড়ের সেই ছেলে চাষী আর জেলে চাষীদের গাঁয়ে। তখন আমরা সদ্য স্বাধীন হয়েছি, 'বিপ্লবীদের আত্মদান সার্থক হয়েছে' মনে করে ফুলে উঠেছি। কোথায় বাড়ী ফিরে বিয়ে সাদি করে সংসারী হবে, তা নয় এ কি পাগলামী? পরিচিত অনেকেই রাইটার্স বিল্ডিং-এ মাতব্বর হয়ে বসেছেন, বিয়ে করে পড়লেই একটা বিয়ে হয়ে যেত। তা তো করলই না, যে কাজ নিয়ে মাতলো, তাতে দেশের কাছে এতটুকু স্বীকৃতি পেল না জীবনে।

গেল যখন, সঙ্গেও তেমন কিছু নিয়ে যায়নি যে কারো চোখে পড়বে। কাঁধে একটা ঝোলা, ভেতরে দু-একটা কাপড় জামা আর টুকি টাকি জিনিষ। তাই নিয়েই ছেলেদের নাবার ঘরে পড়ল। কি দেখে যে ভাল লাগল মানুষগুলোকে, সেই জানে। বলল, আমি এখানে থাকতে এসেছি, কয়েক বছর থাকব। সাজাল দেশের মানুষ, মাছ ধরতে জানি। নৌকাও একটু আধটু বাইতে পারি। মাছ ধরবো আর খাবো, যদি তোমরা থাকতে দেও। তোমাদেরও তো একজন মানুষ দরকার, সঙ্গে গিয়ে তদ্বির তদারক করবার জন্য। সে কাজটা ভালই পারব। তোমরা যাতে মিলে মিশে কাজ করতে পার; দুটো বেশী পয়সা রোজগার করতে পার, তার কিকির ফন্দী বের করতে পারব। —...দেখই না দুচারটে দিন এ মানুষটা কেমন, আমিও দেখি কেমন লাগে।

সেই যে আটকে গেল; গেলই। ক বছর পরে আমার সঙ্গে যখন দেখা, তখন শ্যামলা রং, গাঁয়ের সাধারণ চাষী মুসলমান মূর্তি। চেনা কঠিন হত, মুখের হাসিটি না থাকলে। তখন সে ওখানে ইস্কুল খুলেছে, কো অপারেটিভ স্থাপিত করেছে। সমবায় থেকে কম সুদে কিস্তিতে ঋণ করিয়ে বড় জাল কিনছে জেলেদের জন্য। সদরের আড়তদারের সঙ্গে নগদ কারবারের বন্দোবস্ত করছে। টাকার দরকার পড়লে কলকাতা আসে বন্ধুবান্ধবদের ঘাড় ভাঙে। সেই রকম একটা উপলক্ষে কলকাতা এসেছে; তখন দেখা। গল্পের ফর্দনা দিয়েছিল তার গ্রামে যাবার, তাতে ওর পাওয়ার কথা। কয় ঘণ্টা যেন ট্রেন জানি, তারপর একদেড়া মোটর লঞ্চে গালাগালি, অবশেষে নৌকায় নদী পার হয়ে মাইল খানেক ঘুরেই তার গ্রাম। "শুনতেই যা কষ্ট; গেলে দেখবেন বড় মজার জানি। মানুষগুলো বড় ভাল আর বড় গরীব।" আগ্রহের সঙ্গে বলেছিল, "চলুন না আমার সঙ্গে!" শেষ পর্যন্ত আমার আর সাহস হয়নি।

সেদিন [২২.১১.৭৮] যখন অর্থমন্ত্রী ডক্টর মিত্র বক্তৃতামঞ্চে কো-অপারেশন কমিটির সভ্যদের [ক্যাডার] কাজের মূল্যায়ণ করছিলেন, তখন বার বার সুরাজের কথা মনে পড়ছিল। দৈনিক পনেরো টাকা হিসাবে যে টিফিন-ভাতা দিয়েছেন তখন সেটা বিধান সভায় পাশ করিয়ে নিচ্ছিলেন। সুরাজদের মত কত পাগল ত্রাণকর্মী মন এই ক্যাডাররা। মোটা মাইনের সরকারী কর্মচারী। রাজকার্যে মফঃস্বলে গিয়েছেন, আইন মাফিক টিফিন ভাতা তো 'হু' করবেনই। তবে বিনা বক্তৃতায় গিয়ে টিফিন ভাতা, শুনতে একটু কেমন যেন লাগে। টিফিনই নেই, তার টিফিন ভাতা! একে অজ পাড়াগাঁ, তার চারদিক জলে ভাসছে। কখনও বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে উঠছে, দূরে বাড়ী ভেঙে পড়ার গর্জন। চারদিকে উঠছে মানুষের বাঁচার জন্য আর্তনাদ। যারা শোনে, তাদের মনে তখন একটা অসহায় উদ্বেগ ও অস্থিরতা বোধ ছাড়া আর কিছু থাকে কি? টিফিন কিনবার পয়সা থাকলেই কি সেখানে টিফিন পাওয়া যায়, না তা গলা দিয়ে নামে?

চারিদিক থেকে যখন অজস্র মৃত্যুলীলার খবর আসছে, যখন একটা গোটা দেশ মৃত্যুযন্ত্রনায় ছটফট করছে, তখন কলকাতার 'রাজনীতি-কি-খেলাড়ী' যা খাবার চাল চালছেন, আর টাকা-আনা-পাই হিসাব করছেন। হিসাব রাখা ছাড়া যেন করবার কিছু নেই রাজ্য সরকারের। ত্রাণের কাজ যা হচ্ছে সবই কাগজে কলমে। রাইটার্স বিল্ডিং এ গেলে দেখবেন এ ঘরে একজন গাদা গাদা ফর্ম পাঠাচ্ছে

দিচ্ছেন। অন্ত ঘরে একজন ট্রাক্টারের পর ট্রাক্টার পাঠিয়ে চাষ করছেন ক্ষেতে। গ্রামে যান, দেখবেন ফসল হোঁয়ায়নি, ট্রাক্টারেরও দেখা নেই। দেখা পাবেন শুধু এখনাশ হুকুম নামার, এক এক মন্ত্রণা থেকে এক এক রকম। সব পরস্পর বিরোধী। এক হুকুম বলছে এবার যে অভ্যন্ত পেয়েছে, সে ঋণ পাবে না। আর এক হুকুম আদেশ দিয়েছে সমবায় সমিতির সভ্যরা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পাবে না। তবে কি সমবায় সমিতি থেকে পাবে? তাও পাবে না, যদি অতীতে বাৎসরাধিক কাল defaulter হয়ে থাকে। ঋণ পাবে না, "ঋণ পাবে না"র হুকুম বাবা। ঋণ না পেলে চাষ করবে কি করে মানুষগুলো? "তা আমরা কি জানি।"

এই যে ঘট পাকিয়ে উঠছে, খুলবে কে? অর্থ মন্ত্রীতো দেখছি শুধু হিসাবই করছেন। মুখ্য মন্ত্রীতো ডিমসিদ্ধ খাচ্ছেন রাজনৈতিক খুন-খারাপী সামলাতে। একবার ছুটছেন জাপানবাজার, আবার আসছেন বিধান সভায়। তবে কার কাছে যাবে পশ্চিমবঙ্গের আর্ত প্রজা? পাবে এক আমাদের চেয়ারম্যানের কাছে যেতে। কখনো প্রয়োজন হলে হাসপাতালের দরজায় কেঁদে পড়তে পারে। তবে, শুনেছি তাঁর দেখা পাওয়া মুসকিল। রাজ্য সরকারের কেউ নন তো, আড়াল থেকে সুতো টেনে জ্যোতি বাবুকে চালিয়ে থাকেন। কেউ কেউ বলে নাচিয়ে থাকেন। তাই সামনে আসেন না।

চেয়ারম্যান বলছেন, রাজ্য সরকারের তহবিলে অতেল টাকা নেই। থাকতে যে পারে না তা সবাই জানে। বলছেন কেন্দ্র প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই দিচ্ছেন না। সেটা ওপরওলার স্বভাব। তা নিয়ে গজ গজ করাই সুন্দর। কিন্তু যে টুকু আছে তার সদ্ব্যবহার হয় না কেন! সেটা করার ক্ষমতা যদি না থাকে তবে বিদেশী ত্রাণ সংস্থাগুলিকে কেন কাজ আদায় করতে দেওয়া হচ্ছে না? পশ্চিম বঙ্গের অর্থনীতির স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের চাষীদের বাঁচবার শেষ সুযোগের পথে কেন বাধা দিচ্ছেন? শুনেছি চীনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরে চেয়ারম্যান মাও, কোন বিদেশী ত্রাণ সংস্থাকে দেশে প্রবেশ করতে দেন নি। চীনের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হয় কখনো? ওখানে সরকারী কর্মচারীদের যে নিয়মানুবর্তীতার কথা শুনতে পাই, এখানেও কি তাই দেখতে পান? প্রয়োজনটা অতীব জরুরী না হলে কি আজ সরকারই উপযাচক হয়ে বিদেশী ত্রাণ সংস্থাদের আমন্ত্রণ করতেন?

এই তো সেদিনের কথা, বছর দেড়েকও হয় নি। কাগজে পড়লাম "অক্সে" ত্রাণি সাইক্লোন হয়ে গেছে। গুরুত্বটা বুঝলাম যখন কলকাতার জিমের লাভ ভবল হয়ে গেল। কৃষ্ণা নদীর গোটা বদ্বীপটাই সেবার সাইক্লোনে লন্ডভন্ড হয়ে গেছিল। ওখান থেকেই জিম আসে কলকাতায়, ভাজিনিয়া টুবাকো' রপ্তানী হয় বিশ্বের সর্বত্র। ত্রাণি উর্বর ও সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল ওটা। শুনেছি প্রায় পনেরো দিনের চেষ্টায় ভারতীয় জওয়ানরা রাস্তা থেকে গাছ তুলে সরিয়ে রাস্তা করেছিল, ক্ষয় ক্ষতির পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করেছিল। সেই বিবরণ প্রচারিত হতে না হতে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্বেচ্ছাব্রতী প্রতিষ্ঠানগুলি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছিল। দরিদ্র তৃতীয় বিশ্বের যেখানেই যখন বিপর্যয় আসে, নিশা অবসানে উষার আলোর মত তাদেরও দেখা যায়। দুর্বৃত্তের দেবাই.তাদের 'প্রফেশন'। OXFAM এই রকমই একটি সংস্থা। অন্তে তার কার্য পদ্ধতি সম্বন্ধে দু একটি কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"অক্সফাম উর্বর বদ্বীপ, চারিদিকে সেচের খাল। সার ও কীটনাশক ঔষধ ব্যবহারে অভিজ্ঞ, ধনী কৃষকদের বাস। জনপ্রতি আয় ভারতের বহু আয়ের তুলনায় খুবই বেশী। OXFAM সাধারণতঃ এই সব স্থানে আসে না। আমরা যাই পশ্চাৎপদ এলাকায়, ছোট ছোট কাজে হাত দেই। যেখানে মানুষ খাটতে চায়, সুযোগ পায় না; কিম্বা কাজ করেও খুলিয়ে উঠতে পারে না; তাদের যতটা সম্ভব সাহায্য করি। OXFAM আজ এখানে এসেছে সাইক্লোনের সর্বস্বান্ত দরিদ্র কৃষকদের সাহায্যের জন্য। তাই বলে আমরা প্রতি কৃষককে যে এক বস্তা করে সার দেব, তা নয় কীটনাশক ওষুধ উপহার দিতেও আসিনি। কোন গ্রামকে যে adopt করব [পোষ্য নেব] তাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারও জন্য পাকা বাড়ীও আমরা করে দেব না।

স্থানীয় অবস্থাপন্ন কৃষকদের সভা। সভাপতি OXFAM এর স্থানীয় ডিরেক্টার একজন কাজ পাগল ভারতীয়,

শ্রীকণ্ঠ। খোঁজ নিলে হয়ত দেখা যাবে এঁরা কাজের আকর্ষণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, আর ঘরে ফেরা হয় নি। সেটাই OXFAM এর কর্মী গোষ্ঠীতে মিশে গেছেন। বিদেশী কর্মীও আছেন তার মধ্যে. Specialised Job এর জন্য তাঁদের ডাক পড়ে। কাজ শেষ করে দিলেই ছুটি। দেখে মনে হয় OXFAM বুঝি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। বিলেতের কিছু নয়।

'Aid যদি দিতেই হয় তবে শুধু দরিদ্রতম মানুষদের। জমি আছে যার সব, পুঁজি নেই। খাল দুইকূল যা ছিল বানে ভেসে গেছে। এমন সঙ্গতি নেই যে কিনবেন কিম্বা জন মজুর খাটাবেন। এদের কি করে বাঁচানো যায় তাই আমাদের ভাবনা। সরকারী পরিকল্পনায় যে সব ভালো ভালো কাজ হয়ে থাকে, তার সুফল এদের কাছে পৌঁছায় না। পঞ্চায়েতের তৈয়ারী লিষ্টে এদের নাম ওঠে না। এদের জন্য কিছু করতে চাই, কিন্তু কি করে যে করব সেটাই মাথায় আসছে না। উপস্থিত আপনারা যদি কোন পথ দেখাতে পারেন, সেইটি শুনতে চাই।"

"OXFAM যদি আকাশ থেকে কীটনাশক ওষুধ ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, সকলেরই সমান উপকার হবে"—বললেন একজন। প্রস্তাবটা শ্রীকণ্ঠের পছন্দ হল না। "এতে ধনী কৃষকদেরই বেশী সুবিধা হবে, কারণ তাদেরই জমি বেশী। 'স্প্রে' করার মজুরী নিয়ে যাবে কলকাতা বা মাদ্রাজের কোম্পানী। টাকাটা ষোল আনা এখানে থাকবে না।

আরো আলোচনা চলল; ক্রমশঃ একটা সমাধান ফুটে উঠল। স্বাস্থ্য সরকার খালে জল ছাড়বেন স্থির করেছেন। জমির লবণ ধুয়ে ফেলবার জন্য; অতিরিক্ত একটা emergency crop রোপনের সুযোগ করে দেওয়াও হবে। এই ফসল তুলতে একর প্রতি খরচ হবে ৮০০ টাকা। স্বাস্থ্য সরকার একর প্রতি ৩০০ টাকা ভর্তুকি দেবেন। বাকি ৫০০ টাকা কৃষককে সংগ্রহ করতে হবে। দরিদ্র চাষী টাকাটা পাবে কোথায়? ব্যাঙ্ক তো তাকে টাকা দেবে না। OXFAM কি দরিদ্র কৃষককে টাকাটা ঋণ দিতে পারেন না?

প্রস্তাবটা ভালো কিন্তু OXFAM তো ভারতীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় নামতে পারে না। স্থানীয় কোন ব্যাঙ্ক যদি টাকা ধার দিতে ও আদায় করতে প্রস্তুত থাকে OXFAM কৃষকদের জন্য জামিন হতে প্রস্তুত। সুদের যে বিল হবে, সেটাও শোধ করবে OXFAM।

"আদলটাও শেষ পর্যন্ত OXFAM-কেই দিতে হবে" বললেন সদ্য কৃষক। দরিদ্র কৃষকরা একটি পয়সাও ব্যাঙ্কে জমা দেবে না, সব খেয়ে ফেলবে।"

"আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য রকম "বললেন রাজ্যের কৃষি অধ্যক্ষ।" রাজ্য সরকার যে সব ঋণের 'গ্যারান্টার' হয়েছেন, দেখেছেন দরিদ্র কৃষকের মধ্যে ছয় শতাংশ 'ডিফল্ট' করে। ধনী কৃষকরাই বেশী।" স্থানীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার OXFAM-এর Collatoral-এর উপরে টাকা ধার দেওয়া ও পরে আদায় করার ভার নিলেন। অবশেষে শ্রীকণ্ঠ বললেন "Scheme-টা আপনাদের, আমি উপলক্ষ মাত্র। এই পরিকল্পনা সফল করার দায়িত্ব আপনাদেরই। আপনারা এখানেই একটা কমিটি গঠন করে ফেলুন। কমিটিই স্থির করবে কাকে কত ঋণ দেওয়া উচিত। ফলাফল কি হচ্ছে তার উপরেও তাঁরাই নজর রাখবেন। Schemeটা যাদের, Execute করার দায়িত্বও তাঁদের; এর উপরে আর কথা কি আছে। যদি দরকার হয়, আফিস চালাবার জন্য সর্বক্ষণের একজন কর্মীর বেতনও OXFAM দিতে প্রস্তুত। OXFAM মাইনেটাই দেবে, কাজ করাবেন কমিটি।"

নিখুঁত পরিকল্পনা। ষোল আনা স্থানীয় উদ্যোগ। পরিচালনা ও দায়িত্ব সবই স্থানীয় লোকদের উপর। টাকাটা সবই গ্রামে ঘুরে যাবে। একটা দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক অগ্রগতি লাভ হবে এই থেকে। দরিদ্র কৃষককে একবার ব্যাঙ্কের দরজায় পৌঁছে দিতে পারলে, আর সে মহাজনের ফাঁদে পা দেবে না। OXFAM-এর কাজই তো এই, স্থানীয় লোকদের ঘাড়ে কাজের ভার চাপিয়ে দিয়ে, আস্তে আস্তে সরে যাওয়া।

অতি বড় দুর্যোগের পরই আসে জীবনের অতি বড় সুযোগ। ওকে ধরা বড় কঠিন। হঠাৎ কখন আসে, একটু ছুঁয়েই দূরে সরে যায়। আর ফিরে আসে না। ওকে চিনে নেওয়া সহজ নয়, কমরেড চেয়ারম্যান!

এ আর্ত্তনাদ কেন ?

ডাঃ চিত্তরঞ্জন দাশ (পত্রকার শিরোমান)

আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু হঠাৎ আর্ত্তনাদ শুরু করলেন কেন ? এ কথার জবাব পেতে আপনাকে আমাকে খুব মাথা ঘামাতে হবে বলে আমি মনে করি না। জ্যোতিবাবুরা এর আগেও দু'বার ক্ষমতায় এসেছিলেন—অবশ্যই আমাদের অগ্রজ প্রতীম অজয়দার হাত ধরে—তারপর বিভাগে কি ঘটেছে—আপনারা সবলেই তা বিস্তারীতভাবে জানেন। জানেন ওরা মহামান্য কার্লমার্কসকে কি ভাবে হত্যা করে—তাঁকে ১১ ভাগে ভাগ করে ১/১১ অংশ নিয়েই ভারতের মাটিতে নুতন কার্লমার্কস সেজে কি ভাবে ভারতীয় কৃষ্টি, সাধনা ও ঐতিহ্যকে রক্তদিয়ে ধুয়ে মুছে জমিকে উর্ব্বর করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ভারতের, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার সচেতন মানুষ ওদের বেইমানী ও বিশ্বাস ঘাতকতার জবাব সেদিন সঠিক পথেই দিয়েছিলেন। ওরা পশ্চিমবাংলার মাটিতে আশ্রয় নিয়েছিল—একটি মুসিকের ভূমিকায়।

গত নির্ব্বাচনে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বীরযোদ্ধা বঙ্গসন্তান প্রফুল্ল চন্দ্রের হাত ধরে জ্যোতিবাবুরা আবার, বেরিয়ে এলেন নির্ব্বাসিত বিকৃত জীবন যাত্রা থেকে প্রকাশ্য সামাজিক জীবনে। আমাদের শোনালেন কত আশা-আকাঙ্খার বাণী। কিন্তু হঠাৎ এ আর্ত্তনাদ কেন ? চিকমাগালুর ? জনতার আত্মকলহ না অন্য কিছু ? অবশ্যই কেউ কেউ বলছেন ওদের শরিক দলগুলোও নাকি ওদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য কোথাও কোথাও গোপন চক্রান্তে লিপ্ত। আমি সঠিক রকমটা জানি না, তবে ওঁরা শরিক দলগুলোকে বড় বেশী করে কৃপার পাত্র মনে করে, দয়া করে রেখেছে—বলেই রয়েছে। এটা যদি সত্যি হয়, তাহলে চক্রান্তের কথাও সত্যিই হতে পারে—এটা আমি বিশ্বাস করি।

যাইহোক, জ্যোতিবাবুরা যা-ই বলুন আর করুন, আমার বক্তব্য হল—যেভাবে সরকারী অর্থ কর্মী তথা অফিসারদের দলীয় রাজনীতির স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছেন—এর নজির ভারতে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় ইতিপূর্বে আর কোন সময়ই দেখিনি। একটি ঘটনা থেকেই আপনারা সব বুঝতে পারবেন। বঙ্গীয় যক্ষ্মা সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। জনগণ এবং সরকারী আর্থিক সহায়তায় চলে। এখানে একটি দুষ্ট-চক্র বহুদিন যাবৎ লক্ষ লক্ষ টাকা এদিক ওদিক করে চলেছে। আমি ঐ চক্রের বিরুদ্ধে অভি যোগ ও তাদের অপসারণ দাবী করি। ঐ সমিতির সভাপতি মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী টি, এন, সিং সহঃ সভাপতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, বহু চিঠি এঁদের দিয়েছি কোন জবাব পাইনি। সরকারী শ্রমদপ্তরের লালিশী চলা কালীন অবস্থায় সহঃ শ্রম কমিশনারের নির্দেশ অমান্য করে কর্তৃপক্ষ জুলাইমাসে রাতের অন্ধকারে সমিতি বন্ধ করে দেয় এবং দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়। সদ্য প্রসবা মা ও তার ২০ ঘন্টার শিশুকে প্রবল বৃষ্টিতে রাস্তায় নামিয়ে দেয়। বিচার চেয়েছি

রাজ্যপাল—মুখ্যমন্ত্রী—শ্রম মন্ত্রীর কাছে—কোন বিচার পাইনি—পেয়েছি বিশ্বাস ঘাতকতার উলঙ্গ প্রকাশ—আইনের নামে দলবাজীর নগ্ন বৈনাতার জঘন্যতম কামনা তথা বহিঃ প্রকাশ। আমি মাননীয় রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী তথা প্রমোদবাবুকে চ্যালেঞ্জ করছি—সৎ সাহস থাকতো প্রকাশ্যে বিচার হোক—আজ কেন ৩০,০০০ দুর্ব্বল শ্রেণীর তথা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর দরজায় মাথা ঠুকছে? 'লক-আউট' কেন? দুর্নীতি গ্রস্থ চক্র তথা দুর্নীতির অধিনায়ক এস, কে, হালদারকে বাঁচাতে! কেন? বিনয় ডাক্তারের কুকীর্তি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য?

প্রকাশ্য তদন্ত হোক, বিচার হোক, শাস্তি হোক অপরাধীর। অন্যথায় মাননীয় রাজ্যপাল তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অবিলম্বে পদত্যাগ করে প্রমাণ করুন—দুর্নীতির সাথে তাঁদের কোন প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সম্পর্ক নেই। আমার অভিযোগ প্রমাণীত না হলে—নিশ্চই শাস্তি দেবো।

(ক্রমশঃ)

সারাবাংলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মেলন

নেতাজী সুভাষ ইন্‌স্টীটিউট

(শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকট)

বন্ধুগণ,

আগামী ১২ই ডিসেম্বর '৭৮ মঙ্গলবার বেলা ৩টায় প: বঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটি সম্মেলন হইবে। বন্যার জন্য পূর্ব্ব ঘোষিত গত ২৩শে অক্টোবর সম্মেলন হইতে পারে নাই।

বর্ত্তমান সংকটজনক পরিস্থিতীতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য প্রত্যেক স্বাধীনতা সংগ্রামীকে উক্ত সম্মেলনে যোগদান করতে আহ্বান জানান হইতেছে।

প্রত্যেক জেলা, থানা ও মহকুমা থেকে কতজন ডেলিগেট যোগদান করিতে ইচ্ছুক ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে জানাইতে হইবে। ডেলিগেট ফি ৫ টাকা। অফিসের ঠিকানায় ডেলিগেট ফি পাঠাইতে হইবে। দূরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের থাওয়া থাকার বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

সম্মেলনের আহ্বায়ক কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে—

জগদীশ চট্টোপাধ্যায় মলয় ব্রহ্মচারী

দীনেশ চন্দ্র দাস বীরেন্দ্র ভৌমিক

হরেন্দ্র কুমার ধর।

যোগাযোগের ঠিকানা ৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭

ফোন—৩৪-১৭৯৫

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীক্ষীরোদ দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দিল্লী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা আরম্ভ হবার পূর্ব থেকেই রাসবিহারী ফেরার হন। তাকে ধরবার জন্য অনেক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রত্যেক বড় বড় রেল ষ্টেশনে তার ফটো টাঙানো থাকত এবং তাকে ধরে দিতে পারলে কত পুরস্কার দেওয়া হবে তারও উল্লেখ থাকত। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ অবধি রাসবিহারীকে ধরা যায় নাই কয়েকস্থান ঘুরে রাসবিহারী শেষে ধরা যায় নাই। কয়েকস্থান ঘুরে রাসবিহারী শেষে, স্থির করেন যে তিনি কাশীতেই থাকবেন। এই সময় সম্পর্কে শচীন্দ্র নাথ সান্যাল বলেন, "তিনি কাশীতে আমাদের সহিত প্রায় বৎসরাধিক ছিলেন। তিনি যতদিন কাশীতে ছিলেন ততদিন তাহার সংস্রবে আসিয়া যে আনন্দ পাইয়াছিলাম তাহা ভুলিতে পারিবনা। তাহাকে কখনও নিরানন্দ দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়েনা। তবে যেদিন দিল্লীর ষোকদ্দমার রায় বাহির হইল ও তৎসঙ্গে চারিজনের ফাঁসীর আদেশ হইল সেইদিন তাঁহাকে নিরবে অশ্রুপাত করিতে দেখিয়াছি।" রাসবিহারী যতদিন কাশীতে ছিলেন ভারতের নানা প্রদেশ থেকে তাঁর কাছে বহু লোক আসত। রাজপুতানা, পাঞ্জাব, লাহোর, দিল্লী থেকে আরম্ভ করে সুদূর পূর্ববঙ্গ থেকে তাঁর কাছে লোক যাওয়া আসা করত। তিনি যতদিন কাশীতে ছিলেন ততদিন যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের নানাস্থানে বিপ্লব কেন্দ্র বিস্তারে নিযুক্ত ছিলেন। তার ফলে এই এক বছরের মধ্যেই বিপ্লবী দল বিভিন্ন স্থানে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। ইউরোপের মহাযুদ্ধ যখন আরম্ভ হল তখন এই অঞ্চলের বিপ্লবীদল বেশ শক্তিশালী।

কোমাগাটামারুর শিখ যাত্রীদের যখন কানাডায় অবতরণ করতে দেওয়া হলনা তাদের মনে বিক্ষোভের আগুণ জ্বলে উঠল। সে আগুণ ভারতের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। পাঞ্জাবে বিপ্লবী দলে যারা ছিলেন তাদের বলে রাখা হল কোমাগাটামারুর যাত্রীরা দেশে পদার্পণ করলেই যেন তাদের দলে টেনে নেওয়া হয়। কোমাগাটামারুর যাত্রীরা দেশে ফিরে আসতেই এক বিরাট কাণ্ড ঘটে গেল। দেখতে দেখতে কানাডা ও কালিফোর্নিয়া থেকে দলে দলে শিখ আসতে লাগলেন। এই সকল শিখ ভারতে আসবার পথে স্থানে স্থানে নেমে সেখানকার শিখ পুলিশ ও শিখ সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লবের আগুন ছড়াচ্ছিলেন। এরা যতদিন বাইরে ছিলেন গোপনে কিভাবে ষড়যন্ত্র করতে হয় জানতেন না। তাই প্রকাশ্যভাবেই জাহাজে জাহাজে বন্দরে বন্দরে এরা বিপ্লবের বার্ত্তা ঘোষণা করে আসছিলেন। এর ফল এই হয় যে ভারত সরকার সতর্ক হয়ে যান। শিখদল ভারতে এসে যখনই জাহাজ থেকে নামলেন সদাশয় সরকার বাহাদুরের তরফ থেকে

তাদের তেমনই সাদর অভ্যর্থনা হতে লাগল। আমেরিকা থেকে প্রত্যাগত প্রায় ত্রিশজন ব্যক্তিকে ভারতে আসামাত্র সোজা মুলতান জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এদের অনেকের কাছে প্রচুর অর্থ ছিল। আমেরিকায় কয়েকবছর ধরে যা উপার্জন করেছিলেন সবই সঙ্গে এনেছিলেন। এ সব টাকা গভর্ণমেন্ট বাজেয়াপ্ত করতে লাগলেন। এরূপ একজনের নিকট থেকে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হয় কালিফোর্নিয়ায় বিপ্লব কেন্দ্রের নাম ছিল যুগান্তর আশ্রম। অনেক শিখ বিপ্লবী তাঁর উপার্জিত অর্থ এই যুগান্তর আশ্রমে দিয়ে এসেছিলেন।

যে সব শিখ এবং অন্যান্য পাঞ্জাবী সরকারের নজর থেকে আত্মরক্ষা করতে পারলেন তারা পাঞ্জাবে এসে দলবদ্ধ হতে লাগলেন। শিখদের ধর্ম মন্দিরগুলির নাম গুরুদ্বার। গুরুদ্বারায় শিখদের পুরোহিতগণ শিখগণেদের বলেন গ্রন্থীজী। এই সব গুরুদ্বারাই বিপ্লব পন্থী শিখদের সম্মেলন কেন্দ্র হল। কিভাবে নবাগত শিখদের দলভুক্ত করা হত সে সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল বলেন, 'একদিন একটি গুরুদ্বারায় বসিয়াছিলাম একজন শিখ আসিয়া খবর দিলেন আজ অমুক অমুককে অমুক গুরুদ্বারায় ঢুকিতে দেখিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিয়া আসিয়াছি। অল্পক্ষণ পরেই দেখি সেই দলের মুখ্য ব্যক্তিগণ আমাদের গুরুদ্বারায় আসিয়া উপস্থিত। অর্থের কথা উঠিলেই তৎক্ষণাৎ তাহারা গোল গোল বড় বড় সোনার চাকতিগুলি আমাদের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। আমেরিকার স্বর্ণমুদ্রাগুলি গুনিয়া দেখা গেল প্রায় সহস্র মুদ্রা। প্রায় প্রত্যেক দলই এরূপ করিয়াছিলেন। বিপ্লব কার্যে অকাতরে স্বীয় উপার্জিত অর্থদান করিতে ইহাদিগকে যেমন দেখিয়াছি বাঙলাদেশে তেমন দেখি নাই।"

যারা আমেরিকা থেকে এই ভাবে এসেছিলেন তারা অধিকাংশই ওখানে কুলি মজুরের কাজ করতেন। এদের মধ্যে যার ত্রিশ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হয় তিনি কালিফোর্নিয়াতে চাষের কাজ করে বেশ ধনী হন। এদের আত্মীয়-স্বজন ভারতে সৈন্যদল ভুক্ত ছিলেন। ভারতে পদার্পণ করেই এরা সেই সব সৈন্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এর আগেই বাঙলার সঙ্গে পাঞ্জাবের সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এদের অনেক গুণ থাকলেও বাঙালীদের মতন এদের সংগঠন শক্তি ছিল না। বাঙলার সঙ্গে সংযোগের পরেই উত্তর ভারতে সুশৃঙ্খলভাবে বিপ্লবের কাজ শুরু হয়। প্রায় সকল সৈন্যাবাসেই বিপ্লবীদলের লোক যাওয়া আসা করত। সীমান্ত প্রদেশের বান্নু থেকে আরম্ভ করে দানাপুর পর্যন্ত কোন সৈন্যাবাস বাদ যায় নাই। প্রায় সকল রেজিমেণ্টেই কথা দেন যে প্রথমে তারা উদ্যোগী হয়ে কিছু করবেন না কিন্তু বিপ্লব আরম্ভ হলে তারা সেই বিপ্লবে যোগ দেবেন। কেবল লাহোর এবং ফিরোজপুরের রেজিমেণ্ট সর্ব প্রথমে বিদ্রোহ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এই শিখ দলের লোক সংখ্যা বড় কম ছিল না কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় ছয় সাত হাজার শিখ ভারতে ফিরে আসেন। কিন্তু ভারতে পদার্পণ করা মাত্রই এদের মধ্যে কিছু লোককে যুদ্ধকালের Ingress Ordinance অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়।

(চলবে)

বন্যা বিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরবঙ্গে মুরশিদাবাদ মালদহ জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গত কিছুকাল পূর্বে প্রবল বন্যা তথাকার মানুষজনকে যে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার নিপতিত হতে বাধ্য করেছিল তা সকলেই জানে। ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা বন্যার কবলে পড়ে জলবন্দী হয়ে, আশ্রয়-চ্যুত হয়ে, অনাহারে অনিদ্রায় সদা সশংকিত চিত্তে কাল কাটাতে বাধ্য হয়—ত্রাণ সামগ্রী ও উদ্ধারের আশায়। উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে ও ত্রাণ সামগ্রী তথায় পাঠাতে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়—সরকারী অব্যবস্থার ফলে। বন্যাপীড়িত মানুষজনেরা দারুণ কষ্ট ভোগ করে, কয়েকদিন পরে অবশ্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের চেষ্টা সফল হয় এবং ত্রাণ সামগ্রী, যথা শুকনা খাদ্য, বস্ত্র, জামা-প্যান্ট ঔষধপত্র, পানীয়-জল ইত্যাদি তথায় পাঠান হয় এবং ত্রাণ কার্য সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু জলের তোড়ে কিছু মানুষ ও গৃহপালিত গবাদি পশু ভেসে গিয়ে প্রাণ হারায়—অতর্কিত বন্যার প্রথম আক্রমণের সময়েই। ঘরবাড়ী বন্যায় অনেক নষ্ট হয়—ফসলের ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর পরিমাণে হয়। ঐ সব এলাকার মানুষ রাতারাতি বিরাট আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুরশিদাবাদ ও মালদহের মানুষ হঠাৎ এই বন্যার প্রকোপে পড়ে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার বাধ্য হয় এবং ঐ দুই জেলার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ধসে পড়ে। বন্যার ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য সারাদেশ-ব্যাপী এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সকলেই সহানুভূতি সহকারে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য তথায় বন্যাপীড়িতের জন্য পাঠাতে তৎপর হয়। ধীরে ধীরে বন্যার জল নেমে যায়, কয়েকদিন পরেই, তখন পেটের অসুখ, আমাশয় ও কলেরা রোগ বন্যার্তদের মধ্যে ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করে—বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় তাহা প্রশমিত হয়ে আসতে থাকে। মানুষ ধীরে ধীরে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার সুযোগ পায় এবং পূর্বতন জীবনে ফিরে আসতে যত্নবান হয়। উত্তরবঙ্গের বন্যা যখন স্তিমিত হয়ে এসেছে—মানুষ কিছুটা উদ্বেগশূন্য হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সবে শুরু করেছে, এমন সময়ে দক্ষিণবঙ্গের তিনটি জেলায়—মেদিনীপুরে, বাঁকুড়ায় ও হুগলীতে প্রবলবেগে এক অভূতপূর্ব সর্বগ্রাসী বিধ্বংসী বন্যা প্রচণ্ড জলরাশির গর্জন নিয়ে নেমে আসে শুক্রবার রাত্রে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে। ঐ জেলাগুলির শত শত গ্রাম রাত্রের অন্ধকারে বন্যার প্লাবনে ভেসে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ চরম বিপদের মুখে অকস্মাৎ নিক্ষিপ্ত হয়, বহুলোক ও গৃহপালিত জীবজন্তু জলের তোড়ে ভেসে গিয়ে প্রাণ হারায়। চারিদিকে হাহাকার ও মর্মভেদী কান্নার রোল ওঠে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে। মানুষ অসহায়ভাবে আশ্রয়ের আশায় দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে চারিধারে আশপাশের বড় ও দ্বিতল বা ত্রিতল বাড়ীর অথবা বড় বৃক্ষ ছুটের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে—কি ভয়াবহ ও বিপন্ন অবস্থা ভাবলেও আতঙ্কে গা শিউরে ওঠে। কত শত প্রাণ যে বন্যার কবলে পড়ে বিনষ্ট হয়েছে তা কে জানে। মেদিনীপুর শহর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে জলে ভাসে—যেন এক দ্বীপ তখন ঐ শহরটি। ঘাটাল শহর তখন প্রায় ছয় সাত ফুট জলের নীচে ডুবে যায়। একে প্রকৃতির রোষে গত দশ এগার দিন বাঁকুড়ায় ও মেদিনীপুরে প্রচণ্ড জল-বৃষ্টি হয়, তার উপর আবার ডি, ভি, সি কর্তৃপক্ষ প্রায় একলক্ষ কিউসেক জল ছাড়ে মাইথন ড্যাম বাঁচাতে ও পাঞ্চেৎ ড্যাম বাঁচাতে তা ছাড়া কাঁসাই-বতীর জল ছাড়া হয়েছে ঐ একই সময়ে। ফলে বাঁকুড়ায়, মেদিনীপুরে ও হুগলী জেলাগুলির এবং পরে হাওড়ার অর্থাৎ নিম্নদামোদর এলাকাগুলির জলমগ্ন হওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ান্তর ছিল না এবং বাঁকুড়া, মেদিনীপুর,

হুগলী ও হাওড়া জেলার তলায় ডুবে যায়, আরামবাগও জলের তলায়। প্রাণ হাতে মুষ্টি জল আরামবাগ শহরের উপরে আর তথাকার মানুষ বাড়ীর ছাদে, গাছের উপরে উঠে প্রাণ বাঁচাবার জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টায় রত হয়। ভরসা যদি প্রাণে বাঁচেন, তবে হয়ত ত্রাণ ও উদ্ধারের ব্যবস্থা সরকার ও অন্যান্যরা নিশ্চয় করবেন। ডেবরা, ঘাসপুর ঘাটাল সবচেয়ে বেশী প্লাবিত ও বিপদে মরো ভালমান হয়। বাঁকুড়ায়, মেদিনীপুরে ও হুগলীতে তথাকার নদী-গুলি ফুলে ফুঁসে গর্জন করে পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি জলমগ্ন করে। সে কি ভয়ানক ও বিধ্বংসরূপ তা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া কেউ ধারণাই করতে পারবে না। বন্যার করাল গ্রাসে উক্ত জেলাগুলির বিরাট এলাকা জলমগ্ন মানুষজন কিং-কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাসমানকে ভাসতে থাকে। পরিত্রাণের কোন পথই তারা খুঁজে ঠাওর করতে পারে না। শীলাবতী, কাসাবতী ও দারকেশ্বর এই তিনটি নদনদী তখন ফুলে-ফেঁপে বিরাট আকার ধারণ করে ধেয়ে আসে ঘাটালের আশেপাশে ভয়ঙ্কর বেগে। আরামবাগ মহকুমার ৪টা ব্লক ও ঐ শহরের ৮নং ওয়ার্ড জলের তলায়—দারকেশ্বরের কত্র রোষে। সোনাখুরি, ইন্দাস, পাত্র-সায়ের, গুন্দা তাল-ডাংরা, সিমলাপাল এবং বিষ্ণুপুর থানা এলাকাগুলিও জলমগ্ন। সেখানের লোকেরা জলবন্দী—চরম বিপন্ন।

যথা সময়ে রাজ্য-সরকার ত্রাণ সামগ্রী উক্ত এলাকায় পাঠাতে না পারলেও বেসরকারী ত্রাণ ব্যবস্থা ও ত্রাণ সামগ্রী পাঠান শুরু হয়ে যায় রামকৃষ্ণ মিশন, ভারতসেবাশ্রম সংঘ ভারতীয় রেডক্রস্, কেয়ার, কাসা প্রভৃতি স্বদেশী ও বিদেশী সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি এবং সামরিক বাহিনী আর্ত-ত্রাণের কাজে বন্যা পীড়িত এলাকায় হাজির হয়। শুকনা খাদ্য, রান্না করা খাদ্য, বস্ত্র জামা, প্যান্ট, ত্রিপল, পলিথিলিন সিট, ঔষধপত্র, প্রতিষেধক দ্রব্য সামগ্রী, পানীয় জল বিশুদ্ধ রাখার ব্যবস্থাদিসহ এই সব বেসরকারী সংস্থা ও সামরিক-বাহিনী তথায় বন্যা-কবলিত মানুষদের রক্ষা করার জন্য সেবা ও উদ্ধার কাজে তৎপরতার সঙ্গে নেমে পড়ে। সরকার তখনও এই বন্যার ভয়াবহতা ও বিরাট ব্যাপকতার সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিবহাল নন; বরং সংবাদপত্রের পাতায় সে সময় বেশী বেশী করে বন্যা সম্বন্ধে লেখা হচ্ছে বলে বেশ বিরক্ত ও সংবাদ-সংস্থাগুলি অভিযোজিত—উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই বন্যার কথা লিখছে কেবল সরকারকে অপদস্থ করার দুরভিসন্ধিতে—এ ষড়যন্ত্র ও সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয় বলে প্রচার আরম্ভ হয়। রাজ্য সরকার তখনও জানতেন না সংবাদগুলি নিষ্ঠুর সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠ এবং একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই তাদের এই মিথ্যা ও অহেতুক সন্দেহ দেশবাসীর মনে কোন রেখাপাত করে না। সংবাদ সংস্থাগুলি ঐ নিদারুণ বিপদের সঠিকতথ্য যদি না সে সময়ে সরবরাহ করে জন-গনকে সচেতন করে দিতেন, তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী হত; কারণ সংবাদপত্রের যথাযোগ্য ভূমিকার ফলে সাধারণ মানুষ দলে দলে তাদের নিজ নিজ ক্লাব ও সংস্থার নামে বন্যা ত্রাণের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করে তাহা নিষ্ঠার সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় বন্যা কবলিত এলাকায় পাঠায়। রাজ্য সরকারের সাহায্যের চেয়ে যে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা পরিমাণেও অনেক বেশী এবং সময়োপযোগী, এ কথা বেশ জোর দিয়ে বলা যায় এবং বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার মানুষজন এখন এই কথাই সমর্থন করে বলে "দেশের সরকার যখন বন্যা নিয়ে রাজনীতিতে মেতেছেন, তখন কিন্তু দেশের আপামর জনসাধারণ বন্যার্তদের উদ্ধার করতে, রক্ষা করতে, খাদ্য দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে, বস্ত্র দিয়ে লজ্জা নিবারণে, প্রতিষেধক দিয়ে রোগাক্রমণ রোধে ও সর্বোপরি বন্যাপিড়িতদের পাশে এসে বল, ভরসা, সাহস দিয়ে এক আদর্শ প্রতিবেশীর ভূমিকা কি হতে পারে তা দেখিয়েছে এবং কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে।" মহান দেশের মহান জনগণ মুহুর্মুহু রোগানের বদলে আজ বিস্তীর্ণ কাজ করে দেখিয়েছি বিপন্ন মানবতার উদ্ধারে রাজনীতি—নিষ্প্রয়োজন, মনুষ্যত্বই কার্যকর ও মনুষ্যত্বের অধিকারীরাই সর্বদেশে সর্বকালে নমস্য। দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্যদানে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে বন্যার্ত মানুষেরা হতাশা কাটিয়ে ওঠে এবং বাঁচার তাগিদে পরস্পরকে সাহস ও সান্ত্বনা দেয়।

(চলবে)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৮৯৪—১৮৯৬

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

১৮৯৪ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় মাদ্রাজে। আমরা একটি ষীমার ভাড়া করলাম এবং ষীমারে আমরা বাঙ্গালী ডেলিগেটগণ এক সঙ্গে মাদ্রাজ রওনা হলাম। এই ষীমারে ভ্রমণটি খুব কাজে লেগেছিল। কারণ, ডেলিগেটদের সব একত্রে কয়েকদিন ধরে জাহাজে থাকতে হয়েছে। একত্র থাকার ফলে জীবনে সম-স্বার্থ-বোধ ও চিন্তা ভাবনার ঐক্য স্থাপনে তো তা সহায়তা করেইছে, তা ছাড়া বন্ধুভাবে কোন আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতির ধার না ধরে সহজ সরল মনোভাব নিয়ে জাতীয় সমস্যাগুলির উপর আলোচনারও সুযোগ দিয়েছে। রীতি-পদ্ধতি বা নিয়ম-কানুনের অনুসরণ করে কোন কিছুর আলোচনা অপেক্ষা এইভাবে আলোচনার দ্বার দিয়ে সমাধানের সূত্র আবিষ্কার করতে পারলে তা অনেক ক্ষেত্রেই অধিকতর কার্যকর হয়। যথোচা আলোচনা ততটা বিরক্তিকরও নয়।

সেই জাহাজের মধ্যে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। সিদ্ধান্তটি ছিল আমাদের প্রাদেশিক সম্মেলনগুলির ব্যবস্থাপনার সম্পর্কে সম্মেলনগুলি কংগ্রেস সংগঠনেরই এক অঙ্গীকৃত বিষয় ছাড়া আর কিছু নয়। এই রকম একটি প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মন্তব্য করে বলেছিলেন যে প্রাদেশিক সম্মেলনগুলি কোন বৃহৎ নদীর উপনদীর মত, যেগুলি প্রবাহিত হয়ে কংগ্রেসের আন্দোলনকে স্ফীত করে বিরাট আকার দান করেছে। এ যাবৎ কাল আমাদের প্রাদেশিক সম্মেলনগুলি কলকাতাতেই অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু এই প্রাসে যেন কতকটা নিয়মের দাঁড়িয়ে ছিল এবং মনে হত যেন তা বেশী শক্তি অর্জন করতে বা প্রসারিত হতে পারছে না। আমরা সিদ্ধান্ত করলাম, এই নিয়মের পরিবর্তন করতে হবে। স্থির করলাম, যে প্রাদেশিক সম্মেলনের স্থান বছর বছর পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং বিভিন্ন সময়ে মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থানে প্রাদেশিক সম্মেলন ডাকা হবে। কংগ্রেসের নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে প্রচার কার্য চালানোর যে নীতি আছে সেই নীতিকে কার্যকরীরূপে জাগিয়ে তুলতে হবে বলে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। বহরমপুরের বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন ডেলিগেটরূপে জাহাজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ১৮৯৫ সালে বহরমপুরে সম্মেলন করতে রাজি হলেন। এই পরিবর্তন আমাদের আন্দোলনকে এক নতুন উদ্দীপনা দান করল। বহরমপুরের এই সম্মেলনই মফঃস্বল সহরে প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলন। সম্মেলন খুবই সাফল্য মণ্ডিত হয়। সেই থেকে বিভিন্ন সময়ে মফঃস্বলে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং প্রতিবারই অধিকতর ভাবে সাফল্য মণ্ডিত হচ্ছে। এ কথা ইতিপূর্বে ও আমার স্মৃতি চারণের এক জায়গায় বলেছি যে প্রাদেশিক সম্মেলনে যে বিপুল জনসমাবেশ ও উৎসাহ দেখা যেত তাতেই কংগ্রেস অধিবেশনকালের বিশাল জন-সমাবেশের রূপটি ধরা পড়ত।

১৮৯৪ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন মিঃ ওয়েব। তিনি জাতিতে ছিলেন আইরিস এবং পার্লিয়া-মেন্টের একজন সদস্য ছিলেন। আমার মনে হয় মিঃ ডব্লু. সি. বানার্জি মিঃ ওয়েবকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করাটা সমর্থন করেননি। আরও অনেকের মতই তাঁরও অভিমত ছিল যে খুব বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সময়ে একজন ভারতীয়েরই কংগ্রেস সভাপতি হওয়া উচিত।

কংগ্রেসে আমি সিভিল সার্ভিস্ সংক্রান্ত প্রশ্নের উপরে আমার প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করলাম। কংগ্রেসের মধ্যে আমার একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে দুটি প্রশ্ন সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বেশী আগ্রহ বোধ করতাম সে

দুটি প্রশ্ন নিয়ে লেগে থাকা। এই প্রশ্ন দুটি হল, সরকারী চাকরীর উচ্চতর ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের নিয়োগ এবং জনগণের প্রতিনিধিগণের দ্বারা সংস্থাসমূহ গড়ে তোলা। আমার মনে হত যে ভারতের অন্য সমস্ত সমস্যারই মূলে রয়েছে প্রধানতঃ এই দুটি সমস্যা, এবং এই সমস্যার যদি সন্তোষজনক সমাধান হয়ে যায়, তা হলে অন্য সব সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের যদি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়, যদি আর্থিক বিধি-ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং আমাদের প্রতিনিধিগণের দ্বারা নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী, প্রশাসনিক কার্য্য পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে আমরা প্রকৃত অর্থেই স্বায়ত্তশাসন লাভ করব এবং আমাদের শক্তি সামর্থ্যকে বাড়িয়ে তোলার ও জগতের জাতিসমূহের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত স্থান লাভ করার যথেষ্ট সুযোগ পাব। আমাদের লক্ষ্য এ নয় যে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে নিজেদের জন্য ক্ষমতা চাচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সর্বনিয়ন্তা, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমাদের জন্য যে উচ্চ ভাগ্য বিধান করে রেখেছেন সেই ভাগ্যকে জয় করা।

মাদ্রাজে এক ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা করার জন্য আমকে আমন্ত্রণ জানান হয়। আমি সানন্দে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল "ছাত্রদের রাজনীতি চর্চা করা অথবা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা উচিত কি না", সাম্প্রতিক কালের ঘটনা প্রবাহে এই বিষয়টি বেশ গুরুত্ব লাভ করেছে। বিষয়টি নিয়ে বেশ উত্তেজিত আলোচনার সৃষ্টি হয়। এই আলোচনায় পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ও মিঃ খাপার্দে অংশ গ্রহণ করেন। তারা দুজনেই তখন আমার বিরোধিতা করেন. মিঃ খাপার্দে তখন যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, তার পরবর্তী কালের উক্তিগুলির আলোতে বিচার করলে, তা অসঙ্গত বলেই মনে হয়। আমি এই অভিমত ব্যক্ত করি যে ছাত্ররা অবশ্যই রাজনীতি চর্চা করবে, এমনকি উপযুক্ত নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনার অধীনে রাজনৈতিক কাজেও অংশ গ্রহণ করতে পারবে। আমি তখন যে অভিমত ব্যক্ত করেছি, সে অভিমতকে আকড়ে ধরেই চলেছি এবং সারা জীবনে আমার সেই বিশ্বাস ক্রমে আরও শক্তি অর্জন করেছে। আমার এই অভিমতের কখনই কোন নড়চড় হয়নি। এমন কি উচ্চ সরকারী মহলে এবং খ্যাত নাম রাজনৈতিক নেতাদের তীব্র আক্রমনের মুখেও আমি আমার বিশ্বাসে অবিচল ছিলাম। আমি আনন্দ এবং গর্বের সহিত লক্ষ্য করেছি যে যারা তখন আমার বিরোধী সুর গেয়েছেন তাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি পরে আমার মতেই মত দিয়েছেন। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা কালে আমাকে সেই প্রতিষ্ঠানে যোগ দানের জন্য আহ্বান জানান হয়। সেই প্রতিষ্ঠানের প্রথম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠানের সময় প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বর্গত মিঃ উইলসন আমাকে আমন্ত্রণ জানান বার্ষিক বিবরণ গ্রহনের প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে বলেন। আমি বললাম, আমি সানন্দে তা করতে রাজি আছি; কিন্তু একটি সর্তে এবং সেই সর্তটি হল এই যে ছাত্রদের এই ইনষ্টিটিউটে রাজনীতি চর্চা করতে দিতে হবে। আমার এই শর্তের কথা স্যার চার্লস ইলিয়টের কাছে উপস্থাপিত করা হল। তিনি তা নাকচ করে দিলেন, ফলে এই প্রস্তাবটি আমি আর উত্থাপন করলাম না। শুধু তাই নয়; আমি ইনষ্টিটিউটে যোগদানই করলাম না। ইনষ্টিটিউট রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনায় উৎসাহ দিতে চায় না, অথচ মিঃ রিজলে ও মিঃ কার্লিং এর মত উচ্চ রাজ কর্মচারীরা ইনষ্টিটিউটের মঞ্চ থেকে ভারতীয় প্রশাসনিক ও স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কীয় বড় বড় প্রশ্নের উপর নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

(চলবে)

(Contd. from 2nd Cover)

Name	Address	Amount Rs.	Date
Santra (alias Das) Smt. Kalyani w/o Late Sarbeswar Santra (Das)	Vill Bhisindipur, P.O. Kheloa	100	15. 8. 72
	Dt—BIRBHUM		
Dass Smt. Anandamoyee w/o Late Purnendu Narayan Das	P.O. & Vill Jojigram	100	1. 10. 76
	Dist—PURULIA		
Deogharia Smt. Charubala w/o Late Khandu Deogharia	Vill Arita, P. O. Kuskter P. S. Purulia	150	15. 11. 77
	Dist—MURSHIDABAD		
Majumdar Smt. Manika w/o Late Ramapada Majumdar	159, Bon Behari Sen Road P.O. Berhampur	200	12. 9. 77
	Dist—WEST DINAJPUR		
Chakraborty Smt. Shefali w/o Late Birendra Chakraborty	Sudarshanpur P. S. Raiganj	100	13. 8. 74
	Dist—DARJEELING		
Chakraborty Bibhuti & ,, Smt. Lila	Vidyasagar Palli P. O. Siliguri	400 (arrears due from 15. 8. 72)	1. 10. 76
	Dist—JALPAIGURI		
Bhattacharjee Nitya Ranjan C/o Bharat Chitralaya	New Town (Hathkhola)	200	15. 8. 72
Sarkar Smt. Bina w/o Late Sachindra Mohan Sarkar	New Town, P. S. Kotwali	100	4. 9. 78

RgedNo. R. N .24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—পঞ্চাশ ১৫।০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

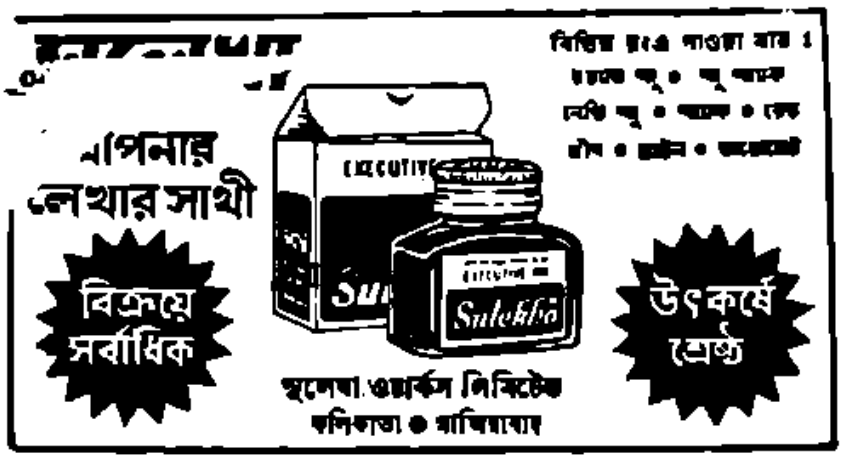

6 DEC 1973

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীঅমরীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী, শ্রীবারীশ রায়।
সম্পাদক—শ্রীশান্তি শরণ রায়চৌধুরী
বিহার বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতালা—শ্রীনন্দগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীবীরেন গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বন্ধুদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

বিপ্লবী বাঙালী

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭১

অষ্টম বর্ষ	শনিবার, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৭৮	১২ সংখ্যা

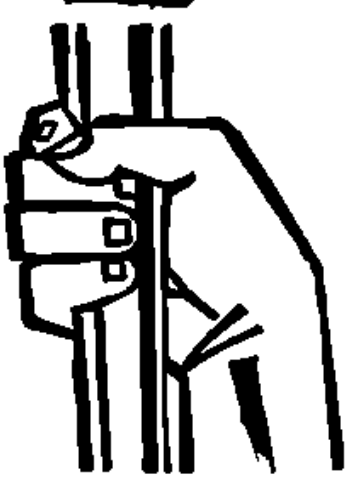

এই সংখ্যায়

বাঘা যতীন

। সম্পাদকীয়

৮ই ডিসেম্বর স্মরণে

। প্রবোধ চন্দ্র দাস ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। গৌরাঙ্গ দত্ত ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক মসিহী মোহন দাশগুপ্ত ।

বন্যা বিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গ

। ধনীরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ।

"পরের উপকার করিয়া কিছু প্রত্যাশা করিবে না, প্রশংসারও আশা রাখিবে না। নিঃস্বার্থ ভাবে নিজেকে বিলাইয়া দিবে।

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাঘা যতীন

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতবর্ষে মুক্তি-গঙ্গার প্রবাহ আনয়ন করবার জন্য ভগীরথের মত যে মুক্তি সাধকেরা তপস্যায় ও সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন, বাঘা যতীন ছিলেন সেই অগ্রপথিকদলের অন্যতম প্রধান প্রাণপুরুষ। তাঁদের কার্যকলাপের জন্য একদিকে যেমন ইংরেজ শাসনের ভিত্তি শিথিল হয়েছিল, অন্যদিকে অত্যাচারিত মানুষের মনে জাগিয়েছিল আসা ভরসা, সৃষ্টি করেছিল তাদের মধ্যে স্বাদেশিকতা, অনন্য মনোবল ও চরম আত্মত্যাগের সঙ্কল্প। বিশেষ করে যুবকদের অনুপ্রাণিত করেছিল "মন্ত্রের সাধন" কিম্বা শরীর পতন" মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নিরাশার ঘনে আশার হাসি ফোটাবার জন্য। তাই এই সব অগ্রপথিকেরা আজও জাতির নমস্য ও শ্রদ্ধেয়।

ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের মূলে আছে স্বামী বিবেকানন্দের অসীম প্রেরণা। সঙ্গে সঙ্গে নির্ভয়ে এগিয়ে চলার পথে যারা আলোকবর্তিকা জ্বেলে রাখেন, তাঁদের মধ্যে পুরোধা ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, রাসবিহারী বসু, বাঘা যতীন। ১৯১৫ সালে সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা করেন রাসবিহারী ও বাঘা যতীন। জাতির দুর্ভাগ্যক্রমে মীরজাফর, জগৎ শেঠ, উমিচাঁদের বংশধররা সক্রিয় ছিল এবং বিশ্বাস ঘাতকতার দ্বারা সেই মহতী প্রচেষ্টাকে সাময়িকভাবে ব্যর্থ করে দেয়। কিন্তু ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের কোন শুভকর্মই কখনও চিরতরে ব্যর্থ হয় না। যে বিপ্লবের বীজ বপন করেছিলেন বিপ্লবীরা, যাঁদের মধ্যে বাঘা যতীনের স্থান ছিল অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কালের প্রবাহ পথে তা দিনে দিনে ক্রমবর্দ্ধমান হয়েছিল। সুতরাং এ সত্য অনস্বীকার্য। বাঘা যতীন ও তাঁর সতীর্থদের বিপ্লব সাধনা কখনও ব্যর্থ হয় নি, হতে পারে না।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের যে পরিকল্পনা করা হয়, তারই অন্যতম পথিকৃৎ মহানায়ক বাঘা যতীন। ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর "নবভারতের হলদি ঘাট" বালেশ্বরের বুড়ি বালামের তীরে রাইফেলধারী ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক যুদ্ধে আত্মাহুতি দিলেন বাঘা যতীন ও তাঁর

চারজন সতীর্থ। এই তাৎপর্যপূর্ণ পরিকল্পনা ও পরিশেষে তাঁদের এই আত্মদানের ঘটনা, বিপ্লবী বাংলা, তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

উপনিষদে কথিত আছে সৃষ্টির মূলে আছে আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। যাঘা যতীনের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তিনি তাঁর সতীর্থদের মধ্যে বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জিবীত করেছেন বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীকে। নিজেকে অকৃপণভাবে দান করতে না পারলে এ কখনও সম্ভবপর হত না। এই যে আত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি। এ দেবী শক্তি। এই শক্তির মহিমা কখনও জরাগ্রস্ত হবে না। যুগে যুগে পৃথিবীর মানুষের মনে নতুনভাবে প্রেরণা যোগাবে। যতীন্দ্রনাথ দেশ কাল অতিক্রম করে বিশ্বের ও নিরবধিকালের কপালে ভাস্বর ও সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

আমি যতীন্দ্রনাথের জন্মদিনে (৮ই ডিসেম্বর) দেশবাসীর সঙ্গে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

সারাবাংলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মেলন

নেতাজী সুভাষ ইন্‌স্টীটিউট

(শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকট)

বন্ধুগণ,

আগামী ১২ই ডিসেম্বর '৭৮ মঙ্গলবার বেলা ৩টায় প: বঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটি সম্মেলন হইবে। বন্যার জন্য পূর্ব্ব ঘোষিত গত ২৩শে অক্টোবর সম্মেলন হইতে পারে নাই।

বর্ত্তমান সংকটজনক পরিস্থিতীতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য প্রত্যেক স্বাধীনতা সংগ্রামীকে উক্ত সম্মেলনে যোগদান করতে আহ্বান জানান হইতেছে।

প্রত্যেক জেলা, থানা ও মহকুমা থেকে কতজন ডেলিগেট যোগদান করিতে ইচ্ছুক ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে জানাইতে হইবে। ডেলিগেট ফি ৫ টাকা। অফিসের ঠিকানায় ডেলিগেট ফি পাঠাইতে হইবে। দূরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের থাওয়া থাকার বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

সম্মেলনের আহ্বায়ক কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে—

জগদীশ চট্টোপাধ্যায় মলয় ব্রহ্মচারী

দীনেশ চন্দ্র দাস ধীরেন্দ্র ভৌমিক

হরেন্দ্র কুমার ধর।

যোগাযোগের ঠিকানা ৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭

ফোন—৩৪-১৭৯৫

বন্যা বিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীবংশীবদন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এরপর ২৬শে সেপ্টেম্বর রাত্রে ও ২৭শে সেপ্টেম্বর দিনমানে রূপনারায়ণের বাঁধ ভেঙে, মযূরাক্ষীর বাঁধ ভেঙে, দ্বারেশ্বরের বাঁধ ভেঙে, হিজলী ড্যাম ভেঙে, ডিভিসাডা ব্যারাজ ছাপিয়ে, অজয়ের প্রবল জল প্লাবনে, গঙ্গার জল-স্ফিতিতে, ভাগীরথীর জল-স্ফিতিতে, ময়ূরাক্ষীর জল-স্ফিতিতে, কাঁসাইয়ের জল-স্ফিতিতে, নদনদীর উৎস মুখে প্রবল বারিবর্ষণে ও প্রায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে নাগাড় তিন দিনের অবিরাম জল-ঝড়ে ১৬ (ষোলটি) জেলার মধ্যে ১২ (বারটি) জেলা বিপুল জলরাশির তলে নিমজ্জিত হলো, অর্থাৎ পূর্বেকার বন্যা কবলিত এলাকাগুলি ও পুনরায় প্রলয়ঙ্কর বন্যায় ভাসলোই, উপরোক্ত অন্যান্য জেলাগুলিও নূতন করে বন্যাপ্লাবিত হলো—যথা :—নদীয়া, বীরভূম, চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, হাওড়া বর্ধমান ইত্যাদি, এবং এবারেরও ন্যায় প্রায় দেড় কোটি মানুষ বন্যা কবলিত হলো, প্রায় দুই লক্ষ গবাদি পশু বন্যার তোড়ে প্রাণ হারাল, চাষের জমিগুলি ফসল সমেত পুরু বালির আস্তরণে ঢাকা পড়ে দারুণ খাদ্যাভাবের সৃষ্টি করলো, মাটির বাড়ী যেখানে যা ছিল ধূলিসাৎ হলো, বহু মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হলো সুজলা-সুফলা বাংলা শ্মশানে ও মরুভূমিতে পরিণত হলো এবং এই চরম ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙে পড়লো। এই অভূতপূর্ব ভয়ঙ্কর ও ব্যাপক ক্ষতিকারক বন্যা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে যে বিপর্যয়ের মধ্যে হঠাৎ নিপতিত করলো, তার বিভিন্ন সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য—বিশেষ করে ভবিষ্যৎ বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার মানসে ও আশার ঘর শীঘ্র সম্ভব একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা, রচনা ও তাহা কার্যে রূপায়িত করা যে একান্ত প্রয়োজন, সে কথা সকলেই স্বীকার করবেন। দেবতার বা প্রকৃতির রুদ্ররোষে ও মানুষের ক্ষমাহীন দোষে যে প্রলয়ঙ্কর বিধ্বংসী বন্যা পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে কান্নার রোল তুলে হাহাকারে দেশকে চরম বিপদগ্রস্ত ও আর্থিক ক্ষেত্রে নিঃস্ব করে ছাড়লো, তার প্রতিকারের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা যদি এখনই না গ্রহণ করা হয়, তবে পশ্চিমবাংলার ভবিষ্যৎ চির অন্ধকারে বিলুপ্ত হবে। এখন জল রহ জায়গায় নেমে গেছে, কিন্তু কোথাও একফুট, দেড়ফুট বা দু'ফুট কোথাও তিন-চার ফুট বালির আস্তরণ জমির উপর রয়ে গেছে। সেই বালির স্তূপ জমি থেকে সরিয়ে দিতে না পারলে, সে জমির চাষবাস ফসলের কাজে লাগান অসম্ভব; ফলে দেশে খাদ্যাভাব বাড়বে এবং চাষীও কৃষি শ্রমিকরা হাতে কোনও অর্থকরী কাজ পাবে না। বালির পাহাড় সরান বুলডোজার ছাড়া সম্ভব নয়, আর সেই বুলডোজার সাধারণের আয়ত্বে নেই, আছে রাজা-সরকারের কর্তৃত্বাধীনে। কাজেই সরকারকে এ কাজে দ্রুত এগিয়ে এসে দায়িত্ব নিয়ে বালিস্তূপ বুলডোজার দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বন্যা বিধ্বস্ত জমিগুলি উদ্ধার করে চাষের উপযোগী করে দিতে হবে এবং তা যত শীঘ্র সম্ভব ততই মঙ্গল। কিন্তু দুঃখের কথা এ ব্যাপারে সরকারকে এখনও দায়িত্ব নিতে দেখা যাচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী পল্লী অঞ্চলে একাধিক সভায় ভাষণ দিয়ে, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত ও ভুল তথ্যের মাধ্যমে তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলেছেন। সি, পি, এম বিভিন্ন জায়গায় দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে জনগণকে বুঝাতে চাইছে যে পশ্চিমবঙ্গের পুনর্গঠন ও বন্যার্তদের পুনর্বাসন ইত্যাদি কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের করা উচিত অর্থাৎ রাজ্য-সরকারের দায়-দায়িত্ব এ বিষয়ে যেন কিছুই নেই। এই মিথ্যা প্রচার জনমনে রাজ্য সরকারের সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি করে চলেছে—তা কি সি, পি, এম নেতারা জানতে পারছেন না—না জেনে-শুনেও চুপ করে আছেন? ভুল ও আজগুবি প্রচারে ক্যাডাররা শান্ত থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষ এ চালাকি ধরে ফেলেছে। তাদের বক্তব্য

বাসে, ট্রামে, ট্রেনে বেশ লম্বর এবং তা হচ্ছে যে আর কতদিন ধাপ্পা ও ধোঁকাবাজীর রাজনীতি চলবে? বোধহয় ওদের দিন শেষ হয়ে এসেছে, ওরা এখন প্রশাসন ছেড়ে পালিয়ে আসতে পারলে হাঁপ ফেলে বাঁচে—এমনই সঙ্গীন অবস্থা। তাই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অনবরত মিথ্যা অভিযোগ ও কেন্দ্রের সব দায়দায়িত্ব বলে মিথ্যা প্রচার, যেন রাজ্য-সরকারের ফর্ক হয়ে থাকা ছাড়া কোন কিছুই করণীয় নেই?" পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে সি. পি. এম তথা বামফ্রন্ট কেবল কেন্দ্রীয় নেতাদের ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অবিরত মিথ্যা ও কাল্পনিক অভিযোগ তুলে নিছেরা রাজনীতি করে চলেছে এবং ভাবছে সবাই বোকা আর ওরাই চালাক। অতি বুদ্ধির নাকে যে দড়ি পড়ে সে কথা কি ওরা বোঝে না? সবাই এদের অহেতুক, উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যা প্রচারের কারণগুলি বুঝেছে—তাই সি. পি. এমকে সবাই এখন চরম ধিক্কার দিচ্ছে, তা কি ওরা জানে না? কি নির্লজ্জ ওদের আচার ও আচরণ? বন্যার্তদের ত্রাণ সামগ্রী পাঠাতে লরী ও গাড়ীতে এরা দলীয় পতাকা লাগাতে লজ্জা বোধ করে নি। সাধারণ মানুষের দেওয়া ত্রাণ সামগ্রী কেড়ে নিয়ে দলীয় নামে তাদের প্রচার করা হয়। সব ব্যাপারেই এরা দলীয় প্রাধান্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়। সরকারী ত্রাণ সামগ্রী সি. পি. এম বিলি করে কেবল নিজ দলের লোকেদের মধ্যে, কোন সাহসে? বন্যায় এরা যে হীন দলবাজী, মিথ্যা প্রচার ও অন্য দলের বা নিরপেক্ষ লোকেদের দেওয়া ত্রাণ-সামগ্রী, সি. পি. এম-এর দেওয়া বলে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অপদস্থ হয়েছে তা আজ আর কারো অজানা নেই। জনে মানুষজন ও শরিকদলের এম. এল. এরা পর্যন্ত সি. পি. এম-এর ওপর আস্থা হারিয়েছে। বন্যায় সি. পি. এম ও তার স্তাবকবাহক রাজ্যকে অডিনেশন কমিটির মুখোস খুলে দিয়েছে। ওদের বাক্-চাতুরী ও মিথ্যা প্রচার এখন আর কোন কাজে লাগছে না। বন্যায় ওদের বেসব নক্কারজনক কার্য পদ্ধতি সরকার বিরোধী ও আর. এস. পি সদস্যদের মাধ্যমে এখন বিধান-সভায় কিছু কিছু প্রকাশ পাচ্ছে তা সত্যই লজ্জাকর ও অগণতান্ত্রিক। অথচ সরকার গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে দিনের পরদিন কেবল দলবাজী আর ছল সৃষ্টি করে চলেছে বেপরোয়া ভাবে। ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দলের সুপারিশের উপর উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটির রিপোর্ট-এর ভিত্তিতে কেন্দ্রীয়-সরকার রাজ্য-সরকারকে নগদে ও জিনিষপত্রে মিলিয়ে ১১৯ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এর মধ্যে ৮৮ কোটি ৯৩ টাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকা-বিলা করার জন্য ও ১৫ কোটি টাকা কৃষি সরঞ্জাম বাবদ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ১৩ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা দামের ২৫ হাজার ৫০০ টন খাদ্যশস্য ও ডাল ও 'কাজের বদলে খাদ্য' প্রকল্প অনুযায়ী ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দামের ১ লক্ষ টন গম এবং ৩৭ লক্ষ টাকা দামের ঔষধপত্রও কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্যন্ত (২২শে নভেম্বর তক) পশ্চিম-বঙ্গে পাঠিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে বন্যার শুরুতেই ১৮ লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ব্যাঙ্কগুলিকেও তখন নির্দেশ দিয়েছিলেন ত্রাণ কাজে রাজ্য-সরকারকে সবরকম সাহায্য করার জন্য আর বন্যাত্রাণের প্রথম মুখে এই সাহায্য যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছিল। তবুও রাজ্য-সরকারের অর্থমন্ত্রী কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বহু মিথ্যা ও ভুল তথ্য দিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন কেন? তাহা বোধগম্য নয়। মুখ্যমন্ত্রীও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বহু অযথা ও অসংলগ্ন এবং ভুল তথ্য দিয়ে যে বক্তৃতা করেছেন তা মোরারজী দেশাইয়ের ২২শে নভেম্বর তারিখের সংসদীয় ভাষণে প্রকাশ পায়। কেন্দ্রের কাছে যে এত বেশী সাহায্য শুরু থেকেই রাজ্য-সরকার পেয়ে এসেছেন এবং শেষ পর্যন্ত আরো অনেক বেশী পাবেন তাহা সুনিশ্চিত, কিন্তু কেন্দ্র এইসব টাকার সদ্ব্যবহারের ও ন্যায়সঙ্গত খরচের সঠিক হিসাব না পাওয়া পর্যন্ত কি করে আরো টাকা বা খাদ্যশস্য বা ঔষধপত্র এখনই পাঠাতে ভরসা পান? টাকা তো আর কোন মন্ত্রীর নয়—টাকা ভারতবাসীর, তাই হিসাব না দিয়ে টাকা পাওয়া যতই মুস্কিল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী যতই বিষোদ্গার করুন না কেন, মোরারজীভাই বড় অভিজ্ঞ প্রশাসক ও খুবই হিসাবী লোক: তাই হিসাব ঠিক ঠিক না পাওয়া পর্যন্ত তিনি এখনই আর টাকা

ছাড়বেন না বলেই মনে হয়। বন্যা সমীক্ষার দ্বিতীয়বার পুনরায় কেন্দ্রীয় দল আসছে তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে যোগ্যতানুযায়ী চিন্তা-ভাবনা করে দেখবেন এবং প্রয়োজন-বোধে যত টাকা দরকার হবে তত টাকাই দেবেন। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারের ওপর নির্ভর ও বিশ্বাস রাখতে পারছে না বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করছেন এবং তাঁরা জনতাদলের সমর্থক বলেই জানা গেছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন সর্বাগ্রে গ্রামগুলির পুনর্গঠন ও গ্রামবাসী-দের পুনর্বাসন একান্ত প্রয়োজন এবং এই ব্যাপারে বিদেশী ও স্বদেশী সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে গ্রামে গ্রামে প্রায় ৪০০০ (চার হাজার) থেকে ৪৫০০ (সাড়ে চার হাজার) টাকার বাবে এক একটি বাড়ী নির্মাণের জন্য সরকারের বা গ্রামবাসীদের কাছেরই খরচ যোগাতে হবে না, সব খরচ উক্ত সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেরাই বহন করবে বলে ঘোষণা করেছিল এবং এই কার্যে প্রায় ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে মোটামুটি স্থির হয়েছিল। তবুও সরকার যে কেন উক্ত সেবা প্রতিষ্ঠানগুলিকে উক্ত শুভ কর্ম করিতে দিতে নারাজ তাহা চিন্তার বিষয়। কাসা, কল্যাণ, রামকৃষ্ণ মিশন ভারতসেবাশ্রম সংঘ ও অন্যান্য মিশনারি সংস্থাগুলি এবং ভারতীয় রেডক্রস যে দ্রুততার সঙ্গে ক্ষিপ্রগতিতে বন্যার্তদের উদ্ধারে, রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থায় ও ধন্যাত্রাণে অসম-সাহসিকতার সঙ্গে বন্যারম্ভেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তা সত্যই অভূতপূর্ব ও প্রশংসার প্রকৃষ্ট দাবী রাখে। সে আংশার সরকারের ভূমিকা সমালোচনার ঊর্দ্ধে বলা চলে না। সি, পি, এম দলের ভূমিকাও ত্রুটি মুক্ত নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে হতাশাব্যঞ্জক ও নানান দোষে দুষ্ট এবং দলবাজী অসম বিলি ব্যবস্থা ও দুর্নীতি পূর্ণ ছিল বলে এখন তা বিধানসভায় বিরোধী সদস্যরা প্রকাশ করছেন। যারা বন্যাত্রাণে নিজ নিজ খরচে মানুষজনকে খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী দূর দুর্গম অঞ্চলের ঘাট ও বাড়ির নিয়ে তা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে দেশবাসীর অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছে, তাদের উপর পুনর্গঠনের ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব আপাতকালেও ছেড়ে দিতে রাজ্য-সরকার কোন মতেই রাজি হতে চাইছেন না কেন? রাজ্য-সরকারের ভয় ঐ সব সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি যেভাবে সুন্দর ও মজবুত এবং স্থায়ী গাঁথুনির ঘরবাড়ী তৈয়ারী করে দেবেন নিষ্ঠার সাথানে এবং স্বল্প ব্যয়ে সে ভাবে রাজ্য-সরকারের দ্বারা বাকী ঘরবাড়ী তৈরী হোওয়া সম্ভব হবে না; ফলে সরকারের সুনাম একদিকে যাবার হবে ও অন্যদিকে রামফ্রন্টের ওপর দেশবাসী বিরক্ত ও বিরূপ হবে। তুলনামূলক বিচারের জলন্ত প্রমাণ দেশ-বাসীর চোখে আঙুল দিয়ে সরকারের ব্যর্থতা বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেবে। রামফ্রন্ট সরকার নিজেদের একদেশ দর্শিতা, দলবাজী ও চরম ব্যর্থতা ঢাকা দিতেই ব্যস্ত এবং সে কারণেই তাঁরা সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বতঃ স্ফূর্ত পুনর্গঠনের ও পুনর্বাসনের কাজে হস্তারকের ভূমিকা গ্রহণ করে দেশবাসীর বিরাট ক্ষতি সাধন করতে মোটেই কুণ্ঠিত হচ্ছেন না। অপরপক্ষে কেরল কাঁদুনি গাইছেন যে কেন্দ্র প্রচুর টাকা (যা চাওয়া হয়েছে তা) দিচ্ছে না এবং কেন্দ্রীয় সরকারের গাফিলতিতেই এখনও এ রাজ্যে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ অগ্রসর হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া টাকা রাজ্য সরকার নিজ ইচ্ছা ও খুশীমত খরচ করতে পারবেন, পরে যা হয় একটা হিসাব দিলেই চলবে কিন্তু এই সব সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলি রাজ্য-সরকারের হাতে নগদ টাকা ও গৃহ নির্মাণের মাল মসলা দিতে কোন মতেই রাজি নয়। রাজ্য-সরকার ওঁদের টাকা ও মাল মসলা চান, কিন্তু ওঁরা নিজ ব্যয়ে ও নিজ তত্ত্বাবধানে যে গৃহ নির্মাণ করতে চাইছেন তা রামফ্রন্টের মনঃপুত নয়। অজুহাত অবশ্য একটা খাড়া করেছেন, তবে দেশবাসী তাতে মোটেই খুশী ও সুখী হতে পারেনি। দেশবাসী ছেড়ে দলের মুখ্য সি, পি, এম তথা রামফ্রন্টের কাছে অনেক বেশী এ কথা এই বন্যার বারে বারে প্রমাণ হয়েছে। দেশবাসী বিশেষ করে পল্লীবাংলার বন্যার্ত মানুষগুলি হাড়ে হাড়ে বুঝছে যে সি, পি, এম দল কি বস্তু এবং তার কি চায়। গ্রাম বাংলার মানুষ আজ সি, পি, এম-এর হাত থেকে পরিত্রাণের আশায় দিন গুনছে আর এই সরকারকে অভিশাপ দিচ্ছে প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায়। (সমাপ্ত)

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীকীরোদ দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অন্য এক দলকে গ্রেপ্তার করে নিজ নিজ গ্রামে আটক রাখা হয়। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা বিপ্লব কার্য্যের সহায্য করার সুযোগ পান নাই। পুলিশ যে কোন সময়ে এদের খোঁজ খবর নিত। তবে বিপ্লব কার্য্য যখন বেশ সুসংবদ্ধভাবে আরম্ভ হল এদের মধ্যেও কিছু লোক গা ঢাকা দিয়ে বিপ্লব কার্য্য আরম্ভ করলেন।

আমেরিকা প্রত্যাগত পাঞ্জাবীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন শিখ। অশিখের সংখ্যা পঁচিশ ত্রিশের অনের বেশী হবে না। এদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন পূর্ণবয়স্ক গৃহী। অনেকেরই স্ত্রী পুত্র পরিবার ছিল। অনেকের বয়স ছিল চল্লিশ বছরেরও বেশী। ভাই নিধান সিং, ভাই মোহন সিং, ভাই কালা সিং, ভাই কের সিং এদের কারও বয়স পঞ্চাশের কম ছিল না। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলাতে যারা গ্রেপ্তার হয়ে ছিলেন তাদেরও অনেকে পরিণত বয়স্ক ছিলেন। জমীর চাঁদের বয়স ছিল পঞ্চাশের উপর। আউধ বিহারীর বয়সও ছিল চল্লিশের উপর।

শিখদিগের প্রচণ্ড উৎসাহ এবং সাহস ছিল। তারা খুব কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। সাধারণত শিক্ষিত বলতে যা মনে হয় আমেরিকা প্রত্যাগত শিখদের মধ্যে এমন লোক বেশী ছিলেন না। শুধু অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যেই এরা পাঞ্জাবের বাইরে গিয়েছিলেন। সিঙ্গাপুর, সেনাং, শ্যাম, মালয় এবং চীন দেশের নানা স্থানেই এরা ছিলেন। এ সব জায়গায় এরা প্রধানত ইংরেজের সৈন্য বিভাগে এবং সামরিক পুলিশ বিভাগে কাজ করতেন। শ্যাম, মালয় এবং চীন দেশে অনেকে কুলি মজুরেরও কাজ করতেন। আমেরিকা প্রত্যাগত শিখরা শিক্ষিত না হলেও তারা নিজেদের মাতৃভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি পড়তে পারতেন। আমেরিকার স্বাধীন আবহাওয়ায় বাস করায় এরা যথেষ্ট উদারপ্রাণ হওয়ায় এদের আত্মসম্মান বোধ এবং আত্মবিশ্বাস বহুল পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল।

বাঙলাদেশের সেদিকের নব জাগরণের ঢেউ ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তেমনি ঢেউ ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তেমনি সে ঢেউ সাগরের ওপারে আমেরিকার উপকূলেও পৌঁছেছিল। বিপ্লব স্ফুলিঙ্গ ধীরে ধীরে দেশে ভারতীয়দের বিদেশে ছড়িয়ে পড়ছিল। এই সময় ভাই কর্তার সিং নামে এক তরুণ যুবক এদের সঙ্গে এসে মিলিত হন। ভাই কর্তার সিং উড়িষ্যার খ্যাণ্ডেনশ কলেজে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়েছিলেন। ইনি শিখদের মধ্যে অনেকের চেয়েই কনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু বিপ্লব দলে যোগ দেওয়ার পরে অনেক বয়স্ক শিখও তার অধিনায়কত্বে কাজ করতেন। এই সময় পাঞ্জাবের সুনাম খ্যাত কর্মী লালা হরদয়াল আমেরিকায় গিয়ে এই সকল শিখদের সঙ্গে যোগ দেন। কর্তার সিং এবং তার সহকর্মীরা হরদয়ালের নিকট এক বিপ্লব পত্রিকা প্রকাশ করার প্রস্তাব করেন। হরদয়াল সানন্দে তাদের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এইরূপে "গদর" নামে এক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়; এবং এই পত্রিকার নামেই আমেরিকার ভারতীয় বিপ্লবী দল গদর দল বলে পরিচিত হয়। গদর উর্দু শব্দ এর মানে বিদ্রোহ বা বিপ্লব। কালিফোর্নিয়ার যুগান্তর আশ্রমই ছিল এদের প্রধান কেন্দ্র।

(ক্রমশঃ)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৮৯৪—১৮৯৬

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

ছাত্রদের রাজনীতি চর্চা থেকে দূরে রাখলে বিজ্ঞজনোচিত কাজ হয় সে কথা এখন ক্রমেই উপলব্ধি করা হচ্ছে। ভালই হোক, আর মন্দই হোক, কোন না কোন রকম রাজনীতির মধ্যে তারা জড়িয়ে পড়বেই, কথা হচ্ছে এই যে তুমি যদি তাকে সঠিক রাজনীতি শিক্ষা না দেও এবং তাদের সাথে আলোচনা করে সেই সঠিক রাজনীতির পথে তাদের পরিচালিত না করো, তাহলে ছাত্র সমাজের আত্যন্তিক স্বার্থ বিজড়িত বিষয়ে তাদের মধ্যে যে প্রচণ্ডতম উত্তেজনা-গ্রাহিতা দেখা দিবে তা গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য তোমার মনকে অবশ্যই প্রস্তুত করে রাখতে হবে। অক্সফোর্ড এবং ক্যাম্ব্রিজের ছাত্র ইউনিয়নে রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা নিষিদ্ধ নয় এবং রাজনৈতিক নেতাদের সেখানে আলোচনার উদ্বোধনের জন্য ডাকা হয়। কিন্তু ভারত তো আর ইংল্যাণ্ড নয়। তবে ছাত্রদের মন জগৎ জুড়ে একই রকম; এবং জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা এবং সুস্থ পরিবেশ যদি সৃষ্টি করা যায় তাহলে তা অবশ্যই, কি পূর্ব, কি পশ্চিম, সর্বত্রই শুভ ফল প্রসব করবে।

আমার অভিমত এই রকম ঠিকই। তা হলেও কিছু কিছু যুবককে ঘোরাফেরা করে, তারও আমি সমর্থন করিনা। এই সমস্ত যুবক কোন কিছু তাদের মতের বিরোধী হলে এমন অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে যা মার্জনা করা যায় না। অনাদিকাল থেকে সহিষ্ণুতাই হচ্ছে হিন্দুর জীবনের মূলমন্ত্র এবং ছাত্রজীবনের মূল ভিত্তিই হচ্ছে শৃঙ্খলা। হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে সুপ্রাচীনকাল থেকে যে আচরণ পদ্ধতি চলে এসেছে এবং যে দৃঢ়-মূল স্বাভাবিক মানস প্রকৃতি গড়ে উঠেছে তা থেকে এই বিচ্যুতি আমাদের সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক প্রগতিকে এক ভয়ঙ্কর বিপদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, কি বাড়ীতে, কি শিক্ষায়তনে, সর্বত্রই যেন শৃঙ্খলার বন্ধনকে শিথিল করে দেওয়া হয়েছে এবং বিশৃঙ্খল মনোভাব বেড়ে চলেছে। তবু আশা করছি যে এ অবস্থা চিরোকাল থাকবেনা, এটা একটা সাময়িক এবং অবস্থাবী ধাপার মাত্র এবং যে উত্তেজনাকর অবস্থার মধ্যে এর সৃষ্টি হয়েছে সে অবস্থা কেটে গেলেই এই দুর্দিনও কেটে যাবে।

আমরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর বেওয়া নামক জাহাজে মাদ্রাজ থেকে দেশে ফিরে এলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমার বন্ধু মিঃ বি. এল গুপ্ত, আই. সি. এস এবং মিস মুলার। মিস্ মুলার মিঃ ঘোষ নামে একটি ভারতীয় ছাত্রকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করে-ছিলেন, হিতবাদী পত্রিকার সম্পাদক কালী প্রসন্ন কাব্য বিশারদও আমাদের দলে ছিলেন, তিনি তাদের দেশা দেখিয়ে আমাদের জাহাজের ইয়োরোপীয় যাত্রীদের খুব আনন্দ দিতেন। বিশারদের নানা বিষয়ে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ছিল এবং এই বিদ্যায় বেশ নিপুন ব্যক্তি ছিলেন। বিশারদ ছিলেন একজন সদানন্দ প্রকৃতির পুরুষ। এরকম প্রকৃতির লোক খুব কম দেখা যায়। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন একজন প্রবীণ বাঙ্গালী লেখক একজন অসাধারণ কবি এবং অতি চমৎকার আবেগ উচ্ছ্বাস পূর্ণ সঙ্গীত রচয়িতা। আমাদের "স্বদেশী" সভাগুলিতে তার গান সমবেত জন-মণ্ডলীকে রোমাঞ্চিত করে রাখত। পরে তার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হবে। জাহাজে আমার সহযাত্রিগণ আমাকে কংগ্রেস সম্পর্কে কিছু বলবার জন্য খুব চাপ দিতে থাকেন। আমার অন্যান্য ভারতীয় বন্ধু-রাও সেই অনুরোধের সঙ্গে যোগ দেন। আমি সানন্দে সে আহ্বানে সাড়া দিলাম। আধ ঘণ্টার উপর আমি জাহাজের সেলুনে এক বক্তৃতা করলাম। সেলুনটিতে বহু প্যাসেঞ্জারের ভিড় জমলো। জাহাজের ক্যাপ্টেন হ্যান্সার্ড সেই সভায় সভাপতিত্ব করলেন। যাত্রীদের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিলেন যারা আজিতে ইংরেজ

মন। আমার বক্তৃতার উপসংহারে তাদের সকলের কাছে আবেদন করে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেছিলাম।

"ইংরেজ ছাড়া আর যারা এখানে উপস্থিত আছেন, তাদের কাছেও আমি গভীর প্রত্যয় নিয়ে এই আবেদন রাখছি যে তারা যেন আমরা যে কাজে ব্রতী হয়েছি তাতে সহায়তা করেন। কারণ, তারা কি সভ্য মানব সমাজের সৌভ্রাত্র মণ্ডলের লোক নন? কংগ্রেসের পক্ষে আমি দৃঢ়তার সহিত দাবী করেছি যে কংগ্রেসের কাজ কেবল মাত্র ভারতের জন্যই নয়। এই কাজের একটা ব্যাপকতর ক্ষেত্র রয়েছে এবং তার গভীরতর তাৎপর্য্যও আছে। মানুষের মুক্তির স্বার্থের সঙ্গে, সমগ্র মানব সভ্যতা অগ্রগতির সাথে কংগ্রেসের কাজ সম্পর্কিত। সমুদ্র তীরবর্তী এক মহান জাতির রাজনৈতিক দাসত্ব মোচন সমগ্র সভ্য মানব সমাজের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক অতি আনন্দদায়ক শুভ-সংবাদ রূপে গণ্য হবে।

১৮৯৫ সালে আমি প্রথমবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হই। পুনায় সে বছর কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। পুণা ছিল দাক্ষিণাত্যের প্রধান নগরী এবং পশ্চিম প্রদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের একটি প্রধান কেন্দ্র। নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে মিঃ মহাদেব গোবিন্দ রানাডের কাছে থেকে এক টেলিগ্রাম পাই। আমাকে কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত করার প্রস্তাবের কথা জানান হয়। আমি সেই দিনই ধন্যবাদের সহিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করে টেলিগ্রামে উত্তর দিলাম। তখনকার দিনে এই সম্মান লাভের জন্য কোন ব্যাকুল প্রতি যোগিতা বা ক্যানভাস করার রেওয়াজ ছিল না। অভ্যর্থনা সমিতি প্রেসিডেন্ট কাকে করা হবে, তা ঠিক করতেন এবং তাদের সিদ্ধান্তই বিনা ওজোর আপত্তিতে মেনে নেওয়া হত। আমার স্মৃতি শক্তি যদি ঠিক থেকে থাকে, তাহলে বলতে পারি যে সভাপতি পদের জন্য প্রতিযোগিতার লক্ষণ প্রথম প্রকাশ পায় ১৯০৬ সালে। তার পরিণতি স্বরূপ পরের বছর সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশন ভেঙে যায় এবং কংগ্রেসের মধ্যে দুটি জনক বিভেদ দেখা দিল। এই প্রতিযোগিতা দেখা দেয় ঠিক সেই সময় যখন বঙ্গভঙ্গের পরে কংগ্রেস শিবিরে প্রবল মত বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অকার্য্যকর বলে প্রতীয়মান হয়।

পশ্চিম প্রদেশে মিঃ রানাডে ছিলেন সমস্ত জাতীয় আন্দোলনের পরিচালক—যেন রাজ সিংহাসনের পেছনে চালক শক্তির মত। রাণাডে ছিলেন সরকারী চাকুরে, সুতরাং সরকারের প্রতি অনুগত। কিন্তু তাঁর সে আনুগত্য কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ছিল না, কিংবা ভিক্ষের কোন অস্থির আবেগের জন্যও ছিল না। সে আনুগত্য ছিল প্রয়োজন ও যুক্তি যুক্ততার বিচার সঙ্গত এবং জনগণের কল্যাণ সাধনের উপায় রূপে গৃহীত। তিনি ছিলেন পশ্চিম প্রদেশের পথ প্রদর্শক, দার্শনিক এবং জনগণের বন্ধু। কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি ধর্মীয়—সমস্ত রকম গণ-আন্দোলনই তাঁর শক্তিশালী নিয়ামক ব্যক্তিত্বের ছাপ বহন করত। আমি তাঁর সংস্পর্শে আসি একেবারে তরুণ বয়সে যখন আমি সবেমাত্র দেশের কাজে নেমেছি। ১৮৭৭ সালে সিভিল সার্ভিসের প্রশ্ন নিয়ে যখন পুনায় যাই তখন আমি তাঁর বাড়ীতেই অতিথি ছিলাম। তাঁর বিশাল প্রতিভা ও গভীর স্বদেশ প্রেম আমাকে আকৃষ্ট করে; আরও আকৃষ্ট করে তাঁর বাস-ভূমির পরিবেশের অনাড়ম্বরতা, তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের কমনীয়তা ও মহত্ব।

কংগ্রেসের সভাপতি পদ গ্রহণ করে আমি সভাপতির ভাষণ প্রস্তুতির কাজে আত্ম নিয়োগ করলাম। এটা একটা হারকিউলিসের কাজের মত বিরাট এবং কঠিন কাজ। আমি দুবার কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার সম্মান লাভ করেছি। দুবারই সভাপতির ভাষণ প্রস্তুত করা আমার কাছে হারকিউলিসের কাজের মত কাজ বলে মনে হয়েছে। কলেজে আমার বৃত্তিগত কাজের দায়িত্ব ছিল, বেঙ্গলী পত্রিকা পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার ছিল আমার উপর। তা ছাড়া ছিল মিউনিসিপ্যালিটির কাজ; সে কাজের দিকেও নজর দিতে হত। কারণ আমি তখন কলকাতা কর্পোরেশনের একজন মেম্বার ছিলাম। আমি এক সহজ পন্থা অনুসরণ করলাম। প্রতিদিন বিকেল দুটার সময় বারাকপুরের বাড়ীতে গিয়ে আমার ভাষণ লিখতে আরম্ভ করলাম। আমার এই কার্য্যকরকে স্থির ভাবে অনুসরণ করার পথ থেকে মনকে অন্যদিকে নিয়ে যেতে পারে এমন কোন রকম বাধাকেই আমল দেব না বলে ঠিক করলাম। তখন কেউ আমার কাছে এলে কঠোরভাবেই

বলে দিতাম "না, এখন নয়।" তবে একবার একটি ক্ষেত্রে "না" বলতে পারিনি। মনে আছে, আমার বন্ধু আশুতোষ বিশ্বাস একবার আমি যখন ভাষণ প্রস্তুত করছিলাম, তখন আমার বাঘবাকপুরের বাড়ীতে আসেন। কলকাতা কর্পোরেশনের ভাইস চেয়ারম্যান পদের জন্য প্রার্থী এক ভদ্রলোকের পক্ষে আমার ভোট ক্যানভাস্ করতে এসেছিলেন। আশুতোষ বিশ্বাসকে আমি কিছুই দেবো না বলতে পারি না। তাকে বললাম, মাত্র দশ মিনিট সময় আমি তাকে দেব। কিন্তু তিনি পাঁচ মিনিটের বেশী সময় নিলেন না।

দিনের পর দিন প্রত্যহ দু ঘণ্টা ধরে আমি আমার ঘরে এই কাজের মধ্যে ডুবে থাকতাম। আমি তখন একাই ছিলাম বাড়ীতে। কারণ, আমাদের পরিবারের সকলে তখন আমার ছেলের অসুখের জন্য এলাহাবাদে ছিল। ভাষণটি ক্রমে বড় হতে হতে এমন বড় হয়ে গেল যে, আমার মনে হচ্ছে, কংগ্রেসের সভাপতির আসন থেকে দেওয়া দীর্ঘতম ভাষণগুলির মধ্যে এটিকে অন্যতম বলা যায়। ভাষণ প্রস্তুতির কাজে দু ঘণ্টা কঠোরভাবে কাজ করার পরে পৌনে এক ঘণ্টার জন্য শরীর রক্ষার্থে নদীর তীরে বায়ু সেবনের জন্য ভ্রমণ করতাম। এই ভ্রমণকালে যা যা লিখেছি সেগুলি মনে মনে ভাবতাম, তর্জমা করতাম, মুখস্থ করতাম এবং সংশোধিত-রূপ করে পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করতাম। আমার এই কাজ দীর্ঘ দশ দিন ধরে বাধাহীন ভাবে চলেছে। আমার মন তখন আমার অভিনিবেশের সাধ্যমত সমস্ত শক্তি নিয়ে এই কাজে কেন্দ্রীভূত ছিল। বক্তৃতা করার সময় সমগ্র ভাষণটিও বললাম; সে জন্য কোন নোটের সাহায্য আমাকে নিতে হয়নি; কেবলমাত্র দীর্ঘ সাংখ্যিক অঙ্কের ক্ষেত্র ছাড়া। আমার ভাষণ দিতে চার ঘণ্টারও বেশী সময় লেগেছিল। আমার মনে হয়, আমার ভাষণের এই সম্পূর্ণ সময়টা ধরে আমি পাঁচ হাজারেরও অধিক] লোকের এক বিশাল সভার মনোযোগ অক্ষুণ্ণ ও অনবদ্য রাখতে সমর্থ হয়েছিলাম।

আমাকে প্রায়ই এই রকম প্রশ্ন করা হয়ে থাকে যে কী করে আমি এত দীর্ঘ বক্তৃতা করি যার মধ্যে একটি বাক্যের জন্যও কোন নোটের সাহায্য নেই না, এমন কি যার মধ্যে মনে তর্জমা করে—কোন কোন পুস্তকের অংশগুলি পর্যন্ত উদ্ধৃত করি। কিন্তু এই রহস্যটি যে কী তা হয়ত প্রকাশ করে বলা যায় না; এমন কি বক্তা নিজেও হয়ত তা জানে না। এমনুষ্যেকটা নির্ভর করে বাক্যটি কি ভাবে গঠিত হয়েছে এবং সাজান হয়েছে, তার উপর। বাক্যটি যদি স্বাভাবিক নিয়ম শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে, যদি তার মধ্যে যুক্তি ও সঙ্গতি থাকে, তা হলে তা স্মৃতিতে ধরে রাখতে সাহায্য করে। বাক্যটি যদি ছন্দ যুক্ত হয়, তা হলে তা মনে দাগ কাটে এবং তার সুরটি স্মৃতি শক্তিকে সাহায্য করে। লর্ড মেকলেবারি, বলেছেন, তিনি যখন তার বক্তৃতা প্রস্তুত করতেন তখন তার সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর কথাগুলি আপনা থেকেই মনের মধ্যে প্রজ্বলিত হয়ে উঠতো। যারা জন সভায় বক্তৃতা করার নৈপুণ্য অর্জন করেছেন তাদের সকলের সম্বন্ধেই এই কথাটি সত্য বলে আমার মনে হয়। মোট কথা হচ্ছে প্রস্তুতিই হচ্ছে একটা বড় কাজ। এটি এমন একটি ব্যাপার যা একান্ত আবশ্যক। প্রতিভার ব্যাখ্যা করে কার্লাইল যথার্থই বলেছেন যে প্রতিভা হচ্ছে বেদনার অনুভূতিকে গ্রহণ করার অফুরন্ত সামর্থ্য। জন ব্রাইটও বলতেন, কোন কথাই শোনার যোগ্য নয় যদি তা হৃদয়ের সহিত প্রস্তুত না হয়। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বক্তৃতা প্রস্তুতকালে এই বিখ্যাত ইংরেজ বক্তা কেবিনেটের মিটিংয়ে অনুপস্থিত থাকতেন। অনবদ্য প্রস্তুতিই তোমাকে তাৎক্ষণিক বিতর্কে যোগ্যতা দান করে, শব্দ চয়নের উপরও অধিকার দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে এসে যায় ভাব ও ভাষা সম্পদ বিভব; এক কথায় এই ভাবে নিপুণ বক্তাকে মনের দিক থেকে প্রস্তুত করে দেয়। বিতর্কে সাফল্য লাভ করলেই যে একজন ভাল বক্তা হওয়া যায়, তা কিন্তু নয়। একজন বাগ্মী পুরুষের বক্তৃতার গুণ হচ্ছে তার বক্তব্য বিষয়ের নৈতিক দিকটা, তার বুদ্ধির দিকটা তত নয়। আবেগই উচ্চ মহতী চিন্তাকে জাগ্রত করে এবং তাকে তার রূপ ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পূর্ণ প্রকৃতি দান করে।

যে নিজের দেশকে ভালবাসে না, সে যেন বক্তা হতে

না চায়। সে ভালবাসা হচ্ছে অকপটভাবে দেশকে ভালবাসা; সমস্ত মন-প্রাণকে অভিভূত করে দেশকে ভালবাসা। বক্তার কাছে নিজের দেশই প্রথম, আর সব কিছুই পরবর্তী স্তরের কাজ। এটা যদি তার জীবনের মূল-মন্ত্র না হয়। স্বদেশ প্রেমের পবিত্র অগ্নিমন্ত্র যদি তার দীক্ষা না হয় তাহলে উচ্চতম বুদ্ধি বৃত্তির অধিকারী হলেও সে কখনও বক্তা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না। উচ্চতম বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হয়ে সে একজন বাক্‌পটু তার্কিক হতে পারে নিজের বিষয়টি তুলে ধরতে পারদর্শী হতে পারে, একজন লোক চিত্তকে বিমোহিত করার মত শক্তি সম্পন্ন একজন বক্তা, হয়ত সকলকে তুষ্ট করতে, আনন্দ দান করতে, কি এমন শিক্ষা দিতেও সে পারে তার সে পারে তার বক্তৃতার দ্বারা; কিন্তু তা সত্ত্বেও, যদি তার উচ্চতর স্বদেশ প্রীতি ও ধর্মীয় আবেগ না থাকে, তাহলে সে সেই পরম শক্তি থেকে বঞ্চিত হবে যে শক্তি মানুষকে সত্য, শিব ও সুন্দরের উপাসনার উচ্চ ভাবনার প্রেরণা জোগিয়ে তার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে। তাই নৈতিকতাই হচ্ছে বক্তার প্রধান সহায় ও সম্বল। অন্য কোন কিছুই তাকে মানবতার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মনের চিরসঙ্গ লাভে সহায়তা করবে না। যারা কাজ করে গেছেন, নির্যাতন ভোগ করেছেন, যারা মহৎ তত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন ও প্রচার করে যারা দেশের সেবায় ও উপাস্য দেবতার সেবায় পবিত্রীকৃত জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের সঙ্গ লাভ থেকে বঞ্চিত থাকবেন।

অনেকদিন আগে একবার এক যুব-শ্রোতার সভায় বক্তৃতা করার কলা-নৈপুণ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলাম: "এমন মহৎ ও পবিত্র পরিবেশের মধ্যে তোমাদের থাকতে হবে যে পরিবেশ দেব-সান্নিধ্যের সৌরভে ভরপুর হয়ে আছে। তোমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী হউন বার্ক ব্যাগিনি, বিদ্যা, বুদ্ধ, মহম্মদ, চৈতন্য, রামমোহন রায়, কেশব চন্দ্র সেন। "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতের মধ্যে যে মূর্ছনা আছে, যে প্রবল ও গভীর অনুভূতির সূত্র আছে, তারই সঙ্গে তোমাদের অন্তরাত্মার সুর বেঁধে তোমাদের চলতে হবে।" যারা কিছু সর্বোত্তম, যা কিছু সব চেয়ে খাঁটি তাই হবে বাগ্মী পুরুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের উপাদান। যতটা পরিমানে সম্ভব ততটা পরিমানেই সে তা লাভ করুক। কিন্তু তা লাভ তাকে করতেই হবে। তখন হৃদয়ের উৎস থেকে ভাষা আপনা থেকেই নিজের বেগে সশব্দে বেরিয়ে আসবে। তার বুদ্ধিগত পুঁজি-পাটা নিঃ সন্দেহে মূল্যবান হলেও তা প্রধান নয়, অনুষঙ্গিক মাত্র। নৈতিকতাই হল প্রধান অগ্রগামী বিষয়।

যে বুদ্ধিগত যোগ্যতার উপরে আমি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করে থাকি, তা হচ্ছে একপ্রকার শক্তি, বিষয় বস্তুর প্রতি এক নিবিষ্ট ভাব প্রয়োগের শক্তি। গ্লাড ষ্টোনের এই শক্তিটি অতিমাত্রায় ছিল। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এর প্রয়োজন আছে। যারা বক্তা, যারা বাগ্মী, তাদের পক্ষে এটি একটি বিশেষ মূল্যবান গুণ; কারণ, তারা সব সময়ই তাদের চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকতে পারেন এবং সেই চিন্তাগুলিকে হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপিত করার জন্য সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে পারেন। আমি আমার সারা জীবন খুব আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত এই এক নিবিষ্ট হয়ে সাধনা করেছি এবং আমার সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে তা আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে। আমার মনে পড়ে, আমি যখন মাত্র ১১ বছরের বালক তখন আমি আমাদের পৈতৃক বাড়ী বরাকপুরের নিকট ঘুনিরামপুর গ্রাম থেকে একবার নৌকায় চড়ে কলকাতায় এসেছিলাম। নৌকায় ছিলেন আমার বাবা, আমার বড়ভাই, আমার জ্ঞাতি ভ্রাতা-ব্যারিষ্টার দ্বারকানাথ বানার্জি এবং আরও দু-একজন। ওঁরা সবাই খুব কোলাহল করে কি সব কথা বলছিলেন। আমার তখন স্কুলের একটি পড়া প্রস্তুত করার ছিল। পড়াটা ছিল ১২ লাইনের কবিতা মুখস্ত করা। ওঁরা কি নিয়ে আলোচনা করছেন সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আমি নৌকার এক কোনে গিয়ে বসি এবং কলকাতা পৌঁছতে যে সময় লাগল, তারই মধ্যে আমি কবিতাটি মুখস্থ করে ফেললাম। প্রত্যেকটি শক্তিরই বিকাশ ঘটে অভ্যাসের দ্বারা, অনুশীলনের দ্বারা। এখনও আমি যখন যে কাজে হাত দেই, আমি সম্পূর্ণরূপে তার মধ্যে ডুবে থাকি। আমাকে ডেকে সরাসরি আমার সঙ্গে কথা না বললে কোন রকম বাধার দিকেই আমার মন যায় না।

(চলবে)

৮ই ডিসেম্বর স্মরণে

—ব্রজেন দাস

রাইটার্স অলিন্দ যুদ্ধের তিনটি সৈনিক বিনয়-বাদল-দীনেশ। ইংরেজ পরিচালিত সৈনিক ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা এ যুদ্ধের নামকরণ করেছিল "ডেয়ারডেভিল ব্যাটল্‌" এই ঘটনার ইতিবৃত্ত সবার জানা, পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এই ঘটনায় বাঙ্গালীর বীরত্বের ও স্বদেশ-প্রীতির ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণা প্রকাশ পেয়েছে সেইটুকু তুলে ধরারই চেষ্টা করব। স্মরণ করব স্বাধীনতার জন্য জীবনের সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করে হাসতে হাসতে মৃত্যু-যজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিয়েছেন যে সমস্ত বিপ্লবী এবং তাঁদের বীরত্বের কাহিনী।

ইংরেজ সরকার ভারতে পদার্পণ করেই বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত ছিল। বাঙ্গালীদের ভীরু কাপুরুষবিহীন, নন্‌মিলিটারী জাতি বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করত। আর্মিতে বাঙ্গালী-দের নিষিদ্ধ করে রেখেছিল। পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজের তৈরী বেঙ্গল আর্মিতে শতকরা অর্দ্ধি ভাগ সৈন্য অযোধ্যা ও তৎসংলগ্ন স্থানের ব্রাহ্মণ শ্রেণী হতে বিলুপ্ত করেছিল, বিশ ভাগ ছিল মুস-লিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত। কোম্পানীর বেঙ্গল আর্মিতে বাঙ্গালীদের স্থান ছিল না। বাঙ্গালীদের সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করতে ইংরেজ চিরদিনই উদাসীন ছিল। কারণ বাঙ্গালী শাসক-দের অধীনে ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসাবে যোগদানে উৎসাহী ছিল না। বাঙ্গালীরা বিদেশী রাজ্য বিস্তারে সহায়তা করতে নারাজ।

মহারাজা নন্দকুমার দিল্লীর অধীনে হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। ইংরেজরা চেয়েছিল তাঁকে তাঁদের শ্রেণীভুক্ত করে তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সাহায্য নিবে। কিন্তু নন্দকুমার ইংরেজের অত্যা-চারে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, তাঁতীদের অঙ্গুল কাটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। ইংরেজ জাল মামলা করে নন্দকুমারকে ফাঁসি দেয়। নন্দকুমার মৃত্যু বরণ করে বশ্যতা স্বীকার করেন নাই।

১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরে স্মরণীয় দিন স্থাপন করলেন বীর বিপ্লবী মঙ্গল পাণ্ডে। মঙ্গলপাণ্ডে ও সিপাহী তে ও য়া রী সিপাহীদের উদ্দেশ্যে বললেন আজ থেকে তোমরা তো মা দে র মিলিত শক্তি দিয়ে ইংরেজদের আঘাত কর। মঙ্গল পাণ্ডের তেজো-দীপ্ত ঘোষণা শুনে রেজিমেন্টের সকল সিপাহী তাদের সামিল হল। পদাতিক বাহিনীর সেজার হুগ্‌সন মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দিলেন। কিন্তু সে আদেশ কার্য্যকরী হল না। মেজর হুগসন ক্ষিপ্ত হয়ে নিজেই আক্রমণ করার চেষ্টা করলে। পাণ্ডে তাকে লক্ষ্য করে গুলি নিক্ষেপ করলেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ থেকে প্রথম গুলি নিক্ষেপ করা হল।

বুলেটের আঘাতে মেজর হ্যুসন পড়ে গেলেন দেখে লেফটেনেন্ট বাও ঘোড়ায় চড়ে মঙ্গল পাণ্ডেকে আঘাত করতে অগ্রসর হলেই মঙ্গল পাণ্ডে গুলি ছুড়লেন। ঘোড়া শুয়ে পড়ল, বাও মাটিতে পড়ে গেলেন। বাও কোন প্রকারে উঠে পিস্তল থেকে গুলি ছুড়লেন, গুলি মঙ্গলপাণ্ডের দেহ স্পর্শ করল না। বাও তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করার আগেই মঙ্গলপাণ্ডে নিজের তলোয়ার দিয়ে বাওকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। অবস্থা দেখে কর্ণেল হুইলার তৎক্ষণাৎ জেমাদার ঈশ্বরীকে বহু সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যসহ পাঠালেন। মঙ্গলপাণ্ডে উপস্থিত সকল সিপাহীদের বললেন, "তোমরা মাতৃভূমির জন্য জীবন দিও, ইংরেজের গোলামীর জন্য জীবন দিও না, একথা বলার পরই নিজের বুকে বন্দুকের গুলি ছুড়লেন। এতে তাঁর মৃত্যু হল না। চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হলেন। অফিসাররা মঙ্গল পাণ্ডের নিকট হতে এই বিদ্রোহের মূলে কে আছে জানার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু মঙ্গল পাণ্ডে একটী কথাও বললেন না। ইংরেজ সরকার মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাঁসির হুকুম দিল। ১৮৫৭ সালের ৮ই এপ্রিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক মঙ্গল পাণ্ডে ফাঁসির রজ্জু দেশ মাতার দেওয়া মাল্যরূপে গ্রহণ করলেন।

এই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হয়ে বাংলার যুবকরা দেশমায়ের বেদীমূলে জীবন অর্ঘ দিয়েছে, সেই পূর্ণ তালিকা এখনও অতীতের গহ্বরে। কয়েকটী নাম উল্লেখ করে মায়ের মুক্তি যজ্ঞে উৎসর্গী সন্তানদের তালিকার একটী উজ্জ্বল স্থান অধিকার করছে বিনয় বাদল দীনেশ।

১৯৩০ সালে ইংরেজ সরকার পাশবিক শক্তির দম্ভে বাংলা তথা ভারতের বৈপ্লবিক চেতনা রুদ্ধ করার সঙ্কল্প গ্রহন করল; এই তরুণত্রয় কলকাতার বুকে প্রকাশ্য দিবালোকে সম্পূর্ণ সমরে আহ্বান জানিয়েছিল ব্রিটিশকে ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর রাইটার্স বিল্ডিংস এর আঙ্গিনা যুদ্ধে। আজ ৮ই ডিসেম্বর প্রথমে জানাই বিপ্লবী ত্রয়কে, স্মরণ করি তাঁদের বৈপ্লবিক তিতিক্ষা এবং সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় প্রকাশ করি :—

"দেশের জন্য এরা জীবন উৎসর্গ করেছে, সর্বস্ব উৎসর্গ করেছে, এরাই দেশের মুক্তিদূত, গভর্ণমেণ্ট এদের ভয় করে, কারণ জানে এদের তপস্যার মধ্যে রচিত হচ্ছে তাঁদের ধ্বংসের যন্ত্র। চির-চঞ্চল, চিরজীবি, চির-তরুণ এরা; দেশের তরুণদের আমি বলি তোমাদের এতবড় আপনজন, জীবন্ত আদর্শ আর কেউ নেই"।

বিপ্লব দরদী শরৎ চন্দ্রের এই আহ্বান বৃথা যাবে না। যুবকেরা দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করতে ক্লেদমুক্ত মন নিয়ে দেশগঠন কাজে এগিয়ে আসবে। বিপ্লবীদের আদর্শের মন্ত্র যুবকদের মনে আরও দৃঢ় ও সক্রিয় করতে সাহায্য করবে ৮ই ডিসেম্বর উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে এই আশাই করব।

৮-১২-৭৮ ইং

RgodNo. R. N. 24811/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
পাক্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | বান্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

c/36

14 DEC 1978

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুলিন চ্যাটার্জী, শ্রীবারীন রায়।
সম্পাদক—শ্রীসাহি শরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেহালা—শ্রীমধুগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীমনীন্দ্র গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্য্যালয় :—৪নং বন্ধুদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

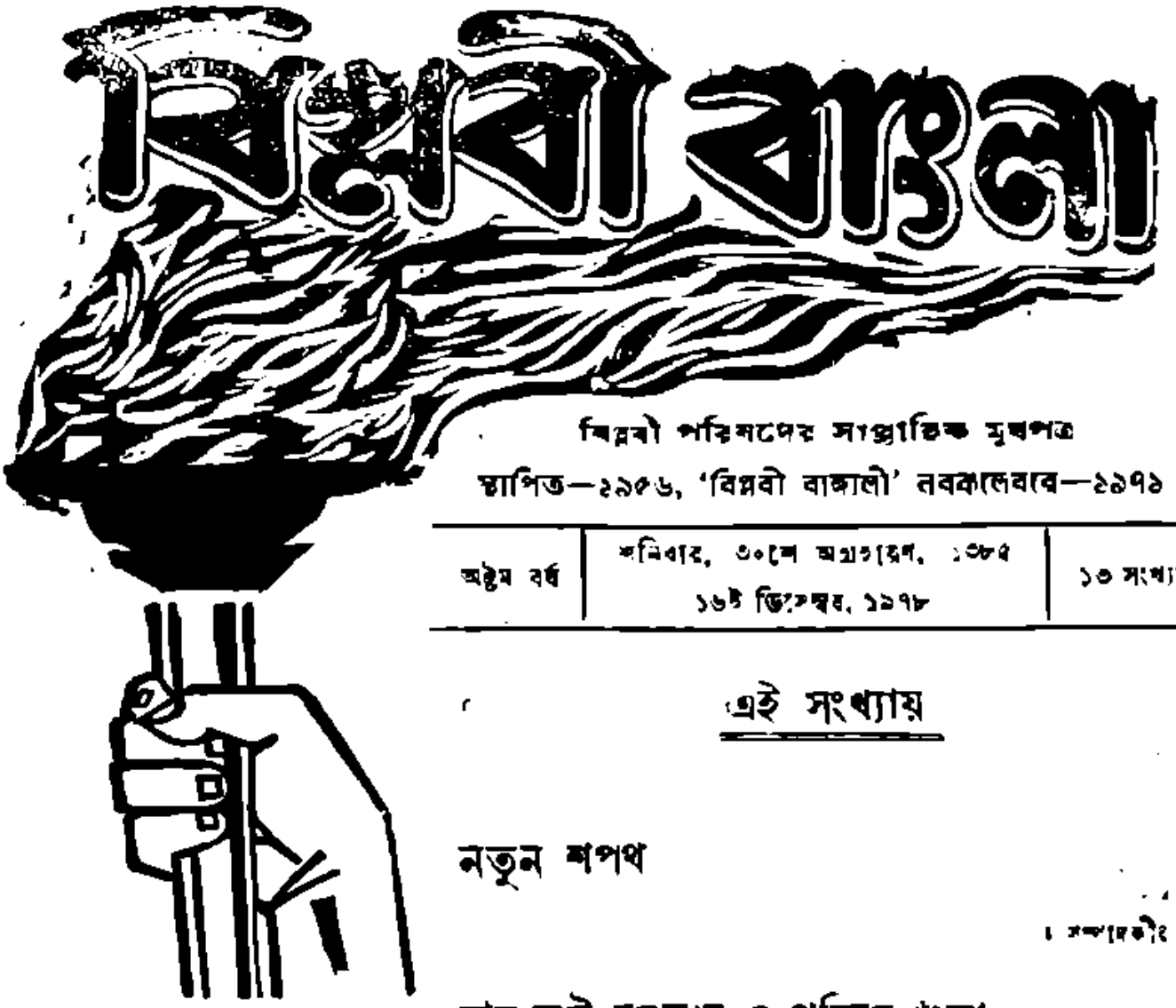

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

অষ্টম বর্ষ	শনিবার, ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৮	১৩ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

নতুন শপথ
। সম্পাদকীয় ।

বাম ফ্রন্ট সরকার ও পশ্চিমবাংলা
। ডাঃ নিরঞ্জন সাহা ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস
। কীরোদ দত্ত ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক মনিনী মোহন রায়চৌধুরী ।

জাতীয় সমস্যা সমাধানের উপায় চিন্তা
। বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

"সব লোককে কিছু কালের জন্যে এবং কিছু লোককে সর্বকালের জন্যে বোকা বানানো যায়, কিন্তু সব লোককে সর্বকালের জন্যে বোকা বানানো যায় না।"

—এব্রাহাম লিংকন

সম্পাদকীয়

নতুন শপথ

গত ১২ই ডিসেম্বর কলকাতার নেতাজী সুভাষ ইনষ্টিটিউট হলে প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীশীলভদ্র যাজীর সভাপতিত্বে সারাবাংলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীত্রিভুবন নারায়ণ সিং, যিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, যিনি আজো আনন্দের সঙ্গে ও গর্ব্বের সঙ্গে এই পরিচয় বহন করতে চান।

সম্মেলনের প্রস্তাবগুলির পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে শুধুমাত্র চাওয়ার অপরাধ যারা এদের উপর চাপাতে চান, তাঁরা কতটা ভ্রান্ত। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা শুধু এই মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁরা নতুন করে শপথ নিয়েছেন শহীদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্নের ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে। তাঁরা একথাও দৃপ্তকণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করেছেন যে যতদিন এমন ভারত প্রতিষ্ঠিত না হয়, যেখানে ধনী দরিদ্রের কোন বৈষম্য থাকবে না, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থানের অভাব থাকবে না, সকল মানুষের বেঁচে থাকার, বেড়ে ওঠার সমান সুযোগ ও অধিকার থাকবে এবং রাষ্ট্র কাঠামোর রূপায়ণ হবে গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ, ততদিন তাঁরা বিশ্রাম গ্রহণ করবেন না। তাঁরা একথাও বলেছেন দলমত নির্বিশেষে অতীত দিনের আদর্শ নিষ্ঠা, সংগ্রামী ঐতিহ্য, ও দেশপ্রেমকে মূলধন করে ভবিষ্যতের পথ-পরিক্রমা করবেন।

রাজনীতি আজ একটা ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে, যার মাধ্যমে একদল মানুষ, যাদের অতীত নেই, যাদের কোন ভবিষ্যৎ জনহিতকর উদ্দেশ্য নেই, যাদের নেই কোন দেশ সেবা-করার আকাঙ্খা, রাজনীতিকে নিজেদের মুনাফা শিকারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছেন। Palitics is the last resort of a scoundrel. এই আপ্তবাক্য দিয়ে এই অবস্থার বর্ণনা করলে খুব একটা ভুল হবে বলে মনে হয় না। তাই রাজনীতিতে পুনরায় উচ্চাদর্শ, দেশপ্রেম ও মানবীয় মূল্য বোধের প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে, দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে বাধ্য। একটি ঐতিহ্যপূর্ণ ভারতীয় জাতির পরিণামও শোচনীয় হবে নিশ্চিত ভাবে। এই সর্বনাশা পরিস্থিতির থেকে দেশকে উদ্ধার করতে পারেন একমাত্র তারাই। যাদের আছে চরিত্রবল, মনোবল, অসাধ্যসাধন করার সঙ্কল্প, যাদের আছে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিপ্লব সাধনার ঐতিহ্য। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই শপথ গ্রহণ অত্যন্ত সময়োচিত ও মূল্যবান হয়েছে। এ জন্য তাদের আমরা সাধুবাদ জানাই। দল ও গোষ্ঠীগত স্বার্থীনতা ভুলে, তারা অগ্রসর হবেন

উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এটাও আশার কথা, ভরসার কথা। কামনা করি, তাদের যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন, মসৃণ ও মঙ্গলময় হোক। বাধা যদি আসে, বিশ্বাস করি, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সে সব অতিক্রম করবেন সফলভাবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ ও দাবী করেছেন। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে নৈতিকতা, আদর্শনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমকে জাগিয়ে তোলা ও অন্য প্রকারের গঠনমূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে চান। কথাটা বাহ্যত শুনলে সহজবোধ্য মনে না হতে পারে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এর মূল্য আছে। সাম্প্রতিক পশ্চিমবাংলার বন্যার্তদের মধ্যে সাহায্য বিতরণ করার সময় দেখা গিয়েছে যে একটি মানবিক, অথচ সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রেও সকলকে কাজ করতে দেওয়া হয় নি। বিশেষ কোন দল বা গোষ্ঠীর লোকেদের ত্রাণ, আর্তত্রান ও পুনর্বাসনের কাজ করতে দেওয়া হয় নি। এদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সংস্থাও ছিলেন। কাজ করতে তো দেওয়াই হয়নি, বরং বাধা দেওয়া হয়েছে। সেবাকার্য্য করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ভয় দেখানো ও অপমানিত করা হয়েছে। কাজেই সরকারী মনোভাবের পরিবর্তন করা প্রয়োজন। "সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে" মায়ের 'মঙ্গল ঘট' পূর্ণ করা যাবে না। এ সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। সরকারের উচিৎ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই সুযোগ দান করা অনতি বিলম্বে। এতে দেশের ও দশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি।

অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য যে দাবী তুলেছেন। সেটা অত্যন্ত সঙ্গত ও সমর্থন যোগ্য। দেশের অন্যান্য মানুষের মত তাদেরও খেয়ে পরে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। জাতীয় সরকারের তরফ থেকে এই কাজ অনেক আগেই করা উচিৎ ছিল। জাতীয় সরকারের অতীত দিনের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিকট একটি বিশেষ ঋণ আছে; কারণ তাঁদের জীবন আহুতি, দুঃখকষ্ট ও কারাযন্ত্রণা ভোগের ফলেই দেশ স্বাধীন হতে পেরেছে। ঋণকে যদি অস্বীকার করা হয়, তবে সেটা হবে চরম অকৃতজ্ঞতা ও অমার্জনীয় কৃতঘ্নতা। আমরা প্রত্যাশা করি জাতীয় সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্বন্ধে যথা কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হবেন না।

———

বামফ্রন্ট সরকার ও পশ্চিমবাংলা

ডাঃ চিত্তরঞ্জন দাস

আমরা ইতিপূর্বে দু'দু'বার যুক্তফ্রন্ট সরকার দেখেছি এবং এবার বাম-ফ্রন্ট সরকার দেখছি। "যা দেখছি এবং যা দেখছি" এটাই হবে আমার বর্তমান সমালোচনার মূল বিষয়। জানি না, কেবার কার কতটুকু আঘাত বেদনা-ব্যথা বা আনন্দ হবে। কারণ, আমার লেখা কাউকে উদ্বেগ করে নয়, কাউকে ছোট করে দেখানোর মতলব নিয়ে নয়। আমার নজরে "যা" দেখেছি আর যা দেখছি" শুধু সেটুকুই লেখার চেষ্টা করছি। আপনারা আপনাদের নজরে একটু দেখলেই আমার চেষ্টা সার্থক হবে।

"যা দেখেছি"

পশ্চিম বাংলার মানুষ তাঁদের বিচার জানিয়েছিলেন কংগ্রেসী অপশাসনের, বিরুদ্ধে। তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন তাঁদের কথার যাঁরা একদিন এই স্বাধীনতাকে "ঝুটা হ্যায়" বলে চিৎকার করে ভারতের আকাশ-বাতাস তথা পরিবেশকে মাতিয়ে তুলেছিলেন; যাঁরা একদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের গুপ্তচর বৃত্তিকরে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিলেন প্রতিটী ভারতীয় নাগরিকের সাথে; যাঁরা একদিন সাম্রাজ্যবাদী বৃটীশ সরকারের শ্রীচরণ বন্দনা করে মাসোয়ারা নিতে কোন দ্বিধা বোধ করেননি; যাঁরা একদিন কলকারখানায় কর্মীদের সেবকের বেশে ২০।২২ ঘন্টা দৈনিক খাটিয়ে মালিককুলের কৃপা কুড়োতে কোন প্রকার লজ্জার কাজে নতি স্বীকার করেন নি।

যখন ভারতের শঙ্কিত, নীপিড়িত, লাঞ্ছিত মানুষ দেশ থেকে বিদেশী লুন্ঠেরাদের তাড়াতে বৃহৎ সমর; ভারতের মুক্তি সংগ্রামে সর্বস্বপণ করে লড়ছে—সে সময়ে যাদের দেখেছিলাম বিপ্লবী কর্মীদের পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দিতো। এই বিশ্বাস করাটা যে খুব অন্যায় বা অস্বাভাবিক হয়েছিল তা আমি বলছি না, কারণ, ক্ষমতায় আমার কখনো কম্যুনিষ্টরা পারেনা—এমন কোন কাজ আছে বলে আমার জানা নেই। আপনারা রাশিয়ার কথা একটু ভাল করে মনে করে দেখুন, মহামান্য লেনিন তাঁর পেশাদারী (Paid) কর্মীদের নিয়ে বৈপ্লবিক সংগঠন করেছিলেন এবং ঐ পেশাদারদের সাহায্যেই একদিন ক্ষমতাও দখল করেছিলেন। কিন্তু ঐ পেশাদার তথা কথিত বিপ্লবী কর্মীরা কখনোই: কখনও বিপ্লবী কর্মী হতে পারেনি, তারা বাস্তবক্ষেত্রে বিশ্বাস ঘাতক ও গুপ্তচর হিসাবেই কাজ করেছে; —যেমন আপনারা দেখেছেন ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের—আমাদের মাতৃভূমির মুক্তি যুদ্ধে-সংগ্রামে। ১৯০৫, ১৯১৭ এবং তার পরেও রাশিয়ার মেনশেভিক দলের কর্মীরা যে আদর্শ, আত্মত্যাগ, আত্মনিষ্ঠা তথা আন্তরিকতা ও বিপ্লবনিষ্ঠা দেখিয়েছিলেন-বলশেভিক কর্মীরা অর্থাৎ ঐ পেশাদারী বিপ্লবী মার্কা গুপ্তচররা ঠিক তার উল্টো ভূমিকায় অবতীর্ণ—নজির রেখেছে ভারতবাসীর সাথে সংগ্রামে নয়—মেনশেভিকদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতায়।

এ সব জানা সত্ত্বেও পশ্চিম বাংলার মানুষ কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষোভ ঘোষনা করেন এবং একটি যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করার সুযোগও দেন—অবশ্যই এটার মূল উৎস ছিল আমাদের অগ্রজ প্রতিম অজয় দা

(শ্রীযুক্ত অতুল কুমার মুখার্জি কংগ্রেস) আরও একটু আগের কথায় গেলে দেখা যাবে আমাদের দেশে কম্যুনিষ্টরা সুভাষ চন্দ্রের কাঁধে চেপেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সুভাষ চন্দ্রকে বাদ দিয়ে কোন রাজনীতির কথা আমাদের উঠতেই পারে না। অবশ্যই সুভাষ তাঁর কম্যুনিষ্টদের লালন পালনের পূর্ণ খেসারত না দিয়ে রেহাই পাননি। যুদ্ধ চলা কালীন সুভাষ এসে আমাদের দরজা থেকে ফিরে গ্যাছেন, আমরা তাঁর ডাক শুনতে পাইনি, তাইজন্য কি এই কম্যুনিষ্টদের মিথ্যা প্রচার শুরুচর বৃত্তি দায়ী নয়? আমাদের দেশে এক ধরনের কথা চালু হয়েছে কম্যুনিষ্টদের সবই ভাল, শুধু আপত্তি ওরা নাকি জাতীয়তাবাদী নয়—অর্থাৎ মার্কসবাদের সাথে জাতীয়তাবাদটা একটু জুড়ে দিলেই নাকি আর কোন আপত্তির কারণ থাকছে না। সুতরাং কম্যুনিষ্টরা এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে বললেন একটু আলাদা ও আলভো ভাবে। এইভাবে ওরা আমাদের বাড়িতে ওদের পা রাখার ঠাঁই করে নিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তথা জয়প্রকাশজীও বাদ পড়েন না ওদের জাঁতাকুড়ে লালন-পালনের দায়ীত্ব থেকে। সুতরাং সাধারণ মানুষ খুব স্বাভাবিক ভাবেই ওঁদের আপন জন হয়ে উঠলেন। খুব ঘটা করে ওঁদের ক্ষমতায় বসিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

তারপরই শুরু হল বাস্তব ভিত্তিক এ্যাকশন যা দেখেছি—তা মনে পড়লে আজও আৎকে উঠতে হয়। পশ্চিম বাংলার মানুষ ওদের অবাঞ্ছিত সন্তানের মত ছুড়ে ফেলে দিলেন ভাইবীনে। আমরা আবার কাল বৈশাখীর নৃত্যতালিমের চমকের আওয়াজ—আভাস পাচ্ছি। আমার কথাগুলো প্রক্তিকটুই হবে, তা আমি স্বীকার করছি। কারণ এটা মিথ্যার বেসাতী দিয়ে পাটোয়ারী কায়দায় লেখা উপন্যাস নয়। পশ্চিম বাংলার তথা ভারতের জনগণের সামনে ঘনায়মান দুর্দিনে, রক্তিম-নিশীথিতের ক্ষণ অবলুপ্তির মুহূর্তে আমার কর্তব্যবোধ থেকেই সারা দেশের মানুষের কাছে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার চিন্তাশীল নাগরিক তথা বিবেকবান ছাত্র যুব সমাজের আবার ডাকছি। যা সত্য, তা যত পুরানোই হোক, যতবারই বলা যাক—তার রূপ কখনও পাল্টে যেতে পারে না। বার বার বলতে হয় এবং হবেও, শুধু মানুষকে, ভবিষ্যতের অনাগতদের জানিয়ে দেওয়া তথা মনে করিয়ে দেওয়ার তাগিদেই। পশ্চিম বাংলা আজ শুধু বঞ্চিত—অবহেলিতই নয়, নিন্দিতও। কিন্তু এখানকার শান্তিপ্রিয় গণতন্ত্রী মানুষ, অপশাসনের ফলে যা ঘটাই একান্ত ছিল-তা ঘটতে দেননি, তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেই অত্যাচার, শোষণ ও নীপিড়নের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করে ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন যুক্তফ্রন্ট সরকারকে। অবশ্য এই যুক্তফ্রন্ট সরকার একটি বাঙ্গালী পার্টনার দিয়ে কোম্পানীর ভিত্তিতে কিছুদিন কাজ করার পরই অংশীদারদের আসল রূপ প্রকাশিত হয়ে জনসাধারণের বাস্তব ভিত্তিক অভিজ্ঞতায়। তাঁরা যেমনি এনেছিলেন, ঠিক তেমনি বিদায় করতে বাধ্য হলেন।

আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ঐ পার্টনারশিপ কোম্পানীর অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের কর্মকর্তারা মহামান্য কার্লমার্কসের নামীয় আবরণ গায়ে জড়িয়ে হিসাব নিকাশের খাতার পাতায় চোখ বুলিয়েই একে অন্যকে নানা ধরণের রং-বেরংয়ের আখ্যা দিয়ে কাঁদা ছুড়তেন আর সেই কাঁদা যেন ঐ আবরনটি লক্ষ্য করেই তাঁরা ছুড়তেন। যাইহোক, মহামান্য মার্কস যে সময়ে, পরিবেশে, তখন যা বলেছিলেন—আজ তার কতটুকু এবং কি ভাবে প্রয়োগ করবো তা নিশ্চয়ই ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। পশ্চিম বাংলায় ১০/১১টা দল-উপদল হয়েছে—তার প্রত্যেকটি-ই নিজেকে আসল মার্কসীয় বলে বাজার 'মাৎ' করার চেষ্টা করছেন—সাধারণ মানুষের কাছে একটি প্রশ্নই বারবার এসে ধাক্কা মারছে ১০/১১টির মধ্যে কোনটি সত্যিই মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী? যদি সবকটি-ই মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী তাহলে ১০ টি কেন? আর যদি আমাকে

আমাকে মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী হতে হয়—তা'হলে ১০১১ টির কোনটি গ্রহণ ও বর্জন করবো? এটা আমাকে ঠিক করে নিতে হবে—কারণ, গ্রহন করার পক্ষে যুক্তি চাই ঠিক বাকীগুলো বর্জন করার পক্ষেও যথেষ্ট যুক্তি থাকতে হবে। কারণ বিশ্ব বরেণ্য মহামান্য কার্লমার্কসের নাম জড়িয়ে রয়েছে ঐ ১০।১১ টির প্রত্যেকটিতেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—ঐ ১০।১১ টি থেকে একটি বেছে নেওয়ার অধিকার আমার আছে কি না? নেই—কারণ, আমি বেছে নেওয়ার যুক্তি নিতে রাজি নই আর এই রাজি নই বেন—তা আপনিও জানেন। তাই ওদের পার্টনারশিপ কোম্পানী আমার-আপনার অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে মহাকরনে হিসাব-নিকাশ করেন—থাকেন। অবশ্যই এবার অংশীদারেরা সংখ্যায় একটু কম এবং অংশীদার ও দাবীদারের যোগাতা অর্জন করতে পারেননি। কেউ এসেছেন ওয়াকীং পার্টনার হিসাবে আর কেউ বা এসেছেন নেহাৎ নাম মাত্র মূলধন বিনিয়োগ করে—অতএব—চলছে—চলতে—দাও এই তো হচ্ছে আজকের অভিজ্ঞতা।

(পরের সংখ্যায় লক্ষ্য রাখুন)

অনুশীলন সতীর্থ বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন, ১৯৭৯

স্থান—মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও শহীদ যতীন দাস স্মৃতি সমিতি প্রাঙ্গণ

৪৭, চণ্ডীতলা লেন, টালীগঞ্জ, কলিকাতা—৪০

তারিখ—৭ই জানুয়ারী, ১৯৭৯, রবিবার।

প্রিয় বন্ধু,

অনুশীলন সমিতি সতীর্থগণের বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন এবার ৭ই জানুয়ারী ১৯৭৯, রবিবার টালীগঞ্জ ট্রাম ডিপোর অনতিদূরে, চালিহা মোলিং মিলের পিছনে, শ্রীশ্রীচণ্ডী মাতার মন্দিরের পাশে, ৪৭, চণ্ডীতলা লেন, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৪০, ঠিকানায় মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও শহীদ যতীন দাস স্মৃতি সমিতির প্রাঙ্গণে নিম্ন সূচী অনুযায়ী সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হইবে

এই অনুষ্ঠানে আপনার যোগদান ও সর্বতোভাবে সহযোগিতা প্রার্থনা করি। আপনার পরিচিত সতীর্থ বন্ধুগণকেও অনুগ্রহপূর্বক, অনুরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবেন।

॥ অনুষ্ঠান সূচী ॥

সকাল ৯-১০ ঘটিকা: উদ্বোধন—জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত, শহীদ বেদীতে মাল্যদান, প্রয়াত সতীর্থ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোদ্ধাদের স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন।

সকাল ১০-১১ ঘটিকা: প্রীতি বিনিময়। চা পানের অবকাশ।

পূর্বাহ্ণ ১১-১ ঘটিকা: বিচিত্রানুষ্ঠান।

মধ্যাহ্ণ ১-৩ ঘটিকা: মধ্যাহ্ণ আহারে বিরতি।

অপরাহ্ণ ৩-৫ ঘটিকা: স্বাগতভাষণ, প্রীতি ভাষণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সমাপ্তি সঙ্গীত।

বিনীত—

পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৮৯৪—১৮৯৬

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

এই প্রসঙ্গে এখানে একটি ঘটনার কথা বর্ণনা করতে পারি। ঘটনাটি কেবলমাত্র আমি নিজেই জানি; আর জানে আমার কয়েকজন আত্মীয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া মারা যাওয়ার পরে লর্ড কার্জন আমাকে তাঁর স্মৃতি সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। আমার মাতৃবর বন্ধু সেই সময়কার কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মিঃ গ্রীথার সাহেবের মাধ্যমে এ আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। ভাইস-রয় স্বয়ং সেই স্মরণ সভায় সভাপতির কাজ করবেন। আমাকে সেই সভায় রিজলিউসন তোলার ভার দেওয়া হল এবং কি ধরণের রিজলিউসন করব, তাও স্থির করার অনুমতি আমাকে দেওয়া হয়েছিল। জীবনে আমি যত বক্তৃতা করেছি, আমার বিবেচনায় আমার এই বক্তৃতাটি আমার অন্য সব উৎকৃষ্ট বক্তৃতার মধ্যে অন্যতম; আর এই বক্তৃতাটি আমি দেড় ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত করে ফেলেছিলাম। স্মরণ সভার আগের দিন সন্ধ্যায় আমি ১৬'×১২' পরিমাপের একটি কোঠা ঘরের এক কোণে একটি টেবিলের সামনে বসে লিখতে আরম্ভ করলাম; ওদিকে ঘরের আর এক কোণে আমার বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা তাদের নিত্য-সুলভ চপলতা ও স্ফূর্তি নিয়ে ক্রীড়া কৌতুক করছিল। তাদের এই ক্রীড়া কৌতুক আমার কাজে আদৌ কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি। তাদের এই অনর্থক চেঁচামেচির দিকে আমার মন মোটেই আকৃষ্ট হয়নি এবং আমার বক্তৃতা প্রস্তুতির কাজ শেষ করে গেলে আমি ওদের সঙ্গে যোগ দেই।

আমার শিক্ষকতা বৃত্তি আমাকে জনসভায় বক্তৃতা করতে খুব সাহায্য করেছে। কারণ, আমাকে ছাত্রদের ইংরেজী ক্লাসিক্যাল সাহিত্য পড়াতে হত। সেই ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের মধ্যে বার্ক, ক্লাউড, লর্ড ডেভেলি এবং আরও অনেকের বক্তৃতা ও রচনাবলী। এই ভাবে ইংরেজী ভাষার বড় বড় পণ্ডিতদের আমি সঙ্গ পেয়েছি, তাই তাঁদের চিন্তা ধারার সঙ্গে, তাঁরা যে পথ যে ভাব প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করতেন তার সঙ্গে আমার একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মে যায়। এদের মধ্যে আবার এডমাণ্ড বার্কের কাছে আমি সবচেয়ে বেশী ঋণী। বার্কের রাজনৈতিক দর্শনই আমার শাসনব্যবস্থা ও সমাজ জীবন সম্পর্কটি ধারণাকে এত অধিক পরিমাণে গড়ে তুলেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যত অন্যায় কাজ করেছে, তার মধ্যে একটাই ছিল বার্কের রচনা পড়ার বন্ধ করে দেওয়া। এই নিষেধাজ্ঞা অবশ্য এখন আংশিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে। আমার মনে হয় এই নিষেধাজ্ঞার পিছনে, অন্ততঃ কিছু সংখ্যক লোকের মনে, এই রকম একটা ধারণা ছিল যে বার্ক বিপ্লব মন্ত্র শিক্ষা দিচ্ছেন। চাকা ষড়যন্ত্র মামলায় এক বিজ্ঞ আইনজীবী তো কার্যতঃ বার্কের "reflection on the French Revolution" পুস্তকখানিকে সেই অর্থে উল্লেখ করেই বসলেন। তিনি ভুলে গেলেন যে প্রকৃতপক্ষে পুস্তকখানির মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী ভাষা ও যুক্তির প্রয়োগ করে সর্ব প্রকার বিপ্লবের বিরোধিতাই করা হয়েছে।

কংগ্রেসে উপস্থিত হওয়ার জন্য পুণা যাওয়ার পথে একদিনের জন্য এলাহাবাদে থেকে গেলাম। আমার জামাই ছিল এলাহাবাদে তার বাড়ীতেই থাকলাম। আমার জামাই কর্ণেল মুখার্জি একটি ভারতীয় রেজিমেন্টের চিকিৎসা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। "এ ডাইরেক্স" নামক পুস্তকের রচয়িতারূপে তিনি এখন সুপরিচিত। পুণার সভাপতিরূপে আমি যে ভাষণ দেব তার শেষ অংশটুকু তাকে শুনালাম। শুনে তিনি মন্তব্য করলেন, "বক্তৃতাটি বিশ বছর ধরে তৈরী হয়েছে।" মন্তব্যটি আমার কাছে অসাধারণ বুদ্ধির চাতুর্য ও অল্প-বিস্তর পরিমাণে সাধারণ-ভাবে প্রয়োগ যোগ্য বলে মনে হল। মন্তব্যটির অর্থ হল এই যে প্রকৃতপক্ষে আমি যে সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করেছি, এত বড় পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ সমাধা করতে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী সময় লেগে থাকবে। পূর্ব

পরিচিতির ছাড়া কোন প্রকৃত বড় কাজ হয় না, হতে পারে না। প্রকৃতির রাজ্যেই হোক, আর কোন শিল্প কর্মের ক্ষেত্রেই হোক, সহজ, সোজা পথ কোথাও নেই। পূর্ব-পরিচিতির ছাড়াই জন সভায় বক্তৃতা করে যে যশ পেয়ে বড় রকম সাফল্য অর্জন করা হয়, সে সব ক্ষেত্রেও প্রায়ই এটা দেখা যাবে যে সেই বক্তৃতার মূল নিহিত রয়ে গেছে সব জাতীয় কঠিন প্রয়াস সাধ্য কাজের মধ্যে। বাগ্মী পুরুষ তার মনের কোঠায় অনেক মহৎ চিন্তার ও সুন্দর সুন্দর কথার এক ভাণ্ডার সঞ্চিত করে রাখেন এবং তা সব সময়ই তার ইচ্ছা মত বিভিন্নভাবে একটি সঙ্গে আর একটি মিশে নিয়ে প্রকাশিত হওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। সেই চিন্তার লহরী ও শব্দাবলী এক নিবিড় সোত:স্ফূর্তায় তার মনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে; আর বাগ্মী পুরুষ তার বক্তব্যটি পেশ করার জন্য তা থেকে তার ইচ্ছা মত ভাব ও ভাষা চয়ন করেন এবং প্রয়োজন মত তার পরিবর্তন সাধন করে নেন। প্রকৃতি এবং সংস্কার বলেই বাগ্মী পুরুষ নিয়ত এ জগতের বিগত দিনের অমর মনীষিগণের সান্নিধ্য বাস করেন এবং তাঁদের নিশ্বাস বায়ুর সৌরভে পুরিত নিকেতনে বেঁচে থেকে স্বকীয় প্রয়াস চালিয়ে যান। তার শিক্ষা, তার যোগ্যতার আনুসঙ্গিক সজ্ঞাপাটের মূল ভিত্তিই নৈতিকতার উপর স্থাপিত, বুদ্ধির উপরে নয়। হৃদয় তাকে প্রেরণা দেয়, উদ্বুদ্ধ করে; আর বুদ্ধি যোগায় বিনয়, ধার করার প্রবণতা। কার্লাইল বলেছেন সমস্ত মহৎ চিন্তার উৎসস্থল হল হৃদয়, আর হৃদয় থেকে বেরিয়ে এসে বুদ্ধিকে দিয়ে তা কাজ করে। বাগ্মীতা হচ্ছে আবেগ সমৃদ্ধ যুক্তি, অন্তরাত্মার ব্যাকুলতা-মণ্ডিত স্বদেশ প্রেম ও মানব-প্রীতি। যে কথা অন্তরে দৃঢ়ীভূত হয়, উদ্ভূত হয় এবং স্ফূর্তিতে নির্গত করে কেবলমাত্র তাই অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে দেয় এবং সেই অবস্থায় হৃদয়ই জিহ্বাকে স্বর্গীয় অনলে স্পর্শ করে।

পুণাচ আমার সভাপতির ভাষণটি বেশ প্রশংসা অর্জন করেছে। খ্যাতনামা লেখক স্যার চার্চিল টেলিগ্রাম করে আমাকে জানালেন যে আমি যে রকম নিখুঁত ভাবে আমার বক্তৃতার উপসংহার করেছি তাতে তিনি খুব খুসী হয়েছেন। পুণা এবং অন্যত্র আমাকে বিজয়োল্লাসপূর্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় তাতে কলকাতায় বেশ সাড়া পড়ে যায়। একজন রাজনৈতিক আন্দোলনকারী স্কুল-মাষ্টার তার নিজ প্রদেশের বাইরে এই সম্মান পেয়েছে, এই তাজ্জব উপর থেকে আরম্ভ করে অফিসের সরকারী প্রকৃতিরও হৃদয় স্পর্শ করল। আমি নিজেও এই আন্তরিক সম্বর্ধনার আয়োজন দেখে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। আমার বক্তৃতার উপসংহার কালে সভামণ্ডপে যে দৃশ্যটির সৃষ্টি হয়েছিল সেই দৃশ্যটির কথা আমি ভুলতে পারছি না। কংগ্রেসের সভার কার্য পরিচালনার রীতিনীতি আমার জানা ছিল, এবং তদনুযায়ী অধিবেশন শেষ হওয়ার সময় কি বলব তা আগে থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছিলাম। দেখলাম যেন সভামণ্ডপে বিদ্যুৎ খেলে গেল। সমস্ত পরিবেশ যেন সেই বিদ্যুতের স্পর্শে চকিত হয়ে জেগে উঠলো, যেন অনুভূতির প্রবল উচ্ছ্বাসে তা টলমল করতে লাগল। আমি নিজেও এতটা ভাবাবেগের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। অবস্থার প্রকৃত মর্মটি বুঝে নিয়ে আমার তৈরী করা বক্তৃতাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মনে প্রাণে সেই উদ্বেল জনতার আবেগের পরিপূর্ণ বন্যার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমার হৃদয় আন্দোলিত হতে লাগল; ভেসে গেলাম সেই জয়-কীর্তিমান আবেগ প্রবাহে। পরিস্থিতি আর এ রকম রইল না যে বক্তা তার শ্রোতাদের অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। শ্রোতারাই বক্তার চিত্তকে আন্দোলিত করে তাকে জাগিয়ে তুলল, তাকে অভিভূত করে তার চিত্তে প্রেরণার সঞ্চার করল। সত্যিই তাদের ও আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন এক সংযোগকারী বিদ্যুৎ প্রবাহের আবির্ভাব ঘটল। আমি না ভেবে চিন্তে আবেগের বশে বক্তৃতা করে চলেছিলাম। বাস্তবিকই এ সময় যা বলেছিলাম তা না ভেবে-চিন্তে আবেগের বশেই বলে যাচ্ছিলাম। বক্তৃতা শেষ করে যখন বসে পড়লাম, তখন তরুণ শ্রোতারা মঞ্চের দিকে ছুটে এসে আমার পা ছোঁয়ার ও পায়ের ধুলো নেওয়ার জন্য আমার কাছে এসে ভিড় জমাল। মুহূর্তের জন্য আমি গৌরবময় অতীতের দিনগুলির দিকে তাকালাম। অতীতের সেই শক্তি, সেই প্রতিভা যেন মূর্তি ধরে আমার সামনে আবির্ভূত হল; আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে কি আশ্চর্য শক্তি বলে এই ভূখণ্ডের পিতৃ-পুরুষগণ বর্তমান যুগের সর্ব শ্রেষ্ঠ হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেই মিলনের স্মৃতি আমার মন থেকে কখনই মুছে যাবে না। আমার জীবনে এই স্মৃতি একটি পরম গৌরবের বিষয় হয়ে রয়েছে।

কলকাতা ফেরার পথে আমাকে এলাহাবাদে নামতে হল ; কারণ সেখানে আমার ভৃত্যটি সাংঘাতিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। রাজা বিনয়কৃষ্ণদেব বাহাদুরের নেতৃত্বে আমার বন্ধুগণ শিয়ালদহ ষ্টেশনে আমাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এক বিরাট জনসমাবেশের আয়োজন করেন। হুগলীতে আমি গাড়ী বদল করে নৈহাটি হয়ে শিয়ালদহ আসি। ষ্টেশনে জনতার ভিড় এত প্রবল হয়েছিল যে রাজা নিজেই ঘুড়িত হয়ে পড়লেন এবং আমি নিজেও আমার গাড়ীতে উঠতে চরম অসুবিধার মধ্যে পড়ে যাই।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ ছিলেন আমার এক পরম বন্ধু। তাঁর বাবা স্বর্গত মহারাজা কমলকৃষ্ণ এবং আমার বাবা—এরা দুজনে ছিলেন এক স্কুলের ছাত্র। তাই বংশানুক্রমে আমাদের মধ্যে একটা পারিবারিক বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল। তাঁর ভ্রাতা মহারাজ কুমার নীলকৃষ্ণ এবং তিনি নিজে দু-ভাইই বলতে গেলে আমার রাজনৈতিক শিষ্য ছিলেন। তাঁরা জীবনের প্রথম বয়সেই ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে যোগদান করেন ; সমিতির কাছে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং রাজনৈতিক কাজ-কর্মে বেশ একটা মানসিক প্রবণতা অর্জন করেন। মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণের উদ্দেশ্যের সততা ও চারিত্রিক গুণাবলী তাঁর সম্পর্কে তাঁর বন্ধু মহলে বেশ উচ্চ আসন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের খুব ক্ষতি হয়েছে এবং তাঁর বন্ধুগণ ও তাঁকে যাঁরা জানতেন, তাঁরা সকলেই গভীরভাবে তাঁর বিয়োগ ব্যথা অনুভব করেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ মাঝে মাঝে কাজের চাপে যাবা পাওয়ার ফলে সময় সময় কিছু দিনের জন্য কাজে বিরত থাকলেও তাঁর ভ্রাতারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন। ১৮৯৭ সালের কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়, তাতে তিনি এক অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী এক বেঙ্গলী লিটারেচার এবং নেশোনোলেই সোসাইটি নামে আর একটি স্মরণীয় প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। আমার প্রতি তাঁর সর্বদাই একটা আন্তরিক প্রীতি ও সহৃদয়তার ভাব ছিল। দৈনিক "বেঙ্গলী" পত্রিকা প্রকাশ করতে ও রিপণ কলেজের বাড়ী নির্মাণের জন্য অর্থ ভাণ্ডার গড়ে তুলতে তিনি আমাকে সাহায্য করেছিলেন। তাছাড়াও অন্য যে কাজে যখনই তাঁর সাহায্য প্রয়োজন হয়েছে, তা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। তাঁর সামাজিক পদ মর্যাদা এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের সীমা বেষ্টনীর মধ্যে সরকারের বিরোধিতা করা একটা বেশ কঠিন ব্যাপার ছিল। এই সীমার মধ্যে থেকেই তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। তা হলেও তিনি বাঙালী সমাজের একজন পরম বন্ধু ছিলেন। তিনিও অপরিণত বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আমার কাছে, এবং কাজের দায়িত্বে অন্য যাদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, সকলের কাছেই তাঁর মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও ক্ষতিকর হয়েছে বলে অনুভূত হয়।

ঠিক হল ১৮৯৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হবে কলকাতায়। সুতরাং বারুণ কাজের চাপ পড়ল আমাদের উপর। একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হল। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র হলেন সেই সমিতির চেয়ারম্যান। স্যার রমেশচন্দ্র ছিলেন একজন খ্যাতনামা জজ। তিনি সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন। এরকম একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিকে এই কাজের মধ্যে পাওয়া একটা বড় রকমের ঘটনা। তাঁকে কংগ্রেসে যোগদান করতে রাজি করাতে কোন প্রকার যুক্তির অবতারণা করে বুঝাতে বা চাপ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়নি। আমাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির মধ্যে কোন প্রচ্ছন্নতা ছিল না। তা ছিল একেবারে খোলাখুলি প্রকাশ্য। তবে জাস্টিস রাণাডের মত বিচার বিভাগীয় চাকরীতে নিযুক্ত থাকাকালে কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হতে বা কংগ্রেসের আলোচনার প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান-রূপে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র একটি স্মরণীয় বক্তৃতা করেন। তিনি আমার কাছে কিছু কিছু তথ্য চেয়েছিলেন। আমি সানন্দে তা তাঁকে দিয়েছি। কিন্তু তাঁর বক্তৃতা ছিল তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। বক্তৃতার প্রত্যেকটি কথার মধ্যেই ছিল তাঁর স্বকীয় অভিমত ও ব্যক্তিত্বের ছাপ। তাঁর বক্তৃতায় তিনি এমন একটা কথা বলেছিলেন যা সবচেয়ে বেশী স্মরণ করার মত ও প্রণিধানযোগ্য ; এবং তাঁর মত লোকের মুখে এ কথা ব্যক্ত হওয়ায় কথাটির একটা নিজস্ব মূল্যও আছে। তিনি বলেছিলেন যে শিক্ষিত সমাজই প্রধানতঃ দেশের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা ও বিবেকের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তারাই প্রকৃত পক্ষে অশিক্ষিত জন-সাধারণের মুখপাত্র এবং স্বাভাবিক ভাবেই তাদের স্বার্থের রক্ষাকর্তা। (চলবে)

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় বিপ্লবীরা বুঝতে পারেন নাই যুদ্ধ এত শীঘ্র আরম্ভ হবে। এজন্য তারা এই মহাসমরের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরাও মনে করেন নাই যে ইংরেজের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ হঠাৎ আরম্ভ হয়ে যাবে। তাই যুদ্ধ যখন আরম্ভ হল তারা ভারতে এসে ভারতীয় সৈনিকদের হাত করাই বিপ্লবের একমাত্র উপায় বলে স্থির করলেন। সহস্র সহস্র শিখ বিদেশে সকল আস্তানা গুটিয়ে স্বদেশাভিমুখে রওনা হলেন। আমেরিকায় এরা প্রকাশ্য জনসভায় ভারতের বিপ্লব সম্পর্কে বক্তৃতা করতেন গদর পত্রিকায় প্রকাশ্য-ভাবেই বিপ্লবের কথা মুদ্রিত হত। আমেরিকায় ভারতীয় মহলে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের তারিখ ১০ই মে এক উৎসবরূপে পালিত হত। বিভিন্ন জার্মান কনসালেরা ভারতীয় বিপ্লবীদের নানা দেশে সাহায্য করছিলেন। যারা আমেরিকা ত্যাগ করে ভারতের দিকে আসছিলেন তারা পথে আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে থাকেন। এইরূপ একটি দল জাপানের বন্দরে উপস্থিত হবার পরে ভাই পরমানন্দ এদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। পরমানন্দের বাড়ী ছিল ঝাঁসীতে। পরে তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে ছিলেন। আন্দামানে সকলে একে বলতো ছোট পরমানন্দ। আন্দামানে আরও একজন পরমানন্দ ছিলেন তাকে বলা হত বড় পরমানন্দ। তিনি ডি. এ. ভি. কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ইনিও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। শিখদের মধ্যে ভাই আখ্যা সম্মান-সূচক। এজন্য বিপ্লবীরা সকল শিখকেই ভাই শব্দ যোগ করে ডাকতেন। ভাই ভগবান সিং শিখদের একজন আর্ত উৎসাহী নেতা ছিলেন। আমেরিকার তার বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে অনেক শিখ নিজেদের কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে বিপ্লব কার্যে যোগ দিয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন এরা যে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনাবশেই একাজ করেছিলেন তা নয়। সত্য সত্যই দেশ সেবার একটা প্রেরণা এদের ভিতর জেগেছিল। ভারত প্রত্যাগত এই সকল শিখদের মধ্যে কেউ কেউ শোনাংএ সামরিক পুলিসের কাজ করতেন। কেউ কেউ হংকং এ পাহারাওয়ালা ছিলেন। আবার কেহবা ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। এই সময় হংকং এ এক শিখ রেজিমেন্ট ছিল। বিপ্লবী শিখরা এই রেজিমেন্টকেও বিপ্লবপন্থী করে নেন। বিদেশে সৈনিকবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে এরা ভারতে চলে আসেন। এদের মধ্যে অনেকে দশ এগার বছর পর্যন্ত সৈনিকবৃত্তির কাজ করছিলেন। যে সকল বিপ্লববাদী পূর্বে সৈনিক ছিলেন তাদের ভিতরে ভিতরে এমন একজনও ছিলনা যার অভিজ্ঞতা তিন বছরের কম। অনেকে মেশিন-গানের চালক ছিলেন কেউ কেউ তোপখানার কাজও করতেন।

ভারত প্রত্যাগত এই সকলেরই অদম্য উৎসাহ

ছিল। কিন্তু কি করতে হবে সে সম্পর্কে এরা অনেকেই অনভিজ্ঞ ছিলেন। এদের না ছিল কোন কেন্দ্র না ছিল শাখা সংগঠন। একজনের অধীনে কুড়ি থেকে পঞ্চাশজন পর্যন্ত লোক ছিল। তাকে বলা হত ঐ দলের সর্দার। এরা মাঝে, মাঝে একত্র হতেন আবার বহুদিন পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে কোনপ্রকার দেখা সাক্ষাৎই হোত না। ফলে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এদের উপর নজর রাখা সহজ হয়েছিল। কিছু সংখ্যক শিখকে জেলে আসামাত্র জেলে আবদ্ধ করা হয়েছিল। মূলতান জেলে যারা আবদ্ধ ছিলেন তারা জানত শীঘ্রই বিপ্লব আরম্ভ হবে এবং তাদের সবাই জেল মুক্ত করা হবে। তারা প্রকাশ্যভাবেই এ সব কথা বলতেন। ফলে তাদের বিভিন্ন জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আমেরিকায় বাস এইসব গদর বিপ্লবীরা বাঙলার বিপ্লব পন্থীদের খবর রাখতেন। তাহতে এসেই এরা বঙলার বিপ্লবীদের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু আলাপ পরিচয় না থাকায় তাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। আমেরিকা থেকে যারা এইভাবে ভারতে এসেছিলেন তাদের মধ্যে কজন বিশিষ্ট সর্দার ছিলেন কর্তার সিং ভিমি কলকাতায় এসে সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাঙলার বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিয়ে দিতে বলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাকে নিজেদের সুযোগ সুবিধামত কাজ করে যেতে বলেন এবং জানান যে বাঙলা ঠিক সময় তাদের সাহায্য করবে।

বিপ্লবীরা মনে করেছিলেন দেশে এলেই পাঞ্জাবী সৈনিকদলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে তাদের বিপ্লবকার্যে নিয়োগ করবেন। তাই প্রথমদিকে অস্ত্রশস্ত্রের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয় নাই। কিন্তু দেশে আসার পরে দেখা গেল যারা নেতৃস্থানীয় তাদের সকলেরই কিছু কিছু অস্ত্র প্রয়োজন। তা ছাড়া আত্মরক্ষার জন্যেও কিছু রিভলবার প্রভৃতির আবশ্যক হল। এজন্য কিছু টাকা দিয়ে জগৎরাম নামে এক শিক বিপ্লবীকে কাবুলের দিকে পাঠানো হল। কিন্তু কাবুলের পথে পেশোয়ারে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যান এবং তাকে কারারুদ্ধ করা হয়। ঝাঁসীর পরমানন্দকেও এই অস্ত্র সংগ্রহের জন্যই বাঙালাদেশে পাঠানো হয়েছিল তার এ প্রচেষ্টাও সফল হয় নাই।

(চলবে)

যাবতীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র
প্রাপ্তিস্থান শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
হিকলকাটা কুটীর • কুমার পুকুর • বরাহনগর • ২৪ পরগণা

প্রবীন বিপ্লবীর পত্র

'বিপ্লবী বাংলার' স্বাধীনতা সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লিখিয়াছেন, 'কংগ্রেস বিপ্লব ভুলিয়া দিয়াছে, সে জনতাকে স্বাধীনতার পরবর্তী অধ্যায়ে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই। কিন্তু আমরা কি পারিয়াছি? সিন্ধিস্তানের জন্য যে প্রাণদেয় সে ভগৎ সিং হয় না কেন? মাদ্রাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছোট করিয়া অন্ধ্রপ্রদেশ গড়িবার জন্য যে প্রাণ দেয় সে দেশব্যাপী দুর্নীতির অবসানের জন্য প্রাণ দেয় না কেন? মানুষ ত প্রাণ দিতেছে, তবে সে সংযুক্ত মহারাষ্ট্র বা মহাগুজরাট গড়িবার জন্য প্রাণ না দিয়া আজিকার খণ্ডিত ও অপরিচিত ভারতকে মহাভারতে রূপান্তরিত করিবার জন্য প্রাণ দিতে আগাইয়া আসে না কেন?

".....রক্ত দিয়া যে স্বাধীনতা জয় করা হইয়াছিল সেই স্বাধীনতাকে যাহারা ব্যর্থ করিয়া দিতেছে রক্ত দিয়া সেই রক্তের ঋণ তাদের একদিন অবশ্যই পরিশোধ করিতে হইবে....."

দুর্নীতির অবসানের জন্য, রক্ত দিবার এই যে আহ্বান স্বাধীনতা দিবসে জানাইয়াছেন, ইহা বাস্তবিকই আমাদের আজিকার এই খণ্ডিত ভারত জীবনের বলিষ্ঠতম এবং প্রধানতম আহ্বান। এই আহ্বানকে সুসংগঠিত রূপ দিয়া চাক্ষুষ করিবার শপথ গ্রহণ, বালেশ্বর দিবসের শপথ হউক। ইহা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি।

১৯৪৭-এর পূর্বেও দেশে অসংখ্য প্রকার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্য বহুবিধ সমস্যা ছিল। কিন্তু আমাদের বহুমুখী বিবিধ মনোভাব সত্ত্বেও ইংরেজের শাসন হইতে স্বাধীনতা অর্জন করাটাকে সর্ব প্রথম কর্তব্য বলিয়া মানিয়া লইয়া কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ঐ একটি অভিষ্টসাধনে বিপ্লবীরা ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বাধীনতার পরবর্তী এই যুগেও একটি সমস্যা এতই প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে যে উহার সমাধানকে অগ্রাধিকার দিয়া অগ্রসর না হওয়ার জন্য অন্য সব সাধু প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে। ইহা হইল নীতি বোধের সমস্যা। বলিষ্ঠ প্রাণবান নীতি-বোধের বাঁধুনী ছাড়া কোন কিছুই দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে না। এই অভিজ্ঞতা বর্তমানে সর্বজনগ্রাহ্য।

পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের কথা জহরলাল হইতে সুরু করিয়া যখন যে যেখানে গদীতে বসিয়াছেন, সকলেই একবার করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ফল কিছুই হয় নাই, বরং অধোগামিতাই ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। কেন এরূপ হইল, কেন এরূপ হইতেছে সে সবের বিশদ আলোচনার প্রয়োজন বেশী নাই। কারণ বহু কথা, বহু বিশ্লেষণ, গত বিশ বছরে বলা হইয়াছে। এখন প্রয়োজন কোমর বাঁধিয়া ঝাঁপাইয়া পড়া। আসুন, দুর্নীতির অপরিচ্ছন্নতা ঝাঁটাইয়া সাফ করার জন্য আশীর ওপারের বৃদ্ধগণ হইতে যুবক কিশোর বালকগণ পর্যন্ত সকলে শপথ গ্রহণ করিয়া সংগঠিত শক্তি লইয়া মাঠে নামিয়া পড়ি। শাসন কর্তারা যদি সুশাসন করিতে না পারেন তবে সর্বসাধারণকে কাতার বাঁধিয়া সম্মার্জনী এবং ঝাড়া হস্তে জাতির জীবন প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিতে হইবে।

বিপ্লবী বাংলার জনৈক বৃদ্ধ পাঠক।

জাতীয় সমস্যা সমাধানের উপায় চিন্তা

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনোত্তর ভারতে যে সমস্যাগুলি অগ্রগতির পথে অনতিক্রম্য বাধা সৃষ্টি করছে, সেগুলি আশু সমাধান ব্যতিত দেশের অগ্রগতি স্তিমিত ও অনর্থক হয়ে পড়বে; ফলে পরাধীন ভারতের চেয়ে স্বাধীন ভারতের অবস্থা সকল দিক দিয়ে আরো হৈরাশ্যজনক বলে বোধ হবে। স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়বে, দেশ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থাকতে বাধ্য হবে। ঈপ্সিত ফল লাভ কিছুতেই, কোনদিনই অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে না। সমস্যাগুলি হচ্ছে, সংহতির অভাব, দূষিত পরিবেশ, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি দারিদ্র, অশিক্ষা, ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা, বেকারী এবং কৃষি ও শিল্পোৎপাদনে মন্থরতা ইত্যাদি। এ ছাড়া আরো বহু ছোট বড় সমস্যা আছে, কিন্তু উক্ত মূল সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য জনগণ, বিশেষ করে বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী নিঃস্বার্থ কর্মীরা এবং সরকার ও বিরোধীদলগুলি যদি একযোগে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে দেশ-কল্যাণে এখনও না ব্রতী হন তবে ভারত সুদূর অতীতকালের মত পুনরায় বিচ্ছিন্ন ও শতধা বিভক্ত হয়ে যাবে এবং স্বাধীনতাও সুদূর হবে। সংহতির একান্ত আবশ্যক সর্বপ্রথমেই, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে যে বর্ত্তমান ভারতে সংহতির অভাব এত অধিক যে তা যে কোন সময়েই দেশের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে; এমন কি দেশরক্ষা কার্য্যকে পর্য্যন্ত বিঘ্নিত ও বিপর্য্যস্ত করতে পারে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে ভুল বোঝাবুঝি ও অসহিষ্ণুতা এবং পরস্পরের মধ্যে দারুণ অবিশ্বাসের ও হিংসার প্রবণতা এখন দেখা যায় তা নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতের পক্ষে বিপদ-জনক ও ক্ষতিকারক। প্রাদেশিকতা যে ভাবে ও ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে আত্ম প্রকাশ করে তা যে মোটেই কাম্য নয়, বরং দেশ, রাষ্ট্র ও জনগণের পক্ষে একান্ত অনভিপ্রেত ও মারাত্মক—সে কথা সকলেই বোঝেন ও স্বীকার করেন। তবুও যে কেন প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাতের লড়াই এদেশে প্রায়শই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, সেটাই বিপদের বলিষ্ঠ সংকেত এবং এইরূপ ঘটনাগুলিই দেশের সংহতির পক্ষে হুমকি। সংহতি বিনষ্ট ঘটলে রাষ্ট্রের ও সাধারণ মানুষ যে কেবল বিপদগ্রস্থ হবে তা নয়, দেশ বিপন্ন এমন কি ধ্বংস প্রাপ্ত হতেও পারে, তাই সংহতি রক্ষার জন্য সব রকম যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তার জন্য যেন সরকার ও সরকারী দলকে এগিয়ে আসতে হবে দ্রুততার সঙ্গে, তদ্রূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিরোধী দল-গুলিকেও এ কাজে অগ্রণীর ভূমিকা নিতে হবে। নঃচেৎ দেশ ধ্বংস হলে, অকারণ দেশ হিংসায় মেতে উঠলে বা যত্র-তত্র প্রজ্জ্বলিত হলে, সরকার বা বিরোধীরা কেউ এর দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে সুখে বিচরণ করতে ত পারবেনই না; উপরোক্ত এই সংহতি নষ্টের জন্য সকলেই দুঃখের ও দুর্দশার শরিক হতে বাধ্য হবেন এবং সকলের কাছেই নিন্দিত ও দোষী সাব্যস্ত হবেন।—সারা ভারতে পরিবেশ যে জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে ইতিমধ্যেই বেশ দূষিত হয়ে মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা ও পুরাকীর্তিগুলির ধীরে ধীরে ক্ষতি সাধন করছে সে বিষয়ে এদেশের ও বিদেশের বৈজ্ঞানিকরা একমত। জ্ঞানী-গুণীজনেরা বারে বারে সরকারকে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিচ্ছেন এবং যথাসম্ভব এর প্রতিকারের পন্থা বাতলে দিচ্ছেন। সরকার হালে এ বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক হয়ে পরিবেশ বিশুদ্ধ রাখার জন্য সচেষ্ট বলে সংবাদে প্রকাশ। কিন্তু যতদিন না 'ডিজেল' তেলে চালিত রেল, বাস, লরি ও অন্যান্য যন্ত্রগুলি অন্য উপায়ে চালিত হওয়ার ব্যবস্থা হয় ততদিন যে ঐ তেলের গ্যাস ও ধোঁয়া সহরবাসীর

স্বাস্থ্য নষ্ট করবে এবং তা অতিরিক্ত মাত্রায় সে বিষয়ে কেহই নিশ্চয় দ্বিমত নয়। 'ডিজেল' চালিত যে কোন ইঞ্জিন যে অধিক মাত্রায় অত্যন্ত ক্ষতিকারক বিষাক্ত ধোঁয়ার পরত ও পহর লাগোয়া গ্রাম বা আধা শহরের স্বাস্থ্যহানি ঘটায় সে কথা কে না জানে। অথচ এই অস্বাস্থ্যকর বিষাক্ত পরিবেশের শিকার হয়ে মানুষ অকালে ফুসফুসের ও অন্যান্য রোগের আক্রমণে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়। এর কোন প্রতিকারের ব্যবস্থার কথা এখনও কোন সূত্রেই শুনা যায়নি। এই বিষাক্ত পরিবেশ কতদিনে যে পরিশুদ্ধ হবে তা এখনও জানা যায়নি, কারণ সরকার এ ব্যাপারে কেন যে এখনও নীরব দর্শক ভূমিকায় না বলে না হতে অবস্থায় নিশ্চল হয়ে রয়েছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন কলে কারখানায় ও গৃহস্থের রান্নার জন্য ব্যবহৃত কয়লার গ্যাস ও ধোঁয়া যে আজ অতিরিক্ত মাত্রায় আবহাওয়া তথা পরিবেশকে দৈনিক দূষিত করছে, সে কথা অনস্বীকার্য। এরও আশু প্রতিকার জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বিশেষ প্রয়োজন। বিভিন্ন কাগজকল, রাসায়নিকদ্রব্য ও সার প্রস্তুতের কারখানাগুলিও আকাশে-বাতাসে ও নদীতে যে বিষাক্ত গ্যাস, ধোঁয়া এবং পরিত্যক্ত ক্ষার ও জলাল ছাড়ে তাও পরিবেশকে দোষযুক্ত করে। এইসব কারণে ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর-নদীর জল দূষিত ও সময়ে সময়ে এত বিষাক্ত হয় যে তা মানুষের ব্যবহারের বা জীবজন্তুর পানীয়ের পক্ষে চরম ক্ষতিকারক হয়। বাস্তবে দেখা যায়, এইসব মারাত্মক ক্ষতির সম্বন্ধে কেহই সজাগ ও সতর্ক নয়; এমন কি সরকারও এ ব্যাপারে উদাসীন, তবে যখন ক্ষতি বাস্তবে রূপায়িত হতে শুরু করে এবং বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে হৈ চৈ আরম্ভ করে দেন, কেবল তখনই সরকারী কর্তা বা আমলাদের টনক নড়ে নচেৎ নয়।

ইহা সত্যই সরকারী ব্যর্থতা ও পরিতাপের বিষয়। সুস্থ থাকতে দূষিত পরিবেশের বিশুদ্ধি করণ জনস্বাস্থ্য রক্ষায় একান্ত প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়া অন্যকোন পথ নেই। পরিবেশ বর্তমানে যে ভাবে দূষিত হতে আরম্ভ করেছে এবং তার মাত্র এত অধিক যে সময় থাকতে তার প্রতিকার যদি না হয় তবে ভারতের বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক পুরাকীর্তিগুলি কালের গর্ভে ক্রমশ বিলীয়মান হবে অথবা বিকৃত অবস্থায় অবস্থান করবে যা কোনক্রমেই কাম্য নয়। পরিবেশ দূষণ আজ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, অচিরেই সেদিকে লক্ষ্য রাখা ও তার সাথে তার আশু প্রতিকার বিশেষভাবে জাতীয় স্বার্থে এবং মানব কল্যাণে অত্যাবশ্যক। বিদেশীরা যে হাইড্রোজেন বা নিউট্রন বোমা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করছে তার তেজস্ক্রিয়া যে ভারত মহাসাগর ও সন্নিহিত এলাকাগুলি পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে, সে বিষয়েও সরকারের সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা ও তার নিবৃত্তির ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ হওয়া জনস্বার্থে বিশেষ প্রয়োজনীয়। নিরক্ষরতা জাতীয় জীবনে এক মস্ত অভিশাপ স্বরূপ, ইহা দূরীকরণ ব্যতীত জাতীয় জীবনে মুক্তি ও শান্তি নেই। তাই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে মনোযোগী হয়েছেন, ইহা সুখের কথা। ইতিপূর্বে শ্রীযুতা গান্ধীর আমলেও এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রচেষ্টা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়েছিল, কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া সম্ভব হয়নি; কারণ জনগণের পক্ষ থেকে যথোপযুক্ত সাড়া ও সহযোগীতা পাওয়া যায়নি। এবারেও যদি সরকারের উপর পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হই, তবে ব্যর্থতা অনিবার্য। নিরক্ষরতা দূরীকরণে সর্বাগ্রে নিঃস্বার্থে দেশ কর্মী-যথা: প্রাক্তন বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এগিয়ে এসে এর হাল ধরা ও এই কার্যকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা একান্ত দরকার, নচেৎ তাঁদের সাধের, ভারত সুখী ও সমৃদ্ধ ভারত গড়া কি ভাবে সম্ভব হবে? অতীতে তাঁরাই একাজে অগ্রনীর ভূমিকা গ্রহণ করে অসাধ্য সাধন করার প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং তাঁরই এর যোগ্য। তাঁদের মধ্যে যাঁরা শারীরিক অক্ষমতার বা রোগগ্রস্থতার অপারগ তাঁরা ছাড়া অন্যান্যেরা এই কাজের ভার না নিলে এবং সরকার তাঁদের সহিত সর্ববিষয়ে সহযোগীতা না করলেও প্রয়োজনীয় সাহায্য না দিলে, মনে হয়, নিরক্ষরতা দূরীকরণ অথই কষ্টসাধ্য কাজ হবে।

(চলবে)

বিজ্ঞাপন প্রচারের উপযুক্ত মাধ্যম

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রকাশিত

পশ্চিমবঙ্গ

(বাংলা সাপ্তাহিক)

প্রচার সংখ্যা : ৭০,০০০

প্রতি সংখ্যা— ২০ পয়সা বার্ষিক সডাক—১০ টাকা

●

শ্রমিক বার্তা

(হিন্দী পাক্ষিক)

প্রচার সংখ্যা : ২০,০০০

প্রতি সংখ্যা— ১০ পয়সা বার্ষিক সডাক—১·৫০ পয়সা

●

ওয়েষ্ট বেঙ্গল

(ইংরাজী পাক্ষিক)

প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০

প্রতি সংখ্যা—২০ পয়সা বার্ষিক সডাক—৫ টাকা

●

এছাড়া, সাঁওতালী পাক্ষিক 'পশ্চিম বাংলা'

এবং উর্দু পাক্ষিক 'মগরেবী বঙ্গাল'

পত্রিকা দুটিতেও বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয়।

●

বিজ্ঞাপনের হার ও অন্যান্য তথ্যাদির জন্য

নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :—

তথ্য অধিকর্তা

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—৭০০০০১

আই সি এ—১০০৪৩/৭৮

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	CALCUTTA		
Chakraborty Smt. Kamala w/o Late Tarapada Chakraborty	10/90/1, Bejoygarh, Calcutta-32	150	26. 7. 78
Chatterjee Jyotimaya	4/3C, Bejoygarh, Calcutta-32	200	1. 4. 78
Dey Smt. Nirupama w/o Late Jyotirmoy Dey	10/2/1, Tilbagan Lane Calcutta-17	150	23. 5. 78
Gangopadhyay Sukumar	159A, Bepin Behari Ganguly St. Calcutta-12	200	1. 8. 77
Ghosh Smt. Protiva Rani w/o Late Nagendranath Ghosh	349, Atta Mohammad Rd , Cal. 28	150 (instead of	15. 8. 72 29. 3. 74)
Paul Ambika Charan	8/1, Taramoni Ghat Road Calcutta-41	200 (+ State Pension)	1. 10. 76
Roy Kalidas	54A, Shyampukur Street Calcutta-4	200	1. 4. 75
Saha Nikunja Behari	418, Rabindra Sarani Calcutta-6	200 (instead of	15. 8. 72 20. 9. 73)
Sanyal Smt. Labanya w/o Late Purnananda Sanyal	5/1, Barikpara Road, Calcutta-24 Calcutta-3p	100	19. 5. 76
	East—24-PARGANAS		
Chowdhury Smt. Abha Rani w/o Late Sushil Chowdhury	Rajbandigarh P. O. Garifa (Naihati)	200	3. 2. 78
Dutta Smt. Gopa d/o Late Pabitra Kiron Dutta		100	20. 11. 75
Majumdar Probodh Chandra	124/8 Ashokenagar P. O. Ashokenagar	200	28. 3. 74
Nandi Jogesh Chandra	Champaberia Colony P. O. Bongaon	200	13. 1. 74
	Dist—HOWRAH		
Golui Debendra Nath	Vill Sandipur. P. O. Joynagar	100	8. 4. 78

(Contd. on next page)

(Contd. from previous page)

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Dist—HOOGHLY		
Hazra Sannyasi Charan	Vill Radhaballavpur P. O. Patul	200 (+ State Pension)	1. 10. 76
Jash Smt. Binapani w/o Late Gadadhar Jash	P. O. & Vill Belia	100	22. 5. 78
	Dist—BURDWAN		
Chaudhury Dharmadas	P. O. & Vill Karanda P. S. Monteswar	200	1. 4. 78
Saha Subodh Chandra	B/1/18/4, V. K. Nagar P. O. Durgapur-10	200 (+ State Pension)	11 10. 76
	Dist—BANKURA		
Devi Smt. Trinayani w/o Late Nemai Dogharia		100	29. 8. 78
	Dist—MIDNAPORE		
Das Smt. Mandakini w/o Late Sripati Charan Das	P. O. & Vill Srirampur	100	29. 6. 78
	Dist—NADIA		
Chakraborty Smt. Maya w/o Late Suresh Chandra Chakraborty	Badkulla, P- S. Hanskhali	100	5. 7. 78
Present Address :— Sudhanya Bhavan H. M. Ghosh Street			
	Dist—MALDA		
Lahiri Sudhir Kumar	No. 3 Govt. Colony P. S. English Bazar	200	1. 5. 78
Saha Smt. Tara Sundari	Puratulo Barakar bhanna English Bazar	100	26. 2. 78

RgedNo. R. N .24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

2 3 DEC 1970

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুলিন চ্যাটার্জী, শ্রীবাদল রায়।
সম্পাদক—শ্রীশান্তি রঞ্জন ভাবচৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবাণীন ঘোষ। বেতারা—শ্রীনন্দগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীকীর্তি গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪৯এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭২

অষ্টম বর্ষ	শনিবার, ৬ই মাঘ, ১৩৮৫ ২০শে জানুয়ারী, ১৯৭৯	১৪ সং

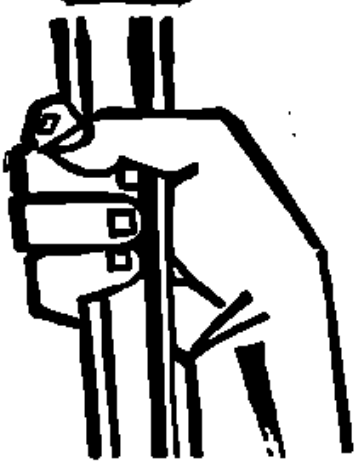

এই সংখ্যায়

ক্ষুধিত মানব
। সত্যভূষণ সে

সারা বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রামী সম্মেলন

হাবড়া দুনম্বর ব্লকের চাষবাস

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস
। ক্ষীরোদ চ

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগু

জাতীয় সমস্যা সমাধানের উপায় চিন্তা
। বংশীধর বন্দ্যোপাধ্য

> মানুষ কোনোদিন কোনো যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, কখনোও না, কেবলমাত্র প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে।
>
> —রবীন্দ্রনাথ

সারা বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রামী সম্মেলন

নেতাজী সুভাষ ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা।

১২ই ডিসেম্বর, ১৯৭৮

উক্ত সম্মেলনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবের বঙ্গানুবাদ—

১। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল হতে দেশকে মুক্ত করবার জন্য যে সব স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদ হয়েছেন এবং প্রত্যক্ষ অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা করিতেছে।

২। এই সভা গভীর দুঃখ ও পরিতাপের সহিত লক্ষ্য করিতেছে, অগণিত শহীদের আত্মদানে যে স্বাধীনতা আসিয়াছে তাঁদের সেই ধ্যানের ভারতবর্ষ আজও গঠিত হয়নি। আজও অধিকাংশ দেশবাসী দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করিতেছে।

৩। এই সভা বিশ্বাস করে কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজবাদী ও ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকাঠামোর মাধ্যমেই ইহার সমাধান সম্ভব। উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে সংগঠিত আন্দোলনে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য প্রতিটি স্বাধীনতা সংগ্রামীকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

৪। এই সভা আরও বিশ্বাস করে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কর্ত্তব্য শেষ হয়ে যায়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁরা যে আদর্শ, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন—দেশ গঠনের কাজে তাঁরা জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও অনুরূপভাবে ব্রত উদ্‌যাপনে এগিয়ে আসবেন।

৫। এই সভা ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছে সরকার কারাবাসের সময়সীমা নির্দ্ধারণক্রমে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে একটি শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। এই সভা সরকারকে অবিলম্বে এই ভ্রান্তনীতি পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছে।

৬। এই সভা সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছে যে এই সম্মেলনে নির্ব্বাচিত সর্ব্বদল-যুক্ত সমিতি দেশের গঠনমূলক প্রতিটি কাজে আত্মনিয়োগ করিবার পূর্ণ সুযোগ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করেন।

৭। এই সভা আন্দামান বন্দীদের সম্মানভাতা বৃদ্ধি করায় সরকারকে অভিনন্দন জানাইতেছে। কিন্তু যেহেতু শুধুমাত্র কারাবাসের সময়সীমার মাধ্যমে কোন স্বাধীনতা সংগ্রামীর দুঃখকষ্ট ও ত্যাগের গভীরতা নির্ণয় করা সম্ভব নয় সেহেতু এই সভা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে সাধারণভাবে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীর সম্মানভাতার পরিমাণ মাসিক পাঁচশত টাকা নির্দ্ধারিত করা হোক্।

৮। এই সম্মেলন সরকারকে আরও অনুরোধ করিতেছে, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও তাহার পরিবারবর্গের বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, সমগুণসম্পন্ন পুত্রকন্যাগণের চাকুরীতে অগ্রাধিকার দান ও সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে চাকুরীর বয়সের উর্দ্ধসীমা ৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত করার ব্যবস্থা করেন।

(এর পর দুয়ের পাতায় দেখুন)

নিবেদিতা নগরে ত্রৈলোক্য মহারাজ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত

হুগলী জেলার জনাইয়ে নিবেদিতা নগর ভগিনী নিবেদিতা সোসাইটির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ত্রৈলোক্য মহারাজ বিদ্যা-নিকেতনে আন্তর্জাতিক শিশুদিবস ও এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সভার প্রবীণ বিপ্লবী তারাপদ লাহিড়ী প্রধান অতিথি থাকেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী ধীরেন ভৌমিক সভাপতিত্ব করেন। প্রবীণ বিপ্লবী ও বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হরিকুমার রায়চৌধুরী বিদ্যালয়ের ও নিবেদিতা সোসাইটির আদর্শ ব্যাখ্যা করেন। হুগলী জেলার নন্দী মজুমদার, অধ্যাপক নলিনী দাসগুপ্ত, স্থানীয় অনিল পালিত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। ক্রান্তি শিল্পী সংঘের প্রসাদ দাস ও শ্রীমতী মন্দিরা দাস, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বিপ্লবী কুমুদলাল আচার্য ত্রৈলোক্য মহারাজের উদ্দেশে লিখিত দুইটি কবিতা পাঠ করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে হরিকুমার রায়চৌধুরী বলেন "এই বিদ্যালয়টি বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজ ও ভগিনী নিবেদিতার নামের সঙ্গে জড়িত এর আদর্শ অম্লান ও অটুট রাখার জন্য দেশবাসীর ও স্থানীয় অধিবাসীদের এগিয়ে আসতে হবে। এখানকার অধিবাসীরা খুবই গরীব এবং অনগ্রসর সমাজের লোকেরা এখানে বেশী।"

তারাপদ লাহিড়ী—মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর জীবনের বিভিন্ন দিক মনোজ্ঞভাবে বিশ্লেষণ করেন। শ্রীলাহিড়ী সকলকে ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান করেন। শ্রীলাহিড়ী আন্তর্জাতিক শিশু দিবসের তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করেন। কামনা বাসনা রহিত কর্মের আদর্শ তিনি তুলে ধরেন।

ধীরেন ভৌমিক বলেন, "মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী—ভারতের অকৃতদার সেরা বিপ্লবী। তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি, স্থানীয় রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, পোষ্ট অফিস স্থাপন প্রভৃতি কাজে স্থানীয় জনসাধারণ ও সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। আন্তর্জাতিক শিশু দিবস যেন আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মত প্রচারে সীমাবদ্ধ না থাকে।

২। এই সম্মেলন সরকারকে অনুরোধ করিতেছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মানভাতার ব্যাপারে বর্তমানে যে মাসিক ৫০০০ টাকা "আয়গত বাধা" রহিয়াছে—তা যেন অবিলম্বে প্রত্যাহার করেন। অধিকন্তু সম্মানভাতার স্থায়িত্বদান করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় আইন প্রনয়ণ করেন।

১০। সম্মানভাতাপ্রাপ্ত কোন স্বাধীনতা সংগ্রামীর মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা স্ত্রীও সমপরিমাণ ভাতার অধিকারিণী হন সেইজন্য এই সভা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।

১১। এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মানভাতা ছাড়াও তাঁহারা যেন প্রতিটি স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ন্যূনতম ১০০ একতিশত টাকা সম্মানভাতা দানের ব্যবস্থা করেন। উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, কেরালা, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি সরকারের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারও যেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ও তাদের পরিবারবর্গের ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবস্থা করেন।

সভাপতি—শ্রীঅশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী
কার্য্যকরি সভাপতি—শ্রীজগদীশ চ্যাটার্জি
সম্পাদক মণ্ডলী—সর্ব্বশ্রী শান্তিরঞ্জন রায়চৌধুরী, কণিভূষণ দত্ত, বিনোদ দত্ত, হরেন্দ্র ধর।
সমিতির কার্য্যালয়—৪নং, বল্লভদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ ফোন—৩৫-১৭৯৫

জাতীয় সমস্যা সমাধানের উপায় চিন্তা

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রাথমিক শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ আর প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে যদি শিশুমনে প্রাথমে দেশকে জানার, বোঝার ও দেশের অতীত ঐতিহ্যের ও দেশ প্রেমিক পূর্বসূরীদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার কথা এবং দেশের জন্য তাঁদের নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গের ঘটনাগুলির শিক্ষণীয় প্রবেশ পাঠ না করে, তবে তারা ভবিষ্যতে দেশের স্বার্থে উৎসর্গীকৃত প্রাণ হতে পারবে কি ভাবে? সেকারণ প্রাথমিক শিক্ষার পুস্তক নির্বাচনে ও ব্যবস্থাপনায় প্রাক্তন বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যুক্ত রাখা বিশেষ সুফলপ্রসূ হবে বলে অনেকেই মনে করে। জাতীয় সংহতি সঠিক ও সুদৃঢ় রাখতে হলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজতে হবে এবং এবিষয়ে বিপ্লবীদের পরামর্শ, সহযোগিতা ও সক্রিয় সমর্থন সরকারকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, জাতীয় স্বার্থে ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের খাতিরে। সরকারকেই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে বিপ্লবীদের দ্বারস্থ হতে হবে এবং সেটাই হবে প্রকৃষ্ট পন্থা, ফলে ভবিষ্যৎকালে ভারতীয়রা চরিত্রবান, সৎ ও মহান নাগরিক হয়ে উঠবে। আজিকার মত অবক্ষয়ের শিকারে পরিণত হবে না, একথা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়। সরকার এতদিন প্রাথমিক শিক্ষাকে যে খাতে বইতে দিয়েছেন, তাতে শিশু গড়তে অশিব বা অসুন্দর গড়া হয়েছে এবং ফলে পরীক্ষা পাশ করেও ছেলে-মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুশিক্ষার পরিবর্তে অশিক্ষা বা কুশিক্ষা পেয়েছে যারজন্য তারা মোটেই কোন অংশে দায়ী নয়, বরং তারা অসহায় ও হালবিহীন নৌকার মত বিপথগামী হতে বাধ্য হয়েছে—পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে ও ভুল পথনির্দেশের কারণে। শিশুকাল থেকেই এরা অবহেলিত, প্রকৃত শিক্ষার বঞ্চিত, আদর্শহীনতার বলি. চারিত্রিক বলিষ্ঠতা দেখতে অনভ্যস্ত এবং নিঃস্বার্থ মানুষের সংস্রবহীন। এরা সত্যই করুণার পাত্র, অথচ এদের ঘাড়ে সব দোষটুকু চাপিয়ে দিয়ে আমরা সদ্যবৃত্তি নিয়ে সভ্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে পরাঙ্মুখ। সঠিক প্রাথমিক শিক্ষার অভাবে ও ছেলেমেয়েদের সামনে আজ আদর্শবানের অপমৃত্যুতে ও সুবিধাবাদের জাগতিক জয়জয়াকারে তারা আজ পথভ্রষ্ট, আদর্শভ্রষ্ট এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা বিহীন কতকগুলি প্রাণীমাত্র বা নামে মানুষ, কিন্তু কাজে অমানুষ। এরজন্য বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা, সরকার, অভিভাবক ও গুরুজনেরাই প্রধানতঃ দায়ী। এরাই জাতির ভবিষ্যত নেতা, গঠনকর্মী, সমাজ সংস্কারক জাতীয়তাবাদী, বৈজ্ঞানিক, সংগঠক ও দেশহিতৈষী বলে গণ্য হবে; অর্থাৎ এককথায় এরাই ভবিষ্যতে ভারতের মান মর্যাদা ও রাষ্ট্রের ধারক-বাহক ও কর্ণধার হবে এবং সুনাগরিক হয়ে বিশ্বের দরবারে মহান ভারতের মহান নাগরিক বলে পরিচিত হবে অথচ এদের গোড়ায় যদি এই গলদ এখন থেকেই না দূরীভূত করা হয়, তবে ফেলোক্ত পরিণতি যে অবশ্যই সৃষ্টি হবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই তার ভয়াবহ পরিণতি এখনই শিহরিত হয়ে কাঁপতে থাকে।

ভারতে যে হারে উত্তরোত্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা শুধু উদ্বেগজনক নয় ভয়াবহও বটে। এই ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা ও সে তুলনায় খাদ্যোৎপাদন যখন অনেক কম তখন বর্দ্ধিত জনসংখ্যাকে আর বাড়তে না দিয়ে যদি সীমিত রাখার ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ এখনি না করতে প্রণোদিত করার কার্য্য দ্রুত গতিতে সরকার ও জনগণের দ্বারা একযোগে সম্পন্ন হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে দেশে খাদ্যাভাব, দারিদ্র, বেকারী, অশুচি ও অন্যান্য নানাবিধ জটিল সমস্যার সৃষ্টি হবে। এক কথায় এদেশের অর্থ-নৈতিক কাঠামো ভয়ানকভাবে ধাক্কা খাবে, চাইকি জাতিকে মৃত্যুর মুখে পড়ে বর্তমান বিভিন্নাপন্নতা হারাবারও আশংকা হয়। দেশের শ্রীবৃদ্ধির ও দেশবাসীকে সুখী ও সমৃদ্ধ করার জন্য জন্মহারকে এখনি নিয়ন্ত্রিত করতেই হবে

এ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। শ্রীমতি গান্ধী তাঁর প্রধান মন্ত্রীত্বের সময়ে এই বাস্তব ও সময়োপযোগী জন্মহার নিয়ন্ত্রনের কর্মসূচি যথেষ্ট বিচার বিবেচনার পরে দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করে দেশকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তিনিই এর জরুরী প্রয়োজন উপলব্ধি করে ত্বরিত গতিতে ইহা চালু করেছিলেন। তাঁর আরব্ধ কাজকে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য রাজ্যসরকার-গুলির অমতিবিলম্বে রূপায়ণের দায় ও দায়িত্ব নেওয়া একান্ত আবশ্যক জাতীয় স্বার্থে। বিলম্বে ক্ষতির বিরাট সম্ভাবনা একথা সমাজ-বিজ্ঞানীরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন। ভারতের সকল ছোটবড় সমস্যার মূলে এই অত্যাধিক ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, কাজেই এর সমাধান বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে করতেই হবে, নচেৎ জাতীর পরিত্রাণ নেই। এর মূলে কুঠারাঘাত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই কারণ এই সমস্যাই আর সব সমস্যার আদি-জননী। এর মূল-সমাধান ব্যতিত অপুষ্টি, দারিদ্র, বেকারী ঘোচান বোধ হয় অসম্ভব। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাই হচ্ছে প্রধান ও দুরূহ-সমস্যা, তাই এর মোকাবিলা করার জন্য জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রদেশের সর্বস্তরের মানুষের ভালোভাবে বাঁচার তাগিদে এগিয়ে এসে এ বিষয়ে সরকারের সহযোগীতায়, সাহায্যে ও পরামর্শে নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় ব্রতী হওয়া বিশেষ দরকার। জনসংখ্যাকে আজ সীমিত করার দায়িত্ব কেবল সরকারের নয় জনগণেরও। জনগণের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগীতা ছাড়া কোন সরকারই এই প্রকার কঠিন কাজে কখনও সফল হতে পারেন না। তবে গ্রামাঞ্চলে চাষী মহলে, শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক মহলে, খনি অঞ্চলে এবং নিম্নবর্গের মানুষের মনে ও অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে এ বিষয়ে সচেতন করার ও সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে সহযোগীতা করার জন্য কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার গুলিকে অনবরত অবিরাম যুক্তি সঙ্গত ও সঠিক প্রচার চালাতে হবে; নচেৎ সফলতা অসম্ভব। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষ এবন অনেক সচেতন, তবুও তাঁদের মধ্যেও সবধিক প্রচার দরকার। প্রচার ও জন-নিয়ন্ত্রনের প্রসার ছাড়া দেশ রসাতলে যাবে, মানুষের প্রতি দিনের জীবন যাত্রা দুর্বিসহ এখনই হয়েছে, পরে আরো মারাত্মক রকমের হবে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। জন্মনিয়ন্ত্রণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে একে অতি দ্রুততার সাথে বাস্তবায়িত করতেই হবে, নচেৎ কারোরই রক্ষা নেই। ভারতে পূর্বে বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক বিবাহের প্রচলন ছিল, এখনও অনেক সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ধর্ম-মতানুযায়ী বহু বিবাহ প্রচলিত আছে; কিন্তু বর্তমান পারিস্থিতিতে একাধিক বিয়ে যারা করেছেন বা করবেন তাঁদেরও অর্থাৎ সেই সব দম্পতির সর্বসাকুল্যে তিনটির বেশী চারটি সন্তান উৎপাদন করা কোনমতেই চলবে না, তা সে দম্পতি ভারতের যে প্রদেশের বা যে অঞ্চলেরই বা যে রাজ্যেরই অধিবাসী হোক না কেন এবং যে ধর্মমতের বা যে পথেরই তারা মানুষ হোন না কেন। সরকারকে কঠিন ও কঠোরভাবে সমদৃষ্টি নিয়ে সকলের জন্য একই ব্যবস্থা এমনভাবে নিতে হবে যে, কোন ভারতীয় নাগরিক-দম্পতির যেন তিনটির বেশী কোনক্রমেই অধিক সন্তান না জন্মগ্রহণ করে। এই কঠিন সমস্যার সমাধান কাঠিন্যের মাধ্যমেই সম্ভব, অন্য পথে বা অন্য চিন্তায় ও ব্যবস্থায় ইহা সম্ভব নয়। সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ, তাই সরকারকে, বিরোধীদলগুলিকেও সর্বোপরি জনসাধারণকে কি প্রগতিতে এ ব্যাপারে অগ্রসর হতেই হবে। কৃষি ও শিল্পোৎপাদনে মন্থরতা আজ ভারতের প্রায় সকল রাজ্যেই ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছে। এর মূলে কৃষি-শ্রমিক ও শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে কেবল বাড়তি পয়সা পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি উত্তরোত্তর বিস্তৃতি লাভ করছে—উদ্দেশ্য এইসব শ্রমিকদের লোভানি দিয়ে দলে টানা এবং এরা আজ সংখ্যায় বেশী বলে এদের ভোটের জোরে গদী দখলের আপ্রাণ চেষ্টা ও অনেক ক্ষেত্রেই সফলতা প্রাপ্তি; কিন্তু উৎপাদনে ঘাটতির ফলে যে পণ্যতা খরচ বেশী হওয়ায় দ্রব্য ও খাদ্য মূল্যের ক্রম বৃদ্ধি এবং ফলে মুদ্রাস্ফিতি ও জাতীয় ক্ষতি—এ কথা কৃষি ও শিল্প-শ্রমিক সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের কি জানা নেই—না জেনে শুনেও তাঁরা পৌনঃপনিক মজুরী বাড়াতে বহুপরিকর কেবলমাত্র দলীয় স্বার্থে ও ভোটের আশ্বাসে বাজি মাৎ করার হীন প্রচেষ্টায়?

জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও জাতীয় লাভালাভের দিকে নজর যদি বাস্তবে শ্রমিক নেতাদের থাকত তবে নিশ্চয় তাঁরা মজুরী বাড়ানর চিন্তা ও চেষ্টা না করে দ্রব্যমূল্য, বিশেষ করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য যা দেশের কোটি কোটি খেটে খাওয়া মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে হামেশাই ব্যবহার করে তা কমাবার জন্য দরবার করত। খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য ক্রমবর্দ্ধমান এবং মজুরীও ক্রমবর্দ্ধমান, অথচ মানুষের অভাব ও কষ্টের সীমা পরিসীমা নেই। এর মূল কারণ ভুল শ্রমিকনীতি এবং নেতাদের ব্যক্তি স্বার্থে বা দল স্বার্থে শ্রমিকদের ভুল বোঝান ও বিপথগামী করা হচ্ছে। বহুদিন থেকেই এই ভুলের মাশুল গুনছে শ্রমিক কৃষকরাই, নেতাদের গায়ে এর উত্তাপ বা আগুনের আঁচও এতটুকুও লাগছেনা বা এখনও লাগেনি। ভারতের বর্ত্তমান শ্রমিক নেতারা দেশের কল্যাণের চিন্তা ছেড়েদিয়ে স্বশ্রেণীস্বার্থী শ্রমিক চিন্তার ধর্ম যার ভিত্তিভূমি ষোলআনা ভুলে ভরা এবং যার ভবিষ্যত চির অন্ধকারময়। উৎপাদন বৃদ্ধির কথা যা জাতীয় স্বার্থে ও শ্রমিকদের স্বার্থে একান্ত দরকার তা আজ পর্য্যন্ত কোন শ্রমিকনেতার মুখে শুনা যায়নি। মহাত্মা গান্ধীকে অতীতদিনে যখন আমেদাবাদের বস্ত্রকলের শ্রমিকরা তাদের নেতৃত্ব দিতে আহ্বান করেছিল তখন গান্ধীজি দৃঢ়তার সঙ্গে শ্রমিকসম্মেলনে ভাষণদানকালে শ্রমিকদের ডাক দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে যে, উৎপাদনের গতিকে মন্থর করে দিয়ে কেবল মজুরী বাড়াবার কথা তিনি কলমালিকদের কাছে তুলতে পারবেন না, তবে যদি শ্রমিকরা তাঁকে কথা দেয় যে তারা উৎপাদন ব্যাহত বা মন্থীভূত না করে বরং সঙ্গত হারে উৎপাদন বাড়াবার জন্য সর্বদা বিশেষ সচেষ্ট থাকতে বদ্ধপরিকর হবে, তিনি নিশ্চয় তখন ন্যায় সঙ্গত হারে মজুরী বাড়াবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল এবং শ্রমিকরাও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়ে জাতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে বিদেশের বাজারে বস্ত্র রপ্তানীর প্রতিযোগীতায় বিজয়ী হয়ে দেশে আর্থিক সুফল ঘটিয়েছিল।

একদিকে কৃষি ও শিল্পোৎপাদনে মন্থরতার জন্য ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, অপরদিকে সীমাহীন অভাবহ বেকারী বৃদ্ধি সমাজে দারিদ্রকে প্রকট করে তুলেছে, ফলে দেশে চারিদিকে হাহাকার ও অপরাধ প্রবণতা উত্তরোত্তর বিস্তৃতি লাভ করছে ব্যাপক হারে যার সমাধান এখনও সরকারের দ্বারা কোনক্রমেই সম্ভব হয় নি। কর্মসংস্থান বাস্তবে রূপায়িত করা যায়নি কারণ নূতন নূতন ক্ষেত্র এর জন্য চাই, অথচ সে ব্যবস্থা করার মত উপযুক্ত প্রকল্প গড়ে তোলার সরকারী আসল প্রচেষ্টার অভাব এখনও বর্ত্তমান। বেকারী একেবারে দূরীভূত করা নিশ্চয় বিশেষ সময় সাপেক্ষ, কিন্তু কিছু কিছু উদ্যোগ আয়োজন যদি ত্বরিত গতিতে ইতিমধ্যেই সরকারের ও দেশের পুঁজিপতি শিল্প-মালিকদের ও বড় ব্যবসায়ী মহলের দ্বারা করা সম্ভব না হয়; তবে শান্তি বিঘ্নিত হবে ও সাধারণ মানুষের কষ্টের অবধি থাকবে না এবং দেশে সর্বপ্রকার অনর্থের সৃষ্টি হবে। বেকারী দূরীকরণের জন্য যেমন একদিকে সরকারী ও বেসরকারী ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা চালাতে হবে তেমনি অন্যদিকে বেকার মানুষদের শুধু চাকরীর আশায় বসে না থেকে ছোট-খাট দোকানদারী, কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প, মাল ও যাত্রী পরিবহন, ব্যবসায়ে দালালি প্রভৃতি স্বনিয়োগ পদ্ধতিতে রোজগার করতে হবে এবং তা দৃঢ়তার ও বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচালিত করার মত মানসিক প্রস্তুতির ব্যবস্থা নিজেদের ও আত্মীয় পরিজনদের ও বন্ধুদের সাহায্যে করে নিতে হবে এবং তার জন্য আত্ম-বিশ্বাসের ও আন্তরিকতার সঙ্গে অগ্রসর হবার কঠিন পণ নিয়ে কাজে লেগে পড়তে হবে। আর কাল বিলম্ব না করে শিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত মানুষেরা নিজ নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার মানসে যদি উক্ত কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে নিশ্চিতই বর্ত্তমান বেকারের সংখ্যা অনেকাংশে কমে যাবে। সরকারকেও এবং শিল্প বাণিজ্যের কর্ণধারগণকেও এদিকে সহানুভূতিশীল দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে নূতন নূতন এইসব ছোটখাট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা কর্মক্ষম ও উপার্জ্জনক্ষম অচিরেই হতে পারে এবং তাদের বেকার সমস্যার কথঞ্চিৎ লাঘব করে দেশের পক্ষে স্বস্তির কারণ হয়। সরকারকে সম্ভাব্য সকল রকম ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে অতি শীঘ্র ও বাস্তব-সম্মতভাবে হতে হবে যাতে করে বেকারদের সত্বর কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

(চলবে)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৮৯৪—১৮৯৬

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

তিনি বললেন, এ কথার অন্যথা যদি ধরে নেওয়া হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে গভর্ণমেণ্টের বিদেশী শাসন কর্ত্তারাই দেশের জন সাধারণের স্বার্থের কথা তাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের চেয়ে বেশী জানেন। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র আরও বললেন যে, যুগে যুগে এটাই নিয়ম বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে "চিরস্থায়ী ব্যক্তিদেরই ভ্রাম্যমাণদের শাসন করতে হয়।" তিনি প্রশ্ন রাখেন, "এটা কি হতে পারে যে এই দুর্ভাগা দেশে সেই স্বাভাবিক রীতির মোড় ঘুরে গিয়েছে?" এখন এই দাবী কার্যতঃ স্বীকৃতি লাভ করেছে। যুক্তি দিয়ে তা প্রতিষ্ঠিত করার কোন কথা ওঠে না। কিন্তু সেদিন এই দাবী ছিল একটা বিতর্কের বিষয়, এবং স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের মত একজন প্রবীন ব্যক্তির, যিনি জন-স্বার্থের ক্ষেত্রেও কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব দেখাবেন না, এর পক্ষে জোরাল যুক্তি দেখাবার প্রয়োজন হয়েছিল এবং তা উপযোগী হয়েছিল। বর্ত্তমানের সমস্যা অবশ্য অন্য ধরণের। বর্ত্তমানে ভারতে যারা দেশের কাজ করেন, তারা তাদের নিজেদের মতের প্রতি ভালবাসার আতিশয্যে সেই মতটাকেই দেশের মত এবং তাদের কণ্ঠে তোলা শ্লোগানই দেশের জনগণের তূর্য্য-নিনাদ বলে ভুল করার প্রবণতার দিকে ঝুঁকে আছেন। এরা কেবলই দেশের কথা বলেন, কিন্তু দেশ বলতে এরা নিজেদেরই বোঝেন, অন্য কাউকে নয়।

১৮৯৬ সালে কংগ্রেস আন্দোলনে আরও একটি দিকে এক বিবর্ত্তন ঘটল। ভাবী ঘটনা অনেক সময় তার আবির্ভাবের পূর্বাভাস ঘোষণা করে। অল্প দিনের মধ্যেই স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যে শিল্পোদ্যোগের তোড়জোড় দেখা দিয়েছিল কংগ্রেস আন্দোলনে এই নতুন গতি পথের সূচনা এই সময় থেকেই ঘটে। এ জন্য কংগ্রেস মিঃ জে. চৌধুরীর দূরদর্শিতা ও সংগঠন শক্তির নিকট ঋণী। মিঃ জে. চৌধুরীকে বাংলার শিল্প আন্দোলনের পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। তিনি প্রস্তাব করলেন। এবং আমি তার প্রস্তাবের আন্তরিক ভাবে সমর্থন করি) যে কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে এক শিল্প প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হোক। এই চিন্তাটি একটুখানি বিলম্বে মনে আসে। তা হলেও আমরা সে কাজে হাত দিতে দ্বিধা করলাম না। আমরা আমাদের সাধ্য ও সঙ্গতি মত অবশ্যম্ভাবী সব ব্যবস্থা করলাম। আমরা গভর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করি এবং আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে লেপ্টন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার জন উডবার্ণকে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে অনুরোধ করলাম। আমি তাকে বললাম যে এটা একটা শিল্প আন্দোলন ছাড়া আর কিছুই নয়; এডজুটেণ্ট জেনারেল মিঃ উইলকের মত ইংরেজ ভদ্রলোকও এই আন্দোলনে যোগদান করেছেন। তা ছাড়া তার মত মান্যগণ্য ব্যক্তি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলে সরকারের পক্ষ থেকেও তাদের নৈতিক সমর্থন পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তখনকার দিনে সরকারী কর্মচারীদের মনোভাব এমনই ছিল যে স্যার জন উডবার্ণ আমাদের অনুরোধ রক্ষা করতে পারলেন না। তিনি বললেন, "মিঃ বানার্জি, তুমি না-ই কেন বলনা, আসলে তোমাদের এই প্রদর্শনী কংগ্রেস আন্দোলনের একটা অঙ্গ; এর মধ্যে রাজনীতির তীব্র গন্ধ আছে। আমি দুঃখিত, আমি প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে পারছি না।" এরপরে কোচবিহারের মহারাজা একটি ছোট্ট বক্তৃতা করে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। দশ বছর পরে আবার যখন কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হল এবং কংগ্রেসের অঙ্গস্বরূপই বৃহত্তর আকারে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হল, তখন কিন্তু তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড

মিন্টো সে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন। ১৮৯৬ থেকে ১৯০৬ সাল—মাত্র দশ বছরের মধ্যেই কংগ্রেস সম্পর্কে সরকারী মনোভাবের এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে গেল। ১৮৮৮ সালে কংগ্রেসের প্রতি সরকারী মনোভাব খোলাখুলিভাবেই যে কিরূপ বিরোধী ছিল তা আমরা লক্ষ্য করেছি। ১৮৯০ সালে বাংলা সরকার এক সার্কুলার জারি করে সরকারী কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ দিলেন যে তারা যেন কখনও কংগ্রেসের কোন সভায় যোগদান না করেন। অবশ্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক আবেদন জানালে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে পরে এই সার্কুলার প্রত্যাহার করা হয়। ১৮৯১ সালে নাগপুর কংগ্রেসের সময় কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান মধ্যপ্রদেশের চীফ-কমিশনার স্যার এমিলি ম্যাকডোনেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কংগ্রেস সম্পর্কে তার মনোভাব কি, তা বুঝতে চেষ্টা করেন। স্যার এমিলি ম্যাকডোনেল ছিলেন একজন খাঁটি সরকারী কর্মচারী। কিন্তু তাহলেও তিনি উদার মনোভাব থেকে একেবারে বঞ্চিত ছিলেন না। তিনি তাঁকে বললেন "মিঃ..., কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করার জন্য আমি কারও সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই চিন্তা করব না।"

১৮৯৯ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময়ে এই স্যার এমিলি ম্যাকডোনেলই ছিলেন যুক্ত-প্রদেশের লেপ্টেন্যান্ট গভর্নর। তিনি প্লেগ নিবারণ ব্যবস্থার অনুসরণ করে লক্ষ্ণৌ বা তার কাছাকাছি কোন জায়গায় কংগ্রেসের অধিবেশন হতে দিলেন না। তিনি সহর থেকে ৭।৮ মাইল দূরে আঁখ ও ধানক্ষেতের মধ্যে একটি স্থান নির্দিষ্ট করে দিলেন। সেখানে ডেলিগেটগণ দিনের বেলায় মাছি ও রাত্রে বুনো শূয়োরের উৎপাতের মধ্যে অবস্থান করেন। বাইরে থেকে সাধারণ যে সব লোক লক্ষ্ণৌয়ে আসতেন, তাদের কিন্তু সহর থেকে বের করে দেওয়া হোত না বা তাদের জন্য কোন আলাদা ছোয়াচ মুক্ত জায়গার ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়নি। সাধারণ সতর্কতামূলক নিয়মকানুনের মধ্যে তাদের সহরে আসতে ও থাকতে দেওয়া হয়। কিন্তু কোন না কোন কারণবশতঃ প্লেগ অনুষ্ঠিত অধিবেশন থেকে যে সমস্ত ডেলিগেট কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য এসেছিলেন তাদের সম্পর্কে এই নিয়ম খাটল না। জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তা, এবং আমার মনে হয়, অন্যান্য নৈতিক কারণেও তাদের এই সহরের বাইরে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা ভাবে রাখার ব্যবস্থা হয়। আমি সাহারণপুরের লোক; সেখানে প্লেগের কোন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু ডেলিগেটদের মধ্যে আমার অনেক সম্মানিত ও প্রীতিভাজন বন্ধু ছিলেন। তাদের এবং অন্যান্য সাধারণ সহ-কর্মীদের থেকে পৃথক ভাবে থাকতে আমার ইচ্ছা হল না। বরং তাদের সঙ্গে একত্র থেকে তাদের কষ্ট ও অসুবিধার অংশীদার হতেই মনস্থ করলাম। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সঙ্গে ছুগছিলেন; কালীচরণ বানার্জিরও শরীর ভাল ছিল না। অম্বিকাচরণ মজুমদারও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমরা সবাই একই তাঁবুতে থেকে সেই অসুবিধার মধ্যেও যতটা সম্ভব সুবিধা করে নেওয়ার চেষ্টা করলাম।

এখন হাস্য করে সেই। একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে জাগতে পারে যে সরকারী মহলের কেন ও মনির এরূপ পরিবর্তনের কারণ কি? কংগ্রেস তার কর্মতালিকায় কোন পরিবর্তন করেনি; তার আদর্শ ও কর্মপন্থা সাম্প্রতিককে নন-কো-অপারেশনের নীতি গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত একই ছিল; চিন্তায় বা ভাষায় কখনই এই প্রতিষ্ঠান অসংযত ভাবাবেগের দ্বারা নিজেকে কলঙ্কিত হতে দেয় নি। মর্যাদাবোধ ও আত্মসংযম প্রদর্শন করে কংগ্রেস সবসময় তার বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করে চলেছে। ১৮৮৮ সালে যখন সরকারী মহলের সমালোচনের তীব্র আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে, আবার ১৯০৬ সালে যখন চাইসরয় নিজে কংগ্রেসের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন, উভয় কালেই কংগ্রেস সমভাবে ভারতীয় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা ও দাবী-দাওয়ার জীবন্ত সংগঠনরূপে কাজ করেছে। ভারতীয় জনগণের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা কংগ্রেসের মাধ্যমেই, তাদের তাদের প্রতিনিধিদলের দ্বারা সংযতভাবে এবং মর্যাদার সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে। আবার আমি জিজ্ঞেস করছি, কি করে সরকারী মহলের মনো-

ভাবের এই পরিবর্তন ঘটল? এ বিষয়ে আমার এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে সাধারণভাবে যে সমস্ত কারণে সত্য প্রকাশ পায়, তা বাদ দিলেও লর্ড মর্লির মনোভাবই হচ্ছে এই পরিবর্তনের কারণ। তিনি একজন বিজ্ঞ রাষ্ট্রনীতি-বিদের মত ভারতের নব-জাগরণের শক্তি উপলব্ধি করে সরকারী কর্মচারী মহলের বদ্ধমূল কুসংস্কারকে দূর করে তাদের মনোভাবকে স্বচ্ছ করে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। সিভিল সার্ভিসের লোকেরা তাদের শৃঙ্খলাবোধ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট মন-প্রাণ ঢালা আনুগত্য স্বীকৃতির জন্য খ্যাত। কোন একটি আদেশ ঘোষণা করা হলে, কোন একটি নীতি গৃহীত হলে, কিংবা কোন উপরওয়ালার কোন বিষয়ে কোন একটি অভিমত ব্যক্ত হলে সিভিল সার্ভিসের সব স্তরের লোকেরা তা বিনা আপত্তিতে পরম বলে মেনে নেয়। সিভিল সার্ভিসের কাজ মেজাজে ও স্বরূপে কতকটা আধা সামরিক কাজের মত। এই সার্ভিসের দক্ষতা তাই এই শৃঙ্খলাবোধ ও আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। হয়ত বা এই আনুগত্য ও শৃঙ্খলাবোধ অন্যদিকে আবার এর দুর্বলতাও বটে। ১৯০৬ সালে কমন্স সভায় ভারতীয় বাজেটের উপর বক্তৃতা দান কালে মিঃ বাল বলেছিলেন :—

"তারপরে সেখানে রয়েছে কংগ্রেস যা চাচ্ছে তার সব কিছুর সঙ্গেই আমি একমত। তবে কংগ্রেসের ইচ্ছার পশ্চাতে কি আছে, সে সম্পর্কে আমি কি ধারণা পোষণ করি, তা মোটামুটিভাবে বলতে গেলে বলতে পারি যে ভারত সরকার সম্পর্কে যিনিই কোন রূপ আগ্রহশূন্য ও কঠিন মনোভাব পোষণ করুন না কেন, তার আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। এই মুহূর্তে আমি এমন কোন সিদ্ধান্ত করব না যে কেউ অসন্তুষ্ট এবং অসুখী হলেই তাকে বিদ্রোহী হতেই হবে। দেখুন না, আমাদের নিজেদের যে শাসন সংস্কার ও পরিবর্তন আনা হয়েছে তা অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারাই আনা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু তারা তো আপনাদের বা আমার মত এতটা বিদ্রোহী ছিলেন না।"

সেই একই সুরে হয়ত বা আরও দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি ভারতের নতুন শক্তির জাগরণের কথা ঘোষণা করলেন যে শক্তির প্রকাশ ঘটেছে কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে। তার যে বক্তৃতা থেকে আমি তার কথার উদ্ধৃতি দিলাম সেই বক্তৃতায়ই তিনি আরও বলেছিলেন, "প্রত্যেকটি লোক—প্রত্যেকটি লোকই—সৈনিক, পর্যটক, সাংবাদিক—সকলেই আমাকে বলেছেন যে ভারতে এক নতুন জীবন দেখা দিয়েছে। তাতো হতেই হবে। অন্যথা আপনারা কি করে আশা করতে পারেন? আপনারা বছরের পর বছর ধরে পশ্চিমের ভাব-ধারা ও সাহিত্য সে দেশের লোককে শিক্ষা দিয়ে আসছেন; আপনারা তাদের একের সঙ্গে অপরের যোগাযোগ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এ অবস্থায় আপনারা কি করে আশা করতে পারেন যে ভারত এখনও সেই যুগে পড়ে থাকবে যখন উচ্চ শিক্ষার তেমন কোন সুযোগ ছিল না, যখন দেশের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের সংযোগ সাধনই ছিল এক কঠিন ব্যাপার বা কদাচিৎ ঘটত? কি করে আপনারা ভাবতে পারেন যে সব কিছুই ঠিক আগের মতই চলবে? আজ যদি আমরা নিরপেক্ষভাবে সুবিবেচনার সহিত এই নতুন জীবনের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তাকে সংগঠিত করতে চাই, তাহলে আমরা পার্লিয়ামেন্টের মহান ঐতিহ্যের প্রতি এবং যারা পর্যায়ক্রমে এবং এক প্রজন্ম থেকে আর পর্যন্ত লিবারেল পার্টিকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন, তাদের প্রতি অবিশ্বাসের কাজ করে বসব।"

ভারত সম্পর্কীয় সর্বোচ্চ কর্তা-ব্যক্তি কর্তৃক ঘোষিত এই প্রকার অভিমত এবং তার সঙ্গে ক্রম-বর্ধমান ভারতীয় জনমতের শক্তির মিলন ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নিরঙ্কুশ প্রশাসন বুদ্ধি—সব মিলে ভারতে সরকারী মহলের মনোভাবের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার না করে পারে না। এই পরিবর্তিত মনোভাব চূড়ান্ত রূপ লাভ করে শক্তিশালী হল লর্ড হার্ডিঞ্জের সমস্তটা শাসনকাল জুড়ে। ১৯১১ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ কংগ্রেসের একটা ডেপুটেশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন যা কয়েক বছর আগে লর্ড কার্জন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তা ছাড়া লর্ড পেন্টল্যাণ্ড গিয়েছিলেন মাদ্রাজ অধিবেশন দেখতে ১৯১৩ সালে। (চলবে)

ক্ষুধিত মানব

শ্রীসতী ভূষণ সেন

সে পৃথিবীতে এসেছিল, কুৎসিৎ দুর্ব্বল। পালক নেই, পোষাক নেই, কেশর নেই, চূড়া নেই। চারদিকে নখী দন্তী শৃঙ্গী; সেই জগৎ সভায় নিতান্ত অসহায় মানবক। সাপ বাঘ শিকারী, প্রাকৃতিক বিপর্যয়। দৃশ্য অদৃশ্য অসংখ্য শত্রু চতুর্দ্দিকে। এমন শক্তি নেই যে লড়বে, এমন গতি নেই যে পালিয়ে বাঁচবে। অস্ত্র বলতে কিছুই নেই দেহে। আছে শুধু অভাব, শুধু ক্ষুধা। অসংখ্য অভাব, অসংখ্য ক্ষুধা। ও কি বাঁচবে? —

কোটি কোটি বছর কেটে গেছে। মানব শুধু বেঁচেই থাকে নি, আগুনের ব্যবহার আবিষ্কার করে নতুন সভ্যতার পত্তন করেছে। রেল গাড়ীতে উঠে বসলে, একদণ্ডে দুদিনের পথ যাওয়া যায়। কারখানায় চিমনী দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ওঠে, লোহার কল কাপড় বোনে। খনি থেকে কয়লা ওঠে, ঝরিয়া দু হাতে বিলোতে থাকে। কেউ সন্দেহ করে না, তার দেহের তাপ কোনদিন কমবে। দিন যায়। একদিন ঝরিয়ার যৌবন শেষ হয়ে যায়, ফুরিয়ে যায় ভাল কয়লা। ব্যাণ্ডেলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হয়, ট্রেণের গতি কমে যায় বাড়ীর মায়েরা উনুন নিয়ে নাকের জলে চোখের জলে একাকার। একি কয়লা না পাথর? খুঁজে আনো কয়লার বিকল্প। ধোঁয়া থাকবে না, থাকবে শুধু তাপ।

মাটির নীচে যে কয়লার ভাণ্ডার ছিল তা অবশ্য শেষ হয় নি, তবে ভাল কয়লার সঞ্চয় উজাড় হয়ে এসেছে। তাই অষ্ট্রেলিয়া থেকে কয়লা আমদানী করতে হচ্ছে। মানুষ বড় বেশী বেড়ে গেছে পৃথিবীতে, তাই অন্য বস্তু গেছে ফুরিয়ে। এটা নেই, ওটা বাড়ন্ত। প্রথমে সে পুড়িয়ে ছাই করেছে অরণ্যের কাষ্ঠ সম্পদ; পরে মাটি খুঁড়ে তুলেছে কয়লা ও তেল। কাঠের চেয়ে কয়লা ভাল, কয়লার চেয়ে তেল। কম পরিসরে বেশী শক্তি। তাই ইদানীং তেলের উপরেই নজর পড়েছিল সকলের। মনের আনন্দে দুহাতে খরচ করছিলেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখলেন, কুড়ি পঁচিশ বছরেই তেল ফুরিয়ে যাবে। তেল ফুরাবার সাথেই আমরা নিবিয়ে দেব আলো? থামিয়ে দেব প্লেন? আরব বেদুইনের মত ঘোড়ায় চড়ে দিগন্তে বিলীন হব? তাই কি পারা যায়?

শুধু শক্তিই নয়, খনিজ সম্পদও যে রকম দ্রুত গতিতে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, তাতে মানব সভ্যতা এক বিষণ্ণ ও বিপদজনক সম্ভাবনার দিকে অন্ধের মত ছুটে চলেছে। জিওলজিষ্টরা খনিজ সম্পদের সন্ধানে দুর্গম গিরি কান্তার মরু চষে ফেলেছেন; নিকৃষ্ট ধাতু গালিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন মেটলার্জিষ্টরা। সেই ধাতুগুলিও ব্যবহারোপযোগী করতে শক্তির ব্যয় হচ্ছে বেশী। ভাল জাতের আকরিক লোহা, এক টন গালিয়ে যেখানে এক টন কাঁচা

লোহা পাওয়া যেত, সেখানে নিকৃষ্ট কোন কোন 'স্যাম্পল' আড়াই টন দরকার হচ্ছে এক টন কাঁচা লোহা করতে। শক্তি খরচ হচ্ছে আড়াই গুণ। এমনিতেই আমাদের শক্তি বাড়ন্ত, তার উপরে এমনই অপব্যয়। শক্তি খরচের চেয়েও বড় কথা, পরিবেশ দূষিত হচ্ছে আড়াই গুণ। বাতাস যে গতিতে বিষাক্ত হয়ে উঠছে, তাতে খাদ্য ফুরাবার আগেই হয়ত আমরা দম বন্ধ হয়ে অক্কা পেয়ে যাব।

অক্কা পেলে তো চুকেই গেল ল্যাঠা। যতদিন সেটা না হচ্ছে ততদিন তেল সঙ্কটের দুশ্চিন্তা ঘাড় থেকে নামবে না। আপনি বলবেন, তেল যদি ফুরিয়ে যায় যাক না। তেল যখন ছিল না তখন কি আমরা ভাত কিছু কম খেতাম? ইণ্ডাস্ট্রি বন্ধ হবে? আপদ যাবে। ট্রাম বাস থাকবে না? নাই বা থাকলো, পায়ে হেঁটে মেরে দেব বরাবগর থেকে বালিগঞ্জ! না, সেইটি আজ আর সম্ভব নয়। তেল ফুরোবার আগেই বিকল্প শক্তির সন্ধান করতে হবে। মানব সভ্যতা 'ব্যাক গীয়ারে' চলতে পারে না। দাঁড়িয়েও থাকতে পারে না, খুঁটির মত নিশ্চল হয়ে। পারে শুধু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। অগ্রগতি বন্ধ হলেই সভ্যতার মৃত্যু হবে।

বৈজ্ঞানিক, শক্তির সন্ধান করছেন, একটা কিছু পেতেই হবে। শক্তির ক্ষুধা মেটাতে এটম ভাঙার কৌশল আবিষ্কার করে আণবিক শক্তি বের করেছেন। যদিও তাতে আমাদের ক্ষুধা মিটছে না কারণ ইউরেনিয়াম ছাড়া এটম্ ভাঙা যায় না, আর ইউরেনিয়ামের মজুত অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ধরে নিন যেভাবে খরচ হচ্ছে, তাতেও তেলের আগেই এই বস্তুটি শেষ হয়ে যাবে। জগদীশ বসুজয়া যেন সাফ জবাব দিয়েছেন 'ার সন্তানদের, বাড়ীতে আর এক বিন্দু শক্তি নেই। এবার ছেলেরা বেরিয়ে পড়ুক বিদেশে।

বিদেশ বলতে তো অন্তরীক্ষ। জবাকুসুমের মত রং ঐ যে গোলাকার উজ্জ্বল বস্তুটি পূব আকাশে উদয় হন আর অস্ত যান পশ্চিমে, তিনিই একমাত্র শক্তির উৎস। কাঠ বলুন, কয়লা বলুন, তেল বলুন, সকলের শক্তির সঞ্চয় ঐ সূর্যদেবের দাক্ষিণ্যে। এখন সূর্যদেবের মন্দিরে ধর্ণা দিচ্ছেন বৈজ্ঞানিক। তাঁর শক্তিকে সোজাসুজি কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। বহুদিন আগে গ্রীকরা একবার সূর্যের রশ্মি focus করে শত্রুর রণতরী বহর ধ্বংশ করেছিল। সেই বিদ্যেতে নির্মিত হয়েছে এযুগের সৌরচুল্লী। ছেলেবেলায় আপনি যেমন অতসী কাঁচের মাধ্যমে সূর্য রশ্মিকে কাগজের উপরে focus করে আগুন জ্বেলে খেলা করতেন সেই একই বৃত্তান্ত। সৌর চুল্লীর তাপ শক্তি দিয়ে কারখানা (Heavy Industry) পরিচালিত করবার জন্য স্থান নির্বাচিত হয়েছে মহাশূন্যে। সেখানে রাত্রি নেই শুধুই দিন, তাই অফুরান শক্তি পাওয়া যাবে। আর একটা মহা সুবিধা, সেই কারখানার ধোঁয়া আমাদের পরিবেশ দূষিত করবে না। ফ্যাক্টরীর জন্য এখন space station বা মহাকাশ ষ্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে। নামেই ষ্টেশন, আসলে এটা একটি কৃত্রিম উপগ্রহ।

আগের দিনে ভূপৃষ্ঠ থেকে কোন বস্তু আকাশে তোলা ছিল বিষম সমস্যা। পৃথিবী মায়ের মত এমনই টানেন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুটিকেও, যে তাঁর মাধ্যাকর্ষণের শক্তি প্রতিহত করার জন্য শক্তিশালী

উৎক্ষেপক দরকার হত। ত্রিস্তর বা ত্রিস্তর রকেটের সাহায্য ছাড়া অন্তরীক্ষে ওঠাই সম্ভব ছিল না। রকেট বস্তুটি বড় ব্যয় বহুল, একবারের বেশী ব্যবহারও করা যায় না। এই অসুবিধা সম্প্রতি কাটানো গেছে স্পেস সাটল (space shuttle) তৈরীর করে। এখন আর আকাশে উঠতে রকেট চাপতে হয় না, সাটলে উঠে বসলেই হল। সাটল যন্ত্রটি একটি আধুনিক জেট প্লেনের মত। চলে জেট প্লেনের মত জ্বালানী পুড়িয়ে। খরচ কম একবার ব্যবহার করেই ফেলে দিতে হয় না। বারবার ব্যবহার করা চলে। যাওয়া যায় এক ষ্টেশন থেকে অন্য ষ্টেশনে, অতি সামান্য খরচ।

এখন অন্তরীক্ষে ষ্টেশন নির্মাণ করে যন্ত্রাংশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পৃথিবী থেকে। সেখানে অংশ গুলি জোড়া দিয়ে শক্তিকেন্দ্র গড়া হবে। শক্তি কেন্দ্রের বিশাল concave আয়নায় প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মি focus করা হবে একটি insulated গহ্বরের উপর। সেই উত্তাপে গহ্বরের ভিতর তাপাঙ্ক উঠে যাবে কয়েক হাজার ডিগ্রি। তখন সেই গহ্বরটিকে Blast furnace ও ডিগ্রি মত আকরিক ধাতু গলানোর কাজে ব্যবহার করা হবে। অশোধিত ধাতুর খণ্ডগুলি একদিক দিয়ে স্রোতের মত প্রবেশ করালে, গহ্বরের উত্তাপে গলে অন্য দিক দিয়ে একটি continuous ধাতুর দণ্ড (Bar) বেরিয়ে আসবে।

ষ্টেশনে এত ধাতু আসবে কোথা থেকে? পৃথিবীর ধাতুর সঞ্চয় ফুরিয়ে যাওয়ার মুখে, সে কথা আগেই বলেছি। বিদেশ থেকে আমাদের ধাতু সংগ্রহ করতে হবে। ধাতু পৃথিবীতে যতটুকু ছিল তার বহুগুণ, বহু কোটিগুণ ধাতু ছড়ান আছে অন্তরীক্ষে। অন্তরীক্ষের অধিবাসী গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু (asteroids) ও উল্কা, যারা পৃথিবীর মত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে অনন্তকাল, তারা সকলেই পৃথিবীর মত বস্তু দিয়ে নির্মিত। যা পাবেন এখানে তা পাবেন সবখানে। তবে অনুপাত বা proportion বিভিন্ন। কোন গ্রহ বা গ্রহাণুর দেহে প্রয়োজনীয় ধাতুটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে, তার একটা নির্ভুল জরিপ দরকার। ওদের দেহ থেকে খানিকটা নমুনা বা sample এনে, আগে পরীক্ষা করতে পারলে, কর্মিক স্থান নির্বাচন করা সহজ হত। কাজটা বড় ব্যয়সাধ্য। তার চেয়ে অনেক সহজ পৃথিবী থেকে দূরবিণ দিয়ে দেখে অনুমান করার চেষ্টা করা, কোথায় কি আছে। সূর্যের আলো যখন কোন বস্তুর উপর প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে, তখন তার দেহ বস্তু সম্বন্ধে অনেক খবরই সেই আলো থেকে জানতে পারা যায়। উল্কাদের দেহ থেকে প্রতিফলিত আলো খবর এনেছে যে সেখানে নিকেল-লোহা (Ni-Fe) ধাতু বর্তমান কার্বন কম্পাউণ্ডও আছে প্রচুর। চাঁদের দেহে Titonium এর সন্ধান এই ভাবেই পাওয়া গেছিল, পরে চাঁদের sample পরীক্ষা করে দেখা গেছে দূরবিণ মিথ্যা কথা বলেনি। পদ্ধতিটার নাম Reflectance Spectra. এরই সাহায্যে সম্প্রতি উল্কার দেহ সম্ভারের map করা হয়েছে। কার দেহে কোন ধাতু কি পরিমাণ আছে, সব আমাদের জানা।

যখন যে ধাতু দরকার হবে, সেই ধাতু পুষ্ট একটি গ্রহাণুতে গিয়ে পদার্পণ করা, অদূর ভবিষ্যতে মানবের পক্ষে সম্ভব হবে। পরে একটি রকেটের সাহায্যে সেই পুরুষ্ট গ্রহাণুটির অকপথ পরিবর্তন

করে পৃথিবীর অক্ষ পথের কাছে নিয়ে আসা এমন কিছু কঠিন নয়। তখনও সে সূর্য্যকেই প্রদক্ষিণ করবে, তবে তার পথ সরে আসবে পৃথিবীর পথের কাছে (ধরুণ চাঁদের গা ঘেসে)।

একদল সাঁওতাল শ্রমিক পাঠিয়ে দেওয়া হবে গ্রহাণুটিতে ; তারা সেখানে ক্যাম্প করবে, আর মাটি খুঁড়ে ধাতু উত্তোলন করবে। Engineer থাকবে, তারা সৌর শক্তির সাহায্যে Bar তৈরী করে জমা করবে। বৎসরাধিক কাল পরে যখন গ্রহাণুটি আবার পৃথিবীর কাছে আসবে, তখন ঐ Bar গুলি বেঁধে ভেলা তৈরারী করে, পৃথিবীর চারদিকে ভাসমান কোন স্পেস্ ষ্টেশনে নিয়ে আসা হবে। ষ্টেষনের ফ্যাক্টরীতে Bar গুলি গলিয়ে foam metal রূপে নিয়ে আসা হবে পৃথিবীতে। অন্তরীক্ষ থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার কতকগুলি প্রযুক্তিগত অসুবিধা আছে, সেই জন্যই Bar কে foam এ রূপান্তরিত করা। Foam metal এর খণ্ডগুলি নামানো হবে সমুদ্রে। Foam রূপী লোহা জলে ভাসবে, ভেঙ্গে যেতে পারে, হারাবে না।

• • •

———সে ছিল দুর্ব্বল, কুৎসিৎ। দেহের তুলনায় হাস্যকর একটি মস্তক, সেখানে সঞ্চিত খানিকটা 'বুদ্ধি'। এই একটি বস্তু জীবজগতে আর কারো ছিল না। এরই শক্তিতে সে পৃথিবীতে অজেয় হয়েছে, সহস্র হরিণের গতি লাভ করেছে, গরুড়ের মহিমায় আকাশে উড়েছে। এক সময়ে তার কিছুই ছিল না, আজ তার দেহে এসেছে ইন্দ্রজিতের সৌর্য্য, আর অঙ্গে ইন্দ্রধনুর বর্ণসম্ভার। সে সমগ্র সৌর জগতের অধিপতি হতে চলেছে।

———

বিজ্ঞপ্তি

প্রেস বর্ম্মঘটের জন্য বিপ্লবী বাংলা পত্রিকা সাময়িক বন্ধ থাকায় আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীকীরোদ দত্ত

এই সকল শিখ বিপ্লবীরা আমেরিকায় বসেই বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারীর নাম শুনেছিলেন। দেশে ফিরে তারা রাসবিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য উৎকণ্ঠিত হন। রাস-বিহারী তখন ফেরার অবস্থায় কাশীতে ছিলেন। কাশীতে বাইরের লোকের সঙ্গে দেখাশোনা করবার জন্য কয়েকটি আলাদা বাড়ী ছিল। পাঞ্জাবী শিখদের এক প্রতিনিধি পাঞ্জাবে বিপ্লব আয়োজনের সংবাদ নিয়ে রাসবিহারীর সন্ধানে এই সময় কাশী আসেন। তার নিকট সংবাদ পাওয়া যায় দুই তিন হাজার শিখ বিপ্লবের জন্য পাঞ্জাবে তৈরী রাসবিহারীকে তাদের প্রয়োজন। সংবাদ পেয়ে স্থির হল এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা হবে। কিন্তু এখনই রাসবিহারী পাঞ্জাব যাবেন না। আগে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল পাঞ্জাবে গিয়ে সেখানকার অবস্থা দেখে আসবেন। তিনি এসে সংবাদ দিলে পরে কর্তব্য স্থির করা হবে। শচীন্দ্রনাথ স্থির করলেন আগে অমৃতসর শহরে গিয়ে শিখ-নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে শিখ সঙ্গীর সহিত রাসবিহারী শচীন্দ্র নাথকে প্রথমে লুধিয়ানা পাঠিয়ে দিলেন। কর্তার সিং শচীন্দ্র নাথকে অভ্যর্থনা করলেন। লুধিয়ানায় সেই সময় দুই তিনশত শিখ ছিলেন তারা সকলেই বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত। বিভিন্ন গুরুদ্বারায় এরা এই উদ্দেশ্যে মিলিত হতেন। কর্তার সিং শচীন্দ্র নাথকে নিয়ে অমৃতসর অভিমুখে রওনা হলেন।

শচীন্দ্র নাথ, কর্তার সিং এবং তাদের সঙ্গী শিখ তিন জনে ট্রেণে লুধিয়ানা থেকে অমৃতসর যাত্রা করলেন সেখানে শিখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথাবার্তা হবে। গাড়ী লুধিয়ানা ছেড়ে পরের ষ্টেশনে আসতেই শচীন্দ্র নাথ বুলেটিন নামে একখানা কাগজ কিনলেন। কাগজ পড়ে দেখলেন কলকাতায় মুসলমান পাড়া দেনে এক ভীষণ বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সুপারিন-টেনডেন্ট নলিনী চ্যাটার্জীর বাড়ীতে দু-তিনটে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছে। একজন হেড কনষ্টেবলের পা উড়ে গিয়েছে। কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঘরের খানিকটা দেয়াল ভেঙ্গে গর্ত হয়েছে। বাড়ীর সামনের গ্যাসপোষ্ট ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে। কিন্তু নলিনী বাবু এ যাত্রা নিষ্কৃতি পেয়েছেন। কর্তার সিং খবরটি পড়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। শচীন্দ্র নাথ ও সঙ্গী শিখের মধ্যেও পরস্পর চাওয়া চাওয়িতে সকলেই নয়ন কোলে আনন্দের আভাস খেলে গেল। কিন্তু প্রকাশ্যে কোন কথাবার্তা হলনা। এইভাবে বিপ্লবীরা অমৃতসরে এসে পৌঁছালেন। অমৃতসরে কয়েকজন ছাত্র বিপ্লবীদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন দেখা গেল। তাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তার পরে শচীন্দ্র নাথকে নিয়ে অদূরে এক বাগানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঐ বাগানের মধ্যে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় শিখ উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে সেদিন ছিলেন পৃথ্বী সিং, রামরাখা এবং আরও একজন। অমর সিং এবং পৃথ্বী সিং দুজনেই ছিলেন গ্রন্থসূত্র। তবে বহুদিন ধরে পাঞ্জাবে বাস করছিলেন। সকলেই রাসবিহারীর দেখা করতে আসায় ঐ স্থানে সমবেত হয়েছিলেন। তাদের বলা হল বিশেষ কারণে রাসবিহারী আসতে না পারায় তিনি শচীন্দ্র নাথকে পাঠিয়েছেন কর্তার সিং বললেন আমরা কিন্তু রাসবিহারী-কেই চাই। শচীন্দ্র নাথ তখন সকলকে বুঝিয়ে বললেন যে এখানে আসার আগে এখানকার অবস্থা ভালরূপে জানতে চান। শচীন্দ্রনাথ তাদের কাছে পাঞ্জাবের বিষয় কিছু কিছু জানতে চাইলেন পাঞ্জাবে তারা কত লোক আছেন, পরস্পর কোথায় কিভাবে যোগাযোগ করেন তাদের প্রকৃত নেতা কে ইত্যাদি। অমর সিং এর উত্তরে বললেন যে তাদের প্রকৃত নেতা কেউ নাই এইজন্যই তাদের রাসবিহারীকে চাই। তাছাড়া বিপ্লবের উদ্দেশ্যে কাজ

বাঙালীর সাহায্য নিতান্তই প্রয়োজন মনে করছেন। বাঙলাদেশে বাঙালী বিপ্লবীরা বহুদিন ধরে কাজ করছেন তাদের এ কার্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। কর্তার সিং ও একথা স্বীকার করলেন বটে কিন্তু অমর সিংকে বললেন, 'দেখ ভাই এ্যায়সে হিম্মৎ কৈও হারতে হো কামকে ওখত্ পর তুমহারে ভিতর সে কিতনে ঠিলে হয়ে কদম পিছে-লেজে। অর্থাৎ কেন ভাই এইরূপ আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছ কার্য্যক্ষেত্রে তোমার মধ্য থেকেই কতবড় বীর আত্মপ্রকাশ করবে। সেদিনের আলোচনা সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথ বলেন "যে বিরাট কার্য্যে তাঁহারা ব্রতী হইয়াছিলেন তাহার গুরুত্ব ইহারা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছিলেন এবং নিজেদের অন্তরে শক্তির কিছু অভাব বোধ করিয়া বাহিরে একটা অবলম্বন খুঁজিতে ছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিলাম যে ইহাদের মধ্যে প্রকৃত কর্মী যদি কেহ থাকেন তবে সে কর্তার সিং ইহার মধ্যে যেরূপ আত্মবিশ্বাস না থাকিলে কাহারও দ্বারা কোন বড় কাজ সম্পন্ন হইতে পারে না।"

কর্তার সিং এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে আলোচনায় শচীন্দ্রনাথ বুঝলেন সদ্য আগত সদর বিপ্লবীরা শিখ সৈন্যের উপরেই নির্ভর করছেন বেশী। কর্তার সিং তাঁকে বললেন যে আমেরিকা থেকে তিনি প্রথম দলেই ভারতে এসেছেন এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই পানজাবে বিপ্লব আয়োজনে ব্রত আছেন। পানজাবী বিপ্লবীরা বাঙলার সাহায্যের উপরে খুব বেশী নির্ভর করছেন। তাদের ধারণা বাঙলাদেশে বহুদিন ধরে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চলছে। সুতরাং হাজার হাজার বন্দুক সেখানে সংগৃহীত হয়েছে। শচীন্দ্রনাথ প্রথমে তাদের এই ভুল ধারণা দূর করলেন। পানজাবী বিপ্লবীদের তিনি বললেন, "যেমন বাঙলাদেশে যদি আপনাদের মত আমাদেরও সৈনিক দলে ঢুকবার সুযোগ থাকত তাহলে বহুদিন আগেই দেশ বিপ্লব হয়ে যেত। বাঙলাদেশে বিপ্লবীদল প্রধানত যুবক ও ছাত্রদের নিয়েই গঠিত। এই দলে আমরা অতি সন্তর্পনে অনেক বাছাই করে লোক নেই, যারা প্রতি মুহূর্তে মরণকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত। কাজে কাজেই আমাদের দলে বেশী লোক নাই। বোধহয় হাজার দুইয়ের বেশী হবে না। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে যেদিন বিপ্লব প্রকাশ্যভাবে আরম্ভ হবে সেদিন আরও হাজার হাজার লোক আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে। পানজাবে যদি বিপ্লব আরম্ভ হয় তবে বাঙলাদেশ নিশ্চেষ্ট বসে থাকবে না।" শচীন্দ্রনাথ তাদের বুঝিয়ে বললেন তারা যেন বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে পরামর্শ না করে হঠাৎ কিছু করে না বসেন। সাবধানে কাজ করতে হবে শক্তি যেন ব্যর্থ না হয়। শচীন্দ্রনাথ তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে সংগঠন গড়ে তুলে কাজ আরম্ভ করতে বললেন।

আলোচনার পরে স্থির হল যে সদর দলে পৃথ্বী সিং শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাশী যাবেন এবং সেখানে রাসবিহারীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হবে। কর্তার সিং শচীন্দ্রনাথের নিকট কিছু রিভলবার এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য চান। শচীন্দ্রনাথ কিছু রিভলবার এবং গুলি সঙ্গে এনেছিলেন সেগুলি কর্তার সিংয়ের হাতে দিলেন এবং বললেন যে পরে আরও কিছু দিবেন। তবে এটাও বুঝিয়ে বললেন যে বেশী অস্ত্রের আশা যেন না করেন। তবে বাঙালী বিপ্লবীরা বোমা তৈরীতে সিদ্ধ হস্ত হয়েছে। বিপ্লবে অথবা বিপ্লবের আগে যত বোমা লাগবে তারা সরবরাহ করবেন। এই সময় পানজাবী বিপ্লবীরাও কিছু কিছু বোমা তৈরী করেছিলেন কিন্তু তার কার্য্যকারীতা বাঙলার মত সাংঘাতিক ছিলনা। ঐ সময় পানজাবের বিভিন্ন স্থানে বাঙলার কিছু বোমা সংরক্ষিত ছিল। শচীন্দ্রনাথ ঐগুলি কর্তার সিংয়ের হাতে অর্পণ করলেন। কাশী ফিরে আসার সময় পৃথ্বী সিংয়ের সঙ্গে কথাবার্তায় স্থির হল যে পরবর্তী ৭ই ডিসেম্বর পৃথ্বী সিং পানজাব মেল কাশী পৌঁছবেন। ষ্টেশন থেকে শচীন্দ্রনাথ রাসবিহারী যেখানে ছিলেন সেখানে তাকে নিয়ে যাবেন।

(চলবে)

"হাবড়া দুনম্বর ব্লকের চাষবাস"

কর্ণ চক্রবর্তী

"বছর পনের আগে পাট, আখ, মটর, মুসুরীর চাষ হত। ধানটা একবার হ'ত আউশ আর আমন এখনকার মতো (রবি শ্রীষ্ম মরশুমে) বোরো হত না—"

কথা হচ্ছিল, উত্তর চব্বিশ পরগণার হাবড়া থানার বাইগাছিতে দাঁড়িয়ে বাইগাছি উন্নয়ন সমিতির সভাপতি শ্রী ফজির পাকই এর সাথে।

"এখানে গত দু-বছর ধরে শেপালারী, নাগড়া, মুসুরীর চাষ হচ্ছে পরপর দু-তিন বছর—"

কথা বলতে বলতে কখন ঝিরঝির হাওয়ায় দোলানো বাদাম গাছের তলা দিয়ে মাটির ভিটা, তাওলার সবুজ ডাঁড়ি চড়ানো টলটলে পুকুর, সবুজ বাঁশঝাড় ছাড়িয়ে নেমে এসেছি—কেও খামারের মধ্যে খেয়াল করিনি। খেয়াল হ'ল গোলায় মোস্তফার মিহি স্বরে।

মোস্তাফা সাহেব বললেন : বিঘে চারেক মুসুরী ছিল আজকে ধান কাড়া হল বিঘেতে আট মন হয়েছে দশ মন হবার কথা। তিনি আরও জানালেন, এই গ্রামে চাষ বাসের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে সেচ ও বিদ্যুতের অভাব।

কলমের গুরু নূর মহম্মদ পাশ থেকে জানালেন পেশোয়ারী ধানও খুব ভাল তেমন সারটার যায় না বিঘেতে যার মন হয় তবে এ বছর ছয় থেকে সাত মণের বেশী হবে না কারণ জমে বুড়ে গেছে।"

পাটের কথায় গ্রামসেবক শ্রী পরেশ মণ্ডল জানালেন : গত বছরের চাইতে এবার এখানে পাটের এলাকা বেড়েছে এ বছর মোট সাতানব্বই একরে পাট চাষ হয়েছিল, তারমধ্যে বেশ কিছু জমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বন্যায়।

আমন ধান কাটা হচ্ছে বেশ কিছু কাটা হ'য়ে গেছে। যেখানে কাটা হয়ে গেছে সেখানে গম, মুসুর, টমাটো লাগানো হ'বে। লাগান পরিবর্তে ফুল ফুল, আলুর সাদা লম্বা ডেলী, গম যেন মিষ্টি রোদে লুটোপুটি খাচ্ছে।

আলু গম শীতকালীন শাকসব্জি চাষের যা হিসেব দিলেন শ্রী মণ্ডল তা কমবেশী নিম্নরূপ :

কৃষি দ্রব্যের নাম	চাষের এলাকা (গত বছরের)	এ বছরের লক্ষ্যমাত্রা
১। আলু	১৫ একর	২৫ একর
২। গম	২০ একর	৩০ একর
৩। শীতকালীন শাক-সব্জি	২০ একর	২৫ একর
৪। সরিষা	৮ একর	১০ একর

সরিষার কথায় বারাসত ব্যারাকপুরের মহাকুমা অধিকারিক (কৃষি) শ্রী বিজয় মিত্র ঠাকুর চোখে মুখে হাসা আলোর ঝিলিক তুলে বললেন বেশ গর্বের সাথে : চৌরী ত্যারাঘাটি সহযে পূজোর আগে বিলি হয়েছে। এগ্রোর সাথে যোগাযোগ করে মাল এনে দেওয়া হোয়েছে।

এখানে বিঘে প্রতি পাঁচ ছয় মণ ফলন হয়। তেল পাওয়া যায় মন কয়া (৪১ কিলোতে) ১২ কে, জি,।

মাকারী ও নিচু জমিগুলিতে পুষা ২২১ পলমন ৪১২ সি, এন, এম, ২৫ প্রভৃতি স্বল্প সময় ভিত্তিক ধান চাষের সাথে সাথে উঁচু জমিগুলিতে এত ব্যাপকভাবে শীতকালীন শাক-সব্জি ও শাক সবজির চাষের পেছনে রয়েছে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের রবি শ্রীষ্ম (১৯৭৮-৭৯) মরশুমে জরুরী কৃষি উৎপাদন প্রকল্প। যে কথাটাই দৃঢ় স্বরে ঘোষণা করলেন কৃষি অধিকারের শ্রী কনক কমল চট্টোপাধ্যায়।

উত্তর চব্বিশ পরগণার এই কার্যক্রম অনুসারে যে সব দ্রব্যের মিনিকিট বিতরণের জন্য মনজুর করা হোয়েছে তাদের নাম ও সংখ্যা নিম্নরূপ :

১।	গম	১১,০০০
২।	আলু	৭,০০০
৩।	সরিষা :	৭,০০০
৪।	ডাল শস্য	৫,০০০
৫।	শাক সবজি	৮০০০

শুধুমাত্র আট হাজার শাকসবজির মিনিকিট বিতরণ করতেই সরকারের খরচ পড়বে ২,০০,০০০ টাকা।

এ ছাড়া মুগের বিশ হাজার মিনিকিট বিতরণের প্রস্তাবও বিবেচনাধীন। একমাত্র মুগ ছাড়া প্রায় সব রকম দ্রব্যের মিনিকিট বিলি করার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে, না হয় শেষ হতে চলেছে।

শুধুমাত্র বাইগাছি নয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই কৃষি বিভাগের কর্মীরা (তাঁদের অফিসার সহ) বর্তমান রবি শ্রীষ্ম মরশুমে জরুরী কৃষি উৎপাদন প্রকল্পের কার্যক্রম সফল করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলেই গত আগষ্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে পর পর তিনটী বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজাত ফসল ও জমির ক্ষেত্রে যে ২০৭০৫ কোটি টাকার প্রবল ক্ষতিক্ষতি হয়েছে তার ঘা শুকিয়ে যাবে ; আর এইভাবেই ভেঙে পড়া গ্রামীণ অর্থনীতি আবার সতেজ প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

বিপ্লবীদের জীবনী

১৯৭৬ সনের নিখিল ভারত জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী কনভেনসান উপলক্ষে বিপ্লবীদের ফটো সহ সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্বলিত স্যুভেনির প্রকাশ করার সিদ্ধান্তানুসারে শীঘ্রই প্রকাশিত হইতে যাইতেছে। সমস্ত বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগঠনসমূহ ও ব্যক্তিগত বিপ্লবী বন্ধুগণকে পাসপোর্ট আকারের ফটো সহ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

ঠিকানা :

সম্পাদক : শ্রীজ্যোতিষ মজুমদার

নিঃ ভা, বি, স্বা: সং কঃ স্যুভেনির কমিটি

১১৭, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলি-১৪

শ্রীজ্যোতিষ মজুমদার
সম্পাদক

পরলোকে প্রবীন বিপ্লবী বেণীমাধব ঘোষাল

হরিদ্বারে ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমে স্বামী কিশোরানন্দ গিরি গত ৫ই জানুয়ারী দেহ ত্যাগ করিয়াছেন পূর্ব্বাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল বেণীমাধব ঘোষাল—জন্ম, বরিশাল জেলার কলসকাঠী গ্রামে। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে কারাবরণ করেন। পরে ১৯৩০ হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত হিজলী—দেউলী প্রভৃতি ক্যাম্পে রাজবন্দী ছিলেন। আমরা তাঁহার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

RgedNo. R. N .24511/71 | Biplabi Bangla Phone : 34-1795 | Regd. WB/NC 77

বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

C/36

— সম্পাদক মণ্ডলী —

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী, শ্রীবারীণ রায়।

সম্পাদক—শ্রীশান্তি পদ চৌধুরী

বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতালা—শ্রীনন্দগোপাল পাল।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীবীর গুহ।

বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪৯এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রণে :—বিপ্লবী প্রকাশনী, ১১১ বি, বেচারাম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাঙলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭১

অষ্টম বর্ষ	শনিবার, ১৩ই মাঘ, ১৩৮৫ ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৭৯	১৫ সংখ্যা

CENTRAL LIBRARY

"চালাকী দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সম্পাদকীয়

নেতাজী ফিরে এস

দেশ প্রেমিক-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে "জগতে যখন এসেছিস, তখন একটা দাগ রেখে যা।" স্বামীজীর যোগ্যতম উত্তরসাধক নেতাজী স্বামীজীর এই মহতী বাণীকে বাস্তবায়িত করেছিলেন তাঁর জীবনে। তিনি শুধুই অতীতদিনে দাগ কেটেই যান্ নি আজও সমানভাবে দাগ কেটে চলেছেন। নেতাজী ছিলেন "স্বভাবে শুধু যে ষোল আনা তেজস্বী পুরুষ তাই নয়, তার উপর ছিলেন সাড়ে পনর আনা আদর্শবাদী সাধক।" নেতাজীর চরিত্রের দিব্য প্রভা, তাঁর প্রজ্জ্বলন্ত দেশপ্রেম, তাঁর নৈরাশ্য-বিজয়ী আদর্শ নিষ্ঠা, তাঁর ঐশ্বরিক বেপরোয়া অনাসক্তি, তাঁর দুঃসাহসিকতা, তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, তাঁর মানবতাবোধ ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ, তাঁর সর্বস্বীকারের ভাব, দেশ ও কালের পরিধি অতিক্রম করে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে মানব-ইতিহাসে, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

উপনিষদে কথিত আছে, তিনি এক, তিনি বললেন বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্ম-বিসর্জনের ইচ্ছা। নেতাজীর সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। দেশ বিদেশের বহু অনুগামী ও সতীর্থদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চরিত্র প্রভাবে অন্যকে ক্রিয়াবান করে তুলেছেন। নিজেকে অকৃপণভাবে ও সম্পূর্ণভাবে দান করতে না পারলে, এ কাজ সম্ভব হোত না।" এই যে আত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি, এ দৈবী-শক্তি। নেতাজীর এই শক্তির মহিমা পরাগ্রস্ত হবে না কোন দিন। অর্দ্ধেক বিশ্বের নিপীড়িত, পরাধীন মানুষের মনে তিনি শক্তি সঞ্চার করেছেন, জাগিয়েছেন স্বাধীনতালাভের অদম্য আকাঙ্খা, দীক্ষিত করেছেন সুমহান আদর্শে। এর ফলে যুদ্ধান্তঃ কালে বহু দেশ তাদের লুপ্ত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি যে অপূর্ব্ব সাংগঠনিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তা অতুলনীয়। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য্য যে ক্ষেত্রটি বহুলাংশে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু। দেশ ত্যাগের পর নিরলস পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে ভারত, তথা গোটা এশীয়বাসীদের মুক্তি অর্জ্জনের জন্য তিনি সর্বস্ব পণ করে কাজ করেছিলেন। রাসবিহারী ও সুভাষের মিলনকে মণিকাঞ্চন সংযোগ বলা যায়। এঁদের সম্মিলিত সাধনা, ত্যাগ ও তপস্যার মাধ্যমেই একটা বিশাল ভূখণ্ড মরুভাগরণ এসেছিল। তার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শুধু ভারত ছাড়তেই বাধ্য হয় নি, এশিয়া মহাদেশের তাদের বহু উপনিবেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। তাই নেতাজীর জন্মদিনে ভারতের এই দুই মহান সন্তানের উদ্দেশ্যে সমগ্র জাতির সঙ্গে আমরাও সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

গীতায় বলা হয়েছে, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্ত্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হন দেশের অধিনায়ক। সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, নেতাজী জীবিত ও সুস্থ আছেন। আমরা একান্তভাবে কামনা করি, দেশের অদৃষ্টাকাশে আজ যখন দুর্যোগ ঘণীভূত, নেতাজী ফিরে আসুন এবং কাণ্ডারীহীন দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করে দেশকে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করার জন্য অধিনায়কত্ব দান করুন। নেতাজী জিন্দাবাদ।

জয় হিন্দ্।

সাধারণতন্ত্র দিবস

প্রায় দুইশত বৎসর সংগ্রামের পর ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ইংরেজ-শাসন-মুক্ত হয়ে দেশের স্বাধীনতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছে। অবশ্য এই মহৎ কর্ম সাধনের জন্য অশেষ নির্যাতন, লাঞ্ছনা, দীর্ঘ কারাভোগ করতে হয়েছে। এর জন্য বহু অমূল্য জীবনও বিসর্জন দিতে হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিবর্তনের ধারা অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে সশস্ত্র ও অহিংস সংগ্রামের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এই দুঃসাধ্য কাজে সফলতা লাভ করা গিয়েছে। যারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একমাত্র অহিংসাপন্থীদের অবদানকেই সব কৃতিত্ব দিতে চেয়েছেন, তারা ইতিহাসের ধারাকে হয় সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি, অথবা পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট।

স্বাধীনতালাভের প্রায় তিন বৎসর পর ভারতের সংবিধান প্রণয়নের কাজ শেষ হয়েছে এবং ভারতকে একটী সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক এবং ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানের মাধ্যমেই জাতির আকাঙ্ক্ষিত ভারতবর্ষের রূপরেখাও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সব বক্তব্যের সার কথা ছিল এমন ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে হবে যেখানে ধনী-দরিদ্রের কোন বৈষম্য থাকবে না, যেখানে মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও বেকারত্ব দূর করার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার কাজই হবে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সেকাজ আজও সমাধা করা যায়নি। শুধু তাই নয়, দিনের পর দিন, দেশের অবস্থা এক ভয়াবহ পরিণতির দিকেই এগিয়ে চলেছে। এ কাজ সমাধান করার দায়িত্ব ছিল প্রধানত রাজনৈতিক দল ও শাসকগোষ্ঠীর উপর। কিন্তু সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী দলগুলির মধ্যে প্রায় সকলেই রাজনীতিকে একটী লাভজনক ব্যবসায় বলে গ্রহণ করেছেন। তারা দেশের ও দশের কথা ভুলে গিয়ে দলের ও গোষ্ঠীর স্বার্থ-লাভের মোহে অন্ধ হয়ে গিয়ে এমন কাজ-কর্ম করছেন যাতে নিঃসংশয়ে বলা চলে যে তাদের মধ্যে আর যাই থাক্, দেশপ্রেমের নামগন্ধও নেই। কোন কোন দল প্রয়াণী হয়েছেন এলোমেলো করে দিয়ে লুটেপুটে খাবার জন্য। তাই আজকের সাধারণতন্ত্র দিবসে দেশবাসীকে শপথ নিতে আহ্বান জানাই যে দেশের অকল্যাণকারী শক্তিগুলিকে অবদমিত করে, পূর্বসূরী শহীদদের ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ধ্যানের ভারতবর্ষকে গড়ে তুলতে। স্বামী বিবেকানন্দের 'অভীঃ' মন্ত্রে নতুন করে দীক্ষা নিতে হবে। নেতাজীর মত বিঘ্নকে সোপান করে, দুঃখকে সুযোগে পরিণত করে, গান্ধীজীর প্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে, বৈপ্লবিক নিষ্ঠা, প্রজ্ঞাসত্ত্ব দেশপ্রেম ও অনাসক্ত নিস্পৃহা নিয়ে কর্মপথে এগিয়ে যেতে হবে। এই ভাবে প্রচেষ্টা করলে সাফল্য অনিবার্য্য। জয় হোক নবভারতের, আজকের দিনে এটাই দেশবাসীর ঐকান্তিক প্রার্থনা এবং পবিত্র কর্তব্য।

বিবেকানন্দকে প্রয়োজন

—শঙ্করীপ্রসাদ বসু

এই মুহূর্তে বিবেকানন্দকে আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজন। তাঁকে সশরীরে পাব না। কিন্তু তিনি বলেছেন, তাঁর দেহ চলে যাবার পরেও তিনি উদ্দীপিত করে যাবেন। তাঁর সে কথায় বিশ্বাস আমাদের করতেই হবে।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন—আমি এই কলকাতারই ছেলে। এখানকার পথের ধুলায় বসে খেলা করেছি।' কলকাতা শহর আজ ডুবছে—নরকের মৃত্যুর মধ্যে; এখন সেই বিবেকানন্দকে আমাদের প্রয়োজন যিনি একদিন স্নেহের কল্পনাতীত বিভীষিকার মধ্যে দাঁড়িয়ে কলকাতার যুবকদের ডাক দিয়ে বলেছিলেন—কার দেহে আছে মানুষের রক্ত, সে এগিয়ে এসো, বাঁচাও মানুষকে—তোমার পরিবার ভাই-বোনদের। সে কথা শুনে পথে নেমেছিলেন নিবেদিতা, সধবামন্ত—বস্তীর মধ্যে ঢুকে, মুমূর্ষুর গোঙানির মধ্যে দাঁড়িয়ে যুগ-যুগ, ধরে জমাট-বাধা নর্দমার পাঁক স্বহস্তে কেটে তুলেছিলেন, আলো এনেছিলেন অন্ধকূপে—প্রাণ।

আজ যখন ভারতের নানাদিকে হরিজনদের বস্তী জ্বলছে, যখন সে আগুনে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে শিশুকে, আঘাত করা হচ্ছে নারীকে, যখন উন্মুক্ত ঘৃণার মতোই বীভৎস আকার গ্রহণ করছে ছদ্ম সহানুভূতি—তখন চাই বিবেকানন্দের ঘর্ষিত কণ্ঠ—ঘৃণিও না, নীচ জাতি, মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।' এই জাতি ডুবছে। সাধারণ মানুষের অভিশাপ আমাদের মাথার উপরে। অমৃতনদী পাশ দিয়ে বয়ে গেলেও আমরা তাদের নর্দমার জল পান করতে দিয়েছি। শুয়ে শুয়ে খাদ্য লাভানো থাকলেও তাদের অনশনে মরতে দিয়েছি। মুখে অদ্বৈতবাদের কথা বলেও তাদের প্রাণপণে ঘৃণা করেছি।'

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণতন্ত্র। ভোট-বাক্সে যে কেউ ভোটপত্র ফেলে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। সুতরাং বলা হচ্ছে, এরই দ্বারা তারা পেয়ে গেছে স্বাধিকার। এখন প্রয়োজন বিবেকানন্দের, যিনি মিথ্যার মুখোসটা টেনে ছিঁড়ে দিতে পারবেন। বর্তমান ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও তিনি একই কথা বলতে পারবেন, যা বলেছিলেন বহু বৎসর আগে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র সম্বন্ধে: 'পশ্চাত্য জগৎ এখন মুষ্টিমেয় শাইলকের শাসনে পরিচালিত। প্রণালীবদ্ধ শাসন, স্বাধীনতা প্রভৃতি ফাঁকা ব্যাপার। পর্লামেণ্ট, ভোট, ব্যালট বেজরিষ্টি—সব তাই। রাজনীতির নামে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে। কী ঘুষের ধুম, দিনে ডাকাতি, যা পাশ্চাত্য দেশে হয়!'

গণতন্ত্রের উল্টোদিকে একনায়কতন্ত্র, যা বলে—মানুষের তথাকথিত স্বাধীনতার কী প্রয়োজন তার? প্রয়োজন রুটির। থাকনা তার কোমরে অড়ানো শিকল—ছুঁড়ে দেওয়া রুটি তার মুখে পৌঁছচ্ছে, এই কি যথেষ্ট নয়? আর এই উপকারের বিনিময়ে তোমাকে বলতেই হবে—তোমাদের ইচ্ছাতেই আমি, আমার পুত্র আমার পৌত্র—এরাই রাজা; এবং তোমাদের মানতেই হবে—তুমি, তোমার পুত্র, পৌত্র—তোমরা সবাই দাস। এক্ষেত্রে আমাদের চাই বিবেকানন্দের এই গর্জনকারী কথাগুলি—স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামির চেয়ে একপেটা, ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা স্বাধীনতা লক্ষ গুণে শ্রেয়ঃ। গোলামের ইহলোকেও নরক পরলোকেও তাই।'

সর্বহারা বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতার কথা বিবেকানন্দ বলেছিলেন। সেই সর্বহারা বিপ্লবের সকল পরিণতির পরেও বিবেকানন্দকে চাই, কারণ দেখা যায় বিপ্লব-মঞ্চে ছিঁড়বার মতো ধনিকের মুণ্ড না থাকলেও রক্তোৎসব থামেনি। সর্বহারাদের মধ্যে যারা শাসক হতে পেরেছে, তারা অনেক শাসিত সর্বহারাকে শত্রুজ্ঞান করে, তাদের বাঁচার অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। আমরা এখানে শুনব বিবেকানন্দের

কথা, যাঁর মতে শ্রেষ্ঠ শ্রেণিক না হলে শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী হওয়া যায় না ; পরম ত্যাগীই কেবল হতে পারেন চরম বিপ্লবী।

স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতবর্ষ যখন বস্তুতঃ কী লাভ করেছে বর্ণ, জাতি, ধর্ম, ভাষার ভেদবুদ্ধির কাছে—তখন সে পূর্বতন শাসকদের এই উক্তিকে সত্য প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর : ভারতবর্ষ অখণ্ড দেশ নয়, অনেকগুলি দেশ ও স্বার্থগোষ্ঠীর সমষ্টি—তখন চাই সেই বিবেকানন্দকে যিনি সর্বদাই গোটা ভারতবর্ষকে ডাক দিয়েছেন, কোন প্রদেশ বিশেষকে নয়, যিনি উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের বিচ্ছিন্নতা-প্রবণতার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছিলেন এবং ভারতের প্রান্তে-প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়ে উদ্বোধিত করতে চেয়েছিলেন সমগ্র ভারতচৈতন্যকে।

চেষ্টা-চিউব শিশুদের হাতে যখন আমরা আমাদের জীবনকে সমর্পণ করতে চাইছি, তখন তখন বিবেকানন্দের এই বাণী—মানব প্রকৃতির মহিমা ভুলো না। আমরাই সর্বোচ্চ ঈশ্বর। বুদ্ধ, বুদ্ধের দল 'আমি'-সমুদ্রের তরঙ্গমাত্র। মানুষের ক্ষুদ্র দেহের ভিতরে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে অনন্ত শক্তি। দেহের পর দেহ তাকে ধরে রাখতে পারে না। অনন্ত শক্তিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে নূতন উন্নত দেহ ধারণ করে। শৃঙ্খলিত প্রমিথিউসের বন্ধন ছিঁড়ে যায়। এই নাম মানুষের ইতিহাস—ধর্মের, সভ্যতার প্রগতির ইতিহাস।'

আর, শিশুধর্ম চলছে এখন—সুতরাং দেবধর্মের সেই ছোট ছেলেটির মতো অনেক ছেলেরই চাই বিবেকানন্দকে, যিনি নীচু ঘরে ছেলেটির জুতোর ফিতে বেঁধে দিয়ে বলেছিলেন—জেনে রেখো, শুচিতা পরিচ্ছন্নতা, যে কোন বড় জিনিষের মতোই জীবনের পক্ষে প্রয়োজন।

আর ...আমি ভাতর, ভীত একাকী, এক মানুষ। আমি জানি, আমারই তাপের জন্য এই গণক এবং পরের গণক নির্ধারিত। অজস্র কণ্ঠের হুঙ্কারের মধ্যে আমি কিন্তু সেই হাতটি পাচ্ছি না, যাকে ধরে পথ চলতে পারি। আমার তাই মনে পড়ছে ফরাসি মহিলাটির কথা, যাঁকে বিবেকানন্দ স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন। রোগ যন্ত্রণায় অস্থির মুমূর্ষু মহিলাটি, অকস্মাৎ তাঁর সামনে অবির্ভূত হলেন দিব্যজ্যোতি পুরুষ বিবেকানন্দ—মুখে অপূর্ব হাসি। হাসির আগুন বলসে দিল মহিলাটিকে। তিনি চিৎকার করে কেঁদে পড়তে বললেন—আমার এত কষ্ট আর আপনি হাসছেন? ঠিক তখনই তাঁর চোখে গিয়ে পড়ল বিবেকানন্দের শরীরে। —একি! বুকের মাঝখানে অত বড় ক্ষতচিহ্ন কেন? এত রক্ত! আর্ত স্বরে তিনি আরও কি বলতে যাচ্ছেন—বিবেকানন্দ—তাঁর মুখে একই হাসি, হাতে ধরা রক্তপদ্ম, বললেন—জীবনে কত আছে, যন্ত্রণা আছে। তবু আমাদের বাঁচতে হবে, হাসতে হবে। বাঁচো, অপরকে বাঁচাও। ভয় নেই।

এই বিবেকানন্দকে না পেলে আমার চলবে না।

আনন্দ বাজারের সৌজন্যে (২০/১/৭৯)

যাবতীয় পেটের ব্যথা, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায় অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী ... মূল্য ৩.৫০ এক আউন্স
প্রস্তুতকারক: শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
হিমকটি কুটীর • কুমুদ গুহ • আগরতলা • ত্রিপুরা

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মেলন

(রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

গত ১২ই ডিসেম্বর কলকাতার নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট হলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যে সম্মেলন হয়ে গেল, সেটা একাধিক কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই সম্মেলনই প্রথম যেখানে সারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী দলমত নির্বিশেষে মিলিত হয়ে ছিলেন এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতে একসঙ্গে চলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে এইবারই বোধহয় প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামীরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সম্বন্ধে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে কয়েকটী প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। দেশের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে একটা হীন ও মিথ্যা প্রচারকার্য্য চলেছিল যে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা শুধু তাদের পাওনা আদায়ের জন্যই সমস্ত শক্তি ও পরিশ্রম ব্যয় করছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এই সম্মেলনে স্বার্থ হীন ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন যে তারা শহীদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ধ্যানের ভারতবর্ষ শুধু গড়ে তুলতেই চান না ; অধিকন্তু যতদিন না একটী সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ভারত গড়ে না ওঠে, ততদিন তারা বিশ্রাম গ্রহণ করবেন না। তারা গভীর বেদনার সঙ্গে একথা ঘোষণা করেছেন যে দেশের অর্দ্ধেকের উপর মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন, দেশের মানুষের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা খুবই অসন্তোষজনক। এই অব্যবস্থা এবং দুরবস্থার জন্য তারা তাদের দেশসেবার ঐতিহ্য নিয়ে সততা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের মূলধন নিয়ে কর্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করতে চান। সেজন্য তারা সরকারের নিকট গঠনমূলক কাজ করার জন্য সরকারের নিকট সুযোগ সুবিধাও দাবী করেছেন। একথা বলা হয়ে থাকে যে সুযোগ ও সুবিধা আদায় করে নিতে হয়, স্বেচ্ছায় কেউ হাতে তুলে দেয় না। এ কথাটা পরদেশী শাসকের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সত্য ছিল। এবং তখন তারা জীবন মরণ সংগ্রাম করে দেশকে স্বাধীন করে সে সুযোগ ও সুবিধা দেশবাসীর হাতে তুলে দিতে পেরেছেন। কিন্তু আজকের সরকার ত পরদেশী সরকার নয়। এই সরকারের নিতান্ত বাধ্য না হলে ত সংঘর্ষের পথ গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। তাই এদের দাবী সকলের সহযোগিতা ও সমর্থন নিয়েই জাতীয় সরকার দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করুন। এ দাবী ত দেশের সকল মানুষেরই। সরকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আদর্শ, নিষ্ঠা, ত্যাগ ও প্রজ্জ্বলন্ত দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেশের সামনে তুলে ধরুন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপূর্ব উদাহরণ ও ঐতিহ্য দেশের মানুষের মনে নতুন উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাবে। দেশের মধ্যে নৈতিকতাবোধ, ত্যাগ ও তিতিক্ষা, দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধের যে অবনতি ঘটেছে তার পুনর্বাসন করতে হলে দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমেই সে কাজ সম্পন্ন করা যাবে না কোনদিন। যাদের চরিত্রের মধ্যে এই সব গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল, তাদের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে দিলে একাজ সহজ হবে। রাজনীতিকে আজ ব্যক্তিগত লোভ চরিতার্থ করার একটী ব্যবসায়ে পরিণত করা হয়েছে একদল মানুষের দ্বারা। এই সব মানুষের কোন ঐতিহ্য নেই। কোন জন-কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। মহৎ উদ্দেশ্য লাভের জন্য নেই কোন আন্তরিকতা ও আগ্রহ। অন্যের পরিশ্রম, দুঃখ-কষ্ট ভোগ ও স্বদেশীকতার মাধ্যমে স্বাধীনতা নামক যে ধন লাভ হয়েছে, তার সিংহভাগ ভোগ করাই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কথায় বলে 'যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই।' এই নেপোর দল রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজ নিজ গোষ্ঠী বা দলের স্বার্থ সাধন করতে যতটা ব্যস্ত, দেশের মানুষের কল্যাণ সাধনে প্রায় ততটাই অনিচ্ছুক। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য্য যে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে পুরাণো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কয়েকজন নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু তারা আজ বহুক্ষেত্রে অসহায়। শুভ কর্মসূচী রূপায়ণে তারা ব্যর্থ হচ্ছেন, এই সব স্বার্থান্বেষীদের জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে, অলক্ষ্যভাবে

সংগৃহীত প্রচুর টাকা ব্যয় করে, ভোটের সময় জালিয়াতি জোচ্চুরি করে এরা ভোটে জয়লাভ করছেন! তাদের দাবী, সঙ্গত বা অসঙ্গত হোক, মেনে না নিলে দল ভেঙে যায় এবং নেতাদের মন্ত্রীত্বও হাত ছাড়া হয়। এই দুঃসময়ে যদি একদল কর্মী পাওয়া যায়, যারা নির্লোভ, চরিত্রবান এবং দেশের স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের উপরে স্থান, এবং তারা যদি সংযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেন, তবে সেটা গ্রহণ না করার মত কোন যুক্তি থাকতে পারে না। একমাত্র বদ্ধ উন্মাদ ও ক্ষমতার মোহে অন্ধ ব্যতীত এই সুবর্ণ সুযোগ কেউ হারাতে চায় বলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। সকলের, বিশেষ করে এমন একদল স্বদেশ সেবকের সহযোগিতা ভিন্ন শহীদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ধ্যানের ভারতবর্ষ যে গড়ে তোলা যায়। এই দীর্ঘ তিরিশ বৎসর সময় তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে। জাতীয় সরকার সহযোগিতা না করলে, সুযোগ না দিলে, বন্যা-পীড়িত, সর্বস্বান্ত মানুষের সেবা এমন কি আহার্য বণ্টন করাও সম্ভব হয় না, তার অতি আধুনিক দৃষ্টান্ত পশ্চিমবঙ্গে মিলেছে। আমাদের মনে হয়, দেশের সমূহ ও আসন্ন সর্বনাশ রোধ করতে হলে, প্রয়োজন হলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগ্রামের পথও নিতে হতে পারে। জীবনের প্রান্ত সীমায় এসে পৌঁছালেও হয়ত একাজ তাদের করতে হতে পারে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে। দেশ আজ বিপন্ন নানাভাবে। জাতিগত, সম্প্রদায়গত, আঞ্চলিক ক্ষুদ্র স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে রাজনৈতিক দল ও নেতারা বেভাবে ভোটের গুটিয়ে নিতে চাচ্ছেন, সংবিধান সম্মতভাবে তাতে বাধা দিতে পারেন, অতীতদিনের ঐতিহ্যবাহী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। তাদেরই রক্ত, শ্রম, অশ্রু ও ঘর্ম ব্যয় করে যে স্বাধীনতা এনেছেন, তাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তারাই। পথা তারা গ্রহণ করবেন শুধুমাত্র দেশবাসীর কল্যাণ সাধনের জন্য।

এই সম্মেলনের আরো একটী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়; স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাদের মধ্যে শ্রেণী-বিন্যাসের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বস্তুতঃপক্ষে সরকারের বর্তমান নীতি ভ্রান্ত। কারাবাসের সময়সীমার পরিপ্রেক্ষিতে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রেণী বিভাজন করা শুধু ভ্রান্তই নয়, রীতিমত অসম্মানজনক। এই ভ্রান্তনীতি পরিত্যাগ করার জন্য সম্মেলনে যে প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে, সেটা প্রণিধানযোগ্য ও গ্রহণযোগ্যও বটে।

এই সম্মেলনের আরো একটী লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে এই সম্মেলন উদ্‌ঘাটন করতে বারণ করা হয়েছিল রাজ্যপাল শ্রীত্রিভুবন নারায়ণ সিংকে একজন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে। তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে তিনি এই সত্য আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে স্বীকার করেছেন। রাজ্যপাল তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন:—আমাকে যে অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল হিসেবে আমন্ত্রণ না জানিয়ে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে নিমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি গর্বিত। আমার সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন এমন বহু মানুষ আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন, এতে আমার পুরাণো দিনের কথা মনে পড়ছে। আমি স্বীকার করি বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বাধীনতার পরও দুঃখ কষ্ট ভোগ করছেন, তাঁদের ভরণ-পোষণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। তবু এই সব স্বাধীনতা সংগ্রামী নিঃস্বার্থ-ভাবে দেশের সেবা করে গেছেন ও যাচ্ছেন।

রাজ্যপাল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পশ্চিমবাংলার ঐতিহ্যময় ভূমিকার উল্লেখ করে বলেন যে সব কিছু রাজনৈতিক মতবাদের উর্দ্ধে থেকে সেই ঐতিহ্যকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নিজেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সামান্য সৈনিক হিসেবে উল্লেখ করে, তিনি মনে করিয়ে দেন কিভাবে কাশী বিদ্যাপীঠের ছাত্র হিসেবে তিনি প্রয়াত শচীন সান্যাল, রাজেন লাহিড়ীর এবং অন্যান্য বিপ্লবী নেতাদের সংস্পর্শে আসেন।

সম্মেলনের মূল সভাপতি শ্রীশীলভদ্র যাজী তার বক্তৃতায় বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুরোধ করেন, তারা যেন ভারতে একটী সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রণীর নেতৃত্ব দান করেন। তিনি আরো অনুরোধ করেন যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি

প্রগতিশীল ও সমাজতান্ত্রিক কর্মধারাকে সমর্থন করেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেন তারা যে সম্মান-ভাতা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দেন, তার পরিমাণ যেন দুইশত টাকা হইতে পাঁচশত টাকায় বর্ধিত করা হয় এবং সম্মানভাতার ক্ষেত্রে যে আয়ের সীমা নির্ধারিত আছে, সেটা প্রত্যাহার করেন।

আর, এস, পি, নেতা শ্রীতারাপদ লাহিড়ী তাঁর বক্তৃতায় বলেন: স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কখন তাদের কাজের জন্য কোন পুরস্কার দাবী করেন নি। কিন্তু জনগণ ও সরকারের কর্তব্য হচ্ছে এটা দেখা, তারা যেন আর দুঃখভোগ না করেন। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আজো পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা অনেকেই দুঃস্থ জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। সম্মেলনে বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে সর্বশ্রী শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ভূপাল বসু, গোপেন মল্লিক, প্রভৃতি আরো অনেকে বক্তৃতা করেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনশন কমিটির সভ্য ও ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃ-স্থানীয় শ্রীগোপেন মল্লিক বলেন যে যে যুগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা ভারতবর্ষের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে স্বাধীনতার বেদী মূলে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর অনেক বিশ্বাসঘাতক রাতারাতি মাথায় গান্ধী টুপি চাপিয়ে নিজেদের দেশভক্ত প্রমাণ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিল নিজেরা ফুলমালা শিকারও করেছে। কিন্তু নিঃস্বার্থ, ত্যাগী, নির্যাতন-ভোগী দেশসেবীরা অর্ধাহারে, অনাহারে, আশ্রয়হীন হয়ে ভবিষ্যতে থেকে মুখ ফেরে।...সেকালে কেউ ভবিষ্যতে পেনশন পাবার আশায় দেশ সেবা করেননি। আজকে যে পেনশন দেওয়া হচ্ছে, তা সম্মানভাতায় পরিবর্তন করা হোক এবং সত্যকার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যাতে সেই সম্মানভাতা পান, সে বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। আমরা যারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলাম, আজ নূতনভাবে শপথ নিতে হবে জন্মভূমি ভারতবর্ষকে উপযুক্ত আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য।

এই সম্মেলনের প্রারম্ভেই শহীদ বেদীতে মাল্যদান করা হয় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রীঅশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের পর সভার কার্য শুরু হয়। সভায় কয়েকটী প্রস্তাব উত্থাপন করেন সর্বশ্রী শান্তিস্মরণ রায়চৌধুরী ও সমর্থন করেন শ্রীধীরেন ভৌমিক। সভার শেষ দিকে সভাপতির করেন বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পরলোকে অনন্ত সিং

বিপ্লবী অনন্ত সিং গত বৃহস্পতিবার ২৩শে জানুয়ারী সন্ধ্যার শেষ ওকলাণ্ড কাসল্যানি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হয়েছিল ৭৬ বৎসর।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলার অন্যতম নায়ক অনন্ত সিং-এর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষ তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে যান। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলায় তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অনন্ত সিং অকৃতদার ছিলেন। মাষ্টারদার অন্যতম শিষ্যরূপে কৈশোর থেকেই তিনি বিপ্লবী সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন এবং সশস্ত্র বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অনন্ত সিংয়ের পিতার নাম ছিল গোলাপ সিংহ মাতা শ্যামকুমারী দেবী। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরলোকে বর্ষীয়াণ বিপ্লবীনেতা ডাঃ নিশিকান্ত গাঙ্গুলী

গত ২১শে ডিসেম্বর সকাল ৮টা ২০ মিনিটে প্রবীণ বিপ্লবী নেতা ডাঃ নিশিকান্ত গাঙ্গুলী তাঁহার বাসভবনে পরলোক গমন করেন। তিনি ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন।

ছাত্র-জীবনেই তিনি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সংস্রবে আসেন এবং ১৯১২ সনে স্বামীজীর বিপ্লবী প্রেরণায় দীক্ষিত হন। তবে স্বামিজী তাকে পুলিসের নজর এড়িয়ে চলতে নির্দেশ দেন এবং আদিষ্ট হয়েই তিনি ভাগাকুলে শিক্ষকতা নেন এবং এম, এ পাশ করে হরেন্দ্রলাল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে স্বামীজীর মৃতদেহ নিয়ে তিনি বরিশাল শংকর মঠে যান। অচিরেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে দেন। অশ্বিনীকুমার দত্তের অনুরোধে তিনি লৌহজঙ্গ জাতীয় বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বৎসরাধিক-কাল লৌহজঙ্গ থাকেন। ১৯২৩ সনে তিনি পুনরায় বরিশাল শংকর মঠে ফিরে আসেন এবং ঐ মঠের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য অধ্যক্ষরূপে মঠ পরিচালনা করেন। এই সময়েই তিনি পরাধীনের মুক্তি, আমেরিকার স্বাধীনতা এবং অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন।

১৯৩০ সনে বরিশাল জেলা কংগ্রেস সভাপতি রজনী চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে বরিশালের সত্যাগ্রহ পরিচালনার সর্বাধিনায়ক মনোনীত হন। এই আন্দোলনের সময় তাঁর এবং জেলা কংগ্রেস সভাপতির এক বছর কারাদণ্ড হয়। বৎসরান্তে মুক্তি পাবার কিছু দিনের মধ্যেই পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং দীর্ঘদিন বকসা, দেউলী প্রভৃতি বন্দী নিবাসে আটক থাকেন। এই আটক থাকার কালেই তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় শিক্ষিত হন এবং এম, ডি, ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩৭ সনের শেষে মুক্তিপাবার পরে আর্তের সেবায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

১৯৪২ ভারত ছাড় আন্দোলনে পুনরায় ধৃত হন এবং প্রায় তিন বছর আটক থাকেন।

এই বিপ্লবী নেতার প্রয়াণে দেশ হারাল একজন প্রকৃত জ্ঞানী পণ্ডিত চিরকুমার যার জীবনে ক্ষুদ্রতা এবং মালিন্যের ছায়া কোনদিন পড়েনি। তাঁর অগণিত বিপ্লবী সুহৃদ। বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে আমরাও তাঁর শূন্যতা অনুভব করছি এবং তাঁর আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি।

ইতিহাস পুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

—কালীপদ সরকার

ইতিহাস পুরুষ নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯১৯ সালের ২৩শে জানুয়ারী বিয়াল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন। কিন্তু নেতাজী কি বেঁচে আছেন? বেঁচে থাকলে তিনি কোথায় কিভাবে আছেন? এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। সুদীর্ঘকাল নেতাজীর অস্তিত্বের অনুকূলে কোন সংবাদ না থাকার কারণে অনেকেই মনে করেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বেঁচে নেই, অপ্রাকৃত অথবা স্বাভাবিক কারণে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত নানাজনের স্তোক বাক্যের উপর বিশ্বাস করে, অথবা নেতাজীর মৃত্যুর সংপ্রমাণিত প্রমাণ না পাওয়ার কারণে, নেতাজী বেঁচে আছেন এমন ধারণা একান্ত ভাবে আত্মপ্রবঞ্চনা নির্ভর ছাড়া আর কি বলা যায়?

'নেতাজী মৃত না জীবিত' গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক সমর গুহ তাঁর বইতে বহু তথ্যের বিশ্লেষণ করলেও নেতাজী যে জীবিত আছেন এমন প্রামাণ্য তথ্য দিতে পারেন নি। উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের পর অধ্যাপক গুহ ১৯৭৮ সালের ২৮শে আগষ্ট সংসদ অধিবেশনে বলেছিলেন, "নেতাজী জীবিত এবং মুক্ত অবস্থায় আছেন। দেশবাসী খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে সব কিছু জানতে পারবেন।" তাঁর এই 'খুব শীঘ্র' কতকালের ব্যবধান বিড়ম্বিত তার আভাস যেমন তিনি দেন নি, তেমনই তিনি তাঁর সংবাদের সূত্রও যে কি তাও জানান নি। সুতরাং সংসদ সদস্য অধ্যাপক গুহের ঘোষণা নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যের উপর কোন আলোক পাত করতে সক্ষম হয় নি।

ভারত সরকার নেতাজীর অন্তর্ধান বিষয়ে দুটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করেছিলেন। দুটি কমিশনই ২৩।৮।৪৬ তারিখের টোকিও বেতার পরিবেশিত ১৮।৮।৪৬ তারিখে তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মৃত্যুর সংবাদ সমর্থন করে রিপোর্ট দেন। প্রথম তদন্ত কমিটির অন্যতম সদস্য নেতাজীর অগ্রজ শ্রী সুরেশ চন্দ্র বসু অবশ্য কমিটির অপর দুজন সদস্যের সহিত তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনা জনিত নেতাজীর মৃত্যুর তথ্য সম্বন্ধে একমত না হতে পেরে পৃথক রিপোর্ট দাখিল করেন। তদন্ত কমিশনের রিপোর্টগুলি সংসদে আলোচিত এবং তদন্ত গ্রহণের দ্বারা মীমাংসিত হয়নি। সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাই সংসদে বলেছেন, রিপোর্টগুলিতে মারাত্মক ত্রুটি ও অসঙ্গতি থাকায় সরকার সেগুলি বাতিল করে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এই সাধারণ ঐ একই কারণে পূর্বেই শাহনওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশনের তদন্ত রিপোর্ট দুটি অগ্রাহ্য করেন। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যোদ্ঘাটনের সঙ্গত প্রয়াস ভারত সরকার করেননি, অথবা এই প্রয়াস সরকারের সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

১৯৪৫ সালের ৭ই মে জার্মানীর আত্মসমর্পণের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের মনে কোন সংশয় ছিল না। তিনি তখন সিঙ্গাপুরে অবস্থান করছিলেন। কিছু ঘনিষ্ট সহকর্মীদের সহিত নিরাপদ স্থানে চলে যাবার উদ্দেশ্যে নেতাজী জাপ কর্তৃপক্ষের নিকট তখন বিমান সাহায্যের অনুরোধ জানান নেতাজীর প্রস্তাবে জাপান সরকার সম্মতিও দেয় কিন্তু প্রতিশ্রুত বিমান পাঠাতে অথবা বিলম্ব করতে থাকে। ইতিমধ্যে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনি বার্মা পুনরধিকার করে সিঙ্গাপুরের দিকে অগ্রসর হয় এবং নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের উর্দ্ধতন অফিসার ও অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীদের সহিত সিঙ্গাপুরে ব্রিটীশ শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪৫ সালের ৭ই আগষ্ট মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্র হিরোসিমায় এবং ৯ই আগষ্ট নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করে। ৮ই আগষ্ট সোভিয়েত রাশিয়া রুশ-জাপ অনাক্রমন চুক্তি ভঙ্গ করে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইতিপূর্বে জাপান সোভিয়েত রাশিয়ার মাধ্যমে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির সহিত সন্ধির আলোচনা চালায়।

নেতাজী যুদ্ধের এই নাটকীয় পরিণতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। জাপানের নিকট থেকে সময়মত নিরাপদ স্থানান্তর যাত্রার জন্য সাহায্য না পাবার কারণেই নেতাজী সহকর্মীদের সহিত ব্রিটীশের নিকট আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

জাপানের আত্মসমর্পণের পর জাপ সরকার সহসা নেতাজীর নিরাপত্তার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে এবং একাধিক উচ্চ পদস্থ জাপ সামরিক অফিসার নেতাজীকে সিঙ্গাপুর থেকে সাইগন নিয়ে যেতে তৎপর হন। জাপানের ইম্পিরিয়াল হেড কোয়ার্টার্স থেকে এই উদ্দেশ্যে নেতাজীর নিকট বিশেষ দূত প্রেরিত হয়। জাপান সরকারের পরিচ্ছায় উপর নির্ভর করে নেতাজী তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং ১৬ই আগষ্ট কতিপয় সহকর্মীর সহিত জাপ জেনারেল ইসোদা, মিঃ মেগিশি ও কর্নেল সাকাই এর পরিচালনাধীনে একটি জাপ বিমানে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করেন। ব্যাংককে পৌঁছে জাপ ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির বিশেষ ব্যবস্থাপনায় কর্নেল তাজার সহিত নেতাজীর আর এক দফা গোপন পরামর্শ হয়। ১৭ই আগষ্ট সকালে জেনারেল ইসোদা, মিঃ মেগিশি, কর্নেল সাকাই, মিঃ হাচিয়ার সহিত নেতাজী তাঁর সহকর্মী এস. এ. আয়ার, দেবনাথ দাস, প্রীতম সিং, গুলজারা সিং, আবিদ হাসান এবং কর্নেল হবিবর রহমানের সমভিব্যাহারে দুইটি বিমানে ব্যাংকক ত্যাগ করেন এবং ঐ দিনই মধ্যাহ্নে সাইগণে পৌঁছান। সাইগনে জেনারেল ইসোদা ও নেতাজীর মধ্যে পুনরায় কিছু গোপন আলোচনা হয়। নেতাজীর সহযাত্রী ভারতীয় সহযোগীরা তাঁর সিদ্ধান্তের বিষয় কিছুই জানতেন না তাঁদের মনে হয়েছিলো নেতাজী টোকিও যাচ্ছেন এবং সম্ভবতঃ তাঁদেরও নেতাজীর সঙ্গে টোকিও যেতে হতে পারে।

নির্দিষ্ট বিমানখানি সাইগণ থেকে উড়ে যাবার ঘন্টা দুয়েক আগে জেনারেল ইসোদা নেতাজীকে জানান যে তাঁর চারজন সহকর্মী যাঁরা সিঙ্গাপুর থেকে সাইগণ পর্যন্ত নেতাজীর সহিত এসেছিলেন এবং নেতাজীর নিরাপদ স্থানান্তর যাত্রায় তাঁর সহযাত্রীরূপে মনোনীত হয়েছিলেন, তাঁদের নেতাজীর সহিত দেওয়া সম্ভব হবে না, জাপ কর্তৃপক্ষ নেতাজীকেই শুধু নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবে। সিঙ্গাপুর ত্যাগের সময় জাপ কর্তৃপক্ষ কিন্তু নেতাজীর সহিত তাঁর এই চার জন সহযোগীকেই যথাস্থানে নিয়ে যেতে সম্মত হয়েছিল। জাপানের এই পরিবর্তিত সিদ্ধান্তের বিষয় সিঙ্গাপুরে অবস্থান কালে অবগত হলে নেতাজী সিঙ্গাপুর ত্যাগ করতেন কিনা নিশ্চিত বলা যায় না। সিঙ্গাপুরে নেতাজী তাঁর সশস্ত্র বাহিনীর একাংশের সহিত ছিলেন এবং একেবারে অসহায় ছিলেন না। সাইগণে তাঁর অবস্থা ছিল ভিন্নরূপ, সেখানে তিনি জাপ সামরিক নিয়ন্ত্রণে ছিলেন বলা চলে। যাইহোক, জাপ কর্তৃপক্ষের শেষ সিদ্ধান্ত জানবার পর নেতাজী তাঁর সহকর্মীদের সহিত পরামর্শ করেন এবং তাঁদের সম্মতি নিয়ে একাকীই নিরুদ্দেশ যাত্রার রওনা হন। এ সম্পর্কে আরো জানা যায় শেষ পর্যন্ত নাকি জাপ কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট বিমানে নেতাজীর একজন সহযাত্রীকে নিতে সম্মত হয় এবং কর্নেল হবিবর রহমান নেতাজীর সহিত যাত্রা করেন। ঐ বিমানে সোনা ও মনিমুক্তা পূর্ণ আজাদ হিন্দ সরকারের কয়েকটি পেটিও তোলা হয়। জাপ বোমারু বিমানটি সামরিক নিয়ন্ত্রাধীনে ছিল। বেলা পাঁচটার সময় নেতাজী সুভাষ চন্দ্রকে নিয়ে বিমানটি সাইগণ ত্যাগ করে। নেতাজীর শেষ পরিক্রমা সম্পর্কে এই পর্যন্ত হল সমর্থিত ও স্বীকৃত তথ্য, এর পরের সংবাদ উদ্বেগ প্রনোদিত ও সংশয় কণ্টকিত।

২০শে আগষ্ট জাপান বেতার থেকে বলা হয়—অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান মিঃ বসু সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে জাপ সরকারের সহিত আলোচনার উদ্দেশ্যে টোকিও যাবার পথে ১৮ই আগষ্ট বেলা ২টার সময় তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় গুরুতররূপে আহত হন এবং ঐ তারিখে মধ্যরাত্রে তাইহোকু সামরিক হাসপাতালে মারা যান। ২১শে আগষ্ট ঐ সংবাদের উপর নির্ভর করে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশ করে। এই সময় ব্রিটীশ ভারতবর্ষে বহাল তবিয়তে বর্তমান। দুই বৎসর পরে ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে চলে যেতে হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ী ব্রিটীশের নিকট তা ছিল স্বপ্নের অগোচর। বিমান

দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুর সংবাদকে মেনে না নিলেও, ব্রিটীশ সরকার কোন অজ্ঞাত কারণে এই সংবাদের সত্যতা প্রকাশ্যে অস্বীকারও করে না।

১৯৭৬ সালের আগষ্ট লণ্ডনে ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের গোপন ঐতিহাসিক দলিল পত্র প্রকাশিত হয়। ঐ দলিলের ষষ্ঠ খণ্ডে বন্দী নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের বিচার সম্পর্কে কিছু কৌতুহল দীপক তথ্য আছে। ১৯৪৬ সালের ২৩শে আগষ্ট তদানীন্তন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ মুডি, সুভাষ চন্দ্র ব্রিটিশ সরকারের হাতে বন্দি হলে কি ভাবে তাঁর বিচার ও দণ্ডবিধান করা হবে সে সম্বন্ধে একটি নোট বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের সেক্রেটারী স্যার ই. জেনকিংসের বরাবর পেশ করেন। ঐ নোট থেকে জানা যায় নেতাজী তখন বন্দী এবং ব্রিটিশ সরকার নেতাজীকে ভারতের বাইরে দ্রুতগতি বিচার করে প্রাণদণ্ড অথবা ভারতের বাইরে গোপন নির্বাসন দিতে সিদ্ধান্ত করেছিল। উক্ত নোট থেকে আরও জানা যায় ব্রিটীশ সরকার নেতাজীর রাশিয়ায় আশ্রয় লাভের বিরোধী ছিল এবং তখন পর্যন্ত নেতাজী রাশিয়ায় যেতে সক্ষম হন নি।

মিঃ মুডি তাঁর নোটের শেষ দিকে লিখেছেন—

"There is more to be said for detention and inturment some where out of India. Out of sight would be to some extent out of mind and agitation for his release might be less also. Escafe to Russia would be deficult." মিঃ মুডির নোটটির তারিখ ২৩/৮/৪৬, ঐ তারিখেই টোকিও বেতার থেকে নেতাজীর মৃত্যুর সংবাদ পরিবেশিত হয়। খুব সম্ভব মিঃ মুডি বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর সংবাদ অবগত ছিলেন না, নতুবা তাঁর নোটে সে বিষয়ের উল্লেখ থাকত।

টোকিও বেতারের তথাকথিত মৃত্যুর সংবাদ সম্বন্ধে স্বভাবতই সন্দেহ জাগে। ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগষ্ট নেতাজীর মৃত্যু হলে পাঁচদিন পরে অর্থাৎ ২৩/৮/৪৫, তারিখে মৃত্যুর সংবাদ ঘোষিত হল কেন? নেতাজীর মৃত দেহের কোন ফটো রাখাই বা হল না কেন? নেতাজীর শেষ কৃত্যসম্পাদনের সময় স্থানীয় ভারতীয়দের ডাকা হল না কেন? আত্মসমর্পনের চুক্তিতে জাপান কর্তৃক নেতাজীকে ইঙ্গ-মার্কিন দখলদার শক্তির হাতে অর্পণ করার শর্ত ছিল। বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হলে সত্যতা প্রমাণের জন্যই জাপ কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল মৃতদেহের ফটো তোলা এবং মৃত দেহ জন সাধারণ ও বিশিষ্ট বৈদেশিকদের অবলোকনে লাভ করা। তারপর, জাপান বেতার প্রথম জানায় যে নেতাজী তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় আহত হন এবং তাঁর চিকিৎসা হয় টোকিও হাসপাতালে এবং সেখানেই তিনি মারা যান। দ্বিতীয় সংবাদে বলা হয় আহত নেতাজীকে তাইহোকুর হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয় এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। সংবাদের বিভিন্নতা সন্দেহকে আরো ঘনীভূত করে এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা সাজানো কাহিনী বলে মনে হয়।

জাপান আত্মসমর্পণ করে ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগষ্ট, তারপর কি জাপানের বেতার সংস্থা তার স্বাধিকারে থাকতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। সুতরাং ২৩শে আগষ্ট তারিখের টোকিও বেতারের সংবাদ নিঃসন্দেহে ইঙ্গ-মার্কিন দখলদার শক্তি কর্তৃক প্রভাবিত। নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যুর পাঁচ দিন পরে মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশের কারণ হিসাবে মনে হতে পারে যে নেতাজী তাঁর ঈপ্সিত আশ্রয় স্থল রাশিয়ায় পৌঁছাবার পর জাপান পূর্ব পরিকল্পনামত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করেছিল। পক্ষান্তরে এ সম্পর্কে এ কথাও বলা যায় যে জাপান আত্মসমর্পণের চুক্তি অনুযায়ী নেতাজীকে দখলদার ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছিল এবং নেতাজীর সংক্ষিপ্ত বিচার ও দণ্ডদানের পর তথ্য গোপনে চাপা দেবার উদ্দেশ্যে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর সংবাদ রটনা করেছিল। অ্যাটম বোমার বিভীষিকা ও চরম সামরিক বিপর্যয়ের কারণে জাপানের নৈতিক মনোবল ভেঙ্গে পড়েছিল। জাপানের নিকট তখন মৈত্রীমূলক প্রতিশ্রুতি অথবা পূর্ব সম্পর্কের ঐতিহ্য রক্ষার প্রশ্নই ছিল না, সর্বনাশা ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের চিন্তাই তখন তাকে পেয়ে

বসেছিল। জাপান তার নিজের দেশের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজো এবং উচ্চ পদস্থ সামরিক অফিসারদের বন্দী করে মধ্যদার শত্রুর হাতে তুলে দিতে দ্বিধাবোধ করে নি। এমন কি জেনারেল তোজো আত্মহত্যার জন্য যখন রিভলবার করতে উদ্যত হয়েছিলেন তখন তাঁকে তাদেরই আদেশক্রমে আত্মহত্যার সুযোগ না দিয়ে বন্দী করে আত্মসমর্পণের চুক্তি মত মধ্যদার শত্রুর নিকট অর্পণ করেছিল।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র যদি রাশিয়ায় চলে যেতে সক্ষম হতেন তবে দীর্ঘকাল আত্ম প্রকাশ না করে সেখানে তিনি গোপনে অবস্থান করবেন কেন? রাশিয়ার সহিত নেতাজীর শত্রুতা ছিল না, অক্ষশক্তি শিবিরে নেতাজীর যোগদান যে একান্তভাবে স্বদেশের স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে ছিল সে সত্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক রাশিয়ার নিকট অবিদিত ছিল না। সুতরাং নেতাজীকে রাশিয়া কারারুদ্ধ করতে যাবে কেন এবং করলেও বা অনন্তকাল তাঁকে কারা বন্দী করে রাখবে কেন? রাশিয়া সরকারী-ভাবে বলেও দিয়েছে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের শেষ পরিণাম সম্বন্ধে রাশিয়া কোনভাবে যুক্ত নয়।

মিঃ মুডির নোট থেকে জানা যায় ঐ সময় নেতাজী বন্দী অবস্থায় ছিলেন। নোটে স্পষ্টভাবে কোন রাষ্ট্রের নাম না থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সেই রাষ্ট্র জাপান। ব্রিটেনস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী এন. জি. গোরে এবং আরো অনেকে মুডির নোট পড়ে তাই বুঝেছেন। গত ১০।৪।৭৮ তারিখে ভিয়েনায় এক সেমিনারে বক্তৃতাদানকালে সে কথা শ্রী গোরে স্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি এ সম্পর্কে আরো বলেছেন যে মুডি নোট লিখবার সময় ভারত সরকার কি সত্যই জানতেন যে নেতাজীর মৃত্যু ঘটেনি এবং তিনি নিরাপদ স্থানে চলে যেতে সক্ষম হয়েছেন? নেতাজীর মৃত্যুই যদি হবে তবে সরকার তাঁর বিচার ও দণ্ডবিধানের জন্য চেষ্টিতই বা হবেন কেন?

১৯৫৫ সালে লোকসভায় নেতাজীর অন্তর্ধান সম্পর্কে তদন্ত কমিশন গঠনের দাবীর উত্তরে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন—"ঘটনার স্থান জাপান, সব কিছু হয়েছে সেখানে। আমরা এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারি না কিংবা জাপানের উপর একটি তদন্ত কমিশন চাপিয়ে দিতেও পারি না। অবশ্য জাপান যদি তদন্ত করতে চায় তাহলে আমরা সানন্দে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা এবং সাধ্যানুসারে সাহায্য করতে পারি। .....বিশেষ করে যখন সম্ভাব্য সকল সাক্ষীই জাপানী-সরকারের অফিসার অথবা জাপ-সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি।" পণ্ডিত নেহেরুর উক্তি "ঘটনার স্থান জাপান, সব কিছু হয়েছে সেখানে" বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য।

পণ্ডিতজী তার পরে বলেছিলেন—"নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মৃত্যু সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহ নেই, এ সন্দেহ আগেও ছিল না, এখনো নেই। আমি মনে করি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মৃত্যু অবধারিত সত্য।" পণ্ডিত নেহেরু খুব সম্ভব নেতাজীর পরিণাম বিষয় অবগত ছিলেন, কূট-নৈতিক কারণে এর বেশী তাঁর পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। যদিও মৃত্যু সম্পর্কে তিনিও কোন প্রমাণ দিতে পারেন নি। সুতরাং মৃত্যুর সুনিশ্চিত প্রমাণ না থাকায় ভাবতে হয় নেতাজী বেঁচে আছেন। জীবনের শেষে মৃত্যু আছে, আছে বিস্মৃতির কাল প্রবাহ। কিন্তু পৃথিবীতে অতি অল্প কিছু মানুষ রয়েছেন যাঁরা লৌকিক সত্তার অবসানে মানব স্মৃতি-লোকে অমরত্ব লাভ করেছেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু সেই বিশ্ববরেণ্য মহামানবদের অন্যতম। ইতিহাস পুরুষ নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের মৃত্যু নেই, নেতাজী মৃত্যুঞ্জয়ী নেতাজী ভারতের চিরন্তন স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ। নেতাজী জিন্দাবাদ।

জাতীয় সমস্যা সমাধানের উপায় চিন্তা

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এ সমস্যার সমাধান কল্পে পর পর পাঁচ পাঁচটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভারতে রূপায়িত হলো, কিন্তু সমাধানের পরিবর্তে বেকারের সংখ্যা আরো বেড়ে গেল। নিশ্চয় পরিকল্পনাগুলি ভাবাবেগে ভরা ছিল, আসল ও বাস্তব চিন্তার অভাবে পরিকল্পনা রূপায়ণের পরেও বেকারীর মাত্রা এতটুকুও কমলো না। কাজেই সরকারকে এবারে অধিক যত্নশীল ও প্রকৃত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বেকারী-নিরসনে সঠিক পন্থায় নিশ্চিত সুফলের আশায় অগ্রসর হতেই হবে। অন্যথায় দেশের সামনে বিরাট বিপদ্যয় এমন আকারে দেখা দেবে যে সর্বনাশ সমুপস্থিত হবে এবং দেশ হয়ত বা রসাতলে যাবে। দেশের ও দশের স্বার্থে এক কথায় জাতীয় স্বার্থে ভারতে বেকারী দূর করতেই হবে এবং সে বিষয়ে সরকারকেই অগ্রণী হতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই এ ব্যাপারে সচেতন এবং তিনি ১৯৭৭ সালে গদীতে বসেই বলেছিলেন যে, আগামী দশ বছরের মধ্যেই তিনি বেকারী সম্পূর্ণভাবে দেশ থেকে দূর করবেন। আশাকরি তিনি সে কথা রাখবেন। বেকারী দূরীকরণ অতি কঠিন কাজ, তবুও মোরারজী ভাইয়ের ওপর আমরা এ বিষয়ে আশা রাখতে পারি। দেখা যাক শেষ অবধি কি হয়। দারিদ্র মোচন বিনা স্বাধীনতা নিরর্থক, তাই দারিদ্র মোচনের জন্য সরকারকেই আইনের মাধ্যমে বর্তমান ভূমি ব্যবস্থার দ্রুত সংস্কার সাধন করে যে ঘর্ম বৈষম্য আজও বিরাজ করছে তার উৎসাদন এবং একাজে সরকারের আন্তরিক ও বাস্তবভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও তাহা রূপায়ণের জরুরী প্রচেষ্টা চাই। ভূমিহীন প্রকৃত কৃষকরা যাতে চাষ করার অধিকার পায় ও ফসলের পুরাপুরি ফসল পায় সে ব্যবস্থা আইনের দ্বারা সরকারকেই করতে হবে এবং কোন জমিই যেন পতিত হয়ে পড়ে থাকতে না পারে তাও লক্ষ্য রাখতে হবে। পতিত জমিগুলি সরকারী প্রচেষ্টায় উদ্ধার ও তাহা সমবায়ের মাধ্যমে ভূমিহীন এ চাষ-যোগ্য করে ফসল ফলাতে হবে, আর ঐ কৃষি জমিগুলিই সমবায়ের মাধ্যমেই তা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেবে। এ ব্যাপারে সমবায় প্রথায় চাষই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলে বিবেচিত হয়। সমস্ত কর্ষণ-যোগ্য জমি যদি সমবায়ের মাধ্যমে এখন থেকে চাষ-আবাদ করার ব্যবস্থা সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় শুরু হয়, তবে বিভিন্ন মালিকের জমির বিদানা বা সীমানা চিহ্নিত করার জন্য বর্তমানে 'আল্' দেওয়ার প্রথা চালু আছে তা আর দরকার হবে না। ফলে 'আল্' দেওয়ায় যে জমিটা বাতিল হচ্ছে আর চাষ করা যেত না এবং যার পরিমাণ বেশ উল্লেখযোগ্য তাবে বিশাল তা চাষের কাজে এখন থেকে লাগবে; অতীতের মত অনাবাদী আর পড়ে থাকবে না এবং যার যেটুকু জমি ও সেই জমিতে সমবায় প্রথায় যে যতটুকু শ্রমদান করবে সেই হারেই সে তার জন্য প্রাপ্য ফসল পাবে। আর যদি সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়ে সকল জমির মালিকানা খাসে নিয়ে নেয় তবে তা আরো উত্তম ব্যবস্থা এবং সেক্ষেত্রে পারস্পরিক শ্রমের বিনিময়ে উৎপন্ন ফসলের ভাগ বাঁটোয়ারা তাথাভিত্তিতে করা যেতে পারে যাতে সকলেই উপকৃত হবে এবং দেশও খাদ্যে পরিপূর্ণভাবে নির্ভর হবে, ফলে দারিদ্র্য দূর করাও তখন সম্ভব হবে, অন্ততঃ কৃষি-জীবি মানুষদের ক্ষেত্রে। আর জলাশয়গুলিও উক্ত পন্থায় মাছ চাষের উপযোগী করে সমবায় পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে একই ভাবে মৎস্যজীবিদের দারিদ্র দূর করা বাস্তবে সম্ভব হবে। তাছাড়া নদী, খাল, বিল, সমুদ্র ও সমুদ্রোপকূলবর্তী জলাশয়গুলিকে একই ভাবে কাজে লাগিয়ে সুফল পাওয়া যেতে পারে অধিক হারে এবং এতে দেশে প্রটিন খাদ্যেরও অভাব মিটবে ও সাথে সাথে অনেক কর্মহীন দরিদ্র মানুষ এ কাজে বহাল হয়ে উপার্জন-ক্ষম হবে। যদিও পরিকল্পনা ও তাকে রূপায়িত করা ছাড়া দারিদ্র দূর করা সরকারের পক্ষে মোটেই সম্ভব হবে না। সমবায় ছাড়া আর অন্য কোন পদ্ধতিতে এর সমাধান সম্ভব নয়। সরকারকে আর গড়ং গচ্ছ ভাবে এগুলে সুফল পেতে অনেক বিলম্ব হবে; ঠিক উক্ত পদ্ধতিতে

সমবায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কুটির শিল্প পুনরুজ্জীবন ও হস্তশিল্প পরিচালনার জন্য সরকার ও জনগণকে যুগ্ম পদক্ষেপে এখন অগ্রসর হতে হবে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, একতার সঙ্গে, আন্তরিকতার সঙ্গে এবং সঠিক ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা রূপায়ণের কঠিন দায়-দায়িত্ব ও ব্রত নিয়ে এগুলে তবেই সফলতা অচিরে আসিবে, নচেৎ নয়। সে কারণ আর অপেক্ষা না করে অতি জরুরী ভিত্তিতে ভারতের দারিদ্র্য তথা অপুষ্টি ও রোগ জ্বালা আশু নিরসনের জন্য সকল শক্তি ও সৎ প্রচেষ্টা নিয়ে সরকার জনগণকে উপরোক্ত ব্যবস্থার সমবায় ভিত্তিক পন্থায়, প্রয়োজন বোধে আইন তৈরী করেও দ্রুততার সাথে আর কালক্ষেপ না করে অগ্রসর হতেই হবে, নচেৎ দেশ ও দেশবাসী অদূর ভবিষ্যতে হয়ত ধ্বংসের পথে অথবা গৃহ-যুদ্ধের পথে আগুয়ান হতে বাধ্য হবে। সময় এখনও আছে, কিন্তু আর কতদিন স্বাধীনদেশের নরনারী এই সীমাহীন তীব্র দারিদ্র, অপুষ্টি, বেকারী ও বস্ত্র-বৈষম্যের মরণ জ্বালায় জ্বলে পুড়ে থাক্ হবে? এর অবসান এখনই চাই।

• • •

গনতান্ত্রিক আবরণে দলতন্ত্র চালু

পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত বলে জ্যোতি-বাবুরা যখন মাঝে মাঝে জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দেন তখন একবারও কি তাঁরা ভাবেন না যে নামে গণতন্ত্র হলেও কাজে তাঁরা যে তন্ত্র চালু করেছেন তা মোটেই গণতন্ত্র নয়—দলতন্ত্র, যার অপর নাম স্বৈরতন্ত্র ছাড়া অন্য কিছুই নয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই এখানে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা লক্ষ্য হয়, তা কোনমতেই দল-নিরপেক্ষ ত নয়ই; বরং সি, পি, এম এর সীমাহীন দলবাজীর পরাকাষ্ঠা পদে পদে, পরিলক্ষিত হয়। এমন কি যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদলের ওপরও হীন দলবাজী করতে সি, পি, এম সর্বদা সচেষ্ট এবং সে কথা মাঝে মাঝে আর, এস, পি ও ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীরা প্রকাশ্যে অভিযোগ আকারে তুলতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না। কুণ্ঠিত হচ্ছে না। সংবাদ পত্রে বিবৃতির মাধ্যমে সে সব ঘটনার উল্লেখও দেখা যায়। যুক্তফ্রন্ট সরকার বলতে বাস্তবে সি, পি, এম সরকার হলেই এখন সবাই মনে করে, কারণ প্রায়শঃ ষোল আনা কেন আঠার আনা সি, পি, এম দলের এবং সেইজন্যই ষোলয়ন সর্বক্ষেত্রে সরকারী আনুকূল্য ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে একমাত্র সি, পি, এম দলভুক্ততা। শরিকদলের কেউ কেউ হয়ত বা কোথাও কিছু ছিটেফোঁটা প্রসাদ পায়, যদি সেখানে ও সে ব্যাপারে সি, পি, এম-এর কেউ দাবীদার না থাকে; অন্যথায় কিন্তু সি, পি, এম-এর পোয়া বারো। গণতন্ত্রে দেশের প্রতিটি মানুষ সমান সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার দাবীদার হকদার, কোনরূপ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার দেওয়া মানে বৈষম্যমূলক আচরণ এবং তা গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অথচ বাস্তবে দেখা যায় সর্ব-ক্ষেত্রে, সর্বস্তরে সি, পি, এম দলভুক্তরা অত্যন্ত অন্যায়ভাবে, নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ও অগণতান্ত্রিক পথে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করছে যা শুধু নিন্দনীয়ই নয়, সংবিধান বিরোধীও বটে। কি সরকারী চাকুরীতে, কি আধাসরকারী চাকুরীতে, কি পৌরসভাগুলিতে, কি সরকার অনুমোদিত বা পরিচালিত স্কুল-কলেজে, কি পঞ্চায়েতে, কি সরকারী কর্পোরেশনের অধীনে, কি সরকার পরিচালিত বা অধিগৃহীত শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে এখন সব জায়গায় সি, পি, এম দলভুক্তরাই অগ্রাধিকার পায় এবং চাকুরীতে বহাল হয়। এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে বর্তমান সরকার দলীয় স্বার্থ সিদ্ধি ও সংরক্ষণে বা দলের প্রভাব কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টায় হাত না বাড়িয়েছেন। এখন সরকার দল বলতে লোকে সি, পি, এম দলকেই বোঝে কারণ যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদলগুলি এত সংখ্যালঘু যে সি, পি, এম যেন খুশী এদের বাদ দিয়ে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে একাই সরকার গঠন করে শাসনকার্য্য চালাতে পারে এবং শরিকরা তা জানে ও বোঝে বলেই অম্লানবদনে সি, পি, এম-এর দলবাজী শেষ পর্য্যন্ত সহ্য করে মন্ত্রীত্ব বজায় রাখার মানসে। (চলবে)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

বাল্যকাল ও যৌবনের শিক্ষা

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

আমি একটি কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। রাজা বল্লাল সেন কর্তৃক কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ার সময় থেকেই আমাদের পরিবার কৌলিন্যের গৌরব বোধ নিয়ে অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের বংশের পবিত্রতা রক্ষা করে এসেছে। অর্থের প্রলোভন বা আরাম-বিলাসে জীবন কাটাবার কোন প্রবৃত্তি তাদের পারিবারিক মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখার দৃঢ়তা ও চিরাগত সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ব্রাহ্মনোচিত সহজ ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও উন্নত চিন্তার এক মূল্যবান সম্পদের অধিকারী ছিল এই পরিবার। এই সম্পদ তাদের এমন এক মহিমা দান করেছে যা কোন বিত্ত-ঐশ্বর্য্য দিতে পারেনি।

আমার পিতামহ ছিলেন ধ্যান-ধারণায় একজন প্রাচীন-পন্থী ব্রাহ্মণ। স্বধর্ম প্রিয়তায় তিনি ছিলেন একজন কঠোর প্রকৃতির লোক। সংযত ও নিয়ম-বদ্ধ জীবন ছিল তাঁর। প্রাচীন যুগের উপযোগী সন্তোষ ও সহজ জীবন বোধ নিয়ে তিনি তাঁর সারাদিনের কর্ত্তব্য কাজগুলি সম্পন্ন করে যেতেন। সেগুলি এমন নিপুণ ও যথাযথভাবে পালন করতেন যা সচরাচর প্রাচ্য জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। তাঁর এই জীবনযাত্রা প্রণালীর দিকে লক্ষ্য করলে গত শতাব্দীর ষাট দশকের প্রথম দিকের একটি নিষ্ঠাবান পরিবারের এক সজীব ও মনোরম চিত্র ভেসে ওঠে। তবে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তৎকালীন অবস্থায় যতটা সম্ভব ইংরেজী শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রই আমার পিতা।

আমার পিতা হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেছিলেন। ছাত্র হিসাবে তিনি বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং ডেভিড হেয়ারের একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ডেভিড হেয়ার ছিলেন বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর মৃত্যুর পরে দুই প্রজন্মের অধিক সময় অতীত হয়ে গেলেও আজও ডেভিড হেয়ারের স্মৃতি পূজা হয়ে থাকে। প্রতি বছর ১লা জুন তারিখে তাঁর মৃত্যু-বার্ষিকী পালন করা হয়। যে জমিটুকুর উপর তাঁর অনাড়ম্বর স্মৃতি স্তম্ভটি দাঁড়িয়ে আছে তা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান-পূত জমি নয় (কারণ তৎকালে খ্রীষ্টান ধর্মের গোঁড়ামি কোন পবিত্রীকৃত ভূমিতে তাঁর দেহ সমাধিস্থ করতে অনুমতি দেয়নি)। স্মৃতি বার্ষিকীর দিনে তাঁর সেই স্মৃতি স্তম্ভটিকে ফুলে ও মালায় সাজিয়ে দেওয়া হয়। এমন সব লোক সেই ফুল এবং মালা দিতে সেখানে যান যাঁরা রক্ত-মাংসের শরীরে তাঁকে কোনদিন দেখেন নি; কিন্তু সকৃতজ্ঞ চিত্তে মনের মন্দিরে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন। তিনি ভারতে আসেন একজন ঘড়ি প্রস্তুত-কারক রূপে; কিন্তু দেহ-ত্যাগ করেন একজন শ্রেষ্ঠ মানব-দরদী পুরুষরূপে, যেন রাজপুত্রের মত সম্মান নিয়ে। হিন্দু পরিবারসমূহের ভালবাসা ও বন্ধুত্ব তিনি লাভ করেছিলেন। এই রকম একটা কথা প্রচলিত আছে যে তিনি একবার আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন (আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারার মধ্যে এই ঘটনাটির কথা মিশে আছে)। আমার পিতা কি একটা কাজ করে হিন্দু আচারের নিয়ম ভঙ্গ করে আমার পিতামহের অসন্তুষ্টির ভয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় আমার পিতামহী শোকে-সন্তপ্তা হয়ে পড়লে ডেভিড হেয়ার তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন।

পরবর্ত্তীকালে আমার পিতা মেডিকেল কলেজে পড়াশুনা করে তাঁর সময়ে একজন সেরা ডাক্তার রূপে যশ লাভ করেছিলেন। তিনি যে শিক্ষালাভ করেছিলেন, তাতে তাঁর মন থেকে নিজ পারিবারিক জীবনের নৈতিক ধ্যান-ধারণা তিরোহিত হয়ে যায়। (চলবে)

প্রগতি

মানুষ এক বিপর্যয়কারী কথা চিন্তা করে,—তা হ'ল 'প্রগতি' এই 'প্রগতি' আমাদেরই স্বমুখ নিসৃত বাণী, পরে যাহা সর্ব্ব বিষয়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে আমাদের বিপথগামী করে। প্রগতি বলতে আমরা বুঝি আধুনিক মানুষের সংগ্রাম—যে সংগ্রাম সর্ব্ব মানবের কল্যাণের জন্য সুখাদ্যের যোগান দিতে পারে—দারিদ্রের জন্য অধিক গরম কাপড় ও পরিচ্ছন্ন বাসস্থানের সংস্থান করতে পারে—রোগগ্রস্থদের জন্য আরো ঔষধ ও হাসপাতালের ব্যবস্থা করতে পারে—যুদ্ধাতঙ্ক হ'তে ক্রম বর্দ্ধমান নিরপত্তার স্থায়িত্ব বিধান করতে পারে—অপরাধ ও দুর্নীতিকে সীমিত ও ক্ষীয়মান হ'তে বাধ্য করে আর আবালবৃদ্ধবনিতার জন্য সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের সুযোগ করে দিতে পারে ; কিন্তু প্রগতি বলতে কি শুধু ইহাই বুঝায়—না আরো অনেক কিছু ?

বহু দূর দুরান্তরে অবস্থিত জনসাধারণকে হত্যার জন্য যে উন্নততর মারণাস্ত্রের উদ্ভাবন—ইহাই কি প্রগতি ?

প্রগতির ফলে রাস্তার মানুষ ও তার চিন্তাধারা ও সৃজনী শক্তি হারায় যখন দেখে যে তার সমস্ত সমস্যাগুলি অপরে সমাধান করে রেখেছে—কোথায়—না—গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে।

প্রগতির ফলে মানুষ এমনই এক বিশেষ অবস্থায় উপনীত হয় যে সে নিজেকে সর্বজ্ঞান্তা ভাবে—যদিও সে আসলে কিছুই জানে না—ইহাই "প্রগতি" প্রগতির ফলে বাস্তবতার অপমৃত্যু ঘটে এমনই ভাবে, যে আমরা সকলই অপরের হাতের ক্রীড়নকের ন্যায় জীবন যাপনের গ্লানি বহণ করতে বাধ্য হই, কারণ অপুষ্ট দেহে অধিক মস্তিষ্ক চালনায় ও কৌশলী বিজ্ঞাপন উদ্ভ্রান্ত করায় আমরা শূন্য হৃদয়ে ভাবি যে একটি ঔষধের নবাবিষ্কার বা ছত্রাকসম হাসপাতালের বৃদ্ধি ও পরিব্যাপ্তি—বুঝি বা—"প্রগতি"

যদি কৃষক তার কাস্তে ফেলে দিয়ে এবং মৎস্যজীবি তার জাল সরিয়ে রেখে কলকারখানায় প্রতি আকৃষ্ট হয় অর্থাৎ শিল্পমুখী জীবনে অভ্যস্ত হ'তে চায়—তবে তাহাই নাকি "প্রগতি"।

"প্রগতি" বলতে মানুষের সরলতার বাতিক্রম বুঝায় বোধ হয়। বর্ত্তমান সমাজে মানুষ যতক্ষণ না অর্থোপার্জ্জন করতে পারবে ততক্ষণ মাছ বা আলু কোন প্রয়োজনীয় সামগ্রীই জোগাড় করতে পারবে না এবং মধ্যবর্ত্তী যে কোন ব্যবস্থাই থাক না কেন জল থেকে মাছ আর মাটি থেকে শস্য আহরণ করতে গেলে, কৃষক আর মৎস্যজীবিকে চাইই চাই।

কৃষক ও মৎস্যজীবি বর্ত্তমান সমাজের প্রতিনিধি, তাদের বাদ দিয়ে কোন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়, বরং তাতে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। কৃষক ও মৎসজীবিরা আমাদের সঙ্গে রুটীর টুকরা সমভাবে ভাগ করে খায় এবং তাতেই তারা সুখী।

আমরা যারা বুদ্ধিজীবি বা শিল্পশ্রমজীবি তারা কখনই বর্ত্তমান সমাজ ও জীবনকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে পারবো না যতক্ষণ না কৃষক ও মৎসজীবিরা আমাদের সাহচর্য্য দেয় এবং তাহাই হবে—"প্রগতি"।

Mr. Heyerdt এর লেখার এই উদ্ধৃতি অনুবাদ করে দেওয়া হল।

RgedNo. R. N .24511/71 | Biplabi Bangla Phone : 34-1795 | Regd. WB/NC 77

পাক্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

30 JAN 1979

— সম্পাদক মণ্ডলী —

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী, শ্রীবারীণ রায়।

সম্পাদক—শ্রীশান্তি পদ রায়চৌধুরী

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতার—শ্রীনরগোপাল পাল।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। সভার সচিব—শ্রীমণীন্দ্র গুহ।

বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৯বা বলরাম ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

যন্ত্রে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১ ৭ বা কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

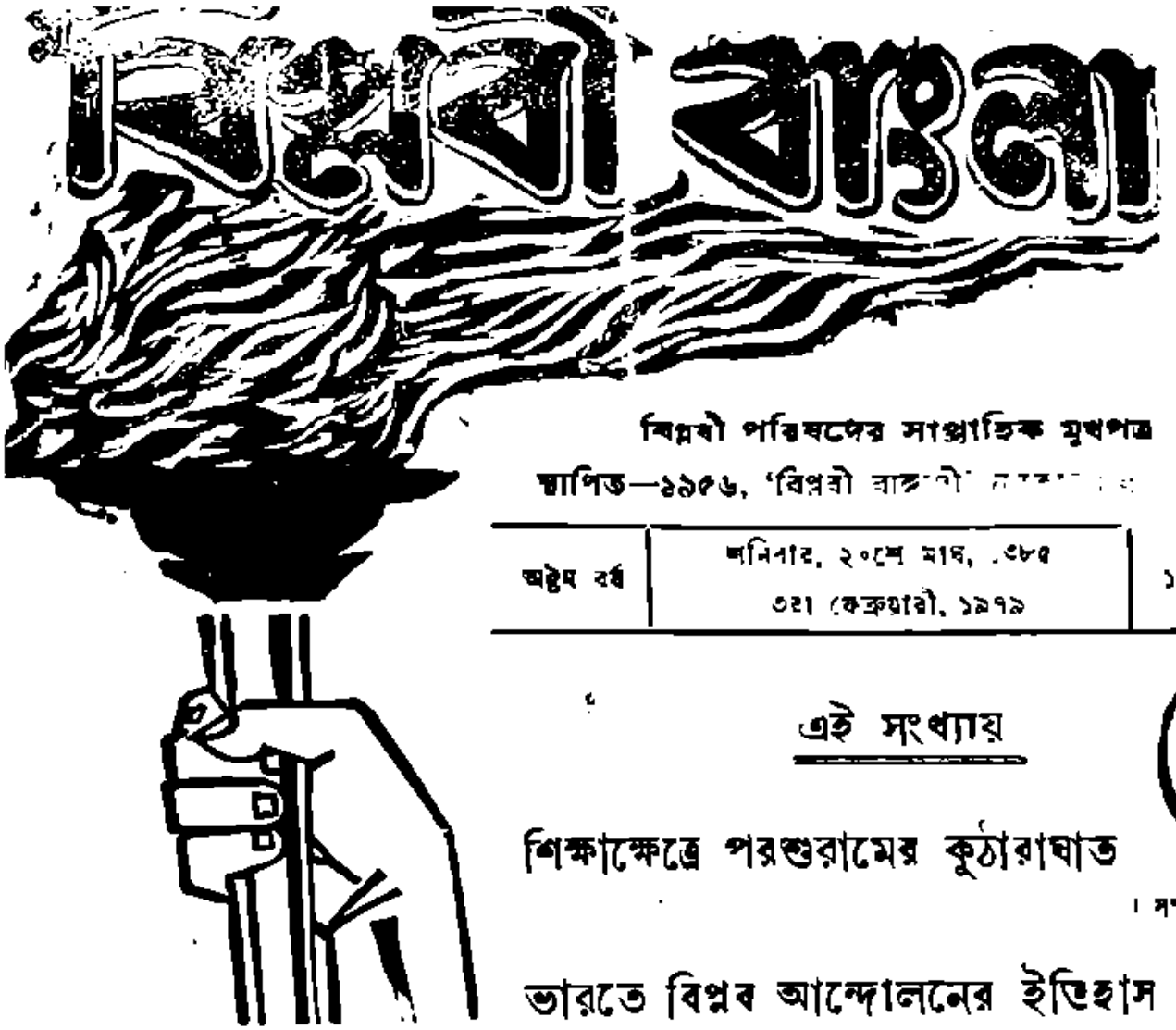

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী [illegible]

অষ্টম বর্ষ	শনিবার, ২০শে মাঘ, ১৩৮৫ ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯	১৬ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

শিক্ষাক্ষেত্রে পরশুরামের কুঠারাঘাত

। সম্পাদকীয় ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। ক্ষীরোদ দত্ত ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক নলিনী মোহন [illegible]

গণতান্ত্রিক আবরণে দলতন্ত্র চালু

। [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

গণতন্ত্রের সঙ্কট

। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস

আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য। এক আবাস, এক স্বার্থ ও এক সম্প্রীতির উপরই জাতীয় ঐক্য গঠিত।

—ভগিনী নিবেদিতা।

সম্পাদকীয়

শিক্ষাক্ষেত্রে পরশুরামের কুঠারাঘাত

রামায়ণে কথিত আছে যে ঋষি পরশুরাম পৃথিবী থেকে ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করার জন্য একুশবার সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়নি। পশ্চিম বাংলার শিক্ষা-ক্ষেত্রে আধুনিক পরশুরামেরা কুঠারাঘাত করে শিক্ষার বিনাশ সাধন করবার জন্য অশেষ আগ্রহ নিয়ে কর্মরত হয়েছেন বলে মনে করছেন দেশের মানুষ। তাদের কৈফিয়ৎ হচ্ছে শিক্ষা-ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তাঁরা আগ্রহী। ভাগ্যক্রমে 'গণতন্ত্র' কথাটি আজকাল যে যেমনভাবে পারছেন, সেইভাবে ব্যাখ্যা করছেন। কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, গণতন্ত্রের নামে যে সব কাজকর্ম করছেন এক দল ক্ষমতামত্ত মানুষ, তার মধ্যে জনগণের কোন কল্যাণ কামনা নেই। জনগণের প্রকৃত স্বার্থসাধনের কোন সম্ভাবনা নেই। আছে শুধু দল বা গোষ্ঠীর স্বার্থ লাভের নগ্ন প্রচেষ্টা। কিন্তু মুস্কিল হল এই যে কোন দল যদি অন্যায় কাজ করে যান, তার ফলভোগ করতে হয় সাধারণ মানুষকেই দীর্ঘদিন ধরে। সেই শিক্ষাক্ষেত্রে এই অনিষ্টকর কাজ সাধিত হবার দুর্লক্ষণ দেখে, পশ্চিম বাংলার চিন্তাশীল মানুষ রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠছেন।

কয়েকটি ঘটনার গতি প্রকৃতি লক্ষ করলেই, বক্তব্যটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। শিক্ষা বিভাগ গণতন্ত্রের দোহাই দিচ্ছেন, অথচ নির্বাচিত স্কুল কমিটিগুলিকে বাতিল করে দিয়ে প্রশাসক নিয়োগ করছেন খুসী মত। চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও অনুরূপ। এ পর্যন্ত প্রায় ৬৮২টি স্কুল বাতিল করা হয়েছে, প্রায় পঁচিশজন প্রধান শিক্ষক, বহু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে তুচ্ছ কারণে। .. বেসরকারী অফিসের ক্লার্কদের প্রশাসক করা হয়েছে, এই অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির। তাঁরা এই অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। প্রশাসক নিয়ে যা করা হচ্ছে বিশেষ বিশেষ দলের অনুরক্ত কর্মীদের, এ ধারণাও বহু মানুষ পোষণ করেন। শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রেও রংএর চিহ্নকেও প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা বিভাগের অনাদরের একটি জলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় যখন বয়স্ক শিক্ষার জন্য কেন্দ্র প্রদত্ত প্রায় কোটী টাকা ফেরৎ যাচ্ছে। এই বিভাগের যথা কর্তব্য পালন না করার জন্য। কোন ক্ষেত্রে উপযুক্ত ও অত্যাবশ্যকীয় কারণ থাকলে পুরাণো দুই চারটি কমিটি বাতিল করতে পারেন। কিন্তু সেটা করা হবে শুধু মাত্র জনস্বার্থে,

কোন দলগত স্বার্থে নয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, বাতিল করার পর দীর্ঘদিনের মধ্যে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি। এক দিকে গণতন্ত্রের দোহাই, অন্য দিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত স্কুল কলেজ কমিটির উপর পরশুরামের কুঠারাঘাত এর মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়?

আরো একটি অসমর্থনীয় কাজ করছেন শিক্ষা বিভাগ। পাঁচ, সাত, দশ বছর ধরে স্থানীয় মানুষেরা, শিক্ষক শিক্ষিকারা বিরাট স্বার্থত্যাগ করে, বহু দুঃখ কষ্ট স্বীকার করে হয়ত একটি স্কুলকে চালু রেখেছেন সরকারী অনুমোদনের প্রতীক্ষায়, কার্যকালে দেখা গেল তাদের অনুমোদন দেওয়া হল না, দেওয়া হল একটি নবজাত শিশু প্রতিষ্ঠানকে। এর কারণ শোচনীয় হলেও, দুর্বোধ্য নয় সাধারণ মানুষের কাছে। এতদিন এই আক্রমণ সীমাবদ্ধ ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত স্কুলগুলির উপর। এখন নবতম আঘাত হানবার লক্ষ্য হচ্ছে ট্রাস্ট, মিশন মিশনারী স্কুলগুলির উপর। ফলে গোটা শিক্ষাক্ষেত্রের উপর একটা অন্ধকার হতাশা ও নৈরাশ্যের আবহাওয়া প্রবহমান হচ্ছে।

এতদিন নানা রকম পরীক্ষা নিরিক্ষামূলক পাঠ্যক্রম চালু করার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। এখনকার চলক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে যে একটা শিক্ষাদের যজ্ঞের অনুষ্ঠান হতে চলেছে। গভীর উদ্বেগের কথা যে এর ফলে আগামী বহুদিনের মধ্যে বাংলার ছেলে মেয়েরা প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। বার্ধক্যের প্রান্তিভোগ করতে বাধ্য হবে জীবনযুদ্ধে। তাদের মধ্যে প্রতিভার সঠিক বিকাশ সাধন ঘটবে না। জাতির ভবিষ্যৎকে এইভাবে ধ্বংস হতে দিলে জাতি বাঁচবে কি করে? এই বাংলা দেশেই অতীতে মুসলিম সাধকগণ তাদের সংখ্যাধিক্যের জোরে শিক্ষা ক্ষেত্রকে এলোমেলো করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু জাগ্রত জনমতের নিকট তারা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। স্কুল কলেজগুলিতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এসব কাজ করা হচ্ছে বলে যে ধারণা বদ্ধমূল হতে চলেছে জনমানসে, সেটা কি একেবারেই ভিত্তিহীন? স্কুল কলেজ গুলিকে কি রাজনৈতিক দলের 'ক্যাডার' সৃষ্টি করার কারখানাতে পরিণত করা হবে? এর সুস্পষ্ট জবাব দাবী করবার সময় এসেছে বলে আমাদের মনে হচ্ছে। শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যের জোরে এই মহতী বিনষ্টি সাধন করতে যদি কেউ অগ্রসর হন, তবে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে বাংলার চিন্তাশীল মানুষদের। ছাত্র ও যুবকদের ও প্রকৃত শিক্ষানুরাগী জন সাধারণের। আমরা বিশ্বাস করি, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ ও নেতাজীর জন্মভূমি এই পবিত্র বঙ্গভূমিতে এখন মানুষের অভাব হবেনা। সদ্ভাব যাদের সাধু, উদ্দেশ্য যাদের মহৎ, কুন্তের আশীর্বাদ তাদের মিলবেই। সঙ্গে সঙ্গে সরকারকেও অনুরোধ করি যে তাদের নীতিকে পুনর্বিবেচনা করে জনকল্যাণ সাধনের পথে পদক্ষেপ করতে। তাদের স্মরণ রাখতে বলি রবীন্দ্রনাথের বাণী—

...দানবের মূঢ় অপব্যয়,
ইতিবৃত্তে গ্রন্থিতে পারে না তবু শাশ্বত অধ্যায়।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, একদা দিল্লীর প্রাসাদকূটে বসে যে সব বাদশারা নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখতেন, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক বিধানে তাদের স্বপ্ন টুটে গিয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের লালদীঘিতে অবস্থিত লাল বাড়ীতে বসে যদি কেউ তাদের দলীয় সংগঠনকে শক্তিশালী করবার স্বপ্ন দেখেন বর্ত্তমান নীতির মাধ্যমে, তাদেরও ঘটবে অচিরাৎ।

যা সত্য, যা সুন্দর, যা কল্যাণময়, তাই শাশ্বত। অন্য সব কিছু ভেসে যায় কালস্রোতে।

ঃ শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ

গভীর দুঃখের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি যে অতি অল্পদিনের ব্যবধানে এত বেশী সংখ্যক স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্ধুরা পরলোকগমন করেছেন যে তাঁদের জীবনী ও গৌরবময় কাজকর্ম সম্বন্ধে একটি সংখ্যায় বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব হল না, সেজন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যথিত। এই সংখ্যায় শুধুমাত্র প্রয়াত সতীর্থদের নাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকতে বাধ্য হচ্ছি। তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যেই আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

১। জ্যোৎস্না সরকার (ঢাকা) ২। আলোক চক্রবর্ত্তী (২৪ পরগণা) ৩। ধীরেন দাশগুপ্ত (মানিক) (ঢাকা) ৪। হরিদাস সেন (ঢাকা) ৫। পান্নাগুপ্ত (বরিশাল) ৬। শ্যামেন ভট্টাচার্য্য (ফরিদপুর) ৭। হরিপদ কুণ্ডারী (ফরিদপুর) ৮। প্রভাত মিত্র (উইটার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সড়যন্ত্র মামলা)

আমরা সকলের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

গণতান্ত্রিক আবরণে দলতন্ত্র চালু

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কি প্রশাসনিক কারণিকদের ক্ষেত্রে, কি বর্গাদের রেকর্ড করার ক্ষেত্রে, কি কুষীর ও কৃষি শিল্পের ক্ষেত্রে, কি শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ ক্ষেত্রে, কি বিদ্যালয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে কি পাঠ্য পুস্তক অনুমোদনের ক্ষেত্রে, কি বন্যাত্রাণ সাহায্যের ক্ষেত্রে, কি বন্যা ত্রাণ কাজে, কি পুলিশ বিভাগে নিয়োগ ক্ষেত্রে, কি বিদ্যালয়ে বা কলেজে অনুদানের ক্ষেত্রে, কি স্বাস্থ্য বিভাগে নিয়োগ ক্ষেত্রে, কি ঠিকাদার নিয়োগ ক্ষেত্রে, কি ঠিকাদারী বিলি বা কোন খাল খনিরের ব্যাপারে কি কৃষি ও সেচ বিভাগে নিয়োগ ক্ষেত্রে, কি পদোন্নতির ক্ষেত্রে, কি কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও দাক্ষিণ্য বিতরণের ক্ষেত্রে, এক কথায় সর্বক্ষেত্রে সর্বব্যাপারে আজ সি, পি, এম দলভুক্তরা বা সি পি এম সমর্থকরা যে একচেটিয়া অতিরিক্তভাবে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে এবং মাত্রাতিরিক্ত বিশেষ বিশেষ অধিকার ভোগের জন্য একমাত্র তারাই সরকারের প্রশ্রয়ে অনুসৃত হচ্ছে তা যে কোনও গণতান্ত্রিক রাজ্যে শুধু নিয়ম বহির্ভূতই নয়, অপরাধজনকও বটে। অথচ এখানে এই ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে সরকার তথা সি পি এম দল চালাচ্ছে। সি, পি এম এখন ক্ষমতার প্রতিটি কেন্দ্রবিন্দু বটিক গতিতে দখল করার জন্যই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই অগণতান্ত্রিক দলবাজী চালিয়ে যাচ্ছে আর কেন্দ্রীয় সরকার দর্শকের ভূমিকায় থেকে গণতন্ত্রের বুলি শুধু আওড়েই যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বাস্তবে গণতন্ত্রের সমাধি রচনায় সি পি এম তার নিজস্ব পরিকল্পনামত উগ্র নীতিহীন দলবাজীকে প্রতিদিন সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত করে চলেছে এবং সব কিছুই কেবলমাত্র দলীয় লোকেদের হাতে তুলে দিচ্ছে। ভবিষ্যতে সি পি এম ক্ষমতাচ্যুত হলেও সর্বত্র সরকারী কর্মীরাও অন্যান্য ক্ষমতার আরূঢ় ব্যক্তিবর্গ যারা আজ সি পি এম দলের স্নেহধন্য ও সাহায্যপুষ্ট তারা নিশ্চই সে সময়েও সি পি এম এর পাশে দাঁড়াবে এবং সকল সাহায্য সি পি এম দলকে দেবে, বিশেষ করে পরবর্তী নির্বাচন কালে; আর তাছাড়া এই মারাত্মক দলবাজীর ফলে ও দলীয় স্বার্থ সিদ্ধি ও দলের লোকেদের দ্বারা সর্বত্র ক্ষমতার আসনগুলি দখলিকৃত করায় নির্বাচন চরম দুর্নীতিগ্রস্ত ও অগণতান্ত্রিক হবেই। ফলে সি পি এম মৌরসি পাট্টা কায়েম করতে সবরকম অন্যায় ও অবিচারের মাধ্যমে এখানে এমন স্বৈরতান্ত্রিক পন্থায় শাসন চালাবে যে সর্বসাধারণের প্রতিবাদ বা প্রতিকারের কোন পথই আর খোলা থাকবে না। সি পি এম তাই সর্বশক্তি দিয়ে সর্ব বিষয়ে সর্বস্তরে এখানে দলীয় প্রশাসন ব্যবস্থা অদূর ভবিষ্যতে চালু করার জন্য পদে পদে গণতন্ত্রকে হত্যা করছে এবং দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছে যা অত্যন্ত বিপদজনক।

খুনের রাজনীতি চলছে

একেত পশ্চিমবঙ্গ একটি সমস্যা কণ্টকিত রাজ্য তার ওপর বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের একের পর এক ভুল ও ত্রুটিকারী কার্যকলাপের ফলে আরো বহুবিধ সমস্যা দিনের পর দিন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে যথা খুন, ডাকাতি, ছোর অরাজকতা, মাছের ভেড়ী লুট, জমির ফসল জোর ভাবে দলবাজী করে কেটে আনা, দিন দুপুরে ছিনতাই, রেল ডাকাতি, বাস-লরি হাই জ্যাকিং, ব্যাঙ্ক লুট, ওয়াগন ভাঙাই, নারী ধর্ষণ প্রভৃতি জঘন্যতম অপরাধ মূলক কাজগুলি অধিক সংখ্যায় ও ব্যাপক আকারে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়ে সমাজে সাহসের অনভিপ্রেত

(১৫ এর পাতায় দ্রষ্টব্য)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

বাল্যকাল ও যৌবনের শিক্ষা

[মূল পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যাওয়ায় এই অংশটি যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। অতঃপর আগামী কয়েক সংখ্যায় অংশটি প্রকাশিত হবে]

—মুদ্রাকর

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

তিনি ছিলেন সেই যুগের লোক যে যুগে বেশ কিছু সংখ্যক তরুণ ডিরোজিওর পায়ের কাছে গিয়ে বসেছিল, এবং কোন নতুন ধর্মমতে নব-দীক্ষিতের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, তেমনি তাদেরও নিজ নিজ পিতৃ-পুরুষের ধর্ম ও বিশ্বাসের সঙ্গে ঘটেছিল পূর্ণ বিচ্ছেদ; এমন কি সেই বিচ্ছেদ মারমুখোও হয়ে উঠেছিল। হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর শিক্ষায় শিক্ষিত এই যুবক দল পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে সদ্য পরিচয় লাভ করে কি ভাবে তারা প্রকাশ্যে সাড়ম্বরে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে উল্লাস প্রদর্শন করত, কিভাবে তারা হিন্দুর অখাদ্য খেয়ে তার উচ্ছিষ্ট নিষ্ঠাবান প্রতিবেশীর বাড়ীতে ছুঁড়ে মারত, প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর ডেভিড হেয়ারের জীবন কথায় তা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। আমার পিতাও এই নতুন ভাবধারায় সম্পূর্ণ মশগুল হয়ে পড়েছিলেন; ফলে আমাদের বাড়ীতে দুইটি বিপরীত ভাবধারা এসে মিলিত হয়। কিন্তু সেজন্য পরিবারের মধ্যে কোন রেষারেষি দেখা দেয়নি। কারণ পরিবারে বাড়ীর কর্তা আমার পিতামহের স্বধর্ম নিষ্ঠার স্বভাবই ছিল সবচেয়ে প্রবল। এমন কি কোন কিছুতে বিশ্বাস অবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও পরিবারের প্রধানের অভিমতই ছিল সবার উপরে।

তথাপি এখন বলা যায় যে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একটা মতানৈক্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে সব কিছুকে একটা অনুসন্ধিৎসা ও বিচার বিবেচনা করে দেখার ভাব গড়ে উঠেছিল। পরস্পর বিরোধী দুই ভাব ধারার সংঘর্ষের মধ্যেই আমার বাল্য জীবন কাটে। আমাদের পরিবারে তখন যা ঘটছিল, তাকে তখনকার দিনে বাঙ্গা দেশের ভাব-জগতে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা যায়। তখনকার দিনে প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালী পরিবারের মধ্যে ভাবের জগতে প্রাচ্যের নিষ্ঠা ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা—এই দুইয়েরই পক্ষে বিপক্ষে যতাযতের বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ চলছিল। কিন্তু সেজন্য একথা যেন মনে না করা হয় যে তার ফলে আমাদের পারিবারিক জীবনে কোন শান্তির ব্যাঘাত হয়েছে। তা কদাচিৎ ঘটেছে। হিন্দু প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যই হল ধৈর্য্য ও সহনশীলতা; এবং সেইদিনে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে বা ধর্মকার্য্য অনুষ্ঠানে কোনরূপ বাধা না দিলে, আমাদের আশে পাশে কে কি বলে বা করে তা, তারা যদি আমাদের নিতান্ত আত্মীয়ও হন, তাহলে—তাকে আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই নেই নি। বর্ত্তমানে যেমন কোন কোন লোকের মধ্যে বিরোধিতা করার ও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠার ভাব পরিলক্ষিত হয় তখনকার দিনে তা ছিলনা। পরিবারের কর্ত্তা এবং বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করা ছিল তদানীন্তন হিন্দু গৃহের রেওয়াজ।

আমার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন আমাকে পাঠশালায় দেওয়া হয়। প্রথমে বাংলা শিখতে হত। একে তো

আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তার উপরে আমার বাবার ছিল নাম ডাক। তাই গুরু মশাই আমার প্রতি বেশ বিশেষভাবে সহিত একটু বড়পর ছিলেন। গুরু মশাই ছিলেন খুব কড়া মেজাজের লোক, শৃঙ্খলাপরায়ণ ব্যক্তি। একবার তিনি আমাকে "মেড়া বামুন" বলেছিলেন ফোকে আমি আর পাঠশালায় যেতে চাইলাম না। আমি জেদ করে বসলাম, ফলে আমার বাবা মাকে তা মেনেই নিতে হল। আমাকে একটি বাংলা স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। এখানে আমার মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষা শেষ করতে হবে। এখানে দু-বছর পড়াশুনা করার পরে ইংরেজী শিক্ষার জন্য প্যারেন্টাল একাডেমিক ইন্সটিটিউশনে ভর্তি করা হল। ছাত্র হিসাবে আমার শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে এখানেই শুরু হয়। এই স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল প্রধানতঃ নিজাম সরকারের কর্মচারী ক্যাপ্টেন ডাইটনের বদান্যতায়। এখানে ইণ্ডিয়ান ছেলেরাই বেশীর ভাগ এই স্কুলে যেত। আমি যখন সেই স্কুলে যেতে শুরু করি তখন আমি ইংরেজীর একটি কথাও জানতাম না। আমি সবেমাত্র ইংরেজী বর্ণমালা শিখে স্লেটে বুকে হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করেছি এবং সে কাজেও কিছুমাত্র এগোইনি। এই অবস্থায় এমন সব ছেলেদের মধ্যে নিয়ে আমায় ফেলে দেওয়া হল, যারা ইংরেজী ছাড়া আর কোন ভাষায়ই কথা বলে না। কি দারুণ সঙ্কট! অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলাম। যাহোক কোন রকমে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে চললাম, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ইংরেজী বলার কাজ চালিয়ে নিতে লাগলাম। তবে তা যে শুদ্ধরূপে বলতে পেরেছি তা আমি মনে করিনে। আর ব্যাকরণের তো একটা কথাও জানতাম না।

আমার অভিজ্ঞতার এই ঘটনাটি একটি সত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে এবং বর্তমানে তা স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভাষা শিক্ষা সবচেয়ে ভাল হয় কানের দ্বারা, ব্যাকরণ বা অভিধানের দ্বারা নয়। আজ কাল ছেলেরা যেমন বিশুদ্ধ ভাবে ইংরেজী ব্যাকরণ শেখে, আমি প্রকৃত পক্ষে কখনই সেভাবে ইংরেজী ব্যাকরণ শিখিনি, আর আমি যখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে যাই তখন লেনির ছোট ব্যাকরণ বই খানিতে দেওয়া সীমাবদ্ধ জ্ঞানটুকু নিয়েই যাই। বর্তমান কালে টিউটোরিয়াল শিক্ষা ও শিক্ষকদের ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগত নজর দেওয়ার উপর খুব জোর দেওয়া হয়। এটা বস্তুত খুব ভাল ব্যবস্থা। আমি কিন্তু কখনও—কি স্কুলে পড়ার সময় কি কলেজে পড়ার সময়, কোন সময়েই কোন টিউটরের কাছে পড়িনি, ইংরেজী ও লাতিন—এই দুইটি কঠিন ভাষা সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়ই আমি শিখেছি। কেবলমাত্র সময় সময় যখন কিছুতেই কোন কিছু নিজে বুঝে উঠতে পারতাম না, তখন বাবার কাছে জিজ্ঞেস করেছি। আমার বাবা নিজেও একজন শিক্ষক ছিলেন, এটা একটা কঠিন, পাহাড়ে ওঠার মত কাজ ছিল। কিন্তু এই কাজ আমাকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করেছে যা ভবিষ্যৎ জীবনে অপরিসীম মূল্যবান বলে মনে হয়েছে। স্কুল, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয় সব জায়গায়ই ছাত্র হিসেবে বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছি। প্রতি বছরই পুরস্কার পেয়েছি। একথা বলতে পারিনে যে আমি প্রথম স্থান অধিকার করেছি। তবে সব সময়ই প্রায় তার কাছাকাছি থেকেছি; আর, কয়েক বছরের মধ্যে এবং পরিশেষে এটা ঘটেছে যে যে সব ছেলে শুরুতে আমাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে, তাদের আমি পেছনে ফেলে এগিয়েছি। আমার মনে হয় স্কুলে এবং কলেজে যারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তাদের সকলকেই জীবনে আমি বহুদূরে ফেলে এগিয়ে এসেছি। আমার বিশ্বাস জীবনে সবচেয়ে বড় গুণই হল সঙ্কল্পে, একেবারে না-ছোড় হয়ে লেগে থাকা।

আমার এদেশী ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয় শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ বরাবরই আমার প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করেছেন। আমার প্রতি ব্যবহারের মধ্যে তাঁরা বিন্দুমাত্রও বিজাতীয় মনোভাব প্রদর্শন করেন নি। এ দেশে সময় সময় সোশ্রিগত এ বর্ণগত যত বিরোধ যে দুঃখজনক অবস্থার সৃষ্টি করে থাকে সে রকম কোন মতবিরোধের ক্ষীণতম প্রতিধ্বনিও আমি সেই শিক্ষা মন্দিরে শুনতে পাওয়ার মত অবস্থা দেখতে পাইনি। আমার জীবনের কয়েকটি অতি আনন্দময় বছর কটেছে এই শিক্ষা মন্দিরে। জ্ঞানের যে একটা সমতা সাধারণ প্রভাব বিস্তার করার

ক্ষমতা আছে তা আমি এখানে আমার প্রথম জীবনে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেছি এবং তা আমার শিক্ষারই একটা অঙ্গীভূত বিষয় হয়ে উঠেছে। এর পরে আমি যখন বি. এ. পাশ করে কলেজ ছেড়ে চলে যাই তখন আমার কলেজের অধ্যক্ষ সেন্ট এণ্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ সাইম (যিনি পরে পাঞ্জাবের ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন হয়েছিলেন) আমার বাবাকে খুব জোর দিয়েই বলেছিলেন যে তিনি যেন আমাকে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করার জন্য বিলেতে পাঠান। আমার পিতা সঙ্গে সঙ্গেই তাতে রাজি হন। আজ আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার পিতাকে স্মরণ করে বলছি যে আমার সারা জীবনে তিনিই ছিলেন আমার উৎসাহ ও প্রেরণার এক চিরকালীন জীবন্ত উৎস। তিনি একজন বড় চিকিৎসক ছিলেন ঠিকই; তবে মানব প্রকৃতির সূক্ষ্ম বিচারক হিসাবে তিনি ছিলেন আরও বড়। ১৮৫৩ সালে আমি যখন পাঁচ বছরের শিশু মাত্র, তখনই তিনি একটি উইল করে রাখেন। সেই উইলের একটি কপি পরবর্তী কালে আমার হাতে আসে। উইলটিতে তাঁর নির্দেশ ছিল যে আমাকে যেন আমার শিক্ষা সমাপ্ত করতে বিলেতে পাঠান হয়। আমার শৈশব কাল থেকেই তিনি এই ধারণা পোষণ করে আসছিলেন যে বিলেতী শিক্ষা আমার জীবনের পক্ষে সহায়ক হবে। ১৮৭৮ সালে তরা মার্চ তারিখে আমি, রমেশ চন্দ্র দত্ত এবং বিহারীলাল গুপ্ত এক সঙ্গে বিলেত যাত্রা করি।

আমার স্কুল ও কলেজ জীবন সম্পর্কে স্মৃতি চারণের এই অধ্যায়টি শেষ করার আগে আমি আর একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে করতে চাই। বিষয়টির উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা; কারণ, এটি এমন একটি শিক্ষার বিষয় যা আমি সেই সময়েই লাভ করেছি এবং যা সারা জীবন ধরে পালন করে বিশেষ উপকার পেয়েছি। আমার সেই বাল্য কালেই প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে শরীর চর্চার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমার পিতা নিজে তো ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তার হিসাবে তিনি বুঝেছিলেন যে স্বাস্থ্যই হচ্ছে জীবনে সর্বপ্রকার-সাফল্যের গোড়ার কথা। আমার পিতা নিজে ব্যক্তিগতভাবে আমার এই ব্যায়াম শিক্ষার দিকে বিশেষ নজর রাখতেন। আমাদের বাড়ীতেই একটি আখড়া ছিল এবং একজন পালোয়ানও নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আমাদের নানা ধরণের জারতীয় কুস্তি ও ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। আমরা যেরূপ নিয়মিত ভাবে স্কুলে যেতাম, তেমনি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে আখড়ায়ও যেতাম। আমাদের মধ্যে দারুণ উৎসাহের সহিত ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন আমার এক ভ্রাতা—ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্র নাথ বানার্জি। তিনি এমন ভাবে এই বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন যে তিনি যে কোন কুস্তিগীরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতেন এবং তিনি বাঙ্গালীদের-মধ্যে সবচেয়ে বলশালী বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আমি প্রায়ই তার বিষয় কত—শারীরিক শক্তির কথা জানতাম, আর আমার সব সময়ই মনে হত যে শারীরিক শিক্ষার কৌশল—কলহতের এর এমন একটা মূল ভিত্তি আছে যার ফলে ঐ শিক্ষা কার্যকরী হয়েছে। সে মূল ভিত্তি হল এই যে শারীরিক সামর্থ্যের একটা অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক মৌলিক ভাণ্ডার আছে।

তিন পুরুষেরও অধিককালের মধ্যে আমাদের পরিবারে কোন বাল্য বিবাহ হয়নি। আমার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কেউ সমাজ সংস্কারক ছিলেন না; বরং কঠোর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণই ছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, সেই কঠোর নৈষ্ঠিকতাই আমাদের পারিবারিক বিধি-বিধানের উপর এমন এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল যার ফলে পরিবারে বাল্য-বিবাহ ঘটতে পারেনি। এমনিতেই শ্রেষ্ঠ কুলীন পরিবারের সংখ্যা ছিল স্বাভাবিক ভাবেই সীমাবদ্ধ আমাদের পরিবার ছিল তার মধ্যে একটি। শ্রেষ্ঠ কুলীন পরিবারের বিবাহ যোগ্য কন্যাদের জন্য সম-সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন পাত্র পাওয়া ছিল একটা কঠিন ব্যাপার। সুতরাং যে পর্যন্ত উপযুক্ত পাত্র না পাওয়া যেত সে পর্যন্ত তাদের কন্যাদের বিবাহ হত না। ইতিমধ্যে তাদের বয়স যেত বেড়ে। আমার মাতা এবং পিতামহীর যখন বিবাহ হয় তখন তাঁরা দশের মত বয়স্কা তরুণী মহিলা; এবং আমার ধারণা আমার প্রপিতামহীরও বেশী বয়সেই

বিবাহ হয়েছিল; কারণ, আমার বাল্যকালে আমি যখন তাঁকে দেখিছি তখন তাঁর বয়স এক শত বছরের উপর। আমাদের পারিবারিক জীবনের ইতিহাসের মধ্যেই আমি বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী শক্তি-শালী যুক্তির সন্ধান পাই; এবং যখনই সুযোগ পেয়েছি, জনসভায় বক্তৃতা করার সময় কিংবা বৈঠকী আলোচনায় সে কথা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করতে আমি কখনই ক্লান্তি বোধ করিনি। আমাদের পরিবারের লোকদের স্বাস্থ্য সব সময়ই বেশ ভালো ছিল। এটা প্রকৃত অবস্থায় একটা বাতিক্রমই বলতে হবে। কয়েকপুরুষ ধরে তাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ না হওয়াই এর কারণ বলে আমি মনে করি। লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে আমার যে সমস্ত সাক্ষাৎকার হয়েছিল তার মধ্যে প্রথম দিকে একটি সাক্ষাৎকারের সময় আমার স্বাস্থ্য ভাল থাকার কারণ সম্পর্কে আমি এই ব্যাখ্যাই করেছিলাম। আমার স্বাস্থ্যের সাবলীলতা দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন যে আমার বয়সের কোন ভারতীয়ের ক্ষেত্রে এ রকম স্বাস্থ্য সচরাচর দেখা যায় না। তথ্য পরিমানে খুব কম হলেও তার মূল্য খুব বেশী। এক আউন্স তথ্যের মূল্য এক টন তত্ত্বের সমান। এই তথ্যের কথা আমি লিখে রাখলাম এই আশায় যে আমার স্বদেশ বাসিগণ নিজ নিজ মঙ্গল চিন্তায় জীবনের এই অত্যাবশ্যক বিষয়টি নিয়ে যখন বিচার-বিবেচনা করবেন, তখন তা তাদের চিন্তার উপরে প্রভাব বিস্তার করবে। মোটের উপর কথা হল এই যে জাতীয় জীবনে উন্নতির প্রথম সর্তই হল জাতির স্বাস্থ্য ও শরীরের উন্নত অবস্থা।

এতক্ষণ আমার যৌবন কালের কোন গণ-আন্দোলনের কথা কিছুই বলিনি। প্রকৃত পক্ষে গণ-আন্দোলন বলতে যা বুঝায়, বিস্তৃতি ও গভীরতার দিক থেকে সে রকমের কোন গণ-আন্দোলন তখনও গড়ে ওঠেনি। কারণ, গণ-আন্দোলন তৎকালে ব্যাপকভাবে জন-মানসে বিশেষ কোন সাড়া জাগায় নি, কিংবা জন-সহযোগিতা বা সমর্থন ও পায়নি। সে সব হচ্ছে পরবর্তী কালের ব্যাপার। সংবাদ পত্রের প্রেসও তখনও পর্যন্ত একটা শক্তিরূপে গড়ে ওঠেনি; আর সভা সমিতি করে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করার রেওয়াজ তখন সৃষ্টি হয়নি। স্বনামখ্যাত রাম গোপাল ঘোষ যে সব জন-সভায় বক্তৃতা করতেন তা শোনার জন্য সেখানে লোক বেশী জড় হত না। তিনি বক্তৃতা করতেন বিচার-পতিদের সভায়। বিচার-পতিরা সেদিনে আজকের কর্পোরেশনের মত কলকাতার মিউনিসিপ্যালিটির কাজ কর্মের দায়িত্ব পালন করতেন।

কেশব চন্দ্র সেনই প্রথমে জন-সভায় বক্তৃতা করার জন্য মঞ্চের ব্যবহার শুরু করেন এবং ভারতীয় গণ-মানসের উপর বাগ্মিতার-শক্তি প্রদর্শন করেন। গত শতাব্দীর ষাট ও সত্তরের দশকের প্রথম দিকে ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলন একটা সম্ভাবনাময় ও জীবন্ত শক্তিরূপে গড়ে ওঠে। এই আন্দোলন পরোক্ষভাবে হলেও সনাতনী হিন্দু সমাজের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই আন্দোলনের তাৎক্ষণিক ফল হিসাবে বলা যায় যে ইহা খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের প্রবণতাকে রোধ করতে পেরেছে। খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ তখন প্রবল ভাবে চলছিল। যারা প্রাচীন চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্বাসের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন এবং মহান ব্রাহ্ম নেতার বক্তৃতার যাদুর ভঙ্গীতে ও বাগ্মিতায় সৃষ্ট নতুন ভাবনার অন্তরে আলোড়ন অনুভব করলেন, তাঁরা এই নতুন ধর্মের শিক্ষার মধ্যে শান্তি ও স্বাস্থনা পেলেন। কেশব চন্দ্র সেন শুরুতে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের একজন অনুগামী ছিলেন। কিন্তু মহর্ষি কর্তৃক ব্যাখ্যাত ব্রহ্মবাদ থেকে তিনি সরে এলেন। কেশব চন্দ্রের মত ছিল হিন্দু সমাজ থেকে প্রকাশ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। অপর পক্ষে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর চেয়েছিলেন মহান রাজা রাম মোহন রায়ের নেতৃত্ব অনুসরণ করে হিন্দু সমাজকে সংস্কার করে তাকে বৈদিক শিক্ষার সঙ্গে সামিল করে নিতে। কেশব চন্দ্র সেনের বক্তৃতা যুব-মনের উপর গভীর ও স্থায়ী রেখাপাত করল; কেশব চন্দ্রের বক্তৃতা শুনতে খুব লোক জড় হত। স্পষ্টতই একটা ধর্মীয় জাগরণ দেখা দিল। তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর যুক্ত বাচন ভঙ্গী, সারগর্ভ বাক্যের ঝঙ্কার এবং তাঁর প্রভাব ব্যঞ্জক উপস্থিতি—সব মিলে

অন্তরের যে ভাবটি এক গভীর ও অনন্ত প্রত্যয়ের তেজস্বিতায় উদ্দীপিত হয়ে প্রকাশ পেত, তা শ্রোতাদের মুগ্ধ করে ফেলত। আমি প্রায়ই তাঁর সভায় যেতাম এবং কঠোরাস মনো যোগিতা ও ঐকান্তিক ধর্মভাব সহকারে তাঁর বক্তৃতা শুনতাম।

কেশবচন্দ্র সেনের একজন সহযোগী ছিলেন প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার। তিনিও একজন সুবক্তা ছিলেন। তবে প্রতাপ চন্দ্রের বক্তৃতা ছিল ভিন্ন ধরণের। তাঁর বক্তৃতার কোন কল্পনা প্রবণতা ছিল। বক্তৃতার বিষয়গুলি যেন ছবির মত ভেসে উঠত; আর তার মধ্যে ছিল কানায় কানায় পূর্ণ কৌতুক রস। কিন্তু যে গুনে বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হয় এবং অন্তরের অনুভূতিকে নাড়া দেয় সে গুণটি তাঁর মহান নেতা কেশব চন্দ্রের বক্তৃতায় ততটা ছিলনা।

কেশব চন্দ্র সেন ছিলেন একজন বড় সংগঠক। নেতা হয়েই যেন তিনি জন্মেছিলেন। মানুষের মন বুঝবার মত বাস্তব অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ছিল। তিনি একজন ধর্মগুরু ছিলেন ঠিকই এবং হিন্দু পারিবারিক আত্মীয়তার সূত্রে পাওয়া হিন্দু বৈষ্ণব সাধকের মত নিষ্ঠাও তাঁর মধ্যে ছিল; কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারও তিনি বেশ বুঝতেন। জগৎ-সংসার যে কি বস্তু এবং তা নিয়ে কি ভাবে চলতে হবে, তা তিনি বেশ জানতেন। ধর্মগুরু হওয়ার পথ যদি তিনি বেছে না নিতেন, তা হলে, সুযোগ পেলে, তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রনীতিবিদ হতে পারতেন। তিনি এক মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর সমাজের মধ্যে তাঁর অনুগামীরা তাঁকে পেয়েছেন একজন মনোরম সাথী ও নেতারূপে। কেশবচন্দ্র যে শিক্ষা দিয়েছেন তার পরোক্ষ ফলও খুব কম ছিল না। একদিকে তা যেমন সমাজ ও ধর্ম চিন্তার ক্ষেত্রে শিক্ষিত মনকে প্রসারিত ও উদার করে তুলেছে, অন্যদিকে আবার বিপরীত ফল হিসাবে তা চরম প্রতিক্রিয়াশীল সনাতনীদের প্রতি নিষ্ঠার মাত্রাও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সনাতনীরা কেশব চন্দ্রের শিক্ষা ও প্রচারের ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর আবরণের মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং চারিদিকে এক অতি সংকীর্ণ ও পুরাতন, পচা কুসংস্কারের কঠিন প্রাচীর গড়ে তোলেন। বর্তমানে কালের প্রভাবে হিন্দু ধর্মের মধ্যে উদার চিন্তাশীলতার দিকে এক ধীর অগ্রগতির প্রবণতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই ধীর গতি প্রবণতাকে যদি হঠাৎ বাড়িয়ে দিয়ে তাড়া তাড়ি করে কিছু করতে যাওয়া হয়, তা হলে তা সন্দেহ ও আতঙ্কের সৃষ্টি করবে এবং সেই গতি প্রবণতাকে একেবারে রুদ্ধ করে দিতে পারে।

(চলবে)

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী ভবেশ নারায়ণ বাবু

রাজসাহীর প্রবীণ বিপ্লবী ভবেশ নারায়ণ বাবু তাঁর লালগোলার বাসভবনে পরলোক গমণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হয়েছিল ৭০ বৎসর। তিনি বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির কর্মী ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান স্মরণীয়। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী ও তিন পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীক্ষীরোদ দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এক সপ্তাহের মধ্যেই পাঞ্জাবে বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আবার কাশীতে ফিরে এলেন। এবার রাসবিহারীর পাঞ্জাব যাবার পালা। কিন্তু তার আগে স্থির হল যে শচীন্দ্রনাথ পিংলের সঙ্গে আর একবার পাঞ্জাব থেকে ঘুরে আসবেন।

পিংলে পাঞ্জাব সংগঠনের জন্য প্রচুর পরিমান বোমা প্রার্থনা করল। তাকে বলা হল বাংলা সংগঠন বোমা পাঠাতে প্রস্তুত। কিন্তু একটি বোমার জন্য খরচ পড়ে ষোল টাকা। তাই অর্থ সাহায্য না পেলে বোমা পাঠানো সম্ভব হবেনা। এই টাকার জন্য এবং পৃথ্বী সিং ও কর্তার সিং প্রভৃতির যথাযথ খোঁজ নেবার জন্য পিংলেকে আরেকবার একাই পাঞ্জাবে পাঠানো স্থির হল। পিংলে এক সপ্তাহের মধ্যেই কাশীতে ফিরে এলেন। এবারে পিংলের সঙ্গে শচীন্দ্রনাথ পাঞ্জাব অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

তখন ডিসেম্বর মাস পিংলের সঙ্গে শচীন্দ্রনাথ অমৃতসরে এক গুরুদ্বারায় এসে নামলেন। এইখানে মূলা সিং নামে এক পাঞ্জাবী নেতার সাথে শচীন্দ্রনাথের পরিচয় হল। মূলা সিং সাংহাইতে পুলিসের কাজ করতেন এবং সেখানে পুলিশ ধর্মঘটকারীদের নেতৃত্ব করেছিলেন। পেনাং এর শিখ কর্মচারীদের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। এই সময় পল্লী অঞ্চলের অনেক শিখ অমৃতসরে বিভিন্ন গুরুদ্বারায় যাওয়া আসা করতেন। তাদের অধিকাংশই চাষী এবং মজুর শ্রেণীর লোক কিন্তু তারা দেশের কাজের জন্য নেতে উঠেছিলেন। মূলা সিংকে শচীন্দ্র নাথ সংগঠনের আবশ্যকতা সম্পর্কে বুঝিয়ে বললেন যে সবচেয়ে প্রধান প্রয়োজন একটা কেন্দ্র। সঙ্গে সঙ্গেই ঐ গুরুদ্বারাতেই কেন্দ্র গঠিত হল এবং মূলা সিংই কেন্দ্রের ভার নিয়ে বসলেন। কিন্তু পল্লী অঞ্চল থেকে আগত কর্মীদের কর্মের অভাব দেখা দিল। কর্মীরা অনন্যমনা হয়ে দেশের কাজ করবার জন্য ঘরদুয়ার ছেড়ে চলে এসেছেন। তারা কেউ অর্থ উপার্জন করছেন না তারা থাকবেন গুরুদ্বারায়, খাইবেন নিকটস্থ হোটেলে। শচীন্দ্রনাথ বুঝলেন উপযুক্ত নেতার অভাবই এই বিশৃঙ্খলার কারণ। তিনি নিজে যতটুকু পারলেন এই ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করলেন। মূলা সিং শচীন্দ্র নাথকে জানালেন আসন্ন বিদ্রোহে সকল রেজিমেন্টই দেশবাসীর পক্ষে যোগ দিবেন। যে সকল রেজিমেন্টের সঙ্গে তখনও সংযোগ স্থাপন করা হয় নাই শচীন্দ্রনাথ পল্লী অঞ্চল থেকে আগত কর্মীদের সেইসব রেজিমেন্ট পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। মূলা সিংয়ের সহিত পরিচয় করিয়ে দিয়ে শচীন্দ্রনাথকে ওখানে রেখে পিংলে অন্যান্য পরিচিত শিখদের খোঁজে মুক্তশ্বর মেলায় চলে গেলেন।

পিংলে যখন মুক্তশ্বর মেলা থেকে ফিরে এলেন তখন কর্তার সিং, অমর সিং প্রভৃতি গুরুদ্বারায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। কর্তার সিং রাসবিহারীর কথা জিজ্ঞাসা করলেন। শচীন্দ্র নাথ বললেন পাঞ্জাবে কার্যের একটু শৃঙ্খলা হলে এবং রাসবিহারীর থাকবার একটু ব্যবস্থা হলেই তিনি আসবেন। শচীন্দ্রনাথ রাসবিহারীর জন্য অমৃতসরে দুটি বাড়ী ভাড়া নিতে বললেন। রাসবিহারী একথা শচীন্দ্র নাথকে বলে

দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ী ভাড়া দেওয়া হল। কর্তার সিংহের নিকট পাঞ্জাবের সেই সময়কার অবস্থার কথা শুনে শচীন্দ্রনাথ আশান্বিত হলেন। এই সময় আমেরিকা প্রত্যাগত আরেকদল শিখ অমৃতসরে এসে পৌঁছান। শচীন্দ্রনাথ এদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই শচীন্দ্রনাথ কাশীতে ফিরে এলেন পূর্ববাঙলার এক নেতার সঙ্গে এখানে তার দেখা হল। তার কাছে শুনলেন পূর্ববাঙলার বিশিষ্ট এক নেতা এরই মধ্যে ধরা পড়ে গেছেন। বিপ্লবের এই আশার দিনে পূর্ব পরিচিত সকলকে জেলে হারিয়ে শচীন্দ্রনাথ বেদনা অনুভব করলেন। এই সময় কলকাতা অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কাশীতে এলেন। আসন্ন বিদ্রোহে যাতে সমগ্র উত্তর ভারত এক সঙ্গে কাজ করতে পারে এজন্য যতীন্দ্রনাথকে কাশীতে ডাকা হয়েছিল। পাঞ্জাবের গদর বিপ্লবীরা এবং সৈন্যদল একটা কিছু করে ফেলবার জন্য অধীর হয়ে পড়েছিলেন। আর কিছুতেই তাদের শান্ত করা যাচ্ছিল না। কিন্তু আলাপ আলোচনার পরে যতীন্দ্রনাথ অনুরোধ করলেন যে বিপ্লবের দিন যেন এমনভাবে পিছিয়ে দেওয়া হয় যে বাঙলাদেশে গিয়ে তিনি অন্তত দুই মাস সময় পান এবং কিছু টাকাও সংগ্রহ করতে পারেন। তিনি বারবার রাসবিহারী এবং শচীন্দ্রনাথকে বলেন যে যথেষ্ট অর্থ না নিয়ে এ কাজে নামা উচিত নয়। কিন্তু এই যথেষ্ট অর্থ বলতে তিনি যা মনে করেছিলেন তা সংগ্রহ করাও এই সময় একেবারে অসাধ্য ছিল। যতীন্দ্রনাথকে একথা বলায় তিনি নিজেও তা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেন। পাঞ্জাবের সিপাহীরা এই সময় নিতান্ত অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন। এই অসহিষ্ণুতার একটি কারণ ছিল যে কোন দিন যে কোন সময় যে কোন সৈন্য দলকে ইউরোপের রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। ভারতেও বিভিন্ন সৈন্যদলকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা হচ্ছিল। উত্তর ভারতে যে সৈন্যদল বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত তাদের যদি দক্ষিন ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তবে তাদের পক্ষে সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টায় যোগদান করা সম্ভব হবে না। এইরূপ নানা কারণে পাঞ্জাবের সিখ সৈন্যদের আয়ত্ত করে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সকল কারণে যতীনবাবুর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হলনা।

যতীনবাবু বাঙলাদেশে ফিরে যাবার পরে শচীন্দ্রনাথ নিজেও বাঙলাদেশে গিয়ে বিপ্লবের প্রস্তুতি কার্য্য আরম্ভ করবার জন্য ব্যস্ত হলেন। কিন্তু রাসবিহারী এ ব্যবস্থায় সম্মত হলেন না। তিনি বললেন, তিনি নিজে যখন পাঞ্জাবে যাচ্ছেন তখন শচীন্দ্রনাথ বাঙলা ও পাঞ্জাবের মধ্য অঞ্চল যুক্ত প্রদেশের কাশীতে থেকে দুই প্রান্তের কর্মপ্রচেষ্টাকে সংযুক্ত রাখবেন। ফলে শচীন্দ্রনাথ মনোক্ষুণ্ন হয়ে কাশীতেই রয়ে গেলেন।

নির্দিষ্ট দিনে রাসবিহারী পাঞ্জাবে রওনা হয়ে গেলেন। তাকে ধরবার জন্য তখন সাড়ে সাত হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষনা করা হয়েছিল। কিন্তু বৃটিশের রাজশক্তি অর্থবল এবং লোক বল অতুলনীয় হওয়া সত্বেও দীর্ঘদিন ধরে তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। এর প্রধান কারণ ছিল বিপ্লবী সঙ্ঘের ব্যাপকতা এবং সুবন্দোবস্ত। উপযুক্ত শক্তিশালী সুনিয়ন্ত্রিত সঙ্ঘ না থাকলে রাসবিহারীকে কখনই এইভাবে রক্ষা করা যেত না। কিন্তু সকলের উপর ছিল রাসবিহারীর নিজের কর্মকুশলতা এবং ভাগ্য।

গণতন্ত্রের সঙ্কট

ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস

গত নির্বাচনে জনতাদলের জাকল্যে মনে হয়েছিল ভারতবর্ষের রাজনীতির শক্তি সমন্বয় ঘটে প্রধানতঃ ত্রিদলীয় রাজনীতির আবির্ভাব ঘটবে জনতা, কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট এবং সুস্থ রাজনীতির মধ্যে গণতন্ত্র প্রসার লাভ করবে। এক দলীয় একচ্ছত্র আধিপত্য স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটবে। কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতি অন্য মোড় নিল, দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। রাজনীতির গতিবিধির নিশ্চয়তাগুলি অনিশ্চিতের হাতে পরাজিত হল।

রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে নায়ক তালিকা এখন অসংখ্য, তাদের বেশ, ভাষা, ভাষণ, বক্তব্য বিচিত্র। এই রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকিয়ে যে সমতাটি দেখতে পাওয়া যায় তার নাম বিচ্ছিন্নতা। বিচ্ছিন্নতা থাকা সত্ত্বেও শাসন ক্ষমতা অভিনব সরিকানা।

স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেসের একচ্ছত্র শাসনেই আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। কংগ্রেস ছিল রাজনৈতিক বটবৃক্ষ, শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন অংশকে একত্রিত করার মত ক্ষমতা কংগ্রেসের ছিল, সেই জন্য অন্য কোন জাতীয় রাজনৈতিক দল গড়ে উঠতে পারে নাই। সকলেই সহ অবস্থান করতে বাধ্য হত।

গত কিশ ত্রিশ বৎসরে কংগ্রেসের সামাজিক ও ব্যক্তিগত মালিকানা মিশ্র অর্থনীতির ফলে ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। বুর্জোয়া শ্রেণী একই সঙ্গে বৃহত্তর ও বৈষম্যময় হয়েছে। সম্পত্তির মালিকানা এখন বহু স্তরের। শিল্পে পরস্পর বিরোধী স্তরের সৃষ্টি হয়েছে,— বড় শিল্প, মাঝারি শিল্প, ক্ষুদে শিল্প, সহরে শিল্প, গ্রামীণ শিল্প। কৃষি ক্ষেত্রে বড় চাষী, মাঝারি চাষী, সবুজ বিপ্লব ঘটেনি এমন অঞ্চলের চাষী। সকলেই সরকারের নিকট রসদ প্রার্থী, সকলের দাবী মিটানর মত রসদ সরকারের ভাণ্ডারে নাই, কাজেই বৈষম্যের সৃষ্টি।

মধ্যবিত্ত সমাজেরও বিরাট পরিবর্ত্তন হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের আগে সারা ভারতের মধ্যবিত্তরা একভাবদ্ধ ছিল, জাতীয় জাগরণের অগ্রণী ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রশাসনে, শিক্ষা ব্যবস্থায়, বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিদ্যায় এদের আধিপত্য নিরঙ্কুশ ছিল। এখন দেখা যায় রাজ্যে রাজ্যে তৈরী হয়েছে স্থানীয় মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব, এরা রাজ্য স্তরের প্রশাসন, শিক্ষা ব্যবস্থা, বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিদ্যা ও অন্যান্য একত্রে প্রাদেশিক আধিপত্য বিস্তারে বদ্ধপরিকর। আরও অনেকগুলি সামাজিক পরিবর্ত্তন আমাদের অর্ন্তাত্ত সংহতিকে গলা টিপে ধরেছে। যে কোন গ্রামে দেখতে পাওয়া যায় একটি গ্রামীণ যুব শ্রেণী তৈরী

হয়েছে যাদের মানসিকতা, তাদের বাপ দাদার মানসিকতা থেকে একেবারে আলাদা, সামাজিক বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার রূপ নিয়েছে। এই সব যুবকরা অধিকাংশই বেকার, কিন্তু কথা বার্তায়; পোষাক পরিচ্ছদ স্টাইল-এ সহরে ছেলে-দের থেকে আলাদা নয়।

আর একটি বিরাট সমস্যা সহরের ছাত্র ও যুবক। আমাদের দেশের একশর মধ্যে ৪২ জন যুবক দরিদ্র সীমার নীচে। এই শক্তিকে সংহত না রাখা হলে ভারতের রাজনীতি কিছুতেই সুস্থির হতে পারে না। কংগ্রেস এতদিন এই শক্তিকে সংহত করে সমস্যা সমাধানের নামে চালিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আজ কংগ্রেসের নেতৃত্বের দুর্বলতার জন্য কংগ্রেস সেই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। বিকল্প কোন রাজনৈতিক দলও এদের সঠিক দেশপ্রেমের ভিত্তিতে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয় নাই।

সামাজিক এই খণ্ড বিখণ্ডতাই বহুদলের সৃষ্টি এবং এনে দিয়েছে একটা ভয়ঙ্কর অশালীন প্রতিযোগিতা, ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দিশেহারাভা।

১৯৭৭ সালে জনতা তরঙ্গের নিকট ইন্দিরা-ঝড় ডুবে গেল, ১৯৮২ সালে ইন্দিরা-তরঙ্গের নিকট জনতা তরঙ্গ হার মানতে পারে বা কোন কোয়ালিসনের উত্থান হতে পারে। কিন্তু সকলেই বুর্জোয়া রাজনীতির ধ্বজা ধরা। আমরা যে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছি তার মূল-মন্ত্র প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার ধীরে ধীরে পরিবর্তন। এই মূল-মন্ত্রটা এখন আর কাজ করছে না। পরিবর্তনকে অনেক দ্রুততর ও মৌলিক করবার চাপ আসছে সমাজের অন্তস্থল হতে অথচ শাসককুল সেই চাপ ধারণ করতে অনিচ্ছুক ও অসমর্থ। এমন কি ভারতবর্ষের উত্তর কমিউনিষ্ট-দল, সি, পি, আই ও সি, পি, আই (এম) এই ধারে চল নীতি অনুসরণ করছে। এই হল ভারতবর্ষের প্রকৃত রাজনৈতিক সঙ্কট। এই সঙ্কটের জন্যই দেশব্যাপি এই ব্যাপক রাজনৈতিক খণ্ড-বিখণ্ডতা, এই আশালীন ব্যক্তিগত কুৎসিত প্রতিযোগিতা, এই ব্যাপক গভীর অনিশ্চয়তা ও দিশেহারাভা।

কাজেই অদূর ভবিষ্যতে কোন একটা দলই সাধারণকে নিজের আওতায় আনতে পারবে না। আগামী কয়েক বৎসর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ছবিটি বহুলাংশে থেকে যাবে। আগামী নির্বাচনে কেন্দ্রে বহু দলের মালিকানাতেই এদেশের শাসনযন্ত্র পরিচালিত হবে, বর্তমান কেন্দ্রিয় সরকারও বহু দলের শরিকানায় পরিবর্তিত হতে চলেছে। কিন্তু আমাদের রাজনীতিতে কোয়ালিশন অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর নয়। দল, উপদলগুলি প্রতি-যোগিতা ও সহযোগিতার মিলন পথ কিছুতেই রপ্ত করতে পারছে না। জনতার শরিকরা যেমন আত্মকলহে পঙ্গু করে রেখেছে কংগ্রেস ও কংগ্রেস (ই)-কে। এমন কি বামপন্থী দলগুলিও অন্তর্দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত নয়। শাসন ক্ষমতা ভাগাভাগি করে দলগত প্রতিযোগিকে শাসন ও শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসতে না পারলে গোটা শাসন ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। বর্তমানে তাই

হয়ে চলেছে। এই কারণে দেশের সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক দলগুলি সম্বন্ধে ক্রমেই বীতরাগ হয়ে উঠছে কিন্তু গণতান্ত্রিক পার্টি গভর্ণমেণ্টের বিকল্প কোন মানসিকতা এখনও জন্মায় নি। কাজেই ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার সময় ও সুযোগ এখনও আছে, কিন্তু এই সুযোগের সদ্ব্যবহার কোন দলই করে উঠতে পারছে না। কোন সুযোগই চিরকাল থাকে না, এ ঐতিহাসিক সত্যটা রাজনৈতিক দলগুলির উপলব্ধি করা দরকার। এই অবস্থা যাদের সুযোগ দিচ্ছে— তারা বসে নাই; স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। সেই স্বৈরাচারী শাসন কি আকারে আসবে এখনও বলা যায় না, কিন্তু অন্তর সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই গণতন্ত্রকে রক্ষা করার পরিবেশ গণতান্ত্রিক দলগুলি সৃষ্টি করতে না পারলে ভবিষ্যৎ স্বৈরাচারীদের হাতেই বন্দী হবে।

গণতন্ত্রকে সজীব ও সক্রিয় অবস্থায় রাখার জন্য বাড়াবাড়ী না করে সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখতে জনসাধারণকে আগাইয়া আসতে হবে। জোর জুলুমের নিকট নতি স্বীকার করব না, গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় রাখব, এই হবে আমাদের অঙ্গীকার। এই শপথ নিয়েই এগিয়ে যাব।

প্রফুল্ল চ্যাটার্জির (ট্যানাভাই) জীবনাবসান

বাংলা তথা ভারত মাতার মুক্তি সাধনের এক সময় যে তরুণদল সর্ব্বস্ব পণ করে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং একটি বিশিষ্ট ভূমিকাপালন করেছিলেন, ট্যানাভাই ছিলেন সেই অগ্রপথিক দলের প্রথম সারিতে। ফরিদপুর জেলায় তার জন্ম হয় এবং যৌবনকাল থেকেই "শান্তি সেনা" নামক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। আজীবন তিনি তাঁর প্রখ্যাত বিপ্লবী পঞ্চানন চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে দেশ সেবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পরাধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রায় সব রকম অত্যাচার, নিপীড়ন, কারাবাস, দুঃখকষ্ট ভোগ করেছিলেন হাসিমুখে এবং নিজের ও পরিবারবর্গের স্বার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে। দেশ থেকে একটি একটি করে দীপ নিভে যাচ্ছে এমন সময় এদের মত আদর্শনিষ্ঠ, নিবেদিত প্রাণ দেশপ্রেমিকের প্রয়োজন একান্তভাবে আবশ্যক ছিল। বর্তমান যুগের ছাত্র ও যুবকেরা যদি এদের জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিবেদন করেন। তাদের প্রজ্বলিত দীপশিখাকে অনির্বাণ রাখতে সচেষ্ট হন, তবেই সার্থক হবে এদের সাধনা, এদের তপস্যা, এদের সব দুঃখকষ্ট ও লাঞ্ছনাভোগ। তাঁর স্মরণ দিনে এই কামনাই করি। আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

(৪ এর পাতার শেষ অংশ)

অবস্থার সৃষ্টি করে এক জায়গায় আবহাওয়ার আমদানি করেছে, যার অপর নাম অরাজকতা। পুলিশ বাহিনী নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে সি. পি. এম দলের ভয়ে, তাছাড়া সরকারও চান না যে পুলিশ ঢালাওভাবে সি. পি. এম দলের কর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কোন উচিৎ ব্যবস্থা নিক। ফলে এদের বেপরোয়া ভাবে খুন-জখমের রাজনীতি চালু করেছে সি. পি. এম্ তার দলীয় স্বার্থে এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলিকে শায়েস্তা করার কুমতলবে। বামফ্রন্ট সরকার খুনীদের নতুন এক শ্রেণীবিন্যাস করেছেন গদীতে বসার পরেই এবং তার নাম রাজনৈতিক খুনী বলে তাদের সাত খুন মাপ করার এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছেন। সে পন্থায় কেবল মাত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের লোকেরা যদি খুন করে এবং ধরা পড়ে ও আদালতে ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে সোপর্দ হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে ঐ মামলা তুলে নেওয়ার জন্য সরকার পক্ষ বিচারককে জানায় যে উক্ত খুনের বা অনুরূপ অপরাধ অনুষ্ঠানের মামলা যেন আর অগ্রসর হতে না পারে, কারণ স্বরূপ বিচারকের কাছে সরকারী উকিল বা পাবলিক প্রসিকিউটার বা উর্দ্ধতন পুলিশ অফিসার সাক্ষী না থাকার অজুহাত বা সাক্ষ দেবার লোকের অভাবের অজুহাত বা সাক্ষীরা প্রভাবিত হয়েছে বলে মামলা তুলে নেবার অন্যায় আবদার করে। হালেই এরূপ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু মাননীয় বিচারকগণ ন্যায় বিচারের খাতিরে মামলা তুলতে রাজী হন নি এবং মন্তব্য করেছেন যে আপাতদৃষ্টে মনে হয় সাক্ষী সাবুদ না আছে তাতেই এইরূপ মামলা এখন তুলতে দেওয়া সাধারণ বিচার ব্যবস্থার পরিপন্থী তাই তাঁরা অনুমতি দিতে অস্বীকার। সরকারের এই সব কার্য্যাবলী বিচারের ওপর অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কি বলা যায়। এর ফলে খুনীরা ও দুষ্কৃতকারীরা দিনের পর দিন প্রশ্রয় পাচ্ছে এবং উত্তরোত্তর খুন-জখমেরও অন্যান্য অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমাজে দুর্বৃত্তদের প্রাধান্য ক্রমশই বর্দ্ধিত হচ্ছে এমন বিরাট আকারে যে ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গে অরাজকতা সর্বব্যাপী বিস্তৃত হচ্ছে। সরকার কোথায় অরাজকতা দমন করবেন, তা না সরকারই এই অরাজকতা বৃদ্ধির সহায়ক হচ্ছেন শুধু দলীয় স্বার্থে। খুনীকে রাজনৈতিক খুনী বলে মর্য্যাদার আসন দিলে দেশে খুন বন্ধ হবে কি? খুনী ও দুর্বৃত্ত শ্রেণীর লোকদের এভাবে আস্কারা করার এবং আস্কারা করার পর বিচার না করে বা না করতে দিয়ে সহজেই মুক্তি দিলে যে বিষময় ফল ফলবে ও তা এখনই ফলতে শুরু করেছে সে কথা কি সি. পি. এম দলপতিরা জানেন না—না জেনে শুনে দল বাড়াবার পদ্ধতি হিসাবে এই হীন প্রচেষ্টা চালাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ? সমাজ বিরোধিরা কোন রাজনৈতিক দলের সম্পদ নয় বরং বিপদ; তাই এদের এভাবে বাড়তে দিলে দলের নেতারাও চরম বিপদগ্রস্থ হতে পারেন—আজ না হোক কাল, না হয় পরে এবং ভবিষ্যতে যে বিপদ হবেই এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত করে এখনই বলা যায়। সময় থাকতে সাবধানতা অবলম্বন ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গল; সে কারণ সি. পি. এম নেতৃত্বের যে ভাবেই হোক এই ক্রমবর্দ্ধিত খুনের রাজনীতিকে সমূলে উৎপাটন করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সি. পি. এম ওপথে চলতে নারাজ বরং উত্তরোত্তর তারা শহরাঞ্চল ছাড়িয়ে দূর গ্রামাঞ্চলেও ঐ একই নীতিকে অঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলেছে বড় পরিতাপ। গ্রামে গ্রামে খুন জখম অত্যাচার অবিচার ও দুর্নীতি ক্রমবর্দ্ধমান। মানুষ জন ত্রাহি ত্রাহি রব তুলে ভীষণ দুরবস্থার মধ্যে ধীরে ধীরে তলিয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা ও দুরবস্থা আর কি হতে পারে? কল্পনাতীত জোরজুলুমের রাজত্ব গ্রামাঞ্চলে কায়েম হতে চলেছে গত কয়েকমাস যাবৎ। একেত বন্যার মানুষ সর্ব্বস্বান্ত তার আবার যাও বা কিছু ফসল পাবার আশা ছিল তাও নূতন বশীরা অর্থাৎ সি. পি. এমের বশীর লোকেরা জোর জবরদস্তি করে রামের ফসল

জমিকে দিচ্ছে অথবা দলের অফিসে বা স্থানীয় দলপতির ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলছে। বন্যার পূর্বে-জমি চাষ দেবার ও ফসল বোনার সময়ে একদফা জোর জুলুম ও অন্যায়ভাবে বেদখল করার ও এদের জমি অন্যকে দখল দেওয়ার কাজে সি. পি. এম কর্মীরা গ্রামাঞ্চলে সন্ত্রাসের, অরাজকতার ও জোর যার জমি তার নীতির রাজত্ব কায়েম করে। এখন আবার ফসল তোলার-ধান কাটার সময়ে ঐ একই অতি কারক নীতি চালু করে মানুষজনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। গোদের ওপর বিষফোঁড়া" রূপে দেখা দিয়াছে—অপারেশন বর্গা এবং এর ফলে পূর্বতন অত্যাচার ও জুলুমের এবং প্রায়শই খুনের রাজনীতি তার নতুন রূপ নিয়ে গ্রামে গ্রামে আত্ম প্রকাশ করছে। ফলে শান্তি বিঘ্নিত ও মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা শুরু হয়ে গেছে—যা দিন দিন ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করে মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিচলিত করছে।

গ্রামে গ্রামে বর্গাদারে বর্গাদারে বিবাদ বিসংবাদ, পরস্পরে হানাহানি, মারামারি ও খুন খারাপী দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। কোথাও বা জোতদারে বর্গাদারে লাঠালাঠি গুলি চালাচালি, বোমবাজী সম্ভবে উঠেছে এবং বাস্তবে দেখা গেছে যে সি. পি. এম কর্মীরা জোতদার দলীয় লোক হলে, তার ফলেই বর্গাদারকে খুন করতে বা করাতে সাহায্য করছে; আবার যেখানে বর্গাদার দলের লোক সেখানে জোতদারকে সি. পি. এম খুন করছে, ধান কেটে নিয়ে দলের লোকেদের ঘরে ধান তুলছে। সি. পি. এম যেন শাঁকের করাত, যেদিকে তার সুবিধা সেই পথেই সে চলে, নীতির বালাই বলে তার কাছে কিছু নেই। কিছুদিন পূর্বেও যে সব জোতদার কংগ্রেসের ঘোরতর সমর্থক ছিল তারা কিন্তু এখন রাতারাতি কোল্ পাল্টে সি. পি. এমকে মোটা অংকের চাঁদা দিয়ে স্থানীয় নেতাদের হাত করে নিয়ে বর্গাদারদের ন্যায্য প্রাপ্য ফসলের ভাগ থেকে বঞ্চিত করছে এবং পূর্বতন বর্গাদারকে ছাড়িয়ে নূতন বর্গাদার নিয়োগ করছে। এই চালাকির হাত থেকে বর্গাদারদের রক্ষা করার জন্যই অপারেশন বর্গা ব্যবস্থা সরকার চালু করেছেন, কিন্তু বাস্তবে যে অবস্থা গ্রামাঞ্চলে ঘটছে তা অন্যরূপ; কারণ স্থানীয় নেতারা কোন আদর্শের, বা ন্যায় নীতির পরোয়ানা করে এই সুযোগে নিজ নিজ পকেট ভরাবার জন্য সুবিধাবাদের আশ্রয় নিয়ে অন্যায়ভাবে খুন, লুঠতরাজ ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধি করে চলেছে; আর কোন ক্ষেত্রে যদি কোন সুদূর অতীতকালে কখনও কোনও জমিতে একবার অন্ততঃ আগে চাষ করে থাকে এবং মাঝখানে যেচ্ছায় যদি সে জমি চাষ করা ছেড়ে দিয়ে থাকে এবং সেই জমিতে যদি বিগত পাঁচ-সাত বছরও চাষ আর না করে থাকে তবে সেই সেই বর্গাদারকে অন্যায়ভাবে বর্তমানের প্রকৃতজ্ঞ বর্গাদারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেও তাকে হটিয়ে দিয়ে ঐ সব পুরাতন বর্গাদারদের দখল দাবাস্ত করার জন্য টাকা-পয়সার বিনিময়ে সরকারী কর্মকর্তাদের ওপর দলের ভয় দেখিয়ে ও প্রভাব খাটিয়ে উক্তরূপ অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে আর এই অন্যায় কাজের বাধা প্রতিবাদ বা প্রতিকার মানসে বাধা দিতে বদ্ধ পরিকর তারাই খুন হচ্ছে সি, পি, এম-এর স্থানীয় দলের লোকদের হাতে। কি অদ্ভুত পরিস্থিতি তা গ্রাম-গঞ্জের লোকেরা ছাড়া কে জানবে এবং কে এর বিরুদ্ধে ভয়ে বাধা দাড়া দিয়ে তাদের রুখবে? রাজ্য সরকারকেই আইনের মাধ্যমে ভূমি সংস্কার করতেই হবে এবং যতশীঘ্র সম্ভব তা করা জাতীয় স্বার্থে একান্ত দরকার। কিন্তু ভূমি-সংস্কারের ধুয়া তুলে যদি কেবল দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ভিন্ন দলের লোকগুলিকে ভূমিহীন করার হীন চক্রান্ত ও চেষ্টা চলতে থাকে, যা গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র পরিদৃশ্যমান, তবে মানুষ সরকারের ওপর আস্থা রাখবে কি উপায়ে? পদে পদে সরকারের আন্তরিকতার অভাব ও এক দেশদর্শিতা লক্ষ্য করে গ্রামীন মানুষজনেরা ক্ষুব্ধ ও নিজেদের অসহায় বোধ করছে, তার ফলে প্রতিকারহীন মানুষ বাঁচার তাগিদে মরিয়া হয়ে উঠছে, তারা অন্য কোন পথ না পাওয়ায় শেষ চেষ্টা হিসাবে হত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে।

(চলবে)

RegdNo. R. N .24511/71 Biplabi Bangla Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—মফঃস্বল ১৫.০০ টাকা বার্ষিক :—৮.০০ টাকা মূল্য—৩০ পয়সা

৫/১৮

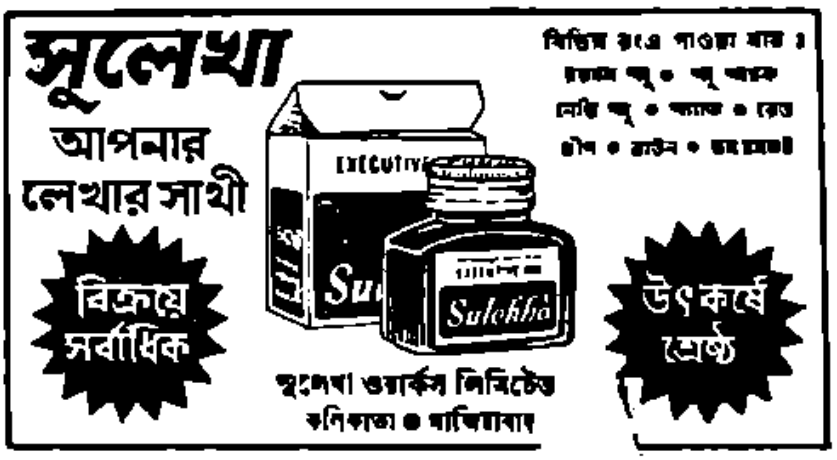

CALCUTTA NATIONAL LIBRARY

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুলক চ্যাটার্জী, শ্রীবারীণ রায়।
সম্পাদক—শ্রীশান্তি পদ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বোম্বাই—শ্রীমধুগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। কার্যাধ্যক্ষ সচিব—শ্রীবীরেন্দ্র গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বন্ধুদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :—প্রিন্সিয়া পাবলিসিটী, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাঙালী

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭১

অষ্টম বর্ষ	শনিবার, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৭৫ ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯	১৮ সংখ্যা

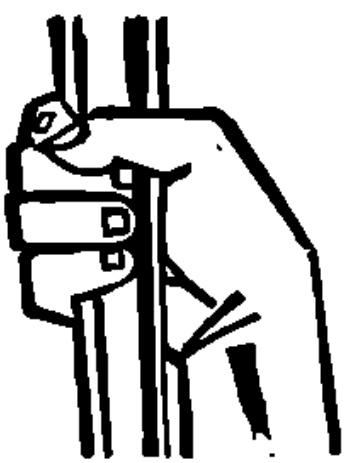

LIBRARY

এই সংখ্যায়

চিরভাস্বর ২১শে ফেব্রুয়ারী
। সম্পাদকীয় ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক মলিনী মোহন দাশগুপ্ত ।

মীরজাফরদের অভিযান

আজি হতে শতবর্ষ পরে
। শ্রীসতীভূষণ সেন ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস
। ক্ষীরোদ দত্ত ।

চিঠিপত্র

বিপ্লবীর জীবন দর্শন
। কুশল ভট্টাচার্য ।

১৯১৫ সালে ২১শা ফেব্রুয়ারী
। ব্রজেন দাস ।

মায়ের আরতি অরাতি নাশন
পদে অঞ্জলি রাঙ্গা পুরণ,
তাজা রক্তে মায়ের তর্পন
জবার বদলে ছিন্ন শির।

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	CALCUTTA		
Banerjee Smt. Basanti w/o Late Jitendra Banerjee	43, Shyambazar Street, Calcutta-4	200	10. 12. 75
Bhowmik Sashanka Kumar	56, Beck Bagan Row, Cal. 17	200	1. 4. 77
Chowdhury Smt. Amiya Prova w/o Late Hem Ch. Chowdhury		200	21. 10. 78
Das Smt. Ashrukhna w/o Late Khudiram Das		200	20 8. 78
Das Gupta Kamala (Devi) w/o Late Ramesh Das Gupta	26, Rasraguru Avenue Calcutta-28	100	1. 10 76
Dey. Haripada Change of Address only (From 40/8/1A, Gariahata Road South) Calcutta-31	1/H-15, Govt. Housing Estate Kusthia Road Calcutta-39	200	2. 10. 69
Dutta Smt. Sachi Rani w/o Late Mahendra Ch.	Khalishakota Pally, Birati Calcutta-51 (C/o Amiya Krishna Basu)	200	11. 11. 78
Majumder Pranati w/o Late Dibyendra Sundar	22C, Ram Ratan Bose Calcutta-4	100	1. 10. 78
Kar Roy Surendra Mohan Change of Address only (in plan of 34, East Beliaghata Road, Milan Nagar, Calcutta-10)	20B, South Sealdah Road		
Roy Mon Mohan	63. Pratapaditya Place Calcutta-26	200	1. 10. 77
Roy Smt Santilata w/o Late Prafulla Roy (alias Guruda)	34, Jadavpur Central Road Calcutta-32	100	14. 10. 78

(Contd. on 3rd cover)

সম্পাদকীয়

চিরভাস্বর ২১শে ফেব্রুয়ারী

প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি দিন চিহ্নিত হয়ে থাকে, যে দিনটি শুধু কোন একটি বিশেষ জাতির গৌরব ও কীর্ত্তিই বহন করে চলে না, সেই দিনটি পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকে। সেই দিনটিকে ইতিহাসের মন্ত্রিক্ষণ বলে অভিহিত করা যায়। সেই বিশেষ দিনটি শুধু অতীতের গৌরবের স্মারক বহন করে না, আগামী বহু যুগের প্রতিশ্রুতিও বহন করে। তাই দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে নিরবধিকালের কপোলতলে শুভ্র, সমুজ্জ্বল ও চিরভাস্বর হয়ে থাকে। এমনি একটি দিন ভারতের ইতিহাসে বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে ও থাকবে। সেই দিনটি হল অবিস্মরণীয় একুশে ফেব্রুয়ারী।

উনবিংশ শতাব্দীকে বলা যায় বাংলা, তথা ভারতের নবজাগরণের যুগ। জাতীয় জীবনে ধর্ম, শিক্ষা, দেশসেবা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাধিক দিক্‌পালের আবির্ভাব ঘটেছিল বাংলা দেশের মাটিতে। এই শতাব্দীর শেষ দশকে স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষি শ্রীঅরবিন্দ অনলস ভাবে দেশ ও জাতিকে মনুষ্যত্ব, দেশপ্রেম ও ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে নবজাগরণের সূত্রপাত করেছিলেন। দীর্ঘদিন বিদেশী শাসন ও শোষণের ফলে, দেশ যখন প্রায় নির্জ্জীব হয়ে পড়েছিল নিজেদের ধর্ম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ভুলে পরদেশীর অনুকরণ করে, এমন কি তাদের ধর্মাবলম্বন পর্য্যন্ত করে প্রায় কাঙ্গাল হতে বসেছিল, তখনই জাতির আত্মবিশ্বাস, দেশপ্রেম ও সম্বিৎ ফিরিয়ে এনেছিলেন এই দুই মহামানব। দার্শনিকেরা বলেন, দুর্গতির জালে যখন রাষ্ট্র জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হন দেশনায়ক। এই দার্শনিক সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায় এঁদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। এঁরা যে ভাবধারা প্রচার করেছিলেন, তা আকাশে বাতাসে, গুহায় কন্দরে, গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু সাংগঠনিক কাজকর্ম, ব্যাপক প্রচার ও ত্যাগব্রতী সেবক সংগ্রহের দায়-দায়িত্ব বহন করবার ও ভাবধারা বাস্তবায়িত করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে জন্ম নিল বিপ্লবী সংস্থা "অনুশীলন সমিতি" ১৯০২ সালের এই একুশে ফেব্রুয়ারী। ভারতবর্ষের বিপ্লববাদ উনিশ শতকে মহারাষ্ট্রে আরম্ভ হলেও, এই প্রদেশের বাইরে বেশী প্রসারলাভ করেনি। বলা যায় বঙ্গদেশের বিপ্লববাদের প্রথম ও প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল অনুশীলন সমিতি। এই অনুশীলন সমিতি একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান মাত্র ছিল না। অনুশীলন সমিতিকে একটি বিশিষ্ট আন্দোলন বলে অভিহিত করা যায়। এই আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তখন যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে, যদিও কর্মসূচির পরিবর্তন ও স্থান কাল-পাত্র অনুযায়ী কিছু নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনও অনস্বীকার্য্য।

অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল মূলতঃ দেশের মধ্যে বিপ্লব ও স্বাধীনতা যজ্ঞের হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার জন্য। সেই যজ্ঞে পরবর্তীকালের একজন প্রধান হোতা

ছিলেন প্রয়াত বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু। তিনি ছিলেন সর্বকালের একজন অলৌকিক মহানায়ক। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইংরেজদের হটিয়ে দেওয়ার চিন্তাভাবনা ও প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই। কিন্তু যারা ভারতবর্ষে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিন ধার্য্য করেন রাসবিহারী বসুই সর্বপ্রথম ১৯১৫ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী। রাসবিহারীর পরিকল্পনা ছিল পেশোয়ার থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ২৬টির মত সৈন্য ব্যারাকে অবস্থিত ভারতীয় সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহ ঘটিয়ে ইংরেজকে দেশছাড়া করবার। রাসবিহারী বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর না করে, ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ও দেশী অস্ত্রশস্ত্রের উপরই তার ভরসা রেখেছিলেন। এখানেই রাসবিহারীর স্বকীয়তা চিন্তাশীলতা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। যে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তে সাময়িকভাবে তাঁর প্রচেষ্টা জয়যুক্ত না হলেও, রাসবিহারীর এই স্বপ্নের সার্থক রূপান্তর ঘটেছিল তাঁরই সংগঠিত ও তাঁর ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদহিন্দ ফৌজের কীর্তিকলাপের মাধ্যমে। আজাদ হিন্দ ফৌজ অমিত বিক্রম ও শৌর্য্য-বীর্য্যের স্বাক্ষর রেখে মূল ভারতখণ্ডের সীমিত অংশকে স্বাধীনও করেছিল। রাসবিহারীর অবদান ব্যর্থ হয়নি। তাই এবারকার ২১শে ফেব্রুয়ারীতেও জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে স্মরণ করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গতঃ একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি দুঃখের সঙ্গে, ক্ষোভের সঙ্গে, গভীর বেদনার সঙ্গে, প্রয়াত 'বসুমহাশয়কে' যোগ্য সম্মান জাতীয় সরকার আজো দেন নি। এমন কি তাঁর চিতাভস্ম দেশে ফিরিয়ে আনার অন্তিম ইচ্ছাটাকেও স্মরণ করা হয়নি। বিংশ শতাব্দীর সাত দশকের একুশে ফেব্রুয়ারী আমরা রাসবিহারীর উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম নিবেদন করি। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি অনুশীলন সমিতিকে বিপ্লববাদের ধারক ও বাহকরূপে। এই দিনে আরো স্মরণ করি সেই সব শহীদদের, যাঁরা ওপার বাংলায় আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে স্বীকৃতি মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য বুকের রক্তে রাজপথ রাঙিয়ে দিয়েছিলেন, অমিত বিক্রমে বুলেটের সম্মুখীন হয়ে নিজেদের জীবন আহুতি দিয়েছিলেন।

এই পুণ্যদিবসে আমরা অনুভব করি যে বিপ্লবীদের ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ধ্যানের ভারতবর্ষ আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দেশের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন বা বিপ্লবের প্রয়োজন আজো বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। তাই এই একুশে ফেব্রুয়ারীতে নতুন করে শপথ নিতে হবে পূর্বসূরীদের অসমাপ্ত কাজকে সম্পূর্ণ করতেও জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য বিপ্লবীর আদর্শনিষ্ঠা, ব্যক্তিগত নিস্পৃহা ও অনাবিল দেশপ্রেম নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার। সমস্ত শহীদ ও প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে ও আজ শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক্।

———

আজি হ'তে শত বর্ষ পরে

॥ শ্রীসতী তৃণা সেন ॥

পাতালের সিঁড়ির একটা নিয়ম আছে। এক ধাপে পা পড়লেই আর রক্ষা নেই। একটু একটু করে একেবারে তলায় নামিয়ে ছাড়বে। আলো আর বাতাসের জীবন থেকে বিদায় নিতে হবে। এই নিয়মটির কথা আমাদের ভুলবার যো নেই। কলকাতায় বাস করি দেখছি তো চারধারে। কয়েকটা মাত্র বছর স্বাধীনতা পেয়েছি, এর মধ্যেই সহরটা যেন বস্তী হয়ে গেছে।

আবার অন্য একটা নিয়ম আছে স্বর্গের সিঁড়ির বেলায়। এক ধাপ উঠতে পারলেই হল, একটু একটু করে উপরে উঠে যাবে। এই নিয়মটার কথা আমাদের জানা নেই। দুনিয়ার দুঃখবাদি বা পেসিমিষ্টদের মত আমরা সবাই বিশ্বাস করি 'গেল গেল সব ফুরিয়ে গেল'। খাদ্য গেল, স্থান বা space গেল, সঙ্গতি অর্থাৎ resource তাও সব টুকুই শেষ হওয়ার মুখে। মানুষ বড় বেশী বেড়ে গেছে দুনিয়ায়। থামাও, এখুনি থামাও। নইলে খাদ্য ফুরিয়ে যাবে, পানীয় পাওয়া যাবে না। শোবার জায়গা পাবে না, চলবার পথ 'জাম' হয়ে যাবে। কলকাতায় আজ আমাদের যে অবস্থা, সারা দুনিয়া তেমনি বাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে।

জগতে সবাই অবশ্য পেসিমিষ্ট নন, অপটিমিষ্ট বা আশাবাদিও আছেন বহু। আজ মুখবন্ধ করবার জন্য তাঁদের যুক্তির সঙ্গে পরিচয় করবার চেষ্টা করব। তাঁদের যুক্তিটা এই রকম। একশো বছর আগে দুনিয়ার সাধারণ মানুষ এ যুগের মানুষের চেয়ে দরিদ্র ছিলেন, অসহায় ছিলেন। বিশ্বাস না হয় সে যুগের লেখকদের বর্ণনা পড়বেন। সংখ্যায় তাঁরা কজনই বা ছিলেন! তখনও ধরণীতে এইসব সম্পদ ছিল, আজ যা আমরা ভোগ করছি, কিন্তু পিতামহরা তার সন্ধান পান নি। একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে, আর আত্মরক্ষা করতে পারতেন না। দুর্ভিক্ষ তো লেগেই ছিল, আজ এদেশে কাল ওদেশে। এমন বছর যেতনা যখন কোন না কোন দেশ বা সহর দুর্ভিক্ষ বা মহামারীতে উজাড় হয়ে না যেত। আজ দুর্ভিক্ষে কাউকে মরতে দেবেন না, মহামারীতেও নয়। জাহাজ বোঝাই হয়ে খাবার আসবে, আসবে প্লেন বোঝাই ওষুধ। একশো বছরে মানুষের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, বেড়েছে তাদের মধ্যে মমত্ববোধ। বেড়েছে নিরাপত্তা।

বিগত একশো বছরে মানব সমাজের যে পরিবর্তন হয়েছে, তার সঙ্গে তুলনা চলে দশ হাজার বছর আগেকার সেই কৃষি আবিষ্কারের প্রভাতটির সঙ্গে। সেদিন প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর না করে, মানব নিজের খাবার নিজেই উৎপন্ন করতে আরম্ভ করে। সেই শুভলগ্নেই মানব সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। সে স্বর্গে উঠবার প্রথম সিঁড়িটিতে পা ফেলেছিল।

দুশো বছর আগে পৃথিবীর জন সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৫ কোটি। ক্রীতদাসের মত উন্মাদ পরিশ্রম করার পরেও তাদের গড় আয় হত বড় জোর বাৎসরিক দেড় হাজার টাকা। আজ পৃথিবীর জন সংখ্যা হয়েছে ৪১০ কোটি, জন প্রতি গড় আয় বেড়ে হয়েছে দশ হাজার টাকা। এই ভাবে বাড়তে থাকলে আরো দুশো বছর পরে জনসংখ্যা হবে ১৫০০ কোটি; তাদের গড় আয় হবে বাৎসরিক জন প্রতি দেড় লক্ষ টাকা। সেই যে প্রথম কবে সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, সেই থেকে মানব উপর দিকে উঠছে। উঠতেই থাকবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি যখনই সমাজের পক্ষে অমঙ্গলের কারণ হবে, তখনই সেটা নিজে থেকে থেমে যাবে। আগের দিনে আমেরিকায় মায়েদের গড়পড়তা সাতটি করে সন্তান হত, এ যুগে হয় দুটির চেয়ে কম। আগের দিনে চাষের কাজে নিযুক্ত হয়ে সন্তান পিতামাতার ধনবৃদ্ধি করত। তারা ছিল Producer বা উৎপাদক। এখন ও দেশে সন্তান আর উৎপাদক নয়, তারা ভোক্তা বা consumer সম্পদ বৃদ্ধি করে না সম্পদ ব্যয় করে। সে যুগে Benjamin Franklin আমেরিকান যুবকদের ধনী হওয়ার সচেতন উপায় বাতলে দিয়েছিলেন : বলেছিলেন এমন একটি বিধবাকে বিয়ে করে ফেল, যার নটি সন্তান বর্তমান। সে যুগে সেটি ছিল অতি উত্তম উপদেশ। এ যুগে সেটা হবে দেউলে হওয়ার সহজতম উপায়।

আমাদের দেশেও আপনারা দেখে থাকবেন মধ্যবিত্তদের মধ্যে মায়েদের পাঁচ ছয়টি করে সন্তান হত। এখন দেখেন মাত্র দুটি বা তিনটি। এটা কিন্তু কোন সরকারী প্রচারের ফলে হয়নি। জরুরী অবস্থার নিষ্ঠুরতার ফলশ্রুতিও নয় এটা। এটা হয়েছে সামাজিক প্রয়োজনের স্বাভাবিক নিয়মে। জাতিসংঘের সংখ্যাবিদরা দেখেছেন যে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জন্মহার কমে আসে। শুধু ধনী পাশ্চাত্য দেশে নয়, দরিদ্র কাফ্রীদের দেশেও একই হারে কমে। জনতা বুঝতে আরম্ভ করেছে তার আর্থিক উন্নতি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে দেশের গভর্নমেণ্ট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর, সন্তানের সংখ্যার উপরে নয়।

মানব সমাজের নিজের প্রয়োজনেই তার জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে, তর্কের খাতিরে সেটা মেনে নিলেও, ধরণীর Resource বা সংস্থান যে দিন দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে, সেটা তো সত্য !—প্রথমেই ধরুন শক্তি যদি ফুরিয়ে যায় তা হলে অবশ্য ভয়ের কথা। কিন্তু তেলের সঞ্চয় কি বাস্তবিকই ফুরোবার তলানিতে এসে পৌঁছেছে ? এখনি নিশ্চয় করে বলা যায় না। ইউরোপের North Sea বা Bombay Highএর মত আরো কত জায়গায় তেল লুকানো থাকতে পারে। আর যদি বাস্তবিকই ফুরিয়ে যায়, তাহলেও ফুরাতে ফুরাতেও, আগামী একশো বছর, আমরা তেল, কয়লা ও আণবিক শক্তি দিয়েই কাজ নিতে পারব। ততদিনে সৌর শক্তির বহুল ব্যবহার আরম্ভ হবে। তখন আর শক্তি কোন সমস্যাই থাকবে না।

দুঃখবাদিদের আর একটা ভয় হল শিল্পের কাঁচা মাল নিয়ে। মানব সভ্যতার সৌধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিল্পের বনিয়াদের উপরে। কাঁচামালের অভাব দেখা দিলে সেই বনিয়াদ ধ্বসে যাবে। শিল্পের কাঁচামাল যে অতি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা দেখছি যে মানবের উদ্ভাবনী শক্তি কোন অবস্থাতেই পরাজয় স্বীকার করে না। একটি বস্তুর অভাব হতে না হতে, পরিবর্তে অন্য বস্তু ব্যবহার করে। এক সময়ে তামা ছিল শিল্পের মৌল বস্তু। এখন এলুমিনিয়াম সেই স্থান অধিকার করেছে। এখন এলুমিনিয়াম উৎপন্ন হয় খনিজ Bauxite থেকে। Bauxite যদি ফুরিয়েই যায়, আরো ডজন খানেক খনীজ পদার্থ আছে, যা থেকে এলুমিনিয়ম পাওয়া যাবে। পৃথিবীর উপরিভাগের ৮ শতাংশেই এলুমিনিয়াম। তবে পরিশোধন করে নিতে খরচ কিছু বেশী পড়তে পারে।

এর পরে আসবে সেই আদিম ও শেষ প্রশ্ন, মানুষ যে ভাবে দিন দিন বেড়ে চলেছে, তাতে খাদ্যের অভাবে কি পরস্পর মারামারি করে ধ্বংশ হবে না ? উত্তরে আশাবাদিরা বলেন, আমরা সাধারণতঃ যে সব

Conventional খাবার খাই, এবং যে সব Conventional উপায়ে সেগুলি উৎপন্ন করে থাকি, সেই সব খাবার সেই পুরাতন পদ্ধতিতে উৎপন্ন করেও ১৫০০ কোটি থেকে ২০০০ কোটি মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে। সেই সংখ্যায় পৌছতে এখনো আমাদের অনেক দেরি। অবশ্য দাম কিছু বেশী পড়বে, দ্বিগুণ বা তিনগুণ পর্যন্ত পড়তে পারে। সেটা এখন কিছু বেশী নয়। যদি বন্টন ব্যবস্থায় গলদ না থাকে আর, যদি তেমন অভাবই দেখা যায়, তখন নয় Unconvential খাদ্য চেখে দেখা যাবে। আমাদের food habit তো সর্বদাই পরিবর্তিত হচ্ছে। বিপাকে পড়ে বাঙ্গালীরা গম ধরেছি। গোল আলু এখন ইউরোপের প্রধান খাদ্য। ভবিষ্যতে কোন্ বস্তু যে খাদ্যের তালিকায় স্থান পাবে কে বলতে পারে?

এখন পৃথিবীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখা যাক। পৃথিবীর জনসংখ্যার তিরিশ শতাংশ অর্থাৎ ১২০ কোটি মানব বাস করে ইউরোপ, সোভিয়েট, জাপান ও উত্তর আমেরিকায়। তার efficient বা সম্পন্ন: মাথা পিছু গড় আয় বছরে ৩৬ হাজার টাকা। পরের ধাপে আছে ৮৫ কোটি মানব, যাদের বলা হয় Coping Nations। তারা বাস করে ব্রাজিল, মেক্সিকো, তাইওয়ান প্রভৃতি দ্রুত উন্নতিশীল দেশে, মাথা পিছু গড় আয় বছরে সাড়ে সাত হাজার টাকা। শতাব্দীর শেষে এরা প্রায় দশ হাজার ধরে ফেলবে।

এর পরের ধাপে ৯৫ কোটি মানুষ, বাস করে এসিয়ার কমিউনিষ্ট অঞ্চলে, চীন ইন্দোচীন ও উত্তর কোরিয়ায়। এদের গড় আয় সোয়া দু হাজার টাকা। কমিউনিষ্ট দেশ হওয়ায় সম্পদ বন্টন খুবই সুষ্ঠু, তাই উন্নতিও হচ্ছে খুব দ্রুত।

দারিদ্রের একেবারে নিচের তলায় পড়ে আছি আমরা, দুনিয়ার অবশিষ্ট একশো কোটি মানুষ। যার আশি কোটিই বাস করি ভারত উপ-মহাদেশে। আমরাই পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ, জগৎ সভায় 'হরিজন'। অন্য সকলের কৃপার পাত্র, বিশ্ব সংস্থার দুশ্চিন্তার কারণ। ধার (aid) নিয়ে খাবার কিনি, শোধ দেবার সময় তালবাহানা করি। অথচ গর্ব আছে ষোলা আনা দুনিয়ার সবাইকে ক্যাপিটালিষ্ট নয় কমিউনিষ্ট বলে অবজ্ঞা করি। চীনকে বলি আফিংখোর, জাপানকে বলি অসভ্য। জীবনে ব্যর্থরা এমনই হয়, জগৎকে ব্যঙ্গ করে গায়ের ঝাল মেটায়। পারে না যে, এইটেই একমাত্র আশা। ঈর্ষাই একদিন আমাদের ঠেলে উপরে তুলতে পারবে। আমাদের ক্লীবতা ও নির্বীর্যতা থেকে মুক্ত করতে পারবে। ধনী দেশের প্রযুক্তিবিদ্যা আছে মূলধন আছে। যেন তেন প্রকারেণ ও দুটি বস্তু আমাদের চাই। পশ্চিমী দেশের সঙ্গে টেক্কা দেবার জন্য, ওখান থেকে ও দুটি বস্তু আমদানী করব। বিনা পয়সায় সেটি হবে না, পরিবর্তে অন্য বস্তু রপ্তানী করতে হবে। চা, পাট, তৈয়ারী জামা: চিংড়ীর ল্যাজ কিম্বা ব্যাঙের ঠ্যাং: যখন যা গছাতে পারি গছাবো আর কিছু না পাই রপ্তানী করব শিল্প শ্রমিক, পাঠিয়ে দেব ডাক্তার নার্স, কিম্বা দলে দলে বৈজ্ঞানিক। তাতে ক্ষতি যতই হোক। মূলধন ও প্রযুক্তিবিদ্যার মূল্য হিসাবে যেকোন বস্তু ওরা চায়, পাবে। তাতেও যখন কুলাবে না, তখন রপ্তানী করব ট্যুরিজম বা পর্যটনের সুযোগ। গরীব দেশের পক্ষে দ্রুত অর্থোপার্জনের এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। কিছু দিতে হয় না, অথচ কিছু পাওয়া যায়। মোটকথা, যে কোন উপায়ে হোক আমরা এদের

(এর পর ৭ পাতায় দেখুন)

মীরজাফরদের অভিযান

১৯৪৭ সনে ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগ করার ফলে উচ্চবিত্ত ভারতীয়দের একটা বৃহত অংশ যেমন হয়েছিল ব্যথিত তেমনি হয়েছিল নিরাশাগ্রস্থ। তাদের আয়ত্তাধীনে ছিল অনেক সংবাদপত্র ও অন্যান্য সাময়িক পত্রাদি। সেগুলোর কাজ হলো দেশ-প্রেমের আড়ালে থেকে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বিষ ছড়ানো। যখনই ভারত সরকার বা কোনো রাজ্য-সরকারের কার্যে কোনো ত্রুটি বা ভুল দেখা দিত তখনই তারা জনদরদী সেজে জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করতে বলত 'এর চেয়ে বিদেশী সরকারই ছিল ভাল।' এদের অন্যতম নেতা ছিলেন বোম্বাই 'Current' সাপ্তাহিক পত্রের তদানীন্তন সম্পাদক D. F. Karakka.

সংগত কারণেই তখন তারা মধ্যবিত্ত মানুষের মনে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করলেও নিম্নবিত্ত ও সর্ব্বহারাদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। কিন্তু ইতিমধ্যে স্বয়ং ভারত সরকারই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে—সহযোগিতা করতে শুরু করলেন সেসব বিভীষণ বাহিনীর সংগে।

প্রথমত: সরকার জাতীয় সংবিধান রচনা করলেন পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশের অনুকরণ করে। তাতে এমন নির্বাচন পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হলো যার ফলে প্রত্যেক নির্বাচন প্রার্থীকেই নির্ভর করতে হয় কালোটাকার ওপর। অর্থাৎ সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের টিকিগুলি বাঁধা থাকে চোরাকারবারী ধনকুবেরদের হাতে।

দ্বিতীয়ত: সরকার স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোপন রাখলেন বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ ও নীতিপরায়ণতার উজ্জ্বল কাহিনীগুলোকে। তাঁরা বারে বারে ঘোষণা করতে লাগলেন যে কংগ্রেসের তথাকথিত অহিংস আন্দোলনই ব্রিটিশকে বাধ্য করেছে ভারত ছেড়ে চলে যেতে। ফলে উদীয়মান যুবশক্তি জানতেই পারল না কত আত্মত্যাগী ও সুনীতিপরায়ণ ছিলেন সত্যিকার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। আজকের সরকারী কর্মচারীরা তাই কোন নৈতিক শক্তি পায় না ঘুষের লোভ বা আলস্যের মোহ সম্বরণ করতে।

তৃতীয়ত সরকার দেশের ছাত্রছাত্রীদের ভীষণ ভাবে উৎসাহিত করতে লাগলেন বিদেশী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে। হাজার হাজার লোককে অকারণে বিদেশে পাঠানো হলো ব্যারিষ্টারি এবং অন্যান্য পড়া পড়তে। দেশের সুশিক্ষিত কাদেক মানুষকে উপেক্ষা করে বরণ করা হতে লাগল অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত বিলাত ফেরতদের। এসব লোক দেশে ফিরে যেতে লাগল বিভিষণ বাহিনীদের সঙ্গে। এরাই আজ বিকল করে ফেলছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিল্প ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থাকে।

চতুর্থত মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ সরকারী লোকেরা অকারণে বিদেশ ভ্রমণ ক'রে ক'রে দেশবাসীর মনে একটা মোহ বিস্তার করতে লাগলেন বিদেশ সম্বন্ধে। আমাদের সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শ যেন কিছুই নয় বিদেশের তুলনায় এটাই পরোক্ষভাবে প্রচার করতে লাগলেন তাঁরা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আমদানী করতে লাগলেন অশ্লীল বিদেশী ছবি যুবশক্তিকে দুর্বল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

এভাবে আটাশ বৎসর চলার পর ১৯৭৫ সনে ঘোষণা করা হলো ইমার্জেন্সী বা জরুরী অবস্থা। ব্যাহত হলো আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র, অসন্তোষ শুরু হলো সরকারের কোনো কোনো মহলে। কিন্তু একটা অদ্ভুত কর্তব্যপরায়ণতা দেখা দিল সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে। এটা দেখেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল মীরজাফররা।

তারপর ১৯৭৭ সনে জনতা সরকার আসার পর থেকেই পূর্ণ উদ্যমে কাজে লেগে গেছে মীরজাফররা। তরুণ-তরুণী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তারা ভালভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে একটা বিষমন্ত্র। অনেক সুখে ছিলাম আমরা। কংগ্রেসই আমাদের সকল দুঃখের মূল। নিজেদের শাসন করার ক্ষমতাই আমাদের নেই। অতএব আমাদের উচিত কোনো বিদেশীকে আমন্ত্রণ করে আনা। এই বিষ মন্ত্রের মধ্যে ইন্ধন যোগাচ্ছে জনতা মন্ত্রীদের উন্মাদবত্ যখন তখন বিদেশ ভ্রমণ। এই পরিস্থিতিতে সরকার পক্ষ, বিরোধী পক্ষ ও সাধারণ দেশবাসী অবশ্যই হুশিয়ার হবেন মীরজাফরদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয়ই তাঁরা অবিলম্বে জানতে চাইবেন কী তথ্য নিহিত আছে ক্ষমতা হস্তান্তরের গোপন দলিলের মধ্যে। কেন মৌলনা আজাদ গোপন রেখেছেন তাঁর আত্মজীবনীর শেষ তিরিশ পৃষ্ঠা?

———

(৫ পাতার শেষাংশ)

প্রযুক্তিবিদ্যা কিনবো। সেই বিদ্যার জোরে ওদের ধরে ফেলব।

সেটা মোটেই অসম্ভব নয়। দধিচির বুকের ভেতরটা দধীচির অস্থি দিয়ে তৈয়ারী। প্রতিহত করবার শক্তি তার ভয়ঙ্কর। নীল ঢেউ তোলা সাগরের উপর দিয়ে তার জীবনতরী আছড়ে পড়ে, সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে। জীবনের দীপশিখা জ্বলে জ্বলে ওঠে। একশো বছর পরে আমরাও পশ্চিমী দুনিয়াকে ধরে ফেলব।

———

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বাধীন সর্বভারতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ৬৯তম স্মারকদিবস।

(উদ্যোক্তা অনুশীলনী সমিতি)

স্থান—মহাজাতি সদন কলিকাতা
তারিখ—২১শে ফেব্রুয়ারী। সময়—সকাল ১১টা।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য কর্তৃক উদ্বোধন।
সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী
প্রধান অতিথি—প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ সান্যাল।
সবার উপস্থিতি কামনা করি।

নিবেদক—সরলকুমার সেনগুপ্ত
শচীন গুহঠাকুরতা
দীনেশচন্দ্র ঘটক

বিঃ দ্রঃ—ঐ দিন সকাল ৯টায় কুদঘাটস্থিত অনুশীলন ভবনের বিশেষিতম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হইবে। সতীর্থ উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করি।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নহেন)

গত ৭ই জানুয়ারী '৭৮ এ আপনার "মানুষ নাই আর দেশে"- এই শিরোনামায় আপনি যে বক্তব্য রেখেছেন তাহা বেশ সুপাঠ্য হইয়াছে! মাতা ও পুত্র গণতন্ত্র বিরোধী কাজ করেছেন তাহা অনস্বীকার্য্য। উচ্চপদস্থ আমলাগণের এবং জনগণ নির্বাচিত (মন্ত্রী হতে এম, এল, এ রা পর্য্যন্ত) প্রতিনিধিদের কর্তব্য ছিল স্বাধীন ও নির্ভিকভাবে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করা কিন্তু তাহা তাহারা না করায় জাতির প্রতি চরম অকর্তব্য করিয়াছেন। এজন্য জনগণের কাছে তাহাদের কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত। মাতা পুত্র তো বটেই, আমলাবর্গ ও জনপ্রতিনিধিগণও সমভাবে জাতির কাছে দায়ী।

এই প্রসঙ্গে 'গণতাদালত' এই আক্ষরিক কথাটির উপর সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সত্যিই কি কোথাও গণতাদালত আছে—বিশেষ বুর্জোয়া ডিমোক্রেটিক শাসনতন্ত্রে? বরং গণআদালতের হাওয়া প্রকৃত গণআন্দোলনের মাধ্যমেই ধরা দিতে পারে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে যাঁহারা এখনও বেঁচে আছেন—হয় তাহারা বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ড থেকে বিদায় নিয়েছেন না হয় শাসন যন্ত্রের সাথে প্রায় মিশে গিয়েছেন।

শ্রীমতী ইন্দিরার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে যে গণ অন্দোলন (গণ-আদালত ?) মুখর হয়ে উঠেছিল তার ধ্বনি সংস্পর্শে শ্রীমতী গান্ধী অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্থ হয়ে পড়েন—ফলে গভীর রাত্রিতে নিজদায়িত্বে ইমার্জেন্সি ঘোষণা করেন এবং তৎপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদ্বারা gratified করেন। আমার বক্তব্য সেই সময় শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ পরিচালিত গণ-আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করার প্রচুর সম্ভাবনা থাকায় স্বৈরতন্ত্র রক্ষাকল্পে ইমার্জেন্সী ঘোষিত হয় এবং অনিবার্য্য ভুলের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শ্রীমতী গান্ধীর পতন হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান Shah Commission গণ-আন্দোলনেরই নামান্তর নয় কি? সকল বিষয়ের উত্থান-পতন সময় সাপেক্ষ। যিনি যেখানে থাকেন তিনি নিজেকে বিপদমুক্ত রাখার জন্য যে উপায় অবলম্বন করেন তাহা যদি অমানবীয় কিংবা স্বৈরাচারী হয় তবে সেই উপায়ের ছিদ্র পথেই উহার পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য্য
৫১।৬।৪ বিদ্যাতন সরণী
কলিকাতা—৩৫ ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাসবীহারী রাত্রের গাড়ীতে দিল্লী হয়ে পাঞ্জাব রওনা হলেন। দিল্লী যাওয়া পর্যন্ত বিশেষ কোন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু গাড়ী যখন দিল্লী ষ্টেশন ছাড়িয়ে চলতে আরম্ভ করল অকস্মাৎ রাসবিহারী দেখতে পেলেন যে ছোট কামরাটিতে তিনি বসে আছেন সেখানে একটু দূরে তাঁরই পরিচিত এক গোয়েন্দা বিভাগের দারোগা রয়েছেন। সে সময়ে রাসবিহারীর মনের অবস্থা শুধু কল্পনার সাহায্যেই বুঝতে পারা যায়। রাসবিহারী ছদ্মবেশে ছিলেন। তাঁর মাথায় টুপি ছিল। সে রাত্রিতে শুধু সেই টুপির গুণেই তিনি রক্ষা পেলেন। পরবর্তী ষ্টেশনে ঐ কামরা ছেড়ে একটু দূরে অন্য এক কামরায় গিয়ে বসলেন। কিন্তু সেই ট্রেনেই তিনি গেলেন। এইরূপ দুঃসাহসের জোরে বহুবারই তিনি রক্ষা পেয়েছেন। শান্ত সমাহিত চিত্তে সাহসিকতার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ার দুঃসাহস রাসবিহারীর ছিল। শেষ পর্যন্ত রাসবিহারী অমৃতসরে গিয়ে পৌঁছলেন।

এদিকে যুক্তপ্রদেশে, বিহারে এবং বাঙলাদেশের বিভিন্ন সেনানিবাসে বিপ্লবীদের যাওয়া আসা চলতে লাগল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই পাঞ্জাবের সংবাদ নিয়ে কর্তার সিং এবং আরও কয়েকজন শিখ কাশীতে শচীন্দ্রনাথের নিকট এসে পৌঁছিলেন। উত্তর ভারতের সব সেনা নিবাসের তথ্যই তখন সংগ্রহ করা হয়েছে। সংবাদ নিয়ে বোঝা গেছে সমগ্র ভারতে তখন ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা খুবই কম। যা ছিল তারাও একেবারে নূতন রিক্রুট। সারা ভারতে এ সময় দু তিনটি মাত্র সেনানিবাসে তিনশতের বেশী ইংরেজ সৈন্য ছিল। কাবুলের সীমান্ত দেশে সেনানিবাসে সৈন্য সংখ্যা ছিল এক হাজার থেকে দু হাজারের মধ্যে। বিভিন্ন সেনা নিবাসে ভারতীয় সৈন্যদের হাতে যে পরিমান অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাতে একবছরের বেশী সংঘর্ষ চলতে পারত। কোন রেজিমেন্টে কত বাক্স রাইফেল আছে ম্যাগাজিনের পাহারায় কারা থাকে এবং সেই পাহারা কিভাবে চলে এ সমস্ত সংবাদ সবই সংগ্রহ করা হয়ে ছিল এই সময় সেনানিবাসে ভারতীয় সৈন্যদের মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। প্রতি মুহূর্তেই তাদের মনে হচ্ছিল হয়তো সেই দিনই ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার আদেশ হবে। বিপ্লবীদের প্রতিনিধিরা সেনানিবাসে গেলেই সিপাহীরা তাদের সমাদরের সহিত বসাতেন এবং আগ্রহ ভরে বিপ্লবীদের কথাবার্তা শুনতেন। প্রায় সকল্ সেনানিবাস থেকেই কথা পাওয়া গেল বিপ্লবে তারা অগ্রণী হবেনা কিন্তু ম্যাগাজিন যাতে হাতছাড়া হয়ে না যায় সেদিকে সচেতন থাকবেন এবং এই বিপ্লব সত্যই আরম্ভ হলে তারাও নিশ্চয়ই যোগ দেবেন।

কাশীর রেজিমেন্টে শচীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং আরও কয়েকজন কয়েকবারই গিয়ে আলোচনা করেন। দু-একজন ছাড়া আর সবই এখানে ভাললোক ছিল। তারা সকলেই দেশের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবে যোগ দিতে প্রস্তুত ছিল। কয়েকটি রেজিমেন্ট বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত হবার কয়েক দিনের মধ্যেই অন্যত্র

স্থানান্তরিত হয়েছে কিন্তু এই পরিচয় ব্যর্থ হয়নি। এদের সাহায্যে বিপ্লবীদের প্রচার দূরদেশান্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

বিপ্লবীরা যে শুধু সেনানিবাসে সেনানিবাসে প্রচার করতেন তা নয় গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চলত। যুক্তপ্রদেশে এমন অনেক গ্রাম যেখানে শুধু ক্ষত্রিয়দিগেরই বাস। এই সকল কেন্দ্র থেকে ইংরেজের সেনানিবাসেও সৈন্য সংগ্রহ চলত। এরা অশিক্ষিত হলেও বেশীদিন আগে পরাধীন হয় নাই। এদের রাজনৈতিক সংস্কার খুবই প্রবল। বিপ্লবীরা এদের কাছ থেকে খুবই সাড়া পেয়েছিলেন।

রাসবিহারী পাঞ্জাবে পৌছবার পরে সেখানকার সৈনিক দিগের সঙ্গে নূতন করে দেখা শোনা আরম্ভ হল। তিনি নিজে যে বাড়ীতে ছিলেন সেখানে কারও সাঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন না। দেখা সাক্ষাতের জন্য তিনটি আলাদা বাড়ী নির্দিষ্ট ছিল। এরই একটি বাড়ীতে সিপাহীদের সঙ্গে রাসবিহারীর দেখা শোনা এবং আলোচনা হত।

বিপ্লবের দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল ততই বিপ্লবীনেতাদের মনে ভয় হতে লাগল শেষ পর্যন্ত এ বিপ্লব সম্ভব করে তুলতে পারবেন কিনা। মন তাঁদের সংশয় দোলায় আন্দোলিত হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এ গুরুভার বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা। কিন্তু বিপ্লবের যত প্রকার আয়োজন করা সম্ভব কোন কিছুতেই ত্রুটি করা হয়নি। স্থির করা হয়েছিল যে উত্তর ভারতের বিভিন্ন সেনানিবাসে যত ইংরেজ সৈন্য আছে তাদের অজ্ঞাতে একই দিনে আক্রমণ করা হবে। বিপ্লবীদের সঙ্গে সংঘর্ষে যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদের হত্যা না করে বন্দী করে রাখা হবে। বিপ্লব রাত্রে আরম্ভ হবে এবং ঐ রাত্রিতেই শহরের টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন করে ইংরেজ সৈন্য এবং অন্যান্য যে সরকারী ইংরেজ পুরুষদের আটক করে রাখা হবে। এরপরে ট্রেজারী লুঠ করে জেলের বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়া হবে। শহরে শান্তি রাখবার ভার বিপ্লবীদের নির্বাচিত এক কমিটির হাতে ন্যস্ত করে মিলিত ভাবে ইংরেজ সৈন্যদের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। বিপ্লবীরা বুঝেছিলেন সাময়িকভাবে কিছু রেজিমেন্ট তাদের দলে এলেও কর্তৃপক্ষ নূতন ইংরেজ সৈন্য আমদানি করবে সে সংগ্রামে বিপ্লবীগণ সর্বতই যে জয়ী হবেন তা তারা মনে করতেন না। কিন্তু তাদের এও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে একবার বিপ্লব আরম্ভ হলে এই সংঘর্ষ জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে যদি এক বৎসর কালও চালিয়ে রাখা যায় তবে আর্ন্তজাতিক এমন এক বিচিত্র অবস্থা দাঁড়াবে তাতে বিদেশে ইংরেজের শত্রুদের সহায়তায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা বিপ্লবীদের পক্ষে কিছুটা কঠিন হলেও একবারে অসম্ভব হবেনা।

কয়েকদিনের মধ্যেই পাঞ্জাব থেকে সংবাদ নিয়ে কয়েকটি লোকএসে কাশীতে পৌছলেন। রাসবিহারী শচীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন এক্ষুণি ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের দিন ধার্য্য হয়েছে। সেদিন ছিল রবিবার নির্দিষ্ট একুশে ফেব্রুয়ারীর আর এক সপ্তাহ মাত্র বাকী। মুহূর্তের মধ্যে এক তীব্র আবেগে শচীন্দ্রনাথের সারা দেহ শিহরীয়ে উঠল। সে নিছক আনন্দও নয় আশঙ্কাও নয়। সে এক বিচিত্র অনুভূতি। সংবাদ পেয়েই শচীন্দ্রনাথ যথাযোগ্য সমস্ত স্থানে বিপ্লবের তারিখের বিষয় জানিয়ে দিলেন।

(চলবে)

১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী

॥ অজেন দাস ॥

১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ভারত হ'তে ইংরেজ সরকার উচ্ছেদ করার সংগ্রামের জন্য ব্রিটীশ ভারতের যুবক দল তৈরী হয়েছিল। নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে ওঁদের রক্তধারায় জন্ম নিবে স্বাধীন নবভারত এই আশায় ওঁরা দিন গুনছিলেন। সামিল হয়েছিল আসাম-বাংলা সিঙ্গাপুর হতে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পেশোয়ার পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ২৯টী সেনাবাহিনী, এই সেনাবাহিনী হিন্দু মোসলমান শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিত স্থানের তরুণ দল দ্বারা সংগঠিত ছিল। কোন ধর্মির ভাব বা স্থানীয় কোন ভাবাবেগে উদ্বুদ্ধ হয় নাই সৈন্যরা। ভারতের নাগরিক আমরা, ইংরেজের কবল হতে দেশকে মুক্ত করতে হবে এই দেশ প্রেমই তাঁদের একমাত্র পাথেয় ছিল। আরও সামিল হয়েছিল বাংলার ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবী কর্মিবৃন্দ এবং বিদেশ হতে আগত শিখদের দ্বারা সংগঠিত লাহোর ও অমৃতসরের কৃষকবৃন্দ। স্থির ছিল ভারতের সিপাহীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করলে বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীরা রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, সূফী অম্বা প্রসাদ ও অজিত সিংহের নেতৃত্বে কাবুল প্রান্ত থেকে ভারতে প্রবেশ করবে এই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতির পরিচালক ছিলেন অনুশীলন সমিতির সর্বভারতীয় নেতা বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ও তাঁর সহকর্মিগণ, সারা ভারত ও পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা ভারতীয় বিপ্লবীরা এই প্রস্তুতির সামিল হয়েছিল রাসবিহারীর নেতৃত্বে।

পলাশীর যুদ্ধের পর হতেই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার সুরু হয় এবং একটীর পর একটী অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হতে থাকে। কিন্তু ভারতের জনগণ ব্রিটিশ শাসন মাথা পেতে গ্রহণ করে নাই। ইংরেজের শোষন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ লাগিয়াই ছিল। ১৮০৮-১২ সালে বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ হয়, ১৮১০-১২ সালে বারানসীতে করবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়, ১৮১২-১৮ সালে উড়িষ্যার পাইকগণ বিদ্রোহ করে। ১৮২৯ সাল হতে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত আসামের খাসিয়ারা বিদ্রোহ করে। ১৮৩২ সালে মানভূমে বিদ্রোহ হয়। মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রাণী শিবধনির বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, বরকন্দাজ বিদ্রোহ, পিতারী যুদ্ধ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, নীলকর বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সমস্ত শ্রেণীর শেষ বিদ্রোহ। দেশকে ইংরেজের কবল হতে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই বিহারের কুমার সিং, পেশোয়া নানাসাহেব এবং তাঁর সহকর্মী আজিমউল্লা খাঁ, তাঁতিয়া তোপী ঝাঁসির রাণী লক্ষীবাই শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৫৭ সালের ২৯ শে মার্চ ব্যারাকপুরের সৈন্যদলের মঙ্গলপাণ্ডেই প্রথমে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করে।

১৮৫৭ সালের ৮ই এপ্রিল মঙ্গলপাণ্ডে ইংরেজের নানা প্রলোভন ও অত্যাচার সত্ত্বেও কোন প্রকার স্বীকার উক্তি না করে ফাঁসির রজ্জু দেশমাতৃকার মালারূপে গ্রহণ করে। এই অভ্যুত্থানে অপরিসীম আত্মত্যাগ ছিল, কোন প্রকার দুর্ব্বলতাও প্রকাশ পায় নাই, তবুও ইংরেজ শক্তিকে পরাভূত করা যায় নাই। কারণ জাতীয়তা বোধ ও রাষ্ট্র চেতনার অভাব ছিল।

১৮৫৭ সালের পর রাস বিহারী বসুর নেতৃত্বে ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রথম সর্বভারত ব্যাপী বৈপ্লবিক জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি হয়। জনৈক সৈনিক কৃপাল সিং এর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এই প্রস্তুতি সারা ভারতে ক্ষমতা দখলের পর্য্যায়ে পৌঁছুতে পারে নাই—; কিন্তু ইংরেজের সবরকম সতর্কতা অবলম্বণ সত্ত্বেও সিঙ্গাপুরে মোসলমান ও শিখ রেজিমেন্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সিঙ্গাপুরকে ব্রিটিশ কবল মুক্ত করে এক সপ্তাহ নিজেদের শাসন কায়েম রেখেছিল। অন্যান্য স্থানে বিশেষভাবে ফিরোজপুরে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যদের তুমুল লড়াই হয়। সরকারী হিসাবে অভ্যুত্থানে ৭০ জন মৃত্যু বরণ করেন, ১০০ জনের ফাঁসি হয়, ১৫০ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং প্রায় ২০০ জনের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড হয়। বিশ্বাসঘাতক কৃপাল সিংকেও বিপ্লবীরা রেহাই দেয় নাই। ইংরেজের পক্ষপুটে আশ্রিত থাকা সত্ত্বেও ২৫ বৎসর পরও এই বিশ্বাঘাতককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। ইহাও জাতীয়তা বোধের নিষ্ঠার পরিচয়।

অভ্যুত্থান কৃতকার্য্য না হলেও বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ বৃথা হয় নাই। বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই জাতীয়তা বোধের উন্মেষ হয়, ভারতবাসী সকলেই এক জাতী এই নবচেতনা নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম অগ্রগতি লাভ করে এবং গান্ধীজীর জন আন্দোলনের পথ প্রসস্ত করে। গান্ধীজী সারা ভারতে গণ-জাগরণ এনে স্বাধীনতা সংগ্রামের তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়; কিন্তু খেলাফৎ আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে হিন্দু-মোসলমানদের মধ্যে ভেদ নীতির বীজ বপন করে দিলেন। হিন্দু-মোসলমান দুই জাতী এবং জাতীয় স্বার্থ সম্পূর্ণ এক নয়, মোসলমানদের মধ্যে এই ধারণা দানা বাঁধতে থাকে। এই ধারণা হতেই জাতীয়তা বোধ ক্ষুন্ন হতে থাকে এবং জাতীয় ঐক্যের ভিতে ফাটল দেখা দেয়। ইংরেজ ইহার সুযোগ গ্রহণ করে। ইংরেজের বেড়াজালের আবর্তে ভারত দ্বিখণ্ডিত হল, জন্ম নিল বিকারগ্রস্ত ভারত ও পাকিস্তান।

বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসু ও নেতাজীর নেতৃত্বে ও পরিকল্পনায় ইংরেজের কবল হতে ভারত মুক্ত করার উদ্দেশ্যে গঠিত আজাদ হিন্দ বাহিনীতে কোন সম্প্রদায়িক দাবীর ও আচার ব্যবহারের স্থান ছিল না। সকল ভারতবাসীই এক জাতী এই দেশপ্রেমই উদ্বুদ্ধ হয়েছিল হিন্দু-মোসলমান শিখ প্রভৃতি সকলে। বাহিনীর সভ্যদের জীবন যাত্রারও কোন ভেদাভেদ ছিল না।

১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর জাতীয় ভাব ধারাই নতুন পরিস্থিতিতে সময় উপযোগী রূপ নিয়েছিল আজাদ-হিন্দ ফৌজে। কাজেই ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঐক্যের ও জাতীয়তাবোধের আদর্শকে তুলে ধরতে হবে নতুন পরিবেশে জাতীকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

বিপ্লবীর জীবন দর্শন

॥ দুর্গেশ ভট্টাচার্য ॥

১৯০৫ সন।

"কথা কও, কথা কও, অনাদি অতীত...।"

শুধু অতীত! কিন্তু প্রবহমান বর্তমান চলে প্রচণ্ড গতিবেগে—সমস্ত কেজে চুরে—অতীতের বাঁধন ছিন্নভিন্ন করে। সে জেনেও জানে না— ডুবুরি যেমন মণি-মাণিক্য আহরণ করে সাগরের অতল তলদেশ থেকে, ভূতাত্ত্বিক যেমন তার তথ্য সংগ্রহ করে ভূগর্ভের তিমির অন্ধকার থেকে তেমনি সুদূর ভবিষ্যতে বর্তমানকেও আসামীর কাঠ-গড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁর কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হয়। ন্যায় ও অন্যায়ের মানদণ্ডে ধৃত হতে হয়। ইহাই প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম।

আজ সেই অতীতের কথাই আলোচনা করতে যাচ্ছি, বিস্মৃত সত্য ঘটনাগুলো প্রকাশ করতে প্রয়াস করছি। যাদের কথা এখানে উল্লেখ করেছি তারা যে দধীচির মত নিজেদের আত্ম-বলিদান করে গিয়েছেন। এ ঘটনাগুলো যদি অতীতের গভীর অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়—তা হবে অত্যন্ত দুঃখের। জাতির দুর্দিনে যাঁরা নিজেদের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন সুদিনে তাঁদের কথা যদি একবার স্মরণও না করি—তাহলে আমাদের অপরাধ হবে মার্জনাতীত।

যে সময়ের কথা বলতে যাচ্ছি তার সঙ্গে আজকের দিনের সামঞ্জস্য একদম নেই বললেই চলে। তখনকার লোকগুলো ছিল অতি সরল ও অকৃত্রিম। বর্তমানে যেমন ভিলকে তাল করে বলে বাহাদুরি নেওয়াই একটা প্রচলিত প্রথা—যা সত্য নয় তাকে সিল্‌টি করা অলঙ্কারে সাজিয়ে গুজিয়ে সত্যের আসনে দাঁড় করালেই একটা বিচক্ষণতার পরিচয়—সে যুগের লোকগুলো ঠিক তেমনিটি ছিল না। তারা ভিক্ষায়ে বেঁচে থেকে, ব্যাঙ্কে লাখ টাকা আছে বলে আলাপ জমাতে পারত না, না খেয়ে দৈ, দুধ খেয়ে এলাম বলে ঢেকুর তুলতে পারত না।

আষাঢ় মাস। সন্ধ্যাকাল। উত্তরদিকে ভীষণ মেঘ করেছিল। কালো মেঘের তুলার মতো কেঁপে উঠা ঢেউয়ের নৃত্যে এবং সাথে সাথে ভীষণ গর্জনে স্বভাবতই মানুষের মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করছিল। এ যেন দেবতা ও দানবের প্রচণ্ড লড়াই! বাতাসের তাণ্ডব, মেঘের প্রচণ্ড গর্জন এবং সাথে সাথে প্রবল বর্ষণ—এ ত্রাসস্পর্শ যেন একটা প্রলয়ের সূচনা করছিল।

সন্ধ্যার সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার এবং দেবতা ও দানবের প্রচণ্ড লড়াই অগ্রাহ্য করে একটা কম্পিত কণ্ঠের ডাক শুনা গেল—দা' ঠাকুর ঘরে আছ?

আছি পলান, যাব কোথায়? একটা মাত্র ঠাঁই আছে, সেখান থেকেও তো এখন পর্যন্ত ডাক আসছে না—বলতে বলতে আমার বাবা হুঁকোটা হাতে করে ঘরের দরজার ছড়কাটা খুলে পুনরায় বললেন—এ কি পলান! এই দুর্যোগে, ঝড় জলের ভিতর এমনি করে ছুটে এলি কেন?

আসব না। বল কি? রমণি পিসি তো অনেকক্ষণ চলে এসেছে—তার কাছ থেকে কোন খবর না পেয়ে আর ঘরে থাকতে পারলাম না—তাড়াতাড়ি মুড়-জল খেয়াদিয়া না করে ছুটে এলাম। যাক্, সংবাদ কি?

অবাক হয়ে বাবা পলানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন—আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন—নিজের বিপদ অগ্রাহ্য করে পলান আমার খবর নিতে এল। এদের প্রাণ আছে—নিজের প্রাণ তুচ্ছ করেও অপরের ভালো করার মত সাহস আছে—নিজে অভুক্ত থেকেও ক্ষুধার্তকে নিজের খাদ্য এগিয়ে দেওয়ার মত মনের প্রসারতা আছে! তবু এদের উপর ভগবানের এতবড়ো অভিশাপ কেন? এরা খেতে পায় না কেন? রোগে ঔষধ, পথ্য জোটে না কেন?

সংবাদ যে এখনো কিছু দেবার মত হয়নি পলান—বলতে বলতে বাবা আলনা থেকে একখানা গামছা এগিয়ে দিয়ে পুনরায় বললেন—শরীরটা ভালো করে মুছে ফেল। ভিজে কাপড়খানাও ছেড়ে ফেল—নৈলে অসুখ করবে যে। বাবা যেন নিজের বিপদের কথাটা একদম ভুলেই

গেলেন—ঐ দাওয়ার ওধারে ছোট একটা আতুড় ঘরে মা প্রসব ব্যথায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন—কখন যে কি হবে কিছুই ঠিক নেই! বাবা এতক্ষণ ঘরের মেঝেতে হুকোটা হাতে করে পায়চারি করছিলেন। উৎকণ্ঠা, আতঙ্কে তাঁর দাড়ির কাঁটা দিয়ে উঠছিল। বাবা পলানের কথা শুনে সব ভুলে গিয়ে গামছাটা এগিয়ে দিলেন।

রেখে যাও তোমার গামছা—অসুখ করেও এদিক মাড়ায় না। এ সামান্য ঝড়-জলে যদি আমাদের অসুখ করে তা হলে তো আমাদের বেঁচে থাকাই হয় না! দাঁড়াও খবরটা নিয়ে আসি—বলতে বলতে পলান লাফিয়ে দাওয়ায় পড়ল।

আমাদের গ্রামের নাম কায়েতপাড়া। গ্রামটা অত্যন্ত ছোট-চাকা সহর থেকে ছয় সাত মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে। চাকা-পেলা সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান আছে তারা সবাই মুড়াপাড়ার নাম জানেন। মুড়াপাড়া বেশ ধনিক গ্রাম—লক্ষ্যা নদীর পূর্ব পাড়ে। আর আমাদের অবস্থান কায়েতপাড়া, লক্ষ্যা নদীর পশ্চিমপার। আমাদের গ্রামের অধিকাংশই ছিল নমশূদ্র। আমরা এক ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ—আর দু তিন ঘর কায়স্থ। অধিকাংশই চাষ আবাদের উপর নির্ভরশীল। সামান্য যার যে জায়গা জমি ছিল তাই চাষ করে ওদের দিন চলত কোন প্রকারে, কায়ক্লেশে। চাহিদাও ছিল তাদের যৎসামান্য—কোন প্রকারে মোটা ভাত, মোটা কাপড় হলেই দিন চলে যেত। আজকের মত চা, বিস্কুটের প্রচলন তখন ছিল না, সিনেমা, থিয়েটার তাদের নিকট ছিল অপরিচিত। স্কুল, কলেজের বালাই ত তাদের ছিলই না। সারাদিন ক্ষেত-খামারে পরিশ্রম করে দিনের শেষে দু মুঠো পান্তাভাত খেয়ে সুখে নিদ্রা যাওয়াই ছিল এদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

খানিকক্ষণ পরেই ছেলে হয়েছে, দা' ঠাকুর—ছেলে হয়েছে—মিষ্টি খাওয়াতে হবে—বলতে বলতে দৌড়ে ফিরে এল পলান। ঝড়ের তাণ্ডবলীলা থেমে এসেছে অনেকটা, বৃষ্টিও প্রায় ধরে এসেছে—এমন সময় হাসতে হাসতে এ সুসংবাদ বয়ে নিয়ে এল পলান।

আমার বাবার নাম ছিল চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি এ সংবাদ পেয়ে মনে মনে খুশী হলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার এই ষষ্ঠ ছেলে, দিন কিথারীর, আবির্ভাবের সাথে সাথে একটা চিন্তার রেখাও মুখে ফুটে উঠল। মেয়ে তার একটিও ছিল না। এতদিন তাঁর পাঁচ ছেলে, নিজে ও স্ত্রীকে নিয়ে—মোট সাতজনের মুখে দু মুঠো ভাতের সংস্থান করাই ছিল কষ্টকর। তারপর এই নূতন আবির্ভাব তার বোঝার উপর শাকের আঁটি হয়ে দাঁড়াল।

একটু ম্লান হাসি হেসে বাবা বললেন—খাওয়াব পলান, খাওয়াব। একটু চুপ করে থেকে তিনি পুনরায় বললেন—আচ্ছা পলান, বলতে পারিস আমি ওদের মানুষ করব কি করে?

অবাক হয়ে পলান বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল—কেন, দা ঠাকুর? এই বলে হাতখানা উপরে তুলে আকাশের দিকে দেখিয়ে দিল।

পলানের এই নির্দ্দেশে বাবা যেন পথ খুঁজে পেলেন। আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠলেন—আমার করার কি আছে? যার অঙ্গুলি হেলনে, যার নির্দ্দেশে এ নখর জগতের সব চালিত হয় তার উপর সমস্ত ভার অর্পণ করে থাকাই বুদ্ধিসঙ্গত—কি বলিস পলান? সমস্ত সমস্যা পথ হাতিয়ে ফেলি—নিজের উপর সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে ফেলি—আর ভাবি—এদের আমি মানুষ করব কি করে? এদের মুখে যে ছবেলা দু মুঠো পেট ভরে ভাত দেওয়ার ক্ষমতাও আমার নেই!

দা' ঠাকুর তুমি বড়ো ভাব—এত ভাব কেন বল তো? দুঃখ আমাদের চির সহচর—সুখের পরশ আমরা কোনদিন পাইনি। চোখের উপর সেদিন দেখলে তো আমার ভাগর ছেলেটা পেট ব্যথা পেট ব্যথা বলে চিৎকার করতে লাগল। কত তেল, জল মালিশ করলাম, কত ভগবানকে ডাকলাম—কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বাছা আমার নিস্তেজ হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে চোখ বুজল—সে চোখ আর খুলল না। আমি মনে মনে ভাবলাম—যিনি দিয়েছিলেন। তিনিই নিয়ে গেলেন—ভালোই হ'ল। এর জন্য আবার দুঃখ কেন?

(চলবে)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

(দুটি মেঘাচ্ছন্ন বছর)

১৮৯৭ সালে ওয়েলবি কমিশনে সাক্ষ্য দানের জন্য আমাকে আহ্বান জানান হয়। ভারতবর্ষের জন্য ব্যয় ভূষণ ও আর্থিক ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কিরূপ হবে সে সম্পর্কে তদন্তের জন্য এই কমিশন গঠিত হয়েছিল। লর্ড ওয়েলবি ছিলেন এই কমিশনের প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য মেম্বারদের মধ্যে ছিলেন স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন, মিঃ জন্ এস. কেইন এবং মিঃ দাদাভাই নৌরজি। ভারতের পক্ষে সাক্ষ্য দানের জন্য বাংলাদেশ থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানান হয়। ভারতবর্ষ থেকে আর যাদের ডাকা হয় তারা হলেন, বোম্বে থেকে মিঃ গোখেল ও মিসেস্ ওয়াচা এবং মাদ্রাজ থেকে মিঃ জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার।

আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে মনস্থির করে আমি আমার পরীক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার কাজে লেগে গেলাম। এ বিষয়ে বাংলার সচীবালয় এবং তদানীন্তন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত স্বর্গীয় স্যার হার্বার্ট রিসলের কাছে থেকে যে সাহায্য পেয়েছি তা অবশ্য সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করতে হয়। আমার মনে হয়, লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্নর স্যার আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জির মনে একটা সন্দেহ ছিল যে আর্থিক ব্যয় ভূষণ সম্পর্কে কঠোর জেরার সামনে আমি দাঁড়াতে পারব কিনা। আমি কিন্তু স্থির সঙ্কল্প হয়ে যতদূর সম্ভব ভালভাবে কাজ করার জন্য মনকে প্রস্তুত করলাম; এবং আমি মনে করি, আমার কাজ আদৌ মোটেই খারাপ করিনি। আমি প্রাদেশিক ক্ষেত্রের আর্থিক বিলি-ব্যবস্থা ও কন্ট্রাক্টের পদ্ধতি খুব বড় সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে নিলাম। এই কাজে যে শ্রম আমি দিয়েছি, যে কষ্ট আমি স্বীকার করে নিয়েছি, পরবর্তীকালে তা আমাকে লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের মেম্বারের কাজে খুব সহায়তা করেছে।

যে মাসের গোড়ার দিকে লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে জানলাম যে আমার অন্যান্য বন্ধুদের সাক্ষ্য দান আগেই হয়ে গেছে। কমিশনের কাছে পেশ করার জন্য এক স্মারক প্রতিবেদন আমাকে প্রস্তুত করতে হয়েছিল। এই প্রতিবেদনের উপরই আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে আমার পনেরো দিন সময় লেগেছিল। এ কাজটি খুব কঠিন এবং ক্লান্তি-করও ছিল। এই সময় সকালের খাবার খেয়ে বেলা ১০টার কাজে লেগে যেতাম আর বিকেল ৫টার কাজ বন্ধ করতাম। মাঝখানে জল-খাবার খাওয়ার জন্য অল্প কিছুটা সময় ব্যয় করতাম। প্রায় সময়ই আমার নিজের ঘরে বসেই জল-খাবার খেয়ে নিতাম। অন্যান্য ভারতীয় সাক্ষ্যদানকারীদের সঙ্গে একত্রে আমার প্রতি-বেদনটি কংগ্রেসের ব্লু-বুকরূপে একখানি আলাদা বইয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটি কর্তৃক মুদ্রিত হয়।

এটাও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়টি মিঃ দাদাভাই নৌরজি নিজে কমিশনের একজন মেম্বার হয়েও কমিশনের সামনে সাক্ষ্যদান করেন এবং জেরার সম্মুখীন হন।

আমার সওয়াল জবাব চলে সম্পূর্ণ একটা দিন ধরে। সকাল ১১টায় তা আরম্ভ হয়, আর শেষ হয় বিকেল প্রায় ৪টায়। মাঝখানে লাঞ্চের জন্য কিছু সময়ের বিরতি ছিল। কমিশনের এবং ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলের মেম্বার স্যার লুইসপীল আমাকে কঠোর ভাবে জেরা করেন। তার জেরার বিষয় ছিল আমি আমার সাক্ষ্যের যে অংশে আরও বেশী করে ভারতীয়দের উচ্চ সরকারী কর্মে নিয়োগের বিষয় উত্থাপন করেছি, সেই অংশ নিয়ে। "তুমি কি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্টটি পড়েছ?" তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি উত্তর দিলাম, "ভাল করেই আগাগোড়া পড়েছি।" আমার মনে হয় এই জবাব দিয়ে আমি তাঁর উপরে একহাত নিতে পেরে-ছিলাম। আমি বিশেষ ভাবে আপত্তি জানিয়েছিলাম শিক্ষা বিভাগের চাকরীতে উচ্চতর পদে আমাদের

দেশবাসীকে কায়দামত ঘায়েল করার কিকিরে। মিঃ মোরেল আমার পরওয়ানা তদারকের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমার জবাবগুলি শুনে মন্তব্য করলেন, "চমৎকার হয়েছে।"

আমার ডেমার পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরক্ষণেই আমি একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করতে যাই। সেখানে স্যার চার্লস ইলিয়টের সঙ্গে আমার দেখা হল। তিনি হৃদ্যতার সঙ্গে আমার সহিত করমর্দন করলেন এবং আমাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর সঙ্গে আমার অনেক বিষয়ে মত পার্থক্য থাকলেও আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং তা ১৯০৯ সাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৯০৯ সালে আমি যখন ইম্পেরিয়াল প্রেস কনফারেন্সের একজন ডেলিগেট হিসাবে ইংল্যাণ্ডে যাই, তখন তিনি আমাকে একখানা পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি আমাকে অরাজকতাবাদী অপরাধীদের প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নেই বলে এক ঘোষণা করতে বলেন। তাঁর প্রতিদানে তিনি আমাকে তাঁর আতিথ্যগ্রহণ দান করে আমাকে সম্মানিত করতে চান। এই অদ্ভুত পত্রখানা আমি স্যার হেনরি কটনসহ অন্য বন্ধুকে দেখিয়েছি। এই পত্রকে আমি কোন আমলই দেইনি এর কোন জবাবও আমি দেইনি। কিন্তু এই সামান্য অক্ষর কালিমা আমাদের সম্পর্কেও আক্ষুণ্ণ করে ফেললেও তখনই তা প্রকাশ পায়নি। তখনও পর্যন্ত আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল এবং পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে খুশীই হতাম।

লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে এই সময় কালকাটা মিউনিসিপ্যাল বিল নিয়ে আলোচনা চলছিল এবং আমার সঙ্গে তাঁর এ বিষয় নিয়ে কথাবার্তাও হয়। স্যার চার্লস্ ইলিয়ট তো আদৌ লোকাল সেল্ফ্ গভর্নমেন্টের বন্ধু ছিলেন না। কিন্তু দেখলাম ইংল্যাণ্ডের স্বাধীন পরিবেশের মধ্যে এবং লোকাল সেল্ফ্ গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্রবে আসার ফলে তাঁর মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি লণ্ডন স্কুল বোর্ডের একজন মেম্বার ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, "ইংল্যাণ্ডে এই সমস্ত কাজ কিভাবে চলছে তা আমি এখন দেখতে পাচ্ছি। তাই আমি এখন তোমাদের কর্পোরেশন সম্পর্কে আগের চেয়ে বেশী করে ভাবছি।" ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল বিলে যে সমস্ত কমমূখীন ও ফলপ্রদ পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার প্রতি কোন সহানুভূতি তাঁর ছিল না। তবে ঐ দিকে তাঁর একটা মানসিক ঝোঁক ছিল। এবং যদি তাঁর ক্ষমতা থাকত তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করতেন।

কমিশনে সাক্ষ্যদান কাজ শেষ হয়ে গেলে, ভারতে ফেরার আগে, আমার হাতে কিছুটা সময় ছিল। এই সময়টা দেশবাসীর কাজে লাগানোর স্থানে স্থানে ভারতীয় সমস্যার উপর কয়েক সভায় বক্তৃতা করে। স্যার হেনরি কটনের নির্বাচন কেন্দ্র সাউথল্যাম্পটনে আমরা বেশ সাফল্যের সঙ্গে একটা সভা করলাম। মিঃ দাদাভাই নৌরজি সেই সভায় উপস্থিত থেকে বক্তৃতা করেন।

ভারতের ব্যাপার নিয়ে স্যার হেনরী কটনের সঙ্গে বেশ মজার কথাবার্তা হয়। আমাদের দেশীয় লোকদের সরকারী চাকরীতে নিয়োগের বিষয় নিয়ে এই কথা। এখন আর তিনি কোন দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কাজে নিযুক্ত না থাকায় সম্পূর্ণ সহজ ও খোলা মনেই বলে ফেললেন, "আমরা রাজনৈতিক কারণেই একই সময়ে সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষাগুলি নেওয়ার বিরোধী।" আমি বললাম, "আমার মনে হয়, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে তোমাদের দ্বিধা কেন, তা আমি বুঝতে পারছি; কিন্তু যাকে ইম্পিরিয়াল সার্ভিস বলা হয়, তা একই সময়ে নিতে তোমাদের আপত্তি কেন? সেখানে তো কোন রাজনৈতিক কারণ নেই?" তিনি এ কথার কোন জবাব দিতে পারলেন না। আমি আমার প্রশ্নের সূত্র ধরেই মন্তব্য করলাম, "স্যার হেনরী, তুমি যখন আমার রাষ্ট্রের সচিব হবে তখন আমাদের এই অভিমত সম্বলিত এক আবেদন পত্র গ্রহণ করার জন্য তোমাকে, অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে।" এর পরে আমরা দু-জনেই খোলা প্রাণে হাসতে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

(চলবে)

(Contd. from 2nd cover)

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Dist—HOWRAH (BURDWAN Distt.)		
Chowdhury Smt. Basana w/o Late Ramesh Chowdhury	C/o Umesh Dutta Chowdhurp Street No. 72, Qr. No. 22/8 P. O Chittaranjan (Burdwan Diss) & P. O Santragachi, Dharsa House of Sital Das (Howrah Distt.)	100	1. 10. 76
	Dist—24-PARGANAS		
Banik Smt. Ashalata w/o Rajeswar Banik	Vill Ramkrishnapur (Kadamtala) P. O. Natagarh	200	1. 5. 78
Bose Provash Chandra alias Santosh	Vill East Kodalia P. O. New Barrackpur	200	28. 3 74
Chakraborty Smt. Radharani w/o Late Kalipada Chakraborty	40, Chakdah Govt. Colony P. O. Purbaputiary	150	2 1. 78
Chowdhury Smt Sadhana w/o Late ukumar Chowdhuty	118, Viveknagar	150	1. 10. 78
Das Ananta Kumar	Sendanga Colony Via Kalyangarh	200	28. 3. 74
Das Kamala Rani w/o Late Aswini Kumar Das	Kodalia No. 7 Gate	100	1. 10. 7?
	Dist—HOOGHLY		
Das Smt Mahabilata w/o Late Tarknath Das	P. O. & Vill Zamindar Serampore	100	10. 10 78
Dutta Smt. Radharani w/o Late Gourchandra alias Gour Mohan Dutta	P. O. & Dist. Shambazar P. S. Goghat	100	15. 8 72
Sanyal Amiya Ballav	Sailabar, Mankundu Station Rd. P. O. Chandernapur	200	2. 4. 78
Sarker Smt. Mayarani w/o Late Rebati Mohan Sarkar	115, Rishi Bankim Avenue P O. Bhadreswar	200	15. 8. 72

RgedNo. R. N .24911/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

c/3c

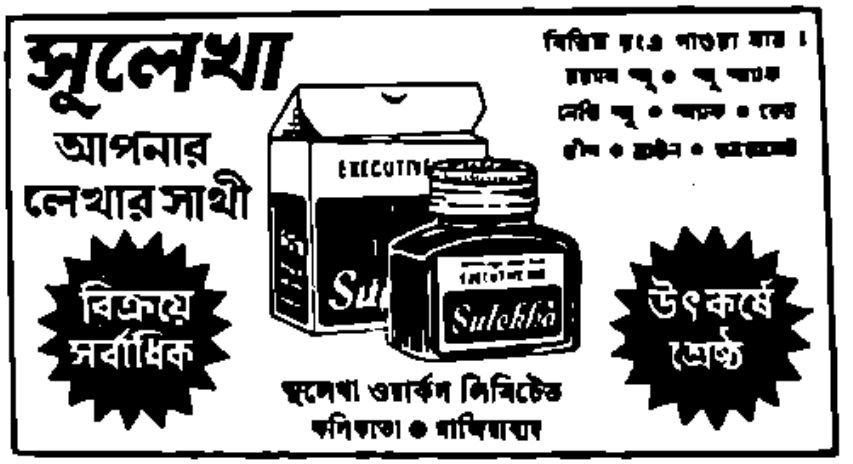

20 DEC 1979

CENTRAL LIBRARY

REGISTERED

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুলিন চ্যাটার্জী, শ্রীবারীণ রায়।
সম্পাদক—শ্রীশান্তি পদ রায়চৌধুরী
বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতার—শ্রীমদনগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীদীপ্তি গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বন্ধুদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

বিপ্লবী বাঙালী

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭৯

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ১১ই ফাল্গুন, ১৩৮৫ ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯	১৯ সংখ্যা

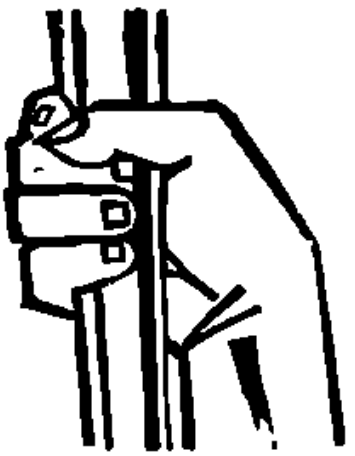

এই সংখ্যায়

ধর্মঘট ও জনস্বার্থ

। সম্পাদকীয় ।

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু

। ব্রজেন দাস ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক মনিমোহন ঘোষ ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। ক্ষীরোদ দত্ত ।

দলীয়স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থা বানচাল

। শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

যদি তোর ডাক শুনে
কেউ না আসে
তবে একলা চলোরে
—রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদকীয়—

ধর্মঘট ও জনস্বার্থ

পশ্চিম বাংলায় আবার ধর্মঘটের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। অবশ্য এই প্রবাহের উৎসমুখ এখানেই ছিল। জরুরী অবস্থাও সমস্ত কিছুটা স্তিমিত ছিল মাত্র।

ধর্মঘটের প্রবক্তা রাজনৈতিক দলগুলির হাতেই এখন ক্ষমতা রয়েছে। বিরোধী দলে থেকে যত দায়িত্বহীন উক্তি ও কাজ করা যায়, ক্ষমতাসীন হলে আর সেটা করা সম্ভব হয় না। এমন কি অনেকক্ষেত্রে তাদেরই প্রচারিত অনেক নীতিকেও বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য একটা আপোষ মীমাংসাও করে নিতে হয়, কারণ তা না হলে প্রশাসনযন্ত্র অচল হয়ে পড়ে। এই অবস্থাটাকে মনে হয় কোন কোন মন্ত্রী এখন বুঝতে পারছেন। তাদের সাম্প্রতিক কয়েকটী উক্তিও এই সত্য প্রতিফলিত করছে।

ধর্মঘট শ্রমিক ও কর্মচারীদের দাবী আদায়ের জন্য একটি বিশেষ হাতিয়ার, সে বিষয়ে কোন মত পার্থক্য নেই। কিন্তু এই অস্ত্র ব্যবহারের স্থান, কাল ও পদ্ধতি নিয়ে মতপার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। জনজীবনে কয়েকটী অত্যাবশ্যকীয় বিভাগ আছে; যেখানে ধর্মঘট ত দূরের কথা, সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি, কর্তব্য কর্মে গাফিলতি ও কাজকর্ম বন্ধ করলে জনজীবন বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। এই সব বিভাগের মধ্যে প্রাধান্য দিতে হয় পানীয় জল সরবরাহ বিভাগ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনবিভাগ ও চিকিৎসা ও হাসপাতাল বিভাগ গুলিকে। যে সব কারণে, সম্প্রতি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল বিভাগে ধর্মঘট করা হয়েছে, সেগুলি অত্যন্ত দুর্বল এবং ধর্মঘট না করেই অন্যভাবে সমস্যাগুলির সমাধান করা সম্ভব ছিল। সম্প্রতি বরানগরে একটি হাসপাতাল উদ্বোধন করতে গিয়ে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে এ কথা বলতে হয়েছে যে হাসপাতাল আর কারখানা এক নয়। কলকারখানায় যে ভাবে বিক্ষোভ দেখানো যায়, কোনও হাসপাতালে সেভাবে বিক্ষোভ দেখানো অন্যায়। হাসপাতালে কথায় কথায় ধর্মঘট করাও অত্যন্ত অন্যায়। সরকার হাসপাতাল-গুলি খুলেছেন রোগীর চিকিৎসার জন্য। সেই হাসপাতালে সব চেয়ে আগে দেখতে হবে রোগীর স্বার্থ। পরিস্থিতির সঠিক সমীক্ষা তারা করেছেন, কিন্তু এই অবস্থার প্রতিবিধান কি করবেন তা খুলে বলেন নি। আমরা বুঝি "চলবে না, চলবে না" রাজনীতিকে এতদিন প্রশ্রয় দিয়ে হঠাৎ কেন কিছু শক্ত ব্যবস্থা নেওয়া একটু কঠিন। কিন্তু গড্ডালিকা প্রবাহকে চলতে দেওয়ারই বা কি যুক্তি আছে? তারা অবশ্য বলেছেন যে কোন সমস্যা উদ্ভূত হলে, ধর্মঘট না করে, টেবিলে বসে তার মীমাংসা করা যায়, বিশেষ করে বর্তমান সরকার যখন তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ধর্মঘট অস্ত্র প্রয়োগ করার যুক্তি থাকে তখনই, যখন অন্য সব পন্থা অবলম্বন করেও সমস্যার মীমাংসা হয় না। ধর্মঘট কর্মীদের হাতে ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। সুতরাং এর প্রয়োগ হতে পারে শেষ অস্ত্র হিসাবে। দুর্ভাগ্যজনক এই দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালিত করা হয়েছে খেয়ালখুসীমত এবং দলীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করতে। সব সময় শ্রমিকদের স্বার্থের কথা ভাবা হয়না, জনস্বার্থ ত দূরের কথা। কিন্তু কথামত

বর্ষণ করেই কি অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে? সরকার কি আইন প্রণয়ন করে দিতে পারবেন যে অত্যাবশ্যকীয় বিভাগে ধর্মঘট বে-আইনী এবং সব পন্থা শেষ না করে কেউ ধর্মঘট ডাকতে পারবেন না এবং সে কাজ করলে আইন অনুসারে দণ্ড ভোগ করতে হবে সংশ্লিষ্ট সকলকেই? এমন কি ধর্মঘট ডাক দেবেন যে সব প্রতিষ্ঠান, তাদেরও বে-আইনী ঘোষণা করা হবে?

সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে স্বার্থহীন ভাষায় বলতে হবে যে অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। হাসপাতালে রোগীদের সেবা করব না, তাদের খাদ্যের অংশ গ্রহণ করব, বিনা টিপ্‌সে কোন কাজ করব না, ধর্মঘটের ফলে বহু রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে জেনেও সামান্য অজুহাতে সব ব্যবস্থা অচল করে দেব, এই অসঙ্গত ব্যবহার আর কতদিন সহ্য করবেন সরকার? এদের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে যদি কোন রোগীর মৃত্যু হয়, তবে নরহত্যার অপরাধে এদের বিচার হবে না কেন? হাসপাতাল থেকে যাদের সহায়তায় রোগীর খাদ্য, পথ্য, ঔষধ চুরি হয়, দলীয় প্রশ্রয় কি তাদের দিয়েই যাওয়া হবে? যারা এতদিন শ্রেণী বিশেষের স্বার্থে জনস্বার্থকে উপেক্ষা করে কর্মীদের প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন, জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে, এদের সংযত করা একটু শক্ত মনে হতে পারে। কিন্তু মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থে, অগণিত মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হবে নির্বিবাদে এবং কোন প্রতিকার করা হবে না, এই কি সরকারের নীতি হবে?

কলকারখানায় ধর্মঘটের ফলে অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ছে। একমাত্র জুটমিলে ধর্মঘটের ফলে দৈনিক প্রায় দু-কোটী টাকা লোকসান হচ্ছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও ধর্মঘটের হুমকী দেওয়া হচ্ছে। আবার কি পশ্চিমবাংলায় সেই অবস্থা সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে, যখন কলকারখানা স্থানান্তরিত হবে, মূলধন বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যাবে? দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বানচাল করতে দিলে, দেশের মানুষ বাঁচবে কি করে? এই সহজ সত্য উপলব্ধি করার মত মস্তিষ্কে ধূসর পদার্থের কি অভাব ঘটেছে? আমরা একথা কখনই বলব না যে ধর্মঘটকারীরাই সব অনর্থের মূল, অন্যপক্ষীয়রা ধোয়া তুলসীপাতা। কিন্তু সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে এমন সবল নীতি গ্রহণ করে, যাতে জনস্বার্থও বিপন্ন না হয়, কর্মীদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থও রক্ষিত হয়।

জনমতের দরবারে আবারও দাঁড়াতে হবে জনপ্রতিনিধিদের, কি কৈফিয়ৎ তখন থাকবে? আত্মহত্যা করতে কৃতসঙ্কল্প না হলে, এ অবস্থার আশু প্রতিবিধান করতেই হবে। অন্যথায় দেশের সে দিন হবে ভয়ঙ্কর।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় ভুলক্রমে অনুশীলন সমিতির জন্মদিবস ২১শে ফেব্রুয়ারী লেখা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে জন্মদিনটী ছিল ১৯০২ সালের মার্চ মাস দোলের দিন। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। —সম্পাদক

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু

॥ ব্রজেন দাস ॥

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারীর জীবনী ও বিপ্লবী কার্য্যাবলী ভিত্তি করে বহু পুস্তক ও রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত পুস্তক অবলম্বনে এই মহানায়কের বিপ্লবী বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন প্রয়াসের প্রচেষ্টাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

এই দেশে রাসবিহারীর মত একজন লোকের আবির্ভাব বিস্ময়কর। এমন দুর্দম প্রকৃতি যা এতটুকু নোয়াতে পারে নি, এমন উগ্র পুরুষকার যা সকল বিঘ্ন উপেক্ষা করে নিজেকে অব্যাহত রেখেছে, এমন উন্নত শির যা কখনও ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্য্যের নিকট অবনত হয় নি, এমন উৎকট বেগবতী ইচ্ছা যা সর্ববিধ দুর্বলতা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছে, পরাধীন ভারতে এমন একটি মানুষের আবির্ভাব ঐতিহাসিক ঘটনা। এই মহানায়ককে বাদ দিয়ে এবং তাঁর বিপ্লব প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে ভারতবর্ষের কোন ইতিহাস রচিত হতে পারে না: অথচ স্বাধীন ভারতেও রাসবিহারীর অবদান ঐতিহাসিকদের ও সরকারের দৃষ্টিগোচরে তেমনভাবে এসেছে বলে মনে হয় না। এটা অত্যন্ত দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়, জাতির বৈপ্লবিক সাধনার প্রতি পদাঘাত।

১৯৪৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী রাসবিহারী বসুর মহাপ্রয়াণ। জন্মেছিলেন ১৮৮৬ সালের ২৫শে মে বর্দ্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে। শৈশবেই মাতৃহারা হন। চন্দননগরে বাল্যজীবন ও কৈশোর কাটে। বালক রাসবিহারী চন্দননগরে ডুপ্লে কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু অদম্য দেশপ্রীতির জন্য কলেজ থেকে বিতাড়িত হন এবং কলকাতায় এসে একটি স্কুলে ভর্তি হন। ১৯০৫ সালে সিমলায় পিতার অফিসে চাকরী গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালে দেরাদুনে ফরেষ্ট অফিসে বড়বাবুর চাকরী পেলেন এবং বিদেশী সাহেবদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দিতেন, তখন রাসবিহারীর বয়স মাত্র ২০। রাসবিহারী বসুর ছাত্রজীবনে বিশেষ মেধার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু রাসবিহারী বহু ভারতীয় ও বিদেশী ভাষা ঐ ভাষাভাষী লোকেদের মত বলতে পারতেন। জাপানে যাওয়ার জন্য ছদ্মনামে পাসপোর্ট সংগ্রহের সময় অভ্যর্থনা অফিসার ফরাসী মহিলার সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কথা বলে মহিলাকে মুগ্ধ করেছিলেন এবং কাজ হাসিল হয়েছিল। ভারতের যে কোন ভাষায় কথা বলতে রাসবিহারী বসুর কোন প্রকার অসুবিধা হত না। এই অদ্ভুত ক্ষমতা কি করে আয়ত্ত করলেন? তা রাসবিহারীর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল, এটা তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

দেরাদুনে যেয়েই লালা হরদয়াল ও জীতেন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসেন, পরে চন্দননগরের মতিলাল রায় ও অনুশীলন নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। কোন দলই রাসবিহারীকে দলভুক্ত করার চেষ্টা করে নি। রাসবিহারী নিজের প্রচেষ্টায়ই দল খুঁজে নিয়েছেন এবং দলের কর্মীরা রাসবিহারীকে নেতৃত্বে বরণ করে নিয়েছে। রাসবিহারীর নেতৃত্বেই অনুশীলন সর্বভারতীয় সংস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং বিভিন্ন

নামে অনুশীলনের শাখা দুনিয়ার সর্বত্র বিশেষ করে ইউরোপে ও আমেরিকায় বিস্তার লাভ করে। নেতৃত্ব দেওয়ার মত বৈশিষ্ট্য রাসবিহারীর ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

১৯১২ সালের ১২শে ডিসেম্বর নতুন রাজধানী দিল্লীতে রাজকীয় প্রবেশের দিন ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করে রাসবিহারী অতি নিপুণ রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। ইংরেজ প্রশাসনের দাম্ভিকতা চূর্ণ হয়েছিল, সাময়িকভাবে ঝিমিয়ে পড়া বিপ্লবী শক্তির নূতনভাবে স্ফুরণের উৎস সৃষ্টি হয়েছিল।

ইংরেজ সরকারকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য রাস-বিহারী বসু দেরাদুনে রাজকর্মচারীদের সভায় লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের নিন্দাসূচক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা শুনে গোয়েন্দা দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী সুশীল ঘোষ তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য রাসবিহারীকে দীর্ঘ দিনের ছুটি দিয়ে বাংলায় পাঠায়। এই সময় প্রফুলচন্দ্র গাঙ্গুলী ও রাসবিহারী বসু কলিকাতায় একত্র বাস করতেন। প্রফুলচন্দ্র গাঙ্গুলী তখন বহুবিশাল ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী। দলের নেতৃস্থানীয়দের নিকট গোয়েন্দা বিভাগের খবর সংগ্রহ করে দলকে অভ্যুত্থানের কাজে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্যকরে, নিজের নিরাপত্তার সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করা প্রভৃতি সকল দিক লক্ষ্য করে চলার কৃতিত্ব কেবলমাত্র রাসবিহারীর চরিত্রেই দেখা যায়। দলের কর্মীদের রাসবিহারীর নেতৃত্বে ও কর্মক্ষমতায় অগাধ আস্থা থাকার দরুণ সেই যুগেও অনুশীলন নেতৃত্ব গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে রাসবিহারীর যোগাযোগ সুনিপুণ হাতে একটি বিপ্লবী কৌশল মনে করতেন, রাসবিহারীর মধ্যে দুর্বলতার কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে না নেতৃত্বের স্থির সিদ্ধান্ত ছিল। গোয়েন্দা হেড অফিসে খবর পৌঁছাবার আগেই রাসবিহারী গোয়েন্দা বিভাগের কার্যকলাপ জানার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই হেতু রাসবিহারী হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ পরি-কল্পনার নেতা দলের লোক দীননাথের বিশ্বাসঘাত-কতায় গোয়েন্দা হেড অফিস জানার আগেই রাস-বিহারী জানতে পারেন এবং এমন ভাবে গা ঢাকা দিলেন গোয়েন্দা সুশীল ঘোষ ও তার বিভাগ রাস-বিহারীর কোন পাত্তা পেল না। রাসবিহারী সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে অভ্যুত্থানের আয়োজনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করলেন।

প্রথম সারির বিপ্লবী নেতারা প্রায় সকলেই গ্রেপ্তার হলেন কিন্তু রাসবিহারীকে গ্রেপ্তার করার জন্য ইংরেজ সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ ও প্রভূত অর্থব্যয় এবং প্রলোভন দেওয়া সত্ত্বেও সমর্থ হয় নি। কখনও কাবুলিওয়ালা, কখনও পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী, কখনও রাজস্থানী জমিদার, কখনও সরকারী কর্মচারীর পত্নী, কখনও রেলওয়ে কুলি, কখনও জমাদার, কখনও পূজারী ব্রাহ্মণরূপে রাসবিহারী সকল উত্তর ভারত পর্যটন করে অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যে সংগঠন গড়ে তুললেন। পুলিশ সঠিক খবর পেয়ে রাসবিহারী বসু জেনেই গ্রেপ্তার করাতে রাসবিহারীর পোষাক পরিচ্ছদ দেখে এবং কথা শুনে এতটুকু সন্দেহের উদ্রেক না হওয়ায় ছেড়ে দিয়েছে এমন ঘটনাও ঘটেছে। এইভাবে বৈপ্লবিক জীবন রক্ষাকরে রাসবিহারী যে শিল্পীর ও নাট্যকারের এবং উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তা যে কোন দেশে বিরল। কেবলমাত্র মহামতি লেনিনের পলাতক জীবনের ছদ্মবেশ সম্বন্ধে প্রচলিত কিম্বদন্তীর সঙ্গে তুলনা করা যায়।

লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ পরিকল্পনার

বসন্ত বিশ্বাসকে সংগ্রহ করা, তাঁকে বোমা নিক্ষেপ শিক্ষা দেওয়া, বোমা সংগ্রহ করা, বিশ্বস্ত সরকারী কর্মচারীরূপে নিজের জন্য একটি পরিচয় পত্র সংগ্রহ করা, বোমা নিক্ষেপ সম্পন্ন করে বসন্ত বিশ্বাসকে লাহোরগামী গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে নিজে দেরাদুনে চলে আসা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অদ্ভুত উপস্থিত বুদ্ধি ও বৈপ্লবিক নির্বিকার চিত্তের পরিচয় দিয়েছেন রাসবিহারী বসু। ভারতে বহু বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছে কিন্তু এমন সুনিপুণ সুষ্ঠু সমাধান হয়েছে বলে জানা যায় না।

২১শে ফেব্রুয়ারী ইতিহাসের অনেক স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেরও একটি স্মরণীয় দিন। ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ইংরেজের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল সারা ব্রিটিশ ভারত। ভারতীয় সৈন্যরা, ভারতের ও বিদেশের ভারতীয় বিপ্লবীরা একত্রে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের জন্য সামিল হয়েছিল। ভারতের জনগণের ইংরেজের বিরুদ্ধে এই আপোষ-হীন বিক্ষোভ ধ্বংস করার জন্য নির্মম অত্যাচার করে ইংরেজ প্রশাসন। এই দিনটী এখনও সারা ভারতে স্বাধীনতার প্রথম দীপশিখারূপে উদ্‌যাপন করার ব্যবস্থা হয় না কেন? স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এই দাবী তুলে না কেন? মুখর হয় না কেন? অথচ ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টায় বিশেষ প্রধান স্থান অধিকার করেছে এই দিনটি। হিন্দু, মোসলমান, শিখ ও অন্যান্য সকলের রক্তস্রোত বহু জীবন অর্ঘ্য দিয়ে তর্পণ করেছিল ভারতমাতার বেদীমূলে এই দিনটির প্রস্তুতির জন্য গড়ে উঠেছিল সর্বধর্ম ও সকল জাতির মিলনসূত্র। মোসলমান ও শিখ সৈন্যরা সিঙ্গাপুর ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এক সপ্তাহ নিজেদের শাসন কায়েম রাখে। এই অভ্যুত্থানে ৭০ জন সম্ভ্রমসমরে আত্মাহুতি দেয় সারা ভারতে, ১০০ জনের বেশী ফাঁসি হয়, কয়েক শত বিপ্লবীর দীর্ঘ কালের কারাদণ্ড হয়।

রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল এই অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি। পেশোয়ার হতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ২৯টি মিলিটারী ক্যানটনমেন্টের সৈন্যবাহিনী এবং বাংলাদেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থানের বিপ্লবীরা অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীরা এই অভ্যুত্থান সফল করার জন্য এগিয়ে এসেছিল, বিভিন্ন ভাবে, সমুদ্র পথে, হাঁটাপথে দলে দলে লোক বিপ্লব প্রচেষ্টায় সামিল হয়েছিল। ভারতের মত বিরাট দেশে এবং সারা পৃথিবীব্যাপি বিপ্লবী সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাসবিহারী বসু। প্রথম সারির বিপ্লবী নেতারা প্রায় সকলেই গ্রেপ্তার হয়ে যান, কিন্তু রাসবিহারী বসুকে জীবিত ও মৃত যে অবস্থাতেই হউক না কেন ধরার জন্য ইংরেজ সর্বশক্তি নিয়োগ করলেও রাসবিহারীকে গ্রেপ্তার করতে ইংরেজ সরকার ব্যর্থ হয়। রাসবিহারী ইংরেজ প্রশাসনের মধ্যে থেকেই ইংরেজ রাজত্ব উচ্ছেদ করার জন্য এই বিরাট সংগঠন প্রস্তুত করেন। পৃথিবীর কোন বিপ্লবীর জীবনে এই ধরণের প্রচেষ্টা হয়েছে কিনা সন্দেহ। দলের লোকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সারা ভারতব্যাপি গণঅভ্যুত্থান সফল না হলেও রাসবিহারী ভেঙ্গে পড়েন নাই, রাসবিহারী ঘুরে ঘুরে সমস্ত ঘাঁটিতে এই অবস্থায় কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে পরবর্তী কর্মপন্থার উদ্দেশ্যে ১৯১৫ সালের ১২ই মে ইংরেজ প্রশাসন থেকেই ছদ্মনামে পাসপোর্ট সংগ্রহ করে গোপনে জাপান চলে যান। জাপান থেকেই

পলাতক অবস্থায় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

১৯১৮ সালের প্রথম দিকে বৈপ্লবিক কাজের সুবিধার জন্য তোষিকার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯১৮ সালে রাসবিহারীর বিবাহের কিছু-কাল পরে সমাপ্ত হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৪ সালের মে মাস হতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত রাস-বিহারী জাপানে পলাতক থেকে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের প্রস্তুতি চালিয়েছেন। পূর্ব এশিয়ার দুই মহান নেতা মহাচীনের মহানায়ক সানইয়াৎ সেন, জাপানের ব্ল্যাক ড্রাগন সমিতির নেতা ওয়ামা প্রমুখ অকুণ্ঠিত চিত্তে রাসবিহারীকে এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামের অগ্রপথিকরূপে গ্রহণ করেন। সাম্রাজ্য-বাদ থেকে মুক্ত করতে হবে এশিয়া, ভারতকে মুক্ত করতে হবে ইংরেজ তাড়িয়ে, ভারতের মুক্তি বিশ্বের মুক্তি রাসবিহারী এই চিন্তাধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে লেখক ও শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রথমে হন টোকির অন্তর্গত কোবুচিকান বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষার শিক্ষক, পরে টোকিও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এশীয় ঐক্য ও বিশ্বমৈত্রী বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে প্রভূত সাড়া পান। ইংরেজী ও জাপানী ভাষায় ভারতের মুক্তি—এশিয়ার মুক্তি—মানবের মুক্তি এই মর্মকথা প্রচারে উদ্যোগী হন। বহু গ্রন্থ রচনা করেন এবং সমগ্র পূর্ব এশিয়াতে মুক্তি আন্দোলনের সংগঠন শুরু করেন। এমন সময় ১৯২৩ সালে জাপান সরকার রাসবিহারীকে জাপানী নাগরিকরূপে গ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রী তোষিকা নিশ্চিত সুখী জীবন যাপন করার আশায় উৎফুল্ল হলেন। বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ ৫ বৎসর স্বামীর বিপদের কথা চিন্তা থেকে মুক্ত হলেন ভাবলেন। কিন্তু মাত্র এক বৎসর পরই ১৯২৪ সনে একটী শিশু পুত্র ও একটী শিশু কন্যার ভার রাসবিহারীর উপর অর্পণ করে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

রাসবিহারীর স্ত্রী তোষিকার ত্যাগ ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। তোষিকার পাঠ্যাবস্থা, বয়স মাত্র ১৮ বৎসর। রাসবিহারী একজন বিপ্লবী, তাঁর জীবন যে কোন মুহূর্তে শত্রু কূল হতে পারে ইংরেজের হাতে পড়লে ফাঁসি নিশ্চিত এই সমস্ত বিপদ জানিয়াও সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য এবং এশিয়ার মুক্তির জন্য রাসবিহারীকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তোষিকা, নিজের সুখ-ভোগের প্রতি সামান্যতম আকর্ষণ উপেক্ষা করে বিবাহিত জীবনের প্রায় ছয় বৎসর এই দায়িত্ব পালন করে স্বামীকে এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামের অগ্রপথিক-রূপে প্রতিষ্ঠিত করে ইহলোক ত্যাগ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই মহিয়সী মহিলার অবদানকে স্বীকৃতি দিতে হবে। বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে তোষিকার স্থান নগণ্য নয়—এই সত্য তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য, এড়িয়ে চললে স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাসে খুঁত থাকবে।

স্ত্রীর মৃত্যুতে রাসবিহারী বসু কর্মসাগর হতে বিচ্যুত হলেন না। শিশু কন্যা ও পুত্রের দায়িত্ব ওদের দাদু-দিদিমার (সোমা দম্পতি) উপর অর্পণ করে এগিয়ে চললেন ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টায়। ১৯১৪ সালে স্থাপন করলেন ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ। জাপান, ভারত, চীন, আফগানিস্থান, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে ১৯২৬ সালের ১লা আগষ্ট নাগাসাকিতে All Asia people's organisation গঠন করার

উদ্দেশ্যে সভা করলেন। এই সংস্থার শাখা স্থাপন করলেন পিকিং, সাংহাই, ফরমোসা, কোরিয়া, টোকিয়া, ইয়াকোহামা নাগাসাকি, হিরোসিমা, ব্যাঙ্কক, জাভা, বালি, সুমাত্রা, হংকং প্রভৃতি স্থানে। ১৯৩৩ সালে গড়ে তুললেন ভারত জাপান মৈত্রী সমিতি এবং এশিয়ার বিপ্লবী ছাত্রদের সমবেত করে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য স্থাপন করলেন টোকিওতে "ভিলা-এশিয়ানদ"। ১৯৩৭ সালের ১৮শে অক্টোবর টোকিয়োর সাংকাইডোতে নিখিল এশিয় যুব সম্মেলনে রাসবিহারী ভাষণ দিলেন "এশিয়াবাসীর জন্য এশিয়া, সাদা মানুষ ফিরে যাও"। এই বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা দিলেন। সারা পূর্ব এশিয়ায় চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি সকলে আগ্রাসী পাশ্চাত্য দেশগুলি হতে শোষণমুক্ত করার জন্য আন্দোলন জোরদার হল।

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বেধে গেল। রাসবিহারী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে জানালেন পূর্ব এশিয়ার বৈপ্লবীক সম্ভাবনার কথা এবং জাপানকে এ্যাংলো আমেরিকান শক্তির বিরুদ্ধে যোগদান করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন। রাসবিহারীর প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হল। জাপান ১৯৪১ সালের শেষের দিকে এ্যাংলো আমেরিকান শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর জাপানী নৌবহর আমেরিকান নৌবহরকে পর্যুদস্ত করে পার্লহারবার আক্রমণ করে। রাসবিহারী Indian Independent League-এর সভাপতিরূপে জাপানী সামরিক বিভাগের সঙ্গে পূর্ব এশিয়াবাসী ভারতীয়দের মিত্র রাষ্ট্রের নাগরিক গণ্য করার জন্য চুক্তি করলেন এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে টোকিয়োতে জাপানবাসী ভারতীয়দের সভা ডেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য গঠন করলেন "আজাদ হিন্দ্ ফৌজ", নিজের একমাত্র পুত্র মাসাহিদে বসুকে সুদক্ষ বৈমানিক হয়ে সমর মত ভারতের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করার জন্য জাপানী বিমান বহরে ভর্তি করে দিলেন। পিতার আশা পূরণ করার জন্য অল্প সময়ের মধ্যেই মাসিদা সামরিক বিমান বহরের অফিসার হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে পৌছেই জার্মান সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে "আজাদ হিন্দ্ ফৌজ" গড়ে তুললেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল রাসবিহারী বসুর আই, এন, এ, যখন পূর্বদিক হতে ভারতে প্রবেশ করবে, জার্মানীতে গঠিত আই, এন, এ, ভারতে প্রবেশ করবে পশ্চিম-দিক থেকে। এই উদ্দেশ্যে আই, এন, এ, আফ্রিকা পর্যন্ত এসেছিল জার্মান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে।

১৯৪১ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব এশিয়াতে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ প্রতিষ্ঠার সময় রাসবিহারী বসুর ভাষণ বিশ্বের দিকে দিকে প্রচারিত হল। রাসবিহারী ঘোষণা করলেন, "স্বদেশে ও বিদেশে ভারতীয় ভ্রাতৃবৃন্দ, বিগত একশ বৎসর যাবৎ ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছি আমরা। সহস্র সহস্র ভারতবাসী আত্মোৎসর্গ করেছেন এই বিরাট সংগ্রামে। কিন্তু অস্ত্রের অভাবে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারিনি আমরা। আজ মহান প্রাচ্যে "এশিয়াদের জন্য এশিয়া" এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জাপানী সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে ব্যাপৃত হওয়ার ফলে আমরা পেয়েছি এক সুবর্ণ সুযোগ। আসুন এ সুযোগে ব্রিটিশের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করি আমরা।.....

আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করার জন্য পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা দলে দলে Indian Independent League অফিসে ৩ মায়েত হতে লাগল এবং গড়ে উঠল বিরাট এক সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী।

১৯৪২ সনের ১৫ই জুন ব্যাংকক, জাপান, কোরিয়া, চীন, মালয়, শ্যাম, বর্মা প্রভৃতি সকল দেশের স্বাধীনতাকামী ভারতীয় প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হল। এই সম্মেলনে জার্মান থেকে সুভাষচন্দ্র বাণী পাঠালেন—আজাদ হিন্দ ফৌজের ইয়োরোপীয় শাখার পক্ষে আমি আপনাদের সাফল্য কামনা করি, আমি বিশ্বাস করি এই পথই জয়ের পথ। এই সম্মেলনে গঠিত হল সংগ্রাম পরিষদ, সভাপতি নির্বাচিত হলেন রাসবিহারী বসু। মোহন সিংকে জেনারেল করা হলেও রাসবিহারীকেই দিনরাত খাটতে হত। হঠাৎ ফৌজের মধ্যে দেখা দিল ব্রিটিশ পঞ্চম বাহিনীর কার্যকলাপ। আভ্যন্তরীণ বিরোধ শুরু হল ফৌজের মধ্যে। এই বিরোধ মীমাংসার জন্য রাসবিহারীকে বৈঠকের পর বৈঠক ডাকতে হল। ভারতে প্রবেশের জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের সদর দপ্তর নিয়ে এলেন সিঙ্গাপুরে। রাসবিহারী অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার বিশ্রামের নির্দেশ দিলেন। এমতাবস্থায় রাসবিহারী সিঙ্গাপুরে স্বাধীনতা লীগ ও সামরিক পরিষদের এক জরুরী বৈঠকে জাপানী কর্তৃপক্ষের সাহায্যে সুভাষচন্দ্রকে পাওয়ার জন্য চেষ্টার প্রস্তাব করলেন এবং তা গৃহীত হল। সুভাষচন্দ্র রাসবিহারীর আহ্বানে সাড়া দিলেন।

১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র জার্মানি থেকে কর্ণেল আবিদ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন এবং দীর্ঘ সাড়ে তিনমাস টর্পেডো-সংকুল সমুদ্রের নিচ দিয়ে ভ্রমণ করার পর টোকিওতে হাজির হলেন ১৩ই জুন রাসবিহারী তখন রোগশয্যায় শায়িত। জীবনের প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ে অনুভব করলেন উভয়ের অনন্য মহানুভবতা। সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে রাসবিহারী অসুস্থ অবস্থায়ই চলে এলেন সিঙ্গাপুরে। ৪ঠা জুলাই সিঙ্গাপুর ময়দানে ৫০ হাজার ভারতবাসীর এক বিরাট সভায় রাসবিহারী সুভাষচন্দ্রকে নেতাজী সম্বোধন করে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক রূপে বরণ করলেন এবং ঘোষণা করলেন আমি বিশ্বাস করি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সংগ্রাম বিজয়ের পথে এগিয়ে যাবে। আঠাশ বৎসর নিজের সকল স্বার্থ ত্যাগ করে যে স্বাধীনতা লীগ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলেছিলেন তা স্ব-ইচ্ছায় ছেড়ে দিলেন তাঁরই মত বিপ্লবীর নিপুণ হাতে। ইতিহাসের পাতায় এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

নেতাজীর সুযোগ্য হস্তে নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করলেও রাসবিহারী দায়িত্ব এড়াতে পারলেন না, নেতাজী রাসবিহারীকে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করে নিলেন এবং আজাদ হিন্দ সরকারের সদর দপ্তর বর্মাতে স্থানান্তরিত করে ব্রিটিশ আমেরিকান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল বিক্রমে লড়াই-এর প্রস্তুতিতে নেতাজীকে রাসবিহারী সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছিলেন।

১৯৪৪ সালের ৪ঠা মার্চ আজাদ হিন্দ ফৌজ আরাকানের পথে ভারতভূমিতে পদার্পণ করে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। নিজের ভগ্ন স্বাস্থ্য ও পীড়িত অবস্থা সত্ত্বেও রাসবিহারী এই

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রণাঙ্গনের ক্লেশবশতঃ অবিলম্বে টোকিয়োতে ফিরে গিয়ে রাসবিহারীকে শয্যাশ্রয় করতে হল এবং শেষ নিঃশ্বাসের জন্য দিন গুণতে লাগলেন।

পনর বৎসর বয়সে রাসবিহারী মাতৃমুক্তির আদর্শে দীক্ষিত হন। ব্রিটিশের পশুশক্তিকে সামরিক বল প্রয়োগ ব্যতীত উচ্ছেদ করা যাবে না—এই সত্য রাসবিহারী উপলব্ধি করেছিলেন তখনই। এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য রাসবিহারী নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন সারা জীবন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় নেই।

জাপানে এসে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুযোগ সুবিধার জন্য বাধ্য হয়ে রাসবিহারী বিবাহ করলেন। স্ত্রী তোষিকাকে গড়ে তুললেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকরূপে। নিজের একমাত্র পুত্র মাসাহিদে বসু পিতার নির্দেশে মৃত্যুবরণ করলেন ভারতের মুক্তিসংগ্রামে। কাজেই দেখা যায় রাসবিহারীর জীবনে ভারতে ব্রিটিশ সরকার উচ্ছেদই একমাত্র ধ্যান ছিল।

ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হতে স্বাধীনতা লাভ অবধি রাসবিহারীর বৈপ্লবিক সামরিক অবদান জাতির দ্বিধাগ্রস্থ অবস্থার পরিবর্তন করে সংগ্রামী বল এনে দিয়েছে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির ভারত শাসনের নৈতিক বল ভেঙ্গে দিয়ে বিপ্লবীদের মনোবল বৃদ্ধি করে দেন ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করে রাজকীয় প্রবেশ দিনে। ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী কোয়েটা হতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সামরিক বাহিনীকে সারা ভারত-ব্যাপী অভ্যুত্থানে সামিল করার প্রয়াসের ফলে জনগণের বিক্ষোভ চরমে উঠে, ইহাই প্রকাশ পায় গান্ধীজীর ১৯২১ সালের পরবর্তী আন্দোলনে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল রাসবিহারীর গঠিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সংগ্রামের ফলে। ইংরেজ সরকার বুঝেছিল আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর আন্দোলনের ফলে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত বিক্ষোভ প্রশমিত হবে না, অলে উঠবেই কাজেই ধনে প্রাণে মৃত্যু হতে যথাসম্ভব সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার্থে আপোষে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার নীতি গ্রহণে ইংরেজ জাতীর সুলভ কূটনীতির পরিচয়।

একাধিক ইংরেজ লেখক তাদের লিখিত পুস্তকে বিশেষ করে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ও পাঞ্জাবের গভর্ণর মাইকেল ওডায়ার তাদের আত্ম-জীবনীতে রাসবিহারীর বৈপ্লবিক মুক্তি সংগ্রামের কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, অথচ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বিপ্লবী মহানায়কের অবদান বিষয়ে দেশবাসী এখনও সচেতন নয়। আত্মবিস্মৃত জাতিকে জাতীয় সত্তায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে, সমাজ ও দেশ ক্লেদমুক্ত করতে হলে এঁদের কাহিনী ও চরিত কথা বর্তমান যুগের যুবকদের মণিকোঠায় স্থান করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, তবেই জাতি নবজীবন লাভ করবে, এগিয়ে চলবে।

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা—সামরিক বানচাল

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এইরূপ মনের ভাব নিয়েই বিপ্লবের আয়োজন চলতে লাগল বাঙ্গলার বিভিন্ন কেন্দ্রে, বিপ্লবকারীদের জন্য হাফপ্যান্ট তৈরী হল। পাঞ্জাবে ভারতের জাতীয় পতাকা তৈরী হল চার রঙয়ের। পতাকার বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে শিখেরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য ঠিক বজায় রাখবার জন্য পীড়াপীড়ি করায় হিন্দু, মুসলমান শিখ এবং ভারতের অন্যান্য জাতির চিহ্নস্বরূপ ভারতের জাতীয় পতাকা চার রঙয়ের হল। সংগ্রামী বিপ্লবীদের জন্য রসদের ব্যবস্থা হল, মোটর লরী প্রভৃতি বিভিন্ন যানের তালিকা প্রস্তুত করা হল। পূর্বেই স্থির ছিল পাঞ্জাবের সঙ্কেত পেলেই মুহূর্তের মধ্যেই আগ্নেয়গিরির ভীষণ অগ্নুৎপাত আরম্ভ হবে, তাই সমগ্র উত্তর ভারতব্যাপী বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবীরা পাঞ্জাবের দিকে তাকিয়ে দিন গুণতে লাগল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সমস্ত আশা নিরাশায় পরিণত হল।

পাঞ্জাবের গোয়েন্দা বিভাগের এক মুসলমান ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট কৃপাল সিং নামে জনৈক শিখকে নিজের চর রূপে বিপ্লবদলে ঢুকিয়ে দিয়ে ছিলেন। কৃপাল সিংয়ের দূরসম্পর্কের এক ভাই ইংরেজদের সৈন্যবাহিনীতে সৈনিক শ্রেণীভুক্ত ছিল। তিনিও এই বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। এই সৈনিকের সাহায্যেই কৃপাল সিং বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ ২১শে ফেব্রুয়ারীর কয়েকদিন আগে বিপ্লব দলে প্রবেশ করেছিলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তার গতিবিধি দেখে নেতৃবৃন্দের সন্দেহ হয়। তখন বিপ্লবী নেতারা স্থির করেন কৃপাল সিংকে হত্যা করা সঙ্গত হবে না। তাকে চোখে চোখে রেখে তার প্রতি কড়া নজর রাখা হবে। দুই চার দিনের মধ্যেই জানাগেল সন্দেহ মিথ্যা নয়। কৃপাল সিং পুলিশের বড়কর্তাদের নিকট নিয়মিতভাবে যাতায়াত করছেন। কিন্তু তা হলেও এই অবস্থায় যদি তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এমন একটা ভীষণ গোলযোগ আরম্ভ হতেপারে যাতে বিপ্লবীদের মনোরথসিদ্ধির পথে ভীষণ বাধার সৃষ্টি হবে। এই আশঙ্কার বশবর্তী হয়েই তখন তাকে হত্যা করা হল না। ক্রমে জানা গেল ২১শে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের দিন ধার্য্য হয়েছে একথা ও পুলিশ জেনে ফেলেছে, কারণ কৃপাল সিং একথাও জানত। অগত্যা ঠিক করা হল কৃপাল সিংকে আর বাড়ীর বাইরে যেতে দেওয়া হবে না এবং বিপ্লবের দিন ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে এগিয়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারী করে দেওয়া হল। সেনানিবাসে এই তারিখের কথা জানিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এই নূতন তারিখের সংবাদ জানিয়ে আসবার ভার যার উপরে ছিল তিনি সেনানিবাসে সেই খবর দিয়ে এসে রাসবিহারীর নিকট বললেন, 'সশস্ত্র অভ্যুত্থান ২১শে ফেব্রুয়ারী আরম্ভ না হয়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারী আরম্ভ হবে সেনানিবাসে জানিয়ে এলাম।' এই সময় কৃপাল সিংও সেখানে উপস্থিত ছিল। এটা ১৮ই ফেব্রুয়ারীর কথা সেই দিনই দুপুরবেলা সবাই খেতে গেছে। কৃপাল সিং বাইরে যাবার চেষ্টা করলেন। কৃপাল সিং দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল সাইকেল চড়ে তারই দিকে আসছিল। কৃপাল সিং বাড়ীর বাইরে

এসেই দেখতে পেল সরকারী গোয়েন্দা বিভাগেরই একটি লোক। তাকে দেখতে পেয়েই জানিয়ে দিল বিপ্লবের তারিখ ২১ ফেব্রুয়ারী থেকে পরিবর্তন হয়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারী হয়েছে। শুনেই গোয়েন্দা বিভাগের চরটি চলে গেল এবং এর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ধরপাকড় আরম্ভ হয়ে গেল। কৃপাল সিং যে বাড়ীতে ছিল ঐ বাড়ীতেই ৭।৮ জন গ্রেপ্তার হলেন। এদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী। রাসবিহারী যে বাড়ীতে থাকতেন সেবাড়ীর খবর দুই একজন নেতা ভিন্ন আর কেউ জানতেন না। কারণ কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার প্রয়োজন হলে তিনি অন্য স্থানেই করতেন। ওদিকে সরকারী কর্তৃপক্ষ অন্যভাবেও সতর্কতা অবলম্বন করলেন। অস্ত্রশস্ত্রের ভার দেশীয় সৈনিকদিগের হাত থেকে ইংরেজ সৈন্যদের হাতে চলে গেল। শহরের সকল ইংরেজ ভালন্টিয়ারকে সমরসজ্জায় সজ্জিত করা হল। সকলেরই বাধ্যতামূলকভাবে ক্যাম্পে থাকার ব্যবস্থা হল।

যুদ্ধের সময় যেরূপ সতর্ক হয়ে থাকবার প্রণালীকে পিকেট করা বলে ইংরেজ সৈনিকও ভলেন্টিয়ার সেরূপ পিকেট করতে আরম্ভ করলেন। ইংরেজ সৈনিকেরা শহরময় কুচ্‌কাওয়াজ করে বেড়াতে লাগল লাহোর, দিল্লী, ফিরোজপুর সর্বত্রই এক অবস্থা। সাধারণ লোকে মনে করল হয়তো যুদ্ধের জন্য এরূপ করা হচ্ছে। কিন্তু দেশী সিপাহীরা যারা বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্রের সহিত যুক্ত ছিল তারা প্রমাদ গুণলো। বিপ্লবের তারিখ এগিয়ে দেওয়াতে সকল লোককে সংবাদ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। কর্তার সিং সত্তর আশী জন লোক সঙ্গে নিয়ে আগের কথামত ফিরোজপুর সেনানিবাসে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু দেশী সৈন্যদের হাবিলদার তাকে জানিয়ে দিলেন আরও কয়েকদিন অপেক্ষা না করলে কিছুই করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। কর্তার সিং সৈন্যদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা ইংরেজ পিকেটদিগের দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করে বুঝিয়ে দিলেন। এখন কিছু করতে গেলে তা ব্যর্থ হবে। ফলে কর্তার সিংকে ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হল। কর্তার সিং ফিরোজপুর থেকে লাহোরে ফিরে এলেন। সমগ্র পাঞ্জাবময় এখন ধরপাকড়ের ধুম পড়ে গেছে। যারা ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বীকারোক্তি করে আর পাঁচজনের নাম বলে দিচ্ছে। কোথাও কোথাও ইংরেজ সৈন্যরা গ্রামকে গ্রাম ঘেরাও করে গ্রেপ্তার করেছে। রাওয়ালপিণ্ডির এক দেশী সৈন্যদলকে বিতাড়িত করা হল। লাহোরে খানা-তল্লাসী এবং গ্রেপ্তার চলতে লাগল। শিখ দেখলে একটু সন্দেহ হলেই সোজা থানায় নিয়ে যাওয়া হতে লাগল। কখনও কখনও উভয় পক্ষেই গুলি চলতে লাগল। কর্তার সিং লাহোরে এসেই সমস্ত বুঝতে পেরে সোজা রাসবিহারীর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন সেই বাড়ীই ছিল সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। রাসবিহারী বিষাদগ্রস্ত মনে একটি খাটের উপর নির্জীবের মত পড়েছিলেন। কর্তার সিং তার পাশে অরেকটি খাটের উপর গিয়ে তার ক্লান্তি ভরা অবসন্ন দেহ এলিয়ে। উভয়েই নীরব। তাদের সেই ম্লান মৌনতার মধ্য দিয়ে কতবড় নিদারুণ মর্মপীড়ার কথাই না ব্যক্ত হতে লাগল। তাদের কতবড় আশা শতধা ছিন্ন হয়ে গেল। বিপ্লবের বিরাট আয়োজন এক নিমেষে লুপ্ত হয়ে গেল।

(চলবে)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

(দুটি মেঘাচ্ছন্ন বছর)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমার মনে হল, আমি যেন অবশেষে সরকারী মহলে যুগপৎ পরীক্ষা গ্রহণে আপত্তিটা কিসের, তার গভীরে যেতে পেরেছি। স্যার হেনরি ফাউলার একজন সৎ ইংরেজের মতই কোন রকম সরকারী গোপনীয়তা রক্ষা না করে সোজাসুজিই তা বলে ফেলেছেন। তিনি তাঁর মনটাকে এইভাবে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। ভারত শাসন কার্যে যতদূর সম্ভব কম সংখ্যক ইংরেজকে সিভিল সার্ভিস রেখে শাসন ব্যবস্থার মধ্যে ইংরেজ-প্রকৃতি রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলা হয়ে থাকে (যেন ভারতীয়রা শাসনকার্যে পশ্চিমের ভাব বহনের সম্পূর্ণ উপযোগী হতে পারবে না), তা সব মিথ্যা, ভুয়ো কথা। এটা আসল উদ্দেশ্যকে গোপন রাখার একটা কূটনৈতিক মুখোস ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ভারতীয়দের উচ্চতর সরকারী কাজে নিয়োগ করার পথে দীর্ঘকাল ধরে বাধা সৃষ্টি করে রাখার পেছনে কোন শাসন সৌকর্য্যের ভাবনা নেই ; আছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।

১২ জুন নাগাদ আমি বোম্বেতে ফিরে এলাম। এসেই শুনলাম যে বাংলাদেশে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়ে গেছে এবং তাতে বহু জীবনহানি ঘটেছে ও সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে। ক্ষতি বেশী হয়েছে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে। তখন নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। অধিবেশন চলা অবস্থায় কনফারেন্স ভেঙ্গে গেল। হাওড়া ষ্টেশনে আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আমার বন্ধুরা অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু আমি হাওড়ায় না নেমে আগেই শ্রীরামপুরে নেমে পড়লাম। ভূমিকম্পের সংবাদ শুনে আমি আমার বাড়ীর লোকজনের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ি। তাই শ্রীরামপুরে নেমে নদী পেরিয়ে দ্রুত আমার বারাকপুরের বাড়ীতে পৌঁছলাম। এই সময়টা ছিল মহরমের সময়। মহরমের সময়েই ভূমিকম্প হয়। আমার বাড়ীর ছেলেমেয়েরা সব মহরমের খেলা দেখতে যাচ্ছিল। তাই তারা খোলা জায়গায় ছিল। ফলে তাদের কোন অনিষ্ট হয়নি। তবে গাড়ী ও ঘোড়াগুলি ভূমিকম্পের ফলে চলেছিল। আমার স্ত্রী ছিলেন বাড়ীতে একা। তিনি তাড়াতাড়ি করে ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে চলে গেলেন। আমার গৃহে একটু ফাটলের সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোন গুরুতর ক্ষতি হয়নি।

বাড়ীতে ফিরে এসে জানতে পারলাম যে প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলির পক্ষ থেকে আমাকে বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের মেম্বার নির্বাচিত করা হয়েছে। সেদিনে কাউন্সিলে নির্বাচনের ব্যাপারটা তেমন উত্তেজনার বিষয় ছিল না, এবং ব্যক্তিগতভাবে ক্যানভাস করে প্রভাব বিস্তার করারও ততটা সুযোগ ছিল না। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলি থেকে ডেলিগেট

নির্বাচন করা হত। সেই ডেলিগেটগণই চূড়ান্ত নির্বাচনে তাদের প্রার্থীদের ভোট দিতেন। ডেলিগেটগণ ছিলেন সুনির্বাচিত ব্যক্তি। তাদের মধ্যে তারা ছিলেন সেরা ব্যক্তি। দুর্নীতি এবং ব্যক্তিগত চাপের প্রভাবের ঊর্ধ্বে ছিলেন তারা।

১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল অমরাবতীতে। অমরাবতী হচ্ছে বেরার অঞ্চলের প্রধান নগরী। আমার স্বর্গত: বন্ধু মিঃ মুধোল কর এখানে থাকতেন। মুধোল করের কথা আমি আগেই বলেছি। জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে এ রকম একজন আত্ম-ভোলা ও আড়ম্বরহীন বন্ধু পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। তার চরিত্রে সাধারণ বিচার বুদ্ধি ও সামর্থ্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তার অমায়িকতা ও বিনীত ভাব। এই গুণরাজি তাকে সকলের নিকট অতি প্রিয় করে তুলেছিল। তিনি আমাকে তার বাড়ীতে অতিথিরূপে তার সঙ্গে থাকতে আহ্বান জানান। কিন্তু আমার সঙ্গে ছিলেন আমার বন্ধুরা—উপেন্দ্রনাথ সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এবং তারাপ্রসন্ন মিত্র (বেঙ্গলী পত্রিকার ম্যানেজার, যাকে টি, পি মিটার বলেই লোকে বেশী জানে)। এরা সকলেই আমার খুব নিষ্ঠাবান বন্ধু এবং আন্তরিকভাবে আমাকে ভালবাসেন ও আমার যত্ন নেন। তাদের থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতে পারলাম না। তাই তাদের সঙ্গেই ডেলিগেটদের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানে থেকেই আনন্দের মধ্যে কাটালাম।

মিঃ শঙ্করণ নায়ারকে সভাপতিত্বে বরণ করার প্রস্তাবটি উত্থাপন করার ভার আমাকে দেওয়া হল। সেই থেকে এ কাজটি প্রায়ই আমি করেছি। প্রস্তাব উত্থাপন কালে আমি বললাম, এটা একটা সঙ্কটময় সময়; এই সময়ে তারই মত লোকের পরিচালনা ও নেতৃত্ব আমাদের প্রয়োজন। মিঃ শঙ্করণ নায়ার তখন মাদ্রাজ হাইকোর্টের একজন এ্যাড্‌ভোকেট ছিলেন এবং ইতিমধ্যেই সেখানকার আইনজীবী মহলে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি হাইকোর্টের একজন বিচারপতি ও ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বার হয়েছিলেন। সভাপতিরূপে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও পৌরুষ-দীপ্ত। তার মত লোকের উপযোগী ভাষণই এটি হয়েছিল। তা ছাড়া তা সময়োপযোগীও হয়েছিল এই কারণে যে তখন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিও বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। তিনি বললেন, "ইংরেজী ভাষার যুক্তি অবতারণা করে কোন মানুষকে দাসত্বে বশীভূত করা অসম্ভব ব্যাপার।" এক জোরাল যুক্তির অবতারণা করে তিনি ঘোষণা করলেন যে সর্ব প্রকার অবনতি ও দুর্গতি এবং বর্ণ-বিদ্বেষ ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্বকে ঘুচাবার প্রকৃত উপায় হল মুক্ত স্বাধীন গণ-প্রতিষ্ঠান-সমূহ।

পুণার নাটু ভ্রাতৃবৃন্দের নির্বাসনের ব্যাপার নিয়ে যে প্রস্তাবটি উঠে তারও ভার পড়েছিল আমার উপর। নাটু ভ্রাতারা ছিলেন দাক্ষিণাত্যের সর্দার। যে সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে পশ্চিম ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাদের পূর্ব-পুরুষদের সেই সমস্ত ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তারা বেশ জ্ঞানী লোক ছিলেন এবং মহারাষ্ট্রের প্রধান নগরীতে তারা নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি রূপে আমার পুণায় অবস্থানকালে তারা আমার সঙ্গে খুব সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন এবং অন্যান্য ডেলিগেটগণ-সহ আমার আতিথ্যও গ্রহণ করে-

ছিলাম। কংগ্রেস আন্দোলনকে তখনও পর্যন্ত সরকার সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত। কিন্তু সেজন্য তারা প্রকাশ্যে এই আন্দোলনে যোগদান করতে ভয় পাননি।

প্লেগ এবং তজ্জনিত সংক্রামণ থেকে বাঁচাবার জন্য আলাদা করে রাখার ব্যবস্থাও আবশ্যিক ভাবে সরকারী কর্মচারীদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে খোঁজ খবর করা ইত্যাদি সব কারণে পুণার অধিবাসীদের মধ্যে একটা আশঙ্কা ও আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হয়। মিঃ গোখলে তখন ইংল্যাণ্ডের ছিলেন। তিনি সেখানে থেকে পুণায় কি ঘটছে তার বিবরণ পান। সেই বিবরণ তিনি সেখানে প্রকাশ করেন। ফলে তাকে সেখানে জবাবদিহি করতে হয়। আমাদের গৃহস্থালীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে এবং আমাদের পারিবারিক জীবনের পবিত্রতার উপর কোন আক্রমণ চালালে আমাদের দেশের লোকের যেমন মর্মাহত হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না। ফলে উত্তেজনার মধ্যে একটি অশুভ ঘটনা ঘটল। প্লেগ কমিটির প্রেসিডেন্ট মিঃ র‍্যাণ্ড এবং লেপ্টন্যাণ্ট আয়ার্স্টকে হত্যা করা হল। জনমতের কোন কোন দিকে উগ্রপন্থী কার্যকলাপের ফলে দেখা দেয় জনমত প্রতিরোধক আইন, নির্বাসন এবং অন্যান্য মামুলী নিপীড়ন নির্যাতনের সরকারী ব্যবস্থা।

নাট্ ভ্রাতাগণ নেতৃস্থানীয় নাগরিক হিসাবে তাদের নির্বাসন দণ্ডের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক ভাবে সরকারের হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন করেন। একটা পুরানো অকেজো রেগুলেসনে তাদের নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। এটি ছিল ১৮২৭ সালের ২৫নং বোম্বে রেগুলেসন—ঠিক ১৮১৮ সালের ৩নং বেঙ্গল রেগুলেসনের মত। তাদের নির্বাসনের পরে পরে তাদের বিত্ত-সম্পত্তি সরকারী হেফাজতে নিয়ে নেওয়া হল। এই কি তাদের দেশ সেবার পুরস্কার? অথবা এটা জন-সাধারণের মনে একটা আতঙ্কের ভাব জাগিয়ে তোলার আমলাতান্ত্রিক চক্রান্ত? সে যাই হোক না কেন, এটা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এবং মাত্রাতিরিক্ত ব্যবস্থা। এড্‌ম্যাণ্ড বার্কের ভাষায় "মানুষের সহিষ্ণুতার মূল্যবান সম্পদের অপচয়।" মিঃ র‍্যাণ্ড ও লেপ্টেন্যাণ্ট আয়ার্স্টের হত্যাকারীদের অনতি বিলম্বেই সন্ধান পাওয়া গেল। তাদের ধরা হল, বিচার হল এবং ফাঁসি দেওয়া হল। কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে নাট্ ভাইয়েরা ৫ মাস কারাগারে আটক ছিলেন।

এই বিষয়ের উপর কংগ্রেস যে প্রস্তাব নেয় আমাকেই তা উত্থাপন করতে বলা হল। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করছে তখন রেগুলেসনের দ্বারা যে অসাধারণ ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষমতা প্রয়োগকে প্রস্তাবে নিন্দা করা হয়, যদিও কংগ্রেস স্বীকার করে যে এমন অবস্থার উদ্ভব হতে পারে যখন এই সমস্ত রেগুলেশনকে কাজে লাগান আবশ্যক হতে পারে। কংগ্রেস এই রকম এক অভিমত ব্যক্ত করল যে কোন প্রদেশে বা কোন এলাকায় যদি এই রকম কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে তা ঘোষণা করে সরকারকে একথা জানিয়ে দিতে হবে যে প্রয়োজনবোধে সরকার রেগুলেশনের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে মনস্থ করেছেন, এবং একথাও ঘোষণা করতে হবে যে বিনা বিচারে কাউকে ৩ মাসের বেশী আটক রাখা হবে না।

(চলবে)

দলীয়স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থা বানচাল

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

যে কোনও রাজনৈতিক দলের শিক্ষাক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ ও সংরক্ষণ করার চেষ্টা প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর এবং বিপদ্জনক সৃষ্টিকারী। পরাধীন ভারতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল স্বাধীনোত্তর ভারতে মোটামুটি প্রায় একই প্রকার তা চালু আছে, যদিও কিঞ্চিৎ দৃষ্টি ভঙ্গির পার্থক্য লক্ষ করা যায় এবং কিছু অদলবদলের পরীক্ষা নিরিক্ষা চালাবার পরেও প্রায় একই অবস্থায় আছে বলে বস্তুতঃ মনে হয়। পরাধীনতাকালে ছাত্র ছাত্রীরা সেই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও বর্তমানকালের চেয়ে অনেক সুষ্ঠভাবে বিদ্যাভ্যাসের তথা জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। এখনকার মত তখনকারকালে শিক্ষা ব্যবস্থার পরে শাসকদলের কোন প্রকার অন্যায় আব্দার বা দাপাদাপি চলিত না। সর্বপ্রকার দল নিরপেক্ষ প্রকৃত শিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তিগণই শিক্ষা জগতের দিকপাল ছিলেন এবং তাঁরা কোন সময়েই শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনরূপ সরকারী হস্তক্ষেপ পছন্দ করতেন না বা বরদাস্তও করতেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানিন্তন মান ও পরিচালনা ব্যবস্থা অতি উচ্চস্তরের ছিল। স্যার আশুতোষের আমলে খোদ গভর্নরের পর্যন্ত কোনরূপ জাতীয়তা বিরোধী প্রচেষ্টা চলেনি, চেষ্টা একবার হয়েছিল তা বাংলার বাঘ আশুতোষ বরদাস্ত করেন নি. শিক্ষার স্বার্থে ও জাতীয় মর্য্যাদার রক্ষার কারণে। আজ কিন্তু সে অবস্থা নেই, শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর পদে পদে বর্তমান সি, পি, এম যথা বামফ্রন্ট সরকার হস্তক্ষেপ করেছেন এবং দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির মানসে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্ব্বত্র সি, পি, এম এর দলীয় ব্যক্তিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য বহু মিথ্যা অভিযোগের অবতারণা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর দলের লোকদের দিয়ে খবরদারী করাতে নির্লজ্জভাবে উঠে পড়ে লেগেছে, ফলে শিক্ষা জগতে পশ্চিমবঙ্গে বেশ একটা নৈরাজ্যের ও হতাশার মনোভাব প্রকাশ পেতে শুরু হয়েছে, যা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয় উপরোন্তু এবম্বিদ দলীয় অনুপ্রবেশ শিক্ষা ব্যবস্থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনই বানচাল করতে লেগে গেছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সব দলবাজী গত কিছুকাল যাবৎ সি, পি, এম এর দ্বারা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আরম্ভ হয়েছে তাতে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাজগতে জাতীয়তাবোধের বিলুপ্তির আর বেশী দেরী নেই। জাতীয় জ্ঞানীগুণী ও দেশপ্রেমিক সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় নেতাদের কথা ছাত্র ছাত্রীরা ভুলে গিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট নেতাদের কথাই জানতে ও শিখতে পারবে। কিন্তু যে জাতি তার নিজের ঐতিহ্য বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টি এবং অতীত-অধ্যায়কে ভুলে যায়, শিক্ষা ব্যবস্থার এবম্বিদ ব্যর্থতার ফলে: সে কি কোনদিন বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজ দেশের বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী প্রতিপন্ন করতে পারে? রামমোহন রামকৃষ্ণ, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র, বিবেকানন্দ, মালব্য জী, বিদ্যাসাগর, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, রাজাগোপালচারি, মহাত্মা গান্ধী, আচার্য্য প্রফুল্ল রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বাল গঙ্গাধর তিলক, যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, লালা লাজপৎ রায়, বল্লভ ভাই প্যাটেল, নেতাজী সুভাষ, বীরেন্দ্র নাথ শাসমল, জওহর লাল, স্যার সুরেন্দ্রনাথ, গোখলে, বিপিন পাল, রাসবিহারী, মৌলনা আজাদ প্রভৃতি দেশবরেণ্য মনীষী ও দেশ

প্রেমিকদের পরিবর্তে ভবিষ্যতে মাও সে তুং, ষ্টালিন, হো, চি, মিন, লেলিন প্রভৃতি বিদেশী বীরদের কথা এ দেশবাসী শিশুই নিজেকে শিক্ষিত বলে বিশ্বের দরবারে জাহীর করবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কোন দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ সর্ব্বপ্রকারে বন্ধকরা রাজ্য সরকারের বা কেন্দ্রীয় সরকারের অবশ্য করণীয়; অন্যথায় ভবিষ্যতে সমগ্র দেশবাসীকে এর কুফল ভোগ করতেই হবে তখন আর কোন পথ খোলা থাকবে না অর্থাৎ কোন বিকল্প উপায় থাকবে না যাতে করে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে স্বদেশ প্রেমের আগ্রহ ও সম্যক চিন্তাধারা ও বলিষ্ঠতা আনা সম্ভব হবে। ফলে অন্য কোনও বিদেশী রাষ্ট্র শক্তিদ্বারা ভবিষ্যতে কখনও এদেশ যদি আক্রান্ত হয় তখন প্রকৃত বীর দেশ প্রেমিক দেশবাসীর বদলে এদেশী মানুষকে পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকায় শত্রুরূপে দেখা যাবে যার পরিণামে এদেশের বহু কষ্টার্জ্জিত স্বাধীনতা বিসর্জ্জিত হবে, অশিক্ষা কুশিক্ষার ফলে যা কোন সমাজই কখনও কামনা করে না বা বরদাস্ত করে না: উল্টে এই বেইমানের দলকে দেশছাড়া করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। তাই এই দলীয় অনুপ্রবেশকে প্রতিটি দল নিরপেক্ষ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের এখনই সর্ব্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করা একান্ত আবশ্যক বলে প্রতীয়মান হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার তথা সি. পি, এম যে প্রশাসনিক স্বৈরতন্ত্রের ব্যবস্থা চালু করেছে তাকে প্রতিহত করতে ছাত্ররা কোন কোন বিদ্যালয়ে ধর্মঘট করতে পর্যন্ত দ্বিধা করছে না। বেলেঘাটার (ক্রিষ্টোফার রোডে) পাঁচকড়ি রাধারাণী আদর্শ বিদ্যালয়ে এরূপ ঘটনা ঘটছে। ছাত্ররা তথায় ধর্মঘট করতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়েছে কারণ সি, পি, এম দলীয় স্বার্থে উক্ত বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক পথে পূর্ব্বের নির্ব্বাচিত কমিটিগুলি অন্যায়ভাবে ভেঙ্গে দলীয় প্রশাসক নিয়োগ করে অযথা রাজনীতির আমদানি করছে যা ছাত্ররাও বরদাস্ত করতে পারেননি। এমনিভাবে আরো বহু বিদ্যালয়ে (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) একইভাবে দলীয় অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সি, পি, এম হীন, প্রচেষ্ট চালিয়ে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-সহরে প্রায় সর্ব্বত্র, ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে এক চরম অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

(চলবে)

বালেশ্বর আত্মোৎসর্গ স্মারক সমিতি

৪ নং বল্লভদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭। ফোন: ৩৪-১৭২৫ রেজষ্টার্ড নং—এস,১১২৩৮

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ

মহাশয়,

বালেশ্বর আত্মোৎসর্গ স্মারক সমিতির সাধারণ সভার আগামী অধিবেশনে যোগদানের জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ জানাইতেছি।

সভার তারিখ ও সময়—ইং ৩ মার্চ '৭৯ শনিবার বিকাল ৪ ঘটিকা।

আলোচ্য বিষয়:— স্থান—মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

১। বিগত সভার কার্য্যবিবরণী অনুমোদন।

২। মুখ্য সম্পাদকের বিবৃতি: ১৯৭৮ সালের পরীক্ষিত হিসাব: ১৯৭৯—১৯৮০ সালের জন্য পরিচালক সমিতি ও কর্মকর্তা নির্বাচন।

৩। কর্ম্মসূচী রূপায়ণ ও পরিচালন ব্যবস্থা। ৪। বিবিধ।

ইতি—নিবেদক—পেঙ্কাংকে দত্ত চৌধুরী, মুখ্য-সম্পাদক।

RgedNo. R. N . 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

C/36

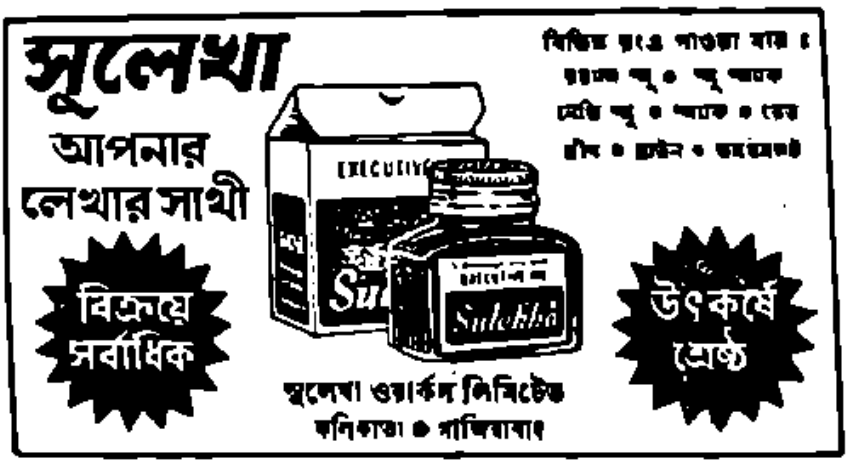

27 FEB 1979

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প ভট্টাচার্য, শ্রীবারীন রায়।
সম্পাদক—শ্রীশান্তি স্মরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বোম্বাই—শ্রীমনমোহন পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅমিল সেনগুপ্ত। কার্যালয় সচিব—শ্রীদীপ্তি গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৩৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণ :—নিউ সারস্বতী প্রেস, ১১১ বি, বেচারাম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাঙলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭৯

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৮৫ ৩রা মার্চ, ১৯৭৯	১০ সংখ্যা

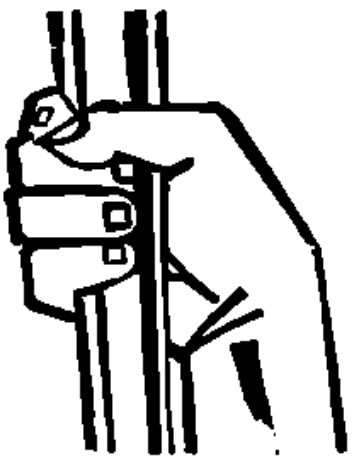

এই সংখ্যায়

তাসের ঘর
। সম্পাদকীয় ।

বিশেষ রচনা

মরিচঝাঁপি—কিছু আন্তরিক ভাবনা
। শ্রীশৈলেন দাশগুপ্ত ।

অনুশীলন ভবন
। শচীন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস
। ক্ষীরোদ দত্ত ।

দলীয়স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থা বানচাল
। শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

প্রতিবাদ

> 'দেশ উঠবে কি ক'রে? দেশের জন্য কি কেউ প্রাণ দিতে চায়? ত্যাগ স্বীকার করতে চায়? আবার যেদিন দেশে এমনে স্বার্থত্যাগী সন্তান জন্মাবে, সত্যিকার দেশের কাজ সেইদিন সম্ভব হবে।
>
> —শরৎচন্দ্র

সম্পাদক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিপ্লবী বাংলার সত্ত্বাধিকার ও অন্যান্য তথ্য

ফরম ৪ (রুল ৮ দ্রষ্টব্য)

প্রকাশের স্থান	:	৪, বল্লভদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৭
প্রকাশের কাল	:	সাপ্তাহিক
মুদ্রকের নাম	:	শ্রীঅনিল কুমার সেনগুপ্ত
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	৪, বল্লভদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৭
প্রকাশকের নাম	:	শ্রীঅনিল কুমার সেনগুপ্ত
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	৪, বল্লভদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৭
সম্পাদকের নাম	:	শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	৪, বল্লভদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৭
সত্ত্বাধিকারী	:	'বিপ্লবী পরিষদ'
		৪, বল্লভদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৭

আমি, শ্রীঅনিল কুমার সেনগুপ্ত, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিলিখিত তথ্য-সমূহ আমার বিশ্বাস ও জ্ঞান মতে সত্য।

প্রকাশকের স্বাক্ষর : শ্রীঅনিল কুমার সেনগুপ্ত

১লা মার্চ, ১৯৭৯

সম্পাদকীয়—

তাসের ঘর

কেন্দ্রে দপ্তর বণ্টন ও কেড়ে নেওয়াকে উপলক্ষ্য করে জনতাদলের ভিতর যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল এবং দলের ভাঙ্গনকে ত্বরান্বিত করে তুলছিল, একটা জোড়াতালি দিয়ে সেই সম্ভাবনাকে আপাততঃ ঠেকান হয়তো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু একাজ করতে হয়েছে একটি অদ্ভুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বর্তমান ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে দুই উচ্চাভিলাষী রাজনীতিবিদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য। এই দুইজন মানুষের প্রধানমন্ত্রীর গদী দখলের আকাঙ্খা যে চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হয়েছে এ কথা মনে করা ভুল হবে। এদের পরবর্তী পদক্ষেপ যে সেই উদ্দেশ্য লাভের দিকেই সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালিত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। জনতা পার্টির জনক, পিতামহ ও প্রধানেরা যতই চক্কানিনাদ করুন না কেন, অনৈক্যের পুনঃপ্রকাশ ঘটতে বাধ্য, তা দুদিন আগেই হোক বা পরেই হোক্। কারণ এই জোড়াতালির মধ্যে কোন অন্তর্বাদ নেই। নেই কোন দেশ সেবার ইঙ্গিত, নেই কোন দেশপ্রেমের বৃহত্তর প্রতিশ্রুতি।

ইন্দিরা সরকারকে পরাজিত করে, যখন রাতারাতি বিভিন্ন মতাবলম্বী কয়েকটী দল আত্ম-বিলোপের কথা শুনিয়েছিল, তখন এই দলের জন্মলগ্নেই শনির প্রবেশ ঘটেছিল। তাদের মৈত্রী ও মিলনের দাবী যে একটা ফাঁকা আওয়াজ ভিন্ন কিছুই নয়, সেটা ক্রমশঃ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। এরা যে পুনরায় গৃহযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, জনগণের এই আশঙ্কাকে অমূলক বলা যায় না। ইতিমধ্যে উত্তর প্রদেশে যে কোন্দলের নাটক সুরু হয়েছে, সেটা বিশেষ-ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তা ভিন্ন শ্রীচরণ সিংহের বিশ্বস্ত সহযোগী প্রকাশ্যেই বলেছেন যে শ্রীসিং ভিতর থেকে এবং তিনি বাইরে থেকে মোরারজী সরকারকে ঘায়েল করবেন। জনতা পার্টির আগামী সাংগঠনিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না বলেছেন, ইতিমধ্যে বি, এল, ডি-এর একদল মানুষ। তাদের অভিযোগ হল নতুন সদস্যদের মধ্যে ভুয়া সদস্যের সংখ্যা প্রচুর। তবে একটি কথা অকপটে স্বীকার করতে হবে যে এদের মধ্যে ভাসা-ভাসা যেটুকু মিল দেখা যায়, সে ইন্দিরা জুজুর ভীতি জনিত। কিন্তু শুধুমাত্র নেতিবাচক একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভারতবর্ষের মত একটা বিরাট ও সমস্যাপূর্ণ দেশের স্বার্থসাধন করা যায় না, এটা ত সূর্য্যা-লোকের মত পরিষ্কার। মনের যেখানে মিল নেই, আদর্শবাদের কোন সেতুবন্ধ নেই, স্বদেশ সেবার মত সঞ্জীবনী শক্তি নেই এক সঙ্গে কাজ করবার মানসিকতা সৃষ্টি করতে, সে ত সের ঘরতো ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য যখন তখন যে কোন অজুহাতে। যতদিন মিলনের বেলা চলবে, ততদিন দলের ভিত্তিটাও নড়বড়ে থাকবে। গোটা দেশকেও এজন্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে ভীষণভাবে।

এ আশঙ্কা শুধু আমাদেরই নয়। জনতাদলের এম, পি, শ্রীপিলু মোদী একটি সাংবাদিক

সম্মেলনে বলেছেন "দেশের ও প্রশাসনের নেতৃত্বে যাঁরা আছেন, তাদের কথায় ও কাজে খুব বেশী ফারাক থাকায় কোন সমস্যার সমাধান হয় নি, হবেও না। যুক্তিপূর্ণ কোন বিজ্ঞানভিত্তিক পথে নেতারা কোন অর্থ-নৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করে না, এতে ভারতবর্ষের মানুষের কাম্য কল্যাণ আসবে না। দেশের মানুষের কথা চিন্তা না করে, যুক্তিতত্ত্বের ধার না ধেরে কেবলমাত্র ভাবপ্রবণতার লোক ভুলিয়ে, জাত-পাত, ধর্মের কথা তুলে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেই কি দেশের সমস্যার সমাধান করা যাবে।"

দেশ এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের গহ্বরের দিকে চলেছে। একে বাঁচাতে হলে দেশপ্রেমিক, আদর্শবাদী, জনদরদী সব মানুষকে সংহত হয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসতে হবে। এ কাজ না করতে পারলে, ক্ষমতাসীন থাকা কালে মুষ্টিমেয় লোক ও তাদের আশ্রিত জনেরা তাদের আখের গুছিয়ে নেবে, কিন্তু সংহতি বিনষ্টির ফলে, অর্থ-নৈতিক বিপর্যয়ের ও রাজনৈতিক অস্থিরতাজনিত দুঃখ দুর্দশা বহুগুণ বেড়ে যাবে অগণিত দেশের মানুষের জীবনে। তাই বিলম্বের ও শৈথিল্যের কোন অবকাশ নেই। এদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে, হয় ঠিকমত কাজ করো, নয় গদী ছাড়। নতুবা দেশ বাঁচবে না।

নবতম পরিস্থিতি হল এই যে কয়েক দিন আগে ভিয়েৎনামকে একটা শিক্ষা দেবার অজুহাতে চীন তার উপরে যে নগ্ন ও ব্যাপক আক্রমণ সুরু করেছে, তাতে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হবার মত উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন শক্তিধরদের রাজনৈতিক দাবা খেলার কি পরিণতি হবে, তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও, পর্যবেক্ষকেরা আশঙ্কা করেন, যে এই রক্তক্ষয়কারী সংঘর্ষ বন্ধ না করতে পারলে, এই আগুন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও উন্নতিশীল দেশগুলিরই সমূহ ক্ষতি হবে। ঘরের কাছে আগুন লাগলে তার স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা খুব প্রবল। পৃথিবীর কোন অংশে আগুন জ্বলতে থাকলে তার আঁচটা তো লাগবেই, ফলে উন্নতির ও প্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি হতে বাধ্য। এই অবস্থায় কোন দেশের সরকার যদি স্থিতিশীল, সংহত ও বলিষ্ঠ না হয়, তবে বিপদের সম্ভাবনাও থাকে বেশী। আমাদের উদ্বেগ এইখানেই যে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার গঠনকারী দলগুলির মধ্যে ঝগড়া বিবাদ বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে দেশকে উপযুক্ত ও সবল নেতৃত্ব দিতে বদ্ধপরিকর না হলে, দেশকে বিপদের সম্মুখীন হতেই হবে। এ কাজ না করতে পারলে, ইতিহাসে তারা একটি কলঙ্কময় অধ্যায়ই রচনা করবেন।

দিকচক্রবালে মেঘের ঘোর ঘনঘটা আত্মপ্রকাশ করছে। সেদিকে তাকিয়ে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় না করে, ব্যক্তিগত পদমর্যাদা ও লোভ ত্যাগ করে দেশের ও দশের কল্যাণযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করে, জনতা নেতারা এই ঘনায়মান অন্ধকারে আলো দেখাতে সচেষ্ট হবেন—এ আশা কি একান্তই দুরাশা? কিন্তু এ ভিন্ন ত পরিত্রাণের অন্য কোন পথ নেই। যারা এই সঙ্কট মুহূর্তে ব্যর্থ হবেন, প্রতিহিংসার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাদের কখনও ক্ষমা করবেন না।

———

অনুশীলন ভবন

১৯৭৯ সনের বার্ষিক বিবরণী

॥ শচীন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা ॥

বন্দেমাতরম্

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ১৯১৫ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের স্থিরীকৃত দিনটি চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যই শুধু অনুশীলন নেতৃবৃন্দ এই অনুশীলন ভবন প্রতিষ্ঠা করেন নি : এই ভবনকে কেন্দ্র করে গঠন মূলক কাজে অগ্রসর হওয়ার সংকল্প ও করেছিলেন। আজ সেই ভবনের বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবসে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমি সর্বাগ্রে সেই মহানায়ক এবং ভবন প্রতিষ্ঠাতা নেতৃবৃন্দ ও স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদকুলের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বাৎসরিক বিবরণী পাঠ করছি।

সুষ্ঠুভাবে ভবন পরিচালিত পুস্তকাগার সহ পাঠাগার, হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় ও 'শক্তিসঙ্ঘ' ব্যায়ামাগার এতদঞ্চলের অধিবাসীদিগকে অনুশীলন ভবন তথা অনুশীলন সমিতির প্রতি যে শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে তার প্রধান কারণ হল গণতন্ত্রের চেয়ে দলতন্ত্রে বিশ্বাসী ক্ষমতালোভীদের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে প্রকৃত অনুশীলন কর্মীদের নিজেদের সীমিত শক্তি নিয়ে গঠনমূলক কাজে লিপ্ত থাকা। প্রতিষ্ঠাতা নেতৃবৃন্দ যাহা স্থাপন করে গিয়েছেন আমরা তাহা সংরক্ষণ করে চলেছি। অর্থ ও স্থানাভাবে ইচ্ছা থাকলেও নতুন কোন সেবামূলক কাজে করা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য একটা মানসিক বেদনা ভোগ করে চলেছি।

পুস্তকাগারের পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এখন (২৫০০) আড়াই হাজারে এসে পৌঁচেছে। এতদ্ব্যতীত ছয়খানা দৈনিক সংবাদ পত্রসহ ষোলখানা সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা পাঠাগারে রক্ষিত থাকে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে আলমপুরদুয়ারের বন্ধুবর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কর্তৃক প্রদত্ত একটি আলমারী এবং বরিশাল সেবা সমিতি প্রদত্ত ২১খানা মূল্যবান পুস্তক আমাদের উৎসাহ বর্ধন করেছে। শ্রীযুক্ত সোম এবং উক্ত সংস্থার সম্পাদকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। দাতব্য-চিকিৎসালয়ে ১৫০ জন রোগী চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন।

প্রতি বৎসরই প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীদের প্রতিকৃতি ভবনে সংরক্ষণের জন্য তাদের আত্মীয় স্বজনরা দিচ্ছেন। এবারেও সুধীর চন্দ্র মজুমদার, ডাঃ নারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী, সতীশ চন্দ্র রায়, তারকেশ্বর গুহ, মনমোহন চক্রবর্তী, ধীরেন দাশগুপ্ত, চন্দ্র সাহা প্রমুখ সতীর্থদের প্রতিকৃতি পেয়েছি এবং আজ তাহার আবরণ উন্মোচন হলো।

সময় সংকীর্ণ, তাই এই সংক্ষিপ্ত বিবরণী গত বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসেব দিয়ে শেষ করার পূর্বে বিপ্লবী বন্ধুদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি, দেশে যে অশান্তি অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে তা কোন দুর্যোগের হাতছানি দিচ্ছে।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাঞ্জাবের বিপ্লব আন্দোলন পণ্ড হল বটে কিন্তু তাই বলে বিপ্লবীদের বিপ্লব প্রচেষ্টা বন্ধ হয় নাই। বহু বিপ্লবী ফাঁসী কাষ্ঠে জীবন বিসর্জন করলেন। কারাগারে আবদ্ধ হয়ে তিলে তিলে প্রাণ বলি দিতে লাগলেন কিন্তু বিপ্লবীদের মন এতে টললো না, এবারের এই নবীন যুবকদের বিপ্লব আন্দোলনের বিশেষত্ব এই ছিল যে কারো মুখ চেয়ে তারা বিপ্লব আন্দোলনে নামেন নি। দেশের গণ্যমান্য লব্ধ প্রতিষ্ঠ দেশনায়করা যখন একদিকে গিয়েছেন অনুকূলশীল সম্পদবিহীন এই তরুণ সম্প্রদায় শত বিপদের মধ্যেও অবিচলিত থেকে নানা বাধা বিপত্তিতেও নিরুদ্যম হয় নাই। বিপ্লবদলের মধ্যে চরিত্রের অভাব ছিল না বলেই বিষম বিপদের মধ্যেও বিপ্লবীরা চঞ্চল হন নাই, পথ দুর্গম দেখে তারা কখনই প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করেন নাই। পাঞ্জাবের বিপ্লব প্রচেষ্টা পণ্ড হলেও বাংলা দেশে উত্তর প্রদেশে এবং অন্যত্র বিপ্লবীদের কাজ সমান-ভাবেই চলতে লাগল।

নিজেদের দলের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে দুই এক দিনের মধ্যেই পাঞ্জাবে প্রায় দুইশত লোক ধরা পড়ল। পাঞ্জাবের বিপ্লব দল এই ভাবে প্রায় নিঃশেষ হল। একদিন জীবন মরণের খেলায় যারা পরস্পর সঙ্গী ছিলেন তারা জীবন থাকতেও মৃতপ্রায় হলেন। প্রতি পদেই প্রমাণিত হতে লাগল এ ছিল বিপ্লবীদের আগুন নিয়ে খেলা। বিপ্লবীদের যতগুলি কেন্দ্র ছিল সরকারী প্রচেষ্টায় একে একে সবই প্রকাশ হয়ে পড়ল। লাহোরের পাড়ায় পড়ায় খানা-তল্লাসী ও গ্রেপ্তারের ধুম পড়ল, পুলিশ কোথাও একবার বোমা আবিষ্কার করল, কোথাও পেল তার কাটা যন্ত্র এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি। রাসবিহারী যে বাসায় থাকতেন তার কথা দু-চার জন ছাড়া আর কেউ জানতেন না, এজন্য আপাতত তাঁর কোন বিপদ হল না। কিন্তু প্রতি দিনই অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগল, সর্বক্ষণই আতঙ্ক কখন কি হয়। কিন্তু এর মধ্যেই নূতন করে বিপ্লবের আয়োজন হতে লাগল। প্রথমে জনতিনেক শিখকে লাহোরের বাইরে পাঠানো হবে স্থির হল। টাঙ্গা করে এই তিনজন শিখ যাচ্ছিলেন রাস্তায় এক মোড়ে পুলিশ তাদের টাঙ্গা আটক করল। কোন শিখই সেদিন সন্দেহাতীত ছিল না। শিখ দেখলেই পুলিশ তাদের আটক করে দেহ তল্লাসী করছিল। পুলিশ তাদের বলল তাদের থানায় যেতে হবে। সেখানে তাদের নাম ধাম লেখা হলে তারা আবার গন্তব্যস্থানে চলে যেতে পারবেন, কিন্তু বিপ্লবীদের সঙ্গে যে রিভলবার এ অবস্থায় থানায় গিয়ে কোন সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ অবস্থায় থানায় যাওয়ার মানেই হল ইচ্ছা করে বিপদ ঘাড়ে নেওয়া। বিপ্লবীরা স্থির করলেন থানায় গিয়ে নির্বিবাদে ধরা না দিয়ে পথের মধ্যে এই পুলিশ দলের সঙ্গেই এক-বার অদৃষ্ট পরীক্ষা করে দেখবেন। বিপ্লবীরা প্রথমেই

রিভলবার বের করে পুলিশ দলের প্রতি গুলি চালালেন। অপ্রত্যাশিত আক্রমণে কয়েকজন পুলিশ হত এবং কয়েকজন পুলিশ আহত হলেন। বিপ্লবীদের একজনকে এক বিরাটকায় মুসলমান ধরে ফেলল। আর একজনকে পুলিশই ধরল। তৃতীয় ব্যক্তি পালাতে সক্ষম হলেন, মুসলমানটি যাকে ধরে ছিল তার নাম জগৎ সিং। শিখদের মধ্যেও এই দৈত্যাকৃতি জগৎ সিং এর তুলনা ছিল না। তিনি যে শুধু বলবান ও সাহসী ছিলেন তা নয় তার দেহটিও ছিল দৈত্যের মতো। পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ের পরে তিনি পুলিশের দৃষ্টির বাইরে যেতে সক্ষম হয়ে ছিলেন, কিন্তু একেবারে নিরাপদ হওয়ার আগেই সংগ্রামে পরিশ্রান্ত হয়ে পথের ধারে জল কল থেকে জলপান করছিলেন। জলপান করে শান্তভাবে যখন মুখ মুছিছিলেন তখন তার থেকেও এক শক্তিশালী মুসলমান হঠাৎ এসে দুই হাতে তার দুই পা এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যে জগৎ সিং এর আর নড়বার-চড়বার ক্ষমতা রইল না। তিনি তাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেলেন পুলিশদল দূর থেকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলে। মুসলমানটি দূর থেকে বিপ্লবী পুলিশের লড়াই দেখছিল। এবারে জগৎ সিংকে ধরিয়ে দিয়ে সে পুলিশের সাহায্য করল। বিচারে জগৎ সিং এর ফাঁসী হয়। জগৎ সিং রাসবিহারীর বিশেষ বিশ্বস্ত ছিলেন। যথা সময়ে জগৎ সিং এর এই গ্রেপ্তারের সংবাদ রাসবিহারীর কাছে গিয়ে পৌঁছিল। কিন্তু দুঃখিত হওয়া ছাড়া তার আর কিছু করবার নাই। সে সময়ে সমগ্র লাহোর শহরে রাসবিহারীকে আশ্রয় দেওয়ার মত সাহস কারো ছিল না। বিপ্লবীদল তখন একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে। রাসবিহারীর সহায় সম্পদের মধ্যে আছেন সামান্য কয়েকজন অজ্ঞাত কুলশীল যুবক।

এর কিছু পূর্ব থেকেই মুসলমানদের মধ্যেও একটা বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়। তুর্ক ইতালীয়ান যুদ্ধের পর থেকেই ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এক নবীন দেশাত্মবোধক চেতনার সঞ্চার হয়। তাদের সঙ্গে রাসবিহারীরও সংযোগ হয়েছিল। এবারে এই মুসলমানদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাসবিহারী স্থির করলেন যে কাবুলে গিয়েই আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, এবং সেখান থেকেই তিনি ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত করবেন। কাবুলের পথে এবং কাবুলে গিয়েও তাদের মুসলমান পরিচয় দিতে হবে। তাই রাসবিহারী এবং তার সঙ্গী অন্যান্য বিপ্লবী শিখগণ এক মুসলমান মৌলবীর নিকট কলমা পড়ার শিক্ষা করলেন। স্থির হল খাঁটি মুসলমান বেশেই রাসবিহারী ও তার সঙ্গীগণ কাবুল যাবেন। রাসবিহারীর সঙ্গীদের মধ্যে কয়েকজন বিপ্লবী নেতাও ছিলেন। সব ঠিক ঠাক, আর দুই এক দিনের মধ্যেই কাবুল যাত্রা করা হবে এমন সময় একদিন দুপুরবেলা রাসবিহারী হঠাৎ বলে উঠলেন, 'না ভাই, কাবুলে যাওয়া আর হল না। আমার মনে হচ্ছে কাবুলের দিকে এখন অগ্রসর হলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু লাহোরেও আর মুহূর্তকাল বিলম্ব করা উচিৎ না। আমার মনে হচ্ছে এখানেও বিপদ অবশ্যম্ভাবী'। রাসবিহারীর যখন যা মনে হত তখন তা করে ফেলতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্থির করলেন ঐ দিন রাত্রের গাড়ীতেই তিনি কাশী চলে আসবেন। কাশীর দুটি যুবক এই সময় রাসবিহারীর কাছে ছিলেন, এদের ভিতর একজন মারাঠী নাম বিনায়ক রাও কাপলে। কাপলে পরিবার বহুদিন ধরে কাশীবাসী ছিলেন। রাসবিহারী ও বিনায়ক রাও রাত্রি আটটার গাড়ীতে কাশী রওনা হলেন, স্থির হল যে দ্বিতীয় ব্যক্তি কয়েকজন ফেরার শিখ নেতাকে নিয়ে কাশীতে রাসবিহারীর সঙ্গে মিলিত হবেন। তর্তার সিং হরনাম সিং এবং আরও কয়েকজন শিখ নেতা কাবুলের দিকে চলে যাবে ঠিক করলেন। (চলবে)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

(দুটি মেঘাচ্ছন্ন বছর)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯০৭ এবং ১৯০৮ সালে লর্ড মিন্টোর শাসনকালে যখন রেগুলেশনের প্রয়োগ খুব ঘাসটের সঙ্গে চলতে থাকে তখন রেগুলেশনের বিধান অনুযায়ী নির্বাসন দানের প্রশ্নটি খুব ব্যাপক আকারে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। লালা লাজপৎ রায় এবং সর্দার অজিত সিংকে পাঞ্জাব থেকে নির্বাসিত করা হয়। একই সময়ে বাংলায় বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত, বাবু শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজনকে একই ভাবে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হল। আমার নিজের প্রদেশের ইতিহাসে এ একটা বিষাদময় অধ্যায়। সে সম্পর্কে পরে বলছি। জনগণের প্রতি দায়িত্বহীন শাসন-কর্তাদের হাতে কোন খারাপ আইন পড়লে তার এমনভাবে প্রয়োগ হতে পারে যাতে প্রায়ই উদ্বেগজনক জন-অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। উত্তেজনার মুহূর্তে যখন সত্তাহরণ ও অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিবিধান ব্যবস্থার প্রয়োজন, তখন এই খারাপ আইন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য এক সোজা পথ বাতলে দেয় এবং তা এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির সৃষ্টি করে যা ভুলে যেতে বহু বছর লেগে যায়।

ভারতের রাজনৈতিক দিগন্তরালে এক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের জমাট মেঘ নিয়ে আবির্ভূত হল ১৮৯৮ সাল। দেশের জনগণের মধ্যে দেখা দিল অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্য, আর তা দমন করার জন্য সরকারী কঠোর ব্যবস্থা। দুর্ভিক্ষ, প্লেগ দেশের উপরে তাদের কালছায়া বিস্তার করল। পুণায় প্লেগ নিবারণের জন্য সরকার যে নির্মম কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করল তার ফলে জনতার মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল; এই উত্তেজনার মধ্যে দুজন ইয়োরোপীয় অফিসারকে হত্যা করা হল, হল নাট্য ভ্রাতাদের নির্বাসন, আর পশ্চিম প্রদেশে একাধিক গোপন ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে বলে অভিযোগ এল।

নানাদিক থেকে নানাশক্তি মিলিত হয়ে যখন দেশের পরিস্থিতিকে অশান্ত করে তুলেছে, ঠিক সেই সময়ই এলেন লর্ড কার্জন ভারতের ভাইসরয় হয়ে। ভারতে আমরা তখন তাকে জেনেছি একজন দীপ্যমান পার্লিয়ামেন্টারী সদস্যরূপে এবং এ পার্লিয়ামেন্টেই তার বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের অন্যতম ভাবী নেতা হিসাবে। তাকে নিয়ে আমরা আশাপোষণ করেছিলাম বটে, কিন্তু স্থির বিশ্বাসী ছিলাম না; এবং এই মনোভাব নিয়ে লোকে যেমন প্রারম্ভ করে থাকে আমরাও সেই ভাবেই চলেছি। তাই তার ভাইসরয়ের কাজ আরম্ভ করার সময়কালেই ১৮৯৮ সালে ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশনকালে তার গুণাবলীর সপ্রশংস উল্লেখ করেছি যে গুণাবলী তিনি ভারতের শাসনকার্যে প্রদর্শন করবেন বলে আমরা আশা করেছিলাম। তাকে আন্তরিক ভাবে স্বাগত জানিয়ে কংগ্রেস এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবের ভাব ছিল আশার উপর। প্রস্তাবের মধ্যে আমরা এই আশা ও বিশ্বাসের কথা জুড়ে দিলাম, যে প্রগতি ও প্রত্যয়ের নীতি ব্রিটিশ শাসনের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে একটা বিশিষ্ট চরিত্র দান করেছে, তার লর্ডশিপের শাসনকালে তা অনুসৃত হবে।

আমার এই প্রস্তাবের সপক্ষে বক্তৃতা করার সময় আমি লর্ড কার্জন ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই যে সমস্ত বক্তৃতা করেছিলেন তা থেকে বচন উদ্ধৃত করলাম। তার সেই সময়কার একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, আমি ভারতকে ভালবাসি, তার অধিবাসীদের ভালবাসি, তার ইতিহাসকে ভালবাসি; ভালবাসি তার—'শাসন ব্যবস্থা, মিশ্র সভ্যতা ও জীবন-ধারাকে।' প্রায় সেই সময়েই তিনি আর একটি বক্তৃতায় মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতের ভাইসরয়ের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে গুণটি থাকা দরকার, তা হল 'সাহস ও সহানুভূতি।' হাঁ, সাহস তাঁর ছিল, প্রচুর পরিমাণেই ছিল। তবে সে সাহস হচ্ছে জনমতকে অগ্রাহ্য করার সাহস; সে সাহস, যাদের শাসন করার জন্য তিনি নিযুক্ত হয়েছেন তাদের ভাবনাকে ঠেলে রেখে নিজের ব্যক্তিগত ভাবনাকেই জাগিয়ে রাখার সাহস। আর সহানুভূতির কথা! তা না বললেই চলে। তিনি ভারতের লোককে ভালবাসেন তার নিজের কায়দায়। যে কোন মর্ম ভারতবাসী বুঝতে পারে না; যে কায়দা ভারতবাসীর মনে প্রতিবাদের ভাবকেই উত্তেজিত করে জাগিয়ে তোলে এবং বহুদিন ধরে সরকার যে অসুবিধা ও ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী অবস্থার সম্মুখীন হয়ে আসছে তার পথ প্রস্তুত করে দেয়।

কংগ্রেসের এই বাণী কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট লর্ড কার্জনের নিকট প্রেরণ করেন এবং লর্ড কার্জন তার প্রতি স্বাগত জানানোর জন্য প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেসকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাঁকে এক স্বাগত সম্ভাষণ জানান হয়। এ ব্যাপারে যারা ডেপুটেশনে গিয়েছিলেন এসোসিয়েশনের সেক্রেটারীরূপে আমি তাদের পরিচয় করিয়ে দেই এবং নিম্নলিখিত পত্রটি পাঠ করি। এখানে একটা ঘটনা ঘটল যা উল্লেখযোগ্য। আমরা সিংহাসন ঘরে ভাইসরয়ের আগমনের অপেক্ষায় সমবেত হলাম। মহান ভাইসরয়ের সেই কক্ষে আগমনের কয়েক মিনিট পূর্বে তাঁর একজন এডিকং সেখানে এলেন। মনে হল যেন সব আয়োজন ও সাজ-সজ্জা ঠিক আছে কিনা, তাই দেখতে তিনি এসেছেন। এডিকং লক্ষ্য করলেন যে ডেপুটেশনের দুজন সেবায়েতের পায়ে ছিল ভারতীয় পাদুকা। সেই পাদুকা খুলে ফেলে খালি পায়ে থাকতে বললেন, নচেৎ তাদের ডেপুটেশন থেকে চলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হল। সেবায়েত দুজন তাঁর দ্বিতীয় নির্দেশই অনুসরণ করলেন। এই ঘটনা একটা বেদনাদায়ক অনুভূতির সৃষ্টি করল এবং আরও দু-একজন ডেপুটেশনের সেবায়েত তাদের সঙ্গে চলে যেতে চাইলেন। কিন্তু পরে বোঝা হল যে না—তা হলে গভর্নমেন্টের প্রধানতম ব্যক্তির প্রতি অযৌক্তিক প্রদর্শন করা হবে এবং হয়ত বা আমরা যে স্বার্থে ডেপুটেশনে এসেছি, পরে সে স্বার্থও ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

ব্যক্তিগতভাবে লর্ড কার্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ ভারতে আমার দুবার হয়েছিল। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কোন সময়ে ডাকেন নি। তিনি যে নীতি অনুসরণ করে চলতেন এবং শাসনকার্যে যে সমস্ত ব্যবস্থা তিনি প্রচলন করেছেন, তাতে জন-স্বার্থ সম্বন্ধীয় কোন ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করার মত কোন মনোভাব আমারও ছিল না। পূর্বোক্ত ডেপুটেশনই ছিল লর্ড কার্জনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করার প্রথম সুযোগ। ভাইসরয়ের চারিদিকের পরিবেশ যে রূপ আড়ম্বর ও জাঁকজমক-পূর্ণ ছিল, তাতে আমার তাজ্জব লেগে যায়। লর্ড রিপণের সময়ে কিন্তু এ রকম ছিল না। তা ছাড়া, তিনি যেরূপ ক্ষমতা-ব্যঞ্জক এবং সুরেন্দ্রনাথ ভঙ্গীতে আমাদের কথার উত্তর দিলেন তাও আমার মনে আঁচড় কাটলো। আমরা অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলাম। তারপরে যখন ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল বিল সম্পর্কে ভারত সরকারের আদেশ জারি হল তখন আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যন্ত নৈরাশ্য ও উৎকণ্ঠা বোধ করতে থাকি।

দ্বিতীয়বার লর্ড কার্জনকে আমি দেখি টাউন হলের এক জন-সভায়। সভাটি হয়েছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি তর্পণের জন্য। এই সভায় তিনি ছিলেন সভাপতি এবং আমি ছিলাম একজন বক্তা। সেই সময় বিপক্ষ

ওয়েলডন বসেছিলেন আমার পাশেই। আমার বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে তিনি আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, 'খুব ভাল হয়েছে।' ভারতসভার প্রাইভেট সেক্রেটারী তার ওয়ালটার লরেন্স ও সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন এবং বললেন, 'আমি আশা-করি আমরা বারে বারে মিলিত হব।' কিন্তু আমরা আর কখনও মিলিত হইনি।

১৮৯৮ সালের এই মাদ্রাজ কংগ্রেসের বিষয়ে পর্যালোচনা শেষ করার আগে মিঃ আনন্দমোহন বসু তাঁর সভাপতির ভাষণে যা বলেছিলেন, সে সম্পর্কে কিছু বলা কর্তব্য ও যুক্তিসঙ্গত। অতি উৎকৃষ্ট ও বিচক্ষণতা-পূর্ণ ছিল তাঁর এই ভাষণটি। কংগ্রেস মঞ্চে যতগুলি বাগ্মীতা-পূর্ণ বক্তৃতা শোনা গিয়েছে—তার মধ্যে তাঁর এই ভাষণটি ছিল একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ। ইংরেজরা যে ধরনে তিনি ভাষণে তুলেছিলেন তা তখনকার দিনে সমর্থনযোগ্য ছিল না। কিন্তু তার প্রতিটি কথায় যে উৎসাহ-ব্যঞ্জক ব্যাকুলতা ও হৃদয়স্পর্শী প্রভার প্রকাশ পেয়েছে তা সময়ের উপযোগিতার অভাবকে সম্পূর্ণরূপে পুষিয়ে নিয়েছে। তা ছাড়া যখন একথা মনে হয় যে মিঃ বসুর স্বাস্থ্য তখন ভাল ছিল না, তখন তিনি যে ভাবে এ কাজটি করেছিলেন তাতে বিস্মিত হতে হয়।

মিঃ আনন্দমোহন বসু ছিলেন এক বিরাট প্রজ্ঞা ও নৈতিক শক্তির অধিকারী। কিন্তু সে সময় দৃঢ় স্বাস্থ্য ছিল না তাঁর,—তা থাকলে যুক্তির প্রতিভা ও নৈতিক শক্তিকে আরও ভালভাবে কাজে লাগান যায়। আমাকে দুঃখের সহিত একথা বলতে হচ্ছে যে তিনি তাঁর স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ কোন যত্নও নিতেন না। আমি কিন্তু মনে করি যে জন-সেবার কাজে যারা আত্মনিয়োগ করেন তাদের নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া হচ্ছে সর্বপ্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। সমাজের কাছে তাদের স্বাস্থ্য হচ্ছে এক অমূল্য সম্পদ। তাদের দীর্ঘায়িত জীবৎকাল তাদের বিচার-বুদ্ধিকে পরিণত দান করে, তাদের বাণীসমূহ গুরুত্ব লাভ করে, ব্যক্তিত্ব লাভ করে সমগ্রের জ্যোতির্ময় যা একটা পবিত্রতার পরিমণ্ডল রচনা করে দেয়। এইভাবে তাদের জীবন জাতীয় সম্পদ হয়ে ওঠে যে সম্পদকে কোন মূল্যমানের সীমার মধ্যে ধরা যায় না। আমার মনে হয় আমাদের জন-সেবকরা সব সময় এই কথাটি মনে রাখেন না এবং ফলে আমাদের অনেক সময় তাদের অকাল প্রয়াণের জন্য শোক করতে হয়।

এই ভাবে সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নানা ধরণের সেবামূলক কাজে ডুবে থেকে মিঃ বসু নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ছিলেন উদাসীন এবং সেজন্য কষ্টও ভোগ করেছেন। ১৮৯৮ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন এবং সেপ্টেম্বর মাসে দেশেফিরে আসেন। তাঁকে টাউন হলে এক জন-সভায় আমরা সম্বর্ধনা জানাই। তাঁকে যে অভিনন্দন দেওয়া হয় সেই অভিনন্দন পত্রটি সভায় গ্রহণ করার প্রস্তাব তুলে আমিএক বক্তৃতা করলাম। তিনি সম্বর্ধনার উত্তরদান করারজন্য উঠে দাঁড়ালেন; কিন্তু অল্প দু-একটি কথা বলার পরেই একেবারে ভেঙে পড়লেন এবং পেছনের চেয়ারের উপর পড়ে গেলেন। সভা ভেঙে দিতে হল। যখন তিনি এই রকম দুর্বল শরীর নিয়ে অবস্থান করছিলেন, সেই সময়েই মাদ্রাজ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করার জন্য অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে এল আমন্ত্রণপত্র। বন্ধুরা ইতস্ততঃ করতে লাগলেন, ডাক্তারগণও নিষেধ করলেন। কিন্তু তাঁর কর্তব্যবোধ প্রবল হয়ে দেখা দিল। তিনি সে আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং সভাপতির ভাষণে এক মহা ভাব-গম্ভীর বক্তৃতা করলেন—যার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

তাঁর মহৎ জীবনে দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ ও হৃদ্-স্পন্দনকারী অনুভূতির আরও একটি দৃষ্টান্ত আছে। সে বিষয়ও মনোযোগ আকর্ষণ করা কর্তব্য। তা পরে করা যাবে।

(চলবে)

মরিচঝাঁপি—কিছু আন্তরিক ভাবনা

॥ শ্রীশৈলেন দাশগুপ্ত ॥

মরিচঝাঁপি আজকাল নিত্যকার খবর। লাঠি, কাঁদানেগ্যাস, গুলি চালনা এবং ধানাপানি বন্ধ করা অবরোধ নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যস্ততা স্বাভাবিক। যতদূর জানি তাতে মন উপদল-নির্বিশেষে বাইরেকার সাধারণ মানুষদের মনে বিস্ময়, বিরক্তি এবং ক্রোধ কিছু কিছু করে দেখা দিচ্ছে। ওরা প্রশ্ন করছেন সমগ্র ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝবার আগ্রহ কারো নেই। প্রশ্ন জাগছে, কেন ওরা দলে দলে এত দূরে চলে এল, কেনই বা ওদের বস্তাবন্দী করে ফেরৎ পাঠাবার জন্য রাজ্য সরকার এত ঈর্ষান্বিত এবং উগ্র হয়ে উঠলেন, এবং যারা মরিচঝাঁপিতে আস্তানা গেড়ে বসল তাদের উৎখাত করবার জন্য এরকম আপাতদৃষ্টিতে নৃশংস মুক্তোপায় কেন? এরই যেন কেমন অদ্ভুত অযৌক্তিক মনে হয়।

দণ্ডকারণ্যে বাঙালী উদ্বাস্তুদের পাঠানো হয়েছিল বিশ বাইশ বছর বা তারও কিছু আগে। এতদিন ওখানে বাসকালে বুড়োরা অনেকে দেহরক্ষা করেছেন, যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরাও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছেন বয়সের ভারে। সেই সঙ্গে বহু নূতন মুখ জীবনের প্রথম আলো দেখেছে ওখানে, এবং তাদেরই অনেকে ক্রমে যৌবনে রূপ হয়ে উঠেছে, তাও ওখানকার মাটিতে। যত কষ্টই হোক ঐ মাটিই তো ওদের আপনার ভুবন। ঐ নূতনদের কাছে ওটাই জন্মভূমি; বাংলার চেহারা ওরা দেখেনি। যে-পঁয়ত্রিশ বছরের বয়েস তাদেরও বাল্যস্মৃতিতে রয়েছে জড়িয়ে দেশভাগের, রেলস্টেশনে এবং কলকাতার পাঁচতলা ক্যাম্পে ঘুপচিকামরার নোংরায় গড়াগড়ি করার এবং শরণার্থী শিবিরগুলিতে ভিক্ষুক-জীবনের ছবি। এসবের মধ্যে আকর্ষণীয় কিছুই নেই। তথাপি ওরা চলে এল-চলে এল, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধের সব সরকারী প্রতিশ্রুতি অবহেলা করে। কেন? প্রমোদ জ্যোতি রাধিকা মহাশয়গণ, মনে হচ্ছে, এই 'কেন'র ধার ধারেন না। তাতলেও 'কেন'টা থেকে যায়। এবং সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতে এর একটি উত্তরই পাওয়া যায়,—বিশ বাইশ বছরেও জীবনে স্থিতিশীলতা এবং আলো হাওয়া না পেয়েই ওরা আবার নূতন আশ্রয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে চলে এসেছে। অন্য কোনও জবাব নেই।

প্রবীণ পাত্রালাল দাশগুপ্ত মহাশয় দণ্ডকারণ্য ঘুরে এসে বলেছেন, ওরা নস্টালজিয়ার শিকার হয়ে চলে এসেছে। এই যুক্তি মানা যায় না। অনেকে প্রত্যাগতদের কনিষ্ঠতর অংশই সব ছেড়ে ছুড়ে চলে আসতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল বেশী। এদেরই নাকি বেশী আগ্রহ ছিল বাল্য-কৈশোরের মাটিকে ছেড়ে আসার। অজানা অচেনা দেশের জন্য এই কনিষ্ঠদের নস্টালজিয়া হওয়ার কথা নয়। তবে কেন? আবার বলছি,—সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতে যতটুক বুঝতে পারছি তা থেকে আবার বলছি,—দণ্ডক প্রকল্পে জীবন ও জীবিকা নূতন করে 'গড়ে' তোলার সব আশা বিশ বাইশ বছরে হতাশায় পরিণত হয়েছিল বলেই ওরা এভাবে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। আসবার আগে ওরা ভেবেছিল ভাষার টান, মাতৃভূমির টান যাদের সঙ্গে আছে বলে ওরা বাঙালীর মুখে শুনেছে তাদের মধ্যে ফিরে এলে সেই বঞ্চিত আত্মীয়তার মধ্যে হয়ত একটা হিল্লে হবে, ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিবেশে হয়ত কিছুটা সার্থক হওয়ার পথ পাবে। কিছুটা হয় সমবেদনা পাবে এটা ওরা নিশ্চয়ই আশা করেছিল। আমাদের বর্তমান সরকার ওদের নিরাশ করেছেন; যেদিন থেকে ওদের 'দূর দূর' করে খেদাবার আপ্রাণ চেষ্টা তাঁরা করে চলেছেন।

কত লোক এসেছিল! জ্যোতিষবাবু বলেছেন লক্ষাধিক, কেউ সরকার বলছেন পঁচাত্তর হাজার। জ্যোতিষবাবুর কথাটাই মেনে নিচ্ছি। লক্ষলোক কতজন? পাঞ্জাবথেকে আমরা যারা স্থায়ীভাবে বাস করছি আমাদের হাজার তনেক ওরা দুজনের কম। হাজারে প্রজনের স্থান কি হত না? দুজন কৃষকের? হ'ত। ভালভাবেই যে তা হ'তে পারে সে কথা পরে আলোচনা করব।

প্রস্তাবের উদ্বাস্তু কৃষকদের পাঠাবার পরিকল্পনাটা গোড়া থেকেই একটা উদ্ভট অকেজো প্রস্তাব ছিল। ঐ সত্যযুগের অযোগ্য দুজনকে চাষ করে' জীবিকা নির্বাহের জন্য পাঠানো হয়েছিল তার চাইতে বহুগুণ দরিদ্র কৃষক অন্য রাজ্য থেকে ইতিমধ্যে এ রাজ্যে এসে হানাপানি সংগ্রহ করছে এবং প্রতি মাসে কোটি কোটি টাকা মেলে রেখে আসা পরিবারকে পাঠাচ্ছে। অন্য রাজ্যের কৃষক এ রাজ্যে কাজের পথ পায় আর এ রাজ্যের কৃষককে অধিকাংশক্ষেত্রে পাথুরে জমিতে কৃষিক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পাঠাতে হয়, এরকম পরিকল্পনা কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় নয়। তাও যদি সেখানে চাষের মাটি থাকত! ওখানে চার যুগে কোন কৃষক বসতি স্থাপন করেনি কৃষিকার্য ওখানে সম্ভব নয় বলে। যাদের পাঠানো হয়েছিল। তারা যদি বিশ বাইশ বছর ধরে চাষ করার চেষ্টায় বিফল হয়ে ফিরে আসে তাহলে দোষ দেব কাকে?

রেলের কামরায় আমার পরে কেউ ঢুকতে চাইলে অনেক সময় যেমন তাকে 'জায়গা নেই' বলে দরজা থেকে হটিয়ে দিতে চাই, কিংবা যেমন প্রাবণ পাড়ি দেবার সময় জোয়ার পাশ ঘেঁষে ভেসে আসা শবগুলোকে লগি দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়ে যাত্রীরা এগিয়ে যায়, আমাদের সরকারও ঠিক তেমনি করেই মৃতক প্রত্যাগতদের নিবারণ করার এবং আবার দূরে ঠেলে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন প্রথমাবধি। চেষ্টা না বলে তপস্যা চালিয়ে যাচ্ছেন বললে বোধহয় আরও ঠিক হবে। ওদের যে করে হোক হটিয়ে দিতেই হবে,—এটা অনাত্মীয় অবাঞ্ছিত বলে' আমি কিন্তু ওদের ভাবতে পারছি না। আমার মত আরও বহুজন পারছেন না। সাক্ষাৎ পরিচয় ওদের কারুর সঙ্গেই নেই; ওদের আলাপ ব্যাভার চলন-বলনও হয়ত সব সময় সমর্থন করার মতো নয়। তবুও মনে হয় ওরা আমাদেরই স্বজন; একান্ত আপ্রাণ হয়ে বিপাকে পড়ে' আমাদের কাছে ফিরে এসে আশ্রয় চাইছে। আমিও ত এ রাজ্যে নবাগত। অবশ্যই একটু হেরফেরে আমাকেও হয়ত বনবাসে যেতে হ'ত। কি করে' আজ ওদের 'ভুয়ন্ত হঠ যাও' বলে' তাড়িয়ে দি? মন চায় না। যাঁরা লাঠি গ্যাস বন্দুক নিয়ে ওদের তাড়া করছেন তাঁরা মনীষী পরিবাচ্য এবং মান্য হলেও তাঁদের এসব কাজে মনে সমর্থন আসে না, আসে বিরূপতা। বিরূপতা থেকেই ত ক্রমে জন্ম নেয় ঘৃণা আর ক্রোধ।

একথা জানি এবং বুঝি যে আমার মত একজন অতি সাধারণ নগণ্য মানুষের বিন্দুপরিমাণ ক্রোধের কিছুমাত্র দহনশক্তি নেই। এতে কারুর কিছু এসে যায় না। অমতাধান শাসকদের ত নয়ই। তাহলেও ক্রোধ জমে ওঠে। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিন্দু বিন্দু বিরূপতা, ঘৃণা আর ক্রোধ জমা নিচ্ছে, জমছে। জমছে এবং বাড়ছে।

পান্নালাল দাশগুপ্ত মহাশয় খুব ধীর প্রকৃতির মানুষ এবং প্রগাঢ় দেশপ্রেমিক। অনেক বছর ধরে' আমাদের গ্রাম্য-জীবনের সমস্যাসমূহের নিরসনকল্পে তিনি নিঃশব্দে কাজ করে' চলেছেন কলহমুখর রাজনীতির বাইরে থেকে। পান্নাবাবু গত নভেম্বর মাসে প্রস্তাবিত ওখানকার সব কিছু সাক্ষাৎ জানবার জন্যে; এবং ঐ প্রকল্পসম্পর্কে তাঁর ধারণাগুলো কলকাতায় একটি সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়েছে, অবশ্য অনেক বিলম্বে, পরের বছর মধ্য ফেব্রুয়ারীতে। তিনি তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন, এ হেন বিরাট ভবিষ্যত সম্ভাবনাপূর্ণ দণ্ডকারণ্য যদি আজ বাঙালীরা পরিত্যাগ করে আসেন তবে তা তাঁদের বুদ্ধি ও চেতনার দৈন্যই বোঝাবে। প্রকল্পের ভবিষ্যত সার্থকতা সম্পর্কে পান্নাবাবু উৎসাহোদ্দীপক অনেক কিছুই বলেছেন। তাঁর কথাগুলো হয়ত ঠিক; হয়ত ভবিষ্যতে অনেককিছু সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

তবে, সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত উন্নয়নশীল দেশে আনাচে কানাচে সর্বত্রই থাকে এবং আছে। বিশ বাইশ বছর যাঁরা ওখানে বিস শুনছেন তাঁদের কাছে future tense এখন আর যদি আকর্ষণীয় না হয় তাহলে সেটাকে তাদের বুদ্ধি ও চৈতন্যের দৈন্য বলে' রায় দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নেওয়া মুস্কিল। পান্নাবাবু তাঁর প্রবন্ধে একথা স্বীকার করেছেন যে সরকার দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের সহায়ক যে সব প্রকল্পে হাত দিয়েছেন সেগুলির গতি অতিশয় মন্থর। ১৯৭৮ এর শেষে দণ্ডকারণ্যে গিয়ে সরকারী কাজ কারবারের শ্লথতা (এবং অনিশ্চয়তা) পান্নাবাবুর নজরে পড়েছে। দেশের সর্বত্র সব সরকারী কাজে এই শ্লথতা সবাই আমরা বরাবর দেখে এসেছি এবং আজও নিত্য দেখছি। কয়লা, বিজলী, ট্রাম, বাস, পাতালরেল, দ্বিতীয় হাওড়াপুল, সুন্দরী কলকাতা প্রভৃতি বহু সরকারী প্রকল্প এবং প্রয়াসের সঙ্গে আমাদের সাহচর্য বহুদিনের এবং প্রতিদিনের। ভরসা পাবার মতো কিছু কি আমাদের নাগালের মধ্যে পৌঁছেছে? না, ভরসা কোথাও নেই, আছে বাড়বাড়ন্ত দুর্ভোগ। প্রকল্প দীর্ঘায়িত হওয়ার ফলে ক্রমাগত ব্যয় বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত করবৃদ্ধি, ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি।

কেন এরকম হয়? কায়েম, জনতা, ধামফ্রন্ট সবার আমলেই দুর্ভোগ সর্বত্র বাড়ছে। কর্তৃত্ব কাদের হাতে সেটা একেবারেই মূলকথা নয়। সরকার প্রকল্প রচনা করেন, কার্যকর করেন না। কার্যকর যাঁরা করেন তাঁদের কাছে কাজটা আদৌ প্রধান কথা নয়। তাঁদের প্রধান বিবেচ্য হ'ল যতটা সম্ভব কম খেটে চাকরীটা বজায় রাখা, বাইরে বৃত্তি, বোনাস ও ছেলে ভাইপো-ভাগ্নেদের জন্য চাকরীর সুযোগবৃদ্ধি। পারকিন্সন সাহেবের দৃষ্টি বাস্তবিক স্বচ্ছ। কোনো সরকারেরই চাকুরেদের কাছ থেকে ঠিক পরিমাণে ও ঠিক সময়ে কাজ আদায় করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই, যাদফ্রন্ট সরকারেরও নেই। প্রকল্প দীর্ঘায়িত হওয়া চাকুরেদের স্বার্থানুকূল বলেই প্রকল্পের কাজ শেষ হতে চায় না, উদ্দিষ্ট ফলপ্রসূ হয় না এবং হাতের কাজ শেষ করার জন্য ক্যাবড়া প্রকল্প রচনা করতে হয়।

ইস্কুলের নিচু ক্লাসে যখন পড়তাম তখন বার্টারসাহেব লিখিয়েছিলেন ইংরেজীতে ভবিষ্যতকাল নির্দিষ্ট হয় ক্রিয়াপদের আগে shall, will যোগ করে,' বহুলাংশে ক্রিয়াপদের পরে বে-ব-বা যোগ করে। পান্নাবাবু তাঁর প্রবন্ধটা আবার পড়লে দেখতে পাবেন, তিনি উৎসাহব্যঞ্জক যা কিছু লিখেছেন সবই ঐ বে-ব-বা পদান্বয়ক। বে-ব-বাতে যদি আমরা এবং দণ্ডকারণ্য আস্থা স্থাপন করতে না পারি, যদি তাতে আরও অপেক্ষা করার ভরসা না পাই, তাতে বাঙ্গালী চেতনার দৈন্য প্রকাশ পায় না, সুবুদ্ধি প্রকাশ পায়।

ভবিষ্যত সম্পর্কে অনেক লোভনীয় ভরসার কথা বে-ব-বা সহযোগে পরিবেশন করতে গিয়ে পান্নাবাবু এমন আর একটি সংবাদ জানিয়েছেন যাতে হেঁটুর বা আশার আলো জ্বলে উঠছিল তাও ঠাণ্ডা পানিতে একদম নিভে গেল। এদিককার বাঙ্গালীরা আমরা এখনও বলি 'কেয়ার অব', ওদিককার বাঙ্গালীরা বলেন 'প্রযত্নে'। এই প্রযত্নের ব্যাপারটা দণ্ডকারণ্যে খুবই গোলমেলে। ওখানকার আদিবাসীরা বসবাস করেন উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ সরকারের প্রযত্নে, আর পুনর্বাসনার্থী বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের ঠিকানা হচ্ছে কেন্দ্র সরকারের ডি ডি এ*

* 'Dandakaranya Development Authority, সংস্থার প্রযত্নে। বিল্লীতেও একটা ডি ডি এ আছে। এটা সেটা নয়।

মন্ত্রী খন্দত্ সাহেব বলেছেন, ডি ডি এ শীঘ্রগিরই তুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পান্নাবাবুও এ কথা জানিয়েছেন। ঐ রাজ্য-সরকারগুলোর কাছে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা বরাবরই সন্দিগ্ধ হয়ে বিবেচিত। এদের বাদ করে' কেন্দ্র সরকার লম্বা লম্বা সড়ক বানিয়ে দিচ্ছেন, বন কেটে এবং পাথুরে জমি থেকে চাষ তুলে ভবিষ্যতে চাষের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে' দিচ্ছেন বলেই পুনর্বাসনের ব্যাপারটা ঐ সরকারগুলো যেন নিজেদের হাতে নিয়েছেন। ডি ডি এ তার পাততাড়ি গুটিয়ে নিলে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের অবস্থা যে অনেকটা না ঘরকা না ঘাটকা গোছের হবে এরকম আশঙ্কা পান্নাবাবুর নিবন্ধেও প্রকাশ পেয়েছে। ওদের

পুনর্বাসনের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারই ও পর্যন্ত একটা নিস্পৃহ নিরাসক্ত মনোভাব অবলম্বন করে এসেছেন। এখনও আমাদের রাজ্যসরকার মনে করেন ওরা কেন্দ্র-সরকারের ভিখারী, রাজ্যের অবাঞ্ছিত বোঝা। সুতরাং উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ সরকার ডি ডি এর অবর্তমানে ঐ প্রকৃত বাঙালীগুলোর জন্যে যে কতটা দরদ অনুভব করছেন তা বুঝতে সাধারণ বুদ্ধিমান লোকের অসুবিধা হয় না।

পান্নাবাবু জানিয়েছেন ওখানকার গ্রামগুলো বহুদূরে দূরে অবস্থিত। চাষের সুযোগ এখনও প্রায় নেই বললেই চলে। বাস্তবিকই ওটা আদিবাসীদেরই দেশ আদিবাসীরা কৃষিতে অপরপক্ষ সংগ্রহজীবী। সংগ্রহজীবিদের বাঁচতে হলে দুটো জিনিস দরকার। প্রথমতঃ অরণ্য বৃহৎ দেশ। পান্নাবাবু বলেন, কয়েকটা পশ্চিমবঙ্গ ওখানে স্থান পেতে পারে। বৃহৎ ঐ দেশটা বনাকীর্ণ, পাথুরে, কর্কশ অযোগ্য হলেও সেই কবে থেকে যখন থেকে অস্ত্যসৃষ্টিই সুরু করেছিলেন তখন থেকে। প্রথমতঃ পাঠানো মানে চাষবাস ছেড়ে ফলমূল ইত্যাদি বাদুড় সংগ্রহ করে বেঁচে জীবন ধারণ করতে অভ্যস্ত হতে বলা। আমাদের প্রাচীন সুমেরীয় আবাসিক ঐতিহ্যে আপত্তিগুলোর অনেকটা রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল। 'ডাঙরে' বসবাসী করে ওদের কেবল পাঠানো। এখানকার বনে ঠাঁই নিতে চাইলে উচ্ছেদ করিয়ে যেতে বাধ্য করা। হয় যাক্, না হয় উপোস করে' মরুক। এসব কথা শুনলে ঠাণ্ডা মানুষের মাথাও গরম হয়ে উঠে অবশ্য যারা পার্টির বাইরের লোক তাদের। সব ব্যাপারটা মনে হয় অভিযাত্রার retrograde, পশ্চাদ্গামিতা সূচক।

ফিরে আসা লোকগুলোকে গ্রহণ করবার মত কর্মসংস্থানের সুযোগ পশ্চিমবঙ্গে হতে পারে কি? এই প্রশ্নটা একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক।

পান্নাবাবু বহুদিন থেকে নিঃশব্দে গ্রামোন্নয়নের কাজ করেছেন। গ্রামপ্রধান রাজ্যে কর্ম-নিযুক্তি এবং আয়বৃদ্ধি সম্পর্কে তাঁর অভিমতকে বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলে মেনে নেয়া যেতে পারে। পূর্বে উল্লিখিত 'দণ্ডকারণ্যের সম্ভাব্য লিমিট' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়ন প্রকল্পে বিপুল জনসংখ্যা একটা বড় সম্পদ বা রিসোর্স।

জন-বহুলতার জন্য ভারতে কোন দুর্বলতা থাকতে পারে না। এই জনশক্তিকে যদি যোগাযোগ ও উৎপাদন বুঝিয়ে দেওয়া হয়, যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয় তখনই প্রমাণিত হবে তার প্রবলশক্তি।" এই যুক্তিটা দণ্ডকারণ্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে দাশগুপ্ত মহাশয় উল্লেখ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কেও ইহা নিশ্চয়ই প্রযোজ্য। পশ্চিমবঙ্গে বিধান সভার উদ্বোধনী ভাষণে মাননীয় রাজ্যপাল বলেছেন, তাঁর সরকারের মতে এ রাজ্যের প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। পান্নাবাবুর যুক্তি মানলে রাজ্যপালের, তথা রামফল সরকারের অভিমতকে ভ্রান্ত বলে' গণ্য করতে হয়, উদ্ভ্রান্তও বলা চলে।

(ক্রমশঃ)

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন
ও
সবাইকে পড়ান—

দলীয়স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থা বানচাল

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিগত ১৯৬৭ সালে ক্ষমতায় আসার পরে পরেই সি. পি. এম সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে আনার জন্য গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে বিসর্জন দিয়ে সকল নির্বাচিত স্কুল কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে দলীয় প্রশাসক নিয়োগ করেছিল, অ-সি. পি. এম শিক্ষকদের এমনকি প্রবীন শিক্ষকদেরও সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে বরখাস্ত করে বীরত্ব দেখিয়েছিল। শিক্ষকের মৌলিক অধিকারকে অস্বীকার করে শিক্ষকদের পথে বসিয়েছিল যেহেতু ঐ শিক্ষকরা সি. পি. এম ভুক্ত ছিল না। এবারেও ঐ একই পথ অনুসরণ করে বামফ্রন্ট তথা সি. পি. এম শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা, অশান্তি ও জোরজুলুমের প্রশ্রয় দিয়েছে দলীয় প্রশাসক বিস্তারের হীন মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার আশায়। এর বিরুদ্ধে চারিদিকেই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে এবং ক্রমশঃ আরও বৃহত্তরের প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে বলে বিশেষ সম্ভাবনা আছে এবং ছাত্র ছাত্রীরাই এর ফলে চরম ক্ষতিগ্রস্থ হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সি. পি. এম এর এই অগণতান্ত্রিক নীতি ও দলীয় প্রশাসক নিয়োগ ভবিষ্যতে একটা বড়রকমের বিপর্যয় ডেকে আনবে যা সব সময়েই শিক্ষার জগতে ঠেলে দেবে অন্ধকার পথের ইশারা জানাবে, যদিও তা পরিত্যক্ত হওয়া সর্বদা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ চিরতরে বন্ধ হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। শিক্ষায় প্রসার ও প্রচার সুদূরপ্রসারী হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিষাক্ত রাজনীতির অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ বর্জনের সর্বদেশে সর্বকালে অভিপ্রেত বস্তু। সম্প্রতি নারকিলায় অবস্থিত হিন্দু স্কুলে সি. পি. এম কর্তৃক হামলা অনুষ্ঠিত হয়। এই স্কুলের আজন্ম উল্লেখযোগ্যভাবে বেশ বিশাল, ভিত্তিভূমি পাকাবাড়ী বিশ-পঁচিশটি প্রশস্ত কামরা ও হল বিশিষ্ট একটি বেসরকারী প্রায় ২৯০/২০০ জন ছাত্র সমন্বিত উপযোগী বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের ও সমস্ত প্রশস্ত ঘর ও হলের জন্য এই বিদ্যালয়টি সি. পি. এম নেতাদের পছন্দ হয় ও মনে মনে এক এখানে সেবার অনুষ্ঠান করতে চাইলে যদি স্কুল কর্তৃপক্ষ অনুমতি না দেন, এইরূপ অনুমানের ওপর নির্ভর করে পূর্বাহ্নেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বামফ্রন্ট সরকার স্কুল কমিটি উপরোক্ত পন্থায় বেআইনীভাবে ভেঙ্গে দিয়ে তথায় দলীয় প্রশাসক নিয়োগ করে এবং এই প্রশাসক নিজ ইচ্ছায় দলের অনুমতি সেবার অনুষ্ঠানের অনুমতি সি. পি. এম দলকে দেয় সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে, যাহা উক্ত স্কুলের কাগজপত্র পরীক্ষা করলেই বাস্তব সত্য বলে প্রকাশ পাবে। সেবার জন্য এই রাজনৈতিক বা উক্ত সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক একটি বিদ্যালয়ের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে না দিয়ে কোন সাধারণের ব্যবহার্য হল ও রাজে তাহা অনুষ্ঠিত হলে কি বেশ ন্যায়সঙ্গত কার্য হতো না ? সি. পি. এম শাসন ক্ষমতায় বসে দলকে দখা চাইছে তা আখির হবে কি করে? এরপর উক্ত বিদ্যালয়টি অনিশ্চয়তের ভবিষ্যতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে একই সুবিধা ও সুযোগ দিতে বাধ্য হলে সেটা কি কোনমতেই একটা ভাল কাজ বা ব্যবস্থা বলে গণ্য হবে? নিশ্চয় এতে করে ভবিষ্যতে স্কুলটির মারাত্মক ক্ষতি করা হলো, যে ক্ষতি অপূরণীয় বলে বিবেচনা হয়। সরকার কোথায় বিদ্যালয়ে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ বন্ধ করবেন—না তাঁরাই এর পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। কি হীন চিন্তাধারা ও ক্ষুদ্র মনোবৃত্তি বর্তমান সরকারের? অভিভাবকদের এখন থেকেই সতর্কতা অবলম্বন এ বিষয়ে বিশেষ প্রয়োজন, নতুন বিদ্যালয়ের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এ সব ছাড়াও অন্যান্যভাবেও স্কুল শিক্ষাক্ষেত্রে আরও এক অশনি বিপর্যয়-

কারী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষক মহাশয়দের দোষে, তা হচ্ছে তাঁদের মধ্যে বিদ্যালয়ের ভিতরেও রাজনৈতিক চর্চা, ও রাজনৈতিক ভিত্তিতে দলাদলি এবং ছাত্র বা ছাত্রীদেরও কেনেতনে তাতে লিপ্ত করার প্রবণতা ও প্রতিযোগীতা সর্বত্র পরিদৃশ্যমান। এমন কি শিক্ষকদের বেতন বাড়াবার তাগিদে ছাত্র ছাত্রীদের হাতিয়ারস্বরূপে ব্যবহার করা ও যখন তখন সেই কারণে ধর্মঘটের উস্কানি দেওয়া হয় যদিও তা নেপথ্যে পরিচালিত হয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের যোগসাজসে। কখনও কখনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির মানসেও তাঁরা ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহ, উদ্দীপনা যোগান এবং সাহসী করে তোলেন। তাঁরা শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে এইসব কার্যাপ্রণালীকে অধিক প্রাধান্য দেন তাঁদের দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণে কখনও বা ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য, আর ঐ সব তাঁরা করেন সজ্ঞানে। একবারও তাঁরা ভেবে দেখেন না এই কাজের পরিণাম কি এবং ছাত্রদের ভবিষ্যত কোথায় গিয়ে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে। ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শিকেয় উঠে গেলেও যেন তাঁদের কিছুই যায় আসে না। আরো একটি অন্যায়কার্য এঁদের দ্বারা প্রায়শঃই সংঘটিত হয় তা হচ্ছে তাঁরা যে ছেলে বা মেয়ের প্রাইভেট টিউটর, সেই ছেলে বা মেয়ে যদি সেই শিক্ষক বা শিক্ষিকা যে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত তথাকার ছাত্র বা ছাত্রী হয় তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পরীক্ষার বসার কিছু পূর্বেই ঐ সব ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলির বেশ কিছু অংশ উক্ত প্রাইভেট টিউটরদের মারফৎ জানতে পারে এবং সে ভাবেই পূর্বাহ্নে প্রস্তুত হয়ে পরীক্ষায় অনায়াসে পাস করে, অথচ প্রকৃত মেধাবী ও পরিশ্রমী দরিদ্র ছাত্র ছাত্রীরা পরীক্ষান্তে এইসব চমকপ্রদ ব্যাপার জানতে পারে ও ব্যথিত হৃদয়ে ঘরে এসে ঐ সব অন্যায় ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিভাবকদের কাছে নালিশ করে এবং যদি কোনও অভিভাবক এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করে তবে তাদের ছেলে মেয়েদের পরীক্ষায় ফল নিতান্ত খারাপ দেখা যায় যতই ভালোভাবে পরীক্ষায় তারা উত্তরপত্র লিখে আসুক না কেন। এই অন্যায় ও অসদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যদি রক্ষিত ছেলে মেয়েরা পরীক্ষার হলে পরস্পর টোকাটুকিকোরে যে কোনও উপায়ে পাস করার চেষ্টা করে, তবে কি সেটা একমাত্র তাদেরই অপরাধ? শিক্ষকশিক্ষিকারা কি ধোয়া তুলসীপাতার মত মত পবিত্র শিক্ষাব্রতী হিসাবেই বিবেচিত হবেন—না তাঁরাও এই হীন কার্যের জন্য কোথাও প্রত্যক্ষ আবার কোথাও পরোক্ষভাবে অল্পবিস্তর দায়ী হবেন, সেটাই আজ সর্বত্র আলোচিত হতে শুরু করেছে। অবশ্য একথা সত্য যে সব শিক্ষক-শিক্ষিকারাই উপরোক্ত অসদাচরণে নিশ্চয়ই লিপ্ত নয়, তা যদি হত তবে এতদিনে তার কুফলে দেশ এমনভাবে ছেয়ে যেত যে, আর মাথা তুলে আমাদের দাঁড়ান কোন মতেই সম্ভব হতো না। অনুমান প্রায় অর্ধেকেরও কমসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকারা উক্ত অন্যায়কারী এবং শিক্ষকদের চেয়ে শিক্ষিকারাই উক্ত অসদাচরণে বেশীপটু বলে শুনা ও দেখা যায়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিভিন্ন সংঘ বা সমিতি আছে আর ঐ সব সংঘ-সমিতি কোন না কোন রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় ও মতাদর্শে পরিচালিত হয়। যেমন এ, বি, টি, এ প্রতিষ্ঠানে সি, পি, এম ও কয়েকটি বামপন্থী দলের মতাদর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রাধান্য পায় সর্বাধিক; ফলে শিক্ষক শিক্ষিকারা স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক বিভিন্ন রাজনৈতিকদলের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হয় এবং সেই কারণেই বিদ্যালয়গুলি এখন আর শিক্ষালয় শুধু নয় রাজনৈতিক দাবার শক্ত ঘুঁটিরূপে পরিগণিত হয় এবং তাই শিক্ষাক্ষেত্রেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চেয়ে রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের প্রভাব বেশী কার্যকারী হয় বলে দেখা যায়; অথচ দেশের প্রকৃত শিক্ষিত ও প্রখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সব সময়েই হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন "শিক্ষাক্ষেত্রে যেন কোন সময়েই রাজনীতি ঢুকতে না পারে কারণ রাজনীতি শিক্ষাক্ষেত্রে ঢুকলেই দেশে শিক্ষার ধ্বজা ধ্বসা হতে বিলম্ব হবে না"। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় আজ তাই হয়েছে এবং ফলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পর্যন্ত

নৈরাজ্য ও হতাশা ক্রমবর্দ্ধমান। তবুও রাজনৈতিক নেতাদের এমনকি দেশনায়ক ও রাষ্ট্রনায়কদের পর্য্যন্ত এখনও হুঁশ নেই এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে, এরচেয়ে আর দুঃখের কথা কি আছে? আশাকরি সবাই এই অবস্থার সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হবেন অচিরেই।

অতঃপর সমূহ বিপদ আসন্ন। বর্ত্তমানে দেখা যায় যে প্রায় সমস্ত রাজনৈতিকদলগুলিই এদেশে ছাত্রাবস্থা থেকেই ছেলে মেয়েদের নিজ নিজ দলে টানবার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যেই বিদ্যালয়ের, মহাবিদ্যালয়ের এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দীর মধ্যে ও বাহিরেও বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের ও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধার কথা প্রচার করে এবং এই প্রচার কার্য্যের জোরেই ছেলেমেয়েদের ছাত্রাবস্থাতেই দলে রিক্রুট করে, একবারও তাঁরা ভাবেন না যে এর ফলে নেতাদের ছোট পাওয়ার প্রচুর সুবিধা হলেও এইসব তরলমতি কিশোর কিশোরীর পাঠাভ্যাসের তথা জ্ঞানার্জ্জনের কি বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হবে? ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত নষ্ট হবে এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই নিয়মিত লেখা পড়ায় বিশেষ ভাল ফল করতে পারবেই না, উপরন্তু লেখা পড়াকে অবহেলা করে নিজেদের আখের অযথা নষ্ট করবে বলে পড়ে এবং ক্ষণিক উত্তেজনার বশে, সেটা কি কোন রাজনীতিবিদ বা সমাজবিজ্ঞানীরা দেশের স্বার্থেও ভাবছেন না? কি মর্ম্মান্তিক দুরবস্থা হবে এই সব ছেলেমেয়েদের অদূর ভবিষ্যতে, তা ভাবলেও মনকষ্ট হয় অথচ দিনের পর দিন এই ঘটনা ঘটে চলেছে অবাধে এবং ফলে ছাত্র ছাত্রীদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে কঠিন বেগ পেতে হবে ও অধিকাংশরাই পরে এই ব্যবস্থার ক্ষমাহীন কুফলের জন্য শিক্ষকদের ও সমাজের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু ও বিরক্ত এবং বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, তবে তখন আর তাদের উক্ত পথ হতে ফিরে আসা বোধ হয় সম্ভব হবে না। ফলে তাদের সমস্ত বিতৃষ্ণা ও ক্রোধ গিয়ে পড়বে রাষ্ট্রনায়কদের ও রাজনৈতিক নেতাদের ওপর এবং পরিণামে খুনের, রাহাজানির, ডাকাতির, রাহাজানির, পরস্ব অপহরণের ও অন্যান্য সব সমাজবিরোধী কার্য্যের প্রসার বাড়বে সীমাহীনভাবে যার মোকাবিলা করতে এই সমাজ পদে পদে ব্যর্থ হবে কারণ সমাজ এই সমাজ বিরোধীদের জন্য অতীতে কর্ত্তব্য সাধনে অবহেলা করেছে আজকালকেই, তাদেরই এই দুর্ভোগ সমাজের সকলকেই সমানভাবে ভুগতে হবে অতীত ভুলকর্ম্মের প্রতিফল হিসাবেই। তখন আর অনুশোচনার অবকাশ বা উপায় থাকবে না। সময় থাকতে এখনও সাবধান হলে তবু কিছু রক্ষা পাবে নচেৎ কাল অনিবার্য্যরূপে এদেশে আত্মপ্রকাশ করবেই করবে। আপাতত সুবিধার জন্য পরিশেষে যে মারণ রাজনৈতিকদলগুলির ও রাষ্ট্রনায়কদের একাংশে দিতে হবে তা অতি তুচ্ছের আর ক্ষতি যা হবে তা অপূরণীয়। কমিউনিষ্ট পার্টির ছাত্র ফেডারেশনের চাপে পড়ে কংগ্রেস ছাত্রপরিষদ ও জনসংঘ বিদ্যার্থী পরিষদ গঠন করে ছাত্রফ্রন্ট খোলে এবং অধুনা ছাত্রজনতা নাম দিয়ে জনতাদলও ছাত্রফ্রন্ট চালু করেছে। সব দলের উদ্দেশ্য ছাত্রদের দলে এনে, দলে নূতন রক্তসঞ্চার, কিন্তু সে রক্ত যে বিষাক্ত নয় তা কিভাবে বুঝা যাবে? ছাত্রসংস্থাগুলি যে যে দলের কর্ত্তৃত্বাধীন দেখা যায় সেই সেই দলের নেতাপ্রতিম নেতারাও কিন্তু মাঝে মাঝে নিজদলের ছাত্রদের দ্বারা বিরক্ত ও অপমানিত হন, এর কারণ কি তাঁরা একবারও ভেবে দেখেছেন? বোধ হয় নয়। মনে হয় ছাত্ররা পরিষ্কারভাবে বুঝে নিয়েছে যে অধিকাংশ নেতারা তাঁদের কার্য্যসিদ্ধি ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী নিজ দলের জন্য নেতাদের পিছনে ছাত্রদের উস্কে দেন আর ছাত্ররা অধিক ভাবপ্রবণ বলেই প্রথমেই এটা বুঝে উঠতে পারে না, পরে যখন বুঝতে পারে তখন উক্ত উস্কানিদাতাদেরও সাবধান করতে পিছপাও হয়না, ফলে প্রায়ই উক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় যেটা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। আর তা ছাড়া বর্ত্তমান রাজনীতিতে দেশের স্বার্থের চেয়ে দলের স্বার্থ ও দলের স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রাধান্য এত বেশী যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিপথগামী হচ্ছে বলে বাস্তবে দেখা যায়।

(চলবে)

প্রতিবাদ

সম্পাদক, বিপ্লবী বাংলা

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে)

মহাশয়,

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী "বিপ্লবী বাংলায়" প্রকাশিত একটি চিঠি পড়ে বিস্মিত হলাম। পত্রলেখক শ্রীভট্টাচার্য্য হঠাৎ শ্রীমতী গান্ধীর উপর খাপ্পা হয়েছেন বলে মনে হয়। যুক্তিতর্কের কোন ধার ধারেননি। বাস্তব পরিস্থিতির কোন মূল্যায়নও করেননি। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার সময় দেশে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, সেটার কোন উল্লেখ বা বিচার ও করেন নি। রেল ধর্মঘট করে দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে পঙ্গু করে দেওয়ার পরিকল্পনামত কাজ করা হয়েছিল, ডিনামাইট দিয়ে রাজধানীর উপর হামলা করতে কিছু লোক সচেষ্ট ছিল। নির্বাচিত এম. এল. এদের মারধর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা করার ষড়যন্ত্রের অস্তিত্বকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মিলিটারী ও পুলিশকে বিদ্রোহ করার জন্যও উস্কানি দেওয়া হয়েছিল। কালোবাজারী ও চোরাকারবারীদের কার্য্যকলাপের ফলে অর্থ-নৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। সর্বোপরি মুদ্রাস্ফীতির চাপকে অবদমিত করার প্রয়োজনও ছিল অত্যাবশ্যক আইনের মাধ্যমে। জরুরী অবস্থার সময় যারা বাড়াবাড়ি করেছে, তাদের কেউ সমর্থন করেনা। তাদের কার্য্যকলাপ নিন্দার্হ। কিন্তু শুধু স্বৈরতন্ত্র বজায় রাখার জন্যই জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছিল, এ বক্তব্যের পেছনে কোন যুক্তি আছে বলে বহুলোক মনে করেন না। তা হলে নির্বাচন ঘোষণা করার কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং সব দোষ শ্রীমতী গান্ধীর উপর চাপিয়ে দিলে, প্রতিহিংসা ও অন্ধ বিদ্বেষ চরিতার্থ হতে পারে, কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে না।

'গণ আদালত' কথাটির কি অর্থ পত্রলেখক করতে চেয়েছেন বোঝা দুঃসাধ্য। একবার বলছেন "বুর্জোয়া ডিমোক্রেটিক শাসনতন্ত্রে" গণ আদালত থাকতে পারেনা। আবার শাহ কমিশনকে গণ আন্দোলন (গণ-আদালত ?) বলে Cirtificate দিচ্ছেন। শাহ কমিশন ত ইন্দিরাজীর উপর ক্রুদ্ধ ক্ষমতাসীনদল কর্তৃক নিযুক্ত। এটা গণ-আন্দোলনের ফলে হয়েছে বললে ত ঐতিহাসিক বিকৃত ও করা হবে। তা ভিন্ন, প্রতিপক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণকে Cross Examine করার সুযোগ না দিয়ে যে রায় দেওয়া হয়েছে, তার Judicial Value কতটুকু, তা ত আদালতের বিচারাধীন আছে। পত্রলেখকের ইন্দিরাজীর পরাজয় উল্লসিত হবার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সত্যকে চেপে দিয়ে, অর্দ্ধ সত্যকে প্রচার করে, মানুষকে ভুল বোঝাবার প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই হাস্যকর।

ইতি—

সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

এ সম্বন্ধে আর কোন বাদানুবাদ ছাপা হবে না—সম্পাদক।

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী উমেশ চন্দ্র সিং

সম্প্রতি প্রখ্যাত বিপ্লবী উমেশচন্দ্র সিং আগরতলায় ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ত্রিপুরা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। অকৃতদার, আদর্শনিষ্ঠ, কর্মবহুল এই সদাহাস্যময় বিপ্লবী জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত দেশ সেবার কাজে নিষ্ঠা সহকারে নিযুক্ত ব্যাপৃত রেখেছিলেন। বিপ্লবী জীবনের পুরস্কার—লাঞ্ছনা, কারাগার—বহু বৎসর হাসিমুখে বরণ করে ছিলেন। আমরা এই মহান বিপ্লবীর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

RgedNo. R. N .24311/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | বাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

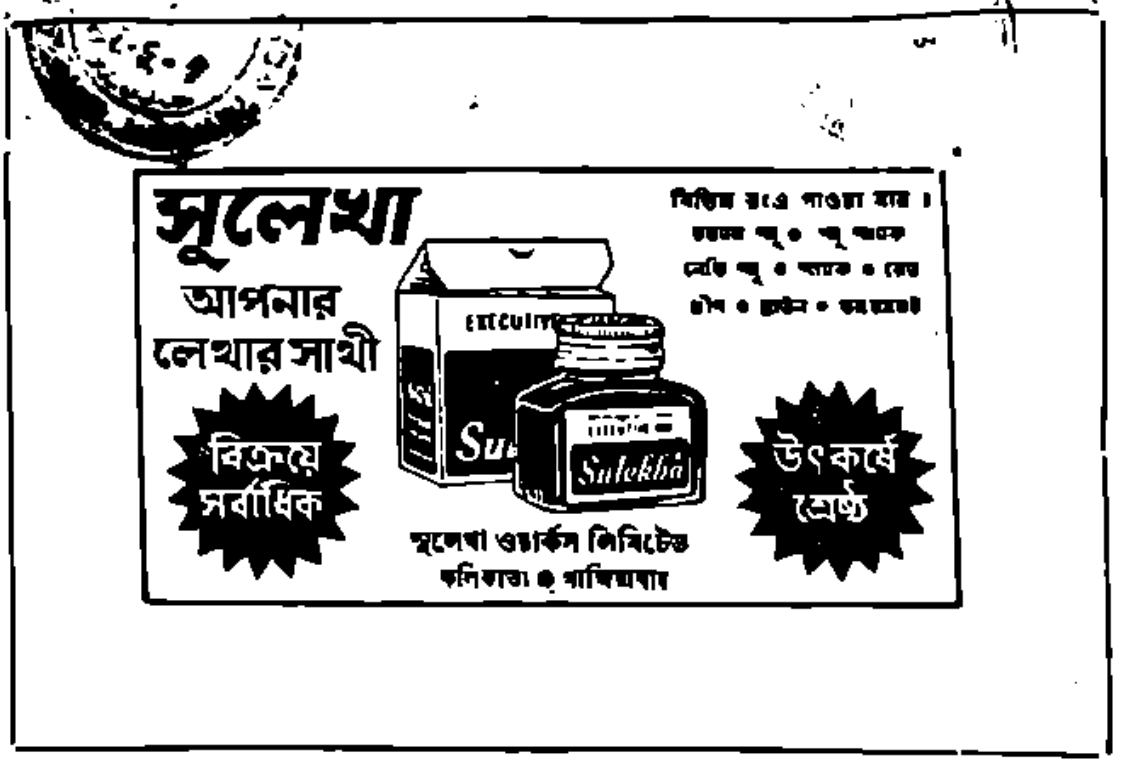

7 MAR 1979

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী, শ্রীবারীণ রায়।
সম্পাদক—শ্রীশান্তি শরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতার—শ্রীনন্দগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅমিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীকমল গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্য্যালয় :—৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

বিপ্লবী বাঙ্গালী

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ২৫ শে ফাল্গুন ১৩৮৫ ১০ই মার্চ, ১৯৭৯	২১ সংখ্যা

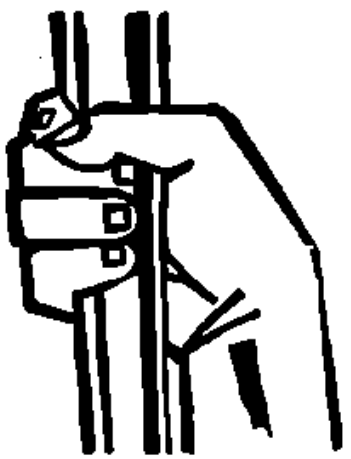

এই সংখ্যায়

কেন্দ্রীয় বাজেট
। সম্পাদকীয় ।

বিশেষ রচনা

মরিচঝাঁপি—কিছু আন্তরিক ভাবনা
। শ্রীশৈলেন দাশগুপ্ত ।

ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি ঃ কর্ম্মপরিচিতি
। ডঃ আশা দাস ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত ।

। ক্ষীরোদ দত্ত ।

দলীয়স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থা বানচাল
। শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ভারতীয় চতুর্ষষ্ঠীতম বর্ষ পূর্তি দিবস পালন

> অধিককে তুষ্ট রাখা দরকার... কিন্তু ধনিকের লাভ বজায় রেখে যদি মজুরী বাড়ানো হয়, তবে অনেক অত্যাবশ্যক বস্তুর দাম বেড়ে যায়, তার ফলে সকলেরই খরচ বাড়ে অন্যান্য পণ্যও দুর্মূল্য হয়, সুতরাং আবার মজুরী বাড়াবার দরকার হয়, এই দুই চক্রের ফল দেশবাসী হাড়ে হাড়ে ভোগ করে।—রাজ শেখর বসু

সম্পাদকীয়—

কেন্দ্রীয় বাজেট

আমাদের দেশের মানুষ প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দুটি সপ্তাহে দারুণ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও আশা নিরাশার মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হন। তার কারণ, কেন্দ্রে এবং প্রতিটি রাজ্যে শাসকদল অর্থ-নৈতিক বাজেট এই সময়ে প্রকাশ করেন। কিন্তু এরা ভুলে যান যে বাজেট শুধুই বর্তমানের প্রতিফলন নয়, ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিও এর মধ্যে থাকতে হবে। ফলে করের খড়্গাঘাত থেকে কোন রেহাইতো মেলেই না, বরং ক্রমবর্দ্ধমান বোঝা মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় প্রত্যেক দলই সরকার বাড়িয়ে চলেন জনগণের নাম করে। প্রতি বৎসরের বাজেটে লিখিত আয় ব্যয়ের অঙ্কটা মেলে না উদ্বৃত্ত ঘাটতিও ঘটে প্রচুর। এ সত্য অনস্বীকার্য্য যে তারা ব্যবসায় ক্ষেত্রেই হোক কি প্রশাসনিক ক্ষেত্রেই হোক অপব্যয়, অসামর্থ্য, অবিমৃষ্যকারিতা, অন্ধ মতবাদের মোহে রাজকোষের টাকা খরচ করেন বেহিসেবী ভাবে। পরের টাকার উপর কোন মমতা থাকে না এবং খসীমত খরচ করে ঘাটতি ঘটালেও দলভারী থাকলে জবাবদিহিও করতে হয় না। যোগ্যতার প্রশ্নটা ত ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না এরা। দেখা যায়, আয় ব্যয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা জন্য এদের কোন আগ্রহ থাকে না। নিজেদের জিদ এবং শখের জন্য কোটী কোটী টাকা খরচ করতে এরা বিবেকের দংশন অনুভব করেন না। কারণ এরা জানেন, "লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন।" অপব্যয়ের ছিদ্র বন্ধ না করে, ব্যয় করার ঝোঁক যখন সর্ব্বগ্রাসী হয়, তখন এ ঘটনা ঘটতে বাধ্য। কিন্তু মজা হয় এই যে ক্ষমতার আসনে এরা বেশ নিরাপদেই থাকেন সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে। বিরোধী দলগুলো হৈ চৈ করলে, এমন কি সঙ্গত সমালোচনা করলেও, এরা সব কিছুই উড়িয়ে দেন। ক্ষমতাসীন থাকাকালে এদের নিজেদের স্বার্থে হয়ত কোন আঁচড় লাগে না। তাই সত্য মিথ্যার যাঁসবৃন্দনিতে ভরা বিবৃতির ফোয়ারা ছুটিয়ে এরা কিস্তীমাৎ করতে চান।

প্রসঙ্গত: এবারকার কেন্দ্রীয় বাজেট সম্বন্ধে একটু সমীক্ষাকালে এই সত্য প্রমাণিত হবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নিজেকে গরীব কৃষকদের একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা বলে গৌরববোধ করেন। এবারকার বাজেটে তাদের কিছুটা সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে বলে দাবী করা হচ্ছে। কিন্তু সুযোগ সুবিধার কতটা অংশ গরীব কৃষকদের ভাগ্যে জুটবে, তাতে গভীর সন্দেহ আছে।

পেট্রোলের দাম, যন্ত্রাংশের দাম, রেলের মাল পরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধি হওয়ার দরুণ উৎপাদন এবং পরিবহনের ব্যয় বাড়বে। ফলে অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামও বাড়বে। অধিকন্তু এই জাতীয় অনেক জিনিসের উপর ত সোজাসুজি করবৃদ্ধি করাও হয়েছে। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন খরচ কিছুটা কমলেও, তাকে কেরোসিন, দিয়াশলাই, কাপড়, বিস্কুট প্রভৃতির ন্যায় জিনিসপত্রের জন্য বেশী খরচ করতে হবে। তা ভিন্ন দুষ্টচক্রের ক্রিয়া প্রভাবে সব জিনিসের দাম বাড়বে। তবে এতে কতটা সুফল কৃষক লাভ করবে, কেন্দ্রীয় সরকার বলতে পারেন কি? তা ভিন্ন, ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা সঙ্কুচিত হলে জিনিস পত্রের কেনা বেচার পরিমাণও সঙ্কুচিত হতে বাধ্য। সমাজের বৃহৎ অংশ হলেও অন্যান্য শ্রেণীকে পঙ্গু করলে, সমাজের ভারসাম্য বাহত হবে নিশ্চিত ভাবে। অবশ্য ধনী সম্প্রদায়ের লোকেদের এই হিসাবের মধ্যে ধরা হচ্ছে না। মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীকে এই হিসাব থেকে বাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হতেই পারে না। শ্রমিক শ্রেণী ও চাকুরীয়া শ্রেণীকে বোনাসের নামে যৎকিঞ্চিৎ ডান হাত দিয়ে তুলে দিয়ে, বর্দ্ধিত করের বোঝা চাপিয়ে সব সুবিধাটুকু বাঁ হাত দিয়ে কেড়ে নেওয়ারই নামান্তর নয় কি? ধনিক শ্রেণীকে আরো বেশী করে ধনী করে তুলতে কেউ সমর্থন করবে না। কিন্তু সাধারণ মানুষের মোটামুটিভাবে ডাল ভাতের সংস্থান বন্ধ করে দেওয়ারও কোন যুক্তি থাকতে পারে না। দশ টাকা বোনাস দিয়ে ত্রিশ টাকা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিলে, অঙ্কের হিসাবে তার কতটা লাভ হয়, সেকথা একটি শিশুও বুঝতে পারে।

একটি অসঙ্গত কাজ করে অদ্ভুত যুক্তি তর্কের ধোঁয়া সৃষ্টি করে একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করা যায় বটে, বিশেষ করে বিবৃতির উপর যখন কোন ট্যাক্স নেই। অর্থ মন্ত্রকের লোকেরা বলছেন, বর্দ্ধিত করের জন্য, টাকায় খরচ বাড়বে মাত্র এক পয়সা। কোথায় পেলেন ওরা এই হিসাব? ওদের কি বাজার করতে হয় না, না সে খরচটা অন্যেরা জুগিয়ে দেয়? দেশের মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা হল, টন প্রতি তিন টাকা কর বাড়লে, হাত ঘুরে সেটা বাড়ে মন প্রতি দুই টাকা। দেশে হৈ চৈ সুরু হলে, সরকারই তখন আইন করে ঐ কালোবাজারী দরটাকেই ধার্য্য করে দেন, এমন দৃষ্টান্ত অজস্র আছে। এই ত হল প্রশাসনিক উৎকর্ষের নমুনা। অন্য একটি মারাত্মক দিক আছে এই বৎসরের বাজেটের। কয়েকশত কোটী টাকা ট্যাক্স বাড়িয়েও ঘাটতি থাকছে তের শত কোটী টাকার উপর। এই ঘাটতিপূরণ করা হবে কি ভাবে? ঐ সেই চিরাচরিত প্রথায় অতিরিক্ত নোট ছাপিয়ে। অর্থ নীতি শাস্ত্রের নিয়মানুসারে, এতে মুদ্রাস্ফীতি হবেই এবং তার ফলে দ্রব্যমূল্যের দরের হবে আরো উর্দ্ধগতি। সে বোঝাও বহন করতে হবে গরীব জনসাধারণকে। মুখে একজন মন্ত্রী যতই বলুন বাড়ুন যে জিনিস পত্রের মূল্যমান স্থিতিশীল আছে এবং থাকবে, কার্য্যকালে সেটা একটা নিষ্ঠুর পরিহাস বলেই প্রমাণিত হবে।

এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? কয়েকটি কাজ করতে পারলে হয় ত কিছুটা সুফল হতে পারে। মৌল কথা হল, কম খরচে, উৎকৃষ্ট জিনিসপত্রের উৎপাদন ও যান্ত্র শক্তির উৎপাদন বাড়াতে হবে। তা ভিন্ন, সর্বপ্রথম প্রশাসনিক দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন করে, অর্থ নির্গমনের পথ রুদ্ধ করতে হবে। অর্থ আগমনের পথ প্রশস্ততর করতে হবে। দলীয় স্বার্থে নির্বাচন তহবিল গড়ে তোলার আগ্রহে, কর ফাঁকি, মুনাফাশিকার, চোরাচালান, কালোবাজারী বন্ধ করতে হবে কঠোর হস্তে।

সরকারী কোষাগারের প্রতিটি পয়সার অপব্যয়, চুরি, অপচয় বন্ধ করতে হবে। সরকারী ব্যবসায়ী সংস্থাগুলিতে লোকসানের অবসান ঘটিয়ে, লাভের পথ সুগম করতে হবে। ইংল্যাণ্ডের মত একটি ছোট দেশ তাদের অর্থ নৈতিক কাঠামো বজায় রেখে যদি অন্য দেশকে ধার দিতে পারে তবে আমাদের মত প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ একটি দেশ কেন তার অর্থনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় করতে পারছে না তবে মূল কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং ত্রুটী বিচ্যুতি সংশোধন করে দেশকে একটি সুসংহত, সমৃদ্ধিশালী বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বাকচাতুরী, রচনাবিন্যাস, একগুঁয়েমী ত্যাগ করে, সর্বজনকল্যাণমূলক নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিহিত, এটা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। অন্য কোন পথ আছে বলে মনে হয় না।

নতুন ভারত যারা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের কেবল দিয়ে যেতে হবে—
সারা জীবন কেবল দিয়ে যেতে হবে—নিজেকে বিলিয়ে কাঙ্গাল হয়ে
যেতে হবে—প্রতিদানে কিছু না চেয়ে।

—নেতাজী

মরিচঝাঁপি—কিছু আন্তরিক ভাবনা

।। শ্রীশৈলেন দাশগুপ্ত ।।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এ রাজ্যে কি বাস্তবিকই নূতন কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই? নিশ্চয়ই আছে। উন্নয়নশীল দেশমাত্রেই কৃষি ও শিল্প সম্প্রসারণের প্রচুর সুযোগ ও প্রয়োজন আছে, এবং কৃষি ও শিল্পের সম্প্রসারণ মানেই ত নিযুক্তির সম্প্রসারণ। প্রেরক শিল্প প্রসারিত হ'তে এবং ফলপ্রসূ হ'তে অনেক সময় লাগে। কৃষির সম্প্রসারণপ্রয়াস প্রধানতঃ শ্রমগুরু এবং সেজন্য অল্পকালে সাধ্য। কর্মসংস্থান বিস্তারের সম্ভাবনাও উন্নয়নকামী গ্রামপ্রধান দেশে বেশী। অবশ্য এটা মনে রাখা দরকার যে কৃষি ও শিল্পকে সযত্নে উন্নয়নমুখী করে' গড়ে তুলতে হবে,—যা সব সরকারের ঘোষিত নীতি। পশ্চিমবঙ্গে কৃষির বর্তমান অবস্থা যা তার কিছু সাংগঠনিক পরিবর্তন করে নিতে পারলে এবং সাধারণ কৃষির সঙ্গে সহজ সম্পাদ্য কিছু কিছু পার্শ্বপ্রয়াস জুড়ে দিতে পারলে কৃষি এবং সহযোগী কর্মে নিযুক্তদের সংখ্যা এবং তাদের আয় অল্পকাল মধ্যে অন্তত দ্বিগুণ করা সম্ভব। কৃষির সঙ্গে মাছের চাষ, পশুপালন, হাঁস মুরগীর চাষ, মৌমাছির চাষ, প্রভৃতির সংযোজন তেমন ব্যয়সাধ্য নয় এবং এসব কাজে পারদর্শিতা অর্জন নূতন কৃষিরীতির অবলম্বনের চাইতে কঠিনতর নয়। এসবকে উপযুক্ত ফলপ্রদ করতে হ'লে কৃষিক্ষেত্রে যারা জীবিকার্জন করে তাদের জীবনরীতি কিছুটা নূতনভাবে সংগঠিত করা দরকার, তাদের মধ্যে বোধ বা সমবায়বদ্ধ প্রচেষ্টার স্থায়ী প্রবর্তন দরকার। নিঃস্ব এবং সমাংস্থাপন্নদের নিয়ে এ ধরণের চেষ্টা সহজে এবং দ্রুতফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। গ্রামে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে যাওয়া প্রান্তিক কৃষকরা এবং গৃহত্যক্ত প্রত্যাগত উদ্বাস্তুরা এই শ্রেণীতে পড়েন। সকলেই এরা সমৃদ্ধতর ভবিষ্যত রচনার শ্রেষ্ঠতর উপাদান।

বর্তমানে আমাদের দেশে যখন যেখানে যে সরকারই কর্তৃত্বে থাকুন না কেন তার সঠিক মূল্য নিরূপণের একটি মাপকাঠিই আছে,—ঐ সরকার দেশের কর্ম-জীবনকে, বিশেষ করে দেশের গ্রামীণ জীবনকে উন্নয়নমুখী সংগঠন কতটা দিতে পেরেছেন সেটা দেখা। গ্রামবনের সুযোগে বর্তমান সরকার যে গ্রামীণ উৎপাদকদের সাধারণমাত্র সংগঠিত করতে পারেননি, করার চেষ্টাও করেন নি, এটা যে কেউ তাইনে বাঁয়ে তাকালেই দেখতে পাবেন। আগের সরকারগুলোও এ বিষয়ে অনিচ্ছা ও অক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে বইপুস্তক রিপোর্ট প্রভৃতির উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। কারণ সাধারণ মানুষের সে সব পড়ার সময় কোথায়? আমাদের প্রায় সবারই ভৌড় সাধারণ পত্র-পত্রিকা পর্যন্ত। ১৭ই এবং ১৯শে জানুয়ারীর স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় শ্রী বি এম ভাটিয়ার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক প্ল্যান নিয়ে। ঐ প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি পরিসংখ্যান এখানে তুলে দিচ্ছি। ৭০ সালের, অর্থাৎ ৯' বছর আগেকার পরিসংখ্যান। এই ৯' বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে সব দেশেই। তবে বিভিন্ন দেশের আপেক্ষিক অবস্থার খুব বেশী পরিবর্তন হয়নি। শুধু পাকিস্তান দুটো আলাদা রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে গিয়েছে। যা হোক আলোচ্য দেশগুলো সবই গ্রামপ্রধান এবং এখনও প্রধানতঃ কৃষিভিত্তিক। ৭০ সালে কোন্ দেশের কৃষি ও কৃষকের কি হাল ছিল এবার তা দেখুন।

গড়ে প্রতি ১০০ হেক্টেয়ার জমিতে কৃষিকার্যে নিযুক্ত ছিল—

ভারতে	... গড়ে	৯২ জন,	মাথাপিছু গড় আয় ছিল ১৫০
পাকিস্তানে			
(পূর্ব ও পশ্চিম)	.... ১০১ ,,	,,	,, ২১৫
শ্রীলঙ্কায়	... ১০৭ ,,	,,	,, ২৬৮
দক্ষিণ কোরিয়ায়	... ২৬১ ,,	,,	,, ১৬৯

সমপরিমাণ জমিতে ভারতের তুলনায় যুক্ত পাকিস্তানে কর্মনিযুক্ত ছিল ১০% বেশী মানুষ এবং তাদের গড় আয় ছিল ভারতের তুলনায় জন প্রতি ৪০% বেশী। দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মরতদের সংখ্যা ছিল ভারতের প্রায় তিনগুণ, তৎসত্ত্বেও মাথাপিছু গড় আয় ছিল ১৭% বেশী। অন্য কয়েকটি দেশের কৃষিতে গড় নিযুক্তির সংখ্যা ছিল প্রতি ২০০ হেক্টেয়ারে নেপালে ২২৯, ইন্দোনেশিয়ায় ২২৪, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ২৪২। সর্বত্রই ভারতের তুলনায় আড়াই গুণ বা তারও বেশী। কৃষির যান্ত্রিকীকরণ উপরোক্ত দেশগুলোর তুলনায় জাপানে বেশী। একটা ধারণা আছে, কৃষিতে যান্ত্রিকতা বাড়ালে গ্রামীণ বেকারত্ব বাড়বে। ধারণাটা ঠিক নয়। ৭০ সালে জাপানের কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্তির সংখ্যা ছিল ১০০ হেক্টেয়ারে ১৯২ এবং মাথাপিছু আয় ছিল ৩৯৭। দেখা যাচ্ছে যে অধিক যান্ত্রিকতা সত্ত্বেও সমপরিমাণ জমিতে ভারতের তুলনায় জাপানে দ্বিগুণাধিক লোক খেটেছে এবং এদের প্রত্যেকের গড় আয় ছিল ভারতীয় কৃষকের আয়ের আড়াই গুণ।

দেখা যাচ্ছে কৃষি যন্ত্রাদি ও কৃষিনীতির সামান্য পরিবর্তন ঘটাতে পারলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে শুধু দণ্ডক প্রত্যাগতদের নয়, আরও বহু মানুষের কাজ ও খাদ্যের অনেক উৎকৃষ্টতর সংস্থান হতে পারে। তবে, বক্তৃতা দিয়ে এটা হয় না, সুষ্ঠু প্রয়াস দরকার। সে প্রয়াস বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে সম্ভব কিনা তাহাই বলুন।

কর্মসংস্থানের অভাব আছে এটা যেমন ঠিক কথা, কর্মসংস্থান ও আত্মবৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই এটাও তেমনি ১০০% বেঠিক কথা। রাজ্যপালকে দিয়ে বলানোও কথাটা প্রামাণ্য নয়ে, ভ্রান্ত। সম্ভাবনা না থাকার ভ্রান্ত অজুহাতে দণ্ডক প্রত্যাগতদের দূর দূর করে খেদিয়ে দেওয়া এবং খেদাবার পরেও যারা থেকে গিয়েছে তাদের ঘেরাও করে রেখে জানাজানি বন্ধ করে জব্দ করার বিদঘুটে তৎপরতা কর্তাদের প্রতি সম্ভ্রম জাগায় না, বিরূপতার উদ্রেক করে। এ রাজ্যের নবাগতদের মধ্যে তো বটেই, স্থানীয় সব সংবেদনশীল মানুষের মধ্যেও।

২০শে জানুয়ারী স্টেটসম্যান পত্রিকা খবর দিয়েছিলেন, 'The Prime Minister—had all along been insisting that no deserter from Dandakaranya should be allowed to settle in West Bengal.' এরকম উক্তি অত্যন্ত অশোভন, সংবিধান বিরোধী এবং পি এম এর প্রতি শ্রদ্ধার হানিকর। কোনও ভারতবাসিকে ভারতের বিশেষ কোন রাজ্যে বসতি স্থাপন করতে দেওয়া চলবে না একথা বলার অধিকার কোনও পদাধিকারীরই নেই। সরকারী কোন কর্তার অধিকার নেই এরকম কোন হুমকী দেবারও যে দণ্ডক প্রত্যাগতদের কেউ এ রাজ্যে জীবিকার্জনের সুযোগ করে দিলে তার ভাল হবে না। দুঃখের বিষয় আমাদের মহোদয় মন্ত্রীরা ঘরে-হামেশা এ ধরণের কথা বলে চলেছেন প্রথম যখন ওরা এল তখন থেকে আজ পর্যন্ত। এ সব হুমকীর খবর সংবাদপত্রে বেরিয়েছে এবং প্রতিবাদ পড়িনি। সুতরাং এ ধরণের insolent, impertinent, contraconstitutional কথাগুলো সবই সত্যি! গায়ে জ্বালা ধরে।

আমার মত একজন অতি সাধারণ মানুষের মনে কাগজ পড়ে যে সব কথা জেগেছে তার কিছুটা আমারই মত সাধারণ দেশবাসীর কাছে খুলে বললাম। সাধারণ মানুষের মনের কথাগুলো পরিষ্কার করে বলবার সময় হয়েছে মনে করেই বললাম। গণতন্ত্রে সবারই নিজ নিজ মনের কথা ব্যক্ত করার অধিকার আছে।

নানারকম প্রশ্ন দণ্ডকীদের নিয়ে উঠছে। দু' একটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

প্রথমে বলা দরকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অতি সহৃদয়

বাস্তুহারা হলেও উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের যে নীতি ওঁর সরকার গ্রহণ করেছিলেন এবং যে নীতি পরবর্তী সব সরকার বেদ-বিধানের মতো মেনে চলেছেন, সেই নীতিটাই উন্নয়নশীল স্বাধীন দেশের পক্ষে অনুপযোগী। উন্নয়নশীল দেশে যন্ত্র-শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে এবং তা গ্রামের মানুষকে নিজ আবর্তে টেনে নেয়, শ্রমিকশ্রেণী শিল্প বিস্তারের সঙ্গে বিস্তৃত হ'তে থাকে। পূর্ব সীমান্ত অতিক্রম করে যে সময় যারা বাধ্য হয়ে এদিকে চলে এসে নূতন রুজি-রোজগারের পথ খুঁজেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের দ্রুত সম্প্রসারণশীল শিল্পক্ষেত্রে তাদের অনেকেরই স্থান হতে পারত। কিন্তু ডাঃ রায় এবং তাঁর পরবর্তিরা এই নূতন বেড়ে চলা ক্ষেত্রটার দিকে একেবারেই দৃষ্টি দেননি এবং এখনও দিচ্ছেন না। পুনর্বাসনের যে নীতি গোড়ায় অবলম্বন করা হয়েছিল তা হ'ল,—কৃষক সন্তানকে চাষের জমি দিতে হবে, ভদ্রলোকের ছেলেকে চাকরী বা মাষ্টারী দিতে হবে। শিল্পক্ষেত্রে যে সম্ভাবনা ক্রমাগত বাড়ছে তার দিকে কেউ কোনদিন নজর দেননি। অথচ যখন অজস্র উদ্বাস্তুকে বছরের পর বছর শরণার্থী শিবিরগুলিতে অকর্মণ্য রেখে ডোল দিয়ে পরিপোষণ করা হয়েছে তখন বছরের পর বছর অন্য রাজ্যের দুর্গত কৃষকরা এ রাজ্যের কলকারখানায় রেলে বন্দরে, নির্মাণ কার্যে এবং অন্য বহুক্ষেত্রে রুজির সন্ধান করে নিয়েছে। কর্তৃপক্ষ যদি শুধু কেরাণীগিরি এবং চাষের জমির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে উদ্বাস্তুদের কর্ম প্রার্থনার মুখ এদিকে একটু ঘুরিয়ে দিতেন তা হ'লে পশ্চিমবঙ্গে সমাজের চেহারা অনেক পাল্টে যেত।

একটা কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়, কলকারখানায় ঝুলীগিরি করতে বাঙালিরা পরাঙ্মুখ। এটাও খুব ভুল কথা। পৃথিবীর সর্বত্র যা হয়েছে এবং হচ্ছে এখানে তা না হবার কোন কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে ভদ্রশ্রেণীর তরুণরাও আজকাল মজুরবৃত্তি অবলম্বন করছেন, চাষীর ছেলেরাও নিজেদের চেষ্টায় শিল্প-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ঢুকে পড়ছেন। সরকারের দৃষ্টি এদিকে থাকলে এবং কিছু সরকারী উৎসাহ পেলে এ রাজ্যের ভূমিহীন কৃষকরা এবং কর্মহীন মিডিওকররা নূতন ধরণের জীবিকায় আরও ভাল করে নিজেদের স্থান করে নিতে পারতেন। তাতে এ রাজ্যের বেকার সমস্যার অনেকটা সুরাহা হ'ত, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সমস্যা সরকারকে ততটা বিব্রান্ত করে তুলত না। বাংলাদেশে ধীরে ধীরে যে বিস্তার ঘটছে তাকে কাজ করছেন বাদের কৃষক-সন্তানরাই, অন্য দেশ থেকে এজন্য শ্রমিক আমদানী করতে হচ্ছে না।

দক্ষ প্রত্যাগতদের ঠাঁই নেই বলে তাড়িয়ে দেবার আগে বামফ্রন্ট সি পি এম এবং চেয়ারম্যান মহোদয়গণ এদিক একটু ভেবে দেখবেন অনুরোধ করি। নবাগতদের মুখের উপরে অনেকে রেলকামরার দরজা বন্ধ করে দেন এটা যেমন সত্যি, তেমনি রোজ এও দেখি যে ঠাসা ট্রাম-বাসে নবাগত হতাশপ্রায় যাত্রীর কোমর সাপটে ধরে পালানীর যাত্রীরা তুলে নিচ্ছেন। আমরাও ঐ পালানীর যাত্রীদের মতো পথপার্শ্বের হতাশ যাত্রীদের সাপটে ধরে তুলে নিই না কেন? চাপাচাপি বাড়লেও উষ্ণতা আছে, যা আজকের জীবনে একটি বিরল বস্তু।

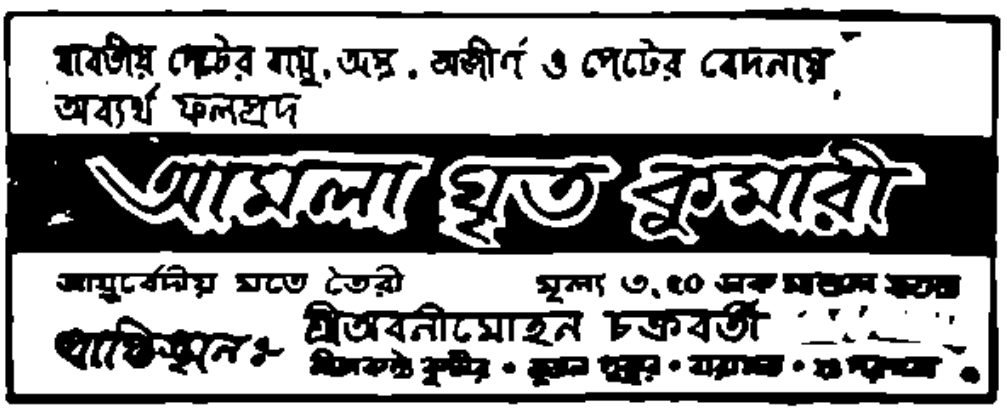

ভারতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চতুর্ষষ্ঠীতম বর্ষ পূর্তি দিবস পালন—নিজস্ব সংবাদদাতা

২১শে ফেব্রুয়ারী, সকাল ১১ ঘটিকায় অনুশীলন সমিতির উদ্যোগে মহাজাতি সদন কলিকাতায়, বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বাধীন সর্ব-ভারতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থান যাহা ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী সংঘটিত হওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাহা স্মরণ মানসে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ত্রিপুরা শঙ্কর সেন শাস্ত্রী মহাশয়, বন্দেমাতরম মুখরিত প্রেক্ষাগৃহে উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রীননী ভট্টা-চার্য্য এবং প্রাক্তন বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেই বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর স্মৃতি চারণা করে তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। শ্রদ্ধেয় ত্রিদিব চৌধুরী বলেন ঐ সশস্ত্র অভ্যুত্থান শেষ পর্য্যন্ত সাময়িকভাবে সফল না হলেও সারা পৃথিবী আলোড়িত ও স্তম্ভিত হয় এবং ভারতকে স্বাধীন করার প্রতিজ্ঞা বিপ্লবীর মনে দৃঢ়তা ও আস্থা আনে। রাসবিহারীর সহকর্মীরা দুর্জয় সাহসে ভর করে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন ও দুর্ব্বার শক্তিতে সারা দেশব্যাপী এক দুরন্ত বিপ্লবী সংস্থা গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে যে স্বাধীনতা ভারতে কায়েম হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তা শুধু গান্ধীজীর অসহযোগ, আইন অমান্য ও বিদেশী দ্রব্য বয়কট আন্দোলনের জন্যই সম্ভব হয় নি, হয়ে ছিল সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অর্থাৎ রাসবিহারী ও নেতাজী সুভাষ গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর বিক্রমের জন্য, ১৯৪২ সালের সারা দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের জন্য ও ১৯৪৫-৪৬ সালে নৌ বিদ্রোহের ও সৈন্য বিভাগের মধ্যে বৃটিশ বিরাগের ও বিদ্রোহী পরিকল্পনার জন্য। কিন্তু এত কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ১৯৪৭ সালে এলেও এখনও পর্য্যন্ত দেশবাসী তার নিম্নতম প্রয়োজন মিটাবার মত সহায় সম্বল জোগাড় করে উঠতে পারেনি। এখনও শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করতে বাধ্য হয়। এই স্বাধীনতার জন্যই কি প্রাক্তন বিপ্লবীরা দলে দলে বাংলার ঘরে ঘরে ও সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রদেশে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন? স্বাধীনতা অর্থাৎ সর্বমানবের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি তাঁরা মনে মনে কামনা ও আশা করে ছিলেন। হায় তা আজও সম্ভব হয় নি। শ্রদ্ধেয় সেন শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীচৌধুরীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রায় একই সুরে তাঁর বক্তব্য রাখেন সভাপতির ভাষণে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, বিপ্লবীদের এখনই অবসর নেবার সময় হয় নি বরং যে অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতার অভাবে সারা ভারতের মানুষ অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করছে তার অবসান প্রাক্তন বিপ্লবীরাই সচেষ্ট হলে এখনও সম্ভব। তাই তিনি ডাক দিয়ে বলেন যে বিপ্লবীদের এখনও সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পূর্ব্বের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে দেশের অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের নূতন বিপ্লবে। তিনি আশা রাখেন প্রাক্তন বিপ্লবীরা অর্থ-নৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন ব্যতিত কিছুতেই বিশ্রাম নিতে পারেন না, তাঁরাই প্রকৃত দেশকর্ম্মী ও দেশপ্রেমিক। ১টায় বিরতি ঘোষণা করেন শ্রীদীনেশ ঘটক। অনুশীলন সমিতি উপস্থিত সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করে। এর পর পুনরায় বেলা ৩ ঘটিকায় যুবছাত্রদের বক্তব্য রাখার ব্যবস্থা। ঐ সভায় রাখা হয় প্রাক্তন বিপ্লবী ও বাঘাযতীন ও বাদুগোপাল মুখার্জির সহকর্মী শ্রীজীবনতারা হালদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে। প্রিয় গোস্বামী নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি যুব-ছাত্র রাজনৈতিক

কর্মীরা তাদের ভাষণে প্রায় একটা কথার ওপর সবাই জোর দেয় তা হচ্ছে নবীনের কর্মোদ্যম ও প্রবীণের চেতনা, অভিজ্ঞতা ও আদর্শ নিষ্ঠার সমন্বয়ে দেশের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি আনা বাস্তবে এখনও সম্ভব। যুব ছাত্ররা বহু ক্ষেত্রেই বিপথগামী হয় ও পদে পদে ভুল করে, কিন্তু যদি প্রাক্তন এই সব বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যুব-ছাত্রদের 'রাউন্ড-সার্কেলের' মাধ্যমে অথবা শিবিরে শিবিরে প্রকৃত শিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে, দেশকে জানতে, বুঝতে ও দেশের অতীত ঐতিহ্যের কথা শুনিয়ে সে বিষয়ে তাদের ওয়াকিবহাল করে তুলতে পারে তবে যুব-ছাত্ররাও সঠিক পথে দেশ সেবার কাজে আগুয়ান হয়ে ভারতের সীমাহীন দারিদ্র্য ঘোচাতে হয়ত পারে। প্রবীণ বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এগিয়ে এসে এ ভার বহন করতে হবে, আর নবীন যুব-ছাত্ররা তাঁদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের ভাবধারায়, কর্তব্য নিষ্ঠায় ও বাস্তব অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিশ্চিতভাবে দেশ পুনর্গঠনের কাজে নির্ভুল পথে অগ্রসর হতে পারবে। যুব-ছাত্ররা আক্ষেপ করে বলে যে তারা স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী সুভাষ, মহাত্মা গান্ধী, রাসবিহারী বসু, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ইত্যাদি মনীষিদের দেখেও নি বা তাঁদের সংস্পর্শে আসার মত যুগে জন্মলাভ করে নি, অথচ অদ্যকার সভায় উপস্থিত প্রবীণ বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে সুযোগ পেয়ে ভারতের মুক্তি সাধনায় যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে ভারতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনতে পেরেছেন, কিন্তু যেহেতু আর্থিক সমৃদ্ধি ও স্বয়ম্ভরতা এখনও আসে নি, সে কারণে তাঁদের এখন আর কাল বিলম্ব না করে সেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে এবং যুব-ছাত্ররা তাঁদের নির্দেশে চিন্তন-মননে ও পরিচালনায় সামিল হতে উৎগ্রীব। যুবছাত্ররা চায় বিপ্লবীরা পথ প্রদর্শকের ভূমিকায় অবতরণ করলে, তারা সেই পথেই অগ্রসর হয়ে আর্থিক স্বয়ম্ভরতা আনতে নিশ্চয় পারবে। সভাপতির ভাষণে অশীতিপর বৃদ্ধ বিপ্লবী ও অনুশীলন সমিতির সদস্য শ্রদ্ধেয় জীবনতারা হালদার মহাশয় ছাত্রযুব কর্মীদের এবম্বিধ বক্তব্যে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন প্রবীণ বিপ্লবীরা ও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সব সময়ই তরুণ কর্মীদের সঙ্গে সহযোগীতায় অংশ গ্রহণে উন্মুখ এবং ছেলেরা উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কাজে নামলেই জাতীয় স্বার্থে এই সব বিপ্লবীরা নিশ্চয় তাদের পাশে থেকে অনুপ্রেরণা দেবে এবং তাদের উদ্দীপিত করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিকাল ৫টায় এই আলোচনা সভা সমাপ্ত হয়। এর পর দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করে— ক্রান্তি শিল্পী সংঘ প্রায় আধ ঘন্টাকাল এবং গুঞ্জন শিল্পীগোষ্ঠীও সঙ্গীত পরিবেশনে দক্ষতা দেখায়। বিকাল ৬ঘটিকায় লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীবৃন্দ ৺দীনবন্ধু মিত্রের জীবন্ত নাটক 'নীলদর্পণ' মঞ্চস্থ করেন। সু-অভিনয়ের মাধ্যমে শিল্পীরা ঐতিহাসিক নীলবিদ্রোহের ঘটনা বাস্তব আকারে উপস্থিত দর্শকমনে ক্রিয়াশীল করে তুলতে সক্ষম হন। সকলেই শিল্পীদের সাধুবাদ দেন। রাত্রি প্রায় সাড়ে আট ঘটিকায় সমাপ্তি ঘোষিত হয়। সকাল ১১টা হতে রাত্রি সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত (মধ্যে মধ্যে কিছু বিরতি সহ) অনুষ্ঠানটি সুপরিচালিত হয় অনুশীলন সমিতির সভ্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়, তাঁরাও ধন্যবাদার্হ। উক্ত সভায় প্রায় পাঁচ ছয় শতাধিক বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সর্বক্ষণ নিবিষ্ট মনে দর্শকের আসনে উপস্থিত থেকে সকলকে উৎসাহিত ও আনন্দিত করেন। জয় হিন্দ!

———

RgedNo. R. N .24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | বান্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

C/36 13 MAR 19

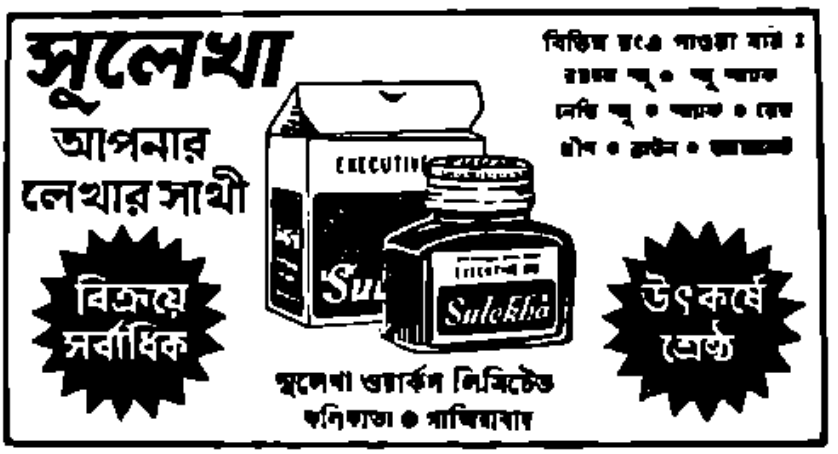

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীঅনীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী, শ্রীবারীণ রায়।
সম্পাদক—শ্রীসাধি শরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেহালা—শ্রীনন্দগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীমণীন্দ্র গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্য্যালয় :—৪নং বক্সলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

বিপ্লবী বাঙালী

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭৯

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ৩রা চৈত্র, ১৩৮৫ ১৭ই মার্চ, ১৯৭৯	২২ সংখ্যা

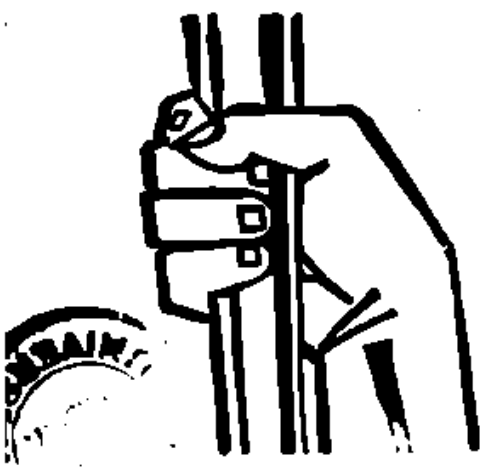

এই সংখ্যায়

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে
। সম্পাদকীয় ।

চিরন্তন বিপ্লবী
। শ্রীনগেন্দ্রকৃষ্ণ সেন ।

ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি ঃ কর্ম্মপরিচিতি
। ডঃ আশা দাস ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক মলিনী মোহন দাশগুপ্ত ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস
। ক্ষীরোদ দত্ত ।

চিঠিপত্র
। ডঃ চিত্তরঞ্জন দাশ ।

বিপ্লবের ফলে যে পরিবর্ত্তন আসে তা মৌলিক। সাধারণ দু' চারটি মন্ত্রীর পরিবর্ত্তনকে বিপ্লব বলা চলেনা। একটি গভর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন বা মন্ত্রী দলের পরিবর্ত্তন বিপ্লব নয়, কারণ এতে জাতীয় জীবন ধারার পরিবর্ত্তন ঘটেনা।

—নেতাজী

সম্পাদকীয়—

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের উপর অকথ্য নির্যাতন ও অমানবিক অবরোধ নীতি গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে তুলনাহীন দৃষ্টান্ত রেখেছেন, তার বিরুদ্ধে জনমত ক্রমশঃ সোচ্চার হয়ে উঠছে। সরকার তাদের এই জঘন্য কাজের জন্য যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, সেটা নিতান্ত দুর্বল ও অবিশ্বাস যোগ্য। নিত্য নতুন নতুন বিবৃতিদান করছেন সরকারের পৃষ্ঠপোষক কিছু কিছু দলীয় নেতারা। উদ্বাস্তুরা নাকি সামন্তরাল সরকার গঠন করেছে, বনজঙ্গল কেটে শাফ্ করে ফেলছেন বন আইন ভঙ্গ করে। তর্কের খাতিরে যদি এসব অভিযোগ সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়, তবুও প্রশ্ন থাকে ভৌগলিক অবরোধ সৃষ্টি করে, খাদ্য, পানীয় জল, ঔষধপত্র সরবরাহ বন্ধ করে, শেষ পর্য্যন্ত গুলিবিদ্ধ করেই কি এই সমস্যার সমাধান করা যাবে ? আজ সরকার সমর্থক নেতার বিবৃতিতে একটি অদ্ভুত কথা শোনা গেল। উদ্বাস্তুরাই নাকি কাউকে সেখানে ঢুকতে দিচ্ছেন না। কাজেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেনই। তাহলে কি বুঝতে হবে যে এই অবরোধ সরকার সৃষ্টি করেন নি ? এতদিন এ বক্তব্য ত রাখেন নি সরকার পক্ষ। এটা কি অবস্থার চাপে পড়ে কৈফিয়ৎ সৃষ্টির হাস্যকর প্রচেষ্টা নয় ? এত সহজ সরল কৈফিয়ৎ থাকলে, সরকার পক্ষ এত জল ঘোলা করছেন কেন ? বলেই ত দিতে পারতেন এবং নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশনকে দেখিয়ে দিতে পারতেন যে উদ্বাস্তুরা স্বখ্যাত সলিলে ডুবে মরছেন। নিজেরা স্বেচ্ছায় অবরোধ সৃষ্টি করে ঘাসপাতা খেয়ে থাকবেন, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটিয়ে ফেলবেন, অসুস্থ অবস্থায় ঔষধ না খেয়ে মৃত্যু বরণ করবেন। এমন কথা ত হস্তীমূর্খেরাই বলতে পারেন বা বিশ্বাস করতে পারেন। এটাই যদি সত্য হত, তবে পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজনদের মারধর করা, গুলি করা, মেয়েদের অসম্মান করার অভিযোগ কি শুধুই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত ? এমনধারা অভিযোগ ত সরকার পক্ষীয় বিশেষ একটি দলের লোকেরাও করেছেন। সবই কি মায়া, মতিভ্রম, ষড়যন্ত্র, আর সত্য শুধু সরকারী বক্তব্য ? একমাত্র বদ্ধ উন্মাদ ভিন্ন এমন কথা কেউ বলতে পারে না। নিরুকারণ ফেরত উদ্বাস্তুদের উপর গুলি চালনা এই প্রথমবার হয় নি, কয়েক মাস আগে বর্দ্ধমানেও এদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়েছিল, ফেরৎ নিয়ে যাবার সময়।

ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে উদ্বাস্তু মৌল সমস্যাগুলিকে অবহেলা করার জন্যই এত সব ঝামেলা হচ্ছে। দণ্ডকারণ্য থেকে উদ্বাস্তুরা কেন চলে এল সেটা প্রণিধান করার কোন প্রচেষ্টা হয়েছে কি? যারা ফিরে গেল, তাদের বর্তমান অবস্থাটা কেমন সেটা সরেজমিনে যেয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে কি? এরা কেন ফিরে যেতে চাইছে না, সেটা জানার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন সরকার? অন্য দলীয় লোকেরা উদ্বাস্তুদের নিয়ে রাজনীতি করছেন, বামফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাতে চাচ্ছেন, শুধু মুখে বলেই দায়িত্ব এড়ান যাবে কি? উদ্বাস্তুদের নিয়ে রাজনীতি করার ঐতিহ্য, যারা আজ সরকার দখল করে আছেন, তাদের একচেটিয়া ছিল। সর্বস্ব একাধিপত্য বিঘ্নিত হবার আশঙ্কায় কি এই রকম উক্তি করা হচ্ছে? উদ্বাস্তু সমস্যার সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের এ সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। এই উদ্বাস্তুরা বাঙ্গালী, পশ্চিমবাংলা সরকারের কি এদের উপর কোন কর্তব্য নেই? তারা কি অস্বীকার করতে চান যে একদল ছিন্নমূল মানুষ যদি বসবাস করবার সুযোগ সুবিধা লাভ করেন, তবে এমন নির্বোধ তারা হতেই পারে না। শুধুমাত্র পশ্চিম বাংলায় বসবাস করবেন, অনাহারে, বিনা চিকিৎসায়, বিনা পানীয় জল ও বিনা ঔষধপত্রে। এ দেশ বিভাগের পর, ভোট লাভের আশায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এদের আশ্বাস দিয়েছিলেন পশ্চিম বাংলায় পুনর্বাসনের যথেষ্ট জায়গা আছে এবং আন্দামানসহ অন্যত্র পুনর্বাসন ব্যবস্থায় বিঘ্ন উৎপাদন করেছিলেন। এমন কি যাবার পর অনেককে ফিরিয়ে নিয়েও এসেছিলেন। যে সব রাজনীতিবিদরা তাদের আজ কি কৈফিয়ৎ দেবার আছে? তারা কি দন্তে তৃণ ধরে জনসাধারনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য নন? এবারও তাদেরই কেউ কেউ মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছেন এখানে আসবার জন্য, এমন অভিযোগও শুনতে পাওয়া যায়। তার কোন তদন্ত হয়েছে কি? না দলীয় লোক বলে চাপা দেওয়া হয়েছে, জনসাধারণ এর উত্তর নিশ্চয়ই দাবী করতে পারে।

গভীর পরিতাপের কথা, সরকার নিজেদের হঠকারিতা প্রসূত কাজের দায়িত্ব চাপাতে চাচ্ছেন অন্য দলের উপর। জনতাদলের লোকেরা অকুস্থলে গিয়েছেন বলে সরকারের উষ্মা হয়েছে। লোক সভার সদস্যরা সরেজমিনে তদন্ত করতে যাচ্ছেন বলে তাতেও ক্ষুব্ধ। ওরা আইন অমান্য করতে আসছেন বলে ত কোন ঘোষণা করেন নি। তবে মুখ্যমন্ত্রী ওদের আইন মান্য করে চলতে হবে বলে হঠাৎ উপদেশ বর্ষণ করলেন কেন? তা ভিন্ন লোকসভা সদস্যদের অধিকারগত প্রশ্নটা কি মীমাংসা করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী? পশ্চিম বাংলা কি ভারত রাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য, না স্বাধীন কোন এলাকা? যদি কেউ এই উক্তিতে বালসুলভ চপলতা, নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও চরম অশালীনতার অস্তিত্ব আছে মনে করেন, তবে কি খুব ভুল হবে? সত্যটা উদ্ঘাটিত হয়ে পড়বে বলে এটা কি আতঙ্কের স্বাক্ষর?

অন্যান্য রাজনৈতিকদল এ সব নিয়ে আন্দোলন করছে বলে দোষারোপ করার কোন যুক্তি নেই। গণতন্ত্রে বিরোধী দলের সরকারের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করা ও নিজেদের

ভাবমূর্তি গড়ে তোলাই ত তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। তবে দ্বিতীয় বিপুর এই নগ্ন প্রকাশ কেন? ক্রোধ থেকেই ত বুদ্ধিনাশ ঘটে, এতে শাস্ত্রবাক্য সরকারপক্ষ যদি এটা বুর্জোয়াদের শাস্ত্র বলে কোন মূল্য না দেন, তবে আলাদা কথা।

মরিচঝাঁপির সমস্যা কোন স্থানীয় সমস্যা নয় বলেই আমরা মনে করি। উদ্বাস্তু সমস্যাটাই হল মৌল সমস্যা। মরিচঝাঁপি ত সেই সমস্যার একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মাত্র। সমস্যার গভীরে যেয়ে সমাধানের চেষ্টা না করলে, মিথ্যা কৈফিয়তের তাত বুনে কোন সুফল হবে না। এতদিনে আমরা আশা করেছিলাম যে সরকার সঠিক অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করবেন। কিন্তু সরকার ও তাদের সমর্থকদলগুলির নেতারা যে সব উক্তি করে চলেছেন নতুন করে, তাতে আমরা হতাশ হয়ে পড়ছি। তাদের সমর্থকেরা সত্যানুসন্ধান করতে চাইছেন না। মরিচঝাঁপির একটি জনসভায় আর, এস, পির একজন নেতা খবরের কাগজের বিরুদ্ধে একহাত নিয়েছেন। অপরাধটা কি কোন সংবাদপত্র মরিচঝাঁপির অবস্থা জনসাধারণের নিকট তুলে ধরেছেন বলে? তা হলে, বলতে বাধ্য হব—সংবাদপত্রের মৌলিক একটি প্রধান কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞান নেই। সংবাদপত্র জনমতের প্রতিনিধি এবং জনগণের দাবী তুলে ধরাই তাদের অবশ্য কর্তব্য। বোমা ছুঁড়ে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা কি সংবাদ পত্রকে স্বাধীনতা দেওয়ার নমুনা? তিনি আরো একটি হিতোপদেশদান করেছেন ঐ সভায়। মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন যে মরিচঝাঁপি সম্বন্ধে তদন্ত যদি করতে হয়, দলীয় মন্ত্রীদের দ্বারাই করতে হবে। অনুগত জন-বৎসল মুখ্যমন্ত্রী তথাস্তু বলে আশ্বাসও দিয়েছেন। সঙ্গত হোক, অসঙ্গত হোক, লোকের অভিযোগ যখন সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, তখন সরকার পক্ষীয় লোকদের দিয়ে তদন্ত করলে সেটা নিরপেক্ষ হতে পারে কি? নিজের বিচার নিজেই করব, এটাত কাজীর বিচারকেও তুলনায় হার মানাবে। এমন হাস্যকর প্রস্তাব ত অন্যপক্ষ করলে, লোকে তাদের পাগল বলত। সংবাদপত্র মানেই বেদবাক্য নয়, তিনি এ কথাও বলেছেন। যেটুকু উক্ত রেখেছেন সেটা কি তাহলে সরকার পক্ষের বক্তব্যকেই বেদবাক্য বলে ধরে নিতে হবে? রাজা যা বলেন, তাই আইন বলে মানতে হবে এমন দিন ত চলে গিয়েছে বহুযুগ আগেই। অবশ্য স্থিতি (Thesis) প্রতিস্থিতি (Anti—Thesis) এবং সংস্থিতির (Synthesis) ক্রিয়াকলাপে রাজনৈতিক দর্শনের এমন পরিবর্তন ঘটেছে বলে ত আমাদের জানা নেই। অবশ্য মুক্ত কণ্ঠে একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

আরো একটি গুরুতর কথা বলেছেন আরো একজন প্রখ্যাত নেতা। মরিচঝাঁপিতে নাকি বাংলাদেশের উগ্রপন্থীদের আনাগোনা চলছে। কথাটা যদি সত্য হয়, তবে তাদের সংযত করার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন সরকার? তাদের একজনকেও কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে অথবা একটি

গুলিও তাদের উপর বর্ষণ করা হয়েছে? না সব গুলিই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে উদ্বাস্তুদের উপর গুলিচালনার পর? দেশের শত্রু বিদেশী চরদের কি তৎপরিবর্তে রসগোল্লা খাওয়ান হয়েছে? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অবশ্য একথা অস্বীকার করেছেন। তবে মিথ্যাবাদী কাকে মনে করবে মানুষেরা? কেন এই নেতারা বাধা করেননি সরকারকে কর্তব্য পালনে? কেন দেশের সর্ব দলীয় মানুষের সহযোগিতা চাওয়া হয়নি এই গুরুতর সমস্যার মোকাবিলা করতে? বরং তাদের সঙ্গে অসহযোগিতা করে তাদের প্রয়াসকে ষড়যন্ত্র বামফ্রন্ট সরকারকে গদীচ্যুত করবার মতলব বাজী বলে প্রচার করা হচ্ছে? সংখ্যাধিক্যের জোরে যা খুসী তাই করব, এটাই কি তবে এদের সুবস্থ গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ বলে ধরে নিতে হবে? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস গায়ের জোরে সত্যকে কেউ চাপা দিতে পারেন নি অতীতে, পারবেও না বর্তমানে ও ভবিষ্যতে। বরং এই প্রকার অপচেষ্টা যারা করেন, আখেরে তাদের উপর ন্যায়ের দণ্ড নেমে আসে, এটাই ইতিহাসের সাক্ষ্য এবং শিক্ষা।

আমরা মনে করেছিলাম কেন্দ্রস্থ জনতা সরকার এই সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিয়ে শুনিয়েছেন, তাতে মনে হয় সঙ্কটমোচনের আশু সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। অবশ্য ভরসার কথা, জনতা ও কংগ্রেস দলের কয়েক জন সদস্য এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ঘটনাস্রোত যেভাবে চলেছে আমরা মনে করি, বিরোধী দলগুলির উপর গুরু দায়িত্ব এসে পড়েছে। নিপীড়িত মানবিক আদর্শের পটভূমিকায় তাদের কাজ করতে হবে নিছক দলবাজির জন্য নয়। শাসকদল কি বলে না বলে, তার তোয়াক্কা না করেই নিজনিজ কর্তব্য পালন করতে এগিয়ে আসতে হবে। জনস্বার্থ-সাধনের জন্য যদি তাদের নিপীড়ন ভোগ করতে হয় এমন কি কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়, তবুও কর্তব্য পালনে পিছপাও হওয়া চলবে না। কোন হিংসাত্মক পরিবেশ সৃষ্টি করে নয়, আদর্শপ্রণোদিত হয়ে, মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করবার পরিকল্পনা নিয়েই কাজ করতে হবে। নতুবা রাজনৈতিক দল হিসাবে তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে।

বিরোধী দলগুলির মধ্যে জনতাদল কিছুটা সক্রিয় হয়েছেন। তারা অন্যায়ের মুখোস খুলে দিতে চেষ্টা করছেন। সেজন্য গ্রেপ্তার বরণও করেছেন। কিন্তু দেশের মানুষকে হতাশ করেছে কংগ্রেসদলের উভয় শাখাই। তারা যেটুকু করেছেন, সেটা খুবই সামান্য প্রয়োজনের তুলনায়। কোন ঐতিহাসিক প্রয়োজনে, সমস্যার গভীরে গিয়ে তার সমাধানের উপায় চিন্তা করে, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার যে ঐতিহ্য কংগ্রেসের ছিল এবং এখনও থাকা উচিৎ তার স্বাক্ষর কোথায়? দলীয় কোন্দল নিয়ে যত মাতামাতি দেখতে পাওয়া যায়, তার

তুলনায় এমন হৃদয়হীন বর্বর, অমানবীয় অবরোধ নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার দিয়ে এগিয়ে এসেছেন কি এই দলের নেতা, উপনেতা, ছাত্র ও যুবকেরা? আমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কথা বলি না বা সমর্থনও করি না। কিন্তু গণতান্ত্রিক কাঠামোতে বিরোধীদলের যে কর্তব্য আছে, তা অবশ্য করণীয় ছিল। প্রদেশের কর্মকর্তারা কি তাদের উর্দ্ধতন নেতৃবৃন্দকে এ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত করেছেন। যেমন করেছেন জনতাদলের প্রাদেশিক নেতারা? কংগ্রেস (ই) দলের প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ ইন্দিরাজীর আসন্ন সফরের সময়, তাঁকে মরিচঝাঁপিতে নিয়ে গিয়ে সরেজমিনে সব তথ্য অবগত করার কোন চেষ্টা করেছেন? অবশ্য এই জবাব শীঘ্রই মিলবে তাঁর আসন্ন সফরের সময়। সরকারের সঙ্গে বহুদিন জড়িত থেকে, সরকারী সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এদের ভিতরকার আগুন একেবারেই নির্বাপিত হয়ে গিয়েছে?

পশ্চিমবাংলার মানবতাবোধকে বিসর্জন দিয়ে দুঃস্থ, অসহায়, ভ্রান্তনীতির শিকার হয়ে পড়া। সর্বস্বান্ত মানুষের উপর যে অবিচার করা হয়েছে, সেটা শুধু উদ্বাস্তুদেরই ব্যাপারে নয়, বিনা প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে এই ব্যবস্থাকে চলতে দিলে সমস্ত মানুষকেই ভোগ করতে হবে চরম দুর্দশা। তাই সচেতন হওয়ার সময় আজ উপনীত। মরিচঝাঁপিতে নিহত ও অপমানিত মানুষের আত্মা আজ কৈফিয়ৎ দাবী করছে হৃদয়বান মানুষের কাছে। বিচারের বাণী কি নিভৃতেই কাঁদবে?

'দেশ উঠবে কি করে? দেশের জন্য কি কেউ প্রাণ দিতে চায়? ত্যাগ স্বীকার করতে চায়? আবার যেদিন দেশে নগরে স্বার্থত্যাগী সন্তান জন্মাবে, সত্যিকার দেশের কাজ সেই দিন সম্ভব হবে।'

—শরৎচন্দ্র।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাসবিহারী যে বাড়িতে থাকতেন সেই বাড়ি সকলের চেয়ে নিরাপদ ছিল। এর সন্ধান বেশি লোক জানত না। কয়েকটি বাড়িতে তিনি বিভিন্ন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। ওই সকল বাড়ির সঙ্গে এখন কোনো রকম সম্পর্ক রাখা তিনি বন্ধ করে দিলেন। তা সত্ত্বেও রাসবিহারীকে কাশীর পথে ট্রেনে পৌঁছে দিয়ে গদা রাম নামে এক বিপ্লবী একবার সেই পুরানো বাড়ির দিকে উঁকি মেরে দেখতে গেলেন। তাঁর অনেকগুলি জামাকাপড় ওই বাড়িতে ছিল। ইচ্ছা ছিল নিরাপদ দেখলে সেগুলি নিয়ে আসবেন কিন্তু পুলিশ আগে থেকেই এই বাড়িগুলির দিকে নজর রেখেছিল। গদারাম বাড়ির কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতেই পুলিশ তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেপ্তার করল। ধরপাকড়ের কয়েক দিনের মধ্যেই গদারাম পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তি করলেন। এর ফলে পুলিশ শেষে রাসবিহারী যে বাড়িতে ছিলেন তারও সন্ধান পেল, কিন্তু সেখানে রাসবিহারীর হাতে লেখা দুই এক টুকরা কাগজ ছাড়া আর কিছুই পেল না। গদারামকে পেয়ে পুলিশ জানতে পারল লাহোরে যখন ভীষণ ধরপাকড় চলছিল রাসবিহারী তখন লাহোরেই ছিলেন। এছাড়া পুলিশ আরও জানলো যে রাসবিহারী কাশী থেকে এসেছিলেন এবং কাশীতেই ফিরে গিয়েছেন।

লাহোরে যখন ভীষণ ধরপাকড় চলছিল শচীন্দ্রনাথ তখন কাশীতেই ছিলেন। তবে কিছুদিন যাবৎ পাঞ্জাবের কোন সংবাদ না পাওয়ায় শচীন্দ্র নাথ ও তাঁর সঙ্গীরা খুব চিন্তিত ছিলেন। রাসবিহারী যখন পাঞ্জাব যান তিনি বলে যান যে তিনি পাঞ্জাবে থেকে কয়েকজন শিখ কর্মীকে কাশীতে পাঠিয়ে দিবেন। তার কারণ কাশী সেনানিবাসে তখন শিখ পল্টন ছিল। শিখদের পল্টনে যদি শিখেরা গিয়ে কাজ করে তবেই ভালো হয়। এর কয়েকদিন পরে কর্তার সিং একবার কাশী এসেছিলেন। তিনিও জানান যে শীঘ্রই আরো কয়েকজন শিখ কাশীতে আসছেন। তখনও কানপুর, লক্ষ্ণৌ, ফৈজাবাদ প্রভৃতি সেনানিবাসের সঙ্গে বিপ্লবীদের সংযোগ স্থাপিত হয় নাই। বিপ্লব কবে আরম্ভ হবে এই সংবাদ নিয়ে এর পরে পাঞ্জাব থেকে লোক এল। কিন্তু এর পরেই সব নীরব। পাঞ্জাবের আর কোনো সংবাদ নেই। অবশ্য ফৈজাবাদ, কানপুর এবং লক্ষ্ণৌএ পাঞ্জাব থেকে লোক পাঠান হয়েছিল। এদিকে কাশী সেনানিবাসে শচীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সঙ্গী প্রতি দিনই যাওয়া আসা করতেন। ১৯১৫ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার বিপ্লব আরম্ভ হবার কথা ছিল। শনিবার রাত্রিতেও শচীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সঙ্গীরা কাশী সেনানিবাসে গিয়ে ছিলেন। এদিকে পাঞ্জাবে যে বিপ্লবের তারিখ ২১ শে ফেব্রুয়ারী করা হয়েছে কাশীর বিপ্লবীরা তখনও তা জানতে পারেন নাই। শনিবার রাত্রিতেও কাশীতে পল্টনের হাবিলদার এবং নায়েক হাবিলদার প্রভৃতি বিপ্লবীদের আশ্বাস দিয়েছেন যে বিপ্লব আরম্ভ হলেই তাঁরা তাতে যোগ দিবেন। বিপ্লবীদের বিশ্বাস ছিলো যে বিপ্লব আরম্ভ হলেই দেশী পল্টন সবই তাঁদের দিকে যোগ দিবে। তখন ইচ্ছা করলেই যে কোন মুহূর্তেই তারা কাশীতে বিপ্লবের সূত্রপাত করতে পারবেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা স্থির করলেন যে অন্যান্য দিকের কথা না জেনে তাঁরা কাশীতে বিপ্লব আরম্ভ করবেন না। বিশেষভাবে পাঞ্জাবের অবস্থার কথা জানা খুবই

হওয়ায়। তার কারণ বিপ্লবীদের নিজেদের নিকট যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। সব ভেবে তাঁরা স্থির করলেন যে কাশীতে বিপ্লবীদের কয়েকজন লোক রেলওয়ে ষ্টেশন ও তারঘরের নিকট অপেক্ষা করে জেনে নেবেন যে পাঞ্জাব থেকে কোনো তার আসার যোগাযোগ হচ্ছে কিনা। যদি তার না আসে তবে বুঝবেন পাঞ্জাবে বিপ্লব আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বিভিন্নস্থানে বিপ্লব আরম্ভ হবার আগেই তার কেটে দেওয়ার কথা ছিল। এছাড়া আরো কথা ছিল যে বিপ্লব আরম্ভ হওয়া মাত্রই কয়েকটি ট্রেণ-এর আসা যাওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হবে।

কাশীতে বিপ্লবীরা স্থির করে ছিলেন যে অস্ত্রাগার অঞ্চলের কথা জেনে তারা কাশীতে ইংরেজী পল্টনকে আক্রমণ করবেন এবং রাত্রের মধ্যেই মহিলা ও বালক-বালিকাদের বাদে পল্টনের সমস্ত ইংরেজকে জেলে আটক করে ফেলবেন। জেলের সাধারণ কয়েদিদের সকলকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। বিপ্লবীরা আশা করে ছিলেন যে মুক্ত কয়েদীরা নিশ্চয়ই তাদের দিকে যোগ দেবে। বিপ্লবীরা স্থির করেছিলেন যে অস্ত্রাগার ও কোষাগার দখল করে তারা কয়েকজন লোককে কাশীতে বিপ্লবের সংবাদসহ এলাহাবাদ ও দানাপুরের দিকে পাঠিয়ে দিবেন। পরদিন সকালেই বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে একটা সভা ডাকা হবে। স্থানীয় ধনীদের নিকট মোটা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হবে। এবং যুবকদের তালিমটিয়ার হবার জন্য অনুরোধ করা হবে। এই সময় কাশীতে বাঙালীদের কয়েকটি প্রকাশ্য সভা সমিতি ছিল। এই সমিতিগুলির সভ্যসংখ্যা ২৫০ জনেরও বেশী ছিল। লেখাপড়ায় স্বভাবচরিত্রে এবং শারীরিক শক্তিতে এরা ছিলেন কাশীর উজ্জ্বল রত্ন। এদের মধ্যে অনেকেই বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। এছাড়া কলেজের অধ্যাপক, স্কুলের শিক্ষক, বিচক্ষণ চিকিৎসক প্রভৃতি অনেকেই বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এজন্য বিপ্লবীরা স্থির করেছিলেন যে বিপ্লবের সময় কাশীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করবার ভার এই সব সমিতির উপরেই দেওয়া হবে। বিপ্লবীরা আশা করেছিলেন যে বিপ্লব আরম্ভ হলেই এদের মধ্য থেকেই এবং স্থানীয় হিন্দুস্থানী যুবকদের মধ্য থেকেই অনেক স্বেচ্ছাসেবক তারা পাবেন। তারা স্থির করেছিলেন যে বিপ্লব আরম্ভ হবার আগেই কাশীর সকল বিপ্লবী সাহায্যকে কোনো এক স্থানে এনে এক সঙ্গে রাখা হবে। অস্ত্রাগার হাতে পাবার পরেই বিপক্ষ সমস্ত লোককেই সশস্ত্র করে ফেলা হবে।

ষ্টেশনের এবং তারঘরের তাৎপর্য্য দেখবার জন্য ১১ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার সময় শচীন্দ্রনাথ একবার কাশীর ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশনে এলেন। তিনি শুনলেন যে ষ্টেশ যাতায়াতের কোনো গোলযোগ হয় নাই এবং টেলিগ্রাফেরও কোনো গোলমাল হয় নাই। ঐ দিনই সন্ধ্যায় পল্টনের এক হাবিলদারের সঙ্গে শচীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হওয়ার কথা ছিল। তাঁর অপেক্ষায় ষ্টেশন প্লাটফর্মে তিনি ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। সময় কাটাবার জন্য তিনি সংবাদপত্র কিনে পড়তে লাগলেন। 'পাইওনিয়র' পত্রিকায় তিনি দেখলেন লাহোরে মড়কপীড়িত আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ইংরেজ সৈন্য সহরে পাহারা দিচ্ছে। সমস্ত পড়ে তিনি বুঝলেন সংবাদ সুবিধাজনক নয়। তৎক্ষণাৎ তিনি সহরে ফিরে এলেন।

তিনি বুঝলেন এ সংবাদ বিপ্লবীদের পক্ষে শুভজনক নয়। বিপ্লব আয়োজন যে পণ্ড হয়েছে এ সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ রইল না। পাইওনিয়রে এই দুঃসংবাদ পড়ে কাশীর বিপ্লবীরা সকলেই খুব আঘাত পেলেন।

(চলবে)

চিঠিপত্র

বেঙ্গল টিউবারকুলোসিস্ এ্যাসোসিয়েশন—
লক-আউটের নেপথ্য কাহিনী—

ডাঃ চিত্তরঞ্জন দাশ

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে)

১৯৭৯ সালটিকে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে শিশুদের প্রতি বাস্তব-ভিত্তিক কর্মসূচী প্রতিপালিত হচ্ছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করা হবে, নানা প্রকার কর্মসূচী তথা শিশুদের প্রতি কর্তব্য পালনে। অবশ্যই এখানে শিশু কথাটি ব্যাপক অর্থে শিশু হলেও, বাস্তবার্থে বিশেষ একশ্রেণীর শিশুদের কথা চিন্তা করেই,—১৯৭৯ সালটি 'শিশুবর্ষ' আখ্যাপ্রাপ্ত হয়েছে—ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নেই, দ্বিমতও নেই।

আমাদের পশ্চিম বাংলায় শিশুদের যক্ষ্মা রোগ নিবারণ তথা প্রতিকারের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। বঙ্গীয় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতির তত্ত্বাবধানে একটি শিশু-চেষ্ট ক্লিনিক বহুদিন যাবৎ কলকাতা ও কলকাতার বাইরের শত শত শিশুর চিকিৎসায় নিয়োজিত। তা' ছাড়া এই শিশুদের প্রায় প্রত্যেকেই বস্তিবাসী এবং/বা অতি গরীব ঘরের সন্তান।

সর্বহারা মানুষের নেতা হিসাবে যে দল সারা দেশের আকাশ বাতাস মাতিয়ে আজ পশ্চিম বাংলার সর্বহারাদের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করেছেন তাদের চোখের সামনেই বঙ্গীয় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তথা মহাসচিব ডাঃ বিনয় ভট্টাচার্য্য হঠাৎ এক ফতোয়া দিয়ে শিশু-চেষ্ট ক্লিনিকটি বন্ধ করে দিলেন।

ডাঃ ভট্টাচার্য্য গত জুলাই (১৯৭৮) মাসের ২৮শে তারিখ শেষ রাত্রে পুলিশ নিয়ে সমিতির গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। কর্মীরা বেতন পায়নি। ৩০,০০০ যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা বন্ধ। এখানে বলে রাখা দরকার—যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা আরম্ভ হয়েছিল তা বন্ধ হয়ে হয়—তা হলে এখনও এমন কোন ঔষধ আমাদের দেশে হয়নি, যা দিয়ে পুনর্বার চিকিৎসা করে ঐ রোগীকে তার অভিশপ্ত অকালমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যেতে পারে। অবশ্যই বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান বাঙ্গালী বীর স্বর্গতঃ বিধানচন্দ্র রায়ের একান্ত প্রেরণায় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতির তত্ত্বাবধানে একটি ল্যাবরেটরী সংগঠিত হয়েছিল—কিন্তু বাংলার অভিশপ্ত যক্ষ্মা রোগীদের সেবায় ঐ প্রয়াস তার অন্বেষণেই অজ্ঞাত কারণে সম্ভবতঃ স্বার্থান্বেষী চক্রের কাল হাতছানিতে আঁতুড়ে যারা গেল।

ডাঃ বিনয় ভট্টাচার্য্য মোশাই চেষ্টক্লিনিকের অবৈতনিক সম্পাদক থাকাকালীন লক্ষ লক্ষ টাকার এদিক-ওদিক, স্বজনপোষণ—আত্মীয়সেবা—শিশু-চেষ্ট ক্লিনিকে হাজার হাজার টাকার ঔষধের কোন হিসাব পাওয়া যায়নি। কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সরকারের নিকট বহু অভিযোগ দায়ের করার পর স্বাস্থ্য বিভাগের হস্তক্ষেপে একটি অনুসন্ধান চালানো হয় এবং ঐ অনুসন্ধানে বহু ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়ে। ৩০ টাকার কাজ ৪০০ টাকায় করান হচ্ছে—কারণ, বিনয়বাবুর পরম আত্মীয়। সামান্য টাকার গাড়ী না সারিয়ে—ট্যাক্সি করে কাজ করানো হয়—কারণ, ওরা নাকি বিনয়বাবুর সাকরেদ্। আরও অনেক অনেক ঘটনা আছে—যার সাথে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পর্ক।

সরকারী কর্মধারা :—

কর্মীদের পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী আমাদের নবীদাকে

RgedNo. R. N .24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | বাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

0/36

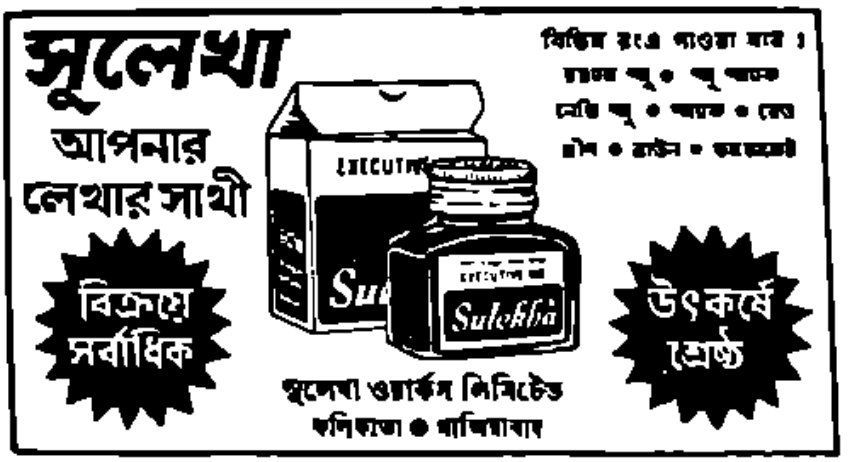

2 0 MAR 1979

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীহরপদ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী, শ্রীবারীন রায়।
সম্পাদক—শ্রীশান্তি স্বরূপ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বোম্বাই—শ্রীমধুগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীমতীন্দ্র গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ নং চিত্তরঞ্জন সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭৯

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ১০ই চৈত্র, ১৩৮৫ ২৪শে মার্চ, ১৯৭৯	২৩ সংখ্যা

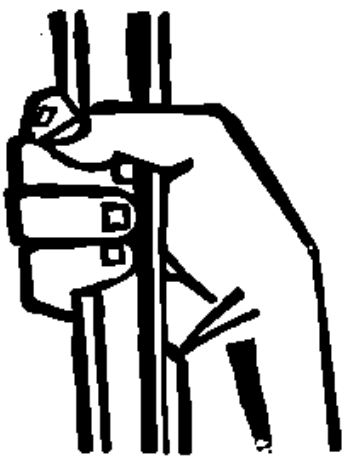

এই সংখ্যায়

চীনা আক্রমণও ভাববার কথা
। সম্পাদকীয় ।

মুদ্রা সঙ্কট
। শ্রীনগীভূষণ সেন ।

রাজনীতি আজ কোন পথে
। শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক নলিনী মোহন দাসগুপ্ত ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস
। ক্ষীরোদ দত্ত ।

বিপ্লবীর জীবন দর্শন
। দুর্গেশ ভট্টাচার্য ।

কি আর বলবো—

তোদের চৈতন্য হোক্

—ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী বারীণ রায়

আমাদের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম প্রবীণ বিপ্লবী বারীণ রায় গত ১৮ই মার্চ মহাজাতি সদন বাসভবনে সকাল ১০টায় পরলোক গমন করেন, মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭২ বৎসর। কিশোর বয়সেই তিনি চাকার বিপ্লবী শ্রীসংঘের সভ্য হন। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি স্তরে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়া ছিলেন। ফলস্বরূপ দীর্ঘদিন কারাবাস ভোগ করেন। তিনি ছিলেন বন্ধুবৎসল, অমায়িক এবং একনিষ্ঠ মহান বিপ্লবী। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী উপেন্দ্রলাল দত্ত

গত ১৫ই মার্চ বৃহস্পতিবার ইং ১৯৭৯ অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায় ময়মনসিংহের যুগান্তর দলের বিশিষ্ট কর্মী বালীনিবাসী নিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বালী অঞ্চলের প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথ জনসেবক, অমায়িক ডাক্তার উপেন্দ্রলাল দত্ত মহাশয় ৭৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। বিধবা সেবাব্রতী স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র ও কন্যা ও বহু নাতি নাতনী রেখে গেছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

সম্পাদকীয়—

চীনা আক্রমণও ভাববার কথা

গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভিয়েৎনামের উপর চীনের আক্রমণকে কেন্দ্র করে, কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন জনমানসকে বিচলিত, শঙ্কিত ও চিন্তিত করে তুলেছে। যে হাস্যকর অজুহাতে ভিয়েৎনামের উপর চীন অমানবিক প্রথায় আক্রমণ চালাচ্ছে, তার দ্বারা কমিউনিজমের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে উঠেছে বলেই চিন্তাশীল মানুষেরা মনে করছেন। দেখে মনে হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের ও কমিউনিষ্টদের আক্রমণাত্মক মানসিকতা ও পদ্ধতি গ্রহণের মধ্যে যেন একটা মৌলিক সাদৃশ্য আছে। মানবতাবোধ, মানবকল্যাণ, শাসন ও শোষণের অবলুপ্তিসাধন সর্ব্বশেষে সুখী ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন একটি জগৎ-পরিবার স্থাপনের আদর্শকে শুধু ত্যাগই করা হয় নি, একটু একটু করে এই উদ্দেশ্যগুলিকে যেন কামান, বোমা, বন্দুকের গুলিতে হত্যা করা হচ্ছে। এটা নতুনের সৃজন বেদন নয়, এটা নবজীবনের আগমনীও নয়, এটা যে একটি মর্মান্তিক বিশ্বযুদ্ধের অশনি সংকেত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কমিউনিজমের কয়েকটি মৌল আদর্শ আজ অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন।

প্রায় দেড়শত বছর আগে কমিউনিজম-এর আদি প্রবক্তা মার্কস্ সাহেব যে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে এই মতবাদ দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন, মার্কস্‌পন্থী রাষ্ট্রনায়করা আজ তাঁর বিশ্লেষণকে ভুল প্রমাণিত করতে যেন বদ্ধপরিকর। দীর্ঘকাল সামন্ততন্ত্র ও অন্যান্য রাজনৈতিক মতাদর্শের আমলে লাঞ্ছিত নিপীড়িত হয়ে নতুন ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন মানুষেরা। প্রচারের ফলেই হোক্ বা অন্তর্নিহিত সত্যের জন্যই হোক্, এই নতুন মতবাদ আশা উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল জনমানসে। মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল, শাসন-শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে তার দুঃখদুর্দ্দশার অবসান ঘটবে চিরতরে এবং এক কথায়, মানুষ ধূলার ধরণীতে স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু কালের পরিক্রমা পথে, এই আশা ত আজ দুরাশার পরিণত হতে চলেছে।

মার্কসের একটি মৌলিক বিশ্লেষণ আজ বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে তিনি বলে গিয়েছেন যে যুদ্ধ বাধে ধনতান্ত্রিক দেশের শোষণ পীড়নের মনোভাবের জন্য, বিশ্বের বাজার দখলের বাসনায়। আজ বিভিন্ন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে যে যুদ্ধের নীতি অনুসৃত

হচ্ছে, তা কিন্তু এই কারণে নয়। শক্তি ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যে অপচেষ্টা আগেও প্রচলিত ছিল, আজও তারই নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে। মানুষের আদিম আকাঙ্খাগুলির মধ্যে একটি প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল "কাহারো তাবেদার রহিব না।" আজ কিন্তু জবরদস্তী করে বৃহৎ কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের "মাৎস্য-ন্যায়" নীতি গ্রহণ করেছেন সেটাকেও মার্ক্সীয় দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলা যায় না কিছুতেই। সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের অতীত এবং বর্তমান কালের অনুসৃত নীতি এই দর্শনের পরিপন্থী। তারাও আজ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মত গোলাগুলি, বোমাবর্ষণ, নরহত্যা করে অন্যের সীমানা দখল করার জন্য মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন ও এখনও হচ্ছেন। সম্পূর্ণ বিভিন্ন মতাবলম্বী দেশের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধন ও চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বিন্দুমাত্র অনীহা প্রকাশ করছেন না। এদের মধ্যে আদর্শের কোন বালাই নেই, আছে নিকৃষ্টধরণের জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব।

তবে কি মার্ক্সীয় মতবাদ আজ জগতে অচল হয়ে পড়বে? অবশ্য মার্কস যখন বিশ্বের পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেছিলেন সেটা নির্ভুল ছিলনা বলে পরবর্তীকালে অনেক রাজনীতিবিদ্‌রা অভিমত প্রকাশ করেছেন। বিশ্ব পরিস্থিতি চিরদিন এক জায়গায় থাকে না, থাকতে পারেও না। জোর করে একথা বললে গোড়ামিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। যে মতবাদ নতুনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলার পথ রাখে না, ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনের সম্ভাবনাও নিশ্চয়তাকে অস্বীকার করে সে মতবাদ কালের কষ্টি পাথরে টিকে থাকতে পারে না। "মিলিবে মেলাবে" এই মানুষের চিন্তাধারার নির্দেশ, এই ক্রমবিকাশের ধারার অনুশাসন। মার্কসের পর মানুষের চিন্তাধারা কি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে? এ সম্বন্ধে নেতাজী বলেছেন—"কোন একটি জীবনবাদ মানব প্রকৃতির শেষ কথা, এই সিদ্ধান্ত করা সুবোধ সম্মত নয়। মানব প্রগতি কখনো থামতে পারে না – অতীতে অভিজ্ঞতার পটভূমিতেই আমাদের গড়ে তুলতে হবে নতুন সমাজ ব্যবস্থা।" যদি কেউ মনে করেন যে তাদের বক্তব্যই ইতিহাসের শেষ কথা তবে তাদেরই নাম ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যেতে বাধ্য। আজ কি সেই অবস্থার সম্মুখীন হতে চলেছে মার্কসবাদ। এ কথা কেউ বলবেনা যে একটি দর্শনের মৌলিক সত্যকে ত্যাগ করে সুবিধামত তার বদবদল করতে হবে? কিন্তু যুগের পরিস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে, পুরানো মতবাদকে একচক্ষু হরিণের মত সামগ্রিকভাবে আঁকড়ে থাকার মধ্যে ধ্বংসের বীজ আবশ্যই নিহত আছে কিনা। আজ সেই কথা ভাববার সময় এসেছে।

কমিনিজমের প্রবক্তারা আরো ভরসা দিয়েছিলেন যে কমিউনিষ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কালক্রমে মিলিয়ে যাবে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভৌগলিক সীমা অন্তর্হিত হবে, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু বর্তমানের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই বিশ্লেষণ নির্ভুল প্রমানিত হচ্ছে না। রাষ্ট্রও সিন্ধুবাদের দৈত্যের মত অন্য রাষ্ট্রের ঘাড়ের উপর চেপে বসছে। ভৌগলিক সীমা বিস্তৃত হচ্ছে প্রবাল রাষ্ট্রগুলির। ভাই ভাইকে খুন করছে অবলীলাক্রমে। বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের

সেতুবন্ধ রচনা করার পরিবর্তে একে অন্যের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষভাবে সচেষ্ট। আর এই সংঘর্ষটা বাধছে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বভৌমিকতার" আদর্শ এতে নেই। পাওয়া যাচ্ছে না বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর পরিকল্পিত ও অনুসৃত বৈদান্তিক সাম্যবাদের। তবে কি সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদেই আবার বিশ্বের রাজনৈতিক মঞ্চে পুনর্বাসন প্রাপ্ত হচ্ছে? কেন ভুলভ্রান্তি ঘটেছে কিনা এটাই আজ শুধু ভাববার কথা নয়, ভুলভ্রান্তির অবসান ঘটিয়ে নতুন মানবিকতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সচেষ্ট হওয়ার দিন এসেছে।

প্রসঙ্গক্রমে ভারতবর্ষের সাম্যবাদ ও জীবন দর্শনের পুনর্মূল্যায়ণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এখনকার সাম্যবাদেও জীবন দর্শনের মূল কথা হল যে মানুষ মাত্রই বিশ্বপিতার সন্তান। অতএব সমাজজীবনে সুখলাভ করতে হলে সর্বমানবে সমদৃষ্টি রাখা ও একাত্মবোধ করতে হবে। মানুষ যখন নিজেকে ব্রহ্মের অংশ বলে হৃদয়ঙ্গম করে, তখন সে আর নিজেকে পৃথক ভাবতে পারে না ব্রহ্মের অন্য অংশ থেকে। এর মাধ্যমে যে একাত্মতা গড়ে ওঠে, তা ক্ষণভঙ্গুর হয় না সেটা শাশ্বত ও কালজয়ী হয়। অবশ্য একাজ করতে হলে মহানায়ক রাসবিহারীও পৃথিবীর বিস্ময়কর সৃষ্টি নেতাজীর মত নিষ্কাম কর্মের মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হবে রাষ্ট্রের ধারক ও বাহকদের। স্মরণে রাখা দরকার শ্রীঅরবিন্দের বাণী—আদর্শ সমাজবাদের উৎপত্তিস্থল হবে এশিয়া বিশেষ করে ভারতবর্ষ।

যকৃতীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০
প্রস্তুতকারক: শ্রীজবনীমোহন চক্রবর্তী

রাজনীতি আজ কোন পথে

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয় শাসকদল 'জনতা' পদে পদে যে ব্যর্থতার নিদর্শন দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন তাতে মানুষের মনে, বিশেষ করে রাজনৈতিক সচেতন মানুষজনের মনে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে যে জনতাদল বোধ হয় শেষ পর্যন্ত ভেঙে যাবে; ফলে কেন্দ্রে পুনরায় শ্রীমতী গান্ধী ক্ষমতাসীন হবেন আর এই চিন্তায় বেশী কাতর হয়ে পড়েছে ভারতের সি, পি, এম দল। তাঁরা হাওড়ায় (সাংগঠনিক) তাঁদের প্রেনামে সেই কথাই ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেছেন অতি সন্তর্পণে। তাঁদের বক্তব্য হ'ল এই যে, জনতা ও কংগ্রেস প্রায় একই আদর্শের ধারক ও বাহক কারণ উভয়েই বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থের সংরক্ষক—কৃষক-শ্রমিকদের স্বার্থ এঁদের উভয়ের হাতেই বহুদিন থেকে বিপন্ন। তাই সি, পি, এম মনস্থ করেছে যে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ও কৃষক-শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণে তাঁরা বাম-গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন করে কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করবেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি এলাকায় তাঁদের সংগঠন যে খুবই দুর্বল তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। ভারতের ভারতের জনসংখ্যার অধিকাংশ লোক হিন্দি-ভাষাভাষি এলাকায় বসবাস করে, কাজেই হিন্দিভাষী মানুষের মনে স্থান পেতে গেলে তাঁদের ঐ সব এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে হবে এবং সংগঠন তৈরী করতে হবে। শ্রীমতি গান্ধীর ভয়ে এরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে আত্মরক্ষার তাগিদে সমস্ত বামপন্থীদের শরণাপন্ন হয়ে ও তাঁদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করার আশায় বুক বেঁধে অগ্রসর হবার জন্য তোড়জোড় করার চিন্তায় এখন মশগুল। কিন্তু এই আশা যে দুরাশা এবং শেষ অবধি যে হতাশায় ভুগতে হবে তা এখনও বুঝতে পারেননি। জনতাদল নিজেদের দোষেই ধীরে ধীরে ঝিমজোরি হয়ে পড়ছে। চরণ সিং ও মোরারজী দেশাই পরস্পরের বিরুদ্ধে যে সব উক্তি করেছেন এবং লোকসভায় ও অন্যত্র তাঁরা যে সব বিবৃতি দিচ্ছেন তাতে যে উভয়েরই ভাবমূর্তি ক্রমশই ম্লান হতে ম্লানতর হচ্ছে সে বিষয়ে সবাই একমত। জনতাদল গঠনে চরণ সিংয়ের অবদান অনস্বীকার্য, অথচ তিনি তাঁর যোগ্য মর্যাদা পাচ্ছেন না বলে বেশ স্পষ্ট তা সহজেই বোঝা যায়। চন্দ্রশেখর এখন চরণ সিংকে দলে ধরে রাখতে খুব বেশী আগ্রহ দেখাচ্ছেন, কিন্তু অতীতে যখন মহারাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ থেকে মোরারজী তাঁকে বিতাড়িত করেন তখন চন্দ্রশেখর মোরারজীর দিকেই বেশী ঝুঁকেছিলেন। চরণ সিং কৃষক সমাবেশ ঘটিয়েই বোধ হয় তখন চন্দ্রশেখরকে হাতে হাতে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে চরণকে অবহেলা করলে জনতা গভীর গাড্ডায় পড়বে। চরণের পিছনে উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের যে বিপুল জনসমর্থন আছে তা উপেক্ষণীয় নয়; বরং চরণ সিং জনতাদলের এক বিরাট সম্পদ। তাঁকে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে দলে ধরে রাখতে পারলে দল শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হবে। চরণ সিং কিন্তু বারে বারে সর্বসমক্ষে প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন যে তাঁর গঠিত দল তিনি কিছুতেই কোন অবস্থাতেই ছাড়বেন না। ওদিকে চন্দ্রশেখর গুপ্ত যাঁর সমর্থকের সংখ্যা প্রায় শূন্য বললেই ঠিক বলা হবে, তিনি হুংকার দিয়ে বলছেন চরণকে দল থেকে তাড়াতে, যদিও সে কথায় কেউই কর্ণপাত করে নি। চন্দ্রশেখর গুপ্ত চরণের বিরোধী বহুদিন থেকেই, আর তাই এই অবধা ও অরাজনৈতিক উক্তি যার অপর নাম চরম বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। চরণকে বাদ দিলে জনতাদলের সংকট ঘনিয়ে আসতে দেরী হবেনা। উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, হিমাচল প্রদেশ ও তৎসন্নিহিত এলাকার আট কৃষক সম্প্রদায়ের প্রায় শতকরা নব্বইভাগ মানুষ চরণ সিংকে তাদের একমাত্র নেতা ও অভিভাবক বলে বিশ্বাস করে

এবং দেবতাজ্ঞানে তাঁকে শ্রদ্ধা করে, কাজেই চরণ সিং নিজেই জনতাদলের একটা বিশেষ শক্তি ও স্তম্ভ। তাঁকে এভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা কোন ক্রমেই উচিত হয়নি। অন্ত সবেই জনতা মৃত্যুমুখে এগিয়ে যেতে কেন চায়, সেটাই বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার, যার কোন সদুত্তর নেই। সি, পি, এম এর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে জনতানেতারা লোকসভা নির্বাচনে নেমে ছিলেন আর ভেবেছিলেন ওরা শেষ পর্য্যন্ত লেজুড় হয়েই থাকবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় সি, পি, এম জনতাকে বেশ বড় ন্যাং মেরে নিজেরা কেমন কায়দায় ক্ষমতা দখল করে এখন কেন্দ্রের দিকে হাত বাড়াতে সাহসী ও উদ্যোগী হয়েছে, তাও তা কোনও দিনই অদূরভবিষ্যতে সফল হবেনা। সি, পি, এম দল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ দল যে কেন্দ্রে ক্ষমতা-দখলের আশা, বামনের চাঁদে হাত দেবার বাসনার সমতুল্য ছাড়া আর কিছু নয়। আগামী ৫০ (পঞ্চাশ) বছরের মধ্যে সি, পি, এম বা তার আকাঙ্খিত বাম-মোর্চার পক্ষে কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল অসম্ভব। হেনাদে নাম্বুদ্রিপাদ হিন্দির বা এলাকায় দলের সংগঠন তৈরী ও সম্প্রসারণের কথা তোলায় প্রাক্তন সম্পাদক সুন্দরায়া এবিষয়ে একমত হতে পারেননি। তাঁর চিন্তা ভিন্নতর, সুন্দরায়া মনে করেন এখনই হিন্দীভাষী এলাকায় সি, পি, এম এর প্রচার চিন্তার কোন চিন্তা অবান্তর ও অমূলক হবে এবং ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের সন্নিহিত এলাকাগুলি যথা :—আসাম, মণিপুর, উড়িষ্যা, অন্ধ প্রভৃতি রাজ্য-গুলিতে ক্ষমতা দখলের উদ্যোগ আয়োজন করলে সি, পি, এম এর সফল হওয়ার আশা অধিক ফলবতী হবে এবং তারপরে কেন্দ্রের দিকে হাত বাড়াবার উদ্যোগ নিলে হিন্দি এলাকাগুলি আপ্তে আপ্তে করায়ত্ত হবে। সি, পি, এম এর সর্বভারতীয় নেতৃত্ব পক্ষমুখে কংগ্রেস ও জনতাদলের কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁদের কাছে কংগ্রেস ও জনতাদল দুই পক্ষই দেশের পক্ষে চরম অধিকারক এবং সে কারণেই তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকার দখলের অভিসন্ধিতে বাম গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনের ডাক দিয়েছেন সাম্প্রতিক রেনাদে এবং দ্রুততার সঙ্গে সেই পথেই এগিয়ে যেতে কিছুদিন ধরে প্রবল প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেছেন। এইসব দেখে ও জেনে শুনেও জনতাদল কি করে সি, পি, এমকে এখনও বিপক্ষ শক্তি মনে না করে, তাকে অবথা তোয়াজ করছে, সেটাই বর্ত্তমান রাজনীতিতে এক অভিনব ব্যাপার, যার ব্যাখ্যা করা দুষ্কর। কেন এই আত্মঘাতি রাজনীতি জনতাদলের?

কি এর পরিণাম? জনতাদল নিজেদের মধ্যে যে ভাবে দুবা কলহে ও বাদ্‌বিতণ্ডায় এখনও মেতে আছে, তাতে সি, পি এম এর বাড়বাড়ন্ত ক্রমঅগ্রগয়মান এবং দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যে খাদ থেকে বেরিয়েছে তা কি তাঁরা একবারও ভেবে দেখছেন না এবং ফলে যে অশুভ শক্তিগুলির দাঁতাল বেশ বর্দ্ধিত হতে শুরু হয়েছে তাকে বাধা দেওয়া কি জনতাদলের পক্ষে ভবিষ্যতে আর সুবিধাজনক ও সম্ভব হবে? সময় থাকতে এখনও সমঝে যদি তাঁরা না চলেন, তবে অদূর ভবিষ্যতে অঘটন ঘটতে কতক্ষণ? মোরারজীদেশাই বেশ নিশ্চিন্ত মনে শাসন কার্য্য চালিয়ে যাচ্ছেন কারণ তাঁর বদ্ধমূল ধারণা চরণ সিং যতই তাঁর পুত্র কান্তি দেশাইয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সম্বন্ধে সোচ্চার হোন না কেন তিনি কিছুতেই ইন্দিরাজীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে জনতার পতন ঘটাবার চেষ্টা করবেন না। কিন্তু রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছুই নেই, তা যদি থাকতো তবে মোরারজীভাই ও অকাল আদি কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে যাঁরা কট্টর গান্ধীপন্থী বলে সুপরিচিত তাঁরা কেন এবং কি চিন্তা ভাবনায় জনসংঘ ও সি, পি, এম দলের সঙ্গে আঁতাত করে লোকসভা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলেন? এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল একটাই এবং তা হচ্ছে শ্রীমতী ইন্দিরাকে গদীচ্যুত করা; কাজেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁরা তাঁদের আদর্শ বিসর্জ্জন দিলেন এবং সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শে আদর্শবান দলের সঙ্গে একীভূত হয়ে কার্য সিদ্ধি করলেন।

(চলবে)

মুদ্রা সঙ্কট

॥ শ্রীসতী ভূষণ সেন ॥

এক যে ছিল রাজা।

উপকথার রাজা। অভাব অনটন ছিল না। যা চান, তাই পেয়ে যান। নতুন মডেলের রথ দেখলেন তো কিনে ফেললেন। নতুন ফ্যাসানের শাড়ি চোখে পড়লে তো কথাই নেই। পকেটে টাকা না থাকলেই বা কি! মুখ ফুটে বলে ফেললেই হল, 'বিলটা পাঠিয়ে দেবেন'। রাজাকে বাকি দিতে কারও আপত্তি হত না। রাজা খুব ভাল Credit Risk। সর্বদেশে এবং সর্বকালে। টাকা মারা যাবার ভয় নেই।

কিন্তু একদিন গেল সব উল্টে।

সদাগরের Show room থেকে বেরিয়ে আসছেন রাজা, হাতে একখানা শাড়ী, মনে মনে কল্পনা করছেন নতুন সুয়োরাণীকে কেমন মানাবে, মাত্র মুখ থেকে কথাটি খসেছে 'বিলটা পাঠিয়ে দেবেন', শুনলেন পেছন থেকে সদাগরের কণ্ঠ, 'আমি তো পাঠিয়ে দিতেই চাই। কিন্তু কি যে মুদ্রা সঙ্কটের আগুন লেগেছে, কারও হাতে একটা পয়সা নেই। বাকিতে যে বেচবো, সে জো নেই।'

এই সদাগর একদা ছিল রাজার বাল্যবন্ধু। রাজা যখন কিশোর রাজপুত্র, সদাগর তখন সদাগর পুত্র। মানিকজোড় তখন মাঠে মাঠে ঘুড়ি ওড়াতেন, গাছে উঠে পাখীর ডিম পাড়তেন। স্বপন পরীর নৈশ অভিযান করতেন। সিংহাসনে বসার পরে কেনাকাটা প্রধানতঃ এখান থেকেই করে থাকেন। সেই বন্ধুর এই ব্যবহারে রাজা অতিশয় অপমানিত বোধ করলেন, প্রতিজ্ঞা করলেন, আর এই ব্যক্তির মুখ দর্শন করবেন না। পাশের বড় দোকানটিতে প্রবেশ করলেন। সেই দোকানীও যখন পিছিয়ে গেল, আর মুখ কাঁচুমাচু করে মুদ্রা সঙ্কটের দোহাই দিল তখন...

এ যুগের রাজা হলে, সদাগরদের আর রক্ষা ছিল না। বিশ দফা আর্থিক অপরাধের (Economic Offence) দায়ে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে পচতে হত। সে তুলনায় উপকথার রাজারা ছিলেন শিবতুল্য ব্যক্তি। সারথীকে বললেন প্রাসাদে নিয়ে চল। অর্থমন্ত্রীকে ডেকে বললেন, দেখলাম রাজ্যে বড় মুদ্রা সঙ্কট চলছে। সরকারী ছাপাখানাকে নির্দেশ দেও, প্রেসে কালি লাগিয়ে নোট ছাপতে থাকুক। আমার রাজ্যে কারো যেন টাকার অভাব না থাকে।

অর্থমন্ত্রীর মুখ শুকিয়ে গেল। বললেন, 'তা হলে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে!' স্বর্গীয় মহারাজার আমলে যে ভয়াবহ পাগলা মুদ্রাস্ফীতির তাণ্ডব দেখেছি, তা কি ভোলা যায়? আপনি তখন

শিশু, মনে থাকবার কথা নয়। শত্রুর আক্রমণ রুখতে গিয়ে, যুদ্ধের প্রয়োজনে, প্রচুর টাকার দরকার হয়েছিল। সেই সব কড়কড়ে নোট যখন বাজারে ছুটতে শুরু করল: যা পায়, যে দামে পায়, কিনতে শুরু করল, একমণ চালের দাম দেখতে দেখতে পাঁচ টাকা থেকে এক লাফে পঞ্চাশ টাকা হয়ে গেল। কত লাখ মানুষ যে উপোষে মরেছিল সেবার, তার হিসেব হয়নি। আসল যুদ্ধে আর ক হাজার প্রাণ দিয়েছিল!'

রাজা ভাবতে লাগলেন। সমস্যাটা মোটেই সহজ নয়। রীতিমত ঘোরালো। সমাধানের জন্য রাজ্যের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপকদের আমন্ত্রণ করলেন। বললেন, আপনারা জানেন দেশে দারুণ অর্থ সঙ্কট চলছে। টাকা পয়সার এই যে টানাটানি, কি করে সেটা দূর করা যায়, সে বিষয়ে একটা সংক্ষিপ্ত রচনা লিখে ফেলুন। যার রচনা সর্বশ্রেষ্ঠ হবে তিনিই হবেন রাজ্যের ভাবি অর্থমন্ত্রী।

পণ্ডিতেরা লিখতে বসে গেলেন। পাতার পর পাতা প্রবন্ধ রচনা করলেন। চার্টের পর চার্ট এঁকে ফেললেন। সেই সব পাতা ও চার্ট রাজার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগল। একবর্ণও মগজে প্রবেশ করল না। বিরক্ত হয়ে রাজা তাদের দূর করে দিলেন। বাকি রইল মাত্র একজন। দেখলে পণ্ডিত বলেই মনে হয় না, একেবারে নবীন যুবা। তিনি বললেন, মহারাজ আমি মাত্র পাঁচটি শব্দে সমস্যাটা ব্যক্ত করছি। আসল কথা হচ্ছে, 'বিনি পয়সায় ভোজ হয় না।'

শুনে রাজা প্রথমটা রাজসিক লাল হয়ে উঠলেন। চীৎকার করে উঠলেন 'কোই হ্যায়?' এই হতভাগাকে ঘাতকের হাতে ...' বলতে বলতেই ক্রোধ উপসর্কিত হল। শেষটা ফিক্ করে হেসে ফেললেন।' সমস্যাটা তো বোঝা গেল, এখন সমাধানটা কি শোনা যাক।

তখন যুবক বললেন, যখন মানব উৎপন্ন না করে ভোগ করতে চায়, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী করতে থাকে তখন সমাজে মুদ্রা সঙ্কট দেখা দেয়। সকলেই যদি নিজ নিজ বৃত্তি ও শক্তি অনুযায়ী উৎপাদন না করে, চাষী ক্ষেতে ফসল না তোলে, মজুর কলে কাপড় না বানায়, কর্মিক নির্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন না করে, তখন ..

'তখন রাজাও বাজারে বার পান না। নোট না ছাপিয়ে একটি পিনও কিনতে পারেন না।' বলে উঠলেন রাজা। 'তাইত আমি বরাবরই বলে আসছি, 'বিনি পয়সায় ভোজ হয় না।' আগে রোজগার পরে ভোগ।'

'অতিশয় ন্যায্য কথা বলেছেন মহারাজ। অর্থমন্ত্রীই কি আপনার কথা শোনেন? রাজস্ব যা আদায় হয়, খরচ করেন তার বেশী। পকেটে টান পড়লেই নোট ছাপিয়ে কাজ চালিয়ে থাকেন। ঘাটতি বাজেট কি বন্ধুর, জিনিষপত্রের দামও দিন দিন আগুন হচ্ছে। মারা পড়ছে গরীব, মরছে বাঁধা আয়ের মানুষ। হাতিশালে হাতির খোরাক যোগাতে টাঁকশালে টাকা ছাপছেন, জমছে গিয়ে মহাজনদের সিন্দুকে।'

'তোমার এই শেষ কথাটা কিন্তু ঠিক হল না, অর্থমন্ত্রী! [কারণ আজ থেকে তুমিই এ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী], সদাগরেরাও মুদ্রা সঙ্কটে সমান বিপন্ন।'

'সদাগরেরা সকলেই মহাপুরুষ। ঈশ্বর যাকে দেন ট্যাক্স দারোগাও তার সন্ধান পান না। মহারাজ যেদিন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তার অন্ন কদিন আগেই সদাগরপুত্র গদীতে বসেছিলেন। তখন তাঁর সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৮ কোটি টাকা। এই কয় বছরে তাঁর সম্পত্তির মোট মূল্য দাঁড়িয়েছে ১০৬৭ কোটি টাকা। রাজধানীর চোখের উপর সম্পত্তিগুলির অধিকাংশেই তাঁরই Nameplate শোভা পাচ্ছে। কোনটিতে তাঁর ইস্কুল, কোথাও তাঁর কলেজ, কোথাও বা হাসপাতাল। এই সব সৎকার্য্য সমস্তই সম্ভব হয়েছে, রাজকোষের কড়কড়ে টাকা শেষটায় তাঁর সিন্দুকে জমা হওয়ার পরে।'

'বুঝলাম। এখন থেকে রাজকার্য্য আমাকেই দেখতে হবে। মনে রাখবে অর্থমন্ত্রী ঘাটতি বাজেট আর নয়। আমাদের motto হবে 'যত্র আয় তত্র ব্যয়।'

'অতি উত্তম প্রস্তাব। পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার আগেই মানুষকে স্থির করতে হয় স্বার্থপর হব কিম্বা নিঃস্বার্থ। তড়িঘড়ি একটা বেছে নিতে হয়, পরে আর বদলানো চলে না। বিধাতাপুরুষ তক্ষুণি কপালে লিখে দেন কিনা। স্বার্থপর হওয়াটা খারাপ ঠিকই, কিন্তু ভেবে দেখুন মহারাজ, একেবারে নিঃস্বার্থ হওয়াটাও সংসারী মানুষের পক্ষে খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। নিঃস্বার্থ যে, সে কখনো ধন সঞ্চয় করতে পারে না। ধন সঞ্চয় না করলে কোন ভাল কাজই করা সম্ভব হয় না।

রাজাকেও প্রথমেই স্থির করতে হবে তিনি কি করতে চান। সেই মত একটা পরিকল্পনা হবে। রাজার একটা standard of living maintain করতে হয় গরীব দুঃখীকে দান ধ্যান করতে হয়, রাজ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টাও করতে হয়। ধন ব্যতিরেকে এর কিছুই করা সম্ভব নয়। রাজার ধন সৃষ্টি হয় ছাপাখানায়। সেই ধনে তিনি মন্দির মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন, দীঘি কেটে জল কষ্ট দূর করেন। কেউ গড়েন পিরামিড কেউ তাজমহল, কেউ কোনারকে সূর্য্য মন্দির। প্রত্যেকটির মূলে এক এক সম্রাটের বড় বড় ঘাটতি বাজেট।'

এবার মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন রাজামশায়। ভালো কাজ করতে গেলেই কি আসবে মুদ্রাসঙ্কট? উপোষ করবে গরীব দুঃখী?

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

ও

সবাইকে পড়ান—

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

(স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রাম)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নিম্ন আদালত বিচারে তাদের কিছু জরিমানা করে ছেড়ে দিলেন। এটা ঘৃণ্য মামলা এবং আসামীদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত ছিল। বিষয়টি নিয়ে আমি পত্রিকায় লিখলাম এবং ব্যক্তিগতভাবে স্যার জন উড্‌রাফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে সব বললাম। অপরাধীদের শাস্তি বৃদ্ধির জন্য এক আবেদন করা হল। অপরাধীদের একজনকে খুঁজে পাওয়া গেল না। সে মুচলেকা দিয়ে মুক্ত করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে গিয়েছে। অপর ব্যক্তির পুনর্বিচারে চার মাস কারাদণ্ড হল। লোকটি গভর্ণমেণ্টের অধীনে পি, ডব্লু, ডিতে কাজ করত। তার মুক্তির পরে তার সম্পর্কে একটু আগ্রহ বোধ করি এবং একটুখানি চেষ্টা করে তাকে তার চাকরীতে পুনর্বহাল করতে সমর্থ হই।

এই জাতীয় মামলায় নিম্ন আদালতগুলি প্রায়ই বর্ণ-বিদ্বেষের মনোভাব নিয়ে কাজ করে। কিন্তু যত উপরের দিকে ওঠা যায় ততই পরিবেশ শুদ্ধতর বলে প্রতিভাত হয়। আমি হৃষ্টচিত্তে লক্ষ্য করছি যে এই ব্যাপারে ইয়োরোপীয়দের মত এবং মনোভাব এখন উন্নত হচ্ছে। এই অবস্থা বজায় থাকলে তাদের প্রভাবে এবং উচ্চ সমাজের মধ্যে সম্পর্ক উন্নততর হলে এই মনোভাব আরও বৃদ্ধি পাবে।

ডাঃ সুরেশচন্দ্র সরকারের মৃত্যুতে তার পরিবার অসহায় এবং কপর্দকহীন হয়ে পড়ে। তিনিই ছিলেন পরিবারের প্রধান এবং একমাত্র উপার্জন কর্তা। তার চিকিৎসার ক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল ঠিকই, কিন্তু খুব বেশী উপার্জন হত না। কারণ তার রোগীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকই ছিল বেশী। তার ছেলেরা ছিল তখন খুবই ছোট। একটি পড়ত এক মেডিকেল স্কুলে। তাদের কিছু সাহায্য করার জন্য আমি লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার জন উড্‌রাফের কাছে তদ্বির করতে গিয়েছিলাম। স্যার উড্‌রাফ উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। আমার আবেদনে তিনি গুরুত্বের সহিত সাড়া দিলেন। তিনি আমাকে বললেন, "যদি বাঙ্গালি, এই ছেলেটি (অর্থাৎ ডাঃ সুরেশচন্দ্র সরকারের পুত্র) যদি পাশ করা ছেলে হত, তাহলে আমি তাকে একটি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োগ করতাম। আমার বাধা হচ্ছে এখানে যে তার সেরকম কোন উপযুক্ত যোগ্যতা নেই। তবে আমি তাকে একটি সাব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত করব।" সে চাকরী সে পেল। পরে ক্রমবর্দ্ধমান পরিবারের চাপে তার আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল। তখন আমারই অনুরোধে পরবর্ত্তী লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার এডওয়ার্ড বেকার সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তার ভাইকেও একটি সাবরেজিষ্ট্রারের পদে নিয়োগ করলেন।

১৮৯৮ সালের কংগ্রেসে আমরা লর্ড কার্জনের সহানুভূতিপূর্ণ বাণীর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমরা এই আশাও পোষণ করেছিলাম যে তিনি প্রগতি ও জন-সাধারণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নীতি অনুসরণ করে চলবেন। পরের বছরই এমন সব ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করল যে আমাদের মধ্যে অতি আশাবাদীদের মন থেকেও সে আশা উবে গেল। সিলেক্ট কমিটির স্তর পেরিয়ে আসার পরে ক্যালকাটা বিশ্ববিদ্যালয় বিল সম্পর্কে তিনি যে আচরণ আরম্ভ করলেন তাতেই তাঁহাদের প্রতি-ক্রিয়াশীল নীতির ও ভারতের জনমতের প্রতি অবজ্ঞার প্রমাণ পাওয়া গেল। এই স্মৃতি কথার এক জায়গায়

পূর্বেই আমি তার এই আদেশের কথা উল্লেখ করেছি। তার এই আদেশগুলিতে কলকাতা কর্পোরেশনকে সরকারী কর্মচারীদের ভাবে আনার ব্যবস্থা করা হল। এই আদেশগুলি এমনই অপ্রত্যাশিত ছিল যে এরকম একটা ব্যাপকভাবে রটে গেল যে স্যার জন উডবার্ণ প্রতিবাদে পদত্যাগ করার হুমকি দিয়েছেন। কিন্তু কেন তিনি পদত্যাগ করলেন না, তা আমরা জানিনা। তার এই আদেশ সমস্ত কলকাতাকে এমন এক আন্দোলনের আবর্তে ফেলে ছিল যার চেয়ে বড় আবর্ত কেবলমাত্র বঙ্গ বিভাগের বিরোধিতার বিক্ষোভই সৃষ্টি করেছিল। সে বিক্ষোভও লর্ড কার্জনের অনুসৃত নীতির ফলেই সৃষ্ট হয়েছিল। দেশের লোক ক্রত ভাইসরয়ের প্রতি বিশ্বাস হারাতে লাগল। জনগণের এই অবিশ্বাস ১৮৯৯ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের প্রস্তাবে প্রকাশ পেল। সে প্রস্তাব আমিই তুলেছিলাম। সে প্রস্তাবের বয়ান ছিল এইরূপ:

> "দেশের জনগণ সকলে একমত হয়ে বিরোধিতা করা সত্ত্বেও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের বিপর্যয়কারী কলকাতা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট পাশ করে এবং বোম্বে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনকে বিপদগ্রস্ত করার মত একই ধরনের একটি আইনের প্রস্তাব আনয়ন করে যে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি প্রকট করা হয়েছে, এই কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করছে।"

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল একটি স্থানীয় ব্যাপার হলেও এর একটা সর্ব-ভারতীয় তাৎপর্য আছে। কারণ এই প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের নীতিকে ব্যাহত করছে, যে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের প্রবর্তন ও ক্রম-বিকাশের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষই গভীর আগ্রহ বোধ করছে। তখনকার দিনে কোন প্রাদেশিক সমস্যার মধ্যে যদি সর্ব-ভারতীয় স্বার্থ ও সাধারণভূতি আক্রান্ত হত, তাহলে কংগ্রেসে সেই সমস্যাকে সর্ব-ভারতীয় সমস্যা বলে গ্রহণ করার ও পর্যালোচনা করার রেওয়াজ ছিল। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের উপর আলোচনা কংগ্রেস তার প্রচলিত প্রথার বাইরে কিছু করেনি। অনুরূপভাবে প্রাদেশিক সম্মেলনগুলিতেও সর্বভারতীয় সমস্যাবলীকে প্রায়ই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হত। এই রীতি এক প্রদেশের জন-জীবনকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের জন-জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে সহায়তা করে এবং তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে অবদান জুগিয়েছে।

কলকাতা কর্পোরেশনের অধিকার হরণের প্রশ্ন নিয়ে কংগ্রেসে আলোচনার সময়ে মিঃ আর. সি. দত্ত যে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেছিলেন তার একটা বিশেষ উপযোগিতা ছিল। আমরা যখন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করি, তখন তিনি ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। তার সঙ্গে আমি পত্রালাপ চালাচ্ছিলাম। ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই বিলের উপর আলোচনার জন্য যে মহতী বিতর্ক সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল তা প্রধানতঃ তারই উদ্যোগে সংগঠিত হয়েছিল। এই সভায় মিঃ হার্বার্ট রবার্টস্ (বর্তমানে লর্ড ক্রাইউড) একটি অনুসন্ধান কমিশন গঠনের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন এবং তখনকার দিনের সরকার বিরোধী পক্ষের স্যার হেনরি ফাউলার ঘোষণা করলেন যে তিনি এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাননি যাতে বলা যেতে পারে যে নির্বাচিত কমিশনারগণ তাদের কর্তব্য পালন করতে পারেননি।

এই বিতর্কের ফলে আমাদের মধ্যে আশা জাগে যে বিলের কিছুটা পরিবর্তন হয়ত হবে। কিন্তু সে আশা মরীচীকায় পরিণত হল। লর্ড কার্জনের প্রস্তাবই অটুট থাকল। বিলটি আইনে পরিণত হল। সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা নিয়েই বিলটি আইন হয়ে গেল। ফলে দেখা দিল উত্তেজনাপূর্ণ মন্তব্য ও সমালোচনা। পর পর কতগুলি প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার এইটি হল প্রথম। এই ব্যবস্থাগুলি শাসক গোষ্ঠীর এমন এক নীতিকে প্রকট করে দিল যা ব্যাপক অশান্তি ও উত্তেজনা সৃষ্টি না করে পারল না।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে আমরা একটি প্রস্তাব নিলাম যে প্রস্তাবে দাবী করা হল যে "ইংল্যাণ্ডে একটি এজেন্সী নিয়োগ করা হোক। সে এজেন্সীর কাজ হবে ভারতের

সমস্যাগুলি সম্পর্কীয় তথ্য দলের ব্যাপক প্রচারের জন্য ইংল্যাণ্ডে ব্রিটিশ কমিটির সঙ্গে মিলিতভাবে জনসভা সংগঠন করা এবং সেই উদ্দেশ্যে একটি অর্থ ভাণ্ডার গড়ে তোলা।"

আমি সে প্রস্তাবটি তুললাম এবং অর্থ ভাণ্ডারে টাকা দেওয়ার জন্য আবেদন জানালাম। আমার সে আবেদন সফল হয়েছে বলে বলতে পারি না। তাছাড়া তখন তখনই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করা হয়নি। প্রস্তাবটি কংগ্রেসের স্থায়ী কার্যক্রমের অংশ হিসাবে থেকে যায়। কিন্তু প্রস্তাবটিকে কার্যকরী করার প্রচেষ্টা সে রকম নিবিড়ভাবে চলেনি; চলেছে কতকটা আকস্মিকে টান-টান ভাবে।

১৯০০ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল লাহোরে। কংগ্রেসের প্রবীণ কর্মী লালা মুরলীধর এই অধিবেশন আহ্বান করেন। স্বাস্থ্য ও শক্তিতে তুলনে তিনি কংগ্রেসের সভায় যোগদান করে যেভাবে তার কৌতুক ও রসিকতা দ্বারা সকলকে মাতিয়ে রাখতেন, পুরান কংগ্রেস কর্মীদের তা এখনও মনে আছে। বয়সের ভারে নত ও অনমর্থ হয়ে পড়লেও কংগ্রেস আন্দোলনে তার উৎসাহ ছিল অনড়, অটুট।

লালা জৈনীরাম লক্ষ্ণৌয়ে আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন যে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসার আগে আমি পাঞ্জাবের কয়েকটি সহরে যুবক ও জন সভায় বক্তৃতা করব। তিনি মনে করেছিলেন যে পাঞ্জাবে কংগ্রেসের কাজে আগ্রহ জাগিয়ে তোলার জন্য এর প্রয়োজন আছে। আমার কাছে এটা কর্তব্যের ডাক বলেই মনে হল। তাই আমি সানন্দে সাড়া দিলাম। আমি দুর্গাপূজার সময় সিমুলতলায় থেকে যে বার্ষিক অবকাশ যাপন করতাম তা বন্ধ রেখে ১৯০০ সালের অক্টোবর মাসে পাঞ্জাব রওনা হয়ে গেলাম। আমাদের প্রথম সভা হয় দিল্লীতে। এখানে ব্যারিষ্টার সর্দার ভগৎসিং আমার সঙ্গে মিলিত হন এবং পরিভ্রমণকালে আমার সঙ্গে থাকেন। আমি দিল্লী অমৃতসর, লাহোর এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে জনসভায় বক্তৃতা করি। লাহোরে অভ্যর্থনা সমিতির অনুরোধে আমি ব্র্যাডলা হলের উদ্বোধন করি। এই হলটি স্বর্গতঃ মিঃ ব্র্যাডলার স্মৃতি রক্ষার জন্য নির্মিত হয়েছিল এবং এখানেই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। পরবর্তীকালে হলটি আগুনে পুড়ে যায়। পরে আবার তা নির্মাণ করা হয়।

রাওয়ালপিণ্ডিতে অবস্থানকালে আমি আচমকা লালা জৈনীরামের মৃত্যু সংবাদ শুনলাম। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান বাবু কালীপ্রসন্ন রায়ের ভাষায় তিনি ছিলেন "পাঞ্জাবের কংগ্রেস আন্দোলনের আলোক ও জীবন।" কংগ্রেস অধিবেশনের সমস্ত আয়োজন করার দায়িত্বভার অধিকাংশই ছিল তাঁর উপর ন্যস্ত। ১৯০০ সালের লাহোর কংগ্রেসের সাফল্য তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রম, একাগ্রচিত্ত উৎসাহ এবং সতর্ক পরিচিন্তনের ফলে সম্ভব হয়েছিল। জীবনের সর্বোত্তমকালে, ৩৫ বছরে, পরিপূর্ণ যৌবনের স্তর পেরিয়ে বেরিয়ে আসার আগেই তাঁর এই মৃত্যু দেশের পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করল। আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনের উপর তাঁর এই মৃত্যু এক শোকের ছায়াপাত করল।

এটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যে লাহোর কংগ্রেসে একজন বাঙালী উকিলকে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়েছে। বাঙালী এবং পাঞ্জাবীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের কোন প্রমাণের যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে এটাই একটা প্রমাণ। সহর কুশল গোষ্ঠীর লোকেরা আমাদের প্রদেশের লোকদের অবজ্ঞা করে—এই রকম যে একটা নিন্দাবাদ প্রচলিত আছে, এই ঘটনাই তা নস্যাৎ করে দেয়। বাবু কালীপ্রসন্ন রায় পাঞ্জাব বারে তাঁরতীয় নেতা ছিলেন। ইংরেজপাড়ায় এবং ভারতীয়, উভয় সম্প্রদায়ই তাঁকে সম্মান করত। আইনজ্ঞ হিসাবে তাঁর পারদর্শিতা, নাগরিক হিসাবে তাঁর জনহিতৈষণা, ব্যক্তিগত জীবনে পরিপূর্ণ সততা এবং ন্যায়-পরায়ণতা—সব মিলে তাঁকে এই সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। লাহোরে তাঁর সম্পর্কে এই রকম ধারণা প্রচলিত আছে যে তাঁর স্বাধীন মনোভাব ও কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক না থাকলে—যা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট ছিল একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার—তিনি পাঞ্জাব হাই-কোর্টের বেঞ্চ থেকে উন্নীত হতে পারতেন। (চলবে)

বিপ্লবীর জীবন দর্শন

॥ দুর্গেশ ভট্টাচার্য্য ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সন্তা পলান, এই তো আমাদের জীবন! দিনের শেষে রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবি—আজকের দিনটা ভালোয় ভালোয় গেল! এইভাবে অনিশ্চিতের ভিতর দিয়েই আমাদের দিন যায়! বলতে পারিস পলান এর কি শেষ নেই? রাত্রির শেষে দিন কি আমাদের আর আসবে না?

পলান একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। তারপর ধীরে ধীরে বললো—আচ্ছা যা' ঠাকুর, পা-টা একটু এগিয়ে যাও, প্রণাম করে বিদায় নেই, বাড়ি গিয়ে সুখবরটা পৌঁছে দিই।

দিন যায় বসে থাকে না—সুখে হোক, দুঃখে হোক—দিন চলে যায়। আমাদেরও দিন কাটতে লাগল। দিনভিখারীও ক্রমশঃ বড়ো হয়ে উঠতে লাগল। অতি কষ্টে কোন প্রকারে দিন কাটত—সব সময় প্রয়োজন মত দিনভিখারীর দুধও জুটত না। দুধ অভাবে মা যখন ভাতের ফেনের বাটিটা হাতে করে এগিয়ে আসতেন ওকে খাওয়ানোর জন্য তার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ত—আর মনে মনে ভগবানকে ডেকে বলতেন—যদি এরা বেঁচে থাকে, এদের তুমি মানুষ করো, আর স্মরণ করিয়ে দিও—শৈশবে বাবাও জোটেনি।

এখানে একটু বলে রাখা দরকার দাদার নাম দিনভিখারী হল কি করে। সব সংসারেই নামকরণের একটা প্রথা আছে। ধনী যারা অথবা যারা কিছু টাকা পয়সা খরচ করতে পারেন তাদের তো বেশ জাঁকজমক করেই এই নামকরণ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। অবশ্য দরিদ্রের কোন ব্যাপারেই আড়ম্বর সম্ভব নয়। তাই আমার দাদার নামকরণের সময়ও কোন আড়ম্বর ছিল না। তবু নাম যখন একটা রাখতেই হবে, তখন মা, বাবা, ভাই, বোন এবং আমার আরও পাঁচ ভাইয়ের নামের সাথে মিলিয়ে দাদার নাম রাখা হ'ল 'ধনেশ'। আমার অপর পাঁচ ভাইয়ের নাম ছিল—নরেশ, পরেশ, হীরেশ, রমেশ ও যোগেশ। আর এই ছয় ভাইয়ের নাম হ'লো 'ধনেশ'।

আমাদের কোন ঝি ছিল না বলে আমার মায়ের সাথে সাথে সব সময় ঘুরে বেড়াত একটি মেয়ে—নাম তার দুর্গা—জাতিতে নমশূদ্র—আমার এই দাদার চেয়ে ছয় সাত বৎসরের বড়ো। দেখতে ঘিস্‌মিসে কালো—লম্বা দোহারা গড়ন—টানা টানা চোখ। রংটা বাদ দিলে দুর্গা ছিল অদ্ভুত সুন্দরী। বলে না দিলে একজন বাইরের লোকের পক্ষে বুঝা শক্ত ছিল যে মেয়েটি আমাদের পরিবারের নয়।

দাদার নাম যখন 'ধনেশ' ঠিক হয়ে গেল, দুর্গা ছিল সেই সময় মাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে। মা ওকে জিজ্ঞাসা করলেন—নামটি পছন্দ হ'ল দুর্গা?

দুর্গা বলল—ছাই হয়েছে। খেতে যার কপালে দুধ জোটে না তার আবার এত পোষাকি নাম কেন? নাম রাখ—'দিনভিখারী'।

কথা শুনে মা দুর্গাকে ধপ করে কোলে তুলে নিলেন। কাপড়ের আঁচল দিয়ে দু' চোখ ঢেকে মা বললেন,—তাই হোক। দাদার আর একটি নাম হ'ল 'দিনভিখারী'।

মা আমার কথা বলতেন কম—তাই তার কথার ধারও ছিল, ভারও ছিল। আমাদের সংসারে তার কথার উপর কথা বলার সাহস বড়ো একটা কারোর ছিল না। কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে মা আমার ছোট একটি উত্তর দিয়েই কথা এড়িয়ে যেতে চাইতেন। তারপরও যদি কেউ অগ্রসর হ'ত, তখন তিনি একটু ম্লান হাসি হেসে বলতেন,—এত কথা বলার সময় কোথায় আমার? যতক্ষণ কথা বলব ততক্ষণে হাতের কাজ সারা হয়ে যাবে।

এ কথাটার তাৎপর্য বর্তমান যুগের লোকের পক্ষে বোঝা শক্ত—বিশেষ করে যারা সহরে বন্দরে থাকেন। ব্যাপারটা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের মনটাকে নিয়ে যেতে হবে সত্তর, পঁচাত্তর বৎসর পূর্বের একটি ছোট মোহনা গ্রামে। মোহনা বলছি কেন? বর্তমান যুগের গ্রাম সেদিনকার গ্রাম থেকে অনেক উন্নত। কাজেই আজকের গ্রাম দেখে সেদিনকার গ্রামের কথা কল্পনা করাও শক্ত! সে যুগের সমাজব্যবস্থা, রীতিনীতিও ছিল আলাদা।

আমাদের গ্রামের একটু আভাস দিলে তখনকার দিনের ছোট একটি মোহনা গ্রামের পরিচয় পাওয়া যাবে। বালু-নদীর পারেই আমাদের গ্রাম—ছোট ছোট পাঁচে ঢাকা পথ। বর্ষাকালে চারিদিকেই জল। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে হলে নৌকা ছাড়া কোন উপায় নেই। রাস্তাঘাট সবই কর্দমাক্ত। সব বাড়িই নানা প্রকার জোপজাড়ে ভরা; বাড়ি বলতে মাঝখানে একটা আঙিনা—আর তার চারপাশে চারটি মাটির ঘর। তারপর এদিক সেদিক গোয়ালঘর, গোয়ালঘর ইত্যাদি। আজকালের মত প্রতি বাড়িতেই একটি করে নলকূপ ছিল না। খাবার জল গ্রামের লোকেরাই একটি ভালো পরিষ্কার পুকুর থেকে বয়ে নিয়ে আসত। বাড়ির মেয়েরা মাটির কলসী করে সাত আট মিনিটের পথ হেঁটে এই জল বয়ে নিয়ে আসত। গোয়ালঘর পরিষ্কার করা, গোবর দিয়ে ঘুটে দেওয়া, গরুর খাবার দেওয়া, প্রতিটি ঘর আঙিনার প্রতিদিন গোবর দিয়ে লেপা ইত্যাদি সব কাজ মেয়েদের করতে হত, বর্তমান যুগের মেয়েরা এ সব কল্পনাও করতে পারে না! তারা ভাবতেই পারে না—খাবার জল ব্যতীত বাড়ি হয় কেমন? সাত, আট মিনিটের পথ হেঁটে কি করে খাবার জল বয়ে আনে? আমাদের মা, বোনেরা সেই সময় এ সব কাজ হাসি মুখে করত এবং কেউ তা করবে না—এ কথা ভাবতেই পারত না। এর জন্যই বোধহয় আমার মা অত্যন্ত স্বল্পভাষিণী ছিলেন—কথার থেকে কাজ বেশী ভালোবাসতেন। এই গ্রামেই—এই পরিস্থিতিতেই আমাদের পিতা, পিতামহগণ মানুষ হয়েছেন।

দিনে দিনে দিনলিপিকারী বড়ো হতে লাগল। ওর যখন তিন বৎসর বয়স তখন জন্ম নিলাম আমি। অপরাপর ভাইদের নামের সাথে মিলিয়ে আমার নাম রাখা হ'ল 'দুর্গেশ'। আমরা সাতভাই হলাম। সন্তানদের সাতভিক্ষা ঘর-দৌলতে পরিপূর্ণ করে আনব বলে আমরা এগিয়ে চললাম মাত্র দরিয়ার দিকে—অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে লক্ষ্য করে।

বাবা সব সময় থাকতেন রোজগারের ধান্ধায়—কি করে দু' পয়সা আনা যায়—কি করে দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান করা যায় তা নিয়ে তিনি থাকতেন ব্যস্ত। পক্ষান্তরে মা-ই ছিলেন আমাদের সব—তিনি একাধারে শাসক ও স্নেহশীলা মাতা। ছেলেদের লেখাপড়া, চলাফেরা—সমস্ত ব্যাপারেই মা ছিলেন অধ্যক্ষ।

একদিন সন্ধ্যায় আমাদের উত্তরের ভিটার ছোট ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলেন মা আর কবিরাজ মশায়। কবিরাজ মশায়ের মুখখানা কালো, চোখে উদ্বেগের চিহ্ন!

মা জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন দেখলেন, কবিরাজ-মশায়?

কবিরাজমশায়—মোটেই ভালো নয়—চিন্তার কারণ আছে। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি চন্দ্রকুমারকে খবর দাও। তার আসা একান্ত প্রয়োজন। মা—তিনি ঢাকা গেছেন। এখন তাকে খবর দিই কি করে? আর খবর দিলেও কালকের আগে তো তিনি কিছুতেই এসে পৌঁছিতে পারবেন না।

কবিরাজমশায়—লোক পাঠিয়ে দাও। কলেরার কখন কি হয় বলা শক্ত। আর পলাশকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও—ঔষধ দিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আর একটা কথা—ছেলেপেলেদের ওঘরটায় যেতে দিও না। বেশ একটু সাবধানে থাকবে—রোগটা অত্যন্ত ছোঁয়াচে!

কিছুক্ষণ পরেই পলাশ ঔষধ নিয়ে ফিরে এল। মা তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে ঔষধ নিয়ে তার তৃতীয় পুত্র নীলমণিকে খাইয়ে খাইয়ে এলেন। এসেই দেখেন—পলাশ ও নরেশ, তার বড় পুত্র ঘরের ঠিক সামনে দাঁড়ালো।

সাথে সাথেই নরেশ ব্যাকুল হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল—মা, দীনেশ কেমন আছে?

মা—ভালো, ঔষধ দিয়ে এলাম—একটু পরে আরও ভালো হ'য়ে উঠবে। ভয় কি? অসুখ-বিসুখ তো মানুষের হবেই।

নরেশ—একটু ঘরে গিয়ে দেখে আসব, মা?

মা—না, যেও না—কবিরাজমশায়ের বারণ. বলছি তো ভালো আছে। আর হ্যাঁ, নরেশ তুমি এখনি প্রস্তুত হয়ে নেও—ঢাকা যেতে হবে। তোমার বাবাকে সাথে করে কাল ভোরেই যেন চলে এস।

পলান—মা, মা যদি যায়। এই রাতে একা নরেশ পারবে কেন?

মা—যাবে পলান? আমি সেই কথাটাই ভাবছিলাম—একা একা নরেশ কি করে এতটা পথ এই রাতে যেতে দেব?

পলান—যাব না মা? তুমি কি বলছ? এই সাতের আঠারো বৎসরের নরেশকে এই রাতে ঢাকা সহরে পাঠিয়ে দেবে আমি তা বলে বলে দেখব? তোমার পলান সে পলান নয় মা। আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি।

একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে মা মনে মনে ভাবলেন—তোরা আছিস বলেই তো এখনো বেঁচে আছি। নিজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, লাভ-লোকসান—সমস্ত ভুলে গিয়ে পরের উপকারে এমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো মনোবৃত্তি তোদের আছে বলেই দেশটা এখনো টিকে আছে। পলান, জাতিতে তোরা ছোট হলেও তোরাই আমার স্বর্গ—তোরাই আমার দেবতা। তোদের একটু আশীর্বাদ যেন আমার ছেলেরা পায়—এই আমার মনের একমাত্র কামনা।

এমনি সময়ে নরেশ ও পলান প্রস্তুত হয়ে এসে উপস্থিত হল। আত্মবিস্মৃত মা যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তাড়াতাড়ি হাত তুলে ওদের আশীর্বাদ করে বললেন—তোমরা রওনা হয়ে যাও। আমি রইলাম—দীনেশের জন্য কোন চিন্তা করো না। কাল ভোরেই চলে আসতে হবে কিন্তু

উত্তরে মাথা নেড়ে ঘরের পদধূলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ওরা রওনা হয়ে যাওয়ার পর মা একবার ঘর থেকে দাদাকে দেখে বেরিয়ে এলেন। এসেই দেখেন দুর্গা একটা বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে—আর ওর সেই টানা টানা চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

মাকে দেখেই দুর্গা একটু এগিয়ে এসে বললো—দাদা কেমন আছেন, মা? কেমন যেন একটু ভয় ভয় করছে—গাটা যেন ছম্ ছম্ করছে, মা!

দুর্গাকে কাছে টেনে মা বললেন—ভয়! কিসের ভয় মা? দাদার অসুখ করেছে—এই তো? কবিরাজ মশায় ঔষধ পাঠিয়ে দিয়েছেন—ভালো করে যাবে।

দুর্গা—ঢাকা থেকে একজন ভালো ডাক্তার নিয়ে এসে দেখাও না, মা? বুড়ো কবিরাজমশায়ের ঔষধ যদি না ধরে?

মা—কি বলছিস দুর্গা? এতকাল ধরে তো এ কবিরাজমশায় ছাড়া আমরা আর কাউকে জানি না। তোর এ মিছে ভয়—দেখবি কালই ভালো হয়ে যাবে। দুই আমার ছোটাটাকে দেখ তো মা! আমি এখানে রইলাম।

দুর্গা—আমি কি আবার আসব, মা? তোমাকে ছেড়ে মনটা যে টিকবে না, মা!

মা দুর্গাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বললেন—দুর্গা তুই যা। আমি আমার এ জীবনে এমন কোন পাপ করিনি যার জন্য আমার ছেলে আমাকে রেখে—আমারি চোখের সামনে চিরতরে চলে যাবে। স্বয়ং যম এসেও আমার কাছ থেকে আমার ছেলেকে কেড়ে নিতে পারবে না—তুই দেখিস! যা, যা, আমায় বিরক্ত করিস না।

দুর্গা চলে গেল। মা ঘরে ঢুকে দাদাকে ঘরে ওর পাশে চুপ করে চোখ বুজে বসে রইলেন। হাত তখন

(বাকী অংশ ১৬ পাতায়)

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দিন কয়েক পরে বিনায়ক রাও কাপ্‌লের বাড়ীতেও তল্লাসী হল। বিনায়ক তখন গঙ্গা স্নান করে বাড়ী ফিরছিলেন। কাশীতে তিনি থাকতেন এক বাসা বাড়ীতে, কিন্তু আহার করতেন নিজের বাড়ীতে। গঙ্গা স্নান করে বাড়ীর নিকটে এসে শুনলেন তাদের বাড়ীতে অনেক সাহেব-সুবা তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তিনি বাড়ীতে না গিয়ে সেখান থেকেই অন্তর্হিত হলেন। এইভাবে পুলিশ সেবারে কাকেও কাশীতেই পেলোনা। রাসবিহারী কিন্তু তখনও কাশীতেই ছিলেন। পরে যখন কাশী ষড়যন্ত্র মামলা সরকার পক্ষ থেকে দায়ের করা হয় রাজসাক্ষী বিভূতি স্পেশাল ট্রাইবুনালের সামনে এই সময়ের ঘটনা বিবৃত করেন তখন ট্রাইবুনালের জজেরা বিভূতির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিছুক্ষণের জন্য নোট লিখতে ভুলেই গিয়েছিলেন। সরকার পক্ষের কাউন্সিল ও বিপ্লবীদেরও উকীল ব্যারিষ্টাররাও আগ্রহ এবং কৌতূহলীভাবে রাসবিহারীর অদ্ভুত কার্যকলাপের কথা শুনছিলেন। মাঝে মাঝে দুই একজন অনুচ্চস্বরে বলছিলেন "ওঃ কতবড় বুকের পাটা রাসবিহারীর," আসামী বিপ্লবীরাও আনন্দগর্বের অতিশয্যে নির্বাক হয়েছিলেন।

কিন্তু তখন পর্যন্ত বিপ্লবীদের একজনকেও ধরতে না পেরে সরকার পক্ষ কিছুটা হতাশ হলেন। কাশীর বিপ্লবীরা কাশী ছেড়ে বাঙলাদেশে এসে মিলিত হলেন। কেবলমাত্র পাঞ্জাবের ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন না তারাই কাশীতে রইলেন। এদের নাম পাঞ্জাবে কেউ জানত না। এদিকে পাঞ্জাবে সামান্য পরিচিত বিপ্লবীরাও অনেকেই গ্রেপ্তার হলেন। নেতৃস্থানীয় একজনও বাহিরে রইলেন না। ডাক্তার মথুরা সিং প্রমুখ দু-তিনজনমাত্র কাবুলে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। পিংলে তখন ধরা পড়েন নাই। পাঞ্জাবে গোলমালের পর তিনিও কাশীর দিকেই আসছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে পরিচিত এক সেনানিবাসের নিকট দিয়ে যখন আসছিলেন তখন বিপ্লব প্রচারের জন্য তিনি ঐ সেনানিবাসে প্রবেশ করেন। কিন্তু মীরাট সেনানিবাসে এক মুসলমান দফাদারের সঙ্গে ঐ স্থানে তার আলাপ হয়। দফাদার পিংলের সঙ্গে কাশীতে আসেন। পিংলে কাশীতে এসে রাসবিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাসবিহারী পিংলেকে কিছুদিন সেনানিবাসে যাওয়া আসা থেকে বিরত হতে বলেন। কিন্তু এরূপ অবস্থার মধ্যেও পিংলের মনে উৎসাহের অভাব ছিল না। তিনি রাসবিহারীর নিকট কাজের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করালেন। শেষ পর্যন্ত রাসবিহারীকে

মত দিতেই হল। স্থির হল পিংলে বিভিন্ন সেনানিবাসে গিয়ে আবার সৈন্যদের উদ্বুদ্ধ করে তুলবেন। পিংলের নিকট কয়েকটি খুব বড় ধরণের বোমা দেওয়া হল। বোমাগুলি এতবড় ছিল যে এর একটিও যে স্থানে পড়ত সেই স্থানের কোন চিহ্ন থাকত না। রাউলাট কমিটির রিপোর্টের এই বোমা সম্পর্কে লেখা আছে, "Sufficient to annihilate half a regiment কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাসবিহারীর সন্দেহই সত্য হল। ঐ মুসলমান দফাদার পিংলেকে নিয়ে মীরাটে নিজের সেনা ব্যারাকে গিয়ে বোমাশুদ্ধ তাকে ধরিয়ে দিল। মীরাটের সেনা ব্যারাকে দশবারোটি সিপাহী ফাঁসীকাষ্ঠে জীবন দেন।

পিংলে যখন মীরাট চলে যান শচীন্দ্র নাথ তখন বাঙলাদেশে চলে যান। রাসবিহারী বাঙলাদেশে শচীন্দ্র নাথকে বলে পাঠালেন তিনি যেন সোজা দিল্লী গিয়ে সেখানকার পদস্থ ইংরেজ কর্মচারী বাঙ্গলা ইত্যাদি ভাল করে দেখে আসেন। (চলবে)

বিপ্লবীর জীবন দর্শন

(১৪ পাতার পর)

প্রায় সাড়ে ৮টা কবিরাজমশায় এসে ডাক দিলেন—একি বসলা, এমনি করে বসে আছ যে—দীনেশ কেমন আছে? একটু সরে বস—আমি ওকে দেখি।

কবিরাজমশায় ভালো করে নাড়ি দেখে বললেন—না মা, দীনেশ ভালোই আছে—আর কোন ভয় নেই। তুমি এখন করে না খেয়ে দেয়ে এখানে বসে থেকো না। তুমি যাও—কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে একটু শুয়ে পড়গে—আর কোন ভয়ের কারণ নেই।

মা—তাতো বলছেন, কবিরাজমশাই? আর ভয়ের কোন কারণ নেই? তবে আর কি? তোর তো হয়েই এল—একটু পরেই আমি স্নান সেরে কাপড় বদলে ঘরে যাব।

কবিরাজমশায়—আচ্ছা, তাই করো। তবে এমনি করে রোগীকে ঘরে বসে থেকো না—একটু সরে বসে থেকো। আমি তা হলে আসি, কেমন?

মা—আসুন। এত রাতে আর না এলেও পারতেন।

কবিরাজমশায়—না গো, মনটা যেন কেমন করছিল—একবার দেখে গেলাম। কাল ভোরে আবার আসব।

কবিরাজমশায় চলে গেলেন। মা আমার হাত দীনেশকে আগলে ঘরে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিলেন।

ভোর হতে না হতেই বাবা, বড়দা ও পলান এসে পড়লো। এসেই রোগীর ঘরে ঢুকে বাবা দীনেশকে দেখে এলেন। বাবা তখন অনেকটা ভালো—বিপদের আর কোন সম্ভাবনা নেই।

বাইরে এসেই দেখেন—ঘটি হাতে মা পায়খানা থেকে এলেন। তাঁর মুখখানা যেন পাংশুবর্ণ হয়ে গেছে—সারা দেহটা থর থর করে কাঁপছে—ভালো করে কথা বলতে পারছেন না।

বাবাকে মা বললেন—তুমি এসেছ, তোমার পথ চেয়ে বসেছিলাম। পায়ের ধুলো দাও। বাবার পদধূলি বাবা নিয়েই মা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না—বাড়ি আঙিনায় ধরাশায়ী হয়ে পড়ে গেলেন। দুর্গা কাছে দাঁড়িয়েছিল। 'মাগো' বলে চীৎকার করে মাকে জড়িয়ে ধরল! মা একবার চোখ খুলে চাইলেন। তারপর অতি মৃদু কণ্ঠে বললেন—দুর্গা, দিনতিখারী ও আমার ছোট ছেলে দুর্গেশকে দেখিস—আমি চললাম।

এক মিনিটে সব শেষ হয়ে গেল! কবিরাজমশায় দেখে বললেন—এসিয়াটিক কলেরা।

(চলবে)

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭১

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ১৭ই চৈত্র, ১৩৮৫ ৩১শে মার্চ, ১৯৭৯	২৪ সংখ্যা

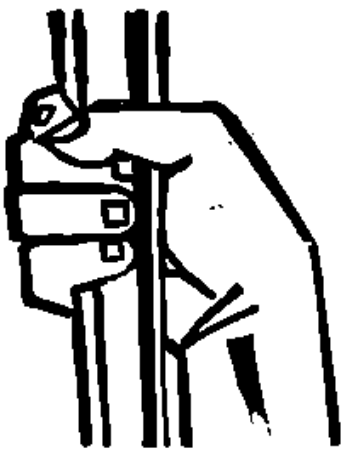

এই সংখ্যায়

দুর্বিসহ অবস্থার অবসান চাই
। সম্পাদকীয় ।

ইরান
। কালীপদ সরকার ।

রাজনীতি আজ কোন পথে
। শ্রীসংগীত বন্দ্যোপাধ্যায় ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক মনিমী মোহন বাগচী ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস
। ক্ষীরোদ দত্ত ।

স্বাধীনতা আন্দোলন ও কারাকাহিনী
। কৌটিল্য ।

"স্বাধীনতা বলতে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা বোঝায় না, বোঝায় দেশের সুষম বণ্টন, জাতিভেদ প্রথা ও সামাজিক অন্যায়ের বিলোপ সাধন এবং যথার্থ গোড়ামী নির্মূল করা।"

—সুভাষচন্দ্র

সম্পাদকীয়—

দুর্বিসহ অবস্থার অবসান চাই

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জীবনে সামগ্রিকভাবে ঘনতম অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। বিদ্যুৎ-এর দারুণ ঘাটতি শুধু ঘরের আলোই নিভিয়ে দিচ্ছে না, এর ফলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ভীষণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে, পানীয় জল সরবরাহ উদ্বেগজনকভাবে ব্যাহত হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ টাকার দুধ নষ্ট হচ্ছে, জরুরী ঔষধপত্র অকেজো হচ্ছে, কৃষি, শিল্প, ট্রেন চলাচলে সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছে। এতদিন গরম পড়েনি, তার মধ্যেও যখন একটি দিনও যাচ্ছে না, যেদিন লোড-সেডিং হচ্ছে না ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। পাম্প উৎপাদন হবে না প্রয়োজন মত, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদনের হার কমে যাবে, যার ফলে মূল্য বৃদ্ধির গতিরোধ করাও অসম্ভব হয়ে পড়বে। কৃষি-ক্ষেত্রে, কলকারখানায় হাজার হাজার মানুষ বেকার হবে। হাসপাতালে রোগীর জীবন বিপন্ন হবে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এই যে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য কোন সার্থক পরিকল্পনার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যাদের উপর এ বিষয়ে দায়িত্ব ন্যস্ত, তারা পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন না অথবা সমস্যার সমাধান করতে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন বলেই মনে হচ্ছে। নতুবা এ সম্বন্ধে অতি অদ্ভুত কৈফিয়ৎ দিতে সচেষ্ট হতেন না। বিদ্যুৎ-এর বাজেট উপস্থিত করার সময় বিদ্যুৎ-মন্ত্রী যে বালসুলভ কৈফিয়ৎ দিয়েছেন বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণ হিসাবে, তাতেও এই ধারণা প্রমাণিত হয়। কংগ্রেস সরকার বহু লোককে এই বিভাগে চাকুরী দিয়েছেন, তার ফলেই নাকি এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করলে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে লোকসানের কারণ বোঝা যায়। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে যাওয়ার যুক্তি হিসাবে ঘাড়া করলে লোকেরা মনে করতে পারে সে এদের মস্তিষ্কে ধূসর পদার্থের পরিমাণ ও শোচনীয়ভাবে বিদ্যুৎ ঘাটতির সঙ্গে সমানতালে নিম্নাভিমুখী হচ্ছে। বর্তমান সরকার ত প্রায় দুই বৎসর সময় পেয়েছেন, এর মধ্যে এই অবস্থার অবসান ঘটিয়ে উন্নতিবিধান করতে কি কি ব্যবস্থা তারা নিয়েছেন, জনসাধারণ আজ অতি সঙ্গত কারণেই এ বিষয়ে কৈফিয়ৎ দাবী করতে পারে। কথার কারসাজিতে রাজনীতিবিদ্‌রা সত্যের প্রতি কোন অনুরাগ দেখাতে আগ্রহী থাকেন বলে তাদের বিরুদ্ধে কেউ এই অভিযোগ করেন না। খবরের কাগজে অর্দ্ধসত্য, মিথ্যার ঠাসবুনুনি দিয়ে একটা বিবৃতি তৈরী করলেই যেন এদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায়। যা'হক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভুল তথ্য পরিবেশন করা ত ধাপ্পা দেওয়ার সামিল। অবশ্য জনজীবন বিপর্যস্ত হলেও, মিথ্যা ভাষণের এর গাফিলতির জন্য কোন সাজা এদের পেতে হয় না।

কিন্তু এ অবস্থা চলতে দিলে পশ্চিমবাংলার মানুষ ধনে-প্রাণে ধ্বংস হতে বাধ্য। তাই একান্তভাবে প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে যে প্রবল জনমতের চাপে এদের ত্রুটি সংশোধন করতে বাধ্য করা। আমরা জানি যে সত্য কথা বললেই কোন কোন মহল থেকে ষড়যন্ত্রকারী আখ্যায়

ভূষিত হতে হবে। কিন্তু জাতির জীবনে এমন সব সমস্যা কখনও কখনও দেখা দেয়, যখন সাধারণ মানুষকেই তার মোকাবিলা করতে হয়। হয় কিছু করতে হয়, নতুবা ধ্বংস হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। প্রশাসকদের মনে রাখা উচিৎ যে বিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরটাই কোন দলের পক্ষে একমাত্র ভরসাস্থল নয়, প্রকৃত শক্তির ভিত্তি হল জন-সমর্থণ। জন-সাধারণকে এই সমস্যাটা ভাল করে বুঝতে হবে যাতে করে প্রতিকারের পথটা দেখিয়ে দেওয়ার কাজটা সহজ হবে।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা কি হবে এবং কিভাবে তার সমাধান করা সম্ভব হবে, নতুন পশ্চিমবাংলার রূপকার ডা: বিধানচন্দ্র তাঁর দূরদৃষ্টিতে সেটা উপলব্ধি করেছিলেন এবং নতুন নতুন উৎপাদন সংস্থা স্থাপনের রূপরেখাও তৈরী করে রেখে গিয়েছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমান বিদ্যুৎ মন্ত্রী তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন এবং এক সময়ে অর্থমন্ত্রী থাকাকালে সে সব পরিকল্পনা ঠাণ্ডাঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বলে সংবাদে প্রকাশ। কিন্তু ভুলটাত মানুষ মাত্রেই হয়, ভুলটা সংশোধন করাটাই মানুষের যোগ্যতা ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। কংগ্রেস শাসনকে দোষ দিয়েই শুধু কর্তব্য শেষ করলে কোন লাভ হবে না, তাঁর নিজের এবং সরকারের যে ব্যাধি বিদ্যুৎ-উৎপাদন সংস্থাগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তাকে নিরাময় করতে হবে। এলোপাথারি অফিসার বদল করার কি ফল দাঁড়িয়েছে তার মূল্যায়ণ করতে হবে। ট্রেড-ইউনিয়নগুলির দলবাজী, রেষারেষি, কর্তব্যকর্মে অবহেলা, সংঘাতমূলক কাজকর্মের অস্তিত্বই বা কতটা এই সমস্যাকে ঘনীভূত করেছে তারও সমীক্ষা করতে হবে। এ কথা আজ সর্বজনবিদিত যে কয়লার অভাবই বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থাগুলিকে নিদারুণ সঙ্কটের মধ্যে ফেলেছে। কোথাও ধৌতাগারের বাতিল কয়লা ব্যবহার করতে হচ্ছে, কোথাও মজুতের পরিমাণ দুই দিনের মত আছে। এই অবস্থাটা একদিনে হয়নি। ভারপ্রাপ্ত লোকেরা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন? খনিমুখে লক্ষ লক্ষ টন কয়লা জমে যাচ্ছে, অথচ প্রয়োজনীয় স্থানে কয়লা পৌছাচ্ছে না, এর চেয়ে শোচনীয় প্রশাসনিক অপদার্থতা আর কি হতে পারে? এসব সমস্যাই ত মানুষের ও প্রশাসকদের সৃষ্টি। এর কোন প্রতিবিধান না করতে পারলে ক্ষমতাসীন থাকার কোন নৈতিক, রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার কোন অধিকার থাকতে পারে না।

সর্বশেষে বলা দরকার বিদ্যুৎ-এর আলো নিভে গেলেও, মানুষের মনের আগুন কিন্তু ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এই আগুনের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে বাধ্য, যদি কর্তৃপক্ষ এখনই সতর্ক না হন। যে কোন কাজে অবহেলা করলেও, রাজনীতিবিদদের এদেশে কোন সাজা পেতে হয় না, এটাই দুর্ভাগ্য। কিন্তু সব কিছুরই একটা সহ্যের সীমা আছে। এটা ভুলে শুধু অঙ্কেই মারছেন না। নিজেরাও মরতে বাধ্য হবেন, এই ইতিহাসের শিক্ষা। এই দুর্বিসহ অবস্থার অবসান চায় মানুষ।

রাজনীতি আজ কোন পথে

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উক্ত ব্যবস্থা যদি তাঁরা গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্থ না হয়ে থাকেন, তবে চরণ সিংও মোরারজী দেশাইকে সরিয়ে নিজে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য যদি প্রয়োজনবোধে ইন্দিরাজীর সঙ্গে আঁতাত করে সেই চেষ্টা করেন তবে তা অসম্ভব কি কারণে? রাজনারায়ণের উক্তি সেই ইঙ্গীত দিচ্ছে কি না কে জানে? সবই সম্ভব, আর ইন্দিরাজী যদি চরণ সিংকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য কূট কৌশল খাটিয়ে তা বাস্তবে রূপায়িত করতে মনস্থ করেন এবম্বিধ কার্য্যকে রূপ দেবার চেষ্টা উভয় পক্ষ থেকে ভিতরে ভিতরে হচ্ছে কিনা তা কে এখন বলতে পারে? জনতাদল ইন্দিরাজীকে যেরূপ অসম্মান করেছে তার প্রতিকারের জন্য তিনি যদি উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং চরণ সিং মোরারজীর দ্বারা মন্ত্রীত্ব থেকে যেভাবে বিতাড়িত হয়েছেন তার বদলা নিতে তিনি যদি ঐ সুযোগ গ্রহণে প্রলুব্ধ হন তবে নিশ্চয় একটা অসম্ভব ব্যাপার মুহূর্ত্তের মধ্যে সম্ভব হয়ে সারা ভারতকে চাই কি সমগ্র বিশ্বকে সচকিত করে তুলবে এবং আমাদের অনুমান সত্যে পর্য্যবসিত হলে, এ কথাই প্রমাণিত হবে যে রাজনীতিতে সবই সম্ভব। রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কোন কথা নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। জনতাদলে অনবরত অন্তর্দলীয় আত্মঘাতী বিবাদ-বিসংবাদ লেগেই আছে ও ফলে সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা আজ যেভাবে প্রকাশমান এবং প্রকট তাতে সি, পি এম একদিকে দারুণ শংকিত, ভীত ও বিপদগ্রস্থ, কারণ সি, পি, এম পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছে যে জনতার মুহুর্মুহু ব্যর্থতার ফলে ইন্দিরা গান্ধী যে ভাবে শক্তিশালী হচ্ছেন এবং দুই কংগ্রেসে ঐক্য প্রচেষ্টা যে ভাবে প্রায় ফলবতী হতে চলেছে তাতে সি পি, এম বিশ্বাস করে যে পুনরায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান নেতৃ হিসাবে শ্রীমতী গান্ধীই প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং পশ্চিমবঙ্গে ও ত্রিপুরায় সি, পি, এম দল ও তার শরিকরা অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকার বরখাস্ত হবে কারণ শ্রীমতী গান্ধী কিছুতেই সি, পি, এমকে সহ্য করবেন না : তাছাড়া বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে অরাজকতা ও খুনের রাজনীতিতে সি, পি, এম কৌশলে মদত দিচ্ছে তা কেহই বরদাস্ত করবে না। মোরারজী দেশাইও সি, পি, এমকে জব্দ করার পথে এগুতেন তথা বামফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করার চিন্তা করতেন যদি তাঁর জনতাদল এতদিনে সত্যই একটি সুসংবদ্ধ ও শক্তিশালী দল হয়ে উঠতে পারত : কিন্তু জনতা একটি দল নয়, কতকগুলি দলের কোয়ালিশন মাত্র। সি, পি, এম নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে সব সময়ে সব বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী ও দোষী সাব্যস্ত করছে। শ্রদ্ধেয় প্রফুল্ল সেনের অভিযোগগুলি পর্য্যন্ত তদন্ত না করে, ডাষ্টবিনে ফেলে দিচ্ছে এবং হুংকার দিয়ে সেন-মহাশয়কে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার জন্য নির্ভেজাল মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ও

দলপতি প্রমোদবাবু ; তথাপি মোরারজীভাই এইসব অন্যায়ের নীরব দর্শক ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি শক্ত হাতে এর প্রতিকার করতে মোটেই সাহসী হচ্ছেন না কেন ? কারণ তার জনতা সরকার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হলেও যে কত দুর্বল তা তিনি ভালভাবেই জানেন : নচেৎ সি, পি, এম-এর এই সীমাহীন ঔদ্ধত্যকে তিনি নিশ্চয় উচিত শিক্ষা দিতেন, কোনক্রমেই একে ক্ষমা প্রদর্শন করতেন না। কেন্দ্রে জনতার মধ্যে মনোমালিন্য ও ফলে অশেষ দুর্বলতা যতই বাড়ছে রাজ্যে সি. পি, এম-এর আস্ফালন ও জনতা-বিরোধী বক্তৃতার বহর ততই বাড়ছে, আর পশ্চিমবঙ্গের জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দলগুলি সেইরূপ আঘাত পাচ্ছে। সি পি, এম নিজেকে গণতান্ত্রিক দল বলে প্রতি মুহূর্তে প্রচার করছে—উদ্দেশ্য একবার গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে যদি কোন রকমে কেন্দ্রীয় শক্তি অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার দখল করতে পারে তবে দেশে আর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে দেবে না এবং তখন নিজ মূর্তি ধরে স্বৈরতন্ত্র কাকে বলে তা সারা ভারতকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেবে। কংগ্রেস, জনতা ও অন্যান্য সকল ছোট বড় রাজনৈতিক দলগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং জাতীয়তাবাদী ছোট বড়, এমন কি প্রখ্যাত নেতাদের গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠিয়ে এবং সর্বহারার তথাকথিত নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্রী সরকার গঠন করে ভারতের পবিত্র সংবিধানকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চীন বা রাশিয়া বা অনুরূপ কোন কমিউনিষ্ট শাসিত রাষ্ট্রের মত স্বৈরতন্ত্রী সংবিধান রচনা করে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করতে দ্বিধা করবে না। মোরারজী দেশাই এ বিষয়ে সম্যক্ ওয়াকিবহাল হলেও বর্তমানে তিনি বেশ বেকায়দায় আবদ্ধ আছেন জনতার মধ্যে পরস্পর বিরোধীতার জন্য, নচেৎ তিনি কট্টর গান্ধীপন্থী হয়েও গান্ধীজীর গ্রাম স্বরাজ তথা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম প্রতিষ্ঠার কাজে এখনও হাত লাগাতে ইতঃস্তত করছেন কেন ? ভারতে বেকারী ও দারিদ্র্য দূর করার একমাত্র পথ—গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথ অনুশীলিত গ্রাম স্বরাজের পথ, যেখানে গ্রামে গ্রামে কৃষির সাথে সাথে এবং পাশাপাশি গ্রামীণ হস্তশিল্প, কুটীরশিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প সমবায় ব্যবস্থায় গড়ে উঠবে আর মানুষে মানুষে হিংসাদ্বেষ-এর পরিবর্তে সৌহার্দের সম্প্রীতির ভালবাসার ও মধুর সম্পর্কের প্রসার লাভ করবে। মানুষ মানুষই হবে, যান্ত্রিক মানব হবে না।

সব জেনে বুঝেও মোরারজী এখন সি, পি, এম বা সি, পি, আই বা অন্য কোন বামপন্থী দলকে চটাতে চাইছেন না কেবল ইন্দিরা-ভীতির জন্য। ইন্দিরা গদীচ্যুত হলেও বর্তমান ভারতে তিনি যে একজন বেগবতী, শক্তিমতী ও বলিষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ সে কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য ; নচেৎ কংগ্রেস-ই ছাড়া অন্যান্য সব রাজনৈতিক দলই ইন্দিরাভীতিতে ত্রস্ত ও দিশেহারা কেন ? ইন্দিরা-ভীতির ফলে সাপে নেউলে একঘাটে জলপান করে কেন ? মত ও পথ আলাদা ও পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও সি, পি, এম ও জনতায় এখনও সমঝোতার আপ্রাণ চেষ্টা দেখা যায় কেন ? ইন্দিরার বেগবান ও ধাবমান এবং সদা প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর সঠিক ও বর্তমান সময়োপযোগী রাজনৈতিক কূট কৌশলের আশু সাফল্যের শঙ্কায় জনতা, সি, পি, এম ইত্যাদি অন্যান্য সব দলই আজ ভয়ে আড়ষ্ট এবং সেই কারণেই তারা পরস্পর আদর্শ বিরোধী হলেও এককাট্টা থাকতে সচেষ্ট। এতদ্-সত্ত্বেও তারা নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী ইন্দিরাকে আঘাত হানবার মতলব ভাঁজছে, এককভাবে এবং

জোট-বদ্ধভাবেও। সি, পি. এম-এর প্লেনামে এবার কোন তাত্ত্বিক আলোচনা হয়নি, হয়েছে সাংগঠনিক শক্তি-বৃদ্ধির ও সম্প্রসারণের উপায়-চিন্তা এবং এর মূলেও সেই ইন্দিরাভীতি কাজ করেছে, সেকথা কেন অনুধাবন করলেই পরিষ্কার বুঝা যায়। অধুনা-কালের সর্ব-ভারতীয় রাজনীতিকে ইন্দিরা যে প্রবল-ভাবে নাড়া দিয়ে নিজের সঠিক স্থান দখল করতে বদ্ধপরিকর তা অনস্বীকার্য্য এবং তিনি যে দ্রুত গতিতে ক্রম-অগ্রসরমান তা তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা বুঝতে পারছে এবং সে কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে সম্ভব-অসম্ভব সকল রকমের হীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচার চালান হচ্ছে এবং এই প্রচার কার্যে সবচেয়ে বেশী সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে সি. পি. এম ; কারণ সি, পি, এম ভাবছে ইন্দিরা একবার পুনরায় ক্ষমতায় এলে প্রথমেই সি. পি, এমকে এমন জব্দ করবে যে, সি, পি, এম-এর আর সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি থাকবে না। বর্ত্তমানে তাই সি, পি, এম কংগ্রেস-ই দলের ওপর সবচেয়ে বেশী অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, যদিও জনতাকেও তারা কম পদ-দলিত করছে না। জাতীয়তাবাদী শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়াই সি. পি. এম-এর আসল উদ্দেশ্য ও কাজ ; তাই পশ্চিমবঙ্গে ও ত্রিপুরায় তারা শাসন ক্ষমতার অপব্যবহার করে চলেছে নিপীড়নমূলক সব কাজের মাধ্যমে, পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রেখে আর এ চালাকি এখন সবাই জানতে ও বুঝতে পেরে গেছে। সি. পি, এম-এর মুখের কথায় আর মনের কথায় আসমান জমিন ফারাক। এদের সাধারণ মানুষ ভয়-ভক্তি করছে—তা কি এরা জানে না ? এই অল্প দিনেই তাদের শাসন পদ্ধতি, নিরপেক্ষ বা অঞ্চলের মানুষ বুঝে ফেলেছে এবং তা হচ্ছে নির্লজ্জ দলবাজী এবং দলপুষ্টি, তা সে যে ভাবেই হোক না কেন ; কোন ন্যায় নীতির বালাই একেবারেই নেই ফলে, গ্রামীণ মানুষ এদের অন্যায় অত্যাচারে দিশেহারা ও ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে চারিদিকে ছোটাছুটি করছে প্রতিকারের আশায়। কিন্তু এই অরাজক ও সন্ত্রাসের রাজত্বকালে কেহই শান্তিতে দিনপাত করতে সক্ষম হচ্ছে না। সি, পি, এম এসব জেনে বুঝেই এই কাণ্ড কারখানা দিনের পর দিন চালিয়ে যাচ্ছে তা কি মোরারজীভাই রাজ্যপালের মাধ্যমে খবরাখবর পাচ্ছেন না ? পশ্চিমবঙ্গ আজ ধ্বংসের মুখে প্রতাহই এগিয়ে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এ ব্যাপারে কি কিছুই করণীয় নেই, খালি দলীয় ঝগড়ায় মেতে থাকলেই রাজ্য শাসন হবে পশ্চিমবঙ্গকে এখন সি. পি, এম-এর অত্যাচারের হাত থেকে যে বাঁচাতে পারবে, সে কংগ্রেসই হোক জনতা হোক বা জাতীয় কংগ্রেস হোক, সেই পশ্চিম বঙ্গবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন পাবে এবং ভবিষ্যতে এখানে শাসন ক্ষমতায় বসার সুযোগ ও অধিকার পাবে। কংগ্রেস-ই তাই সি. পি, এম-এর এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্রমশঃই সরব হচ্ছে এবং জনতাদলও সি. পি, এম-এর মুখোস খুলে দিতে এখানে বদ্ধ-পরিকরবলে কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ; কিন্তু কেন্দ্রীয় জনতাদলের নেতাদের মধ্যে কারো কারো অহেতুক সি. পি, এম প্রীতি এখনও পশ্চিমবঙ্গে জনতাকে সঠিক পথে চলতে অর্থাৎ সি. পি. এম তথা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে স্পষ্ট কথা সত্য কথা প্রকাশ করতে বা তাদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন করতে দিতে বাধা সৃষ্টি করছে। জনতার শক্তি তাতে এখানে ক্রমশঃই নিস্তেজ হয়ে পড়ছে এবং সি, পি, এম-এর দম্ভ আকাশ ছোঁয়ার অবস্থায় পৌঁছাচ্ছে। ফলে এখানে জনতা নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। রাহুমুক্তি যদি কেন্দ্রীয় জনতার

দোষে এখানে না ঘটে, তবে জনতার এখানে ঘোর দুর্দিন আসন্ন, একথা জনতানেতা প্রফুল্ল সেন ভাল-ভাবেই বুঝেছেন এবং একমাত্র তিনিই একে রুখতে এগিয়ে এসেছেন। ধন্য তাঁর একক প্রচেষ্টা। সি পি এম এখন প্রফুল্লবাবুকেই চরম শত্রু আখ্যা দিয়ে প্লেনামের পরে মুক্ত মঞ্চে হাওড়া ময়দানে ভাষণ দেয়।

সি, পি, এম-এর স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, ব্যবস্থায় দেশ যেভাবে চলছে তা যেকোনও দেশপ্রেমিককেই উৎকণ্ঠিত করবে। জ্যোতিবাবুভাইয়ের হাতে এই দেশকে রক্ষা করার সকল ক্ষমতা থাকতেও যদি পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা এভাবে সন্ত্রাসের ও অরাজকতার কেন্দ্রস্থল হয়, তবে এর চেয়ে আর দুঃখজনক ঘটনা কি হতে পারে? তিনি সরজমিনে তদন্ত করে দেখুন কি হীন অবস্থায় আছে আজ বাংলার ও ত্রিপুরার ছোট ছোট জমির (তিন থেকে পাঁচ-সাত বিঘের) মালিক, তা বেওয়া বিধবা হোক আর নাবালকই হোক। তবেই তিনি বুঝতে পারবেন প্রফুল্লবাবু কেন এই অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সে বীরভূমে হাল ধরে দুর্গত কৃষক পরিবারকে বাঁচাবার তাগিদে সেখানে গিয়েছিলেন এবং ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাজ-নীতির জন্য নিশ্চয় তিনি এই কাজে এগিয়ে যাননি। হাইকোর্টের হুকুম পর্যন্ত এখানে তখন মানা হয়নি, সি পি এম-এর পরোক্ষ উস্কানিতে এবং একথা সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশিত হলেও কেন্দ্রীয় সরকার এর কোন প্রতিবিধান করেনি। এর চেয়ে বিপজ্জনক অবস্থা আর কিই বা হতে পারে? মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা এখানে প্রায় নেই বললেই সত্য কথা বলা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার বন্যায় দুর্গতদের জন্য যে জিনিষপত্র ও অর্থ এ রাজ্যে সি পি এম তথা বামফ্রন্ট সরকারের মাধ্যমে পাঠিয়েছিল তার সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত বিলি-ব্যবস্থা এ রাজ্যে কিরূপ হয়েছে এবং এ ব্যাপারে বামফ্রন্টের অন্য শরিকরা পর্যন্ত যেখানে দলবাজী ও অসম বন্টনের কথা প্রকাশ্যে প্রচার করেছে, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রতিকারে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে কেন? কি এর উত্তর? পশ্চিমবঙ্গবাসীরা কেন্দ্রকে কি আয়কর দেয় না? কেন্দ্রের এই নীরবতা কেন?

(চলবে)

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

ও

সবাইকে পড়ান—

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাসবিহারী দিল্লীতে এক কাণ্ড ঘটাবার আয়োজন করছিলেন বোঝা গেল। কিন্তু শচীন্দ্রনাথ রাসবিহারীর সঙ্গে পরামর্শ না করে দিল্লী যাওয়া সঙ্গত মনে করলেন না। অথচ কাশী গিয়ে রাসবিহারীর সঙ্গে পরামর্শ করাও সম্ভব নয়। পুলিশ কাশীতে ভীষণভাবে শচীন্দ্রনাথকে খুঁজছে। কিন্তু তিনি সমস্ত বিপদ ঘাড়ে নিয়েই কাশীতে এলেন।

কাশী আসার পথে মুঘলসরাই ষ্টেশনে শচীন্দ্রনাথ তাঁর পরিচিত এক গুপ্তচরকে দেখলেন। কিন্তু সঙ্গে তার মাসীমা থাকায় পালাবার কোন উপায় ছিল না। বাঙলাদেশের এক বিপ্লবী যুবকও শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে এসেছিল। কয়েকটি বোমাও তাদের সঙ্গে ছিল। শচীন্দ্রনাথ ঐ যুবককে বোমাসহ অন্য এক কামরায় বসিয়ে দিয়ে এলেন এবং মাসীমাকে নিয়ে নিজে দূরে এক কামরায় গিয়ে উঠলেন। মাসীমাকে বলে রাখলেন যে যদি তিনি ধরা পড়েন তিনি কাশী ষ্টেশনে গিয়ে ঠিকানা বলে যেন বাড়ী চলে যান। কাশীতে ট্রেন প্লাটফর্মে এসে ঐ গুপ্তচরটি শচীন্দ্রনাথের কামরায় এসে উঠল। সে শচীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করল সঙ্গের স্ত্রীলোকটি কে, শচীন্দ্রনাথ মাসীমার পরিচয় দিলে সে কী মনে করে আর কোন উচ্চবাচ্য করলনা ফলে সে যাত্রা শচীন্দ্রনাথ রক্ষা পেলেন। খুব ভোরে শচীন্দ্রনাথ বাড়ীতে এসে পৌঁছলেন। অল্পক্ষণ বাড়ীতে থেকেই তিনি বাড়ী থেকে বেড়িয়ে পড়লেন। তখন ভোর পাঁচটা। রাত্রি একেবারে প্রভাত হয় নাই। শচীন্দ্রনাথ রাসবিহারীর বাসায় গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

সে মাস থেকে আর বাড়ী যাননি। পরদিন ভোরবেলা কাশী ছেড়ে অন্যত্র চলে যান ঐ সকালেই। কাশীতে শচীন্দ্রনাথদের বাড়ী তল্লাসী হয়। শচীন্দ্রনাথদের বাড়ীর সামনেই এক গুপ্তচর থাকত। ফলে শচীন্দ্রনাথের বাড়ী আসার সংবাদ পেতে সরকারের কোন অসুবিধা হয়নি। পুলিশ মনে করেছিল শচীন্দ্রনাথ বাড়ী থেকে পালিয়েছে বেশী সময় হয় নাই। এজন্য তার সন্ধানে রাজপথেও কিছুক্ষণ ছুটাছুটি করেছিল। কিন্তু শচীন্দ্রনাথকে না পেয়ে তারা হতাশ

হয়ে পড়লো। শচীন্দ্রনাথ কাশী ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন নি। এখানে এসে তিনি শুনতে পান যে পুলিশ নাকি তার সম্পর্কে বলছে যে কাশীতে পুলিশ তাকে ধরতে গেলে তিনি নাকি পুলিশের সামনেই এচাদ থেকে ও ছাদে গিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যান। পুলিশ নাকি সব দেখেও শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে পারেনি।

শচীন্দ্রনাথ ষ্টেশন থেকে বিষন্ন মনে বাড়ী ফিরলেন। বাড়ীতে সহকর্মীরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করে বসেছিলেন। পাড়ার কিছু যুবকদলও এই সঙ্গে ছিলেন। তারা আসন্ন বিপ্লবের কথা জানত না। কিন্তু একটা ভীষণ কিছু হচ্ছে এটা জানত। বিপ্লবী সহকর্মীরা শচীন্দ্রনাথের নিকট সবই শুনলেন। বিপ্লব যে পণ্ড হয়েছে তা সবাই বুঝলেন। কিন্তু এ সত্বেও দু' তিনদিন সবারই খুব উৎকণ্ঠায় কাটল। বিপ্লব যে ব্যর্থ হতে পারে একথা অনেকেই আগে আশঙ্কা করেছিলেন। তাই পাইওনিয়ার পত্রিকার সংবাদে কেউ বিশেষ একটা বিস্মিত হলেন না। নীরব কণ্ঠে যেন সবাই বলতে লাগলেন তাইতো এত শীঘ্র কী আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন হবে? সবাই রাসবিহারীর কথা ভাবতে লাগলেন। পাছে পাঞ্জাবের আঘাত কাশীতেও এসে পৌঁছে এই আশঙ্কায় শচীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য বিপ্লবীরা কেউ বাড়ীতে থাকতেন না। সবাই রাত কাটাতেন অন্য স্থানে। প্রায় সকলের বাড়ীতেই পুলিশের পাহারা ছিল। তাদের চোখে ধুলা দিয়ে সবার কাজ করতে হত। এইরূপে কাশীতে কয়েকদিন কাটলো।

ওদিকে পাঞ্জাবে কর্তার সিং এবং হরনাম সিং কাবুলের পথে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে তাদের কি খেয়াল হল এক সেনা-নিবাসে প্রবেশ করলেন। তখন নানাস্থানে সিপাহীদের মধ্যে ধরপাকড় আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। সকলের মধ্যেই আতঙ্কের ভাব দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় সেনানিবাসে প্রবেশ করা কর্তার সিংয়ের পক্ষে কিছুতেই ঠিক হয় নাই। ফলে সেনানিবাসে সিপাহীরাই বিপ্লবীদের ধরিয়ে দিলেন। গ্রেপ্তারের পরে তাদের দুজনকেই লাহোরে নিয়ে আসা হল। লৌহ শৃঙ্খলিত কর্তার সিংয়ের তরুণ মুখশ্রীতে বীরত্বের এমনই মহিমা প্রকাশ পেয়েছিল যে তা দেখে শত্রু মিত্র সবাই মুগ্ধ হয়েছিল। ভাইপরমানন্দ তার লিখিত 'আপবিতি' (অর্থাৎ My experience) গ্রন্থে সে দৃশ্য মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

এই সময় একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে রাসবিহারী কাশী এসে পৌঁছলেন। কাশীর বিপ্লবীরা রাসবিহারীর কাছ থেকে পাঞ্জাবের কথা জানতে পারলেন। স্থির হল পাঞ্জাবের কথা প্রথমে বাঙলাদেশে জানানো আবশ্যক। তাছাড়া রাসবিহারী এবং অন্যান্য সকলে পরামর্শ করলেন যে শচীন্দ্রনাথের এই সময় কাশীতে থাকা ঠিক নয়। এই সময় কাশীতে পুলিশের দৃষ্টি খুব প্রখর ছিল। বাঙালী মহল্লার পাড়ায় পাড়ায় পুলিশ খোঁজ লইতেছিল কোন বাড়ীতে কোন নূতন বাঙালী এসেছে কিনা। চন্দননগর এবং বাঙলাদেশে যারা রাসবিহারীকে চিনত এমন সব

গোয়েন্দাদের কাশীতে এনে বিভিন্ন স্থানে পাহারায় নিযুক্ত করা হয়েছিল। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই তাহারা পাহারা দিত। নতুন কোন বাঙালী কাশীতে এলে পুলিশ তাদের নামধাম লিখে নিত এবং সন্ধান নিয়ে জানত তাদের কথা ঠিক কিনা। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও রাসবিহারী নিরাপদে কাশী এসে পৌঁছলেন। এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার।

শচীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য পরিচিত বিপ্লবীরা সকলেই খুব সাবধান হলেন। সবাই অল্প সময়ের জন্যই বাড়ীতে থাকতেন। বেশীর ভাগ সময় যে স্থানে কাটাতেন তা দলের কয়েকজন ছাড়া অন্য কেউই জানতো না। এই সময় রাসবিহারীই রাত্রিতে বাড়ী বাড়ী গিয়ে সবার খোঁজ নিতেন। কাশীতে রাসবিহারী নিজেকে অনেকটা নিরাপদ মনে করতেন। কারণ এখানে তাকে বড় বেশী লোকে চিনতো না। এজন্য এইরূপ ভীষণ অবস্থার মধ্যেও বেশ কিছু রাসবিহারী কাশীতে মাসখানেকেরও বেশী কাটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। একদিকে রাসবিহারীকে ধরবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট উঠে পড়ে লেগেছে; আর অন্যদিকে কাশীর বিপ্লবীদের বাঁচাবার জন্য রাসবিহারী আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কাকে কোন গোপন স্থানে অবস্থান করতে হবে কাকে কাশী ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে হবে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে রাসবিহারী তার নির্দেশ দিতেন। প্রথমেই শচীন্দ্রনাথের প্রতি নির্দেশ হ'ল তাকে কাশী ছেড়ে বাঙলাদেশে যেতে হবে। যারা যুক্তপ্রদেশের অধিবাসী তাদের প্রতি নির্দেশ হ'ল সকলকে শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে চলে যেতে হবে। কয়েকজন শহরের বাস পরিবর্তন করলেন। কাশীর লোক লক্ষ্ণৌয়ে গেলেন এবং লক্ষ্ণৌয়ের লোক কাশীতে এলেন। শচীন্দ্রনাথের কাশী ত্যাগের কয়েকদিন পরেই কাশীতে তার বাড়ী খানাতল্লাসী হল। এরপরে আরও একটি বাড়ীতে তল্লাসী হল। ঐ বাড়ীর বাসিন্দা বিপ্লবী তখন বাড়ীতে ছিলেন না, এজন্য এবারে তিনি রক্ষা পেলেন। ভোর তিনটা থেকে পুলিশ তার বাড়ী ঘেরাও করে তল্লাসী চালায়

(চলবে)

যকৃতীয় পেটের বায়ু. অম্ল . অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ একমাত্রার মূল্য
প্রাপ্তিস্থান:- শ্রীভবনীমোহন চক্রবর্তী
[illegible]

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

(স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রাম)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রকৃতি অনুযায়ী নানা রকম বৈশিষ্ট্য দেখা যায় ও তা প্রকাশ পায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ককে কোন কোন প্রদেশে উচ্চ বিচার বিভাগীয় কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন রকম অযোগ্যতা বলে গণ্য হত না। আবার কোন কোন প্রদেশে তা অযোগ্যতা বলেই গণ্য হত। অন্ততঃ বোম্বেতে এবং মাদ্রাজে যে তা অযোগ্যতা বলে গণ্য হত না, তা নিশ্চিত। ১৯০০ সালের লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন মিঃ (পরে স্যার) নারায়ণ চন্দ্রাবরকার। তাকে যখন কংগ্রেসের সভাপতিত্ব গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান হয় তার আগেই তিনি স্বপদতঃ ব্রাণ্ডাডের স্থলে হাইকোর্টের বিচারপতির পদ গ্রহণ করেন। তিনি বোম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেনকিন্সের পরামর্শ চাইলেন। তিনি কোনরূপ আপত্তি করলেন না। এই স্যার লরেন্স জেনকিন্স সাহেবই যখন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন, তখন তিনি মিঃ আশুতোষ চৌধুরীকে বিচারকের কাজে নিয়োগ করতে চান এবং গ্রহণ করতে তাকে রাজি করান। আশুতোষ চৌধুরী ছিলেন তখন একজন উৎসাহী কংগ্রেস কর্মী। মিঃ চন্দ্রাবরকার লাহোর কংগ্রেসে সভাপতির কাজ শেষ করে বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতির কাজে যোগদান করলেন। তিনি যে হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছেন, তা কংগ্রেসের অধিবেশন চলা কালে সকলেই ভালভাবে জানা ছিল। তাকে সভাপতির পদে বরণ করার প্রস্তাবটি উত্থাপন করার ভার আমাকে দেওয়া হল। প্রস্তাবটি উত্থাপন প্রসঙ্গে আমি মন্তব্য করলাম যে কংগ্রেসের সভাপতির পদটি প্রায়ই প্রমাণ করছে যে হাই-কোর্টের বিচারপতি হওয়ার পক্ষে এটা হচ্ছে একটা রাজপথ।

ছোটখাট সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে উচ্চতর পদে কোন ভারতীয়কে নিয়োগ না করায় দুঃখ প্রকাশ করে আমি এক প্রস্তাব আনলাম এই লাহোর কংগ্রেসে। এই ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে—পুলিশ, কাষ্টমস্, ষ্টেট রেলওয়ে, আফিম, পাবলিক ওয়ার্ক, সার্ভে এবং আরও কয়েকটি বিভাগ।

হাউস অব্ কমন্সে বসে স্যার হেনরি ফাউলারের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আমার যে আলোচনা হয়েছিল, তা আমি কোন সময়েই ভুলতে পারছিনা। এই আলোচনার ফলে আমার মনে এই ধারণা সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়েছে যে, যে কোন দিক থেকেই বিচার করে দেখা যাক না কেন, এ সমস্ত চাকরীর ক্ষেত্র থেকে আমাদের বাদ দেওয়ার পক্ষে কোন কারণই থাকতে পারেনা; এবং এ বিষয়ে আমাদের দাবী একটি পুরাদস্তুর শক্তিশালী দাবী। ভারতে প্রত্যাবর্তন করে আমি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের

সেক্রেটারীরূপে গভর্ণমেণ্টের কাছে এক স্মারকপত্র পেশ করেছিলাম, কিন্তু সরকারী দপ্তরগুলি তাদের পুরাণ দিনের ধারণার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তাই তারা সহজে নড়তে চায় না। একথা আমি বলতে পারিনা যে আমাদের প্রচেষ্টার ফলে আমরা যা পেয়েছি তা সন্তোষ জনক, কিংবা যা পেতে আশা করার অধিকার আমাদের ছিল তা আমরা পেয়ে গিয়েছি। তবে আমাদের দাবী উপস্থাপনে একটু ফল হয়েছে যে তা সরকারী দপ্তরগুলিকে কাজে হাত দিতে তৎপর করেছে। সরকারকে দিয়ে কাজ আদায় করতে অনেক ঢিলেমি সহ্য করতে হয়। তাই ধৈর্য্যই হল জনসেবকদের কাছে প্রথম এবং শেষ কথা।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষাগুলি একই সময়ে গ্রহণ সম্পর্কে ১৮৮৩ সালে ২রা জুন তারিখে হাউস অব কমন্‌সে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেই সিদ্ধান্তকে কার্য্যকরীরূপ দেওয়ার জন্য ১৯০১ সালে কলকাতা কংগ্রেসে এক প্রস্তাব এনেছিলাম। সারবত্তায় এ প্রস্তাবের মধ্যে নতুন কিছু ছিলনা; মূলতঃ তা একই ধরণের ছিল; তবে সেই সিদ্ধান্ত যাতে কার্য্যে রূপায়িত হয়, তার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

এই কংগ্রেস অধিবেশনেই মিঃ ডব্লু. সি. ব্যানার্জি শেষবারের মত যোগদান করেছিলেন। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ায় বাধ্য হয়েই তাঁকে ১৯০২ সালের গোড়ার দিকে ইংল্যাণ্ডে যেতে হয়। রোগক্লিষ্ট হলেও কংগ্রেসের প্রতি তিনি তাঁর আগ্রহ হারাননি, ইংল্যাণ্ডে তিনি উদারনৈতিক দলের পক্ষে ওয়েলথামস্টো নির্বাচন কেন্দ্র থেকে পার্লিয়ামেণ্টে নির্বাচন প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন। যে সমস্ত বিবরণ তাঁর সম্পর্কে পাওয়া গিয়েছে তাতে মনে হয় যে তাঁর নির্বাচিত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ। তাঁর স্বাস্থ্যের এমন অবনতি ঘটল যে তিনি বাধ্য হয়েই পার্লিয়ামেণ্টের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ালেন, এবং তার অনতিকাল পরেই তাঁর দেশবাসী গভীর দুঃখের সঙ্গে সংবাদ পেলেন যে তিনি ইংল্যাণ্ডে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

মিঃ ডব্লু. সি. ব্যানার্জি তাঁর সময়ে কলকাতা হাইকোর্ট বারের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। যদিও ব্যবসায়ে তাঁর খুব পসার ছিল এবং প্রচুর উপার্জ্জন করেছেন, তা হলেও কংগ্রেসের কাজে তীব্র আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। একথা বলা বাহুল্য হবে না যে তাঁর সময়ে তিনিই ছিলেন বাংলায় কংগ্রেস আন্দোলনের নেতা। সাধারণ অর্থে যাকে আন্দোলনকারী বলা হয় তিনি সে আন্দোলনকারী ছিলেন না। সরকারী মহলের এক অংশের কাছে এই আন্দোলনকারী শব্দটি নাকে দুর্গন্ধের মত ঘৃণাজনক বলে মনে হয়। কিন্তু তিনি কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সরকারী মহলে এই আন্দোলন একটা মর্য্যাদা ও দায়িত্ববোধের স্বীকৃতি লাভ করে। তা না হলে হয়ত কংগ্রেস তা লাভ করত না।

মিঃ ডব্লু. সি. ব্যানার্জি যে সারা জীবনভর জন-সেবা মূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন তা বলা যায় না। একটা অত্যন্ত লাভজনক বৃত্তির প্রবল কাজের চাপের মধ্যে ডুবে থাকার জীবনের প্রথম দিকে তাঁর জন-স্বার্থ বিষয়ক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার কোন সময়, হয়ত বা ইচ্ছাও, ছিলনা। কিন্তু ইলবার্ট বিলের উপর যে বিরোধ বিতর্ক দেখা দেয় তাতে অন্য অনেকের মত তাঁরও দৃষ্টি খুলে যায়। এই সময়ে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমাদের মর্য্যাদা প্রকৃতপক্ষে কতটুকু তা নগ্নভাবে তাঁর নিকট প্রকট হয়। সেই উপলব্ধির তীব্র আলোকে কোন আত্ম-সম্মান জ্ঞান-বিশিষ্ট ভারতীয়ই চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। যাঁরা এই ইলবার্ট বিলের মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁদের কাছেই তা স্বদেশের প্রতি এক কর্ত্তব্যের আহ্বান-রূপে দেখা দিল। মিঃ ডব্লু. সি. ব্যানার্জি আহ্বানে উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিলেন।

এরপর ১৩শ পাতায় দেখুন

ইরানে এক বছরের অধিককাল যে রাজতন্ত্র বিরোধী সংগ্রাম চলছিল সম্প্রতি তার প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। ধীরে ধীরে ইরানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে। ইরানের রাজা শাহ মহাম্মদ রেজা পলহবী দেশ ত্যাগ করে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর ভবিষ্যৎ এবং জীবনের নিরাপত্তা অনিশ্চিত। প্রাক-বিপ্লব ইরান পার্লা-মেণ্টের নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী ডঃ শাপুর বক্তিয়ার পদত্যাগ করে নিখোঁজ হয়েছেন। তিনি জীবিত কিনা তা অবিদিত। ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লা খোমেইনি দীর্ঘ নির্বাসনের পর দেশে ফিরে এসে শাহবিরোধী বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন।

ইরান

কালীপদ সরকার

খোমেইনির অধিনায়কত্বে ইরানে নূতন সরকার গঠিত হয়েছে এবং খোমেইনি হয়েছেন এই সরকারের প্রেসিডেণ্ট। নূতন সরকারের আদর্শ ঐসলামিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। সরকারের প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন শাহবিরোধীদের অন্যতম নেতা ডঃ মেহেদি বাজারগান। ইরানের সামরিক বাহিনী নূতন সরকারের প্রতি তার আনুগত্য জানিয়েছে এবং এই সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া, ব্রিটেন, ফরাসী, ভারত সহ বিশ্বের ছোট বড় অধিকাংশ দেশ। সুতরাং অবস্থা বিচারে নিঃসন্দেহে বলা চলে ইরানে বিপ্লব সফল হয়েছে।

নূতন সরকার শাহ সমর্থকদের শাস্তিবিধানে তৎপর হয়েছে। ইতিমধ্যে সেনাবাহিনীর বেশকিছু সংখ্যক প্রধান এবং অসামরিক নেতৃবৃন্দের বিচার ও মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। সেনাবাহিনীর আরো অনেক কর্মচ্যুত হয়েছেন। শাহ এবং তাঁর পরিবারবর্গের ধন সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়েছে এবং শাহের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে ফরমান জারী হয়েছে। শাস্তিবিধান পর্ব এখনো বহাল আছে। শাহের বিচার এবং তাঁকে তাঁর আশ্রয়স্থল মরোক্কো রাজ প্রাসাদ থেকে ইরানে আনবার আয়োজন চলছে।

নব-গঠিত ইরান সরকারের প্রধান খোমেইনি জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতির অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন—সত্বর একটি গণ ভোটের মাধ্যমে জানা হবে ইরান কি ধরণের শাসনতন্ত্র চায়, ঐসলামিক গণতন্ত্র, না শাহীতন্ত্র। ইরানবাসীর অভিমত জানবার পর নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিগণ একটি নূতন সংবিধান রচনা করবে এবং সেই সংবিধান অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত সরকারের হস্তে বর্তমান অস্থায়ী সরকার দেশের শাসনভার তুলে দেবে। ঘোষণাটি গণ-তান্ত্রিক আদর্শ সম্মত, তবে নির্বাচন ব্যবস্থা এবং ঐসলামিক গণতন্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা অবগত না হওয়া পর্যন্ত, ইরানের ভবিষ্যৎ শাসনযন্ত্রের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়।

ইরানের রাষ্ট্রবিপ্লব শেষ পর্বে কিছুটা নাটকীয় মোড় নিলেও, সকল বিরোধের নিষ্পত্তি হয়ে গেছে একথা বলবার সময় এখনো আসেনি। শাহ-সমর্থকরা ত আছেই, তাছাড়া মার্কসবাদী সশস্ত্র গেরিলা দল, ফেদা দিন মিলণ্ড' এবং কমিউনিষ্ট 'টুডে পার্টি' যারা শাহ-বিরোধী সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, দাবী তুলছে খোমেইনি সরকারে তাদের স্থান কি হবে তা নিয়ে! ঐসলামিক গণতন্ত্রের সঙ্গে মার্কসবাদীরাই বা কিভাবে নিজেদের মানিয়ে নেয় তাও নিশ্চয়ই দেখবার বিষয়।

অন্যদিকে ইরানের রাষ্ট্রজীবনে অল্পকালের হলেও পল্‌বী রাজবংশের অবদান যে এক কলমে মুছে ফেলবার নয়, সে কথাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হয়। এ সকল ছাড়াও আছে দুই বিশ্বশক্তির পিছন থেকে বিপরীতমুখী কলকাঠি নাড়ার চক্রান্ত।

ইরানের দীর্ঘকালীন রাষ্ট্রীয় অস্থিরতার মূলে তার গুরুত্বপূর্ণ ভৌগলিক অবস্থানে ও তৈল সম্পদ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি ভিত্তিক পরিবর্তনের সংঘাত যার শিকার বর্তমানে প্রায় প্রতিটি মুসলমান রাষ্ট্র। ইরান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংযোগস্থলে অবস্থিত এবং এক সময় এই দুই ভূভাগের যোগসূত্র হিসাবে চিহ্নিত ছিল। ইরানের সীমান্ত ছুঁয়ে আছে সোভিয়েত রাশিয়া, তুরস্ক, ইরাক, আফগানিস্থান ও পাকিস্থান। ইরানের উত্তরে ভূমিবন্দী কাসপিয়ান সাগর এবং দক্ষিণে পারস্য উপসাগর। পারস্য উপসাগরের তীরে ইরানের বিখ্যাত বন্দর আব্বাস এবং আবাদান। আবাদান বন্দর পথে ইরানের মুখ্য সঞ্জীবনী ধারা তৈল দেশ বিদেশে রপ্তানী হয়। ৬,২৮,০০০ বর্গমাইল আয়তন ইরানের ৭০ ভাগ মরুঅধ্যুসিত অনুর্বর। মোট ভূমির মাত্র ৭ অংশ কৃষিযোগ্য। তিন কোটি মানুষের বাসভূমি ইরানকে তাই খাদ্য আমদানী করতে হয় বিদেশ থেকে। কিন্তু তাতে ইরানের কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই, খনিজ তৈলসমৃদ্ধ ইরান তার তৈল রপ্তানী আয়ের এক ক্ষুদ্র অংশ দিয়েই আমদানীকৃত খাদ্যের ব্যয় মেটাতে সক্ষম। বিশ্বের তৈল উৎপাদনের শতকরা ৬ভাগ হয় ইরানে। তৈলরপ্তানীকারী দেশগুলির মধ্যে ইরানের স্থান প্রথম সারিতে। ছোট দেশ হলেও ইরান ধনীরাষ্ট্র এবং সেখানকার জীবনধারার মানও বেশ উন্নত।

ইরানের দেশত্যাগী বিপন্ন রাজা শাহ মহম্মদ রেজা পল্‌হবীর পিতা রাজা রেজা শাহ পল্‌হবীকে আধুনিক ইরানের নির্মাতা বলা যায়। তাঁকে ইরানের কামাল আতাতুর্ক বলা হত। গ্রীকদে

১১ পাতার শেষ অংশ

বয়সকাল থেকেই তিনি তাঁর সঙ্গে নিজেকে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত করে ফেলেছিলেন এবং হাই কোর্টের ব্যবহারজীবী মহল এ বিষয়ে তাঁর নেতৃত্বের প্রভাব অনুভব করতে থাকেন। বক্তা হিসাবে তাঁর সমকালীনদের মধ্যে কে হয়ত তাঁকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছেন, উৎসা উদ্যমের ব্যাপারেও তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে এমন কয়েকজ ছিলেন যারা সাধকের মত তেজ-বীর্য নিয়ে নিজেকে দীপ্তিমান করেছিলেন; কিন্তু পরিস্থিতির প্রকৃতপক্ষ শান্ত ও স্বচ্ছভাবে উপলব্ধিতে কোন মিথিই লক্ষে পৌছবার সঠিক উপায় নিরোগে, বিজ্ঞ রাষ্ট্রনীতিবিদে মত পরামর্শ ও নির্দেশ দানের ব্যাপারে, যারা তা সঙ্গে একত্রে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন তাদে মধ্যে, তিনিই ছিলেন সেরা ব্যক্তি। ব্যবহারজীব মহলে জননেতা হিসাবে তাঁর স্থান আজ শূন্য পড়ে আছে তিনি আজ মৃত। সে চেয়ারের সার লোক আজ আর নেই। বাংলা নীরবে তার একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানের বিয়োগে শোক প্রকাশ করেছে। এই রকম একজন পুরুষের মৃত্যু দেশের পক্ষে নিদারুণ ক্ষতির বিষয়, বিশেষ করে এমন একটি সময়ে যখন বাংলা এক দারুণ আন্দোলনের মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছে যে আন্দোলন ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে এই প্রথম সমস্ত প্রদেশকে কাঁপিয়ে তুলেছে।

১৯০৬ সাল বাংলা তথা ভারতের পক্ষে এক দারুণ দুর্ভাগ্যের বছর। ডব্লু. সি. বনার্জি, বদরুদ্দিন তায়েবজি, আনন্দমোহন বসু, নলিন বিহারী সরকার, কাছাকাছি সময়ের মধ্যে, একের পর এক সেই অজানা রাজ্যে চলে গেলেন যেখান থেকে কোন পথিকই আর ফিরে আসে না। আর ঠিক সেই সময়েই বাংলা তার অঙ্গচ্ছেদের যন্ত্রণার মধ্যে কাতরাচ্ছিল। (চলবে)

দেওয়া পারস্য নামের পরিবর্তে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি দেশের ইতিহাসসম্মত ইরান নাম সরকারী ভাবে প্রচলন করেন। রেজা শাহ ছিলেন প্রখর জাতীয়তাবাদী এবং নানাবিধ শাসন সংস্কারের মাধ্যমে পারস্যের পূর্বগৌরব পুনঃস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প। শরেজা শাহের শাসনকালে ইরানের সাফল্যের ইতিবৃত্ত বলবার পূর্বে, পারস্যের অতীত ইতিহাসের আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

ইরান বা এরিয়ান আর্যশব্দবোধক। পুরাতত্ত্ব-বিদ্‌দের মতে কাসপিয়ান বা কাশ্যপ সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে আর্যজাতির উদ্ভব ঘটে। এ স্থলের অনতিদূরে ককেসাস ও হিন্দুকুশ অবস্থিত। ইরান তাই আর্যজাতির এক প্রাচীন লীলাভূমি। অনেকের ধারণা ইরান থেকে আর্যদের একটি শাখা ভারতে গিয়েছিল। ইরানের পাশেই ইরাক, ইরাকের পুরাতন নাম মেসোপটেমিয়া। মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন রাজধানী ব্যাবিলন ছিল মানব সভ্যতার অপর এক আদি লীলাক্ষেত্র। সুপ্রাচীন সুমার জাতি যাদের ভারতীয় দ্রাবিড়দের সমগোত্রীয় মনে করা হয় ব্যাবিলনে প্রথম বসতি স্থাপন করে। খৃঃ পূঃ হাজার বছর আগে সুসা নগরীতে আর্য-পারসীক সাম্রাজ্য সমৃদ্ধি গৌরবে ব্যাবিলন ও এশিরীয় সাম্রাজ্যের সমকক্ষ ছিল। সুসার সম্রাট সাইরাস, দারায়ুস ও জারাকসস সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে অধিকার স্থাপন করেছিলেন। গ্রীক দিগ্‌বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের পারস্য অভিযানকাল পর্যন্ত সুসার সাম্রাজ্য বর্তমান ছিল। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। তবে পারস্যে গ্রীক অধিকার দীর্ঘস্থায়ি হয়নি। আর্য সাসানিয়ান ও পার্থিয়ান বংশের রাজত্বকালে পারস্য তার প্রনষ্ট গৌরব ফিরে পায়। ৬৪২ খৃষ্টাব্দে আরব মুসলমানগণ পারস্য আক্রমণ করে দীর্ঘকালীন যুদ্ধের শেষে পারস্য মুসলমান অধিকারে চলে যায়। পারসীকগণ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। পারসীকগণ সিয়া, মুসলমান, আরবগণ সুন্নি সম্প্রদায় ভুক্ত। পারসীক ভাষা প্রাচীন আর্যভাষাগুলির অন্যতম এবং ভারতের সংস্কৃত ভাষার সহিত নিকট সম্পর্কযুক্ত। মুসলমান ধর্ম গ্রহণের পূর্বে পারস্যবাসীরা ছিল সূর্য উপাসক, তাদের ধর্মগুরু জরথুস্ত্র এবং ধর্মগ্রন্থ জেন্দ আবেস্তা বেদ ও বাইবেলের ন্যায় প্রাচীন। পারস্যের ধর্মসংস্কৃতি ও সভ্যতা বিশ্বসভ্যতা বিবর্তনের মূলে উল্লেখ যোগ্য অবদান জুগিয়েছে। ভারতের পার্শী সম্প্রদায় যাদের পূর্বপুরুষ পারস্যে মুসলমান অধিকার-কালে দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, এই প্রাচীন আর্যভাব প্রবাহ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় না। কবি ওমর খৈয়াম, জালালুদ্দিন রুমী, শেখ সাদী ও হাফেজের কাব্য সাহিত্যে সেই ভাবধারার সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। জালালুদ্দিন রুমীর 'মনসবীয়ে রুমী' এবং শেখ সাদীর 'গুলিস্তাঁ' ও 'বুস্তাঁ' কাব্যগ্রন্থে আধ্যাত্মিকতাবাদের গভীর নিদর্শন মিলে।

বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ধর্মসাধনা হল—মানব প্রেম এবং ঈশ্বরের নিকট আত্মনিবেদন, যা সুফী ধর্মমতের মূল-কথা, তার জন্মও ঘটেছিল পারস্যে। ভারতবর্ষে সুফীধর্মমতের প্রধান সাধক খাজা মইনুদ্দিন চিশতী পারস্য থেকেই এদেশে এসেছিলেন এবং দীর্ঘ সাধকজীবনের শেষে আজমীরে দেহরক্ষা করেন। উপনিষদের বাণী সুফীমতবাদের সহিত একীভূত হয়ে সম্রাট সাজাহানপুত্র দারার অন্তরে ধর্মসমন্বয়ভিত্তিক গভীর মানবিকতাবাদের সঞ্চার করেছিল।

আরব অধিকারের পর পারস্যে মুঘল ও তুর্ক

অভিযান ঘটে কিন্তু নানা বৈদেশিক আক্রমণ, হানাহানি এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্য দিয়ে চললেও, পারসীকগণ নিজেদের ভাষা, জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং গৌরবময় ঐতিহ্যের আবেদন থেকে দূরে সরে যায়নি। ইরানের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করতে গেলে এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অন্তর্প্রবাহী প্রভাবের বিষয়টিও মনে রাখতে হয়।

প্রাচীন যুগে দিগ্‌বিজয়ী সমরনায়কদের বাবিলন, মিশর কিংবা ভারতে অভিযান না চালাতে পারলে যেমন আত্মতৃপ্তি ঘটত না, তেমনি পারস্যের সুসা বা পারসিপলিসের সিংহাসনে বসতে না পারলে তাদের গৌরবলাভ পূর্ণ হত না। ভারতে তুর্ক ও মুঘল আক্রমণের পাদভূমি সেই কারণে অনেক ক্ষেত্রেই ছিল পারস্য। দিল্লীর মুঘল সাম্রাজ্য পারস্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। হিন্দুযুগ থেকে মুসলমান রাজত্বের শেষকাল অবধি ভারতবর্ষের সহিত পারস্যের সংযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। মুসলমান রাজত্বকালে বহু পারসীক ভাগ্যান্বেষণে দিল্লীতে এসেছিলেন এবং ভারতভূমিতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ইরানের বর্তমান রাষ্ট্রনায়ক আয়াতুল্লা খোমেইনির পূর্বপুরুষও এইভাবে ভারতে এসে বাস শুরু করেন এবং ১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহের পর পারস্যে ফিরে যান। তাঁর আত্মীয় জ্ঞাতিবর্গ এখনো উত্তর ভারতের অধিবাসী। তুর্ক মুঘল রাজত্বে পারসীক ছিল ভারতের রাষ্ট্রভাষা। বহু পারসীক শব্দ সেই হেতু ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে স্থান লাভ করেছে। আরবী হরফে লেখা হলেও উর্দু মূলত ভারতীয় ও পারসীক ভাষার মিশ্রণে সৃষ্টি। সুতরাং নানাভাবে পারস্যের সঙ্গে ভারতের বন্ধন যেমন প্রাচীন তেমনই নিবিড়।

নানা রাষ্ট্রবিপ্লবের পথে চলতে চলতে পারস্য আঠার শতকের শেষাশেষি আগা মহম্মদ খানের শাসনকালে জাতীয় সংহতি লাভ করে। কাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আগা মহম্মদ ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। কশিয়ার সাম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন এই সময় পারস্য আক্রমণ করে জর্জিয়া, দারবেন্ড, বাকু প্রভৃতি সুরক্ষিত অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর ফলে, রুশ সৈন্যবাহিনী অধিকৃত অঞ্চল ত্যাগ করে। পারস্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে রাশিয়া, ব্রিটেন ও ফরাসীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলে, শাহ আগা মহম্মদের পরবর্তী শাহ ফতে আলি ইউরোপীয় রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন এবং সেই থেকে পারস্যকে ইচ্ছায়, কিংবা অনিচ্ছায় হোক, ইউরোপীয় সম্প্রসারণবাদী রাজনীতির দ্বন্দ্বক্ষেত্র হতে হয়েছে।

নেপোলিয়ন রাশিয়ার সম্রাট জার পলের সহযোগে একসময় পারস্য ও আফগানিস্থানের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তিকেন্দ্র ভারতবর্ষ অভিযানের সংকল্প করেছিলেন। জার পলের মৃত্যু এই সংকল্প সাধনে বাধা ঘটায়। সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষাকল্পে পারস্যের শাহের সহিত ব্রিটেন ১৮০০ খৃষ্টাব্দে একটি মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করে, যা মালকম চুক্তি নামে পরিচিত। জার শাসিত রাশিয়া বহুদিন থেকে পারস্য অধিকার করে, পারস্য উপসাগরীয় বন্দর পথে ভারত মহাসাগর তথা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবেশের সহজ উপায় সন্ধানে তৎপর ছিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে জার আলেকজাণ্ডার পুনরায় পারস্য আক্রমণ করেন এবং জর্জিয়া অধিকার করে রুশ-সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ব্রিটেন মালকম চুক্তি অনুসারে পারস্যকে প্রতিশ্রুত সাহায্য দিতে ব্যর্থ হয়।

(ক্রমশঃ)

স্বাধীনতা আন্দোলন ও কান্না কাহিনী

কৌটিল্য

ইতিহাস মূলত একটি ধারা। কোন কোন সময় এর গতির পরিবর্তন হয়। আমরা যাকে বক্রগতি বলি তাও ঘটে। আবার কিছুকাল গতির তীব্রতা হ্রাস পেয়ে শিথিল স্তিমিত হয়ে পড়ে। এইটাই ইতিহাসের সামগ্রিক রূপ। এই সামগ্রিক রূপটিকে যদি কেউ বিশেষ একটি ভঙ্গী দিয়ে, মানসিক বৃত্তি দিয়ে গতি বন্ধ করতে চান, তবে ইতিহাসকে সঙ্কীর্ণ সত্তায় রূপান্তরিত করতে হবে। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ইতিহাস কারুর-না-কারুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কোন না কোন স্থান দ্বারা নামাঙ্কিত ইতিহাস প্রভাবিত হয়, আবার স্থান দ্বারাও নামাঙ্কিত হয় এও আমরা জানি। আমরা যখন ফরাসী বিপ্লবের কথা বলি, তখন ফরাসী জাতির সামগ্রিক মনোবৃত্তি, স্বদেশীয় মনোভাব তার অর্থনৈতিক ধারা একটি বিশেষ আন্দোলনের মাধ্যমে বিচার করি। এখানেও বিভিন্ন মতের প্রশ্ন রয়েছে। কেউ হয়ত দেশবন্ধু পরিচালিত, তারকেশ্বর মোহন্ত সিরিয় বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে ভবিষ্যৎ হরিজন আন্দোলনের পূর্বগামী বলে ব্যাখ্যা করবেন। আবার কেউবা ব্রিটিশ যুগে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ, আমলাতন্ত্রে যোগদানকে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুচর হিসাবে ব্যাখ্যা করবেন। গ্রন্থকার আলোচনা ক্ষেত্রে বাঙালী বর্ণ হিন্দুদের ওপর একহাত নিয়েছেন। কিন্তু বর্দ্ধমান রাজ পরিবার সুদূর পাঞ্জাব থেকে আওরঙ্গজেবের পাঞ্জা নিয়ে এদেশে এসে জমিদার রাজা, হয়েছেন—যে সম্বন্ধে তিনি তেমন কিছু বিরূপ নন। বরং মোগলদের সম্বন্ধে বর্দ্ধমান রাজা যে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন—কবর সংস্কার, তাজ সংস্কার, ইত্যাদি গ্রন্থকার সবিশেষ উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থকারের ইতিহাস আলোচনায় আর একটি বিশেষ লক্ষ্য করার এই যে 'আর্য্যামী' কথাটার আমদানী। ইতিহাস-কালের মধ্যে কোন দেশ বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়নি এমন বড় একটা দেখা যায় না। ইংল্যাণ্ডে নরম্যান স্যাক্সনরা গিয়েছিল। আজ ইংল্যাণ্ডে ড্রুইডদের কতটুকু খুঁজে পাওয়া যায়? এই ড্রুইডরাই ত ইংল্যাণ্ডের আদিবাসী। ইতিহাসের নব নব গঠন কার দ্বারা, কি পরিস্থিতিতে গঠিত হয় তা সব সময় খতিয়ে বলা যায় না। গ্রন্থকার দেখিয়েছেন রাজা শশাঙ্ক উগ্র শৈব ছিলেন। তিনি বোধিদ্রুম কেটে ফেলেছিলেন।

আজকের বিচারে এ ঘটনার উল্লেখের তেমন গুরুত্ব নেই। তবু তিনি যখন এটাকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে উল্লেখ করছেন, তখন অন্যটাও বলা উচিত ছিল। বৌদ্ধরা এদেশে কি করছে। সিন্ধুর রাজা দাহিরের আমলে ইসলামকে এরাই ডেকে এনেছেন। বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাভিচারের ফলেই শঙ্করের আবির্ভাব হয়। আবার পাঠান এদেশে আসবার পরই, রামাই পণ্ডিত (শূন্য পুরাণ) লেখেন—

" ধর্ম্ম হইলা যবনরূপী,
মাথায় সিলা কালো টুপী,
ধর্ম্মের শত্রু করিতে বিনাশ। "

এও প্রায় সবাই জানে যে, পূর্ব বঙ্গালায় আজ যে মুসলমান ধর্ম্মের এত প্রতিপত্তি তা সবই বৌদ্ধ পল্লীদের দৌলতে।

(চলবে)

RgedNo. R. N .24511/71 | Biplabi Bangla Phone : 34-1795 | Regd. WB/NC 77

বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

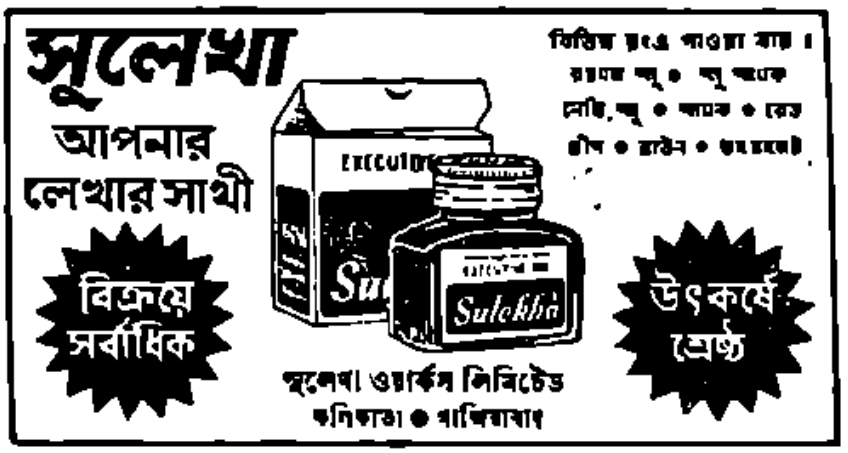

6 APR 1972

— সম্পাদক মণ্ডলী —

শ্রীহরপদ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী।

সম্পাদক—শ্রীশান্তি পদ রায়চৌধুরী

বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীব রীন ঘোষ। বোম্বাই—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ পাল।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। সহকারী সচিব—শ্রীঅনীশ গুহ।

বিপ্লবী বাংলা কার্য্যালয় :—৩নং বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রণ :—বিপ্লবী প্রেস ১৩ নং বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা—৭০০০০৭

বিপ্লবী বাঙালী

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭১

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ২৪শে চৈত্র, ১৩৮৫ ৭ই এপ্রিল, ১৯৭৯	২৫ সংখ্যা

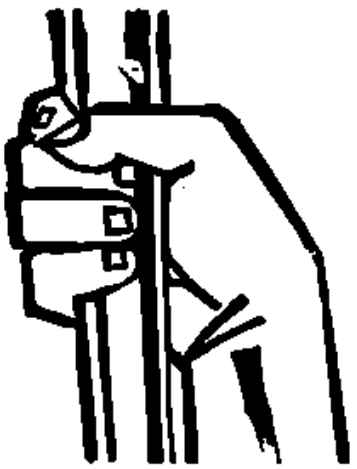

CALCUTTA POLICE

এই সংখ্যায়

বুক খুলে আজ দাঁড়াতে হবে
। সম্পাদকীয় ।

ইরান
। কালীপদ সরকার ।

রাজনীতি আজ কোন পথে
। শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক নলিনী মোহন রায়গুপ্ত ।

দেওয়ানী ফৌজ
। শ্রীমতী ভূষণ সেন ।

স্বাধীনতা আন্দোলন ও কারাকাহিনী
। কৌটিল্য ।

'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন। মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীর-ই কাছে।'

—জীবনানন্দ

ফোন : ৭২-৫১৪৫

অনুশীলন সমিতি

৬২/৮ চণ্ডীঘোষ রোড কলিকাতা-৪০

জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস ও মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস (১ম খণ্ড) আনুষ্ঠানিক প্রকাশ সূচি,

আগামী ১৩ই এপ্রিল (শুক্রবার) ১৯৭৯ ইং সকাল ৯-৩০ ঘটিকায় শিশির মঞ্চে (কলিকাতা তথ্য কেন্দ্র) জালিয়ানওয়ালাবাগে যে সকল শহীদ আত্মদান করিয়াছেন তাঁহাদের পুনাস্মৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করিবার উদ্দেশ্যে এক জনসভার আয়োজন করা হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে অনুশীলন সমিতির ৭৪তম বার্ষিক উৎসবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস (Freedom Struggle Anushilan Samiti), প্রথম খণ্ড আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

এই অনুষ্ঠানে মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীত্রিভুবন নারায়ণ সিং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করিবেন এবং মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীশংকর প্রসাদ মিত্র ও শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী মহাশয় ভাষণ দিবেন।

মাননীয় পূর্তমন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন।

এই অনুষ্ঠানে আপনার সানুগ্রহ সবান্ধব উপস্থিতি প্রার্থনা করি।

ইতি

অনুশীলন সমিতির পক্ষে

সরল কুমার সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা

দীনেশ চন্দ্র ঘটক (সাধারণ সম্পাদক)।

কলিকাতা

৩০শে মার্চ, ১৯৭৯

বিঃ দ্রঃ—অনুষ্ঠান আরম্ভের ১৫মিঃ পূর্ব্বে আসন গ্রহণ করিয়া সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

সম্পাদকীয়—

বুক খুলে আজ দাঁড়াতে হবে

পশ্চিমবঙ্গে দুর্বিসহ বিদ্যুৎ ঘাটতি জনজীবনে শোচনীয় পরিণতি ডেকে আনবে। একটি নিবন্ধে এ আশঙ্কা প্রকাশ করার পর, এত শীঘ্রই যে আমাদের ভবিষ্যৎবাণী সফল হবে, এ কথা ভাবা যায়নি। মনের কোন ক্ষীণ আশা ছিল যে হয়ত অবস্থার উন্নতি ঘটবে। কিন্তু গত সপ্তাহে বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিমাণ একটি রেকর্ড স্থাপন করেছে। ছাত্রদের লেখা পড়া বন্ধ, হাসপাতালে রোগীদের নাভিশ্বাস. ডাক্তারদের চেম্বারে রোগী দেখা সম্ভব হচ্ছে না, পানীয় জল সরবরাহ ভয়ঙ্কর ভাবে বিঘ্নিত. কৃষিক্ষেত্রে, শিল্পে. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে লোড-শেডিং-এর দাপটে মানুষ অস্থির, সর্বোপরি বিদ্যুৎ ঘাটতির সময়সীমা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে এক কথায় মানুষের জীবন সর্বস্তরে স্তব্ধ হতে চলেছে। কিন্তু এই পরিস্থিতির দিকটা হচ্ছে এই যে সঙ্কটের মৌলিক সমাধান খুঁজে বের করে প্রতিষেধমূলক এবং প্রতিকারমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়াস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। যার যেমন খুশী বিবৃতি দিয়ে চলেছেন, তার মধ্যে দায়িত্বশীল মহল থেকে 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' বাঁশীতে এই সুর বাজিয়ে মানুষকে ধোকা দিচ্ছেন।

নিত্য নূতন যে সংবাদ আত্মপ্রকাশ করছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের এই বিদ্যুৎ সঙ্কট যে প্রশাসক, কর্মী, আমলা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট লোকেদেরই সৃষ্টি, এটাই এখন প্রমাণিত হচ্ছে। এতদিন সব দায়িত্ব পূর্বতন কংগ্রেস শাসকদের উপরেই চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের মুখরক্ষার চেষ্টা হচ্ছিল। কিন্তু খবরের কাগজে প্রকাশ পাচ্ছে যে মেশিনের অথর. ইউনিয়নদের মধ্যে রেষারেষি, জবরদস্তি করে বিশেষ কোন একটি ইউনিয়নের কর্মীদের বদলি করে, ছাটাই করে দলীয় লোকদের নিয়োগ, কাজ না করে ওভারটাইমের ব্যবস্থা প্রভৃতির মত কারণগুলি এই শোচনীয় অবস্থাকে প্রায় স্থিতিশীল করে তুলেছে। গাফিলতির জন্য মেসিনের মধ্যে ছাই জমে যাচ্ছে। তেলের সঙ্গে ধুলোবালি মিলে অগ্নিকাণ্ড ঘটাচ্ছে। ত্রুটী সংশোধন করার আগেই ইউনিয়ন কর্মীদের চাপে, বামফ্রন্ট সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবার অভিপ্রায়ে ইঞ্জিনিয়াররা জোড়াতালি দিয়ে মেসিন চালাতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে উৎপাদন ক্ষমতা ক্ষীণতর হচ্ছে এবং নতুন ইউনিটগুলি অল্পদিনের মধ্যে বিকল হয়ে পড়ছে। নতুন মেশিনগুলি জলে বৃষ্টিতে বাইরে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, অথচ গুদামে তুলে রাখার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। অথচ এজন্য হাজার হাজার কর্মী, ইঞ্জিনিয়ার আমলারা বহাল তবিয়তে অবস্থান করে মাসে মাসে রাজ কোষ থেকে মোটা টাকা ঘরে তুলছেন। সর্বোপরি নৈবেদ্যর উপর কদলীর মত শোভা পাচ্ছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রীমুরসেদ সাহেব, যিনি নাকি এই বিভাগের সর্বেসর্বা এবং যার সম্বন্ধে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে এক সঙ্গে কাজ করার চেয়ে ভাড়া ব্যবহার কর্মে ইনি খুব দক্ষ।

একথা আজ অনস্বীকার্য যে অপদার্থতা, অযোগ্যতা, হৃদয়হীন উদাসীনতা, ক্ষমাহীন ব্যর্থতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভরসায় সমস্যার মৌলিক ত্রুটি অনুসন্ধান করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কোন মানসিকতা এবং ব্যগ্রতা না থাকা প্রভৃতি মিলে এই বিদ্যুৎ সঙ্কটকে ক্রমশঃ ঘনীভূত করে তুলছে। ঠিক পথে প্রতিকার করার কোন প্রচেষ্টাও হচ্ছে না। সবচেয়ে বড় ভরসা বোধহয় এদের এই যে কিছু করলেও কিছু হবে না। বিদ্যুৎ-মন্ত্রী লজ্জার কোন ধার ধারছেন না। কখনও বলছেন এক দেড় বছর এই অবস্থা থাকবে। কখনও বলছেন যে দক্ষ লোকের অভাব আছে এবং দক্ষ লোক নাকি খোঁজা হচ্ছে। দুই বৎসর পর কি এই চেতনা হল? কিন্তু এই বিভাগে নাকি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে কোন দক্ষ লোক আসতে চাইছেন না এবং যারা আছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ রেহাই পেতে চাচ্ছেন। এই যখন প্রকৃত অবস্থা তখন সব দোষ অন্যের উপর চাপিয়ে মানুষকে কেন ধোকা দেওয়া হচ্ছে, এর সদুত্তর দাবী করতে পারেন জনসাধারণ ন্যায়সঙ্গতভাবে। এদেশে অপকর্মের জন্য নানারকম কমিশন বসান হয়েছে এবং আরো হবে শোনা যায়। কিন্তু অসত্য ভাষণ ও ক্ষমার অযোগ্য ব্যর্থতার জন্য কেন কমিশন বসবে, না সেটা কর্তৃপক্ষ জানাবেন কি? নিজেদের অপকর্মের জন্য কমিশন আর কে বসাবে। তবে জনসাধারণ যদি তাদের আদালতে এদের বিচার করে এদের কপালে যদি একটি অযোগ্যতার ছাপ একে দিতে পারেন এবং আগামী নির্বাচনের সময় একথা স্মরণে রাখেন, তবে যেখানে যত অযোগ্য, অপদার্থ ও হৃদয়হীন প্রশাসক ও দল আছে, তাদের সকলেরই একটা শিক্ষা হতে পারে।

এ দুর্ভাগা দেশে একবার গদীতে বসতে পারলে, যমরাজা যতদিন পর্যন্ত না এসে সরিয়ে নেন, ততদিন গদী কেউ ছাড়তে চায় না। বিধানসভা বা লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে, মানুষের উপর চরম দুর্ব্যবহার করলেও, এদের কোন শাস্তি পেতে হয় না, সবই যেমন চলছে, চলতে থাকে। জনসাধারণও নিজেদের সংগঠনের অভাবে প্রশাসকদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন না নিয়মতান্ত্রিক পথে। তবে সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হলে, জনতার রুদ্ররোষ কখনও কখনও হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে আগ্নেয়গিরির লাভার মত এবং সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়, এটাও ইতিহাসের সাক্ষ্য। একথা মনে রাখলে প্রশাসকদের পক্ষে মঙ্গল হতে পারে।

এই দুর্দ্দিনের অবসান সহজে হবার নয়, যদি না সংশ্লিষ্ট সকলকেই বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে আগুন নিয়ে তারা খেলা করছেন। এই আগুন যদি বিস্তৃতি লাভ করে তবে অমাত্য, পাত্রমিত্র, সভাসদ, পরিষদ, কর্মী কারো নিষ্কৃতি থাকবে না। সময়ে দেওয়ালের লেখা যারা পড়তে পারে না, তাদের পরিণাম ভোগ করতে হয়, ইতিহাসের পাতায় তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সত্যকে গোপন করে কেউ পরিত্রাণ পায় না দীর্ঘদিন। তবে বিদ্রোহী কবির ভাষায় প্রশ্ন করি:

সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নেই কিরে কেউ সত্য-সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায়?

পারস্য আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ফরাসীর দ্বারস্থ হয় এবং উভয়ের মধ্যে একটি চুক্তি সাক্ষরিত হয়। কিন্তু ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া ও ফরাসীর মধ্যে টিলসিট সন্ধি সম্পাদিত হলে, পারস্য অসহায় বোধ করতে থাকে। ব্রিটেন পারস্যে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধিতে উদ্‌বিগ্ন হলেও, ইউরোপে নেপোলিয়নের সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকায়, কার্যকরী কোন ব্যবস্থাই নিতে পারে না। সেই সুযোগে রাশিয়া পারস্যের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালায় এবং পারস্যকে জর্জিয়া, দাগেস্থান, মিংগোলিয়া এবং আবকাশিয়ার উপর রুশ অধিকার মেনে নিতে বাধ্য করে। কাসপিয়ান সাগরে

ইরান

কালীপদ সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাশিয়ার নৌ-আধিপত্যকেও পারস্যের স্বীকার করতে হয়। রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী তখন তেহেরানের উপকণ্ঠে! ব্রিটিশের মধ্যস্থতায় অবশেষে রাশিয়ার সহিত পারস্যের ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে গুলিস্থানে সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধি পারস্যের নিকট বিপর্যয় স্বরূপ ছিল. পারস্য এই পরাজয়ের বেদনা কোনদিন ভুলতে পারেনি।

গুলস্থান সন্ধিপত্রের কালি শুকাতে না শুকাতে রাশিয়া পুনরায় পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে এবং তাব্রিজ সহ এক বিরাট অঞ্চল দখল করে নেয়। পারস্য নিরুপায় হয়ে, ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার নির্দেশ মত তুর্কমানচাই সাদ্ধ পত্রে সই করে। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে রাশিয়ার সীমান্ত আরস নদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, রাশিয়া পারস্যের নিকট থেকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভ করে। গুলিস্থান ও তুর্কমান চাই সন্ধির পর প্রকৃত প্রস্তাবে পারস্যের স্বাধীন সত্তার অবলুপ্তি ঘটে, পারস্য রাশিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়। অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রও ভূ-সম্পত্তির অধিকার আরম্ভ করে বসে. পারস্যবাসী স্বদেশে প্রবাসীতুল্য হয়ে যায়। পারশ্য শক্তির অস্তগমন মধ্য এশিয়ার তুর্ক জাতীয় মুসলিম অঞ্চলগুলির রুশ সাম্রাজ্যভুক্তি ত্বরান্বিত করে। পারস্যের ককেসাস অঞ্চলও চিরদিনের মত রাশিয়ার অধিকারে চলে যায়।

রাশিয়া যখন পারস্যের অধিকার এবং পারস্যের উত্তরাঞ্চল অধিকার এবং পারস্যের উপর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বিস্তারে ব্যস্ত, ব্রিটেন তখন পারস্যের তৈলসমৃদ্ধ দক্ষিণাঞ্চল ইজারা নিয়ে ব্যবসায়িক স্বার্থ মজবুত ও রুশ অভিসন্ধি থেকে ভারত সাম্রাজের নিরাপত্তা বিধানে সক্রিয় হল। এই দুই বৃহৎ শক্তি অল্পদিনের মধ্যেই পারস্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসর জমিয়ে ফেলল এবং তাদের ক্রীড়নক হলেন পারস্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত শাহান শাহ। এইভাবে পারস্যের রাষ্ট্র-জীবন উনবিংশ শতাব্দী পার হল। ইতিহাসে অনেক ক্ষেত্রে এমনই ঘটতে দেখা যায়. বিক্রমের পরিণতি আসে অবসাদ দীর্ণতায়, রণজয় কলরবের শেষে নামে আত্মবিস্মৃতির নীরবতা। দার্শনিক গ্রীস শৌর্যের পদতলে ভূলুণ্ঠিত হয় এবং শেখ সাদী হাফেজের পারস্য জড়বাদী পাশ্চাত্যের ক্রূর শোষণের শিকার হয়।

১০১ খৃষ্টাব্দে আর্থিক অভাব মেটাতে শাহ ব্রিটেনকে আর এক দফা তৈল্য সমৃদ্ধ ভূমি ইজারা দিলেন, ফলে সমগ্র দক্ষিণ পারস্য ব্রিটেনের করায়ত্ত

হল অ্যাংলো-পারশীয়ান অয়েল কোম্পানী, ইম্পিরিয়াল ব্যাংক অব পারশীয়া যার মালিকানা ব্রিটিশের। পারস্যের মুদ্রা-ব্যবস্থার ভার নিল ইম্পিরিয়াল ব্যাংক। আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যও গেল ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে। ভারতের সাম্রাজ্যবাদী বড়লাট লর্ড কার্জন এক সামরিক নৌবহর নিয়ে ঘুরে এলেন পারস্য উপসাগরবর্তী অঞ্চল। কূটনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত হল সামরিক শক্তির মহড়া। উদ্দেশ্য, পারস্যের ব্যাপারে রুশপ্রভাব প্রতিরোধ। রাশিয়ার জারতন্ত্র তখন প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, বিভেদ ও দুর্নীতির দ্বারা পর্যুদস্ত, স্রোত ব্রিটেনের অনুকূলেই বইতে লাগল।

গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী জাতির জীবনে সাময়িক সুপ্তি দেখা দিলেও, আত্মিক মৃত্যু কদাচিৎ ঘটে। পারস্যে নবজাগরণ ঘটল। পাশ্চাত্য ভাব, শিক্ষা ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারা বিংশ শতকের প্রথম দশকেই তরুণ পারশীকদের মন অধিকার করল। প্রেস. বাবিষ্ট ও বাহাপন্থীদের উদার নৈতিক মতবাদ প্রচারের ফলে, জামালুদ্দিন আল আফগানী ও ম্যালকম খানের ন্যায় সমাজ সংস্কারক নেতাদের অভ্যুদয় ঘটল। তাঁরা সমাজের আধুনিকীকরণের দাবীর সঙ্গে বৈদেশিক শোষণ, শাহের বেহিসেবী অর্থঅপচয় এবং স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জাপানের নিকট রাশিয়ার পরাজয় ও জারতন্ত্র উৎখাত প্রচেষ্টা আন্দোলনকারীদের মনোবল বাড়াল এবং শাহ পারস্যের শাসন বিষয়ে একটি সংবিধান মঞ্জুর করলেন। সংবিধানে মৌল গণ অধিকার স্বীকৃত হল, ১৩৬টি সদস্য বিশিষ্ট মজলিস এবং ৬০টি আসন বিশিষ্ট সেনেট নিয়ে পারস্যের পার্লামেন্ট গঠনের বিধান থাকল। সেনেটের সদস্যদের অর্দ্ধাংশে মনোনয়নের অধিকার রইল শাহের। বিদেশীদের অনুকূলে শাহ কর্তৃক ভূমি বা বাণিজ্যিক স্বার্থ ইজারা দান ব্যবস্থা রহিত হল, মজলিসের অনুমোদন ব্যতীত বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ এবং জাতীয় সম্পদের হস্তান্তর নিষিদ্ধ হল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে তেহেরানে পারস্যের পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন বসল। সমগ্র এশিয়ার এই হল দ্বিতীয় সংসদ, প্রথম সংসদ জাপানের।

সংবিধান অনুসারে আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা সংসদের উপর রাখা হল—তা হল, ধর্মীয় বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার দেওয়া হল পাঁচজন মুজতাহিদ বা ধর্মগুরুর এক কমিটির উপর। মজলিসে কোরান বা শরিয়তের অনুশাসন বিরোধী কোন বিধান গৃহীত হলে এই কমিটি কর্তৃক তা নাকচ করার ক্ষমতা থাকল। সংবিধানের এই বিধানটির কোনদিন রদবদল হয়নি।

শাহের নিকট সংসদ নিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থা মনোমত হল না, এক বছর পরেই রাশিয়ার সাহায্যে তিনি সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে একনায়কতন্ত্রে ফিরে যেতে চেষ্টিত হলেন। রুশ কশাক সৈন্যদল কর্ণেল লিয়াকফের নেতৃত্বে মজলিস ভবনে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে প্রগতিপন্থী সদস্যদের হত্যা করল। মজলিস ভেঙ্গে দেওয়া হল এবং পারস্যে সামরিক আইন জারী হল। শাহবিরোধীদের অনেকে কারারুদ্ধ হল, অনেকের প্রাণদণ্ড হল এবং কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দেশ থেকে নির্বাসিত হলেন। কিন্তু ইরানের মানুষ শাহের স্বৈরাচারী আচরণ মেনে নিতে সম্মত হল না ফলে গৃহযুদ্ধ বাধল। শাহের রুশ দোস্তরা কশাক সৈন্যদলের সাহায্যে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করল, কিন্তু সফল হতে পারল না। আলিকুলি খাঁর বক্তিয়ারী সেনার হাতে

রুশ কশাক বাহিনী পরাজিত হল শাহ তাঁর নাবালক পুত্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করে রাশিয়ায় আশ্রয় নিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সাহায্যে প্রাক্তন শাহ পারস্যে ফিরে এসে সিংহাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলেন কিন্তু কৃতকার্য হলেন না এবং স্বস্থানে ফিরে গেলেন।

উদারপন্থী নেতৃবৃন্দ কিন্তু সফল বিদ্রোহের সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হলেন। আভ্যন্তরীণ কলহ শাসন ব্যবস্থাকে অচল করে তুলল, পারস্য এক গুরুতর আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ল। পারস্য সরকার তখন আর্থিক দুরাবস্থা থেকে উদ্ধার কল্পে একজন মার্কিন অর্থনীতিবিদ মিঃ মরগান সুস্টারকে রাজ্যের অর্থবিভাগকে সুগঠিত করতে নিয়োগ করল। সুস্টার অল্পদিনের মধ্যে অপচয় ও দুর্নীতির পঙ্ক সাফ করে, রাজ্যের অর্থ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করলেন কিন্তু পারস্যের শাসনকার্যে সুস্টারের প্রভাব বৃদ্ধি রাশিয়ার গাত্রদাহের কারণ হল। কায়েমী স্বার্থভোগী পারসীক বড়লোকদের নিকটও সুস্টার অপ্রিয়ভাজন হলেন। রাশিয়া পারস্যের নিকট সুস্টারের বহিষ্কার দাবী করে কড়া নির্দেশ পাঠাল। মজলিস রাশিয়ার নির্দেশ অগ্রাহ্য করলে, রুশ সৈন্য বাহিনী পারস্যে প্রবেশ করল এবং তাব্রিজে উদারপন্থীদের হত্যা করল। শক্তিশালী রাশিয়ার সহিত পারস্যের বিরোধ করা সম্ভব ছিল না, সুতরাং মিঃ মরগান সুস্টারকে পদত্যাগ করে দেশে ফিরে যেতে হল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সাক্ষরিত ইঙ্গ-রুশ সন্ধির ফলে, এই সময় পারস্যের পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইংরাজদের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা ছিল না। এ সময়ে কার্যতঃ পারস্যের দক্ষিণ ভাগে ইংরাজ এবং উত্তর ভাগে রাশিয়া নিজেদের স্বশাসিত অঞ্চল গড়ে তুলেছিল। প্রতিবিধানে অক্ষম পারস্যকে নীরব থাকতে হল।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে পারস্য তার নিরপেক্ষ নীতির কথা ঘোষণা করল। ইংলণ্ড এবং রাশিয়া উভয় দেশকেই পারস্য শত্রু বলে মনে করত, তাই ইংলণ্ড ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জার্মানীর প্রতি ছিল পারস্যের আন্তরিক সমর্থন। দুর্বলের রাষ্ট্রনীতি অর্থহীন। পারস্যের নিরপেক্ষ নীতির বেলায়ও তাই ঘটল। পারস্যের অভ্যন্তরেই রাশিয়া গড়ল এক কশাক সৈন্যদল এবং ব্রিটেন দক্ষিণ পারস্য রাইফেলস বাহিনী। পারস্য যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল এবং পারস্যের উপরে দিয়েই ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনী তুর্ক-জার্মান সৈন্যদের অগ্রগমনে বাধা দিতে এগিয়ে গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কোন সুযোগ পারস্য নিতে পারল না, তারজন্য যে প্রস্তুতির দরকার ছিল, পারস্য তা করতে পারে নি। অধিকন্তু রাশিয়ার বোলশেভিক বিপ্লব ঘটায়, পারস্যের উপর ব্রিটিশ কর্তৃত্ব বেড়ে গেল। ব্রিটিশ পারস্যের প্রতি অধিকার ভুক্ত অঞ্চলের ন্যায় ব্যবহার করতে লাগল। ব্রিটেনের সৈন্যদলও পারস্য ভূমিতে রয়ে গেল। অবস্থার পরিবর্তন ঘটল ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে রুশ-পারস্য মৈত্রী-চুক্তি সহি হবার পর। সোভিয়েত রাশিয়া পারস্যের উপর থেকে তার রাজনৈতিক অধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টার অবসান ঘটাল। তবে পারস্যে রুশ বিরোধী বৈদেশিক তৎপরতা দেখা দিলে রুশ হস্তক্ষেপের শর্ত বহাল রাখল। তাহলেও রুশ-পারস্য মৈত্রী চুক্তি পারস্যের আত্মমর্যাদা ও স্বাধীন সত্তা পুনরুদ্ধারের পথ সুগম করল।

(বাকী অংশ ১০-এর পাতায়)

[গ্রন্থ সমালোচনা]

স্বাধীনতা আন্দোলন ও কারা কাহিনী

কৌটিল্য

ইতিহাস মুখ্যত একটি ধারা। কোন কোন সময় এর গতির পরিবর্ত্তন হয়। আমরা যাকে বজ্রগতি বলি তাও ঘটে। আবার কিছুকাল গতির তীব্রতা হ্রাস পেয়ে শিথিল স্তিমিত হয়ে পড়ে। এইটাই ইতিহাসের সামগ্রিক রূপ। এই সামগ্রিক রূপটিকে যদি কেউ বিশেষ একটি ভঙ্গী দিয়ে, মানসিক বৃত্তি দিয়ে গতি বদ্ধ করতে চান, তবে ইতিহাসকে সঙ্কীর্ণ সত্তায় রূপান্তরিত করতে হয়। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ইতিহাস কারও-না-কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কোন না কোন স্থান দ্বারা নামাঙ্কিত ইতিহাস প্রভাবিত হয়, আবার স্থান দ্বারাও নামাঙ্কিত হয় এও আমরা জানি। আমরা যখন ফরাসী বিপ্লবের কথা বলি, তখন ফরাসী জাতির সামগ্রিক মনোবৃত্তি, ধর্ম্মীয় মনোভাব তার অর্থনৈতিক ধারা একটি বিশেষ আন্দোলনের মাধ্যমে বিচার করি। এখানেও ঐতিহ্যের মতের প্রশ্ন রয়েছে। কেউ হয়ত দেশবন্ধু পরিচালিত, তারকেশ্বর মোহন্ত গিরির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে ভবিষ্যৎ হরিজন আন্দোলনের পূর্ব্বগামী বলে ব্যাখ্যা করবেন। আবার কেউবা ব্রিটিশ যুগে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ, আমলাতন্ত্রে যোগদানকে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুচর হিসাবে ব্যাখ্যা করবেন। গ্রন্থকার আলোচনা ক্ষেত্রে বাঙালী বর্ণ হিন্দুদের ওপর একহাত নিয়েছেন। কিন্তু বর্দ্ধমান রাজ পরিবার সুদূর পাঞ্জাব থেকে আওরঙ্গজেবের পাঞ্জা নিয়ে এদেশে এসে জমিদার, রাজা হয়েছেন—যে সম্বন্ধে তিনি তেমন কিছু বিরূপ নন। বরং মোগলদের সম্বন্ধে বর্দ্ধমান রাজা যে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন—কবর সংস্কার, তাজ সংস্কার, ইত্যাদি গ্রন্থকার সবিশেষ উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থকারের ইতিহাস আলোচনায় আর একটি বিশেষ লক্ষ্য করার এই যে 'আর্য্যামী' কথাটার আমদানী। ইতিহাস-কালের মধ্যে কোন দেশ বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়নি এমন বড় একটা দেখা যায় না। ইংল্যাণ্ডে নরম্যান স্যাক্সনরা গিয়েছিল। আজ ইংল্যাণ্ডে ড্রুইডদের কতটুকু খুঁজে পাওয়া যায়? এই ড্রুইডরাই ত ইংল্যাণ্ডের আদিবাসী। ইতিহাসের সব নব গঠন কার দ্বারা, কি পরিস্থিতিতে গঠিত হয় তা সব সময় খতি পেতে বলা যায় না। গ্রন্থকার দেখিয়েছেন রাজা শশাঙ্ক উগ্র শৈব ছিলেন। তিনি বোধিদ্রুম কেটে ফেলেছিলেন।

আজকের বিচারে এ ঘটনার উল্লেখের তেমন গুরুত্ব নেই। তবু তিনি যখন এটাকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে উল্লেখ করছেন, তখন অন্যটাও বলা উচিত ছিল। বৌদ্ধরা এদেশে কি করেছে। সিন্ধুর রাজা দাহিরের আমলে ইসলামকে এরাই ডেকে এনেছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ব্যভিচারের ফলে শঙ্করের আবির্ভাব হয়। আবার পাঠান এদেশে আসবার পরই, রামাই পণ্ডিত (শূন্য পুরাণ) লেখেন—

" ধর্ম্ম হইলা যবনরূপী,
মাথায় দিলা কালো টুপী,
ধর্ম্মের শঙ্ক করিতে বিনাশ। "

এও প্রায় সবাই জানে যে, পূর্ব বঙ্গালায় আজ যে মুসলমান ধর্মের এত প্রতিপত্তি তা সবই বৌদ্ধ পল্লীদের দৌলতে।

অতএব "আর্য্যামি" বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ওপর অথথা কটাক্ষ করে কোন ঐতিহাসিক তথ্য প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। কালের প্রয়োজনে অনুশাসন আসে আবার প্রয়োজন মিটে গেলে তা আপনা থেকেই বিলীন হয়ে যায়। এইটাই ইতিহাসের ধারা। আমরা ইতিহাসকে একটা সজীব ধারা বলে মনে করি। এই কারণে মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরীতে যেমন আশ্চর্য্য বোধ করার নেই, তেমনি আবার মসজিদ ভেঙে গীর্জা তৈরীতেও বিচলিত হই না। কেননা, রাষ্ট্র ক্ষমতার সঙ্গে ধর্ম অথবা ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্র বিস্তার এই হলো ইতিহাসের গতিপথ। এই গতি পথেরও সরল অথবা বক্রগতি আছে।

ইয়োরোপে ধর্ম যুদ্ধের পর রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছে। এই বিদ্রোহের ধাতায় ফরাসীর নাম আসে বটে, কিন্তু তারও আগে ওলন্দাজরা জাতীয়তার খাতায় তাদের নাম্বর রেখেছেন। সেই ওলন্দাজেরাই একদিন সাম্রাজ্যবাদী হয়েছে। জীবনের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ যেমন একটা অবশ্যম্ভাবী পর্য্যায়, জাতির ক্ষেত্রেও তেমনি। এখন বিচার করে দেখতে হবে এই সম্প্রসারণের লক্ষ্যস্থল কোন কোন দেশ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই পাশ্চাত্য সম্প্রসারণবাদের লক্ষ্যস্থল ছিল এশিয়া, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।

আরবরা তুর্কী সাম্রাজ্যবাদের আওতায় থাকতে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণ সে যুগে বড় একটা হয়নি। সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপী পাশ্চাত্য বণিকেরা নৌ-বাণিজ্যে হাত পাকায়, সঙ্গে সঙ্গে নৌ-যুদ্ধেও হাত মক্স করে। ফলে ভারতের অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে, তার কারণ ভারতের মোগল শাসকেরা নৌ-যুদ্ধের দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। যে দেশের এত বিরাট তটভূমি সে দেশ যদি নৌ-যুদ্ধে পশ্চাৎপদ থাকে তবে সে দেশ আজ হোক কাল হোক সুদক্ষ নৌ-যুদ্ধবাজদের হাতের পাঞ্জায় আটকা পড়বেই। ভারতের তৎকালীন শাসকেরা ভারতে এসেছিল পাহাড়-পর্বত মরুভূমির দেশ থেকে। কাজেই নৌ-যুদ্ধের কায়দা-কানুনে তারা খুব একটা সুদক্ষ ছিল না। আর পাশ্চাত্য দেশগুলির, বিশেষ করে সাগর-তীরবর্তী

দেশগুলির নৌ-বহর, নৌ-বাহিনী ছিল সুসংহত তার সঙ্গে বণিক বৃত্তি যোগ হয়ে সাম্রাজ্যবাদের পথ সুগম করেছে। ভারত বলতে আমরা যা বুঝি, তাই সেই সাম্রাজ্যবাদের শিকার হয়েছে। ভারতের সংহতিও তৃতীয় পক্ষের আমলে হয়েছে।

ভারতের জাতীয়তাবোধ সাম্রাজ্যবাদের, বিশেষ করে, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের দান। যদি ইস্‌লামের মত পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে ভারতে বাস করত তবে ভারতে জাতীয়তাবাদের ধারা অন্যরূপ নিত। কিন্তু বিজ্ঞানে, দেশ অভিযানে, ব্যবসা-বাণিজ্যে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা তখন অনেক এগিয়ে—তাই ভারতের মত এমন সমৃদ্ধ দেশকে তারা কাঁচামাল সংগ্রহের কেন্দ্রস্থল হিসেবে দেখেছে। ব্যবসা বাণিজ্যই তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। সব বিষয়েরই যেমন প্রাথমিক মুখ্য উদ্দেশ্য রূপান্তরিত হয় তেমন এক্ষেত্রেও—অর্থাৎ ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও প্রাথমিক উদ্দেশ্যের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। তার অর্থ ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে।

কিন্তু বণিকের এই মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দেবার জন্য ভারতবাসীরা নিজেরা কি কিছু দায়ী নয়? বেডের নবাব বাড়িতে বসে ওলন্দাজ বণিকেরা ব্যবসার অছিলায় এ উপমহাদেশে কি ঢোকেনি?

আবার কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতে বসে ইংরেজরা পরামর্শ করেছে। এই জাতীয় গোপন পরামর্শ ভারতের মত এমন বিরাট দেশে কেন সম্ভব হলো? তৎকালীন শাসক শ্রেণী সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনধারা বা সামাজিক নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করতে পারলে হয়ত ভারতের ইতিহাসে বৈদেশিক শক্তির এমনতর আবির্ভাব হতো না। আজকের দিনের জাতীয়তা বোধ বা ভারতীয়তা বোধ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছিলনা। ফলে রাষ্ট্র এবং জনসাধারণ একটি পূর্ণাঙ্গ সমষ্টি না হয়ে দুটি পরস্পর বিরোধী শাখায় পরিণত হয়েছিল। তাছাড়া ধর্মীয় মনোবৃত্তি একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তার ফলে আভ্যন্তরীণ বিভেদ আরো বৃদ্ধি পায়। ইংরেজের আমলে আমাদের জাতীয়তাবোধের চেতনা এত বিভেদ-ক্লিষ্ট ছিল না। আজ ভারতে পা দিতেই ওঠে মারাঠারা আলীবর্দীকে শায়েস্তা করতে এসে কী পরিমাণ অত্যাচার সাধারণ মানুষের ওপর চালিয়েছিল। পরবর্তী যুগে সেই মারাঠা বাঙালী জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি, ইতিহাস মূলত একটি ধারা, এর আদি, মধ্য, অন্ত আছে এবং এরমধ্যে যে বৃহত্তর সমাজ সত্তার আভাষ পাওয়া যায় তা কোন একটি বিশেষ স্থানের ইতিহাস রচনার মধ্যে পাওয়া যায় না। রুশ বিপ্লবের সঙ্গে তৎকালীন রুশ জারের মনোবৃত্তির ইতিহাসটাও পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা সামগ্রিক কোন খণ্ড সত্তা নয়। ইদানিং ভারতের ইতিহাস নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে, সেখানে অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাসকে খণ্ডকালের মধ্যে ফ্রেমে এঁটে দেখানো হচ্ছে। আর ইতিহাসকে অখণ্ড করে দেখানো মানেই হচ্ছে, কোন বিশেষ ধারা-প্রতিফলিত না-করা। বস্তুত এই ইতিহাসের ধারাকে আবিষ্কার করাই ইতিহাসবেত্তাদের মহান কর্তব্য। কোন ঘটনা ঘটলেই তা নিজে-নিজে ইতিহাস রচনা করে না। তার অগ্র, পশ্চাৎ ও আভ্যন্তরীণ ইঙ্গিত পরিস্ফুট হয়ে না ওঠা অবধি কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, তা অর্থবহ হয়ে ওঠে না। প্রকৃত পক্ষে ইতিহাস তখন বোধা। সামাজিক, রাষ্ট্রীক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের ব্যাখ্যারও পরিবর্তন হয়। যে সমাজ-মনোবৃত্তি ও বোধশক্তি অপরিস্ফুট ছিল তা পরিস্ফুট হয়ে উঠে ইতিহাসের ব্যাখ্যারও রূপান্তর ঘটে, পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনটাই অনন্তকালের সত্য। কিন্তু এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এমন একটি বিশ্বজনীন যুক্তি সৃষ্টি করতে হবে যা শাশ্বতকালে স্থির। ব্যাখ্যার পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু যুক্তির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। যাঁরা এই ইতিহাসকে পরিপূর্ণতার মধ্যে পরিব্যাপ্ত দেখতে চান, তারা সহসাই খণ্ডীকৃত কালের ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। তা বলে কি খণ্ডীকৃত কালের ইতিহাস নেই, নেই তার উপযোগিতা? অবশ্যই আছে। অসংখ্য ও অজস্রই আছে। এর উপযোগিতাও আছে।

কথা উঠতে পারে, স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় প্রফুল্লকার যা লিখেছেন, তা প্রকৃতই ইতিহাস কিনা? আমাদের উত্তর ইতিহাস, তবে তা প্রক্ষিপ্ত। নিজের বক্তব্যকে জোরদার করার জন্য তিনি অতীত ইতিহাস টেনে এনেছেন। কিন্তু সেটা প্রসঙ্গ থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বন্দী জীবনের কাহিনী, বিভিন্ন বন্দী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা বেশ মনোমত হয়েছে। গ্রন্থের মধ্যে লেখক কথাটার এত বেশী ব্যবহার করেছেন যে পাঠক পড়তে-পড়তে হাসিয়ে উঠে। ঘটনা বিন্যাসে আর একটু শিল্পী মনের পরিচয় থাকলে ভাল হত, এ সব ছোটখাট ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হয়েছে।"

"স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়—প্রথম খণ্ড, ফকির রায়।

দেওয়ানী ফৌজ

॥ শ্রীমতী ভূষণ সেন ॥

ক্ষণস্থায়ী মানবজীবন। ক্ষণস্থায়ী বলেই এত মধুর, তার রহস্য ভেদের জন্য এত আকুলতা। ধমনীর উষ্ণ রক্তস্রোত, মনের বল্গাহীন চিন্তাধারা, হৃদয়ের উদগ্র কামনা বাসনার প্রবাহ; জীবনের এই যে প্রকাশ, এর কিছুই থাকতো না যদি দেহকোষে লুকানো একটি ক্ষুদে ফৌজ মুহূর্তের জন্য কর্তব্য বিমুখ হত। রোগের সংক্রমণ হতে না হতে আক্রান্ত স্থানে ছুটে যাওয়া আর শত্রুদের ধ্বংশ করাই ওদের কাজ। সে কাজ ওরা জানে। অটনমি দেওয়া আছে. যা দরকার নিজেরাই করবে। আমি বা আপনি, আমরা জানতেও পারব না। ওরা যদি নিয়ম মাফিক কাজ করত [work to rule], তবে যে ইতিহাস রচনা করেছে মানব, তা রচিত হত না। আজ যদি ওরা ঘাড় বেঁকিয়ে বলে বসে, বাইল তোমার হাতিয়ার পত্তর, আমরা Strike করলাম; তবে কোটি কোটি বছরের চেষ্টায় যে অপরূপ সভ্যতা গড়ে তুলেছে মানব, তা হাওয়ায় উড়ে যাবে। বিচিত্র সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ, মিলিয়ে যাবে শূন্যে।

মানবদেহের এই রহস্যময় শক্তির প্রমাণ পেয়েছেন বৈজ্ঞানিক মাত্র এক শতাব্দী আগে। সেই থেকে এর রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করছেন। খুব যে সফলকাম হয়েছেন এই একশো বছরে, তা নয়। সামান্য যেটুকু জানা গেছে, তাও জানা গেছে শেষ দশটি বছরে। এই ফৌজের কাউকে চোখে দেখা যায় না, যন্ত্র দিয়ে যে ধরবেন তারও উপায় নেই। এরা যে ছিল জানা যায় যখন এরা নেই তখন। অথচ আমাদের রক্তস্রোতের মধ্যে লুকানো এই অতি বিক্রম "দেওয়ানী ফৌজ", দেহে রোগবীজাণু সংক্রমিত হতে না হতে, ছুটে গিয়ে আক্রমণ করে; বীজাণুদের ধ্বংশ করে আমাদের রক্ষা করে। কোটি কোটি বছর ধরে বীজাণুদের সঙ্গে ফৌজের লড়াই চলছে, এখনো চলছে। বীজাণুরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়নি। যদি হত, তবে ওরা নতুন Cancer এর বীজাণু সৃষ্টি করে লড়াই চালিয়ে যেতে পারত না। যদি ফৌজ পরাজিত হত, তবে এতদিন আর দেখতে হত না। কবে আমরা appendix কেটে নয় হাড় গোড় ভেঙ্গে, নিমুনিয়ায় দম আটকে নয়তো মেনিনজাইটিসে চোখ উল্টে, অক্কা পেয়ে যেতাম। এই দেওয়ানী ফৌজের একটা গদ্যময় নাম করণ করেছেন বৈজ্ঞানিক। বলেছেন এই বস্তুটি হচ্ছে মানবদেহের স্বতঃনিরাপত্তা বা immunology।

এই immune system যদি একদণ্ডও কাজে ঢিলে দেয়, তবে কি অবস্থা হবে, বুঝতে হলে প্রাণীদেহ ও উদ্ভিদ দেহের মৌল পার্থক্যটা জানা দরকার। জীবদেহের চিরশত্রু Bacteria, Virus ও Fungi-এরা উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহ বাছবিচার করে না। যাকে সামনে পায় আক্রমণ করে, পচিয়ে ফেলবার চেষ্টা করে। যেখানেই জীবনের আবির্ভাব দেখে, তাকে ধ্বংশ করে পৃথিবীর আদিম organic molecule এ ফিরিয়ে নিতে

চায়। উদ্ভিদ দেহে Circulation System নেই, Virus দের আক্রমনও একটি স্থানেই localised থাকে। উদ্ভিদ সময় পায়, ধীরে সুস্থে সংক্রমণ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে থাকে।

মানবের পক্ষে সময় বড় মূল্যবান। তার ধমনীর রক্তস্রোত ১৩ সেকেণ্ডে একবার সমগ্র দেহ পরিক্রমা করে। মস্তিষ্ক ও মূত্রাশয়ে প্রতি ঘণ্টায় ৬০ লিটার রক্ত, মনে রাখবেন ৩০ লিটার রক্ত যাতায়াত করে। সমগ্রদেহ পরিক্রমা করে হার্টে আবার ঐ ৬০ লিটার ফিরে আসে প্রতি ঘণ্টায়। গাছের মত স্থানু হয়ে দাড়িয়ে হাওয়া খেলে আমাদের চলে না। আমরা একটা সভ্যতা সৃষ্টি করছি। সেজন্য খাটছি পিটছি ছুটছি। হাত ও পায়ের পেশীতে প্রচুর Oxygen ও Sugar পৌছে না দিলে ওরা খাটবে কিসের শক্তিতে?

মানব যে গতি ও শক্তি লাভ করেছে, তার মূল্যও কিছু কম দিতে হয় নি। আঙ্গুলের ডগায় যদি একটু ছিড়ে বা কেটে যায়, সেই ক্ষতপথে একটি Bacterium প্রবেশ করলে মাত্র ৪সেকেণ্ডের মধ্যে সে Brain আক্রমণ করবে। Lungs থেকে একটি Pneumo-coccus তিন সেকেণ্ডের মধ্যে হাতের হাড়ে পৌছে, পচনের কাজ সুরু করে দেবে। Circulation System যেমন perfect হয়ে এসেছে প্রাণী জগতে, বীজাণুরাও তার সুযোগ গ্রহণ করেছে; ওদের হাত থেকে আত্মরক্ষাও তেমনি কঠিন হয়েছে।

জীবন আরম্ভের রহস্য আজও অজ্ঞাত, কিন্তু জীবনের শত্রুদের আমরা চিনতে ভুল করিনি। মহা মহা প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের তত বড় শত্রু নয়, যত বড় শত্রু ক্ষুদে Single cell microbe রা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ নমাসে ছমাসে এক আধবার আসে ক্ষুদে শয়তানগুলো লেগেই আছে পেছনে, প্রতিজ্ঞা করেছে ধ্বংস না করেই ছাড়বে না। ওরা যে কি পরিমান desperate এবং ওদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমরা কি পরিমানে "দেওয়ানী ফৌজের" উপর নির্ভরশীল, জানতে পারা যায় বাড়ীর শিশুদের কারো অসুখ

(৫-এর পাতার পরের অংশ)

ব্রিটেনকে অনিচ্ছা সত্বেও তার সৈন্য বাহিনীকে পারশ্য ভূমি থেকে সরিয়ে নিতে হল।

পারশ্যের এই সংকটকালে আবির্ভাব ঘটল এক প্রতিভাদীপ্ত বীর সৈনিক-নেতার, নাম রেজা খান। এক অখ্যাত পরিবারের সন্তান রেজা খানের জীবনের প্রথম বিশ বছর কেটেছিল কশাক বাহিনীতে এক সাধারণ সৈনিকরূপে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে তার রণদক্ষতা এবং চরিত্রবল ব্রিটিশ সেনাপতি কর্নেল জেমস স্মিথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং রেজা খান কশাক ব্রিগেডের অধিনায়ক পদে উন্নীত হল। যুদ্ধ পরবর্তী পরিবর্তনের যুগে পারশ্যবাসীরা দুর্বলচিত্ত শাহের পরিবর্তে একজন জাতীয়তাবাদী, দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন দক্ষ প্রশাসকের সন্ধান করছিল। রেজাখান তাদের সেই অভিলাষ পূরণে সমর্থ বলে বিবেচিত হলেন। জিয়াউদ্দিন তাবাতাবাই প্রধান মন্ত্রীর পদে ইস্তাফা দিলে, মজলিস রেজা খানকে প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত করল। রেজা খান পূর্বেই সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় রেজাখান পারস্যের অপ্রতিদ্বন্দী রাষ্ট্রনায়ক হয়ে উঠলেন বহুকাল পরে পারশ্য একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক দক্ষ নেতার শাসনে এল।

(চলবে)

হলে। বিশেষ করে যে হতভাগ্য শিশু তার এই defnece system-টি গড়ে নিতে পারে নি, তার বাঁচবার প্রয়াস, অসহায়ের মত দেখতে হলে।

জীবনে মৃত্যুই একমাত্র ধ্রুব সত্য, মৃত্যুই জীবনের একমাত্র পরিণাম। সকলেই একথা জানি, তবু মৃত্যুকে আমরা ভয় পাই, ঘৃণা করি। কিন্তু কোন কোন ব্যধি আছে যা এমন করাল, যার বেদনা ও যন্ত্রণা এমন সর্বগ্রাসী, যে তার সম্মুখে অজানিতের ত্রাশ সত্ত্বেও মৃত্যুকে অতি বড় মিত্র বলে মনে হয়। সেই রকম একটি ব্যাধির নাম combined Immuro-deficncy বা Immunity গড়বার সম্পূর্ণ অক্ষমতা। জন্মমুহূর্তে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সুস্থ হৃষ্টপুষ্ট শিশু, আসল বস্তুটিরই অভাব, ধরা পড়ে দুচারদিন পরে। পিতামাতা দেখেন, কিছুর মধ্যে কিছু নয়, শিশু ঘুমাতে ঘুমাতে চমকে জেগে উঠল, কঁকিয়ে কাঁদতে সুরু করল। যেন বুকভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে পারছে না। মুখের কাছে বোতল ধরলেন, তৃষিত ঠোঁট আগ্রহভরে চেপে ধরল, গলা দিয়ে নামল না। সারাদিন শিশুর সেই যন্ত্রণা আর চোখে দেখতে পারা যায় না। নার্স, চিকিৎসক আত্মীয়স্বজন, সকলেই মৃত্যুকেই স্বাগত জানায়।

শিশুদের সাধারণতঃ প্রথম সর্দিতে ধরে যখন তার বয়স ছ'মাস। বছরে সাত-আটবার এইরকম সর্দি হয়ে থাকে। নাক দিয়ে ক'দিন জল ঝড়ে কয়েকদিন কান্নাকাটি করে, কিছু খেতে চায় না, হয়ত পেট খারাপ হয়। তারপর আপনা থেকেই ভাল হয়ে যায়। কিন্তু যে হতভাগ্য শিশুর immue system ঠিক মত কাজ করে না, তার শুকনো কাশী আর সারতে চায় না। জ্বরও ছাড়ে না।

তখন বাপমার দুশ্চিন্তা বাড়ে ভয় দেখা দেয়। সেদিন পর্যন্ত শিশু সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিল। অন্যদের মত হেসেছে খেলেছে, খেয়েছে ঘুমিয়েছে। এখন অন্যদের মত সেরে উঠছে না কেন? তারা তো জানেন না যে সেই প্রথম মাস দুটিতে, তাদের শিশু অন্য শিশুদের মতই Virus ও Bacteria দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে যে বায়ু নিঃশ্বাস নিয়েছে সেই বায়ুর সঙ্গে, যে জল পান করেছে সেই জলের মধ্য দিয়ে, যে খাদ্য আহার করেছে তার প্রতি গ্রাসে। এতদিন রক্ষা পেয়েছে মাতৃদেহ সঞ্জাত antibodies দের শক্তিতে। সে শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, অথচ তার নিজের রক্ত antibodies নিজান শেখে নি। মায়ের দুধ ছেড়েছে জন্মের পরেই, তাই মার কাছ থেকে যে সাহায্য পাবে তার উপায় নেই।

জননী নিজ দেহরসের সঙ্গে সেই মূল্যবান immunity শক্তিটি শিশুর দেহে প্রেরণ করেছিলেন, জন্মকালীন তীব্র বেদনা ও সম্ভাব্য দুর্ঘটনা থেকে, এবং জন্মের পর কিছুদিন সর্বপ্রকার সংক্রামণ থেকে রক্ষার জন্য। সে কাজ শেষ হওয়ার পরে অন্য protein-দের মত এই proteinগুলিও আবর্জনার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। শিশুর নিজের রক্ত, যদি প্রয়োজনের সময় নূতন antibodies নির্মাণ করতে সক্ষম না হয়, তবে রোগের সঙ্গে যুঝবে কোন শক্তিতে?

তখন সর্দি একবার ধরলে আর ছাড়বে না। মা child specialist-এর কাছে ছুটবেন। ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখবেন শিশু সুস্থ ও স্বাভাবিক, কিন্তু অসুখ সারবে না। দু-তিন সপ্তাহ

(বাকী অংশ ১৫-এর পাতায়)

রাজনীতি আজ কোন পথে

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেতে খামারে, কলে কারখানায় উৎপাদন নিম্নমুখী কেন ? গ্রামাঞ্চলে অপারেশন বর্গা চালু করে দলবাজী ও দলপুষ্টি করে সি, পি, এম যে অশান্ত পরিবেশ দিনের পর দিন সৃষ্টি করে চলেছে তাতে কৃষিপণ্য উৎপাদনে ভাঁটা পড়তে শুরু হয়েছে ; ফলে ক্ষেতে খামারে উৎপাদনক্রম নিম্নমুখী আর শিল্পাঞ্চলে ঘন ঘন ধর্মঘটের ডাক যা 'সিটু' অর্থাৎ সি, পি, এম-এর শ্রমিক সংস্থা ও বামফ্রন্ট শরিকদলের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি একের পর এক শিল্পক্ষেত্রে, বিশেষ করে ক্ষুদ্রশিল্পে ও কুটির শিল্পে স্বাভাবিক উৎপাদনকে ব্যাহত ও নিম্নগামী করছে। বড় বড় শিল্প সংস্থায় সিটু গায়ের জোরে ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে পুলিসকে বগলদাবায় পুরে যে তাণ্ডব সৃষ্টি করে চলেছে তা কি মোহরেজী ভাইয়ের অজ্ঞাত আছে ? এখানে হোসিয়ারী শিল্প যা বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প বলে পরিচিত ও পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিচালিত এবং উদ্বাস্তু শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদন যখন প্রায় ক্ষেত্রেই চালু ছিল সেই সব ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পগুলি আজ ধ্বংসের পথে অগ্রসরমান কেন ? সিটুর দাপট ও ধর্মঘটের কারণে। বহু দিন ধরে ঐ শিল্পে ধর্মঘট স্থায়ী হওয়ায় বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং হোসিয়ারী শিল্পের ক্ষতি এত ব্যাপকহারে হয়েছে যে উক্ত শিল্প বাংলার বাইরের শিল্পপতিদের হাতে মুনাফা এনে দিয়েছে এবং তারাই এখন পশ্চিমবঙ্গের বাজার দখল করায় বাঙ্গালীর এই নিজস্ব শিল্পটি হাতছাড়া হতে বসেছে। এই আত্মঘাতী ধর্মঘট কি শুভ সূচনা করল এবং কি লাভ অর্জন করল তা সিটু তথা সি, পি. এম-ই জানে। এইরূপ ভাবে আজ বাংলার বহুদিনেরলব্ধ প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণ শিল্পও বাংলার বাজার হারাচ্ছে, ফলে ধ্বংসোন্মুখ, তবুও ধর্মঘটের ঘনঘটার আজ বিরাম নেই। মুদ্রণ শিল্পটিও বাংলার বাইরে স্থানান্তরিত হবে বলে আশংকা হয়। রাজ্য সরকার এখনও এ বিষয়ে প্রায় উদাসীন বলেই ক্ষুদ্র মুদ্রক সংস্থার বাঙ্গালী মালিকরা যাদের শিল্পে পাঁচ বা খুব বেশী হলে দশের বেশী শ্রমিক কাজ করে না ; তাদের অবস্থা যে কি নিদারুণ দুঃখজনক ও মর্মান্তিক তা ভাবলে রাজ্য সরকারকে এর জন্য দায়ী করতে মন চায়। মুদ্রকরা ও তাদের কর্মচারীরা এই সব ছোট ছোট ছাপাখানায়, দপ্তরীখানায় ও কাগজ কাটাই সংস্থায় কাজ চালাতে চায়, কিন্তু বড় বড় মুদ্রণ শিল্পে নিয়োজিত ধর্মঘট শ্রমিকদের হুমকি ও দৈহিক নিপীড়নের ভয়ে কাজ চালাতে সাহস করে না। এ সব ব্যাপারে রাজ্য সরকার পুলিসকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকতে হুমকি দিয়ে রেখেছেন, কাজেই এই শিল্পটিও মরণোন্মুখ বলেই ধারণা হয়। চটকলগুলিতেও ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে এবং রাজ্য সরকার পাশ কাটিয়ে আছেন। বিদেশী মুদ্রা অর্জন বোধ হয় সি, পি, এম চায় না,

কিন্তু মোরারজীভাই ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এখন ও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কেন দ্রুত হস্তক্ষেপ করে এই ক্ষতিকর ধর্মঘটের মীমাংসার চেষ্টা করছেন না? কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী কি করছেন? তাঁর ত এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে এখনই ছুটে বাংলায় এসে এর প্রতিবিধান করা একান্ত দরকার। এইসব কারণে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো যে ভাঙ্গনের মুখে তা কি জ্যোতিবাবুরা একবারও ভাল ভাবে খতিয়ে দেখছেন না—তাঁরা এখানে বন্ধ্যা রাজনীতির পৃষ্ঠপোষক না কি জানতে বড় ইচ্ছা হয়। ইন্দিরার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে মোরারজী ভাইয়ের এখনই সি, পি, এম এর বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়া অচিরেই আবশ্যক, নচেৎ পশ্চিমবঙ্গ চরম দুর্বিপাকে পড়বে এবং পরে আর এর কিছুই আদায় থাকবে না। ইন্দিরার চেয়ে রাজ্য সরকার ও তার অনুসৃত নীতি কি দেশের ও দশের পক্ষে এখনই খুব বিপদজনক বলে কেন্দ্রীয় সরকার মনে করতে পারছেন না? না কি গদী রাখতেই এত ব্যস্ত যে সি, পি, এম এর শত অন্যায়কেই প্রশ্রয় দেওয়া জনতাদলের পক্ষে আরো কিছুকাল বেঁচে থাকবার রসদ সংগ্রহের চেষ্টা? পশ্চিমবঙ্গ এভাবে ধ্বংস হলে সারা ভারতও ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগোবে। জনতাদলের নেতারা কি তা বোঝেন না? তা যদি হয়, জেনে রাখুন বাংলা অতীতে কাহাকেও ক্ষমা করে নি এবং ভবিষ্যতেও করবে না। বাংলা ভাগ হয়েই আজ বাংলার চরম দুর্গতি, দিল্লী নিশ্চিন্তে বেশীদিন আর থাকতে পারবে না। বাংলায় যে আগুন আজ লেগেছে তা ক্রমশ আশপাশের সকল রাজ্যে লাগবেই লাগবে, আজ না হয় পরশ্ব এবং সেই একই অগ্নিতে দিল্লী ছারখারে যাবে। ইন্দ্রপ্রস্থ বড় মারাত্মক স্থান, ওখানে স্থায়ী হয়ে বসে কেউই রাজত্ব চালাতে পারে নি। মোরারজীর কানে জল ঢুকতে আর কত দেরী?

———

বাবতীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র
প্রস্তুতকারক: শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
শিবকালী কুটীর • কুমার খুরই • বাঁকুড়া • পশ্চিমবঙ্গ

বার নম্বর ভবনের স্মৃতি রক্ষার্থে
বিপ্লবী পরিষদ্ এগিয়ে আসবে কি ?

॥ ব্রজেন দাস ॥

রাজা সুবোধচন্দ্র (বসু) মল্লিকের ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার (বর্তমানে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) ভবনটি বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের একটি পীঠস্থান। এই ভবনটিকে বাঙালীর বৈপ্লবিক জাতীয়তা-বাদের একটি জন্মস্থান বলা যায়।

১৯০৮ সালে বাংলা সরকারের চিফ্ সেক্রেটারী তাঁর গোপন ফাইলে লিপিবদ্ধ করে গেছেন—সুবোধচন্দ্রের কলিকাতার বাড়ীটি "এনার্কিষ্টদের" আড্ডা, অরবিন্দ, সুবোধ ও অবিনাশের শলাপরামর্শ করার স্থান, এই বাড়ীতে অরবিন্দের গুরু লেলে মহারাজ (সিদ্ধযোগী বিষ্ণু ভাস্কর লেলে মহারাজ ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের যোগ-দীক্ষার গুরু) ও অন্যান্য প্রদেশের 'এনার্কিষ্ট' মিলিত হয়।

১৯০৮ সালের ১১ই নভেম্বর, ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন আইনে তৎকালীন বাংলার জাতীয়-জাগরণের অগ্রপথিক অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চাটার্জি, পুলিনবিহারী দাস, ভূপেশচন্দ্র নাগ, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্রকুমার বসু, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক এই নয়জনকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে ইংরেজ সরকার কারারুদ্ধ করে। সুবোধচন্দ্র মল্লিক ছিলেন অনুশীলন সমিতির সভাপতি প্রমথনাথ মিত্র এবং সহ-সভাপতি শ্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী। ইংরেজের দমন-নীতি শুরু হল। অনুশীলনের কর্মীরা নিজ নিজ বাড়ী হতে যথাসম্ভব অর্থ সংগ্রহ করে আত্মগোপন করে সমিতির কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু উহা দ্বারা বৈপ্লবিক কর্ম-প্রচেষ্টা চালাবার মত অর্থ সংগ্রহ হল না। সিদ্ধান্ত হল ইংরেজের তাঁবেদারদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করতে হবে। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য সুবোধ মল্লিকের বার নম্বর বাড়ীতে কলিকাতা ও বিভিন্ন জিলার প্রতিনিধিদের গুপ্ত আলোচনা বৈঠক হয়। প্রমথনাথ মিত্র ছিলেন এই আলোচনা সভার সভাপতি। সভায় শ্রীঅরবিন্দ ও পুলিন দাস উপস্থিত ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বলেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করা নীতির দিক দিয়ে দোষের নয়। এই সভায় ইহাও সিদ্ধান্ত হয় স্বাধীনতা লাভের পর ডাকাতির টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে। বৈপ্লবিক আন্দোলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই বাড়ীতে বিপ্লবীরা গোপন বৈঠকে গ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় থাকাকালীন মাঝে মাঝে কলিকাতায় এসে এই বাড়ীতেই সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, মিস্ সরলাবালা ঘোষাল, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, প্রমথনাথ মিত্র প্রভৃতি সমমতাবলম্বীদের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতেন এবং বৈপ্লবিক কার্যকলাপ কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়—আলোচনা করতেন। স্বদেশী যুগ ও প্রাক্ স্বদেশী যুগ থেকে বাঙালীর রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেরণা এই বাড়ী হতে পেয়েছে। এই বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা বসু-মল্লিকরা এসেছিলেন হুগলী থেকে। মল্লিকরা ছিলেন বাঙালীদের মধ্যে আধুনিক শিল্পপতি, মিল্, বিল্ডিং ও জাহাজঘাটার মালিক।

জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ও স্মৃতিজড়িত এই ভবনটি বর্তমানে হাতবদলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

(বাকী অংশ ১৬-এর পাতায়)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

(১৯০০—১৯০১)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমার সাংবাদিকতার কাজের পরিধি আরও বেড়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ না করে ১৯০০ সালের কাছ থেকে আমি বিদায় নিতে পারছি না। ১৮৭৯ সালে আমি 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক ও সত্বাধিকারীরূপে এর দায়িত্বভার গ্রহণ করি। সেই সময় থেকে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত এটি ছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৯০০ সালে এটিকে একটি দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করা হয়। এটিকে দৈনিকে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব আমার কাছে অনেকবার করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে আমার অন্য জনসেবা-মূলক কাজে বাধার সৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই আমি বুঝতে পারলাম যে সর্ব-ভারতীয় স্বার্থ-বিজড়িত বিষয়কে তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা দ্রুত অকেজো হয়ে পড়ছে। দেশে নাগরিক ও রাষ্ট্রিক জীবন ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত সংবাদ পাওয়ার চাহিদাও বেড়ে যাচ্ছে সাপ্তাহিক পত্রিকার আদর, প্রভাব এবং জনপ্রিয়তাও দ্রুত কমে যাচ্ছে। সুতরাং অবস্থার চাপের কাছে এবং তার সঙ্গে মানিয়ে চলার মহান নীতির কাছে আমার নতি স্বীকার করতে হল।

পত্রিকাটিকে দৈনিকে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব নিয়ে আমার উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন স্বর্গতঃ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব। আমার সমস্ত জনসেবামূলক

(১১-এর পাতার পরের অংশ)

কেটে যাবে, বাবা দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে জলের মত অর্থব্যয় করবেন, আত্মীয়স্বজন উল্টো পাল্টা পরামর্শ দিতে থাকবেন। বাপমার পীড়াপীড়িতে অস্থির হয়ে শেষটায় ডাক্তার কড়া কড়া কয়েকটা antibiotic ওষুধ লিখে দিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করবেন।

Antibiotic ওষুধ রোগের আক্রমণ বিলম্বিত রোগের বিস্তৃতি রোধ করবার চেষ্টা করবে, কিছু বীজাণু বধও করবে। কিন্তু দেহকে রোগ-মুক্ত করতে পারবে না। শিশুর নিজের তৈয়ারী antibodieq ছাড়া কারো সে ক্ষমতা নেই। রোগ-বীজাণু ধ্বংস করা আর সেই সব জঞ্জাল পরিকার করা কাজ দুটি করতে হবে শিশুকেই।

এক বাড়ীতে এক বয়সী দুটি শিশু একটিকে রোগে ধরে অন্যটিকে ধরে না, এর কারণও immunity-র তারতম্য। সোনার সঙ্গে খাদ মেশানো যেমন স্বর্ণকারের অভ্যাস, প্রকৃতিরও তেমনি এ একটা খেলা। একজন মানুষকে সম্পূর্ণ immune করে অমৃতের স্বপ্ন দেখান, আর এক-জনকে করেন বঞ্চনা। তা প্রকৃতি যত বড় খেলোয়াড়ই হোন, মানবের একটা mission আছে, সে প্রকৃতিকে জয় করবেই। আজ না পারলে, আগামীকাল পারবে।

ও ব্যক্তিগত কাজে তিনি বন্ধুভাবে, এমনকি প্রীতির সহিত আগ্রহ প্রকাশ করতেন। 'হিতবাদী' পত্রিকার আংশিক মালিক মেসার্স সি. কে. সেন এণ্ড কোম্পানীর বাবু উপেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে দশ বছরের জন্য একটি অংশিদের চুক্তিতে রাজি হই। অতঃপর 'বেঙ্গলী' দৈনিকরূপে আত্মপ্রকাশ করল। এখনও পর্য্যন্ত তা দৈনিকরূপেই চলছে। আমাদের এই পত্রিকাই সর্বপ্রথম ভারতীয় পত্রিকা যা রয়টার এজেন্সীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং সেজন্য আমরা কোন সময়েই মনস্তাপ বোধ করিনি।

আমার নিয়ন্ত্রণাধীনকালে 'বেঙ্গলী' কতখানি সাফল্য অর্জন করেছে সেকথা বলার কাজ আমার নয়। কিন্তু এ কথা বলতে পারি যে পত্রিকাটি যেটুকু প্রতিষ্ঠাই লাভ করে থাকুক না কেন, তা প্রধানতঃ হয়েছে এর প্রাক্তন ম্যানেজার তারাপ্রসন্ন মিত্রের দুর্লভ সাধনা ও ব্যবসা পরিচালন ক্ষমতা-গুণে। তারাপ্রসন্ন মিত্র ছিলেন পত্রিকার অন্তরাত্মা-স্বরূপ। যে কাজ তাকে করতে হবে নিজেকে তিনি সে কাজের উপযোগী করে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন এবং নৈপুণ্য, নিষ্ঠা ও সংগঠন শক্তির সমবায়ে তিনি পত্রিকাটিকে গড়ে তোলেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন, অবিরাম কাজ করে যেতেন। প্রকৃতপক্ষেই তিনি পত্রিকার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আজ আর তিনি বেঁচে নেই, আছে তাঁর স্মৃতি। যারা তাঁর সঙ্গে বা তাঁর অধীনে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাদের কাছে সে স্মৃতি মূল্যবান সম্পদরূপে বিরাজ করছে।

(চলবে)

(১৪-এর পাতার পরের অংশ)

সম্পত্তি। এই বাড়ীতে বিশ্ববিদ্যালয় কি করতে চাইছে জানার জন্য জনসাধারণের পক্ষ হতে দাবী উঠছে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন লেখকের চিঠি ও প্রবন্ধ। সম্প্রতি রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সুবোধচন্দ্র মল্লিকের অনুরাগীদের প্রচেষ্টায় জাতীয় আন্দোলনে এই বাড়ীর অবদান বিষয়ে তথ্য সম্বলিত প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ডাঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর সভাপতির ভাষণে গোটা বাঙালী সমাজের পক্ষ থেকে জানতে চেয়েছেন দানসূত্রে প্রাপ্ত মল্লিকদের বাড়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে ব্যবহার করতে চান। উহার জবাব আশু প্রয়োজন। দাবী উঠেছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের সঙ্গে সংযোগিতা করে বিপ্লবী বাঙালীর যে সব স্মৃতি চিহ্ন সরকারের হেফাজতে আছে তা সংগ্রহ করে এবং এখনও যা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে তাও সংগ্রহ করে ঐ বাড়ীর একটি অংশে বিপ্লবী আন্দোলনের মিউজিয়াম করতে পারেন। বিপ্লবীদের প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা গোপন ইস্তাহার, ফাঁসীর আগে বিপ্লবীদের বিবৃতি, আন্দোলন দমন করার জন্য ইংরেজ সরকারের কর্মচারীদের গোপন কাইলের রিপোর্ট বিপ্লবী আন্দোলনের উপর প্রকাশিত পুস্তকাবলী প্রভৃতিও মিউজিয়ামে স্থান করে দিতে হবে। তা' হলেই বাড়ীর মর্য্যাদা রক্ষা হবে।

বিপ্লবী পরিষদ বাংলার বিপ্লবযজ্ঞ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে বৈপ্লবিক আন্দোলনের অবদান জন-সমক্ষে তুলে ধরার জন্য বিভিন্নমুখি প্রয়াস চালাচ্ছেন, সেইজন্য আমরা তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা আশা করব সুবোধচন্দ্র মল্লিকের বার নম্বর ভবনটির বৈপ্লবিক স্মৃতি রক্ষার জন্য বিপ্লবী পরিষদ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে ত্রুটি করবেন না—এবং বিপ্লবী বাংলায় প্রকাশিত হবে তাঁদের প্রচেষ্টার বিবরণ।

RgedNo. R. N. 24011/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
পাক্ষিক :—গ্রাহক ১৫.০০ টাকা | বাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

16 APR 1978

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প ভট্টাচার্য্য।
সম্পাদক—শ্রীশান্তি পরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতার—শ্রীনন্দগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীমতীন্দ্র গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্য্যালয় :—৩নং বঙ্কিমদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

বিপ্লবী বাঙলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭১

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ৭ই বৈশাখ, ১৩৮৬ ২১শে এপ্রিল, ১৯৭৯	২৬,২৭ সংখ্যা

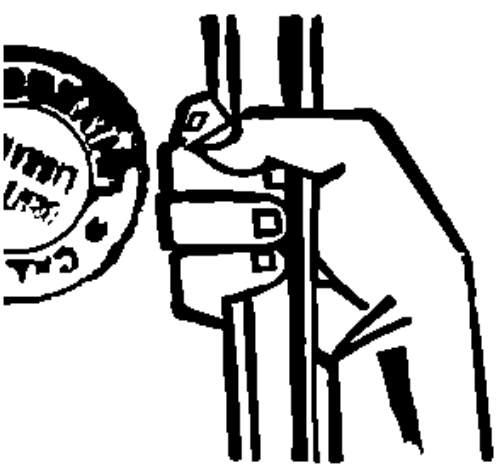

এই সংখ্যায়

জনাব ভুট্টোর ফাঁসির প্রতিক্রিয়া
। সম্পাদকীয় ।

ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস
। বিরোধ বসু ।

অন্তবিহীন রয় যে অন্ধকার
। শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক নলিনী মোহন দাসগুপ্ত ।

যদি ফেল করে
। শ্রীমতী ভূষণ সেন ।

বিপ্লবীর জীবন দর্শন
। দুর্গেশ ভট্টাচার্য্য ।

বেঙ্গল টিউবারকুলোসিস এ্যাসোসিয়েশন
। ডাঃ চিত্তরঞ্জন দাস ।

ভাবতাম যে দেশ শুধু মাটি আর আকাশ। কিন্তু এখন বুঝেছি যে জন্মভূমি মানুষ, সে কথা কয়, হাসে, কাঁদে, বুকে জড়িয়ে ধরে। তার চেয়েও বেশী — জন্মভূমি সাক্ষাৎ মা।

—দ্বিজেন্দ্রলাল

সম্পাদকীয়—

জনাব ভুট্টোর ফাঁসির প্রতিক্রিয়া

শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বজনমত উপেক্ষা করে মিলিটারী শাসক জিয়াউলহক পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী জনাব ভুট্টোকে ফাঁসীতে ঝুলিয়েছেন। কারো কোন সদুপদেশ না শুনে কাজ করার সামরিক লোকদের চিরাচরিত পদ্ধতি ও নীতির স্বাক্ষরই এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে জিয়া তার কাজটাকে একটা আইনসঙ্গত রূপদিতে চেষ্টা করেছেন। বলেছেন তিনি আদালতের রায়কে মেনে নিয়েছেন মাত্র। অবশ্য ভুট্টোর বিচারকদের মধ্যে বিরাট মত পার্থক্য ছিল এবং একজন বিচারপতি বিদায় গ্রহণ না করলে এবং একজন মারা না গেলে রায়টা ভুট্টোর পক্ষেই যেত বলে মনে করেছেন অনেকেই। তা ভিন্ন এমনক্ষেত্রে পুরানো প্যানেল ভেঙ্গে দেওয়াটাই ছিল আইন সর্বজন গ্রাহ্য নীতি। কিন্তু জিয়া তা করেন নি। তা ভিন্ন চারজন বিচারপতিদের উপর পরোক্ষে কতটা প্রভাব খাটিয়েছেন। তার কোন মূল্যায়ন হয়নি। আর একটা কথা বলেছেন তিনি যেটা হাস্যকর। বিশ্বরাষ্ট্রনায়কেরা শুধু ভুট্টোর প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা মুকুব করতে বলেছেন। কিন্তু অন্য চারজনের কথা বলেননি। শুধু যেন এই ত্রুটীতেই ভুট্টোকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার পক্ষে পাঁচজনের মৃত্যুদণ্ড মকুব করা বাধা কোথায় ছিল, তা বলেন নি। দুরাত্মার ছলের অভাব হয়না, এটা তারই একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দুঃখের সঙ্গে হলেও আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ভুট্টো সাহেবের সব কাজ কর্ম, সমালোচনা এমন কি নিন্দার উর্দ্ধে ছিলনা সব সময়। তারই অবিমৃষ্যকারিতায় নারীকে তাদের সতীত্ব হারাতে বাধ্য হতে হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকার ধনসম্পত্তি বিনাশের কথা না হয় বাদই দিলাম। তখন যদি কেউ তার বিচার করে তাকে নরহত্যা, সতীত্বনাশ, সম্পদ সম্পত্তি বিনাশ করার অপরাধে কেউ ফাঁসি দিত, তবে খুব একটা বলার কিছু থাকত না। পাকিস্থানের ক্ষমতা দখল করার পরও তার রেকর্ড খুব পরিচ্ছন্ন ছিল না। বিরোধীদের তিনি সর্বতোভাবে খতম করতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। তারও প্রমাণ সাক্ষ্য দেয় বাদ্চ খান্ডীর জীবন নাশ, ওয়ালিখানের সঙ্গে অন্যান্য নেতাদের শেষ করার পরিকল্পনা। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে বিচারের প্রহসনের নামে জিয়া সাধু সাজতে চাচ্ছেন। সেটা প্রতারণারই নামান্তর মাত্র। বর্ত্তমান নাটকের প্রথম ও শেষ অঙ্কে যেটা ঘটেছে। সেটা বহুল পরিমাণে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত, একথা অস্বীকার করার

উপায় নেই। এ লড়াইটা হল জনপ্রতিনিধিমূলক বনাম মিলিটারী শাসন ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব-প্রসূত। বিগত কয়েক দশকের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে পাকিস্থানে এই প্রকার প্রশাসন ব্যবস্থার লড়াইটা, রৌদ্র মেঘের লুকোচুরি খেলার মত। অবশ্য আমরা মনে করি মৌল কারণ হল যে জাতি বিদ্বেষ, অন্যের রক্ত নিয়ে হোলি খেলার ভিতর দিয়েই পাকিস্থান জন্মগ্রহণ করেছে। তাই সেই পুরাণো স্বভাবটাও আজও পালটাতে পারেনি ওখানকার মানুষেরা। মুসলমান শাসকদের পুরানো এবং বর্ত্তমান দিনের ইতিহাস সমীক্ষা করলে দেখা যাবে এরা কেউ নিজেদের ক্ষমতার মোহে বৃদ্ধ পিতাকে পাগল' ঘোষণা করে অন্তরীণ করে রেখেছেন, তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ভাইয়ের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে উৎসব করতেও দ্বিধা করেন নি। মানুষের জীবনের কতটা মূল্য এরা দেয়, সম্প্রতি ইরাণের নরহত্যার মধ্যেও তার প্রমাণ মেলে। মনে হয় হত্যাকাণ্ড সমাধা করতে এদের কোন বিবেকের দংশন অনুভব হয় না। গোড়ামি সমসাময়িক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে, পুরাণোর সঙ্গে নতুনের সামঞ্জস্য বিধান করবার কোন প্রচেষ্টা এদের নেই। ফলে, প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবিতার শিক্ষা ও এরা গ্রহণ করছেন না। হিংসা যে প্রতিহিংসার প্রসূতি। সত্যও হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন না। যান বাহনের স্বচ্ছন্দতার সূত্রে নতুন ভাবধারা জন্মনিতে বাধ্য, এ কাণ্ডজ্ঞানও এদের হচ্ছেনা। তাই মানুষ দেখতে পাচ্ছে যে এসব দেশে খুনখারাপি লেগেই আছে, মানুষের জীবনের কানা কড়িরও মূল্য নেই এদের কাছে। কাজেই ভুট্টোকে বা অন্য কাউকে ফাঁসি দিতে এরা বিচলিত হল না। যে যতবড় জবরদস্ত প্রশাসক হোন না কেন, ইতিহাসের গতিকে ও ধারাকে কেউ নিজের খুসীমত রুদ্ধ করে রাখতে পারেনা চিরদিনের জন্য, এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারলে সকলেরই মঙ্গল হত। যারা এই সব অপকর্মের নায়ক, তাদেরও যে তাদের অন্যায়ত নীতির স্বীকার হতে পারা অসম্ভব নয়, এই চৈতন্যোদয়ও কি হবেনা তাদের? তবে ত এটাই আশঙ্কা করতে হয় যে মুষ্টিমেয় দেশের রাষ্ট্রনায়কদের কুকার্য্যের ফলে, বিশ্বশান্তি চিরদিনই বিঘ্নিত হতে থাকবে। সমগ্র মানব জাতির সামনে এই প্রশ্নই জেগে উঠেছে যে এই অশুভ শক্তির বিলোপ সাধন করা হবে, না মানুষের কল্যাণের পথ নর-রক্তে চিহ্নিত হতে দিতে হবে আগামী বহুযুগ ধরে। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে আজ ভাবতে হবে যে পৃথিবীটাকে কি শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে পরিণত হতে দেওয়া হবে? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতি এই প্রশ্নই মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। ভুট্টোর ফাঁসি তারই একটী অঙ্গমাত্র।

ভুট্টোসাহেবের ফাঁসিতে পাকিস্তানের স্থিরতা প্রতিষ্ঠিত করার চেয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি

করার সম্ভাবনাই সমধিক বলে ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করেছে। রক্তপাতের অধ্যায় শেষ হয়েছে মনে করা ভুল হবে। বহু মানুষের রক্তে রাজপথ, শহর গ্রাম রঞ্জিত হচ্ছে এবং আরো হবে বলেই মনে হয়। ভারতবর্ষ পাকিস্তানের সন্নিহিত দেশ। পাকিস্তানের ভারতের প্রতি মনোভাব আদৌ বন্ধুজনোচিত নয়। তা ভিন্ন কয়েকটী প্রধান রাষ্ট্র আছে যারা এই উপমহাদেশে বিরোধ জাগিয়ে রাখতে ব্যগ্র। তারা শুধু উস্কানিই দেয়না, ইন্ধনও জোগায়। অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্যও দেয়। তাদের এই অপকর্মের স্রোত অব্যাহত আছে। সর্বোপরি যখনই পাকিস্তান নিজেদের অন্তর্দ্বন্দের জন্য বা অন্য কোন কারণে তাদের দেশের মানুষের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠেছে, তখনই জনগণের দৃষ্টি ও মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টায় ভারত বিদ্বেষের জিগীর তুলেছে। এমন কি এই দেশের উপর আক্রমণও সুরু করেছে। ভুট্টোর সমর্থকদের আন্দোলন জোরদার হলে, পাকিস্তানের সামরিক শাসক দলও এই পথে পা বাড়াতে পারে। পাকিস্তান পারমানবিক অস্ত্র তৈরী করছে কি উদ্দেশ্য, সেটা কখনই ভুলে গেলে চলবে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী, দেশবিদেশের রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, ভুট্টোর ফাঁসি স্থগিত রাখার আবেদন না করে যদি মনে করে থাকেন যে জিয়া সেজন্য এদেশের বন্ধু বনে গিয়েছেন, তাহলে মারাত্মক ভুল হবে। দেশকে পুরোপুরি প্রস্তুত রাখতে হবে। আর প্রয়োজন হলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তন করার জন্য সকলেরই সহযোগীতা দরকার। হিংসার প্রতিহিংসার রাজনীতিকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। নতুবা দেশ বিপন্ন হবে। গোজামিল, ক্ষমতার মোহ, জিঘাংসাবৃত্তি, শুধু বাক্‌চাতুর্য্য বিপৎকালে কোন কাজেই আসবেনা, একথা স্মরণে রাখতেই হবে।

ভুট্টো ভারতের বন্ধু ছিলেন পুরোপুরি, একথা কেউ বলবেনা। তিনি একজন দোলাচিত্তের মানুষ ছিলেন। তবুও জনপ্রতিনিধিমূলক সরকার গঠনে পাকিস্তানে তার জুড়ি ছিলনা। তিনিই কি পাকিস্তানের জনগণের দ্বারা গঠিত সরকারের শেষ প্রতিনিধি বলে ইতিহাসে চিহ্নিত হবেন? আমাদের আশঙ্কা এইখানে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট সজাগ থাকতে হবে। নতুবা সমূহ সর্বনাশ ঘটতে পারে। ভুট্টোসাহেবের এই চরমপরিণতির জন্য আমরা দুঃখিত, নৈতিক কারণও বটে। তিনি সুবিচার পাননি বলেই অগণিত মানুষের সঙ্গে আমরা একমত। জীবনের মধ্যপথে হঠাৎ এমনভাবে যবনিকাপাত হল দেখে আমরা ব্যথিত।

যদি ফেল করি !

শ্রীসতীভূষণ সেন

কেন করবে ছেড়ে দিন। সব কাজেরই কি কারণ পাওয়া যায়? হয়ত বেশী খাটিয়েছেন, বেচারী আর পেরে উঠছে না। হয়ত বদ্দিমাল, টেষ্ট না করেই Maker ডেলিভারি দিয়েছেন, ও আর মেরামত চলবে না। পালটে নিন! ভাল দেখে, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মালের খোঁজে থাকুন। পেয়ে যাবেন।

আপনার কিডনির কথা বলছি। ভারতে পাঁচটি প্রথম শ্রেণীর হাসপাতাল আছে যেখানে যেখানে কিডনি বদলানো হয়ে থাকে [Kidney transplant]। বোম্বাইয়ে দুটি Jaslok আর KEM, ভেলোরে Christian Medical College, নয়াদিল্লীতে All India Institute of Medical Services, আর চণ্ডীগড়ের Post Graduate Medical Institute। এই পাঁচটি হাসপাতালে বছরে বড়জোর শ'খানেক কিডনি বদলানো অপারেশন হয়। প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য।

কলকাতায় এর সুযোগ নেই। প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে আমরা বাঙ্গালীরা জীবনটাকে এমন কিছু মহামূল্য বস্তু বলে মনে করি না। অতো পয়সাও নেই। জীবনটাকে তো অনেক দিন দেখা হল, তেমন লোভনীয় বলে তো মনে হল না; এখন মরণটাকে বরং দেখা যাক। অনেকটা এই জাতীয় আমাদের ফিলসফি।

কিডনির কাজ হচ্ছে দেহের রক্তকে পরিশ্রুত করা। দেহের যেখানে যত আবর্জনা জমা হয় সেই সব বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে থাকেন। সেই বিষকে ফিলটার করে রক্তকে পরিশ্রুত করাই কিডনির কাজ। সে যদি 'Go slow' করে, রক্ত সম্পূর্ণ পরিষ্কার হবে না, আপনার Blood Pressure চড়ে যাবে, হার্ট ও মাংসের উপর চাপ পড়বে। মাথা ধরবে, ঘুম হবে না। ক্লান্ত অবসন্নভাব কাটতে চাইবে না। হাঁটতে গেলে মাথা ঘুরবে। Go slowর পরে আসবে সাময়িক কর্মবিরতি, সবশেষে আগাতার ধর্মঘট।

আমাদের রাজনৈতিক বন্ধু অনেকেই শেষ পর্য্যন্ত এই সব লক্ষণ যুক্ত Nephritis রোগে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এর চিকিৎসা তাঁদের সাধ্যের অতীত ছিল। বয়স ছিল না, প্রয়োজনও বোধ করেন নি। কিডনি ট্রানসপ্ল্যান্ট, সে মহা খরচের ব্যাপার। তাও আঁধারে ঢিল ছোঁড়া, কাজ কতদূর হবে ঠিক নেই। রোগীর দেহ বাইরের একটা কিডনিকে কাজ করতে দেবে, না মেরে হাঁকিয়ে দেবে আগে থেকে জানা যায় না।

জন্মকালে জননীর দেহ থেকে আমরা যে Immunity লাভ করেছি, এবং পরে লালিত করেছি নিজের শোণিতে, সেই দৈত্যটি ভয়ানক হিংসুটে। বাইরের কোন বস্তু দেহে প্রবেশ করলেই তাকে বিতাড়িত না করে ছাড়েন না। আগন্তুকের উদ্দেশ্য যত সাধুই হোক, immunityর কাছে সে শত্রুই। যে বায়ুতে আমরা নিঃশ্বাস নেই' যে জল আমরা পান করি, সেই অতিপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলির আড়ালে আবডালে Virus, Bacteria প্রভৃতি শত্রুরা দেহের মধ্যে প্রবেশ করবার চেষ্টা করে। এদের ধরে ফেলা এবং বধ করাই immunityর কাজ। পাছে শত্রু চিনতে ভুল হয়, তাই

যার গায়ে নতুনের গন্ধ, তাকেই তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করে। এই সদাজাগ্রত প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টির জন্যই, কিডনি বা হার্ট ট্রানস্প্লান্ট করা এত কঠিন।

আপনি যদি কিডনি বদলাতে চান, ঐ পাঁচটি হাসপাতালের যে কোন একটিতে ভর্ত্তি হওয়ার চেষ্টা করেন। যতদিন আপনার উপযুক্ত কিডনি না পাওয়া যায়, ততদিন ডায়ালিসিস করে আপনার রক্ত পরিশুদ্ধ রাখতে হবে। আপনার Blood group এর সঙ্গে মেলে এমন দাতার সন্ধান করতে হবে। শুধু Blood group মিললেই হল না, Tissue Type ও একই রকম হওয়া চাই। এই রকম সুলক্ষণযুক্ত কিডনি পাওয়া গেলে, তখন আপনাকে অপারেশন টেবিলে তোলা হবে।

অপারেশান টেবিলে তোলা অর্থ বাইরের জগৎ থেকে সম্পর্কহীন একটি Capsule এর মধ্যে নিয়ে যাওয়া। সেই ঘরে যে কেউ প্রবেশ করবেন তিনিই সম্পূর্ণ Sterilized হয়ে আসবেন। গায়ে গাউন, মাথায় মুখোস, পায়ে বীজাণুমুক্ত জুতো। ঘরের প্রত্যেকটি বস্তু বীজাণুমুক্ত করতে হবে। কদিন থাকতে হবে ঠিক নেই, রবীন্দ্র-রচনাবলী এক সেট যদি নিতে চান, ষ্টেরিলাইজ করে তালপাতার পুঁথির মত হলুদ করতে হবে পাতাগুলো। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন, যাঁরাই দেখা করতে চাইবেন, পুরু কাঁচের জানলার বাইরে দর্শন করবেন। যেন রেডিও অফিসের রেকর্ড দেখছেন।

এর পর আপনার দেহের immunityর দেবতাকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়াতে হবে। তিনি জেগে থাকলে শলা চিকিৎসক যতই Blood group মিলান, আর Tissue Type বাছুন, দেবতা ঠিক ধরে ফেলবেন। Capsule এর মধ্যেই আপনাকে বাস করতে হবে, বাইরে এলেই Virus আর Bacteria রা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে। immunity কে যখন ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে তখন তো Virus দের মহোৎসব। তাই Capsule এর মধ্যেই বেশ কয়েকদিন বাস করতে হবে। সে এক রাজসিক ব্যাপার, খরচপত্রও প্রায় রাজসূয় যজ্ঞের মত। তা সত্ত্বেও কিডনিটি শেষ পর্য্যন্ত Service দেবে কিনা কিছুই ঠিক নেই।

তার চেয়ে বরং ডায়ালিসিস সম্বল করে চালিয়ে যেতে পারেন। বিশেষতঃ বয়সে যদি ভাটার টান দেখা দিয়ে থাকে। কিডনি যে কাজ করতো, যন্ত্র সেই কাজ করবে। রক্তকে মোটামুটি পরিশ্রুত করতে পারবে। হাতের আঁটালিতে ছিদ্র করে নল বসিয়ে রক্ত টেনে আনবে। পরিষ্কার করে সেই রক্ত আবার পাম্প করে চালিয়ে দেবে দেহে। দিনে আট ঘণ্টা যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত পরিষ্কার করবেন ; সপ্তাহে তিন দিন। Sterilize করার হাঙ্গামা নেই। যেভাবে বাড়ীতে থাকেন সেইভাবে হাসপাতালে থাকবেন ; যা বাড়ীতে করতেন, তাই করবেন। শুয়ে শুয়ে বই পড়বেন, নয় টিভি দেখবেন। বন্ধু বান্ধব কেউ এলে গল্পগুজব করবেন। কিম্বা দেবেন লম্বা ঘুম।

খরচ অবশ্য ডায়ালিসিসেও কিছু কম নয়। প্রত্যেক Sitting এ ৩৫০ টাকা খরচ। হপ্তায় তিন সিটিং, ধরুন হাজার টাকা। মাসে ৪/৫ হাজার। বছরে ষাট হাজার। নিজের বাড়ীতেও ডায়ালিসিসের যন্ত্র বসিয়ে নিতে পারেন। ছোট যন্ত্র, খরচ প্রতি সিটিংএ ১২৫ টাকা। কিন্তু যন্ত্রটি বসাবার প্রাথমিক ব্যয় পড়বে ষাট হাজার। এতগুলো টাকা প্রথমেই লগ্নী করতে হবে।

যন্ত্র যন্ত্রই। কিডনির সব কাজ যন্ত্র দিয়ে হয় না। আমরা সাধারণতঃ যে সব মুখরোচক খাদ্য আহার করে থাকি, ডায়ালিসিসের রোগীর সে সব খাওয়া চলবে না। যন্ত্র মাত্র অল্পস্বল্প High Protein, Amino acid এবং Salt Chemicals পরিষ্কার করতে পারে। তাই রোগীকে কম Protin ও লবণমুক্ত [Salt free] খাদ্যের উপর নির্ভর করতে হবে। দুধ কফি বা ফলের রস দেওয়া হবে যৎসামান্য। চপ কাটলেট বা সন্দেশ রসগোল্লার নামও মুখে আনবেন না। জলও দেওয়া হবে পরিমিত। ভেবে দেখুন ডায়ালিসিসে থাকবেন কিনা।

পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে শুধুমাত্র শুয়ে থাকবার জন্য কেউ আসে না। সকলেই চায় নানা বিচিত্র ভূমিকায় অভিনয় করতে। জয় পরাজয়, আশা নিরাশার দোলায় সকলেই দোল খেতে চায়। জীবনকে উপভোগ করতে চায়। সুখ চায়, দুঃখকেও ছাড়তে চায় না।

জীবনে কত লোককে পাবেন, কত লোককে হারাবেন, তার কি কিছু ঠিক আছে? কত লোক ভালবাসবে আবার কত লোক আঘাত দেবে। সেইসব পাওয়া হারানো, ভালবাসা, আঘাত, এইসব ইট দিয়েই জীবনের ইমারত গড়ে উঠবে। রোমান্সের স্বপ্ন নিয়ে সুরু হবে জীবন, শেষ হবে হয়ত গিয়ে নির্জলা বাস্তবের রুক্ষতায়। জয়ের মালা পরতে গিয়ে চোখ মেলে দেখবে সামনে পরাজয়। সেই জীবনই চায় মানুষ। পরিবর্তে যদি আসে একটা একঘেয়ে রুটিন, সীমাবদ্ধ গতিবিধি, ক্লান্তিকর বাধা মেনু, ঔষুধের মত বিস্বাদ। পথ্যে রুক্তকণিকার অভাব, দেহচর্মে শুকনো পাতার পাণ্ডুরতা দিন দিন ছেয়ে ফেলবে। এরজন্য এত অর্থব্যয় করবেন? না কি টুপ করে চলে যাবেন ওপারে?

পরলোকে বিপ্লবী নরেন্দ্র মোহন বসু

বিশিষ্ট বিপ্লবী শ্রী নরেন্দ্র মোহন বসু গত রবিবার ৮/৪/৭৯ শেঠ সুখলাল করনানী হাসপাতালে পরলোক গমন করেছেন, মৃত্যুকালে তিনি তার স্ত্রী: আত্মীয়বর্গ ও বহু রাজনৈতিক বন্ধু রেখে গেছেন।

ঢাকার সূত্রাপুর থানার টিকাটুলীতে নরেন্দ্র মোহন বসুর পূর্ব নিবাস ছিল। যৌবনেই তিনি অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সংগঠক সুবোধ বসুর সংস্পর্শে আসেন এবং অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। মুক্তি সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্য ১৯৪১ সালে তাহাকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আবদ্ধ রাখা হয়। জেল হতে মুক্তি লাভের পর পুণরায় তাকে অন্তরীণাবদ্ধ করা হয়। কর্ম নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতার জন্য নরেন্দ্র মোহন সমিতির একজন দায়িত্বশীল কর্মীরূপে সকলের আস্থা অর্জন করেন। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হন এবং বিপ্লবী বাংলা, অনুশীলনভবন, নিখিল বঙ্গ শহীদ সমিতি প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকে জাতি গঠন মূলক বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করেন।

আমরা তার বিদ্রোহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

বেঙ্গল টিউবারকুলোসিস এ্যাসোসিয়েশন তালা বন্ধের নেপথ্য কাহিনী

ডাঃ চিত্তরঞ্জন দাস

বঙ্গীয় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি আজ দীর্ঘ ন'মাস তালা বন্ধ কেন? একথার জবাব পশ্চিম বাংলার বামপন্থী সরকার আজও দেননি। দলীয় স্বার্থ ও চক্রান্তের বলি হয়ে ৩০০০০ হাজারেরও বেশী যক্ষ্মারোগী সমিতির চিকিৎসাধীন অবস্থায় চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়ে আজ এক চরম অবস্থায় এসে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করে পল, দণ্ড তথা দিন গুণে গুণে ধীরে কদমে এগিয়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে প্রায় ৭০০০ শিশু যারা এখানে নিয়মিত চিকিৎসা পেয়ে আসছিল—তারাও আজ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। এই বঞ্চনা কার স্বার্থে এবং বা কার অপরাধে—এর জবাব কে দিবে?

স্বাস্থ্য দপ্তরের এক চিঠিতে আমাকে জানানো হয়েছে যে, ঐ দপ্তর' 'লক-আউট'' প্রত্যাহারের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছে কিন্তু বর্তমান পরিচালক মণ্ডলীর একগুঁয়েমীর ফলে কোন প্রকার মীমাংসা করা সম্ভব হয়নি। সমিতির কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য দপ্তরের বৈঠকে হাজির পর্যান্তও হয়নি। স্বাস্থ্য দপ্তর আমাদিগকে আরও জানিয়েছেন আমরা যেন শ্রমদপ্তরের আহ্বান গ্রহণ করি। শ্রমদপ্তরে জানানো হয়েছে: মাননীয় যুগ্ম শ্রমকমিশনার শ্রীযুত শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিছু সুরাহা করার চেষ্টাও করেছিলেন কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে বর্তমানে তাঁর কলম নিস্তব্ধ এবং মুখেও কুলুপ আটকানো। তিনি শুধু বলেন—''আপনাদের ফাইল শ্রমমন্ত্রীর কাছে চলে গিয়েছে।''

এদিকে আমাদের খবর হচ্ছে:—পরিচালক মণ্ডলীর সম্পাদক ডাঃ বিনয় ভট্টাচার্য্য বহু বিনয়ের অবতারণা করে, বহু প্রলোভন দেখিয়ে কর্মীদের অনাহার—অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে নানা ধরণের কাগজ-পত্র স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছেন এবং শোনা যাচ্ছে তিনি নাকি কর্মী ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করাতে ব্যস্ত এবং এই বাতিল না হওয়া পর্যান্ত নাকি ''লক—আউট'' প্রত্যাহার করা হবে না, এখানে বলা প্রয়োজন যে, বিনয় বাবু মার্কসীয় নামাবলী গায়ে জড়িয়ে যে অপকর্মে নেমেছেন—তাতে তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ তথা খেয়াল হয়তো আপাততঃ কিছুটা ফলপ্রসু হলে হতেও পারে—কিন্তু মহামান্য কার্ল-মার্ক্সের নামে তথা গায়ে যে নোংড়া কাঁদা লেপন করা হচ্ছে তথা হ'ল—তার পরিনাম নিশ্চয়ই খুব ভাল হবে না।

মানুষের অনাহার তথা অসহায় অবস্থাকে ভিত্তি করে সবই হয়তো করা সম্ভব—কিন্তু মানুষের অন্তর থেকে যে অভিশাপ, ঘৃণা, অশ্রদ্ধা ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় এবং একদিন তার বহিঃপ্রকাশ বাস্তবে রূপ নেয় তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া কি খুব সহজ? বামফ্রন্ট

সরকারের বহু অপকর্মের মধ্যে এই সেবা প্রতিষ্ঠানে বিনা কারণে শুধু দলীয় স্বার্থে তথা ডাঃ বিনয় ভট্টাচার্য্যের অপকর্ম চাপা দেওয়ার তাগিদে "তালা বন্ধ" ৩০,০০০ যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা বন্ধ, আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে শিশুরা চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত ইত্যাদি একটি জীবন্ত এবং প্রত্যক্ষ নজির।

যে শিশু বিনা চিকিৎসায় মায়ের কোলে ঢলে পড়েছে—যে রোগী তার চিকিৎসায় বঞ্চিত হয়ে স্ত্রীর সামনে গোংরাতে গোংরাতে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ছে—তাদের কি বাঁচার অধিকার ছিল না? তারা কি শুধু বিনয় ডাক্তারের অপকর্মের বলি হয়ে জন্মেছিল? জবাব একদিন দিতেই হবে। পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম নায়ক হিসাবে একদিন যাঁর পরিচিতি ছড়িয়ে পড়েছিল—আজ তাঁকে জবাব দিতে হল। এ নজির ইতিহাসে বহু। বামফ্রন্ট সরকার ইতিপূর্বেও আমাদের অগ্রজপ্রতিম অজয়দার আঁস্তাকুড়ে জন্ম নিয়ে অকালেই চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এবার ওদের জন্মলগ্নের পুরোহিত যিনি ছিলেন তিনি তাঁর আশীর্ব্বাদ থেকে বহু আগেই ওদের বঞ্চিত করেছেন এবং অবাঞ্ছিত সন্তানের পিতার মত আত্মগ্লানিতে মনোকষ্ট পেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছেন।

কেন সমিতির সদরদপ্তর সহ প্রায় ৫০টি ইউনিট বন্ধ তা প্রকাশ করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে না?

যদি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা না হয় তা হলে কি সমিতির অর্থ ভাণ্ডার তথা সম্পদ-সম্পত্তি-ই এই হীনচক্রান্তের তথা "লক-আউটের" নেপথ্য রহস্য?

দেশের মানুষ সব মরেনি—আর মেরে ফেলাও খুব সহজ নয়—সুতরাং বিনয় বাবুকে অনুরোধ তিনি যেন তাঁর স্বপ্নরাজ্যের নায়কত্বে খোয়ারী নায়ক সাজার ব্যর্থপ্রয়াস না করেন, এখনও সময় আছে—অবিলম্বে "লক-আউট" প্রত্যাহার করে লক্ষলোকের চিকিৎসার পথ মুক্ত করে দেন। দেশবাসী কি সত্যই বোকা—না?

———

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

ও

সবাইকে পড়ান—

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

(১৯০০—১৯০১)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তার এবং রিপণ কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট স্বর্গত: অমৃতচন্দ্র ঘোষের জীবন থেকে আমি একটা বড় রকমের শিক্ষালাভ করেছি। সে শিক্ষাটি হল এমন একটি গুণের শিক্ষা যা অন্য সমস্ত গুণের চেয়ে অধিক পরিমাণে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা পরিচালনায় সাফল্য লাভ সম্পর্কে নিশ্চয়তা দান করে। সে গুণটি হল—সততা এবং সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধির একটা মোটামুটি পরিমাণ মূলধন ভাণ্ডারের সঙ্গে অপরিসীম ও অব্যাহত নিষ্ঠা।

চল্লিশ বছরের উপর আমি সাংবাদিকতা কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এই দীর্ঘ দিনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তাতে একথা বলতে পারি যে কোন সংবাদপত্রের সাফল্য অধিক পরিমাণে নির্ভর করে তার ম্যানেজারের উপর, সম্পাদকের উপর নয়। সম্পাদকের ব্যক্তিত্বের অনেক মূল্য আছে। তা একটা সম্পদ যাকে অবহেলা করা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংবাদপত্রের পক্ষে আরও বেশী প্রয়োজন পরিচালনার দক্ষতা। কার্য্যত: এই দুই রকমের কাজ একটার সঙ্গে আর একটা জড়িয়ে পড়ে। অন্তত: ম্যানেজার এবং সম্পাদক—এই দুইয়ের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ এবং একের সঙ্গে অন্যের সংস্রব থাকা অবশ্য প্রয়োজন। সম্পাদককে অবশ্য জনমত গঠন করে তাকে নেতৃত্ব দান করতে হয়। তবে তাকে এটা দেখতে হবে যেন তিনি এমন কিছু না করে বসেন যা সাংঘাতিকভাবে জনমতের বিরুদ্ধে যেতে পারে যার ফলে জনপ্রিয়তা হারাবার ঝুঁকি এসে পড়তে পারে। তাহলে গ্রাহক সংখ্যা কমে যাবে, বিজ্ঞাপন কমে যাবে এবং আয়ও কমে যাবে।

সাংবাদিক-রূপে আমার কাজের মধ্যে আমি রাজদ্রোহাত্মক কাজ মানহানির ব্যাপার এবং ব্যক্তিগত প্রত্যাপবাদ এড়িয়ে চলেছি। আনুষ্ঠানিক ভাবেই হোক বা অনানুষ্ঠানিকভাবেই হোক, আমার বিরুদ্ধে কখনও কোন রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়নি, যদিও আমার মনে হয় যে বেঙ্গলীতে আমার কোন কোন লেখাকে রাজদ্রোহের খুব কাছাকাছি বলে ধরে নেওয়া হত। ভারত-সরকার যখন ইম্পেরিয়াল লেজিজ্‌লেটিভ কাউন্সিলে আমার নির্বাচনের অযোগ্যতা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করছিলেন, তখন এই উদ্দেশ্যে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার ফাইল তাদের কাছে পাঠান হয় যে আমার বিরুদ্ধে কোন রাজদ্রোহের অভিযোগ প্রমাণ করা যায় কিনা। আমি মনে করি এই চেষ্টা একেবারেই বিফলে গিয়েছে এবং যে ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরী থেকে ফাইলগুলি নেওয়া হয়েছিল সেখানেই তা ফেরৎ পাঠান হয়। আমি স্বীকার করছি,—যখনই সেরকম কোন পরিস্থিতির উদ্ভব ও জনমতের প্রবল দাবী উপস্থিত হয়েছে অতি কঠোর ভাষায় আমি সে সম্পর্কে লিখেছি। আমি স্বীকার করছি, বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের দিনগুলিতে ব্রিটিশ

সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে—যে নীতি তারা তার আগে কখনও প্রয়োগ করেননি—জনসাধারণের মধ্যে যে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল, সে সময় সংযতভাবে লেখা ছিল একটা কঠিন ব্যাপার।

আমাদের শাসনকর্তারা অনেক সময়ই প্রেসে কড়া কড়া লেখার জন্য অভিযোগ করেন। কিন্তু তারা সুবিধা মত একথা ভুলে যান যে এই কড়া লেখার প্রয়োচনা তারাই দিয়ে থাকেন। নিন্দাবাদ সম্পর্কে একথা বলা যায়, যে কোন সংবাদপত্রের লেখকই তা সর্বদা এড়িয়ে চলতে পারেন না। সময় সময় জনস্বার্থের খাতিরেই তাকে ইচ্ছা করেই নিন্দার বিষয় লিখতে এবং তার পরিণতিতে যাই ঘটুক না কেন, তার সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়াতে হয়। অনেক সময় কোন সংবাদদাতাই কোন সংবাদ দিয়ে তাকে অসুবিধার মধ্যে ফেলেন এবং সেজন্য তাকেই শাস্তি পেতে হয়। কোন পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়ের জন্য সম্পাদক নামে মাত্র দায়ী। আসলে তার দায়িত্ব শুধু কয়েকটি সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা বিষয়ের মধ্যে যেগুলি তার অধস্তন কর্মীরা, যারা তার পরামর্শ মত কাজ করেন, তার দৃষ্টিতে আনতে পারেন। কিন্তু আইনের চক্ষে তিনিই সমস্ত প্রকাশনার জন্য দায়ী।

একটি ঘটনার উল্লেখ করে আমার বক্তব্য বিষয়টির একটি বিস্তারিত আলোচনা করছি। ঘটনাটির সঙ্গে আমি নিজেই ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট। ১৯১১ সালের কথা। আমার বিরুদ্ধে একটি আদালত অবমাননার মামলা আনা হয়। এড্‌ভোকেট জেনারেলের মোসনের উপর বিচারপতি মিঃ ফ্রেচার আমার বিরুদ্ধে এই রীট মামলাটি আনেন। আমার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার এটি হচ্ছে দ্বিতীয় মামলা। মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র মামলা চলা কালে মিঃ উইলসন ছিলেন সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট। একটি বিচারাধীন মামলায় তিনি যে সাক্ষ্য দেন, তার উপর মন্তব্য করে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ বেঙ্গলী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যে সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই মন্তব্য করা হয়, সেটি লিখেছিলেন বাবু কালীনাথ রায়। কালীনাথ রায় তখন বেঙ্গলী পত্রিকার সাব-এডিটর ছিলেন। বর্তমানে তিনি ট্রিবিউন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। আমি আদালতে লিখিতভাবে যে বিবৃতি দেই তাতে ঐ নিবন্ধ প্রকাশ করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করি। কালীনাথ বাবু এত উচ্চমনা লোক ছিলেন যে তিনি আমাকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে দিতে চাননি। তিনি আমাকে একখানা অফিসিয়াল চিঠি লিখে সমস্ত দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দিয়ে দৃঢ়তার সহিত জানালেন যে এজন্য যদি কেউ দোষী হয়ে থাকেন তবে সে দোষী তিনি নিজে। তার এই শপথের কোন সুযোগ গ্রহণ করার ইচ্ছা আমার ছিল না। কারণ, আমি আগেই সেই সম্পাদকীয় মন্তব্যের জন্য সমস্ত দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছিলাম। তবে তার অনুরোধে তার চিঠিখানা আমি আমার পক্ষের উকিল মিঃ এ, চৌধুরীকে দেখিয়েছিলাম। মিঃ এ. চৌধুরী পরবর্তীকালে হাইকোর্টের একজন জজ হয়েছিলেন। আমরা কালীনাথবাবুর এই চিঠিখানা মামলার কোন কাজে লাগাইনি। তবে বিরোধী পক্ষের উকিল হিসাবে এড্‌ভোকেট জেনারেলকে পত্রখানা দেখাই। আমি জানিনা এর ফলে তার উপর কী রেখাপাত করেছে অথবা তার কাজের উপর কি প্রভাব বিস্তার করেছে। আমার কিন্তু মনে হয় জজ সাহেব এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না। তবে মামলাটি অন্ত একটি সম্পূর্ণ

রীতিগত কারণে ডিস্‌মিস্ হয়ে যায়।

একজন জনসেবক হিসাবে এবং 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক রূপেও আমাকে অনেক সময় ব্যক্তিগত আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। জন-সেবামূলক কাজে যিনি অংশ গ্রহণ করেন তার এজন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। যে পদে তিনি থাকেন, এটা সেই পদের একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপার। এই অবস্থার কাছে সর্বতোভাবে ধৈর্য্যের সহিত নতি স্বীকার করেই চলতে হবে এই আশা নিয়ে—যদিও সে আশা সব সময় ফলবতী হয় না—যে, এই সমস্ত ব্যক্তিগত অপবাদের খেলা যারা খেলে, তাদের নিজেদের কাছেও তা লাভজনক হয় না।

ভারতে আবহাওয়া সময় সময় বর্ণ-বিদ্বেষের তিক্ততা ও ব্যক্তিগত দ্বেষ হিংসায় গজিয়ে ওঠে। লেপ্টেন্যান্ট গভর্নর স্যার রিভার্স টম্পসন একবার কৃষ্টদাস পালকে অসৎ ও মান্য করার অযোগ্য ব্যক্তি বলে বর্ণনা করেন। ইম্পেরিয়াল কাউন্সিলের নির্বাচনে আমার পরাজয় ঘটলে একটি প্রধান সংবাদ-পত্র আমাকে বলে যে ৩১শে জুলাই তারিখে, যে তারিখে আমি নির্বাচনে হেরে গিয়েছি, আমার জন-প্রতিনিধিত্ব শেষ হয়ে গেছে। যদিও আমার মনে হয় তার আগের দিনও আমি জন-প্রতিনিধি ছিলাম। এই সমস্ত ছেলেমানুষী নিন্দারও অযোগ্য। কোন ব্যক্তিগত নিন্দাবাদকেই আমি আমল দিইনি যদি না সেই নিন্দবাদ ভুল ধারনার উপর সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয়ে পড়ে বা জন-সাধারণের স্বার্থ বিজড়িত বিষয় তার মধ্যে এসে পড়ে।

দশ বছর পরে আমি 'বেঙ্গলী'র একক মালিক হয়ে পড়লাম। এই একক মালিকানা ১৯১৯ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত চলে। ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে আমি কাশিম বাজারের মহারাজার সঙ্গে এক চুক্তি আবদ্ধ হই যার ফলে তিনি আমার সঙ্গে যুক্ত মালিকানা লাভ করেন। চুক্তিতে এই সর্ত ছিল যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠান-টিকে একটি লিমিটেড দায়বদ্ধ কোম্পানিতে রূপান্তরিত করতে হবে। এরপরে কতগুলি ঘটনা ঘটে গেল যার ফলে আমি 'বেঙ্গলী' থেকে একে-বারেই সরে আসতে বাধ্য হলাম। এখন আর এর সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নেই এবং জন-স্বার্থ-ঘটিত কোন ব্যাপারে এই পত্রিকা এখন আর আমার বা আমার নীতির প্রতিনিধিত্ব করছে না।

১৯০২ সালে আমাকে আবার কংগ্রেসের সভা-পতির পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। বোম্বাই প্রদেশের আমেদাবাদে এই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই আহ্বান আসে ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে। আমি তখন ছিলাম শিমুলতলায়। বন্ধুবর দিনশাওয়াচা বেসরকারীভাবে এ বিষয়ে আমাকে পত্র লেখেন। পত্রোত্তরে আমি অক্ষমতা প্রকাশ করে আমাকে মাপ করতে বলি এবং মিঃ কালীচরণ ব্যানার্জির নাম ঐ পদের জন্য প্রস্তাব করি। দিনশা ওয়াচা আবার আমাকে পত্র লিখে জানালেন যে ১৯০২ সালে দিল্লীতে দরবার হচ্ছে; এর মুখো-মুখী একটা বড় রকমের আকর্ষণীয় প্রভাব বিস্তার করা দরকার। তাছাড়া স্যার ফিরোজ শা মেটা এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ইচ্ছা যে আমিই সভাপতিত্ব করি।

এই সম্মানের পদটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে আমার পত্রে লিখেছিলাম, 'যদি নিতান্তই অনিষ্ট ঘটে, তাহলে আমি আপনারা যা করবেন তাতেই রাজি।' আমার এই সর্তাধীন প্রতিশ্রুতিতে আমি বাঁধা পড়ে গেলাম। আমার আর এড়াবার উপায় রইল না।

প্রস্তাবটি গ্রহণ করলাম, যদিও আমার কাছে মিঃ কালীচরণ ব্যানার্জির আমার ঐ পদে নির্বাচিত হওয়া অধিক কাম্য বলে মনে হয়েছিল।

কংগ্রেসের এই আমেদাবাদ অধিবেশনটি খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়। আমেদাবাদের লোকেরা আমাকে যে ভাবে অভ্যর্থনা জানান, তা আয়োজন ও উৎসাহ-উদ্দীপনার দিক থেকে রাজকীয় বলা চলে। আমার বক্তৃতার উপসংহারে আমি বলেছিলাম, কংগ্রেসের সভাপতিরূপে আমি যে সম্বর্ধনা লাভ করেছি, কোন রাজপুত্র যুদ্ধ জয় করে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনকালে যে সম্বর্ধনা লাভ করেন তাও এর চেয়ে বেশী উৎসাহ-ব্যঞ্জক হয় না। বক্তৃতায় আমি আরও বলি এই যে সম্মান দেখান হল, ব্যক্তিগত-আমাকে বা আমার যোগ্যতাকে দেখান হয়নি, দেখান হয়েছে সেই মহান আদর্শকে যে আদর্শকে উপস্থাপিত করার গৌরব আমি পেয়েছি। সভাপতির ভাষণ প্রস্তুত করতে আমার ছয় সপ্তাহ লেগেছিল। শিমূলতলায় অবস্থানকালে ৭ই অক্টোবর ভাষণটি প্রস্তুত করতে শুরু করি এবং তা শেষ করি ২৭শে নভেম্বর। এই ভাষণ প্রস্তুত করতে শিমূলতলার পরিবেশ আমাকে বেশ সাহায্য করেছিল। স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, উত্তম জলবায়ু মনোরম আবহাওয়া এবং সর্ব-ব্যাপক একটি বিশ্রামের প্রশান্তিবোধ সব আমার কাজের সহায়তায় অংশ গ্রহণ করেছে। এই ভাষণটি শেষ করতে আমার দু' ঘণ্টা সময় লেগে যায়। এতে আমার বেশ শারীরিক পরিশ্রমও হয়েছিল; কারণ, আমাকে পাঁচ হাজারেরও বেশী লোকের এক সমাবেশে বক্তৃতা করতে হয়েছিল। আমার নিজস্ব প্রথা মতই কোন নোট না দেখেই আমি বক্তৃতা করেছিলাম।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনের অল্প কয়েক দিন পরেই করোনেসন দরবার বসার কথা। ভারতের শিক্ষিত মহল থেকে এই দরবারের ব্যয়বহুল জাঁক-জমকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হয়। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। আমার বক্তৃতায় আমি আমার দেশের শিক্ষিত সমাজের মনের কথা প্রতিধ্বনিত করেছিলাম। কিন্তু দরবার যখন বসবেই, তখন আমি দাবী জানালাম যে ইতিপূর্বে ১৮৫৭, ১৮৭৭ এবং ১৮৮৭ সালের দরবারগুলিতে যেমন এদেশের স্বার্থ বিষয়ক কোন কোন ব্যাপারে ঘোষণা-বাণী প্রকাশ হয়েছে, এই দরবারকেও স্মরণীয় করে রাখার জন্য যেন সেই রকম কোন উপযুক্ত ঘোষণা-বাণী প্রকাশ করা হয়। দরবার হয়ে গেল; কিন্তু কোন ঘোষণা-বাণীই প্রকাশ করা হল না। এই দরবারের স্মৃতি যদি কোন কারণে জাগরূক থাকে, তবে তা হল এর চমকপ্রদ অলঙ্কারসমৃদ্ধ বক্তৃতা এবং অর্থ অপচয়ের বিরাট বহর যে অপচয় না করলেও চলতে পারত।

তখনকার দিনে সবচেয়ে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা। স্বভাবতই আমার সভাপতির ভাষণের একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়। আমি নিজে ছিলাম সারা জীবন একজন শিক্ষাব্রতী। তাই স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষা সমস্যা নিয়ে আলোচনায়ই আমি গভীর আগ্রহ বোধ করি। লর্ড কার্জন ভারতে যতগুলি কু-কর্ম করে গেছেন তার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারই হল কু-ফলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী দূরপ্রসারী। কাজে দক্ষতা আনয়নের অছিলায় কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিকে তিনি সরকারী কর্মচারীদের তাঁবে আনেন।

(চলবে)

বিপ্লবীর জীবন দর্শন

॥ দুর্গেশ ভট্টাচার্য্য ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মা চলে গেলেন আমাদের রেখে। আমরা সাত ভাই এবং বাবা একটা অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চললাম। আমার দাদাদের কারো কোন রোজগার করার মত বয়স তখনো হয়নি—কেউ পড়াশুনা শেষ করে উঠতে পারেন নি। বাবার রোজগারও বিশেষ কিছু ছিল না। তাই আমাদের দিনগুলো কাটছিল অতি দুঃখে, অতি কষ্টে। বাবা তাঁর সাধ্যমত চারিদিক ঘোরাঘেরা করে যা সামান্য রোজগার করতেন তাতেই আমাদের দিন চালাতে হত। এই অভাব, অনটন, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় বাবার শরীরটাও ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

মা আমাদের এই দুর্দিনটা দেখার পূর্বেই বিদায় নিলেন। তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অসম্ভব কর্মদক্ষতা, অটুট মনোবল ও একটা ঐশ্বরিক শক্তির উপর অচল বিশ্বাস তাঁকে একজন সাধারণ মেয়ে মানুষ থেকে যেন একটু পৃথক করে গড়ে তুলছিল। আত্মবিশ্বাস তাঁর এত বেশী ছিল যা সাধারণতঃ আজকাল চোখেই পড়ে না। পরবর্ত্তী জীবনে আমি বহুলোকের সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু এরূপ মহিলা আমার নজরে বড় বেশী একটা পড়েনি।

আমার মা লেখাপড়া জানতেন না মোটেই। সে যুগে খুব কম মহিলাই স্কুল, কলেজে শিক্ষা লাভ করত। মহিলা কেন? ছেলেরাও পারত না।

তখনকার দিনে গ্রামাঞ্চলে ছেলেদের স্কুলে, কলেজে পড়ার বিশেষ সুবিধা ছিল না। গ্রামের ছেলে কেউ যদি বি. এ. পাশ করত, চারিদিকের লোক সব তাকে দেখতে আসত, তার সাথে আলাপ করে গর্ব অনুভব করত।

আজকাল অবশ্য বি. এ. এম. এ. পাশ ছেলে মেয়ের অভাব নেই। কিন্তু প্রকৃত মানুষের অভাব ক্রমশঃই বেড়ে উঠছে। শিক্ষা দীক্ষার উন্নতির সাথে সাথে মানুষের সাধারণ গুণাবলীরও উন্নতরূপ নেওয়ার কথা। কিন্তু তা বিশেষ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। একটা উদাহরণ থেকে তার খানিকটা আঁচ পাওয়া যাবে। আমরা যখন স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে পড়তাম (১৯২৫-২৬ সন), তখন ছাত্রেরা ধূমপান করবে ইহা কল্পনারও অতীত ছিল। "ছাত্রানাং অধ্যয়ন তপঃ" ইহাই ছিল আদর্শ। আমি জোর করে বলতে পারি হাজার হাজার ছাত্রের ভিতর একটি ধূমপানে অভ্যস্ত ছেলে পাওয়া যেত না। কিন্তু আজকাল তার বিপরীত! স্কুলে উচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়নে রত বা কলেজের ছাত্রের ভিতর ধূমপান করে না এরূপ ছাত্র বের করাই শক্ত! ধূমপান করা ভালো কি মন্দ, উচিত কি অনুচিত তারা বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়, তবে এ কথাটাই আমি বলতে চাই—তখন যা হওয়া সম্ভব ছিল না, এখন তা হতে বাধা নেই।

যুগ পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে সবই বদলায়। সামাজিক কাঠামোর পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে মানুষের চিন্তাধারা রীতিনীতি সবই পালটে যায়। কিন্তু সেটা কোন পথে যাবে—উন্নতির পথে না অবনতির পথে—সেটাই বিচার্য্য।

কিন্তু যাক্ সে কথা। যা বলতে যাচ্ছিলাম, তাই বলছি—আমার মার আত্মবিশ্বাস ছিল অপরিসীম—বিপদে ধৈর্য্য ধরার ক্ষমতাও ছিল অস্বাভাবিক, তাই তিনি জোর করেই বলতে পেরেছিলেন—এ জন্মে আমি এমন কোন পাপ করিনি যার জন্য আমার ছেলেকে আমার নিকট হতে কেড়ে নিতে পারবে। হলোও তাই, মার আকাঙ্ক্ষাতেই তার ছেলে দীনেশ প্রাণ পেল।

আমার যখন ৩ বৎসর, আর আমার দাদা, দিনভিখারীর চার বৎসর তখন আমার মা আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন। এই বয়সে মা হারানো যে কি তা আমার পক্ষে লিখে বুঝানো শক্ত! আমাদের মত অবস্থায় যারা মা হারিয়েছেন তারাই শুধু অনুভব করতে পারবেন। আমরা আমাদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তা বুঝতে পেরেছি—বুঝতে পেরেছি—এ ক্ষতি অপূরণীয়, এ শূন্যতা জীবনের চিরসহচর।

আমাদের গ্রামের পাশ দিয়েই বালু নদী বয়ে গেছে। নদীটি অবশ্য অত্যন্ত ছোট—শীতকালে এটাকে একটি খাল বললেই চলে, কিন্তু বর্ষাকালে অন্যান্য নদীর মত এরও রূপ বদলায়। তখন জলের স্রোত ও বেগ দেখলে সত্যি ভয় হয়! তবে পদ্মা, শীতলক্ষ্যা এ সব বড় বড়ো বড়ো নদীর তুলনায় এ নদীটি বেশ ছোট।

এ নদীর পারেই প্রতি রবিবার হাট বসত। আশে পাশের গ্রামের সমস্ত লোকেরা যার যা সপ্তাহের প্রয়োজন সবই এখান থেকে কিনে নিয়ে যেত। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে এখানে একটি মেলাও বসত। বহু দূর দূর দেশ থেকে এই মেলাতে নানা প্রকার জিনিষ কেনা বেচার জন্য লোক সমাগম হ'ত। নানা প্রকার খেলনা ও খাবারের জিনিষ পাওয়া যেত। এটা একটা গ্রামের ছেলে-পেলেদের মহোৎসব ছিল। গ্রাম উজাড় করে সবাই এখানে এসে জড় হত ও নানা প্রকার জিনিষ ক্রয় করে গভীর রাতে বাড়ি ফিরত।

এছাড়াও আর একটি বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় নৌকা বাইচ (Boat race)। প্রতি বৎসর এই মেলার সময়টায় বালু নদীতে নৌকা বাইচ হ'ত। বর্ত্তমানে এই নৌকা বাইচের প্রচলন বিশেষ নেই। পূর্ব্বে, বৎসরে একবার করে—বিশেষ করে এই মেলার সময় অনেক গ্রামেই এই বাইচ খেলা হ'ত।

আমাদের গ্রাম ছিল নমশূদ্রপ্রধান। চাষ আবাদ করেই এদের দিন চলত। নৌকা করে লোকজন এদিক সেদিক নিয়ে যাওয়াও ছিল এদের আর একটি পেশা। তাতেও এদের রোজগার ছিল মন্দ নয়। পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামগুলোতে প্রতি বাড়িতেই কমপক্ষে একটা করে নৌকা থাকত। বর্ষাকালে নৌকা ছাড়া চলা মোটেই সম্ভব ছিল না। শীতকালেও একটু দূর পথে যেতে হলে নৌকার প্রয়োজন হ'ত। এর জন্যই আমাদের দেশের নমশূদ্ররা নৌকা চালাতে খুবই পারদর্শী ছিল। এই কারণেই সেই সময় নৌকা বাইচের খুব প্রচলনও ছিল।

বাইসের নৌকাগুলো সাধারণ নৌকার মত নয় একটু আলাদা রকমের—লম্বা, পাতলা এবং সামালটা বেশ একটু লম্বা ধরণের। এগুলোকে ছিপ বলা হত। এই ছিপগুলোর চলার বেগ অত্যন্ত বেশী এমন কি, ছোট ছোট লঞ্চগুলো থেকে এদের বেগ মোটেই কম নয়। এই ছিপগুলোকে নানা রংয়ের কাগজের নিশান দিয়ে সাজিয়ে এই বাইচ খেলায় যোগ দিতে নিয়ে আসত। ছিপের দু-ধারেই চার, পাঁচ জন করে চালক বসত। পেছনে একজন হাল ধরে থাকত, আর মাঝখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে চিৎকার করে চালকদের উৎসাহ দিত।

(চলবে)

অন্তবিহীন রয় যে অন্ধকার

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগ থেকে মানুষ অন্ধকার থেকে আলোয় পৌঁছানোর সাধনায় ব্যাপৃত। 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়' তমসা মানুষ চায় না—অবশ্য অন্ধকারের জীবদের কথা স্বতন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র ঘোর অমাবস্যা নেমে এসেছে বিগত ১৯৭৭ সালের জুলাই মাস থেকে এবং যতদিন যাচ্ছে, অন্ধকারের ঘনত্বটা তত ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার জনগণের প্রতি বাম জানা ছিল, কিন্তু এত অধিক বাম তা জানা ছিল না। প্রত্যহ ঘন ঘন লোডশেডিং উত্তরোত্তর ক্রমবর্দ্ধমান, ফলে জন-জীবন বিপর্যস্ত। বিদ্যুৎমন্ত্রী জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রীও বটে, তবু প্রতিহারহীন এই জীবন যন্ত্রণার হাত থেকে কি শহরবাসী, কি গ্রামবাসী, কি ধনী, কি নির্ধন, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি শ্রমিক, কি কৃষক, কি ব্যবসায়ী, কি ক্রেতা, কি ছাত্র, কি শিক্ষক, কি রোগী, কি চিকিৎসক, কি গবেষক, কি লেখক, কি সাংবাদিক, কি মুদ্রাযন্ত্রের চালক, কি পরীক্ষার্থী, কি পরীক্ষক, কি শিল্পী, কি শিল্পপতি— কারোরই নিষ্কৃতি নেই। এ যুগে মানুষের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই বিদ্যুতের একান্ত প্রয়োজন অপরিহার্য্য, অথচ সেই অতি প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের অভাব প্রতিনিয়ত অনুভূত হয় এবং তা সীমাহীন। এই অন্তহীন বিদ্যুৎ ঘাটতির ফলে প্রতিদিন মানুষ যে অনন্ত দুর্গতির মধ্যে এখানে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে তা সরকারের অজানা নয়; তবুও প্রতিকারের আন্তরিক চেষ্টার অভাব পরিলক্ষিত হয় কেন? সরকারের এই উদাসীনতা অথবা অকর্মণ্যতা কি আর সহ্য করা বাস্তবে সম্ভব? ছোট বাট কলকারখানায়, কুটীরশিল্পে, দোকান-বাজারে ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত খেটে খাওয়া মানুষের দল প্রায়শই লে-অফ বা ছাঁটাইয়ের বন্দি হতে বাধ্য হচ্ছে এবং সমগ্রভাবে অর্থনীতিতে যে প্রলয়ঙ্কর ক্ষয়িষ্ণুতা ধীরে ধীরে নেমে আসছে—তা কি এরপরে সরকারের পক্ষে রোধ করা আর সম্ভব হবে? সরকার যেন নির্লিপ্ত দর্শক, তার কি কিছুই করণীয় নেই? শুধুই ফাঁকা বুলি, মিথ্যা আশা ও আশ্বাসের মত ভেল্কিবাজী, আর কাজের বেলায় বিরাট শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এভাবে আর কত দিন মানুষকে স্তোক বাক্যে ভুলিয়ে রাখা যাবে? সহরে বহুতল বিশিষ্ট ফ্ল্যাট বাসিন্দা ও অন্যান্য এলাকায় যেখানে ডিপ্-টিউবওয়েলের সাহায্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা চালু আছে সেই এলাকার বাসিন্দারা এই প্রচণ্ড গরমে জলকষ্টে ম্রিয়মান ও এই অবস্থা আর কিছুদিন চললেই জলাভাবে কোলকাতায় কলেরা ও অন্যান্য মারাত্মক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাবে ফলে মড়ক অবশ্যম্ভাবী। সরকার কি এই বিপদের কথা একবারও চিন্তা করছেন না?

কোলকাতা শহরের মানুষরাই তো ভোট দিয়ে এই সরকারকে গদীতে বসতে সাহায্য ও সহযোগীতা করেছে—তবে কেন দিনের পর দিন কোলকাতায় এই অপরিসীম জলকষ্ট বিদ্যুৎ ঘাটতির ফলে? সরকার কি শুধুই কর নেবার মালিক? প্রতিকারের কেউ নয়? কলিকাতা

করপোরেশন এখন সরকারের পরিচালনাধীন, তবু এত বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যস্ত অবস্থা কেন? পানীয় জলের এত ব্যাপক ও বিশাল অভাব নাগরিক জীবনকে বিপদগ্রস্থ করবে—তা কি সরকার জেনেও না জানার ভাণ করছে — ফল বিষময়, সরকার হুঁসিয়ার—সন্তের সীমা প্রায় অতিক্রান্ত হতে চলেছে—আর কতদিন এই ফাজলামি বরদাস্ত হয়? শহরের বস্তিবাসীরা সবচেয়ে বেশী বিব্রত ও সংকটের সম্মুখীন—এই সর্বহারাদের কে বর্তমান তীব্র জলকষ্ট হতে রক্ষা করবে? বস্তীবাসীদের ওপর সরকার এত হৃদয়হীন কেন? কি এদের অপরাধ? কেন এই বৈষম্যমূলক সরকারী আচার ও আচরণ? বস্তীর মানুষরা সরকারের নিষ্ক্রিয়তায় বিমূঢ়, ব্যথিত ও চরম হতাশ।

পশ্চিমবঙ্গে বিরাট ও ব্যাপক লোডশেডিং প্রাত্যহিক ব্যাপার এবং ফলে ক্ষেতে-খামারে, হাটে-বাজারে, গ্রামে-গঞ্জে, কলে-কারখানায়, অফিস-কাছারীতে, স্কুলে-কলেজে, গ্রন্থাগারে-গবেষণাগারে, ট্রেনে-ট্রামে, বিশ্ববিদ্যালয়ে-মহাফেজখানায়, ঘরে-বাইরে, রাস্তা-ঘাটে, শ্মশানে-কবরখানায়, হোটেল-রেস্তোরায়, বাসষ্ট্যাণ্ডে-ষ্টেশনে, এক কথায় সর্বত্র যখন তখন ধীরে অন্ধকার নামে, অকস্মাৎ শুষে লয় সবটুকু আলো। কর্মচঞ্চল এলাকা হঠাৎ কর্মহীন স্থাণুবৎ হয়ে পড়ে—মানুষ বিরক্ত হয়—সরকারকে অভিশম্পাৎ দেয়—আর কপাল চাপড়ায়। এই দুরবস্থা দৈনন্দিন এবং যত্র-তত্র—কখনও কখনও সর্বত্র। পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার পড়া-লেখা করতে পারে না, শ্রমিকরা কর্তব্যকর্মে ব্যর্থ হয়, কারিগরা কলম থামায়, বিভিন্নকর্মে কর্মরতরা কর্মে ইতি টানে অর্থাৎ যেখানে যা সচল সবই অচল হয়ে পড়ে, এমনি বিদ্যুৎ মাহাত্ম্য। বিদ্যুৎ বিনা সবই একদম অচল, ফলে অর্থনৈতিক অবস্থাও বিকল। পশ্চিমবঙ্গ আজ ভিখারীদের আবাসভূমি হতে আর বিলম্ব নেই। কর্মই জীবন, কর্মহীনতাই মৃত্যু। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ ঘাটতির ফলে কর্মহীনতা পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করেছে—ফলে এদেশ আজ মৃত্যুপথ যাত্রী। এর জন্য দায়ী কে? নিঃসন্দেহে বামফ্রন্ট সরকার, কারণ এই সরকার গদীতে বসার পর থেকেই এই দারুণ অচলাবস্থা চালু হয়েছে। ইতিপূর্বে শ্রীমতী গান্ধীর আমলে, বিশেষ করে জরুরী অবস্থার ১৯ মাস কালে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ ঘাটতি মোটেই ছিল না; যদিও ক্বচিৎ কখন তা কোথাও দেখা গেছে সে ক্ষণকালের জন্য; এমন দীর্ঘস্থায়ী ও নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল না, হলফ নিয়ে বলা যায়। কিন্তু এখন বিদ্যুৎ এখন ঘাটতি বিরাট দৈত্যের আকার নিয়ে মানুষকে আতঙ্কগ্রস্থ করে তুলেছে। বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্য পশ্চিমবঙ্গে এখন মন্বন্তর দেখা দেওয়ার উপক্রম পরিলক্ষিত হয়। জ্যোতিবাবু এই মন্বন্তর ঠেকাতে যদি নাই পারেন, তবে গদী ছাড়েন না কেন? অথবা তাঁর দলের অন্য কোনও ব্যক্তিকে বিদ্যুৎমন্ত্রী করেন না কেন? কি এর জবাব? তিনি যখন সামলাতে অপারগ তখন ব্যর্থতা স্বীকার করে গদী ছাড়লেই তো তাঁর মান বাঁচে। পারিও না ছাড়িও না—এ কেমন কথা? হয় তিনি ভালভাবে চালান না হয় তিনি দয়া করে পশ্চাৎ অপসরণ করুন। সেটাই হবে প্রকৃষ্ট পন্থা—অন্য পথ খোলা নেই। বিদ্যুতের অভাবে পশ্চিমবাংলার বেকারদের চাকরী হওয়া কি সম্ভব?

(চলবে)

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শচীন্দ্রনাথ রাজপুতনার এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে দিল্লী এসে পৌঁছলেন। দলেরই এক বিপ্লবী যুবকের বাসায় অতিথি হলেন। কথা ছিল দিল্লীতেই পিংলের সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু তা না হওয়ায় এখানে কোন কাজই হোল না। এর দুই একদিনের মধ্যেই খবরের কাগজে শচীন্দ্রনাথ দেখলেন পিংলে মীরাটে ধরা পড়েছে। এদিকে শচীন্দ্রনাথও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রায় পনের দিন শয্যাগত ছিলেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে নিমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। ফলে শচীন্দ্রনাথকে একটু সুস্থ হওয়ামাত্রই দিল্লী ছাড়তে হল।

ওদিকে পাঞ্জাবে তোড়জোড় করে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বিচারের নামে যা হয়েছে তাকে বিচারের প্রহসন বলা চলে। আদালতে বিচারকালে আলা সিং নামে এক শিখ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যেভাবে সনাক্ত করা হচ্ছে তাতে আপত্তি করলেন। শুধু এই অপরাধের জন্যই তাঁকেই ত্রিশ ঘা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় পাঞ্জাবের কোথাও থেকে অথবা ভারতের কোথাও থেকে এর এতটুকু প্রতিবাদ করা হয় নাই। কর্তার সিং বিচারকালে সমস্ত অপরাধ অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করেন। সকল অপরাধ তিনি নিজের স্কন্ধে তুলে নেন। কিন্তু ইংরেজ বিচারক প্রথম দিন তার কথা লিপিবদ্ধ করেননি। তিনি কর্তার সিংকে বুঝিয়ে বলেন যে তিনি যে অপরাধ স্বীকার করছেন তার ফল তার পক্ষে খারাপ হবে। কিন্তু সে সত্ত্বেও কর্তার সিং তার মত পরিবর্তন করেন নাই। ২১শে ফেব্রুয়ারী এবং তাহার আগে পরের সকল ঘটনার দায়িত্ব তিনি বীরের মত স্বীকার করে নেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও ইংরেজ জজ কর্তার সিংকে ডেকে বললেন, 'কর্তার সিং আজ আমি তোমার কোন কথাই শুনলাম না তোমায় আরও একদিন সময় দিলাম, ভাল করে ভেবে চিন্তে কাল যা বলবার বলবে।' কিন্তু পরদিনও কর্তার সিং পূর্বদিনের কথাই পুনরাবৃত্তি করলেন। কোন রকম উত্তেজনা নাই, কোন রকম বীরত্ব প্রদর্শনের চেষ্টাও নাই। তিনি শান্তভাবে সকল কথা বলে গেলেন। কর্তার সিংয়ের সেদিনের শান্ত বীরত্বে সবাই মুগ্ধ হল। ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসে কর্তার সিংয়ের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সত্যই কর্তার সিং বিপ্লবী ভারতকে স্মরণীয় করে রেখেছেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় লাহোরের ডি, এ, ভি কলেজের অধ্যাপক ভাই পরমানন্দও ধরা পড়েন। বিচারে তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় লাহোর জেলে অবস্থানকালে তিনি কর্তার সিংয়ের পাশের কক্ষেই ছিলেন। প্রায় সকল বিপ্লবী অপরাধীই এক ব্যারাকে আবদ্ধ ছিলেন। রাত্রিকালে তারা নিজ নিজ কুঠরীতে আবদ্ধ থেকে পরস্পরের সঙ্গে গল্প গুজব করতেন।

রাজপুতনার যে যুবকের সঙ্গে শচীন্দ্রনাথ দিল্লী যান তার নাম প্রতাপ সিং। প্রতাপ সিং রাজপুতনার চারণ বংশোদ্ভূত। এই বংশ উদয়পুরের রানার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় প্রথমে প্রতাপ ধরা পড়েন। সঙ্গে প্রতাপের ভগ্নীপতিও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে আদালত কোন প্রমাণ না পাওয়ায়

সে যাত্রা দুজনেই নিষ্কৃতি পান। শুধু প্রতাপ নয় প্রতাপের পিতা কেশরী সিং-জীও বিপ্লবী দলভুক্ত ছিলেন। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার অল্পদিন পরেই কোটাতে এক রাজনৈতিক মামলায় কেশরী সিংজী গ্রেপ্তার হন। এই মামলায় তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রতাপের এক কাকার নামেও ওয়ারেন্ট ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন নাই। কেশরী সিংজী এবং ঐ ভ্রাতার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। এ ছাড়া আরও এক ভ্রাতার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয় যিনি কোনদিন রাজনীতির ধার দিয়াও যাননি ফলে সিংহ পরিবার সমৃদ্ধি-সম্পন্ন জমিদারের অবস্থা থেকে একেবারে পথের ভিখারী হয়ে পড়েন। প্রতাপের জননীর দুঃখের অবধি রইল না। আজ এক আত্মীয়ের নিকট কাল এক আত্মীয়ের নিকট থাকেন। শেষ পর্য্যন্ত পতিগৃহ ত্যাগ করে পিতৃগৃহে আশ্রয় নেন। এই সকল বিপদের মধ্যেও প্রতাপ অকুণ্ঠিত চিত্তে বিপ্লবী দলে কাজ করতে থাকেন। তার মনে কোনরূপ শোচনা ছিল না। কোন সঙ্কোচ বা গ্লানি ছিলনা। তিনি আনন্দের সঙ্গে পিতার অভিপ্রেত প্রিয়কার্য্য করে যাচ্ছিলেন। তার মনপ্রাণ আনন্দে ও গর্বে ভরপুর ছিল। শুধু যে প্রতাপ নিজেই কেবল আনন্দে থাকতেন তা নয় তার সাহচর্যে যারা গিয়েছেন তারাও আনন্দ পেয়েছেন। তবে দুই এক সময় তাকে বিষন্ন অবস্থায়ও দেখা যেত।

প্রতাপ ধরা পড়লে পুলিশ অনেকদিন পর্য্যন্ত নানারূপ প্রলোভন দেখিয়ে সমস্ত গোপন কথা প্রকাশ করে দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। ওরা প্রতাপকে বলে গোপন কথা প্রকাশ করলে শুধু প্রতাপকে নয় তার পিতাকেও ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তার কাকার নামেও মামলা তুলে নেওয়া হবে। তাদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে এছাড়া কিছু পুরস্কারও দেওয়া হবে। তারা প্রতাপকে বুঝায় তার জননী এখন যে দুঃখভোগ করছেন মামলায় প্রতাপ দণ্ডিত হলে তার অবস্থা আরও শোচনীয় হবে। এই আঘাত তিনি সহ্য করতে পারবেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতাপ দৃপ্তভাবে বলেন আমি স্থির করেছি কোন কথাই প্রকাশ করব না। এখন তো কেবল আমার একার মা-ই কষ্ট পাচ্ছেন কিন্তু আজ আমি যদি সব কথা প্রকাশ করে বলি তখন ঠিক আমার মার মতই আরও কত লোকের মা-ই কষ্ট পাবেন তার কথা কে ভাবছে। আমার একটি মার পরিবর্তে আরও কত মাকে সেদিন এইভাবে হাহাকার করতে হবে। শেষ পর্যন্ত প্রতাপ কাশী ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হয়ে ছিলেন শাস্তি ভোগ করতে করতে বেরিলি জেলে তার মৃত্যু হয়। প্রতাপের বয়স তখন বাইশ বৎসর।

প্রতাপকে সঙ্গে নিয়ে শচীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে এলেন। শচীন্দ্রনাথ তখন বিষম জ্বরে ভুগছেন। বাংলাদেশের বিপ্লবীদের একটি কেন্দ্র ছিল চন্দননগরে। শচীন্দ্রনাথ এখানে এসে উঠলেন এবং প্রায় দিন—পনেরো জ্বরে ভুগলেন। প্রতাপ, শচীন্দ্রনাথকে চন্দননগরে রেখে রাজপুতানায় চলে গেলেন। দুজনের মধ্যে কথা হল শচীন্দ্রনাথ একটু সুস্থ হলেই রাজপুতানায় যাবেন এবং সেখানে দুজনে মিলে একটা শক্তিশালী বিপ্লবের কেন্দ্র গড়ে তুলবেন। কিন্তু এরপরে দুজনের যখন আবার দেখা হ'ল তখন তারা দুজনেই কাশী ষড়যন্ত্র মামলা উপলক্ষে জেলে।

শচীন্দ্রনাথ যখন চন্দননগরে জ্বরে ভুগছিল

তখন পূর্ববঙ্গের নেতা নগেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে গিরিজা দত্ত প্রায়ই চন্দননগরে যাওয়া আসা করতেন। কয়েকটি ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে পূর্ববঙ্গের নেতারা অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় বিপ্লবীদল পরিচালনার ভার নগেন্দ্রনাথের উপর পড়ে। নগেন্দ্রনাথ দক্ষতার সহিত দল পরিচালনা করছিলেন। শচীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হয় রাসবিহারীকে আর ভারতে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। এযাবৎ নানা কারণে তিনি রক্ষা পেয়ে এসেছেন এখন ভারতে তাকে নিরাপদে রক্ষা করা সম্ভব নয়। বিপ্লবী দল আঘাতের পর আঘাত পেয়ে প্রসার লাভ করবার সুযোগ পাচ্ছিল না। প্রথমে দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার আঘাত। এ আঘাত সামলাতে প্রায় এক বছর যায়। কিন্তু আঘাত সামলিয়ে দল যখন সরকারকে পুনরায় আঘাত করবার শক্তি সামর্থ অর্জন করল। সেই সময়েই আবার লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হ'ল। এই আঘাতে পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশের বিপ্লবীদল প্রায় ভেঙ্গে যায়। বাংলা দেশেও বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলার ফলে দলকে কম আঘাত সহ্য করতে হয়নি তবুও বাংলার বিপ্লবীদল সরকারের সঙ্গে একটা পরোক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত এ সংগ্রাম বন্ধ হয় নাই। এ অবস্থায় রাসবিহারীকে ভারতে রাখা সঙ্গত নয় বলেই তুজনে মনে করলেন। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার পর রাসবিহারীকে ধরিয়ে দেবার জন্য ৭৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এরই বছর খানেক পরে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় কেবার রাসবিহারীর কার্যকলাপ প্রকাশ হয়ে পড়লে পাঞ্জাব গভর্মেন্ট তাকে ধরিয়ে দেবার জন্য ২৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেন। এরপরে বারাণসী ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হইল যুক্ত প্রদেশ গভর্মেন্ট আরও ২৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেন। সবমিলে রাসবিহারীকে ধরিয়ে দেবার জন্য পুরস্কারের টাকা ১২৫০০ টাকায় দাঁড়ালো। সুতরাং রাসবিহারীকে আর ভারতে রাখা সমীচীন নয়।

এতদিন পর্য্যন্ত বিপ্লবীদল মনে করছিলো সরকারের সঙ্গে পরোক্ষ সংগ্রাম তাদের বহুদিন চলবে। প্রকৃত বিপ্লব আরম্ভ হতে বিলম্ব আছে। তাই বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করবার বিশেষ কোনো চেষ্টা হয়নি। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভে বিপ্লবীদল যখন উপযুক্ত পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র হাতে থাকলে দেশে বিপ্লব আরম্ভ করতে বেশী বিলম্ব হবে না। তাই বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করবার জন্য রাসবিহারীর বাইরে যাওয়া প্রয়োজন। রাসবিহারীও বিদেশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি বললেন, "এবার ভারতের প্রত্যেক যুবক যুবতীকে সশস্ত্র করতে হবে, তারপর দেখা যাবে ইংরেজ কেমন করে ভারত শাসন করে।"

রাসবিহারীর নিকট যখন বিদেশ যাওয়ার প্রস্তাব করলেন তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি আরও কিছুদিন পরে বাইরে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাকে যখন সমস্ত দিক বুঝিয়ে বলা হ'ল তিনি শচীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথের মত অগ্রাহ্য করলেন না। কবে, কেমন করে, কোন পথে যাওয়া হবে তাই তিনজন মিলে ঠিক করলেন। কথা হ'ল বিদেশে গিয়েই রাসবিহারী যথেষ্ট পরিমাণ মূল্যে পিস্তল এবং তার গুলি পাঠিয়ে দিবেন এবং পরে বিপ্লবিক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য যথেষ্ট পরিমান অস্ত্র-শস্ত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। (চলবে)

একে একে নিভিছে দেউটি

বিপ্লবজগতের আর একটি নক্ষত্র অস্তমিত হলো। আমাদের অগ্রজপ্রতীম অতীনদা চলে গেলেন। আজীবনের স্বদেশসাধনায়, বিপ্লবী প্রাণের ষোড়শোপচারে তিনি দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ আরাধনায় ব্রতী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের ইতিহাসে একটি অধ্যায়ের অবসান হলো।

অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অতীন রায়ের জন্মভূমি তথা কর্মক্ষেত্র পূর্ববঙ্গ, অধুনা বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশের কুমিল্লা শহরে তাঁর বিপ্লবী জীবনের সূচনা। আজীবনের বিপ্লবসাধনার সমাপ্তিও এখানেই—মহানির্বানের পথে। জীবনে অসংখ্যবার জেল খেটেছেন, অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের কোন নগ্নতাই তাঁকে পরাভূত ক'রতে পারেনি। দেশসেবার অটল আদর্শ থেকে বিচ্যুত ক'রতে পারে নি। জীবন-পরিক্রমার প্রতিটি মুহূর্তে এই আদর্শ তাঁর কর্মধারাকে পথ দেখিয়েছে, তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এনেছে শক্তির সঞ্চার। এরই প্রেরণায় তিনি অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার অগ্রণী হয়েছেন। মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন আর. এস. পি দল গঠনের তাঁর জীবনটাই ছিল চলমান। গান্ধীজীর মতো, নন্দলাল বসুর যে 'একলা চলো রে' ছবি, তার মতো।

বিপ্লবী অতীন রায়ের মতো, মানুষ অতীনদাও ছিলেন তাঁর সতীর্থ ও অনুজ বিপ্লবীদের অনেক কাছের মানুষ। ইংরেজের জেলে কিংবা জনসমুদ্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটার মুহূর্তে তিনি বিপ্লবীদের পাশে থেকেছেন পরম আশ্বাসের মতো, দৈবী প্রেরণার আয়ুজো। অসংখ্য প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁর সংগ্রামী চেতনা উদ্দীপিত করেছে, উজ্জীবিত করেছে সহযোদ্ধাদের। দেশবিভাগের পরেও এই দেশপ্রেমিক তাঁর আবাল্যের জন্মভূমিকে ত্যাগ করেননি, শত দুঃখকষ্ট ভোগ করেও পূর্ববাংলার ছোট শহর কুমিল্লাতে সাদাসিধে জীবন কাটিয়ে গেলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তাঁর একমাত্র পুত্র বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানীদের গুলিতে নিহত হন—এক কন্যা বর্তমান আছেন।

আমরা, অনুশীলন সমিতির তথা সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষ থেকে এই আজীবন-মহান বিপ্লবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। অতীনদার আত্মা শান্তি লাভ করুক।

RegdNo. R. M. 24911/71 | Diplabi Bangla | Regd. W B/NC 77
Phone : 34-1795
পাক্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | বাষ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

6/30

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী।
সম্পাদক—শ্রীমতি শরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতালা—শ্রীমধুগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীদীপু গুহ।
দিপালী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বন্ধুরাম ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

বিপ্লবী বাঙালী

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭৯

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ১৪ই বৈশাখ, ১৩৮৬ ২৮শে এপ্রিল, ১৯৭৯	২৮ সংখ্যা

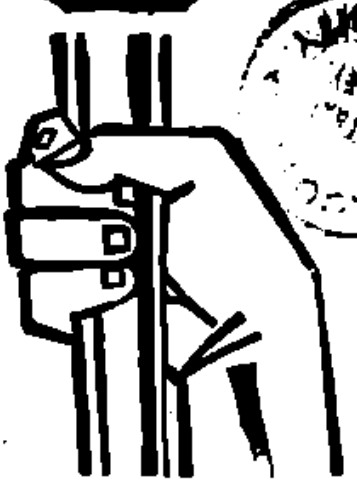

এই সংখ্যায়

জামসেদপুর
। সম্পাদকীয়

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস
। ক্ষিতীশ রায়

অন্তবিহীন রয় যে অন্ধকার
। শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক মলিনী মোহন দাশগুপ্ত

ইরান
। কাদীশ সরকার

বিপ্লবীর জীবন দর্শন
। হরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভুট্টোর ফাঁসি কোন দৃষ্টিতে দেখতে হবে
। ব্রজেন দাস

মানুষ হও। অমনি দেখবে, ওসব বাকি আপনা আপনি সড় গড়িয়ে আসছে। পরস্পরের নেড়ি কুত্তোর খেয়োখেয়ী ছেড়ে দন্দ্বেদ্বেষ সদুপায়ে সৎসাহস, সবীর্য অবলম্বন কর।

—স্বামী বিবেকানন্দ

সম্পাদকীয়—

জামসেদপুর

সম্প্রতি জামসেদপুরে যে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, অগ্নিসংযোগ ও খুনখারাপির চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে, তার দ্বারা জাতীয় সংহতি ও দেশের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবার সম্ভাবনাকে পরিস্ফুট করে তুলেছে। এটা অবশ্য একটি পুরাণো ব্যাধির পুনরাবির্ভাব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই ব্যাধির আক্রমণ প্রকোপে ভারতবর্ষ বহুদিন ধরে ভুগছে, সেটাও একটা ইতিহাস। কিন্তু এই ব্যাধিকে নির্মূল করা গেল না এতদিনে, বরং প্রবলতর ও ব্যাপকতরভাবে এর প্রাদুর্ভাব ঘটছে, এটাই উদ্বেগের কথা। জনতা সরকার এ ব্যাপারে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, এসম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মোকবিলা করতে না পারলে, সে আগুন ত ছড়িয়ে পড়তে পারে আরো ব্যাপকভাবে, এটাই রীতিমত আশঙ্কার কথা।

দেশের মধ্যে যে কয়েকটি অশুভশক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তার মধ্যে প্রধান দুটি হল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও জাতিগতভাবে হরিজন ও অনগ্রসর জাতির উপর অত্যাচার। এদেশে বসবাসকারী মুসলমানেরা যেন অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে, সমাজ ও রাষ্ট্রের সবার সঙ্গে সামিল হয়ে একটি সুসংহিত উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন, প্রগতিশীল জাতিগঠনের কাজে ঠিকমত আত্মনিয়োগ করতে পারছে না। তারা যেন শুধু তাদের সম্প্রদায় নিয়ে ব্যস্ত। দেশের ভিতরে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ বিশেষ দাবী আদায়ের জন্য অশোভন আগ্রহ দেখান, এমন কি সেজন্য দাঙ্গাহাঙ্গামা করতেও পিছপাও হয়না। ফলে প্রতিক্রিয়া হিসাবে অন্য সম্প্রদায়ও সক্রিয় হয়ে উঠতে বাধ্য হন।

দুর্ভাগ্যক্রমে অতীতে কংগ্রেসের মধ্যে অতি উচ্চ-আদর্শ-নিষ্ঠ মহান্ নেতাদের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও এই ভাঙ্গনের মানসিকতাকে রুদ্ধ করা যায়নি। একথা অনস্বীকার্য্য যে পরদেশী ইংরেজ শাসকেরা তাদের সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য, হিন্দু, মুসলমান ও শেষ পর্য্যন্ত অনুন্নত সাম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিভেদের বীজ উপ্ত করেছিল এবং সযত্নে একটি বিষবৃক্ষ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। তখনকার নেতাদের ঐকান্তিকতাও চেষ্টা সত্ত্বেও, এই বিভেদের ক্ষেতটাকে সম্প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছিল শাসকরা। দেশের মানুষ আশা করেছিল উত্থানোদাতারা বিতাড়িত

হলে, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠাও সুদৃঢ় করার কাজ সহজ হবে। কিন্তু একটি ভুল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশটাকে খণ্ড-বিখণ্ড করা হয়েছিল স্বাধীনতালাভের আকাঙ্খায়। কংগ্রেসের মুসলিম তোষণ নীতি যে সর্বনাশা মানসিকতার সৃষ্টি করার কাজে ইন্ধন জুগিয়েছিল, এটা একটি ঐতিহাসিক সত্য বলে এখন প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে না চাওয়ার ফলেই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল। বিভেদকারীরা প্রচার করেছিল যে মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা ভৌগলিকসীমা নির্দ্ধারিত হলেই মুসলমানদের সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু কালক্রমে প্রমাণিত হয়েছে এই ধারণা কত ভ্রান্ত। পাকিস্তানে সাধারণ মুসলমানের সব সমস্যার সমাধানত হয়ইনি। হতেও পারে না। সকলের সঙ্গে যুক্ত না থেকে, সকলের সুখ-দুঃখের ভাগ না নিলে, এককভাবে এই উপমহাদেশে কেউ বাঁচতে পারেনা। আজও পাকিস্তানের অস্তিত্বই বিপন্ন করে তুলেছে পাকিস্তানীরা। কিন্তু দেখেশুনেও, এখানকার মুসলমানদের মতিগতির পরিবর্ত্তন ও চৈতন্যোদয় হচ্ছে না কেন? অবশ্য আমাদের বক্তব্য এটা নয় যে সব দোষই মুসলমানদের, তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী কেউ নেই। কিন্তু তাদের প্রভাব অতিক্রম করে, এদের মধ্যে একজন মানুষ আবার এই সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষদের বিপথে চালিত করতে সমর্থ হচ্ছেন কি করে? এটাই আমাদের প্রশ্ন।

এইখানে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে ভুল সরকারী নীতিও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। ভারতীয় সংবিধানের ত সব সম্প্রদায়ের ভারতীয়দের সমান অধিকার ও সুযোগ দেওয়ার বিধান রয়েছে। কোন বিশেষক্ষেত্রে কারো উপর অন্যায় অবিচার ঘটলে, তার প্রতিবিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু, তাই বলে বিশেষ কোন সম্প্রদায়কে, বিশেষ কোন সুবিধা ভোগ করতে দেওয়া যায় না, জাতীয় স্বার্থ এবং সংহতিকে ক্ষুন্ন করে। এদেশে হিন্দু, খ্রীষ্টান, জৈণ, শিখ, পার্শী প্রভৃতির জন্য এক আইন হবে, মুসলমানদের জন্য অন্যরকম আইন হবে কোন যুক্তিতে? এক বিবাহ যদি অন্য সাম্প্রদায়গুলির জন্য বাধ্যতামূলক হয় মুসলমানদের বহু-বিবাহ প্রথা চালু রাখতে হবে কেন? বারাণসী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় যদি দেশের আইনে চলতে পারি, তবে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা আইন চালু করার দাবী মানতে হবে কেন? এই ধরণের প্রশ্রয় যদি দেওয়া হয়, তবে এরা কি কোনদিন অন্যদের সঙ্গে একাত্মবোধ করে এখানে বসবাস করতে পারবেন? অতি সাম্প্রতিক কালে আমাদের সরকার একটি নতুন বিভাজনের সৃষ্টি করেছেন, অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য চাকুরী সংরক্ষণ করে। এই নীতি যদি মেনে নেওয়া হয়, তবে ক্রমে ক্রমে সব সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা সৃষ্টি হবে। এর দ্বারা একজাতি—গঠনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

রাজনীতিবিদরা মুখে যারা বিশ্ব-দুনিয়ার কথা বলেন তারাও ভোটের লোভে এই তোষণ নীতি অনুসরণ করেন। এর ফলে অন্যান্য সাম্প্রদায়ের লোকেরা যদি গোটা

দেশের ও জাতির স্বার্থভুলে গিয়ে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা দাবী তোলেন, তবে সরকার কি তা পূরণ করতে পারবেন? যদি না পারেন (পারা সম্ভবও নয়), তবে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে যদি এদের ভোট না দেন, তবে ভোটের যোগফল কি হবে, তা ভেবে দেখেছেন কি বর্ত্তমান রাষ্ট্রনায়কেরা এবং ভবী রাষ্ট্রনায়কেরা! সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে যদি বিভেদমূলক মানসিকতা প্রবল আকার ধারণ করে, তবে দেশ ও জাতির যে সর্বনাশ হবে, গদীর মোহে সেটা আজ না বুঝলেও, হাড়ে হাড়ে বুঝতে হবেই একদিন একাংশে "দিন ভয়ঙ্কর" খুববেশী দূরেও নয়। হৃদয়ঙ্গম না করল, ওদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হবে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে।

আমরা সকলেই অনুরোধ করি আগুণ-নিয়ে-খেলায় মেতে না উঠ্‌তে। তা হলে, সেই আগুনে পুড়ে ছারখার হতে হবে সবাইকে। আমরা বলি, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, রাসবিহারী বসু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য মনীষীদের প্রদর্শিত পথে চলতে শিখুন। ভারতবর্ষকে একটি বিশ্ব প্রেমিক, শক্তিশালী, মানব দরদী। সর্বজন কল্যাণকামী দেশরূপে গড়ে তুলবার কাজে অগ্রনিয়োগ করুন। কোন উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে পারলে, মানুষ যে ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উদ্দেশ্য লাভের জন্য, একসঙ্গে জীবন বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করতে পারে, তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ত নেতাজীর "আজাদ হিন্দ্" বাহিনী রক্তাক্ষরে লিখে গিয়েছে। কালের প্রয়াণ পথে, ভাঙ্গনের মহারথে, যে প্রলয়ের ধ্বংস নেমে আসছে, তাকে প্রতিহত করতেই হবে, পূর্বসুরীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধে, বর্ত্তমান কালের মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য বোধে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি কল্যাণ সাধনের প্রতিশ্রুতি পালন করার দায়িত্ববোধে। দেশের স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দিয়ে, ভারতের সব অঙ্গরাজ্য ও সম্প্রদায়গুলিকে একসূত্রে বেঁধে দেবার যে স্বপ্ন মারাঠাবীর শিবাজীর ছিল, তাকে বাস্তবায়িত করতে বদ্ধ পরিকর হতে হবে। নইলে কারো পরিত্রাণ নেই। অকৃত্রিম দেশপ্রেমই কেবল এই অসাধ্য সাধন করতে পারে। উদার এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে। এই দেশের অধিবাসী প্রত্যেককেই উর্দ্দু কবির কথা স্মরণ রাখতে হবে। তুম্ আগর চাইতে হো মুলুক কী খায়েব/ন কিছী হামে-ওতানকো সমঝো গায়ের" (দেশের যদি ভাল চাও ত স্বদেশের কাউকে পর ভেবনা)।

সবচেয়ে বড় কাজ হবে ভোট-সর্বস্ব রাজনীতি পরিত্যাগ করা। ভোটের মাধ্যমেই এই দেশে দুর্নীতির পঙ্কিল আবর্ত্ত সৃষ্টি হয়েছে। আবার সম্প্রদায় বিশেষের ভোটের আসাতেই যদি জাতির সর্বনাশ সাধন করা হয়, তবে দেশ ও জাতি দুইয়েরই অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। সাম্প্রদায়িক তোষণ নীতিকে অবশ্য পরিত্যাগ করতে হবে, অন্যথায় তোষণকারী ও তোষিত কেউ বাঁচবে না।

———

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

(১৯০০—১৯০১)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সেই একই অভিলাষ তিনি এখন বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের তাঁবে আনার পথে চলেছেন এবং এই ভাবে সমস্ত উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইছেন। তার বাঁধা বুলিই হচ্ছে কেবল দক্ষতা আর দক্ষতা। জনগণের মনোভাব ও মতামতের কোন মূলাই নেই। এই দক্ষতা অপদেবতা পূজার পাগলামি করে লর্ড জনমতকে প্রকাশ্য বিরোধিতায় টেনে আনলেন।

১৯০১ সালে লর্ড কার্জন সিমলায় একটি শিক্ষা সম্মেলন ডাকলেন। সেই সম্মেলনে কেবলমাত্র ইয়োরোপীয় শিক্ষাব্রতীদের আমন্ত্রণ জানান হল। এই সম্মেলন ছিল একটি গোপন সভা বিশেষ। এই সভায় কি আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা আজও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। তা হলেও এই সভায়ই লর্ড কার্জন ঘোষণা করেন: "ভারতে আগমণের কাল থেকেই আমার নীতির মধ্যে গোপনীয় বলে কিছু নেই। আর জনসাধারণের শিক্ষা বিষয়ে বলতে গেলে বলতে হয় যে এটা নিশ্চিতভাবেই এমন একটি বিষয় যে সেখানে গোপনতার নীতি প্রয়োগের ভাবনাও আমার মনে আসে না।" কথা এবং কাজের মধ্যে এর চেয়ে বড় রকমের ব্যতিক্রম আর কোথাও দেখা যায় নি। এটা একটা ধৃষ্টতা, নির্লজ্জতা। গোপনীয়তাকে তার এরূপ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করার মধ্যেই রয়েছে সেই ধৃষ্টতা। যে সময়ে এবং যে বিষয় প্রসঙ্গে তিনি একথা বলেছেন সেই বিষয় সম্পর্কে বলার সময়ই তিনি তার বক্তৃতা পূর্ণ ভাষায় ঘোষিত নীতিকে লংঘণ করতে সুপরিকল্পিত ভাবেই মনস্থির করেছিলেন। তবে হাঁ, এটা লর্ড কার্জনেরই রীতি: আর আমরা প্রাচ্যের অধিবাসীরা এই আচরণকে একটা আমোদজনক বিষয় বলে গ্রহণ করেছি, কারণ এই আচরণ এমন এক ব্যক্তির কাছ থেকে প্রকাশ পেয়েছে যিনি প্রাচ্যে যে সমস্ত অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের নীতিবোধ আছে তার উপরেই দাঁড় করিয়ে পাশ্চাত্যের নীতিবাদকে উচ্চে তুলে ধরেছেন।

এই শিক্ষা সম্মেলনের পরেই একটা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের নাম যখন ঘোষণা করা হল তখন দেখা গেল যে এর ভিতরে একজনও হিন্দু সদস্য নেই। অথচ আমরা হিন্দুরাই শিক্ষা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী চিন্তা-ভাবনা করে আসছি ও আগ্রহ প্রকাশ করেছি। হিন্দুদের এইভাবে কমিশন থেকে বাদ দেওয়ায় আমি "বেঙ্গলী" পত্রিকায় জোরাল প্রতিবাদ করি। ভারতের জনমত-বাহী সমস্ত পত্রিকাই আমার অভিমতের সঙ্গে একমত হয়। ফলে পরে মিঃ জাষ্টিস্ গুরুদাস বানার্জিকে কমিশনের একজন সদস্য করে নেওয়া হয়।

পাঁচ মাসের কম সময়ের মধ্যেই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হল। ১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশনের কিন্তু তাদের সুপারিশ প্রকাশ করতে আঠারোমাস সময় লেগেছিল। আর এই রিপোর্টই

হল একটা আতঙ্কজনক কর্ম-কসরৎ। এটা বলা অতিরঞ্জন হবে না যে এই রিপোর্ট ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত শিক্ষিত সমাজকে খুঁচিয়ে উত্তেজিত করে তুললো। এই রিপোর্ট ভারতের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষেই এক বিপদ বলে মনে হল। ১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশনের নীতিকে এই রিপোর্ট সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে। এই রিপোর্টে যা যা সুপারিশ করা হয় তা হল এই: (১) দ্বিতীয় স্তরের কলেজগুলিকে তুলে দেওয়া। এই দ্বিতীয় স্তরের কলেজগুলিই কিন্তু বাংলাদেশে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী (২) আইনের ক্লাশগুলি বন্ধ করে দেওয়া (৩) সিণ্ডিকেট কর্তৃক কলেজের ন্যূনতম বেতনের হার নির্ধারণ। এর প্রকৃত অর্থ হল কলেজ ফি'র পরিমাণ বৃদ্ধি। দক্ষতার মান বাড়াবার জন্য উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করাই এর উদ্দেশ্য।

কমিশনের অধিকাংশ সদস্যের অভিমত অনুযায়ী রচিত এই রিপোর্টের মধ্যে ভারতীয় আইনজীবীদের প্রতি বিদ্বেষের ভাব খোলা-খুলি ও অপ্রচ্ছন্নভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে "আইনের ক্লাশগুলি তুলে দিলে অনেক ক্ষেত্রেই আইন শিক্ষার্থী ছাত্রদের খরচ বেড়ে যাবে; তবে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বৃত্তি পাবে: আর এমন কি মোট ফলও যদি এই দাঁড়ায় যে ভারতের আইনজীবিদের সংখ্যা কমে যাবে, তাহলেও তা যে অবিমিশ্র সন্দেহ হবে তা আমরা নিশ্চিতভাবে মনে করিনা।" ভারতে সরকারী গোষ্ঠীর মনোভাবের মধ্যে আইন ও আইনজীবীদের প্রতি এই বিদ্বেষ ছিল একটা স্থায়ী লক্ষণীয় বিষয়। তাদের এই মনোভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময় "পাইওনিয়ারে" পত্রিকার স্তম্ভে যে সব মন্তব্য করা হয় তারমধ্যে প্রকাশ পায়। ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের উনিশ জন নির্বাচিত সদস্য যুদ্ধোত্তর কালে শাসন সংস্কার সম্পর্কে যে পরিকল্পনা দাখিল করেন, তাতে যে উনিশ জন স্বাক্ষর করেছিলেন তার মধ্যে আইনজীবিদের অভিমতই ছিল প্রবল। "পাইওনিয়র" এই বিষয়টির উপর বিরূপ মন্তব্য করেন।

এটি লক্ষ্য করার বিষয় যে কমিশনারগণ নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে তারা যে প্রস্তাব দিয়েছেন তার ফল হবে জনগণের উচ্চশিক্ষার অধিকার হ্রাস করা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রকেও সঙ্কুচিত করা।

বলা বাহুল্য মিঃ ভাষ্টিস গুরুদাস ব্যানার্জি তার তীব্র বিরোধিতা লিপিবদ্ধ করেছেন। উপরে যে কয়টি বিষয় উল্লেখ করেছি সে গুলি সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করেই তিনি উহার বিরোধিতা করেন। রিপোর্টে যে সুপারিশ করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে এক জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। একটি স্মারক লিপি প্রনয়ণ করা হল। টাউন হলে এক সভা আহ্বান করা হল। সে স্মারকলিপি রচনায় আমার বড় রকমের হাত ছিল। গভর্ণমেণ্টের কাছে সে স্মরকলিপি পেশ করা হল।

আন্দোলনটি বিফলে যায় নি। ভারত সরকার আংশিকভাবে জনমতকে স্বীকার করে নিলেন। ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে এক পত্র প্রকাশ করে সরকার ঘোষণা করলেন: "দেশের শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলির একটি সুনির্দিষ্ট স্থান দখল করে রয়েছে এবং সে কলেজগুলি প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করছে।" ল'ক্লাশগুলি তুলে দেওয়া সম্পর্কে ভারত সরকারের মত হল যে "প্রত্যেক

(এর পর ৭ পাতায় দেখুন)

বিপ্লবীর জীবন দর্শন

॥ দুর্গেশ ভট্টাচার্য্য ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের গ্রামের এই বাইচ্ খেলায় আশে পাশের গ্রাম থেকেও প্রচুর দল টিপ নিয়ে যোগ দিতে আসত। যারা প্রথম ও দ্বিতীয় হতো তারা পুরস্কার পেত।

একই সময়ে এই বালু নদীতে বাইচ্ খেলা ও তীরে মেলা বসত। চারদিক থেকে দলে দলে লোক এই আনন্দোৎসবে যোগ দিত। কি যে উত্তেজনা, কি যে আনন্দ তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য! আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই এখানে এসে জড়ো হ'ত।

এমনি একটা দিনে আমাদের গ্রামের প্রায় সবাই এই নৌকা বাইচ্ দেখতে চলে গিয়েছে—কেউ বড়ো একটা বাড়ি নেই। আমার বাবা সাধারণতঃ কোথাও যেতেন না তিনি বাড়িতে নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন দুর্গা দিনভিখারীর হাত ধরে বাড়ি ফিরছে-চোখে তার জল—সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছে। ওকে দেখতে পেয়েই বাবা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—একি দুর্গা? কি হয়েছে?

বাবাকে দেখেই দুর্গা আর চুপ করে থাকতে পারল না, চিৎকার করে কাঁদতে সুরু করল।

বাবা অনেক কষ্টে ওকে শান্ত করে জিজ্ঞাসা করল—কাঁদছিস কেন? বল না কি হয়েছে?

দুর্গা চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল—আমি আর পারব না, দা' ঠাকুর! তুমি তোমার ছেলেকে ফিরিয়ে নাও। কখন যে কি হয়ে যাবে, কি অঘটন যে ঘটে যাবে তা কে জানে? তখন মা আমায় উপর থেকে অভিশাপ দেবে—বলবে—তুই আমার ছেলেটাকে দেখে রাখতে পারলিনি, দুর্গা। আমি যে তোর হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম।

বাবা অধীর হয়ে বললেন—কি হয়েছে, দুর্গা! ব্যাপারটা খুলেই বল না?

দুর্গা—কি আর হবে! ঘন্টাখানেক হ'ল আমি দিনভিখারীকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তখনি আমার মনে পড়ল—ও নিশ্চয়ই বাইচ্ খেলা দেখতে গেছে? আমি দৌড়ে দৌড়ে নদীর ধারে এলাম—চারিদিকে খুঁজে ওকে দেখতে পেলাম না! অনেক খোঁজা-খুঁজির পর দেখি—ও পাড়ার অবিনাশ খুড়োর দস্যি ছেলেদের সাথে একটি ডিঙ্গি নৌকোতে উঠে লাফাচ্ছে আর বাইচ্ খেলা দেখছে। প্রমাদ গুণলাম, দা ঠাকুর—আমি পার থেকে চিৎকার করে বললাম—খ্যাপা, ও খ্যাপা—দিন ভিখারীকে আমার কাছে দিয়ে যা! চারিদিকের গণ্ডগোলে আমার চিৎকার যে কোথায় ভেসে গেল—তা কে জানে? তবু বোকার মত চিৎকার করতে লাগলাম—একটা অভাবনীয় আশঙ্কায় ও দুশ্চিন্তায়! এমন সময় বাইচের নৌকা প্রথম হওয়ার আশায় ছুটে আসছিল। এর বেগটা চট করে সামলাতে না পেরে ঐ অবিনাশ খুড়োর দস্যি ছেলেদের ডিঙ্গিটায় একটা ধাক্কা লাগিয়ে দিল—চোখের পলকে ডিঙ্গিটা ঘুরে গেল—ঝাঁকানির টাল সামলাতে না পেরে দিনভিখারী টুপ করে নদীর জলে পড়ে গেল! চারিদিক থেকে একটা বিরাট চিৎকার উঠল—চন্দ্রঠাকুরের ছেলেটা গো-চন্দ্রঠাকুরের ছেলেটা! আর ঝপাঝপ আট দশটা লোক নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল! আর আমি কিছুই জানি না—যখন চোখ খুললাম দেখি কি—তোমার দস্যি ছেলে আমার মাথায় একটু জল দিচ্ছে আর ডাকছে—দুর্গাদি ও দুর্গাদি—এই তো আমি এসেছি—আর সাথে সাথে ওর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল আমার মুখে

পড়ছে। আমি চোখ মেলেই আবার জ্ঞান হারালাম। তারপর—তারপর—এই তো আমি ওকে নিয়ে এসেছি।

বাবা দুহাতে দুর্গাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—কি করবি দুর্গা? অন্তের বোঝা বইবার জন্যই যে তোদের সৃষ্টি! জানি না—এর শেষ কোথায়? একটু থেমে বাবা আবার বললেন—যা দুর্গা কাপড়টা ছেড়ে আয়—গুরুদেব এসেছেন—প্রণাম করবি আয়।

আমাদের গুরুদেব ছিলেন শক্ত—লম্বা দেহ—ছয় ফুটের কম হবে না—গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ—বড়ো বড়ো চোখ—লম্বা কাঁচা-পাকা দাড়ি, চুল—সবই অত্যন্ত সযত্নে রক্ষিত। পরিধানে টক্‌টকে লাল ধুতি—গলায় উপবীত ও রুদ্রাক্ষের মালা। সুন্দর নিটোল দেহ। আমরা তাঁকে বেশ বৃদ্ধ বয়সে দেখেছি। তখনো তাঁর যা রূপ ও স্বাস্থ্য তা বড়ো একটা আজকাল দেখা যায় না। মাঝে মাঝেই তিনি চিৎকার করে উঠতেন—মা, করালী মা" বলে। সেই বজ্রগম্ভীর স্বরের ডাক শুনলে মনে হত—সত্যি বুঝি স্বর্গ থেকে কোন এক দেবতা মর্ত্যে নেমে এলেন—আমাদের পরিত্রাণ করতে।

সেকালে গুরুদেবের প্রতি ভক্তি ছিল অচলা। যখন তারা শিষ্যদের বাড়ি আসতেন, সবাই তাদের দেবতার মত ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। ক্ষমতা থাক আর নাই থাক দেবতার মত তাদের সাধন ভজন করতেন এবং তাদের সন্তুষ্ট করে শিষ্যেরা এত আত্মতৃপ্তি পেতেন যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি দুর্গা কাপড় ছেড়ে এসে উপস্থিত হ'ল। আমরা সবাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করতে চললাম।

আমরা সবাই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়ালাম, গুরুদেব আমাদের আশীর্বাদ করে বাবাকে ডেকে বললেন—চন্দ্র কুমার এবার তোমরা ঢাকা সহরে চলে যাও ছেলেদের মানুষ করতে হবে, শিক্ষা দিতে হবে। তাই এখানে থাকা তোমার আর উচিত হবে না। তুমি যত তাড়াতাড়ি পার ঢাকা সহরে বাসা ভাড়া করে চলে যাও।

এই নির্দ্দেশ দিয়ে গুরুদেব আমাদের বাড়ি থেকে বিদায় নিলেন। (চলবে)

(৪ পাতার শেষাংশ)

প্রদেশে একটি করে কেন্দ্রীয় কলেজ স্থাপিত হবে। তবে সেটি একটি আদর্শ কলেজ হবে এবং সেখানে কারও কোন এক চেটিয়া অধিকার থাকবে না।" সরকারের এই ঘোষণার উদ্দেশ্য যাই হোকনা কেন, কেবলমাত্র রিপন কলেজের আইনের ক্লাশগুলি ছাড়া কলকাতার আর সমস্ত কলেজেরই আইনের ক্লাশগুলি তুলে দেওয়া হল। কলেজের ন্যূনতম বেতনহার কি হবে সে সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট নীরব রইলেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশক্রমে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি (আমি বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই বলছি) বহুল পরিমাণে কলা ও বিজ্ঞান শাখার উচ্চতর শিক্ষাদানের কার্য্যভার নিয়ে আছে, যার ফলও বেশ প্রশংসনীয় হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার ও লেকচারারগণ নিয়মিতভাবে শিক্ষনীয় বিষয়ের উপর বক্তৃতা করার ফলে উচ্চ শিক্ষার প্রতি একটা ঝোক সৃষ্টি হয়। কিন্তু এসব হলে কি হবে, উচ্চ শিক্ষা লাভের ব্যয় বেড়ে গেল। তদনুপাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পদের কিন্তু কোন বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটল না; অথচ প্রধানতঃ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই ছাত্ররা আমাদের কলেজে পড়তে আসে। (চলবে)

No./3/2/79-FF(P)

Government of India/Bharat Sarkar

Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

New Delhi-110001, the 12 Apr. 1979

To

The President,

All Bengal Freedom Fighters Conference,

4, Ballavdas Street, Calcutta-700007

Subj :—Grant of pension to freedom fighters and their families under the Central Scheme

Sir,

I am directed to refer to your letter dated 22. 1. 1979 enclosing therewith a copy of resolutions passed by the All Bengal Freedom Fighters Conference held on 12. 12. 1978 at Calcutta, and to say that the resolutions at S. Nos. 5, 7, 9 and 10 concerning Central Freedom Fighters Pension Scheme have been looked into and the position is as under :—

The Ex-Andaman Political Prisoners have been given special consideration in view of known facts of their suffering with regorous and long term convictions and incarceration in the Cellular Jail in the Andamans. The number of living beneficiaries under the Andaman Scheme who are all very old is less than 200. Under the general Freedom Fighters Pension Scheme, However, the number of pensioners is more than one Lakhs Considering the less severity of the suffering in the mainland Jails and the very largo number of beneficiaries involved and in view of the difficult financial position it is regretted that it will not be possible to consider uniform enhancement of pension from Rs, 200 to Rs. 500 per month in the case of all mainland freedom fighters.

Regarding demand for removal of income limit of Rs. 5000 it may be stated that the pension under the Scheme is an ex-gratia payment and it is meant to help maximum number of freedom fighter who are poor and needy within the limited resources available to Govt. A ceiling on income has therefore been fixed and it is not possible either to relax or eliminate it.

As regards resolution to grant pension to the widows equal to the amount of pension sanctioned to freedom fighters, the matter has already been examined but it has been felt that it not desirable to give equal pension to a freedom fighter and also to the family of the deceased freedom fighter. Some differentiation in the scale of pension between the two categories has to be maintained.

Yours faithfully,

Sd / Illegible

(A. V. S. KRISHNAN)

Under Secretary to the Govt. of India

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কাশীথেকে রাসবিহারী বিনায়ক রাও কাপ্‌লেকে সঙ্গে নিয়ে প্রথম দিকে নবদ্বীপে এসেছিলেন। বিদেশ যাত্রার আগে পর্যান্ত নবদ্বীপেই তিনি ছিলেন বিদেশ যাত্রার দিন চারেকের আগে তিনি চন্দননগরে আসেন এবং একদিন দুপরে শচীন্দ্রনাথ এবং গিরিজাবাবু দুজনে মিলে গিয়ে তাকে জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে আসল. এটা ১৯২৫ সালের ১২ই মে। শচীন্দ্রনাথ এবং রাসবিহারী একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে এবং গিরিজাবাবু আর একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে জাহাজ পর্য্যন্ত যান। পথে রাসবিহারী শচীন্দ্রনাথকে কাছে টেনে নিয়ে ঘাড়ে হাত দিয়ে স্নেহ ভরে বললেন "ভাই দেশ ছেড়ে যেতে আমার যে কি কষ্ট হচ্ছে তা তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারছি না, তুমো খুব সাবধানে থেকো ভাই। দেশের কাজ একটু গুছিয়ে নিয়েই "তুমিও আমার কাছে চলে এস।" দুজনের মধ্যে এরপরে আর কোন কথা হয়নি। এর অল্পদিন পরেই বারাণসী ষড়যন্ত্র মামলা উপলক্ষে শচীন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হল এবং রাসবিহারী জাপানে গিয়ে বিপ্লবের উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত হল।

এই সময় ঠিক ছিল যে ভেঙ্গেপরা সংগঠন একটু গুছিয়ে দিয়ে শচীন্দ্রনাথও বিদেশে গিয়ে রাসবিহারীর সঙ্গে যোগ দিবেন। কারণ শচীন্দ্রের নামেও তখন ওয়ারেন্ট বেরিয়ে গিয়েছে এবং দেশে থাকলে তাঁর গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনা। কিন্তু এর অল্পকিছদিন পরেই শচীন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন এবং কাশী ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। রাসবিহারী ভারত ত্যাগ করার সময় এই পরিণতি সম্পর্কে কারও জানা ছিলনা। রাসবিহারী যখন জাপান চলে যান তার আগেই তিনি শচীন্দ্রনাথের মার কাছ থেকে এই মর্মে এক প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন যে বিদেশে যাবার খরচ হিসাবে তিনি শচীন্দ্রনাথকে একহাজার টাকা দেবেন। শচীন্দ্রনাথ যে গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব কার্য্যে লিপ্ত আছেন একথা তাঁর মা ভালো করেই জানতেন এবং এ বিষয়ে তাঁর সহানুভূতিও ছিল।

যে সময় রাসবিহারী গোপনে জাপান চলে যান তখনও বিশ্বযুদ্ধ ভীষণভাবেই চলছিল। সহজ পথে বিদেশে যাওয়া এবং বিদেশ থেকে আসা খুবই কঠিন ছিল। রাসবিহারীর মত ফেরার বিপ্লবীর পক্ষে গোপন পথে এই যাতায়াত কম বিপদজনক ছিলনা। ফেরার অবস্থায় রাসবিহারীর কাছে সবসময়ই গুলিভরা পিস্তল থাকত এবং রক্ষক হিসাবে কেউ না কেউ তাঁর সঙ্গে থাকতেন। সুতরাং তাঁর জীবিত ধরা পড়ার সম্ভাবনা খুব কম ছিল সর্বোপরি তিনি ভগবানের অনুগ্রহের উপরই বেশী নির্ভর করতেন। জাপান যাত্রার আগে কাশী থেকে কলকাতা আসার সময় তিনি রিভলবার নিতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। রাসবিহারীর দেহ কিছুটা স্থূল ধরণের ছিল। সবার ধারণা ছিল তিনি দৌড়িয়ে পালাতে পারবেন না

তিনি নিজেও একথা জানতেন। একবার তাঁকে একথা জিজ্ঞেস করাও হয়েছিল। তিনি হেসে হেসে উত্তর দিয়েছিলেন যে দৌড়িয়ে পালানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হবেনা। কিন্তু পরমায়ু শেষ না হলে তিনি ধরা পড়বেন না। অর্থাৎ তাঁর জীবন থাকতে তিনি ধরা পড়বেন না।

১৯১৫ সালের মে মাসে রাসবিহারী জাপান যান। জাপানে গিয়ে তিনি জাপানী জনসাধারণের সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই হৃদ্যতা করে নেন। এদেশে থাকতে তিনি ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিরোধিতা করতেন কিন্তু ইংরেজদের বাঙলা পড়াতেন। জাপানে গিয়েও তিনি জাপানী নাগরিকদের ইংরেজী পড়াতে আরম্ভ করেন। ঐ সময় জাপানে এশিয়ান রিভিউ নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। কিছুদিনের মধ্যেই রাসবিহারী তার সম্পাদক হলেন। এছাড়া জাপানের বিভিন্ন স্থানে তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে বক্তৃতাদি দিতেন এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখতেন। জাপানে পদার্পণ করবার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বন্দী হতেন কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে টোয়ামা নামে এক বৌদ্ধ পুরোহিতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় তিনিই সমস্ত বিপদ আপদ থেকে রাসবিহারীকে রক্ষা করেন। অবস্থা যখন খুবই সঙ্কটাপন্ন হল তখন এই টোয়ামা এক সম্ভ্রান্তবংশীয় জাপানী মহিলার সঙ্গে রাসবিহারীর বিয়ে দিয়ে এবং রাসবিহারীকে জাপানী নাগরিক করে তাঁকে রক্ষা করেন। এই জাপানী পত্নীর গর্ভে রাসবিহারীর এক পুত্র এবং এক কন্যা জন্মলাভ করে। পুত্রটির নাম রেখেছিলেন ভারতচন্দ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের সাথে যুদ্ধ করার সময় সে নিহত হয়। রাসবিহারীর পত্নী বাঙলা ভাষা শিখেছিলেন।

জাপানে বসে রাসবিহারী বিশ্বের বহু পত্র পত্রিকায় ভারত সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। ভারতেও ইয়ং ইণ্ডিয়া এবং অন্যান্য পত্র পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। শচীন্দ্রনাথ এবং আরও কয়েকজনের নিকট তিনি নিয়মিতভাবে পত্র লিখতেন। এই সকল পত্র থেকে তাঁর মতামত জানা যায়। একখানি পত্রে তিনি লিখছেন, "We are destined to tackle the problem of the World. It is India's mission to usher in a new era of real peace and happiness in the world. India's freedom is but a means to this and it is not an end in itself."

"১৯২২ সালেরই জুলাইয়ের এক পত্রে তিনি লিখছেন," Independent India must have because her independence is essential for the regenaration of the whole world. It is means to the destruction of imperialism and the creation of a better world for all to live in. It is India's mission and therefore your and my mission. I like Japan and I have came to adore her. Because I am conviuced that she will stand for Asia's independence when time come. When I came here first the Japanese had little knowledge of the state of afairs of India I have got many Japanese friends from the cabinet ministers down to

(এর পর ১২ পাতায় দেখুন)

অন্তবিহীন রয় যে অন্ধকার

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বর্তমানে যে ভাবে কলকারখানা ও অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এখানে লোকসানের কড়ি গুণছে তাতে তারা যদি অন্যত্র সরে যেতে বাধ্য হয়, তবে ক্ষতি কার, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের না ঐ সব কলকারখানার ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মালিকদের? এ বিষয় কি জ্যোতিবাবু একবারও খতিয়ে দেখছেন না? এ তো অতি সাধারণ ব্যাপার। উক্ত ধনীক বণিক শ্রেণীর মানুষরা পশ্চিমবঙ্গকে তাদের কড়ি রোজগারের ও মুনাফা শিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান বলে এতকাল বিবেচনা করে এসেছিল তাই এখানে তারা ঘাঁটি গেড়ে ছিল; কিন্তু এখন এই সীমাহীন বিদ্যুৎ বিভ্রাট-জনিত অবস্থার জন্য যদি তারা অন্যত্র পালায় তবে কি জ্যোতিবাবুদের শাসনব্যবস্থা তার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী হবে না? রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট—এখন রাজার ভূমিকায় মুখ্যমন্ত্রীরা অবতীর্ণ হন এবং তাঁরাই রাজ্য পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করেন। অতএব ভাল হলে যেমন প্রশংসা মুখ্যমন্ত্রীর প্রাপ্য, মন্দ হলে সেইরূপ নিন্দাও মুখ্যমন্ত্রীরই প্রাপ্য! জ্যোতিবাবু সজাগ হোন, যেকোনও উপায়ে এই অন্তহীন বিদ্যুৎ ঘাটতি রোধ করুন, নচেৎ আমরা অদূর ভবিষ্যতে একটা ভিখারীর শ্রেণীতে পরিণত হয়ে অন্যান্য রাজ্যের মানুষের দরজায় দরজায় মাথা হাতে নিয়ে ভিক্ষায় বেরুতে বাধ্য হবো। এখনও সময় আছে যদি পারেন তবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রকৃত কল্যাণ মানসে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে সঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে চলুন এমনভাবে যাতে করে এই সীমাহীন বিদ্যুৎ ঘাটতি সীমিত হয় ও ধীরে ধীরে ঘাটতি পুরাপুরি বন্ধ হয় অচিরে। অর্থনৈপুণ্যতা প্রমাণের এই সুযোগ ছাড়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? কোমর বেঁধে দৃঢ়চেতা হয়ে বাস্তবক্ষেত্রে নেমে পড়ুন, ভয় কি?

পশ্চিমবঙ্গের দৈনিক প্রয়োজনের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রত্যহই পাওয়া যায় এবং এ হিসাব সঠিক। এই হিসাবের ওপর ভিত্তি করে আমরা সরকারকে কিভাবে এবং কি কি সম্ভাব্য উপায়ে বিদ্যুৎ রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে বণ্টন করা যায় তার একটা পরিকল্পনা দিচ্ছি :—

সরকারের প্রাথমিককাজ হবে পরিসংখ্যান গ্রহণ করা। যে কোন সেক্টারে দৈনিক কত ইউনিট বিদ্যুৎ প্রকৃতপক্ষে খরচ হয় এবং এই হিসাব বিগত তিন মাসের গড় বিদ্যুৎ খরচের হিসাবের ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে ও তাহা নথিভুক্ত করতে হবে এমনভাবে যাতে জানতে পারা যায় যে কোন গৃহস্থ বাড়ীতে বা কোন প্রতিষ্ঠানে বা কোন কল-কারখানায় বা কোন সৌধ প্রতিষ্ঠানে বা কোন ব্যবসায়ী সংস্থায় উক্ত একই সেক্টারের মধ্যে দৈনিক গড় পড়তায় কোথায় কত কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হয়েছে। ধরুন কোনও সংস্থায় দৈনিক একশত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হয়েছে এবং তা তিন মাসের খরচের গড় হিসাব, তখন ঐ সংস্থাকে সরকারের নূতন প্রণীত ব্যবস্থানুযায়ী মাত্র পঞ্চাশ ইউনিট বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে বলে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং বাকী সব গৃহস্থবাড়ী বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও ঐরূপ প্রকৃত বিদ্যুৎ খরচের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মাত্র দৈনিক সরবরাহ করা হবে যতদিন না বিদ্যুৎ ঘাটতির উন্নতি দেখা যায়, উন্নতি হলে তখন যতো যতটা বেশী সম্ভব ততটা বিদ্যুৎ বণ্টন করা হবে। এখন প্রশ্ন উক্ত অর্ধেক পরিমাণের বিদ্যুৎ কবে, কখন কতক্ষণ ধরে সরবরাহ করা হবে তাও বিদ্যুৎগ্রাহকদের পূর্বাহ্নে সরকারকে জানিয়ে দিতে হবে, যাতে গ্রাহকরা নিশ্চিত-ভাবে জানতে পারে কবে, কখন, কতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যুতের সরবরাহ উক্ত এলাকায় সকলের জন্য সমভাবে চালু থাকবে। এই ব্যবস্থা পূর্বাহ্নে জানা থাকলে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা নিজ নিজ সুবিধা ও প্রয়োজনমত বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পাবেন, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই কেহই উক্ত সতকরা পঞ্চাশভাগের বেশী বিদ্যুৎ পাবেন না। বিপদে পড়লে পণ্ডিতব্যক্তি অর্ধেক ত্যাগ করেন কারণ ষোলআনা নষ্ট হওয়ার চেয়ে আট আনা নষ্ট

করে, যদি আট আনা বাঁচান যায়, ত বন্ধ কি ? "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিত" এই চিন্তায় আমরা সকলেই দোষ নিরমিত প্রয়োজনের অর্দ্ধেক পেয়েই বর্ত্তমানে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ থাকতে রাজি আছি। সরকার এগিয়ে আসুন এবং উক্ত পরিকল্পনা মত বিদ্যুৎ সেচন করুন। বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা যেন না নেওয়া হয়—তা যদি হয় তবে বিপদ হবেই। এই কথা চিন্তায় আমার কারণ, বন্যায় শিক্ষাব্যবস্থায়ও অন্যান্য অনেক ব্যাপারে এই সরকারের দলপ্রীতির নিদর্শন এখনও দেখিনি ; আর তাছাড়া সি, পি, এর দেওয়াল লিখনে নিজেদের সমর্থন ঝেড়ে ফেলে, ইন্দিরাগান্ধীর ঘাড়ে সব কল্পিত দোষ চাপিয়ে লিখেছে 'পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্য ইন্দিরাগান্ধী দায়ী।" এরপর এই দলের কর্তাব্যক্তিরা কিভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সর্বদা জনগণকে কিভাবে ধোঁকা দেয়—তা আর বলে দিতে হবে না। সকলেই এদের কার্যকলাপের সঙ্গে ও বুকনির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। তাই সরকারকে সমদৃষ্টি নিয়ে সকলের কল্যাণে চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদ্যুৎ সেচন করতে এখনই অনুরোধ জানাই প্রকৃত জনস্বার্থে। তাতেও যদি দেখি সরকার গড়িমসি করছেন, তখন জনগণের পক্ষে এই সরকারের বিরুদ্ধে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ব্যাপক গণআন্দোলন করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকবে না। দেখা যাক জ্যোতিবাবু সোজা রাস্তায় চলেন কি না। তারপর কথা কর্তব্য নিরূপণ করা যাবে।

সমাপ্ত

(১০ পাতার শেষাংশ)

law years. M. P's, journalist and students. Many books in Japanese about Gandhi and Indian movement have been published and the papers and magazines are regularly carrying articles on India. This month a proffessor of Tokio imperial University published a Voluminous book in Japanese on India. Next month I am engaged to deliver lectures on Indian situation for three days. Today most of the young men of Japan are staunch advocates of Asian independent. Even older men and responsible officials are in sympathy with the new awakening notice from Persia and China. The most remarkable national trait is patriotism. The people are ready to revere and love those who have the same Characteristics. This is the reason why were giving protection but for Japanese sympathy and love I would have been dead long ago.

(চলবে)

: একটি ঘোষণা :

'বিপ্লবী বাংলা'র আগামী সংখ্যাটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ যুগ্ম-সংখ্যা রূপে আগামী ২৮শে বৈশাখ প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদক, বি: বা:

ভুট্টোর ফাঁসি কোন্ দৃষ্টিতে দেখতে হবে

॥ ব্রজেন দাস ॥

সারা পৃথিবীর প্রতিবাদ এবং বিশ্ব নেতাদের আবেদন সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়া-উল-হক প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী জুলফিকর আলি ভুট্টোকে ফাঁসির রজ্জু হতে রেহাই দিলেন না। আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন, চীন, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রধান প্রধান শক্তি, সৌদি-আরব, ইরান প্রভৃতি মোসলিম রাষ্ট্র বলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে স্থান জগতের মহারাজ পোপ ও রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের আবেদনেও ভুট্টোর প্রাণ রক্ষা হল না। সমস্ত জগতের উপেক্ষা করে রাওলপিণ্ডির জেলে ভুট্টোকে হত্যা করা হল।

জিয়ার একমাত্র উক্তি আইনের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। কিন্তু প্রায় দেড় বৎসর ধরে ভুট্টোর কারাবাস ও বিচারের সুদীর্ঘ অভিনয় সত্ত্বেও পৃথিবীর কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি স্বীকার করেননি যে ভুট্টোর প্রতি ন্যায়-বিচার হয়েছে বা নরহত্যার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৭৭ সালে জুন মাসে জিয়া পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেন। ইহার চার বৎসর আগের এক হত্যাকাণ্ডে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোকে জড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে চারজন রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। সুপ্রিম কোর্টের আপিল মামলায় রায়ও বিভক্ত ; ৪-৩। হত্যাকাণ্ডের কোথাও ভুট্টো উপস্থিত ছিলেন না। কাজেই ইহা নিতান্ত মধ্যযুগীয় কায়দার বিচার এবং মোটেই আইনসঙ্গত নয়। নিছক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। পাকিস্তানের জন্মলগ্নেই ইহার অঙ্কুর জন্মেছিল, ইহারই স্ফুরণ মাত্র।

পাকিস্তানের জন্ম বেইমানী, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ঘৃণা ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। জন্মলগ্নের এই অঙ্কুর পাকিস্তানের রাষ্ট্রদেহের অভ্যন্তরে এমনভাবে সংক্রামিত যে কোন সুস্থ মানবতাবোধ ও বলিষ্ঠ আদর্শ গড়ে উঠতে পারে নাই।

এই বেইমানী ও বিদ্বেষ পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কদের রাজনৈতিক জীবনেও বর্ত্তায়েছে পাকিস্তানে জন্মদাতা রহস্যময় আলি জিন্নার আকস্মিক মৃত্যু রহস্যজনক। জিন্নাসাহেব ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হন, মারা যান ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। জিন্না সাহেব রোগাক্রান্ত হলে পাকিস্তান সরকার জিন্নাসাহেবের চিকিৎসার দায়িত্ব অর্পণ করেন লাহোরের মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল লেঃ কঃ ইলাহি বখসকে। লেঃ কঃ ইলাহি বখস পাকিস্তান টাইমস্ পত্রিকায় জিন্না সাহেবের জীবনের শেষদিনগুলি কিভাবে কাটায়েছেন সেই বিবরণ লিখেছিলেন। ইলাহি বখস লিখেছেন রোগমুক্তির কোন আশা না থাকায় জিন্নাসাহেবকে লাহোর হতে করাচী নিয়ে যাওয়া হয়। পাকিস্তানের স্রষ্টা করেদে আজমকে অভ্যর্থনা করার জন্য করাচী এয়ারপোর্টে তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খান কিংবা কোন রাজনৈতিক নেতা উপস্থিত ছিলেন না। একমাত্র এসেছিলেন গভর্ণর জেনারেলের মিলিটারী

সেক্রেটারী মাত্র একখানা এম্বুলেন্স গাড়ী নিয়ে, দ্বিতীয় গাড়ী ছিল না। এই এম্বুলেন্সও করাচী শহরের পথে অচল হয়ে যায়। জিন্না সাহেবের মাথা রাখতে অসুবিধা হচ্ছিল, একখানা ইট দিয়ে বালিশ উঁচু-করা হয়। বাড়ীতে এসে জিন্না সাহেব প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলিকে ডেকে পাঠান, লিয়াকৎ এলেন অনেকে দেরীতে, কিন্তু জিন্নাসাহেবের কাছে গেলেন না। জিন্না সাহেব মারা গেলেন। ব্যাধির প্রকৃতি ও মৃত্যু রহস্যই রয়ে গেল। জিন্নার মৃত্যুর পর লিয়াকৎ আলি খান পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনকে গভর্ণর জেনারেলরূপে নিয়ে এলেন। নাজিমুদ্দিন পূর্বপাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হয়ে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগষ্ট এ মোসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের প্রধান উদ্যোক্তা সুরাবর্দি সাহেবের পূর্বপাকিস্তানে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা করলেন। তিন বৎসরের মধ্যে ১৯৫২ সালের অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খান এক জনসভায় আততায়ীর গুলিতে রহস্যজনক ভাবে নিহত হলেন। নাজিমুদ্দিন এই খুনের কোন কিনারা না করে গভর্ণর জেনারেলের পদ থেকে নেমে এসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং গভর্ণর জেনারেল করলেন—অর্থমন্ত্রী গোলাম মহম্মদকে। গোলাম মহম্মদ ১৯৫৩ সালের এপ্রিলমাসে নাজিমুদ্দিনকে সরাসরি বরখাস্ত করলেন। প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসালেন বগুড়ার মহম্মদ আলিকে। ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে মহম্মদ আলির মন্ত্রি-সভায় এলেন ইস্কান্দার মির্জা এবং আয়ুবখান। চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে অভিজ্ঞ হয়ে গোলাম মহম্মদ অসুস্থতার অজুহাতে ছুটি নিলেন ১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে, অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট পদে বসিয়ে গেলেন ইস্কান্দার মির্জাকে। এই বৎসরই অক্টোবর মাসে ইস্কান্দার মির্জা স্থায়ী প্রেসিডেন্ট হলেন। ইস্কান্দার মির্জার সময়ে একে একে চৌধুরী মহম্মদ আলি, সুরাবর্দিসাহেব, ফিরোজ খাঁ প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন। কাহাকেও বেশীদিন টিকতে দেওয়া হয় নাই। শেষ পর্যায়ে ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সামরিক আইন জারি করে সামরিক বাহিনীর প্রধান কর্তা জেনারেল আয়ুবখানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। এই মন্ত্রিসভাতেই জুলফিকর আলি ভুট্টোর প্রথম রাজনীতিতে প্রবেশ, তখন ভুট্টোর বয়স ৩০। আয়ুব খান ইস্কান্দার মির্জাকে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত ভুট্টোর সঙ্গে আয়ুবের প্রেম অটুট ছিল। ১৯৬৫ সালে ভারত পাক যুদ্ধের পর আয়ুবের সমালোচনায় ভুট্টো মুখর হন এবং তাঁকে মন্ত্রি সভা ছাড়তে হয়। ১৯৬৯ সালে আয়ুবের পতনের পর এলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবের আওয়ামী লিগ পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেল। ভুট্টো কিছুতেই শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে দিবেন না। ইয়াহিয়াকে ভুট্টো মদত ও পরামর্শ দিয়ে বাধ্য করলেন ১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের জনমত শুদ্ধ করার জন্য পাকবাহিনী নেলিয়ে দিতে সরকার গঠন করার গণতান্ত্রিক অধিকার অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে। করাচী বেতার পথে ঢাকা এয়ার পোর্টে ভুট্টো বললেন "ভগবানকে ধন্যবাদ, পাকিস্তান রক্ষা পেল। ভারতের নিকট পাকিস্তানের পরাজয়ের পরও বাংলা দেশ সৃষ্টির পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া-খানই ভুট্টোকে প্রধান মন্ত্রী করলেন। প্রতিদানে ভুট্টো ইয়াহিয়া খানকে নজর বন্দী করলেন। এই ভুট্টো নীত-আট-জন জেনারেলকে ডিঙিয়ে জেনারেল জিয়া-উল-হককে পাক সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক করেন। জিয়া-উল-হক ভুট্টোকে ফাঁসি দিয়ে তার পূর্বসূরীদের বেইমানীর ইতিহাসই অনুসরণ করলেন।

ইতিহাসের এই সমস্ত কুকীর্তি ও অপকীর্তির শেষ ফল কি হবে? ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর ধান্ধিকতা ও অগণতান্ত্রিক পৈশাচিক কার্যকলাপের ফলে পাকিস্তান দ্বি-খণ্ডিত হয়েছে, বাংলা দেশ জন্ম নিয়েছে। সারা পৃথিবীর জনমতকে উপেক্ষা করে ভুট্টোকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় দ্বিখণ্ডিত পাকিস্তান কতখণ্ডে পরিণত হবে কে জানে। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আর কতকাল অত্যাচারকদের দাসত্ব মেনে নেবে। পাকিস্তান বিস্ফোরণের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণ এই বিষয়ে ওদের সহায়ক হবেন কি?

সামরিক শাসন কিংবা সেনাবাহিনীর একাধিপত্যে পরিচালিত সরকার কল্যাণ রাষ্ট্র, সুস্থ গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। ভুট্টো কারাগারের মৃত্যুকুঠরিতে ইহা উপলব্ধি করেছিলেন এবং লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক সংবিধানের রূপকার পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রমুখ নেতাদের প্রশংসা করেছেন। ভুট্টো কখনও ভারত বন্ধু ছিলেন না। ভুট্টো স্বস্তি পরিবদে কখনও ভারতীয়দের বলেছেন "কুত্তা", কখনও বলেছেন হাজার বছর ধরে ভারতের সঙ্গে লড়াই করবেন। এই ভুট্টোকে ইয়া-উল-হক হত্যা করে নাই। মৃত্যু কুঠরীর ভুট্টোর ভয়েই ইয়া ভীত ছিলেন, তাই তাঁকে হত্যা করা হল। সারাদুনিয়ার জনগণ মৃত্যু কুঠরীর ভুট্টোরই প্রাণ-ভিক্ষা চেয়েছিলেন। এই ভুট্টোকেই পাকিস্তানের জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে, বিশ্বের শান্তি ও কল্যাণকামী মানুষের ইহাই কর্তব্য। অথচ আমাদের প্রধান মন্ত্রী মোরারজী দেশাই মৃত্যু কুঠরীর ভুট্টোকে না চিনে উক্তি করলেন—ভুট্টোকে যখন ফাঁসি দেওয়া হয় তখন তিনি সেই দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, সে দেশের একজন সাধারণ নাগরিক। দ্বিতীয়তঃ তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডনীয় অপরাধেরও অভিযোগ ছিল, সেইজন্য ভারত সরকার ভুট্টোর ফাঁসির নিন্দা করেনি। মোরারজি দেশাই আরও বলেন Mr Solomon mahiangu একজন মুক্তি যুদ্ধের, সেইজন্য মিঃ সোলেমাহাঙ্গুর ফাঁসির ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিবের মাধ্যমে দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানিয়েছেন, (১ই এপ্রিল শিলং এ সাংবাদিক সম্মেলনে-বিবৃতির সারাংশ)।

রত্নাকর হয়া-বাল্মীকি-মুনি হয়েছিলেন, মরা মরা রাম রাম বলিতে পরিবর্তন হয়েছিল। ভারতীয় সংস্কৃতি ইহা বিশ্বাস করে। মোরারজী দেশাই ভারতীয় সংস্কৃতিতে আস্থাবান হয়েও মৃত্যু-কুঠরির ভুট্টোকে কেন দেখতে পেলেন না। ইহা কি তার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবৃত্তির প্রতিফলন। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছায় ইঙ্গিত এবং বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের থেকে স্বীকৃতি আদায়ের অপচেষ্টা। দেশের গণতন্ত্রের বুনিয়াদ শক্তিশালী দৃঢ় করতে হলে প্রধানমন্ত্রীর এই অগণতান্ত্রিক অমানবিক মনোভাবের প্রতিবাদ হওয়া দরকার নতুবা শাশ্বত গণতন্ত্রের দেশ ভারত ভূমিতেও অঘটন ঘটতে পারে।

ইরান

॥ কালীপদ সরকার ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রেজা খান প্রধানমন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করে সর্বপ্রথমে আধাস্বাধীন প্রদেশিক শাসকদের কেন্দ্রের অধীনে আনলেন। তারপর, ইরানের রাষ্ট্র জীবন থেকে বিদেশী হস্তক্ষেপের প্রভাব বিলোপ করতে কৃতসংকল্প হলেন। সোভিয়েত রাশিয়া-ইরান মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করে তিনি উত্তর ইরানে তার আমলের আগ্রাসন আশংকা বন্ধ করেছিলেন, তুরস্কের সহিত অপর একটি চুক্তি সই করে বহুদিনের মনোমালিন্যের অবসান ঘটালেন। বাকি রইল দক্ষিণ ইরানে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের মূলে ছিল ব্রিটেনের ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানীর বিপুল আর্থিক শক্তি। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে রেজাখানের সহিত ব্রিটেনের নতুন করে যে বোঝাপড়া হল তাতে ইঙ্গ-পারস্য তৈল্য কোম্পানীর কর্তৃত্ব কিছুটা খর্ব হল। অল্পদিনের মধ্যে এই ভাবে জাতীয় সংহতি ও প্রতিকূল বৈদেশিক তৎপরতার অবসান ঘটিয়ে রেজাখান ইরানবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা লাভ করলেন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণ ও মজলিসের সমর্থনে রেজাখান, রেজা শাহ পহলবী নামে ইরানের প্রসিদ্ধ ময়ূর সিংহাসন একটা বিশেষ স্থান যেন অধিকার করে আছে। রেজাশাহ হলেন ইরানের নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রধান। তিনি যে জাতি গঠন মূলক কর্মে হাত দিয়েছিলেন তার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে রেজাশাহ ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানীর চুক্তির কিছু শর্ত পরিবর্তন করে রাজস্ব বাড়াতে সক্ষম হলেন। সমগ্র দেশের শিল্পবাণিজ্যের চল্লিশ শতাংশ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত হল, রাষ্ট্রপরিচালিত চিনি, তামাক, বস্ত্র ও সিমেন্ট কারখানা স্থাপিত হল। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শাহ বহু কৃষি বিদ্যালয় ও আদর্শ খামার প্রতিষ্ঠা করলেন। ইরানের ভবঘুরে যাযাবরদলগুলিকে কৃষি খামারে কাজ দেওয়া হল। শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টায় যে সব বৈদেশিক উপদেষ্টার প্রয়োজন হল, শাহ তাদের আনলেন ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ব্রিটিশ ও রুশ প্রভুত্ববিস্তারের তিনি যতদূর সম্ভব পরিহার করলেন।

যক-পর্বতমর ইরানে আভ্যন্তরীন যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল ছিল না। রেজাশাহ ট্রান্স-ইরান রেলপথ ও কয়েক হাজার মাইল সড়ক নির্মান করালেন রেলপথে ও মোটর ট্রাকে দেশের এক প্রান্ত অবধি পণ্য চলাচল শুরু হল। ট্রেণে ও বাসে যাত্রী পরিবহণও চলল।

শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুসরণ করলেন। শিক্ষা বিভাগের পরামর্শদাতারা ছিলেন ফরাসী। পারসীক ভাষার সহিত নানা ইউরোপীও বিশেষ করে ফরাসী ভাষা শিক্ষা প্রবর্তিত হল। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি পারসীক ভাষায় অনুবাদ করা হতে লাগল। বহু প্রাচ্যদেশের ন্যায় ইরানে নারী জাতি ছিলেন অবহেলিত, অশিক্ষা ও কুসংস্কার তাদের অন্ধ করে রেখেছিল। রেজাশাহ আইন করে বোরখা ও নারীর অবরোধ প্রথার বিলোপ ঘটালেন। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য সর্বত্র স্কুল খোলা হল, মহিলা স্কাউটদল গড়া হল এবং পুরুষদেরন্যায় নারীদের জন্য সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাসংস্থার দ্বার উন্মুক্ত হল। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হল। রেজাশাহের চেষ্টায় ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য ঘটল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন দেশের প্রধান মন্ত্রী হন, শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা একজন, আর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁকে বাধ্য হয়ে ক্ষমতা ত্যাগ করতে হয়, তখন শিক্ষিতের হার দাঁড়ায় শতকরা ৩০ জনে।

শাহের প্রগতিমূলক কর্মপ্রয়াস যে বিনা বাধায় চলেনি, সে কথা বলাই বাহুল্য। মোল্লাতন্ত্র শাহের আধুনিকীকরণের ঘোর বিরোধী ছিল। দেশের শাসন বিধি পরিবর্তন করে যখন তিনি ফরাসী আইন অনুযায়ী রচিত ইরানের নতুন শাসন বিধি প্রবর্তন করলেন, পুরুষের বহুবিবাহ এবং নারীর প্রতি অবমাননামূলক তালাক প্রথা রদ করলেন, তখন মোল্লাতন্ত্রীরা শাহের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে আর কি! কিন্তু রেজাশাহের অনুকূলে ছিল তাঁর বিপুল জন সমর্থন, তাঁর নিভীক স্বাধীন রাষ্ট্রনীতি ও জাতীয়তাবাদের স্বীকৃতি। তার সঙ্গে ছিল তাঁর দৃঢ়তা, প্রতিভা ও চরিত্রবল। তাই সিংহাসন টলল না।

(চলবে)

RgedNo. R. N .24911/71 | Biplabi Bangla Phone : 34-1795 | Regd. WB/NC 77

বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

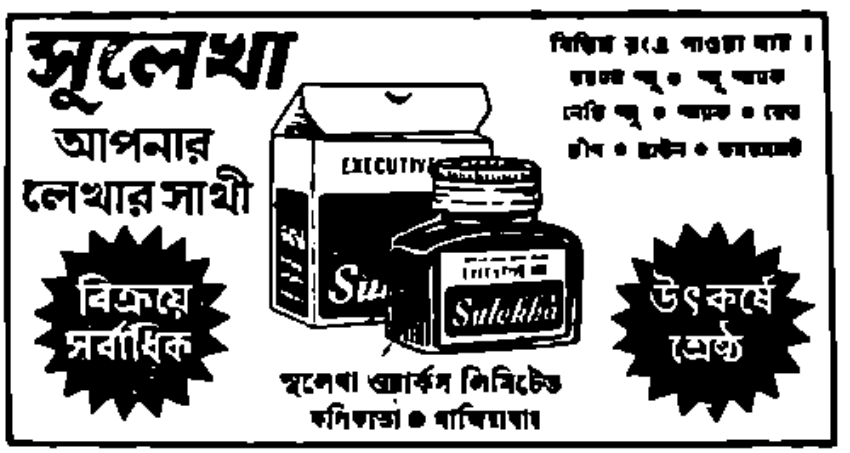

— সম্পাদক মণ্ডলী —

শ্রীঅনিল চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীঅরুণেশচন্দ্র নন্দী, শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী।

সম্পাদক—শ্রীশান্তি পদ রায়চৌধুরী

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেহালা—শ্রীমধুগোপাল পাল।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীসন্তোষ গুহ।

বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪৫২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রক :—নিউ প্রসেসিং, ১১৭ এ, বেচারাম সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাঙলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ২৮শে বৈশাখ, ১৩৮৬ ১২ই মে, ১৯৭৯	২৯-৩০ সংখ্যা

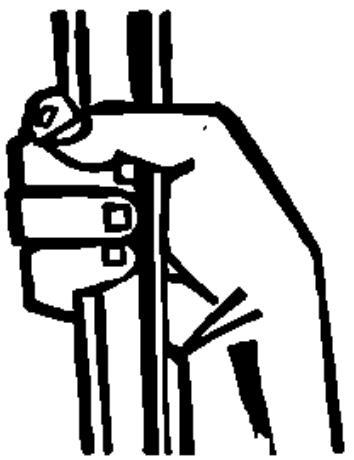

১১৮–তম জন্মদিনে
বিপ্লবী পরিষদের
শ্রদ্ধাঞ্জলী—

নির্ঝর যথা সংগ্রামে নামে দুর্গম পর্ব্বতে
অচেনার মাঝে ঝাঁপ দিয়ে পড় দুঃসাহসের পথে ;
বিপ্লবই তোর স্পর্দ্ধিত প্রাণ জাগারে তুলিবে যে রে,
জয় করে তবে জানিয়া লইবি অজানা অদৃষ্টেরে ॥

সম্পাদকীয়—

রবীন্দ্র জয়ন্তী

এই সদাচলমান অধ্রুবভিত্তি জগতে এক একজন বরেণ্য, কীর্ত্তিমান আবির্ভূত হন, যাঁদের নিয়ে ধুমধাম না করে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। উৎসবের কস্তুভ হয়েই যে আসেন তাঁরা—তাঁদের নিয়ে উৎসব না করে থাকা যায় না। রবীন্দ্রনাথ এই জাতেরই একজন অসামান্য প্রতিভাধর মনীষী। তিনি তাঁর সমসাময়িককালের এবং পরবর্তী বহুযুগের অগ্রগামী দিশারী ও পথিকৃত ছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর শতাব্দীরও অধিক সময় কেটে গেলেও, রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় জীবনে, তথা সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জীবনে সমান ভাবে আজিও প্রভাব বিস্তার করে চলেছেন। আশা করবার সঙ্গত কারণ আছে, রবীন্দ্রনাথের দীপ্তি, আদর্শ নিষ্ঠা, দর্শন ও চিন্তা ভাবনা, মানুষকে শুধু অনুপ্রেরণাই যোগাবে না, অন্ধকারের মধ্যে আলো জেলে রাখবে, সঠিকভাবে জীবনের পথপরিক্রমা করতে সাহায্য করবে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অতিদূর জগতের মানুষ, চারিদিকের পরিমাপে তৈরী নয়, তিনি ছিলেন শেওলার মধ্যে শতদলপদ্ম।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি বলেই খ্যাত। কিন্তু তাঁর মধ্যে ভাবাবেগ ও কর্মযোগের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। ভারতবর্ষের, তথা সমগ্র বিশ্বের, এমন কোন সমস্যা ছিলনা, যার সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন না এবং সমাধান দেবার চেষ্টা করেননি। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই কোন ঘটনা ঘটত, তাঁর মনের বীণায় সেটা অনুরণিত হত। এই অর্থেই তিনি ছিলেন বিশ্ব প্রেমিক। এই অর্থেই অন্যের বাক্‌সর্বস্ব বিশ্বপ্রেম থেকে, তাঁর বিশ্বভৌমিকতা ছিল স্বতন্ত্র, আন্তরিকতাপূর্ণ, নির্ভেজাল ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাঁর যা মানসিক সংগঠন ছিল, তাতে তিনি বিশ্বপ্রেমিক না হয়েই পারতেন না।

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে পৃথিবীর কবি বলে অনুভব করতেন। তাই তাঁর মন কোনদিন ভৌগলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেনি। যেখানেই মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটেছে, যেখানেই মানুষের মঙ্গলযজ্ঞ বিঘ্নিত হয়েছে, যখনই কোনদেশ অন্য দেশকে আক্রমণ করেছে, তখনই তাঁর কণ্ঠ গর্জন করে উঠেছে, লেখনী তীব্র কষাঘাত করেছে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে। নিজের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা বিসর্জনের ঝুঁকিও নিয়েছেন। চীনের উপর জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, তাঁর বন্ধু জাপানী কবি নোগুচিকে যে চিঠি লিখেছিলেন, বিশ্বের ইতিহাসে তা চিরদিন মর্য্যাদা পাবে। তিনি জানতেন অন্যায় যে করে, আর অন্যায়

যে সহে, বিধাতার রুদ্ররোষ তাদের সমভাবেই দহে। জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের প্রতিবাদ, নাইট উপাধি ত্যাগ, ইংরেজদের রোষচক্ষুকে আগ্রাহ্য করে হিজলীতে রাজবন্দীদের হত্যা করার প্রতিবাদ সভায়, অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি সভাপতিত্ব করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যের, সুন্দরের এবং শিবের পূজারী। যার মধ্যেই সত্য নিহিত থাকত, যা কিছু সুন্দর ও মঙ্গলময় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন, তাকে তিনি চিরদিনই সমর্থন করে গিয়েছেন।

তাঁর জীবনদর্শন ছিল জনগণমঙ্গল সাধনার দর্শন। একথা সত্য যে তিনি চিন্তার রাজ্যে অসীমের পথের যাত্রী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা তাঁর প্রাণে অনুরণিত হত সর্বক্ষণ। এই উচ্চতম শিখর ও নিম্নতম ধরণী—এরমধ্যে সমান স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করা ও অভূতপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করার অবিশ্বাস্য ক্ষমতার তুলনা মেলে না। তাঁর একান্ত কামনা ছিল,

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক্,—
আমি তোমাদেরই লোক,
আর কিছু নয়,
এই হোক মোর পরিচয়।

তাঁর জীবনে এই দৃষ্টিভঙ্গীটাই ছিল বিস্ময়কর। যেমন "শান্তিনিকেতন" গড়ে তুলেছিল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, তেমনি "শ্রীনিকেতন" গড়ে তুলতেও তার অবহেলা ঘটেনি। নানা উৎসবের মধ্য দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের জীবনের মান উন্নত করার উপায় নির্দেশ করতেও চেষ্টার কসুর করেন নি। বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, কুটীর শিল্প স্থাপন, বর্ষামঙ্গল, বসন্ত উৎসব পালনের মাধ্যমে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

'শান্তিনিকেতন' প্রতিষ্ঠা করে উদার পাঠ্যসূচী, শিক্ষাব্যবস্থা এবং এক পরিচ্ছন্ন পরিবেশের মাধ্যমে বিশ্বের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এই শিক্ষার পরিস্থিতিতে ছাত্র যুবক ও যুবতীদের এমনভাবে তৈরী করতে চেয়েছিলেন, যার ফলে পরবর্তীকালে তারা নিজেদের শুধু বিশ্বনাগরিক বলে গণ্য করবে না, অন্যদেরও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করবে। তাই দেশবিদেশ থেকে বিশিষ্ট জ্ঞানী ও গুণীজনের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন এখানে। এই শিক্ষাই যে বিশ্বের পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা, বর্তমান কালের মানুষ বহু দুঃখ কষ্ট, বহু রক্তপাত ও জীবনহানির মধ্য দিয়ে, মর্মে মর্মে অনুভব করছে। এই দূরদৃষ্টি সত্যিই অলৌকিক।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল সর্বতমুখী। তার মূল্যায়ন চলছে, আরো চলবে বহু দিন ধরে। ততদিন তিনি দেশ কাল অতিক্রম করে নিরবধি কালের কপোলতলে শুভ্র ও সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবেন। রবীন্দ্রনাথকে এই উপলক্ষ্যে আমরা সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

রবীন্দ্রনাথ ও আমরা | অজিত গুহ

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ৩০ বছর পার হয়ে গেছে। দেশ বিদেশী শাসন মুক্ত হয়েছে আজ তিরিশ বছরের বেশী। স্বাধীনতার পর এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথের অবস্থানটা কোথায়, বিচার করে দেখার সময় এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে জীবনের অনেকটা সময় ও শক্তি তিনি ব্যয় করেছেন। স্বাধীনতার এত বছর পরেও দেশে অক্ষর পরিচিত লোকের সংখ্যা তিরিশের উপরে ওঠে নি। শুধু তাই নয় আজ সমগ্র দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যা চলছে, তা এক কথায় নৈরাজ্য। ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা আজও সক্রিয়ভাবে চালু হয়নি। নিম্নবিত্তদের শিক্ষার ব্যবস্থা তো প্রায় না থাকার মধ্যে। উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে শিক্ষার ব্যাপারে আজ এক অদ্ভুত মনোভাব গড়ে উঠেছে। পাঁচ বছরের ছেলে-মেয়েদের কাঁধে তিনটী ব্যাগ চাপিয়ে English medium স্কুলে তাদের পাঠাবার একধরণের অসুস্থ মানসিকতার প্রতিযোগিতা দেখা যাচ্ছে। সেখানে তারা ভাল করে কথা ফুটবার আগেই—

"BA BA Blackship have you any wool"

ছড়া মুখস্ত করতে দেখে, রবীন্দ্রনাথ বা সুকুমার রায় পড়তে দেখে না। বড়ো হয়ে এরা লম্বা দাড়ি ও লম্বা লম্বা নখ রেখে বিচিত্র ধরণের চিত্র বিচিত্র ছাপ মারা জামা প্যান্ট পরে যা সৃষ্টি হয়,—

"মহাকবির কল্পনাতে ছিল না তার ছবি।"

আমাদের দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। এদের শতকরা ৬০ থেকে ৬৫ ভাগ মানুষ দরিদ্র ভূমিহীন চাষী ও ২ থেকে ৪ বিঘা, জমির মালিক। এই মানুষগুলির জীবনের যে অভিযোগ—

"কলিল ভিক্তি সকলি বিক্তি মিথ্যা দেনার খতে।
এদেশেতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভূরিভূরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।"

এই চুরি কি স্বাধীনতার এত বছর পরেও বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে? হয়নি। তার প্রমাণ সেন্সাস্ রিপোর্টে দেখা যায় প্রতি দশ বছরে ৫ থেকে ৭ শতাংশ হারে ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ছোট ছোট চাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া আজও একই ভাবে চলছে।

কিছু গোয়ালার গলির সাঁতসেঁতে ঘরের বাসিন্দা সওদাগরী অফিসের সেই কর্মিণী মেয়েটি, আলো জ্বালবার পয়সার অভাবে সন্ধ্যেটা যে নিরালায় হেসনে কাটিয়ে আসে, তার জীবনে কি আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যেতে পেরেছি? রবীন্দ্রনাথ বলতেন তাঁর কবিতা হয়তো একদিন লোকে পড়বে না, কিন্তু তাঁর গান বাঙালীকে চির দিন গাইতে হবে। রবীন্দ্রনাথের শতাধিক সঙ্গীতগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ গানের পর্যায়ে পড়ে এবং বর্ষার গানগুলি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। কিন্তু স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরেও আড়াই লক্ষ লোক শুধু কলকাতা শহরে ফুটপাতে রাত কাটায় এবং মুম্বই কলকাতায় ৩০ থেকে ৩৫ লক্ষ লোক বস্তিতে বাস করে। নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমি জানি বর্ষারাতে ঘরের এখানে হাঁড়ি, ওখানে গামলা ও বাটি বসিয়ে অসুস্থ শিশুকে কোলে নিয়ে ঘরের কোণে জেগে বসে বাকি রাত কাটাতে হয় তাদের জীবনে—

"আজ বারি ঝরে ঝর ঝর"
বা
"ঝরঝর বরষে বরষিছে বকুল
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল
খসিয়া অলক
ঢাকিছে পলক
"কবরী খসিয়া খুলিছে"
—এর কোন মূল্য নেই।

রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত অনুপম সৃষ্টির রস উপলব্ধির জন্য কতগুলি নিম্নতম অর্থনৈতিক গ্যারান্টি সাধারণ মানুষের জীবনে প্রয়োজন। প্রয়োজন—দুবেলা পেট ভরে দুটো খেতে পাওয়া, মাথার উপরে এমন একটু আচ্ছাদন, যাতে বর্ষা নামলে অন্ততঃ গায়ে কাঁথা জড়িয়ে জানলার ধারে বসে আকাশের দিকে তাকাবার একটু অবসর এবং—কাল রেশন কী করে তুলবো, এই চিন্তা থেকে অন্ততঃ মুক্তি।

স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরে, পাঁচ পাঁচটা পরিকল্পনার মাধ্যমেও এই সামান্যতম ব্যবস্থাটুকুও শতকরা ৭০ ভাগ মানুষের জন্য করা সম্ভব হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ আজও

অবিবেকের drawing room এর মধ্যেই আবদ্ধ রয়েছেন। তাঁকে আমরা নিয়ে যেতে পারিনি যেখানে তিনি যেতে চাইতেন—

"যুগের প্রশস্ত রাজপথে
জনতার মাঝখানে।"

কারণ—আজকে সমস্ত সমাজজীবন ও রাষ্ট্রজীবন চলছে বিরাট ধামার তলায়। আমরা যা ভাবি তা বলি না, যা বলি, করি ঠিক তার উল্টো। অর্থাৎ চিন্তায়, কথায় ও কাজে কোন মিল নেই। জীবন দর্শনটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে ফোকটসে কি করে কিছু গুছিয়ে নেওয়া যায়। কাউকেই চটাবো না, পাছে আখের নষ্ট হয়। ক্ষমতাসীন এর চাটুকারিতা করো এক তালে তাল দিয়ে চলো।

"যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য জ্বলসি ওঠে খর খড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে।"

এটা শুধুই রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন নয়। এটা তাঁর জীবনদর্শনের অঙ্গ। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ডের পর সমগ্র দেশ যখন বিস্ময়ে বিমূঢ়—রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনকে বললেন প্রতিবাদ-সভা ডাকবার জন্য।

চিত্তরঞ্জন বা অন্য কোন রাজনৈতিক নেতারাই যখন প্রতিবাদে সভা ডাকার ভরসা পেলেন না, তখন রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জাতির পক্ষ থেকে সে দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। বাইটহল্ কর্জন করে লর্ড চেমসফোর্ডকে লেখা সেই ঐতিহাসিক প্রতিবাদপত্রের মধ্যে সমস্ত জাতির অন্তরের ভাষা রূপায়িত হলো।

১৯০১ সাল! অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ চিকিৎসার জন্য কলকাতায় খবর এলো হিজলী জেলখানায় গুলি চালিয়ে দুজন বিচারাধীন বন্দীকে হত্যা করা হয়েছে। ৭০ বছরের অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ ডাক্তারদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে ময়দানে মনুমেন্টের নীচে সভায় এসে দাঁড়ালেন সেই নৃশংসতার প্রতিবাদ করতে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"বাঁচাতে আপন প্রাণ
বন্দীর প্রাণের দুর্বহভার
যদি করিবারে চাহ।"

প্রাণ বাঁচানো তো দূরের কথা, পদশ্রী, উপাচার্যগিরি বা আরও সামান্য কিছু প্রাপ্তির লোভে রক্তাক্ত পায়ে দুর্বলকে বলি দিতে আজ অনেক তথাকথিত রবীন্দ্রভক্তদের বিবেকে বাঁধে না।

এই পারিপার্শ্বিকে যখন ২৫শে বৈশাখকে কেন্দ্র করে চারিদিকে রবীন্দ্র জন্ম উৎসবের জোয়ার শুরু হয় তখন রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গানের লাইনটাই বার বার মনে আসে—

"তোমার পূজার ছলে,
তোমায় ভুলেই থাকি।"

আমাদের এই বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশে রবীন্দ্র জন্মোৎসব আজ একটা চতুর্দশ পার্বণের উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র। জীবনের সঙ্গে এর কোন যোগই নেই। (আর তা যদি না থাকে তবে) রবীন্দ্র-নাথেরই ভাষায়:

"জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে
ব্যর্থ হয় গানের পসরা"

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একদিকে এই আড়ম্বরিকতাবিহীন হৈহৈ ও আর একদিকে পাটওয়ারী বুদ্ধির কারবারকে ব্যঙ্গ করে শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় যথার্থই লিখেছিলেন—

ঠাকুর ঘরে কে?

পক্ষ তোমার ছিন্ন যারা
তারাই পূজারী
তোমার নামে নৈবেদ্য
তাদের চিরা তারী।
বেঁচে থাকো রবিঠাকুর
চিরজীবি হয়ে
তোমার যারা ইষ্টকারী
তারাই মরে ভয়ে।
বন্ধুগণের হস্ত হতে
রক্ষা করুন হরি
শত হাতে পড়েছো হে
কর্ণধরা তরী।
পাড়ায় পাড়ায় ধামোয়ারী
পাড়ায় পাড়ায় সং
একটা মরদ নাই
শুধু ভক্ত রং

———

মহান বিপ্লবী রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের মহাপ্রয়াণ

গত ২৯শে এপ্রিল রাজধানী দিল্লীনগরীতে অগণিত মানুষের হৃদয়রাজ্যের রাজা প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ মৃত্যুবরণ করেছেন। ভারতের নবজাগরণের যুগ উনবিংশ শতাব্দীতে তিনি ভারতভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন করে ভারতকে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশজননীর সেবায় যাঁরা আত্মনিবেদন করেছিলেন, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ছিলেন সেই অগ্রপথিকদলের অন্যতম প্রধান। এই অনিত্য সংসারে প্রতিদিন কত ক্ষুদ্র জীব জন্মগ্রহণ করে ও মরণের কোলে চলে পড়ে তার সংখ্যা নেই। কিন্তু রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের মত মানুষ ন ভূতো, ন ভবিষ্যতি। উনবিংশ শতাব্দীতে যে সব মানুষ ভারতের ভাগ্যাকাশে আলোক বিকীর্ণ করেছিলেন, মহেন্দ্রপ্রতাপ ছিলেন সেই আলোক-দিশারী দলের একজন সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এদের প্রদত্ত আলো কখন ম্লান হয় না, এর দীপ্তি দেশকাল অতিক্রম করে চিরভাস্বর হয়ে থাকে এবং দেশ-বিদেশের অত্যাচারিত, নিপীড়িত, বিশেষ করে স্বাধীনতাকামী মানুষের মনে জোগায় উৎসাহ, প্রেরণা, সৃষ্টি করে চরিত্রবল, আদর্শনিষ্ঠা ও মরণবিজয়ী সঙ্কল্প। তাই দৈহিকভাবে এঁদের মৃত্যু হলেও এঁরা চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন জগতের ইতিহাসে।

পৃথিবীতে এক একজন মানুষ আসেন যাঁরা নিজেদের প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে, অন্ধকারের মধ্যে চলার পথে আলোকবর্তিকা তুলে ধরেন, যাদের রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সাধক, প্রেমিক ও পাগল। মহেন্দ্রপ্রতাপ এই জাতের একজন মানুষ ছিলেন। রাজ-সিংহাসন, সম্পদ সুখ ত্যাগ করে মানব কল্যাণের জন্য একদা ভগবান বুদ্ধ তপস্যায় নিরত ছিলেন। এঁরা জগতে আসেন একটি মিশন নিয়ে। প্রিয়ার মিনতি, অপত্যস্নেহ, ঐশ্বর্য্য কোন কিছুই এদের বিধি নির্দিষ্ট চলার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনা। মহেন্দ্রপ্রতাপও তাই পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে ভারতবাসীর মুক্তির জন্য মহাপরিব্রাজকের মতো পৃথিবীময় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। উদ্দেশ্য লাভের জন্য রাজ-ভিক্ষুকের মত ভিক্ষাপাত্র হাতে সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন। পরহিতব্রতে এমন missionary zeal নিয়ে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। সঙ্কল্প সাধনের জন্য মহেন্দ্রপ্রতাপ দীর্ঘ একত্রিশ বৎসর কাল স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করেছিলেন। মহেন্দ্রপ্রতাপ ছিলেন সত্যিই অনন্যসাধারণ।

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের জীবন ইতিহাস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রায় একটি পূর্ণ ইতিহাস বলে আখ্যাত হতে পারে। জন্মভূমির স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি জার্মানী, আমেরিকা, রাশিয়া, আফগানিস্তান ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স নামে একটি বৈপ্লবিক সংগঠনের অন্যতম প্রধান ছিলেন। আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত গদর পার্টির তিনি একজন

প্রাণপুরুষ। ১৯১৫ সালে আফগানিস্তানে তিনি অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন করেন। তিনি ছিলেন এই সরকারের প্রেসিডেন্ট, বরকতউল্লা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ১৯১৯ সালে আফগানিস্তানে লেনিনের সঙ্গে তিনি দেখা করেন অন্যান্য কয়েকজন বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে নিয়ে। তিনি ট্রটস্কির সঙ্গেও দেখা করেন। পশ্চিমী দেশগুলির থেকে সাহায্য পেতে ব্যর্থ হয়ে তিনি আমেরিকায় চলে যান এবং গদর পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করতে থাকেন। ঐ দল তাঁকে ১৯২৬ সালে তিব্বতে পাঠায়, সেখানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটাতে। তিনি ইয়োকোহামা, মেক্সিকো, সানফ্রান্সিস্কো, মস্কো, পিকিং প্রভৃতি স্থানে উথার মত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ঘুরে বেড়ান। বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারীর সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন।

১৯৪৫ সালে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করে দেখতে পান তাঁর স্ত্রী মৃত, ধনসম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত। এতদিনে তিনি দেশের মধ্যে প্রায় অলৌকিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি বলে পরিগণিত হয়েছিলেন।

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ যখন জমিদারী উচ্ছেদের জন্য মত প্রকাশ করেন, তখন এটা কল্পনার অতীত ছিল। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধেও তিনি সংগ্রাম করেছিলেন এবং তখনকার দিনে সাতাশ হাজার টাকা দিয়ে ১৯০৯ সালে প্রেম মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন, সেখানে ধর্ম ও জাতপাতের বিধিনিষেধ ছিল না। মুসলিমলীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময় তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করেও সাম্প্রদায়িক মৈত্রী স্থাপন করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। মহেন্দ্র প্রতাপ সুবক্তা ছিলেন এবং একজন সাংবাদিকও ছিলেন। 'নিরবল সেবক,' 'প্রেম' নামক আমাদের দুটি হিন্দী ও উর্দু পত্রিকাও স্থাপন করেছিলেন। একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধের মাধ্যমে মহেন্দ্রপ্রতাপের জীবনী শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে ধরা অসম্ভব। তবু নৈবেদ্যের আয়োজন সামান্য হলেও, আন্তরিকতাপূর্ণ, এই আমাদের ভরসা।

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একজন পরম বন্ধু ছিলেন। লোকসভার সদস্য হিসাবে এবং তারপরেও এদের তরফ থেকে যখনই তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া হয়েছে, তখনই তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সর্বরকমে সাহায্য করেছেন সদুপদেশ দিয়ে, এবং তাঁদের সমস্ত দাবীদাওয়া আদায়ের সমর্থনে সব সময়েই এগিয়ে এসেছেন। দক্ষিণেশ্বর ও ভারত মহাসভা ভবনে অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কনফারেন্সে তিনি যোগ দিয়েছিলেন।

আমরা এই মহান জননায়ক আজীবন সংগ্রামীর উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

———

চিঠিপত্র

মজুদর ও মজুরী

এবার আর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমালোচনা নয়। প্রত্যক্ষ দর্শকের ভূমিকায় মাত্র দু চারটী প্রশ্ন। জানি না, কোথায় কার বিরুদ্ধে বা পক্ষে আমাকে পরিচিতি কুড়োতে হবে। তবুও লিখতে হচ্ছে, কারণ নীরবতার প্রকৃত তাৎপর্য্যই হচ্ছে সমর্থন, সুতরাং যা সমর্থন করা সম্ভব নয়, তার বিরুদ্ধাচরণ করতেই হবে, যদিও জানি – ওরা যা করার তা' করবেই।

কংগ্রেসীরা নাকি টাটা বিড়লার দালাল, তাই ওদের আমলে শ্রমিক সাধারণের তেমন কিছুই হয়নি একথা বলে জ্যোতিবাবুরা বেঁচে ছিলেন আর বাঁচিয়ে রেখে ছিলেন ঐ বঞ্চিত মানুষগুলোকেও। অবশ্য একে অন্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কোথাও প্রকাশ্যে কোথাও গোপনে ওদের কাজ চালাচ্ছিলেন।

পশ্চিম বাংলায় গান্ধীবাদী নেতা প্রফুল্ল সেন মশাইয়ের হাত ধরে রাস্তায় হামাগুড়ি দিয়ে নেমেই হাঁটতে শিখলো আর দৌড়তে শুরু করে দিল। বৃদ্ধ প্রফুল্লচন্দ্র হাঁপিয়ে উঠলেন। ছাড়তে বাধ্য হলেন ওদের সাথে হাঁটা। ওরাও ওদের পথে এগিয়ে চললেন। কলকারখানার মালিকরা নাকি সবাই এককালীন কংগ্রেসীদের কুশিক্ষায় প্রভাবিত —তাই তাঁরাও নাকি ওদের সাথে বামসুলভ ব্যবহার শুরু করলেন একটু "বে-কায়দায়" ফেলার জন্য। কিন্তু যেখানে ওরা মালিক সেখানে তালা বন্ধ কেন? কেউ কেউ বলেন ঐ কর্মীগুলো নাকি সেই কংগ্রেসী মার্কা যুগের আদব কায়দায় বেড়ে উঠেছে—তাই মহামান্য কার্লমার্কসের উপদেশ নিতে চাইছে না—সুতরাং চার্জশীট, ছাটাই এবং "লক-আউট" করে ওদের কার্লমার্কস দর্শন পড়াতে হবে অথবা নুতন ছাত্র ভর্ত্তির রাস্তা তৈরী করতে হবে।

এই উলঙ্গ চক্রান্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে—বঙ্গীয় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতির তালা বন্ধের মাধ্যমে। ৩০,০০০ রোগীর চিকিৎসা বন্ধ হল; সরকার নীরব। বিশিষ্ট মার্কসবাদী বিনয় ডাক্তারের নুতন দাওয়াই ওরা চেষ্টা করে দেখছেন—যদি কোন সুফল পাওয়া যায় তা' হলে এ দাওয়াইটা বাজারে চালু করলে চলবে।

অবশ্যই আমি দু'চার জন মার্কসবাদী কর্মীর কাছে শুনেছি যে বিনয়বাবু মার্কসবাদী দলের ডাক্তার নন বা নিজেও মার্কসবাদী নন—তবে যাঁরা মার্কসবাদে বিশ্বাসী তাঁদের কারো

কারো নাড়ী টেপেন—অবশ্যই আশ্রয়প্রার্থী বলে মনের ভাব দেখান না। যেমন কংগ্রেসী আমলেও দু'চার জন কংগ্রেসীর নাড়ীও নাকি টেপাটিপি করতেন, এই টেপাটিপির পেছনে একটি রহস্য নিশ্চয়ই আছে—তা' হচ্ছে বেনামী—বেনামী সম্পত্তি।

আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে, শুধু নাড়ী টেপানোর লোভেই বামফ্রন্ট নেতা তথা, সি, পি, এম নেতা প্রমোদবাবু বিনয় বাবুকে ডাক্তারী ডিগ্রীর মত একটি সি পি. এম ডিগ্রীও ব্যবহার করতে দেবেন। আমি সমস্ত বামফ্রন্ট নায়কদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি—এগিয়ে আসুন আপনাদের সততার ঝুলি নিয়ে প্রকাশ্য বিচারের জন্য, আমি প্রমাণ করে দেব—বিনয় ডাক্তার বামফ্রন্টের নাম তথা অজুহাতে কতবড় অসৎ ও অসত্যের প্রশ্রয়দাতা। একটি সেবা প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছেন। ৩০,০০০ মানুষকে মৃত্যুর হাতে ঠেলে দিয়ে প্রমাণ করলেন যেন নট্রকোম্পানীর কথাটিই ঠিক—"যমরাজ যদি ডাক্তার হতেন।"

আমার আবেদন বিবেকবান নাগরিক, ছাত্র যুব, শিক্ষাবিদ, আইনজীবি, আপনারা আসুন, দেখুন কার্লমার্কসের নাম নিয়ে এরা গণহত্যার চক্রান্তে লিপ্ত—আমি প্রমাণ করবো —আপনারা স্বচ্ছ করে আসুন—বাঁচান ৩০,০০০ যক্ষ্মা রোগীকে আর এই পবিত্র সেবা মন্দিরটীকে।

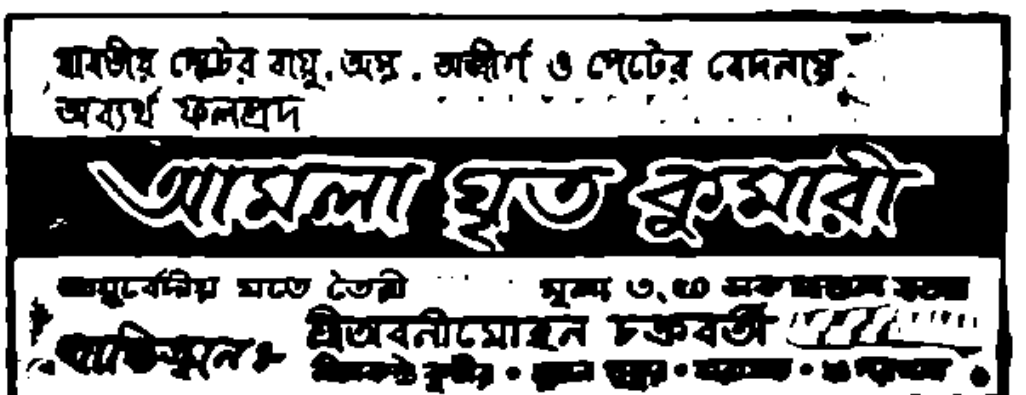

কবি-প্রণাম

সংক্ষিপ্ত জীবন পঞ্জী

ধরণীর তলে গগনের গায়
সাগরের জলে অরণ্য ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।
সংসার মাঝে দুয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দুয়েকটি কাঁটা করি দিয়া দূর
তার পরে ছুটি নিব॥

কবি সকলের জীবনকে রঙিন করিয়াই ছুটি নিয়াছেন—আজ থেকে ৩৮ বছর আগে ৭ই আগষ্ট ১৯৪১ সালে। (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮)

১৮৬১ সালে ৭ই মে মঙ্গলবার (২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮)—কবি কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্দশ সন্তান। মাতা সারদাদেবী।

১৯৬৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ বোলপুর ভুবনডাঙ্গার কাছে ৩ একর জমি সংগ্রহ করেন—শান্তিনিকেতন এই জমিতেই প্রতিষ্ঠিত।

১৮৬৯-৭০—(বয়স ৮-৯) বালক রবীন্দ্রনাথ ওরিয়েন্টাল মিশনারী ও পরে কলিকাতা নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন।

১৮৭১-৭২—(বয়স ৯-১০) বেঙ্গলএকাডেমী (Anglo Indian School)-তে ভর্তি হন, কিন্তু স্কুলে যাওয়া মোটেই পছন্দ করতেন না।

১৮৭৩—(বয়স ১২) পিতার সঙ্গে প্রথম শান্তিনিকেতনে যান। ঐ বছরই পিতার সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন এবং অমৃতসর ও ডালহৌসীতে পিতার কাছে সংস্কৃত, ইংরাজি ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রাথমিক পাঠ নেন।

১৮৭৪—(বয়স ১৩) কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পর St. Xaviers School-এ ভর্তি হন। এই সময় তিনি Macbeth-এর বাংলা অনুবাদ করেন—পরে ইহা "ভারতী"তে প্রকাশিত হয়।

১৮৭৫—(বয়স ১৩) কলকাতার বার্ষিক হিন্দু মেলাতে স্বরচিত দেশানুরাগোদ্রেক কবিতা পাঠ করেন। ৮ই মার্চ রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ হয়।

১৮৭৬—(বয়স ১৫) মাসিক পত্রিকা "জ্ঞানাঙ্কুর"-এ তাঁর দীর্ঘ কবিতা 'বনফুল' প্রকাশিত হইতে থাকে।

১৮৭৭—(বয়স ১৬) দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে তদানিন্তন ভাইসরয় Lord Lytton-এর দিল্লীর দরবারে জাঁকজমককে ব্যঙ্গ করিয়া হিন্দু মেলায় কবিতা পাঠ করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে 'অলীকবাবু' নাটকে 'অলীকবাবু'র ভূমিকায় প্রথম যোগ দেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকাতে ভানু সিংহ ঠাকুর ছদ্মনামে গল্প 'ভিখারিণী', কবিতা 'কবি কাহিনী' ও অন্যান্য নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত করিতে থাকেন।

১৮৮৮—(বয়স ১৭) অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর কাছে আমেদাবাদ যান। এবং তাঁরই সঙ্গে মার্চ মাসে ইউরোপ যাত্রা করেন। Brighton School-এ ভর্তি হন, পরে University College, of London-এ Prof. Henry Morley-র কাছে ইংরাজী সাহিত্যের পাঠ নেন।

১৮৮০—(বয়স ১৯) ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৮৮১—(বয়স ২০) প্রথম গীতিনাট্য 'বাল্মিকী প্রতিভা' রচনা করেন। 'ভারতী'তে 'চীনে মরণের ব্যবসা' নামে আফিং ব্যবসায়ীদের তীব্র আক্রমণ করেন। মেডিকেল কলেজের বক্তৃতা মঞ্চে প্রথম সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলী ও আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্য রওনা হ'ন কিন্তু মাদ্রাজ হতেই ফিরে আসতে হয়।

পিতার সঙ্গে দেখা করবার জন্য মুসৌরী যান। 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' এই সময় রচনা করেন। 'ভারতী'তে বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' প্রকাশিত হতে থাকে।

১৮৮২—(বয়স ২১) গীতিনাট্য 'কাল মৃগয়া' রচনা করেন। এই সময় তিনি ৯০, সদর ষ্ট্রীটে বাস করতেন। এই বাড়ীতেই তিনি তার বিখ্যাত কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ' রচনা করেন। অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সারস্বত সমাজ' প্রতিষ্ঠার কাজে বিশেষ সহায়তা করেন।

১৮৮৩—(বয়স ২২) বোম্বাই-এর কারওয়ারে কিছুদিন বাস করেন। 'ভারতী'তে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' প্রকাশিত হয়। মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ (৯ই ডিসেম্বর)।

১৮৮৪—(বয়স ২৩) আদি ব্রহ্মসমাজের সম্পাদকের পদে ব্রতী হন। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনা করেন।

১৮৮৫—(বয়স ২৪) 'মুকুট' 'রাজর্ষি' এবং অন্যান্য বহু গান, প্রবন্ধ রচিত হয়। অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে শোলাপুর ও বান্দ্রায় কিছুকাল বাস করেন।

১৮৮৬—(বয়স ২৫) ডিসেম্বর মাসে দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতিয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে স্বরচিত উদ্বোধনী সঙ্গীত ('আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে, ঘরের হ'য়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কতদিন থাকে') করেন।

১৮৮৭—(বয়স ২৬) 'মানসী', 'চিঠিপত্র', 'আলস্য ও সাহিত্য' ও অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হয়।

১৮৮৮—(বয়স ২৭) জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম। 'মায়ার খেলা' প্রকাশিত হয়।

১৮৮৯—(বয়স ২৮) 'রাজা ও রাণী' রচিত হয়।

১৮৯০—(বয়স ২৯) 'বিসর্জন নাটক রচিত হয়—রঘুপতির ভূমিকায় ঠাকুর বাড়ীতে অভিনয় করেন। Tagore Estate-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন শিলাইদহ বাস করেন। অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ও লোকেন পালিতের সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিদেশ ভ্রমণে যান—ইটালী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড। দ্বিতীয় কন্যা রেণুকার জন্ম।

১৮৯১—(বয়স ৩০) ইয়োরোপ যাত্রীর ডায়েরীপ্রকাশিত হয়—'সাধনা' মাসিক পত্র প্রকাশ করেন।

১৮৯২—(বয়স ৩১) 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'সোনার তরী' রচিত হয়। মাতৃভাষায় শিক্ষার যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ 'শিক্ষার হের ফের' সাধনায় প্রকাশিত হয়। তৃতীয় ও কনিষ্ঠা মীরার জন্ম।

১৮৯৩—(বয়স ৩২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে চৈতন্য লাইব্রেরীতে 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৮৯৪—(বয়স ৩৪) 'ক্ষুধিত পাষাণ'।

১৮৯৬—(বয়স ৩৫) চিত্রা, নদী, জীবন দেবতা, মানসী।

১৮৯৭—(বয়স ৩৬) নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দেন। ইংরাজী ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় সম্মেলনের কাজ চালানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হন।

'বৈকুণ্ঠের খাতা,' 'গান্ধারীর আবেদন,' 'সতী,' 'নরক বাস' রচিত হয়।

১৮৯৮—(বয়স ৩৭) কারমাটারে (সাঁওতাল পরগণা) বায়ু পরিবর্তনে যান। 'ভারতী' সম্পাদনার ভার নেন। New sedition Act 1898-এর বিরুদ্ধে কলকাতা টাউন হলে প্রতিবাদ সভায় 'কণ্ঠরোধ' রচনার মাধ্যমে তীব্র আক্রমণ করেন।

বাল গঙ্গাধর তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে একাধিক প্রবন্ধ লেখেন ও তিলকের মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। লক্ষ্মীর পরীক্ষা' রচনা করেন।

১৮৯৯—(বয়স ৩৮) কলকাতায় প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দেয়—ভগিনী নিবেদিতার সহযোগিতা করেন। ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দেন এবং রেঃ কালীচরণ ব্যানার্জীর ইংরাজী ভাষণের বাংলা অনুবাদ করেন।

১৯০০—(বয়স ৩৯) কণিকা, কথা, চিরকুমার সভা রচিত হয়।

১৯০১—(বয়স ৪০) বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পুনঃ প্রকাশ করেন। 'চোখের বালি' প্রকাশিত হতে থাকে। 'নৈবেদ্য' এই সময়ই লিখিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নৈবেদ্যের কবিতায় বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ছাপাইবার ব্যয় বহন করেন।

সপরিবারে শান্তিনিকেতনে বাস করিবার জন্য আসেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্কুল উদ্বোধন করেন এবং নিজে শিক্ষকতা সুরু করেন এবং ছাত্রদের সকল কর্ম্মে সাহচর্য্য দেন। এই স্কুলের প্রথম শিক্ষকগণের মধ্যে জগদানন্দ রায়, William Lawrence, রেওয়া চাঁদ, পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। পরে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, হরিচরণ ব্যানার্জি ও কবি সতীশ চন্দ্র রায় যোগ দেন।

১৯০২—(বয়স ৪১) অত্যন্ত আর্থিক অনটনে পুরীর বাড়ী বিক্রয় করে দেন এবং স্ত্রী মৃণালিনী দেবীও তার স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয় করে স্কুল ও অন্যান্য দেনা শোধ করেন।

কলকাতা ইউনিভার্সিটির কনভোকেশনে Lord Curgeon কর্তৃক প্রাচ্য দেশীয়দের সম্বন্ধে কটূক্তির প্রতিবাদ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করেন।

২৩শে নভেম্বর শ্রীমৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়।

১৯০৩—(বয়স ৪২) বঙ্গদর্শনে 'নৌকাডুবি' প্রকাশ হইতে থাকে।

১৯০৪—(বয়স ৪৩) গঠন মূলক জাতীয়তাবাদ, গ্রাম সংগঠন এবং নানা রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়।

কলকাতা টাউন হলে 'শিবাজি উৎসব' বিখ্যাত কবিতা পাঠ করেন।

১৯০৫—(বয়স ৪৪ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেহত্যাগ (19 January 1905/ ৬ই মাঘ, ১৩১১)।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বাস করতে আসেন। মাসিক পত্রিকা 'ভাণ্ডার' প্রকাশ করেন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে থাকে। ত্রিপুরা রাজের আমন্ত্রণে আগরতলা যান—New Bengal School of Act এর সংগঠনে Count Okakura ও ভগিনী নিবেদিতাকে সক্রিয় সাহায্য দেন।

১৯০৫—(বয়স ৪৪) Lord Curgeon এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। 'রাখী বন্ধন' উৎসব পালনে বিরাট শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করেন। কলকাতা টাউন হলে বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। এই উপলক্ষে তিনি একাধিক গান রচনা করেন—

বিধির বিধান কাটবে এমন শক্তিমান
তুমি কি এমনি শক্তিমান।
আমাদের ভাঙ্গা গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান।

রাখী বন্ধনের আর একটি বিখ্যাত গান—

বাংলার মাটী বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।

ইংরেজ সরকার ছাত্রদের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত নিষিদ্ধ করে দেন। বহু জনসভায় রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদ করেন।

১৯০৭—(বয়স ৪৬) প্রবাসীতে 'গোরা' উপন্যাস প্রকাশিত হতে শুরু হয়। বোমার মামলায় অভিযুক্ত অরবিন্দের উদ্দেশ্যে লেখেন—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু স্বদেশ আত্মার
বাণী মূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ, কোনো ক্ষুদ্র দান

চাহ নাই কোন ক্ষুদ্র কৃপা, ভিক্ষা লাগি
বাড়াওনি আতুর অঙ্গুলী। আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ববাধাহীন।

●

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে
তব শুভ আশিষ মাগে
গাহে তব জয় গাথা।

১৯০৮—(বয়স ৪৭) পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে তিনি মানিকতলার বোমার কারখানা, মুজাফ্ফরপুরের বোমা বিস্ফোরণ, বারীন ঘোষ ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ইংরাজের অমানুষিক অত্যাচারেই আদর্শবাদী বাঙালী যুবক হিংসার পথ অনুসরণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

১৯০৯—(বয়স ৪৮) প্রায়শ্চিত্ত, শরতত্ব, 'ধর্ম'। 'তপোবন' শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের আদর্শ ব্যাখ্যা। গোরা, রাজা, শান্তিনিকেতন, গীতাঞ্জলী ও প্রবাসীতে জীবনস্মৃতি প্রকাশিত হয়

১৯১১—(বয়স ৫০) জাতীয় কংগ্রেসে "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে" গানটী গীত হয়। এই প্রসিদ্ধ গানটী রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ব্রাহ্ম সমাজে মাঘোৎসবে গান।

১৯১২—(বয়স ৫১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিরাট সম্বর্দ্ধনা জানায়। ২৭ মে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে তৃতীয়বার বিদেশ যাত্রা করেন। তাঁর কিছু কবিতা ইংরাজীতে তর্জ্জমা করে Rothensteinকে দেখান। পরে W. B. Yeats বিদগ্ধজন সমক্ষে পাঠ করেন। C. F. Andrews এর সঙ্গে এই সভাতেই পরিচয় হয়। এই কবিতাগুচ্ছই 'গীতাঞ্জলী' নামে প্রকাশিত হয় এবং বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

১৯১৩—(বয়স ৫২) ১৩ই নভেম্বর সাহিত্যে Noble prize এর কথা ঘোষিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত D,Litt উপাধি প্রদান করেন।

১৯১৪—(বয়স ৫৩) ২৯শে জানুয়ারী বাংলার গভর্ণর Lord Carmichael বিশেষ সম্বর্দ্ধনা সভায় Noble prize ও পদক প্রদান করেন। W. W. Pearson শান্তিনিকেতনে আসেন। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজ পত্রে' অজস্র গান, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা করেন। এলাহাবাদ অবস্থানকালে বিখ্যাত 'শা-জাহান' কবিতা লেখেন।

১৯১৫—(বয়স ৫৪) গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত Transval-এর Phoenix School এর ছাত্র শিক্ষকগণ শান্তিনিকেতনে আসেন। গান্ধীজী ও শ্রীমতিী কস্তুরী বাঈ শান্তিনিকেতনে আসেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বিশেষ সভায় সম্বর্দ্ধিত করেন। ওরা জুন ভারত সম্রাট তাঁকে Knighthood প্রদান করেন। 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ' 'ফাল্গুনী' 'বলাকা' রচনা করেন। বাংলা ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত এই মর্ম্মে তিনি রামমোহন লাইব্রেরী হ'লে "শিক্ষার বাহন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৯১৬—(বয়স ৫৫) C F. Andrews, Pearson ও মুকুল দে-কে সঙ্গে লইয়া জাপান ভ্রমনে যান। জাপানে Tokyo ও Keio Gijiku বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ প্রসঙ্গে জাপানের চীনের উপর আগ্রাসী নীতির নিন্দা করেন। পরে আমেরিকায় ভ্রমণে Yale Universi y ও অন্যান্য শহরে অনেক বক্তৃতা দেন। পুনরায় তিনি জাপান হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৯১৭—(বয়স ৫৬) সাধারণ ব্রহ্মসমাজ আচার্য্য ব্রজেন শীলের সভাপতিত্বে বিশেষ সম্বর্দ্ধনা জানান। অ্যানি বেসান্টের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ' কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম" প্রবন্ধটি জনসভায় পাঠ করেন।

সেই সভাতেই তিনি স্বরচিত গানটি করেন—

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীর বৃন্দ আসন তব ঘেরি।

১৯—১৯(বয়স ৫৮) দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যান।

১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে কবি বিচলিত হইয়া অসুস্থ শরীরে কলকাতায় আসেন এবং বিক্ষোভ সভার আয়োজন করেন! এই হত্যার প্রতিবাদে তিনি Knighthood ত্যাগ করেন। ৩০শে মে ভাইসরয়কে লেখেন

"The very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen, surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in the iucongnous context of humilation. and I for my hart wish to stand shorn of all special distinctions. dy the side of those of my countrymen who for then so called insignificance, are liable to suffer degradarion not fit for human beings."

১৯২০—(বয়স ৫৯) উত্তর ভারত ভ্রমণে যান। গান্ধীজীর সবরমতি আশ্রমে একদিন বাস করেন। পঞ্চমবার বিদেশে যাত্রা করেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেপ ভ্রমণ করেন—পরে আমেরিকায় যান। Rome in Rolland, Bergson. Sylvian Levy প্রমুখ মণীষীদের সহচর্য্যে আসেন। আমেরিকায় একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন।

১৯২১—(বয়স ৬০) গান্ধীজী জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিভৃতে অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

২২শে ডিসেম্বর আচার্য্য ব্রজেন্দ্র শীল আনুষ্ঠানিক ভাবে বিশ্বভারতী উদ্বোধন করেন। শান্তিনিকেতনের সকল সম্পত্তি 'বিশ্বভারতী'র নামে দান (trust deed) করিয়া দেন।

১৯২২—(বয়স ৬১) দক্ষিণ ভারত ও সিংহল পরিভ্রমণ, 'শিশু ভোলানাথ' সুধারণ, লিপিকা প্রকাশ।

১৯২৩—(বয়স ৬১) 'রক্ত করবী' প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতীকে গ্রন্থসত্ব দান পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণ।

১৯২৪—(বয়স ৬৩) চীন ভ্রমণে যান এবং পথে জাপান হ'য়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। চীনের সর্বত্র তিনি বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন।

১৯২৫—(বয়স ৬৪) দক্ষিণ আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ ভ্রমণে যান। গান্ধীজীর শান্তিনিকেতনে আগমন। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে কবি মর্মাহত হয়ে লেখেন।

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান॥"

১৯২৬—(বয়স ৬৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ঢাকায় যান। পরে কুমিল্লায় অভয় আশ্রমের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন। ত্রিপুরা রাজ্যের আমন্ত্রণে আগরতলা হয়ে কলকাতায় ফেরেন। ইতালীর আমন্ত্রণে অষ্টমবার বিদেশ যাত্রা। মুসোলিনী কর্তৃক রাজকীয় সম্বর্দ্ধনা।

১৯২৬—(বয়স ৬৫) রোমাঁ্যা রোঁলার আমন্ত্রণে সুইজারল্যাণ্ড গমন। ফ্যাসিষ্ট সরকারের পরিচয় লাভ এবং প্রতিবাদে ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে পত্র প্রেরণ। অষ্ট্রিয়া ও ইংল্যাণ্ড হইয়া নরওয়ে ও সুইডেন যাত্রা। নরওয়ে রাজার অভ্যর্থনা। ডেনমার্ক হইয়া জার্মানী আগমন এবং ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা। চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লোভিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস ও মিশর হয়ে ৭ মাস পরে দেশে প্রত্যাবর্তন।

'লেখন', 'বৈকালী', 'নারীর পূজা', 'চিরকুমার সভা', 'শোধবোধ'।

১৯২৭—(বয়স ৬৬) ভরতপুর, আগ্রা, জয়পুর ও আমেদাবাদ ভ্রমণ। শিলং-এ 'যোগাযোগ' উপন্যাসের সূচনা। 'নটরাজ', 'মৃত্যুরঙ্গ'। নবমবার বিদেশযাত্রা। মালয়, বালী, জাভা, শ্যামদেশ হয়ে প্রত্যাবর্তন। বসুমতিতে শেষ রক্ষা।

১৯২৮ (বয়স ৬৭) পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সিংহল ও বাঙ্গালোর ভ্রমণ।
'শেষের কবিতা' রচনা।

১৯২৯—(বয়স ৬৮) কানাডার আমন্ত্রণে দশমবার বিদেশ যাত্রা। জাপান হয়ে ভ্যানকুভারে বক্তৃতা। যুক্তরাষ্ট্রের নানা শহরে বক্তৃতা। জাপান ও ইন্দোচীন হয়ে প্রত্যাবর্তন। তপতী, মহুয়া।

১৯৩০—(বয়স ৬৯) পুনরায় বিদেশ ভ্রমণ। ফ্রান্স হয়ে ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড হিবার্ট লেকচার—পরে জার্মানীতে আইনষ্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাতকার। ডেনমার্ক হয়ে রাশিয়ায় গমন। রাশিয়ায় বিপুল সম্বর্দ্ধনা।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

১৯৩১—(বয়স ৭০) হিজলীর বন্দী শিবিরে গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে ১লা অক্টোবর জনসভায় বক্তৃতা। প্রথম কবিতা রচনা।

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—
তারা বলে গেল "ক্ষমা করো সবে বলে গেল 'ভালবাসে'—
অন্তর হ'তে বিদ্বেষ বিষ নাশো।"

রাশিয়ার চিঠি, বঙ্গবাণী, সহজ পাঠ।

১৯৩২—(বয়স ৭১) গান্ধীজীর কারাদণ্ডে বৃটিশ মন্ত্রীকে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। আমন্ত্রিত হয়ে পারস্যে গমন। রেজা শা পহ্লবী ও পারস্যবাসীর বিপুল সম্বর্ধনা। ইরাক হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন। মদনমোহন মালব্যের শান্তিনিকেতন আগমন।

১৯৩৩—(বয়স ৭২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন উপলক্ষে বক্তৃতা। রামমোহন মৃত্যু শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব।

দুইবোন, বিচিত্রিতা. চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, বাঁশরী।

১৯৩৪—(বয়স ৭৩) জহরলাল নেহেরুর শান্তিনিকেতন আগমন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সিংহল ও দক্ষিণভারত পরিক্রমা।

১৯৩৫—(বয়স ৭৪) কাশীহিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনে ভাষণ এবং ডি. লিট উপাধী লাভ। জাপানী কবি নোগুচির শান্তিনিকেতন আগমন।

১৯৩৬—(বয়স ৭৫) অর্থ সংগ্রহে উত্তর ভারত যাত্রা। গান্ধীজির সাহায্যে ৬০,০০০ টাকা সংগ্রহ। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রতিবাদে বক্তৃতা।

পত্রপুট, ছন্দ, শ্যামলী সাহিত্য, জাপানে-পারস্যে পাশ্চাত্য ভ্রমণ।

১৯৩৭—(বয়স ৬৭) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে সর্বপ্রথম বাংলায় অভিভাষণ। শান্তিনিকেতনে চীনা ভবনের উদ্বোধন।

১৯৩৮—(বয়স ৭৭) এণ্ড্রুজ কর্তৃক হিন্দি ভবনের ভিত্তি স্থাপন। গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯৩৯—(বয়স ৭৮) ২১শে জানুয়ারী জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্রের শান্তিনিকেতনে আগমন।

১৯শে আগষ্ট মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

১৯৪০—(বয়স ৭৯) ১৭ই ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী ও কস্তুরবাই আশ্রমে আগমন।

১৯৪১—(বয়স ৮০) ১লা বৈশাখ তারিখে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আশীতম বর্ষপূর্তী উৎসব। জন্মদিনের ভাষণে 'সভ্যতার সঙ্কট' লেডি রাণুর খোলা চিঠির উত্তরে রোগ শয্যা হতে বিবৃতি। ৩০শে জুলাই অস্ত্রোপচারের পূর্বে মুখে মুখে সর্বশেষ রচনা. "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি"। ৭ই আগষ্ট ১৯৪১ (২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮) রাখী পূর্ণিমার দিন বেলা বারোটার কিছুপরে ৮০ বৎসর ৩ মাস বয়সে জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বাড়ীতে দেহত্যাগ।

কবিগুরু যদি আজ থাকতেন

—মলয় ঘোষ

আরেকবার পঁচিশে বৈশাখ এলো জাতির জীবনে। আজ বেঁচে থাকলে কবিগুরুর বয়স হতো ১১৮ বছর। ভাবতে খুব আশ্চর্য্য লাগে, বর্তমান যুগ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে জীবিত কবিগুরুর ভূমিকা কি হতো, কেমন হতো তাঁর মানসিক অবস্থাটা! আমার মনে হয়, জাতির অধঃপতন ও ক্রমনিম্নাভিমুখিতার এই ভয়াবহ দুর্দিনে কবির্মনীষী হয়তো আত্মগোপন করতেন লোকান্তরালে অথবা 'মরিয়া প্রমাণ করিতেন যে 'তিনি মরেন নাই।' কারণ কল্পনার জগতে বিচরণ করলেও তিনি ছিলেন একজন খাঁটি 'সহৃদয়-হৃদয়সম্বাদী'—তাঁর দেশের মানুষের কাছে, বিশ্বের তাবৎ মানবশ্রেণীর কাছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আজীবনের সাহিত্য সাধনায় যে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের জয়গান গেয়েছেন, তার মূল উপজীব্য ছিল মানুষ। তাঁর জীবনদেবতা মাটির মানুষেরই দৈবী স্বরূপ। আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে তিনি যে পরমের সন্ধান পেয়েছিলেন—তা' প্রকৃতপক্ষে একজন মানবপুত্রের আত্মানুসন্ধানেরই ফলশ্রুতি। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার দৈনন্দিনতায় যে রূপাতীতের, যে অরূপের বর্তমানতা – সুন্দরের পূজারী কবি, তাকেই আবাহন জানিয়ে গেছেন। শিশুতীর্থের ভক্ত যে পরমতম উত্তরণের সন্ধান দেয় দিক্‌ভ্রান্ত মানুষকে যুগে যুগে তারই অন্বেষনে কবি লিখেছেন কবিতা, সাধক বেঁধেছেন গান, মহাপুরুষ দিয়েছেন আত্মবিসর্জন। অসংখ্য দুঃখ আর হতাশাকে অতিক্রম করে মানুষের যুগযাত্রা সেই পরমাকে উপলব্ধির তাগিদে। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যকেই বারবার প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তাঁর লেখায়, গানে, কবিতায়।

বর্তমানের অবক্ষয়ী মুহূর্তের পরিপ্রেক্ষীতে, মূল্যবোধ হীনতার যুগযন্ত্রণায় ভাববিলাসী রবীন্দ্রনাথকে অনেকে 'পলায়নবাদী' বলেছেন—অনেকে বুর্জোয়া আখ্যা দিয়েছেন। কবি নিজেও স্বীকার করেছেন নিজের ব্যর্থতা—মাটির মানুষের কাছাকাছি আসার, কৃষাণের জীবনের শরিক হওয়ার কাজে। 'জীবনে জীবন যোগ করা, না হলে কৃত্রিম পণ্য ব্যর্থ হয় গানের পসরা'—এ তাঁরই কথা, তাঁরই নির্দেশিত আদর্শ। কবির নিজের সৃষ্টিও তাই 'গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী'। আসলে মানুষকে ভালোবাসাই সমস্ত সাহিত্যকর্মের মূলাদর্শ—তবেই তা সার্থক, তা উত্তীর্ণ। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যেরই

অনুসারী ছিলেন। কিন্তু পারিবারিক আভিজাত্য ও কবিত্বশক্তির সর্বময়তা তাঁকে শুধুমাত্র এই ভাবনাতেই আবদ্ধ থাকতে দেয়নি—তা ছড়িয়ে পড়েছে বহুবিস্তৃত পরিধিতে—বিচিত্রভাবে, ভাবনায়, বিচিত্রতর ধ্যানধারণায়। তাই, কিন্তু গোয়ালার গলির একতলা বাড়ির স্যাঁতাপড়া দেওয়াল ঘেরা অন্ধকুঠরীতে বসে হরিপদ কেরাণী তার সাযুজ্য খুঁজে পায় 'আকবর বাদশার' সঙ্গে, বাংলাদেশের গরীব ঘরের 'অতি সাধারণ' মেয়ে স্বপ্ন দেখে অসাধারণত্বে উত্তরণের, পুজোর ছুটীর আনন্দ-মুখর দিনে 'শহরের দাদন দেওয়া দড়ি বাঁধা ছাগলছানা, কেমন ক'রে যেন বুঝতে পারে 'এলো তাদের পূজার ছুটীর দিন'! অতি সাধারণের বেদনারিক্ত জীবন-যন্ত্রণায় স্বপ্ন আর কল্পনার যে অলীক পাখি গান গেয়ে যায় জীবনের সব হারানোর ব্যাথাকে ভুলিয়ে দিতে—কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় তাকেই উপজীব্য করেছেন। এটাকে হয়তো 'এসকেপিজম্' বলা যায়—বাস্তবের রুক্ষতাকে আড়াল করতে অবাস্তব কল্পনার জগতে আশ্রয় নেওয়া বলা যায়—কিন্তু সেটাই মানুষের প্রকৃত পরিচয়। রূপ থেকে অরূপে উত্তরণের প্রয়াস মানুষের জীবনভোর—শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানির অন্তস্থলেও বয়ে যায় যে এক, বিশ্বাসের নদী—তা-ই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে—আত্মহননের ইচ্ছা থেকে, নিম্নগামীতার অমোঘ প্রলোভন থেকে।

কবিগুরুর সুবিশাল রচনাসম্ভারের মূল্যায়ন প্রয়াস নিয়েছেন অনেক লেখক, অসংখ্য সমালোচক। তাঁর সাহিত্যকে উপজীব্য করে প্রতি বছর ডক্টরেট করছেন একাধিক শিক্ষার্থী। তবু তাঁর সাহিত্য-সাধনার সঠিক মূল্যায়ন এখনও সম্ভব হয়নি। কথায়, লেখায়, আলোচনায় তাঁর বাণীই আমরা উদ্ধৃত করি, তাঁর রচনার ঐশ্বর্য নিয়েই আমাদের গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো। প্রতি বছর ২৫শে বৈশাখ আসে আর যায়। ধূপে, মালায়, অগুরু চন্দনে কবিতায় আর গানে ভরে যায় আমাদের বাংলাদেশ—অথবা, সমগ্র ভারতবর্ষ। পৃথিবীর যেখানেই বাঙালী আছেন, সেখানেই রবীন্দ্রনাথ আছেন—থাকবেনও। প্রাচীনপন্থী, ভাববিলাসী আর 'বুর্জোয়া' বলেও আমরা, প্রগতিপন্থীরা, তাঁকে কোনদিনই অস্বীকার করতে পারবো না;—কারণ, তিনি মিশে আছেন আমাদের রক্তে, আমাদের চেতনায়—আমাদের পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যে। রবীন্দ্রনাথকে অনেকে একটি যুগ বলেন; কিন্তু প্রকৃত অর্থে তিনি যুগাতীত, কালাতিক্রমকারী। 'আজি হতে শতবর্ষ পরে'ও মানুষ তাঁর কবিতা পড়বে, গান গাইবে। সৎ সাহিত্য এইভাবেই বিবর্তনের প্রতিটি কালপরিক্রমায় মানুষকে পথ দেখায়। ইউরোপের সেক্সপীয়ার অথবা সংস্কৃত সাহিত্যের কালিদাসের সঙ্গে তাঁর এখানেই যোগ।

বর্তমানের দিকে তাকিয়ে তাই যখন শুধুই হতাশার ছবি চোখে পড়ে—তখনও এক প্রবুদ্ধ পিতামহ যেন আমাদের কানে কানে বলে যান্—"যা কিছু মঙ্গল, যা সকলের ভালোর জন্য সে-ই তপস্যা"। মানুষকে এই তপস্যাই করতে হবে। সত্য, শিব ও সুন্দরের জন্য মানুষের আন্তরিক তপস্যা ব্যর্থ হবার নয়। অসংখ্য ব্যর্থতা, আত্মস্বার্থের অন্ধ আনুগত্য ও হিংসাকণ্টকিত পথে আজ, 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো'—তাদের সমূলে বিনষ্ট করে মানুষের শুভবুদ্ধি

জয়ী হবেই, যেহেতু—

'দানবের মূঢ় অপব্যয়
ইতিবৃত্তে গ্রন্থিতে পারেনা,
কভু শাশ্বত অধ্যায়।

এই সত্যকে সামনে রেখেই আমাদের সংগ্রাম করে যেতে হবে—অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অসত্য আর ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে সোচ্চার যুদ্ধঘোষণা, কবিগুরু বেঁচে থাকলে তিনিও আজ তাই করতেন। উচ্চ-পদের মোহ কিংবা প্রশাসনিক সম্মান তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারতোনা—পারেনি কোনদিন। বৃটীশ বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে যে বিপ্লবী কবি একদিন অবহেলায় 'নাইট' উপাধি ছুঁড়ে ফেলে-ছিলেন—মানুষের চরম দুঃখ দুর্দশার বর্তমানতাও তাঁকে সমভাবে উদ্দীপ্ত করতো, প্রতিবাদে সুদৃঢ় করে তুলতো—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তথাকথিত ও বহুব্যবহৃত বিপ্লবের বুলি নয়—মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিতেন প্রকৃত বিপ্লবের পথ, তাদের উদ্বুদ্ধ করতেন গানে, যুগোপযোগী কবিতায়, সাহিত্যে—যেমন করেছেন প্রাক্ স্বাধীনতার যুগে, সাম্রাজ্যবাদী বৃটীশের বিরুদ্ধে স্বদেশী সংগ্রামের প্রতিটি মুহূর্তে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের অনেক ঋণ—এ ঋণ কোনদিন শোধ হবার নয়, শোধ করার চেষ্টাও যেন কোনদিন আমরা না করি। তাঁকে বিশ্বকবি আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে তাঁর সাহিত্যের 'বিশ্বজনীনতার' কারণে। কিন্তু প্রকৃত সত্যে তিনি বাঙালীর কবি—ভারতবাসীর কবি। দেশবাসীর প্রতিটি দুর্দ্দিনে, রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রত্যেক সংকট মুহূর্তে তাঁর বাণী আমাদের প্রেরণা দেবে, পথ দেখাবে অন্ধকার থেকে আলোক উত্তরণের—কবচ-কুণ্ডলের মতো রক্ষা করবে অসত্য ও অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ-রফার অধঃপতন থেকে।

———

দিকে দিকে নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই—
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

বিশ্ববিদ্যালয় আইন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হয়। এই আইন অনুযায়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিয়োগ করা হল। বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হওয়ার পরে আমি নিজেকে রিপণ কলেজের মালিকানা থেকে মুক্ত করে নিলাম। একটি অছি পরিষদের হাতে কলেজটি সমর্পণ করলাম। রিপন স্কুলটি ছিল, কলেজেরই একটি অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠান। সেটিকেও এই সঙ্গে অছি পরিষদের হাতে তুলে দেওয়া হল। কলেজ এবং স্কুলের লাইব্রেরী, লেবরেটরী সমেত সমস্ত সম্পত্তি এবং নগদে ৫০০০, টাকা অছি পরিষদকে দিয়ে দেওয়া হল, আমি নিজে অছিদের মধ্যে একজন হয়ে রইলাম। আর্থিক বা অন্য কোন রকম স্বার্থ নিজের জন্য সংরক্ষিত করে রাখিনি। কেবলমাত্র আমার স্থলে একজন অছিকে মনোনীত করার অধিকারটুকু রাখলাম।

এইভাবে জনসাধারণের হাতে কলেজ ও স্কুলটিকে ছেড়ে দিয়ে আমি প্রতিষ্ঠান দুটির জন্য স্থায়ী আবাসের ব্যবস্থা করার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। এই রকম একটা বিরাট কাজের জন্য আমাদের কোন সময়েই কোন অর্থ ভাণ্ডার ছিল না। আমি যতদিন প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলাম, ততদিন আমি জন সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য চাইতে পারিনি; কারণ, তখন প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল আমার নিজস্ব সম্পত্তি। এখন যখন প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণের সম্পত্তি হয়ে গেল, তখন আর আমার যে সঙ্কোচ রইল না। আমি কলেজের বাড়ীর জন্য চাঁদা আদায়ের তালিকা প্রস্তুত করলাম। ১৯১০ সালের আগষ্ট মাসে বাংলার লেফ্টেন্যান্ট গভর্ণর স্যার এডওয়ার্ড বেকার কলেজ বাড়ীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি এত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত সেই রকম একটা প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রকাশ্যে জড়িত হয়ে পড়ার জন্য তাঁর হেনরী স্যার এডওয়ার্ড বেকারকে আক্রমণ করলেন। এডওয়ার্ড বেকার তাঁর লেখাটি পাঠকরে আমাকে তাঁর সঙ্গে বেলভিডিয়ারে দেখা করার জন্য লিখলেন। তিনি লেখাটি আমাকে দেখালেন এবং বললেন, "আমি এর উত্তর দিতে চাই।" তিনি আরও বললেন, "আমার উত্তর হচ্ছে রিপন কলেজকে ৫০০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা। একাউন্টেন্ট জেনারেলকে ডাকিয়ে, তিনি আপনাকে সে টাকা দিয়ে দেবেন।" এই ছিল এই মানুষটির প্রকৃত—দৃঢ়, উদার এবং আবেগপ্রবণ। রিপণ কলেজের যত দৃঢ়চেতা বন্ধু ছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। একথা বলা বাহুল্য হবেনা—এবং আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্ভ্রম বোধ থেকেই একথা বলেছি—যে তাঁর দৃঢ়ভাবে হস্তক্ষেপ ব্যতীত রিপন কলেজকে বাঁচান যেত না। আমাদের আইনের গ্রন্থাগার সে রকম সুসম্পন্ন ছিলনা। তিনি বাংলা সরকারের দান হিসাবে কয়েক হাজার টাকা মূল্যের ল রিপোর্ট কলেজকে দান করেন।

রিপন কলেজের আইনের ক্লাশগুলির স্বীকৃতি কোন প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে না, আমাদের তার কাছে [illegible] বলা হয়েছিল, পরে সিণ্ডিকেটের মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা মত ব্যবস্থা অবলম্বন করার স্বীকৃতি বহাল থাকে। আমাকে সিণ্ডিকেটের

একটি সভায় ডাকা হয়েছিল এবং সেখানে আমি প্রথম জেলার সম্মুখীন হই। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণ যোগ্য কতগুলি সর্তে একটা আপোষ হয়। সিণ্ডিকেট এবং রিপন কলেজ কর্তৃপক্ষ উভয়েই তাতে রাজি হন। এই ব্যাপারে যে সমস্ত যোগাযোগ ও মত বিনিময় হয় এবং মেজাজের পরিবর্তন প্রকাশ পায় তার মধ্যে ফেকটের (এডওয়ার্ড বেকার) যে প্রভাব ছিল তা স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়।

কলেজের বাড়ীর জন্য টাকা তোলার কাজটি খুব সহজ ছিল না। যে সব ক্ষেত্রে গোটা সমাজের অনুভূতি গভীর ভাবে আলোড়িত হয় সে সব ক্ষেত্র ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে জন সাধারণের কাছ থেকে কোন জন-হিতকর কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা সবসময়ই বিশেষ শ্রম ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে এখানে একাজ কতগুলি বিশেষ সমস্যার সঙ্গে জড়িত। আমাদের দেশের লোক ধনী নয়। ধনী যারা আছেন তারা সব সময় দিতে ইচ্ছুক নন বা দান করার মত তত্টা স্বদেশ প্রেমিকও তারা নন। তাছাড়া প্রতিবারই একই লোকের কাছে চাঁদা চাইতে হয়। আর চাঁদা সংগ্রহ করা যেতে পারে যাদের কাছ থেকে আমাদের যে রকম পরিচিত মহলও খুব সংকীর্ণ। ফলে আমরা যা পেতাম তা সব সময়ই অল্পবেশী পরিমাণে অসন্তোষ জনক হত।

স্যার এডওয়ার্ড বেকার ছুটিতে দেশে চলে যান। তার স্থলে অস্থায়ীভাবে কাজ করেন স্যার উইলিয়াম ডিউক। আমি তার কাছে সরকার পক্ষ থেকে টাকা দিয়ে ও প্রভাব খাটিয়ে আমাদের সাহায্য করতে আবেদন করলাম। তিনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং অনুগ্রহ করে কলেজের বাড়ী দেখতেও এলেন। এই সময় আমরা কন্ট্রাকটরের বিলের টাকাও পরিশোধ করতে পারিনি বললেও চলে। তিনি বললেন, "মিঃ ব্যানার্জি, তুমি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই গড়ে চলছ"। উত্তরে আমি বলেছিলাম, "হুজুর, বিশ্বাস পাহাড়কেও টলায়।" আমার এ বিশ্বাস যে ঠিক, তা আমার কাজের ফলেই যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণিত হয়েছে। শুরুতে খরচের হিসাবে ১,১৪০০০ টাকা ধরা হয়েছিল। তা বেড়ে গিয়ে ১,৪৪০০০ টাকায় দাঁড়াল। এ রকমটা যে হবে স্যার এডওয়ার্ড বেকার তা আগেই ভবিষ্যৎ-বাণী করে রেখেছিলেন। গভর্ণমেণ্ট দিলেন ৬০,০০০ টাকা। বাকীটা আমি জনসাধারণের কাছ থেকে তুললাম, আর কলেজের তহবিল থেকেও খুব সামান্য পরিমাণ কিছু পাওয়া গেল। রিপন কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের কাছেও আমি আবেদন করেছিলাম। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিনা-বেতনে কলেজে শিক্ষা লাভ করেছে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে যে সাড়া পাওয়া যায়, তা সন্তোষ জনক হয়নি। এটা নিরাশারই সৃষ্টি করেছে।

এখন আমরা আমাদের দেনা শোধ করে ফেলেছি, কলেজের বাড়ীতে চারতলা তুলেছি এবং ১ লক্ষ টাকার একটি সংরক্ষিত তহবিলও গড়ে তুলেছি। কলেজটি এর ফুল বিভাগ সহ দেশের মধ্যে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রসংখ্যা হয়েছে প্রায় ২০০০। আইন বিভাগসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত এটিই হল একমাত্র বেসরকারীকলেজ। কলেজের আর্থিক দায়-দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ভার ছিল অছি পরিষদের উপর। কলেজ ও স্কুলের পরিচালনার ভার ছিল একটি কাউন্সিলের উপর। আমি ছিলাম সে কাউন্সিলের সভাপতি। অছি পরিষদ ও কলেজ কাউন্সিলের গঠন প্রকৃতি কি রকমের হবে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সঙ্গে আলোচনা করে আমিই সাব্যস্ত করে দিই।

১৯১৩ সালে আমি অধ্যাপকের কাজ ছেড়ে দিলাম। কারণ এই সময় আমি ভাইসরয়ের লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হই এবং এই কাজের জন্য আমাকে দিল্লীতে ও সিমলায় থাকতে হয়। ফলে কলকাতায় থেকে নিয়মিত ভাবে শিক্ষা দানের কাজে যোগদান করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই শিক্ষাদান কাজ ছিল আমার জীবনের আনন্দস্বরূপ।

(চলবে)

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যুদ্ধ আরম্ভ হবার অল্পদিন পরেই বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে জার্মান অস্ত্র সাহায্যের ব্যবস্থা হয়। স্থির হয় যে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান হবে এজন্য জার্মানী অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করবে। বিদেশ থেকে গদর এবং অন্যান্য বিপ্লবীরা এই সংবাদ নিয়ে ভারতে আসেন। শ্রীরামপুরের জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ১৯১৫ সালের প্রথমদিকেই এই সংবাদ নিয়ে বাঙলাদেশে আসেন। তার সঙ্গে যতীন মুখার্জীর পূর্বেই যোগাযোগ ছিল। যতীন মুখার্জী, জীতেন লাহিড়ীর নিকট থেকে জার্মান সাহায্যের সংবাদ পান। সংবাদ পেয়েই বাঙলাদেশে বিভিন্ন জেলায় যে সব বিপ্লবী দল ছিল তারা যতীন্দ্রনাথের অধীনে এক হন। এই সময় অনুশীলন, গদর, চন্দননগর এবং কাশীর বিপ্লবীদল ভারতব্যাপী বিপ্লব প্রচেষ্টায় রত ছিলেন রাসবিহারীর নেতৃত্বাধীনে। সুতরাং বাংলার অনুশীলন দলের যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ভারতব্যাপী সশস্ত্র বৈপ্লবীক অভ্যুত্থানে যতীন্দ্রনাথকে ডাকা হয়েছিল কিন্তু তিনি এজন্য প্রস্তুত হবার জন্য কিছু সময় চেয়েছিলেন। গদর বিপ্লবীরা তখন সকলেই বিক্ষুব্ধ। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য আর অপেক্ষা করা চলে না। এই জন্যই বাংলার মিলিত বিপ্লবী দলসমূহের সঙ্গে অনুশীলন দল মিলিত হতে পারেনি। পক্ষান্তরে যতীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়েই ২১শে ফেব্রুয়ারী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিন ধার্য্য হয়েছিল। এ সম্পর্কে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিপ্লবী দলের অনুশীলনের বিরুদ্ধে কিছুটা ক্ষোভ ছিল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি শচীন্দ্রনাথ সান্যালের নিজের কথাতেই বুঝা যাইবে। এ বিষয়ে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল যা লিখেছেন হুবহু উদ্ধৃত করা গেল 'বাঙলার সকল বিপ্লবী দলেরই ধারণা ছিল যে ঢাকার অনুশীলন সমিতি অন্যান্য বিপ্লব সমিতির সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজকর্ম করিতে অনিচ্ছুক অথবা বাঙলার কোন বিপ্লবী সমিতিই ঢাকা অনুশীলন সমিতির সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারিবে না। কিন্তু তাহারা কেহই জানিতেন না যে ঢাকার সমিতি চন্দননগর অথবা রাসবিহারীর দলের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া গিয়াছিল এবং এই মিলন ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের বহু পূর্বেই সাধিত হয়। আমার যতদূর অভিজ্ঞতা আছে এইটুকু বলিতে পারি যে দোষেগুণে এই ঢাকার অনুশীলন সমিতি বাঙলার অন্যান্য বিপ্লব সমিতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। ইহাদের মত এত বড় দল বাংলায় আর কোন বিপ্লব দলেই ছিল না। পূর্ব-বাঙলার এবং উত্তর বাঙলার প্রায় প্রতি জেলাতেই ইহাদের শাখা-প্রশাখা ছিল। ইহারা যে সংখ্যায় এবং প্রসারে বাঙলার সকল বিপ্লব দল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এ কথা সর্ববাদীসম্মত। এই কারণে বাঙলার প্রায় সকল বিপ্লব দলেই ঢাকার অনুশীলন সমিতিকে অল্পবিস্তর পরিমাণে ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেন। এইসব কারণে চন্দননগর অথবা রাস-বিহারীর দল ছাড়া বাঙলার আর কোন দলেই ঢাকা অনুশীলন সমিতির সহিত মিলিয়া গিয়া এক অখণ্ড দল গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছুক হয় নাই। বহুবার আমি স্বয়ং বাঙলার কয়েকটি বিপ্লব দলকে ঢাকার দলের সহিত মিলাইবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কোনবারেই

কৃতকার্য্য হয় নাই। অবশ্য এইরূপ মিলন না হইবার আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল। বাঙলার বিভিন্ন বিপ্লব দলের মধ্যে এমন কোন প্রতিভাবান শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন না যাহার মোহিনী শক্তি বলে বিভিন্ন দল আকৃষ্ট হইয়া শেষে একদলে পরিণত হইতে পারিত। যে কারণেই হোক বাঙলার প্রায় সকল বিপ্লবী দলই ঢাকা সমিতির প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। হয়ত তাহার একটি কারণ এই ছিল যে পূর্ব-বাঙলার অনুশীলন সমিতির প্রায় সকল সভ্যের মনেই এইরূপ গর্বের ভাব ছিল যে তাহাদের মত শক্তিশালী দল বাঙলায় আর নাই। বোধহয় এইজন্যই পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লব দল পূর্ব-বাঙলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই একটি বিপ্লব দলের প্রতি তেমন বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন না যেমন এই ঢাকা সমিতির প্রতি ছিলেন। এইরূপ হইবার আরও একটি কারণ ছিল। ঢাকা সমিতি পুলিনবাবুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। পুলিনবাবুর প্রকৃতিতে আধ্যাত্মশক্তির ভাব ভয়ানক প্রবল ছিল। পুলিনবাবু সত্যই অন্য কাহারও সহিত মিলিয়া কাজ করিবার পক্ষপাতি ছিলেন না। পুলিনবাবুর আধিপত্য যেখানে এতটুকু খর্ব হইবে সেখানে পুলিনবাবুর থাকা অসম্ভব। এই হিসাবে পুলিনবাবু এবং বারীনবাবু সম প্রকৃতির লোক। এই কারণেই পুলিনবাবুর বর্তমানে ঢাকা সমিতি অন্য কোন সমিতির সহিত মিলিতে সক্ষম হয় নাই। অনেকটা পুলিনবাবুর জন্যই সেই সময় হইতেই বাঙলার সকল দল ঢাকা সমিতির প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া যায় এবং কালক্রমে সেই অসন্তোষের বহ্নি ক্রমশঃ বিকৃত আকার ধারণ করে। কিন্তু পুলিনবাবুর জেল হইবার পর ঢাকা সমিতিতে একচ্ছত্র আধিপত্য থাকে নাই। তখন হইতেই এই সমিতি গণতন্ত্রের আদর্শে অনেকটা গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাঙলার বিভিন্ন দল তাহাদের নেতাদের নামেই পরিচিত যেমন যতীনবাবুর দল, বিপিনবাবুর দল ইত্যাদি। কিন্তু ঢাকা সমিতির কোন একজন নির্দিষ্ট নেতা না থাকায় ইহা শেষ পর্য্যন্ত ঢাকা অনুশীলন সমিতি নামেই পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। এইরূপে সর্বাংশে একজন নেতৃত্বাধীনে না থাকায় যে এই দল কিছু কম শক্তিশালী হইয়াছিল তাহাও নয়। কারণ অত বড় তুফান এই ঢাকা সমিতিকে সহ্য করিতে হইয়াছে কিনা সন্দেহ! বার বার বিপদে আবার এই দল মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পুলিনবাবুর পর যাহারা ঢাকা সমিতির নেতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন তাহারা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে দেশের বিভিন্ন বিপ্লব দল মিলিয়া মিশিয়া সম্পূর্ণরূপে এক হইতে না পারিলে দেশের মঙ্গল নাই। তাই তাহারা দেশের সকল দলের সহিতই মিলিবার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন। সেই জন্যই সম্ভবত বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার সময়েই ঢাকা সমিতি চন্দননগর দলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। কাশীর দলও এই ঢাকা সমিতির মাধ্যমেই রাস-বিহারীর উত্তর-ভারতের দলের সহিত পরিচিত হয়। এইরূপে আমাদের দল পূর্ব-বাঙলা হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্জাব প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া এক-যোগে কাজ করিতে থাকে। পাঞ্জাবের বিপ্লব আয়োজনের সংবাদও অধিকাংশ স্থলে এই ঢাকা সমিতির মাধ্যমেই বাঙলার বিভিন্ন বিপ্লব দলের কাছে পাঠানো হয়। লাহোর, দিল্লী, কাশী, চন্দননগর ও ঢাকার বিপ্লব দল এইরূপে সর্বাংশে এক হইয়া যায়। একথা কিন্তু বাঙলার অন্যান্য বিপ্লব দল সে সময়ে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই।

(চলবে)

রবীন্দ্র বাণী মঞ্জরী

আজ ভাববার সময় এল। মানুষের স্পর্শে অশুচিতার আরোপ করে অবশেষে সেই স্পর্শে দেবতারও শুচিতা নাশ কল্পনা করি। এ বুদ্ধি হারাই যে, তাতে দেবতার স্বভাবকে নিন্দা করা হয়। তখন আমরা সম্প্রদায়ের মন্দিরে অর্ঘ আনি, বিশ্বনাথের মন্দিরের বিশ্বদ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে তাঁর অবমাননা করি। মানুষকে লাঞ্ছিত করে, হীন করে রেখে পুণ্য বলি কাকে!

●

সংকোচের বিহ্বলতায় নিজেরে তাপমান
সংকটের কল্পনাতে হয়োনা ম্রিয়মাণ,
মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়।
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন, নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয়, নিজের পরে করিও ভর না রেখো সংশয়।
ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে, নম্র হয়ে,, পণ করিও প্রাণ
মুক্ত করো ভয়. দুরূহ কাজে নিজেরই দিও কঠিন পরিচয়।

●

যদি সত্যকে চাও, তবে অন্তের মধ্যে নিজেকে স্বীকার করো। সেই সত্যই পুণ্য এবং সেই সত্যের সাহায্যেই পরাধীনতার বন্ধনও ছিন্ন হবে।···

মানুষকে মানুষ বলে দেখতে না পারার মতে এত বড়ো সর্বনেশে অন্ধতা আর নেই। এই বন্ধন, এই অন্ধতা নিয়ে কোন মুক্তিই আমরা পাবোনা।

●

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে।
যদি কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়
তবে পরান খুলে,
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে।···
যদি আলো না ধরে, যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে
তবে বজ্রানলে,
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে।

———

Regd. No. K. N. 2451//1 Regd. No. ...NC //

মূল্য—৫০ পয়সা

অসতর্কতার পরিণাম মৃত্যুও হ'তে পারে—
নিরাপত্তার জন্য পথ চলার নিয়মগুলি মেনে চলুন।

বাস যাত্রীরা

কি করবেন—

- সর্বদা লাইন দিয়ে বাসে উঠবেন।
- বাস থামলে তবেই উঠবেন বা নামবেন।
- বাসের মধ্যে যাতায়াতের পথ খোলা রাখুন।
- নামবার পর রাস্তা পার হ'তে হ'লে বাস চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, পরে দু'দিকে দেখে রাস্তা খালি পেলে পার হবেন।

কি করবেন না—

- বাসে যাতায়াত কালে শরীরের কোন অংশ গাড়ীর বাইরে রাখবেন না।
- বাসের পা-দানিতে দাঁড়াবেন না।
- বাস থেকে কিছু ছুঁড়ে ফেলবেন না। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
- চলন্ত গাড়ী থেকে লাফিয়ে নামবেন না।
- বাস থেকে নামবার সময় ঠেলাঠেলি করবেন না।

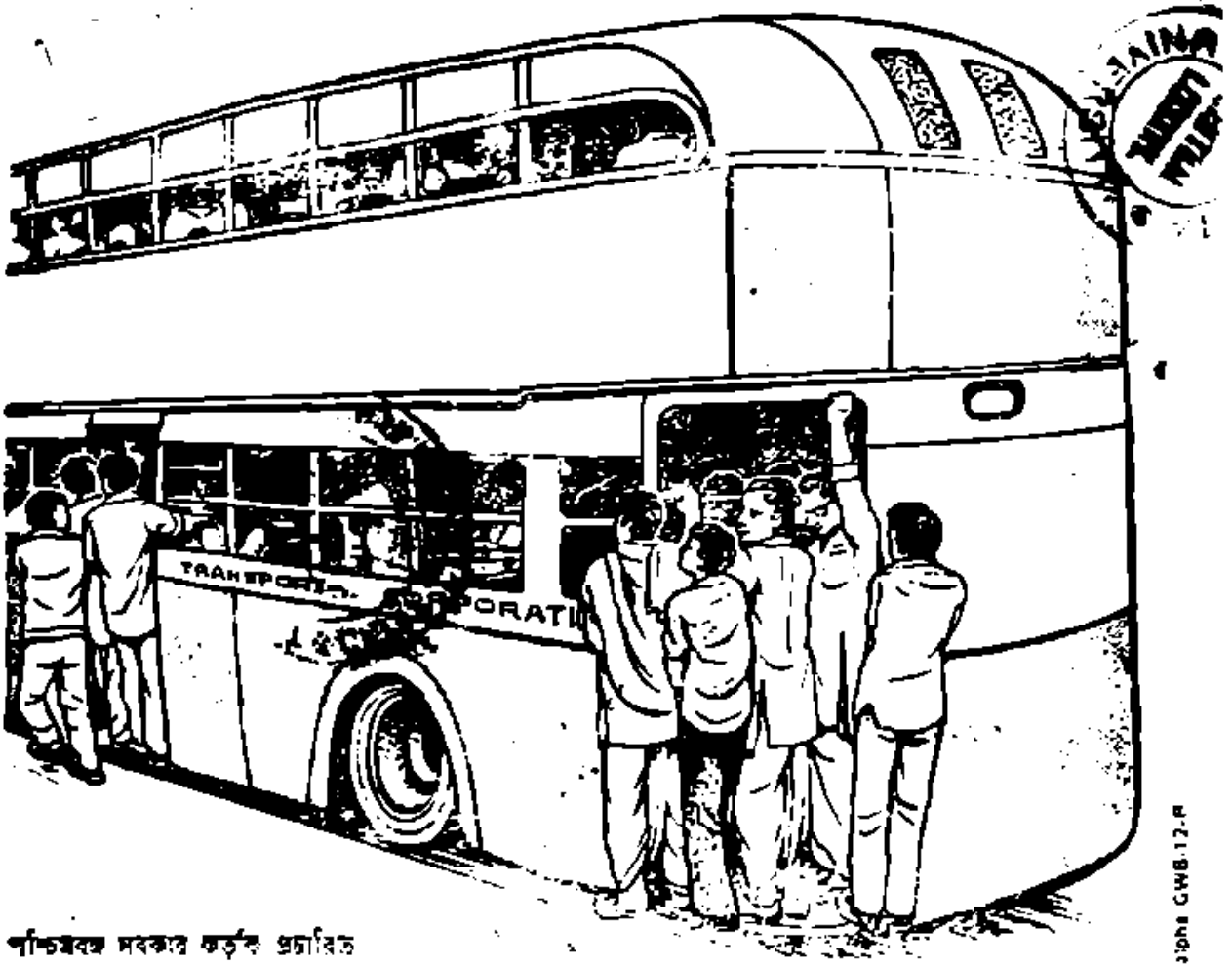

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

...—লিটিং পাবলিসিটি ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯।

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭১

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ ১৯শে মে, ১৯৭৯	৩১ সংখ্যা

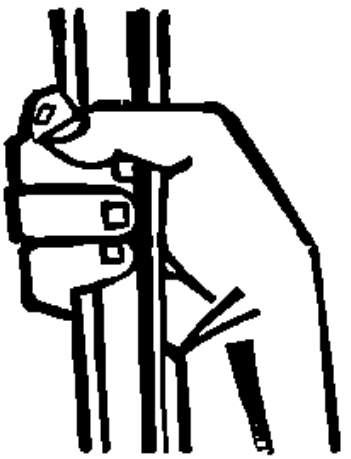

এই সংখ্যায়

পুনশ্চ মরিচঝাঁপি
। সম্পাদকীয় ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস
। বিনোদ দত্ত ।

ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা
। শ্রীবলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক মনিনী মোহন দাশগুপ্ত ।

ইরান
। কাশীনাথ সরকার ।

বিপ্লবীর জীবন দর্শন
। যুগেশ ভট্টাচার্য ।

ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভিতর যে দেবত্ব প্রথম হতেই বর্তমান—তার পূর্ণ বিকাশ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	CALCUTTA		
Chakraborty Chunilal	Port Hospital Park, Flat G-6 Majerhat, Calcutta-53	200	16. 8. 72
Das Smt. Amiya w-o Late Bejoy Kumar Das	63 Ultadanga Main Road Calcutta-4	150	13. 4. 78
Ghose Smt. Pratima Rani w-o Late Shyamal Ghose	120 Linton Road, Calcutta-74	150	1. 12. 78
Nundy Smt. Binapani w-o Late Jitendra Nandy	Nandibari, Thakurpukur Calcutta 63	100	21. 7. 78
Roy Amal Kanti	121-4L Manicktola Main Rd. Cal.	200	1. 3. 75
	24-PARGANAS		
Babu Smt. Annapurna w-o Late Bhabesh Narayan Babu	P. O. Aswininagar (Bognibate)	100	1. 11. 78
Bhattacharya Smt. Usharani w-o Late Sudhir Bhattacharji	P. O. & Vill Hijolpukur	200	20. 6. 71
Chakraborty Smt. Jogmaya w-o Late Manmohan	Vill Bijna P, O. Madanpur	150	10. 1. 78
Dutta Sudhir Chandra	28 Cooperative Rd. P.O. Banadroni	200	1. 4. 72
Kar Rakhal Chandra	51-88 Ashokenagar	200	14. 9. 73
Mitra Smt Sarana Bala w-o Late Nalini Ranjan Mitra	Baranagar	100	21. 10. 78
	Dist—HOOGHLY		
Halt Anukul Chandra	P. O. & Vill Mathigote	200	1. 10. 76
Rani Janan Ranjan	638 Aurobindo Pulli (Kotron) Konnagar	200	1. 10. 76

(Contd. on 3rd cover)

সম্পাদকীয়—

পুনশ্চ মরিচঝাঁপি

পশ্চিমবঙ্গে ইদানিংকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বর্বরতার ঘটনা কোনটি—এ প্রশ্ন করা হলে মানবতাবাদী প্রতিটি মানুষ একবাক্যে বলবেন—মরিচঝাঁপির বাঙালী নিধন। শুধু ইদানিংকালেই নয়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতোত্তর কালপরম্পরার ইতিহাসেও এ বর্বরতার নজীর একান্তই বিরল বলা যায়।

স্বাধীনতার বলি বাঙালী উদ্বাস্তুদের জীবনে নিপীড়ন ও নির্যাতনের ঘটনা আকস্মিক নয়। দেশবিভাগের সময় এঁরা বহুবার বহু ভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন। অনিশ্চয়তা ও বিঘ্ন সংকুল ভবিষ্যতের পথে অবিরাম পদচারণা এঁদের সহিষ্ণু করে তুলেছে। জীবনকে এঁরা দেখেছেন এক বিপ্রতীপ দৃষ্টিভঙ্গীতে—তাই জীবনের কাছে, মানুষের কাছে কিছু পাওয়ার থেকে না পাওয়ার স্বাভাবিকতাই এঁদের মানসিক গঠনকে সুদৃঢ় রূপ দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে, স্বাধীন সরকারের কাছে এঁদের প্রার্থনা ছিল—'ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা'। যা বিগত সরকারের পূর্বসুরী নবীন বাংলার রূপকার ডা: বিধানচন্দ্র রায়কে উদ্বুদ্ধ করেছিল উদ্বাস্তু-পুনর্বাসনের সঠিক ও সুনির্দিষ্ট প্রকল্পসমূহের সার্থক রূপায়ণে। তৎকালীন বামপন্থী দলগুলিও তখন এঁদের প্রতি সহানুভূতিতে ছিলেন সোচ্চার। ক্ষমতায় আসীন সরকারকে নাজেহাল করতে উদ্বাস্তুদের দুঃখে বিগলিত অশ্রু বামপন্থী নেতৃত্বের তৎকালীন ভূমিকা হয়তো অনেকের কাছেই দৃষ্টিকটু মনে হয়েছিল। যুগ পরিবর্তিত হয়েছে, অতিক্রান্ত হয়েছে কাল—সেদিনের সেই সব প্রগতিপন্থী উদ্বাস্তু প্রেমীগণ আজ পশ্চিমবাংলার শাসন ক্ষমতায় আসীন। এবং কতো অনায়াসে এঁরা প্রকাশ করে ফেলেছেন নিজেদের স্বরূপ। মরিচঝাঁপির মুষ্টিমেয় উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের উপর শক্তি প্রয়োগ করতে আসরে নেমেছে এঁদের আজ্ঞাধীন বিশাল পুলিশবাহিনী ও এঁদের নিজস্ব ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী তথা ক্যাডারের দল সদ্যজাত শিশু, সদ্য প্রসূতি, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও অনাহারী মানুষের উপর এদের সম্মিলিত আক্রমণ 'হিটলারের ইহুদী দমনকেও হার মানিয়েছে। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের তথা কথিত অত্যাচারী ইংরেজ শাসকরাও স্বাধীন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ্যে এই মধ্যযুগীয় নৃশংসতায় লজ্জা পাবেন। মাত্র কয়েক মাস আগে অপারেশন মরিচঝাঁপি নামে যে তাণ্ডব হয়েছিল অতি সাম্প্রতিককালের ঘটনা তাকেও ছার মানিয়েছে। আমরা দেশের সমস্ত জাতীয়তাবাদী শক্তিকে এই জঘন্য সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানাই—কারণ মরিচঝাঁপির এই ঘটনা আরও বড়ো সন্ত্রাসের সূচনা বলে আমরা আশংকা করি। সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থার নামে অহেতুক সন্ত্রাস সৃষ্টি আরও বড়ো সন্ত্রাসের ইন্ধন জোগায়। বিশদ গণ সংযোগ ও প্রচারের মাধ্যমে প্রকৃত গণতান্ত্রিক পথে যে কাজ করা যেতো—তার জন্য রক্তের বন্যা বহানোর ঘটনা ক্ষমতায় আসীন শাসকদলের অক্ষমতা ও আদিম মানসিকতার পরিচায়ক—গণতন্ত্রের পক্ষে যা একান্তভাবে বিপজ্জনক। অপারেশন মরিচঝাঁপি পশ্চিমবঙ্গের বুকে বামপন্থী শক্তির গণতান্ত্রিক মুখোশ খুলে দিয়ে জনসাধারণের মনে ব্যাপক ভয় ও আস্থাহীনতার সঞ্চার করবে—এ সত্য অনস্বীকার্য।

———

বিপ্লবীর জীবন দর্শন

॥ দুর্গেশ ভট্টাচার্য্য ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গুরুদেবের আদেশ অলঙ্ঘনীয়—কোন বিচারের প্রতীক্ষা রাখে না। তাই আমাদের এতদিনের বাস্তুভিটা ছেড়ে ঢাকা সহরের দিকে পা বাড়াতেই হবে।

বাবা শুধু ভাবতে লাগলেন—আমাদের এতবড়ো সংসারের খাওয়া দাওয়া চলবে কি করে? সহরে গেলে বাড়ী ভাড়া করতে হবে, মাসে মাসে বাড়ীর মালিককে তার বাড়ী ভাড়া চুকিয়ে দিতেই হবে—তা না হলে সেখানে আর থাকা চলবে না। তারপর সহরে সব জিনিষই কিনে খেতে হবে—বাড়ীতে করে কোন জিনিষই খাওয়া সম্ভব নয়। গ্রামে থাক সবজীটা এবার ওবার থেকেই যোগাড় হয়ে যায়—কেনার প্রশ্নই নেই, সে তো আর সহরে বসবে চলবে না। এ অবস্থায়, যে সংসার গ্রামেই অচল, তা নিয়ে কি করে সহরে বাস করা যাবে—তা বাবা কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারছিলেন না।

কিন্তু গুরুদেবের আদেশ পালন করতেই হবে। তাই শেষ পর্যন্ত আমাদের সব থেকে বড়ো জেঠতুতো দাদা সুরেশকে বাড়ী চলে আসার জন্য পত্র দিলেন—এই আশায় যে তার সাথে পরামর্শ করলে একটা সুরাহা হতে পারে। আমার এই জেঠতুতো দাদা নারায়ণগঞ্জ টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করতেন। তার রোজগার আর আমার বাবার এদিক সেদিক থেকে যা আয় হত তা দিয়ে আমাদের সংসার কোন প্রকারে চলত।

পত্র পাওয়া মাত্রই আমার দাদা সুরেশ একদিন বাড়ীতে এসে হাজির হলেন। বাবা সমস্ত ঘটনা তাকে খুলে বললেন। জানতে চাইলেন—কি করে ঢাকা সহরে থাকবার ব্যবস্থা করা যায়।

আদ্যপান্ত সমস্ত শুনে আমার দাদা সুরেশ বললেন—এত ভাবছেন কেন, কাকা? আমি তো নারায়ণগঞ্জ হোটেলে থেকে অফিস করি—তাতে আমার খাওয়া খাওয়ার অনেকটা খরচ হয়ে যায়। ঢাকা বাসা হলে আমি ওখান থেকেই রোজ নারায়ণগঞ্জ যাতায়াত করে অফিস করতে পারব, এতে অনেকগুলো টাকা আমাদের বাঁচবে। তারপর নরেশ এখন বড়ো হয়েছে, তাকেও একটা ছোটখাট কাজে লাগিয়ে দেওয়া যাবে। এমনি করে কোন রকমে কায়-ক্লেশে দিন চলে যাবে। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হবে হয়তো পরে ভালোই হবে, দেখবেন।

সুরেশের কথা শুনে বাবা অনেকটা আশ্বস্ত ও উৎফুল্ল হয়ে বললেন—চলবে সুরেশ? পারবি তোরা এত বড়ো সংসার চালিয়ে নিতে?

সুরেশ—কেন পারব না, কাকা? এমনি কি আমাদের সংসার চলছে? একে কি চলা বলে, মরি নে বলে বেঁচে আছি এই মাত্র। এর চেয়ে খারাপ আর কি হবার আছে, কাকা? আমি এবার ঢাকায় গিয়ে অল্প ভাড়ায় একটা বাসা ঠিক করে আনাব। তারপর নির্দিষ্ট দিনে জিনিষপত্র নিয়ে আপনারা রওনা হয়ে যাবেন।

সব ঠিক হয়ে গেল। সাত পুরুষ যেখায় মানুষ তা এক গুরুদেবের আদেশে ত্যাগ করে যাওয়াই সাব্যস্ত হল। জুটুক না জুটুক, ঝড়-বাদলে মাথা গুঁজবার মত একটু জায়গা ছিল, রাত্রিতে নিশ্চিন্তে ঘুমানোর মত একটু স্থান ছিল, প্রয়োজনে গ্রামবাসীদের সাহায্য ছিল—সব ছেড়ে এক অজানা ভবিষ্যতের দিকে আমাদের পা বাড়াতেই হবে।

হু হু করে গ্রামের চারিদিকে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল। কত লোক কত কথা বলল, কত ভয় দেখাল, কিন্তু গুরুদেবের আদেশ শুনে আর কেউ উচ্চবাচ্য করল না—জোর দিয়ে নিষেধ করতে পারল না।

বর্ষাকাল—চারিদিকে জল থই থই করছে। এই বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার উপযুক্ত সময়—কারণ, নৌকাযোগে জিনিষ-

পত্র নিয়ে যাওয়ার সুবিধা হবে। তাই ধীরে ধীরে যাওয়ার প্রস্তুতিও আরম্ভ হয়ে গেল।

হিমভিখারী খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করছিল—কত লোক এল, গেল—কত কথা বলল—কিন্তু দুর্গাদির কোন হদিস নেই। গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকেই দুর্গাকে হিমভিখারী আর দেখতে পাচ্ছিল না—ও যেন কোথায় আত্মগোপন করে আছে। কিন্তু এত বড়ো সুসংবাদটা ওকে দেওয়ার জন্য হিমভিখারী আকুলি বিকুলি করছিল। শেষটায় আর অপেক্ষা না করতে পেরে হিমভিখারী নিজেই এক বিকেলে ওর খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। ওকে কোথাও দেখতে না পেয়ে—শেষটায় খালের দিকে এসে দেখতে পেল—দুর্গা একখানা ছোট ছিপ নিয়ে মাছ ধরছে। হিমভিখারী ছুটে গিয়ে আনন্দের আতিশয্যে দুর্গাদির পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক নিঃশ্বাসে বলতে শুরু করল—জানিস দুর্গাদি, জানিস—আমরা তো ঢাকা সহরে চলে যাচ্ছি। সেখানে কত বড়ো বড়ো বাড়ি, স্কুল, কলেজ, কত বড়ো বড়ো বাধানো রাস্তা—কাদামাটি সেখানে নেই-ই—কত খেলাধূলা—কত খাওয়ার জিনিষ—মিষ্টি বলে সেখানে কেউ গুড় খায় না—সবাই সন্দেশ, রসগোল্লা খায়—চিনির সন্দেশ নয়, ছানার সন্দেশ—খেতে কত ভালো জানিস—ঐ যে অনেকদিন হল দাদা একদিন নারায়ণগঞ্জ থেকে নিয়ে এসেছিল—মা তোকে দিয়েছিল না—সেই রকম সন্দেশ। তুই যাবি, আমি যাব এবং আর সকলেও যাবে—আর গুড় আমরা খাবই না, ইত্যাদি ইত্যাদি, কত সুখবরই না হিমভিখারী দুর্গার হাতে এক নিমেষে পরিবেশন করল, কিন্তু দুর্গা স্থির, নিষ্পলক দৃষ্টিতে ছিপের ফাতনার দিকে তাকিয়েছিল—কোন কথার একটা হুঁ, হ্যাঁ বলে জবাবও দিচ্ছিল না। আকস্মিক দুর্গার এই অদ্ভুত নীরবতা হিমভিখারী কিছুতেই আর সহ্য করতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত অধীর হয়ে চিবুক ধরে ওর মুখখানা ঘুরিয়ে সুসংবাদটা আর একবার পরিবেশন করতে চাইল। হঠাৎ হাতখানা সরিয়ে অবাক হয়ে বলল—দিদি, তুই কাঁদছিস?

কোথায় রে, পাগলা ছেলে—বলে দুর্গা হিমভিখারীকে কাছে টেনে নিল।

হিমভিখারী ধীরে ধীরে বলল—তুই কাঁদছিস, দিদি? কেন কাঁদিস? এই যে তোর সারা মুখখানা ফুলে উঠেছে—চোখ লাল হয়ে গেছে—ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। আমরা সহরে গিয়ে কত ভালো ভালো খাবার খাব, দালান বাড়িতে বাস করব। আর জানিস দিদি—ওখানে গিয়েই না বাবা তোকে একখানা ভালো দেখে সাড়ি কিনে দেবে। কত কি সব এক টানা বলে দুর্গাকে সে খুশী করতে চাইল।

দুর্গা অবাক হয়ে হিমভিখারীর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, আর ভাবতে লাগল—কি বিচিত্র এই পৃথিবী! এই সাত, আট বৎসরের বালক আশা সহরে যাবার আনন্দে আত্মহারা, আর আমার মাথায় যেন সারা আকাশটা ভেঙে পড়ল—চোখে যেন সাত সমুদ্রের জল এসে জমা হতে লাগল—আর মনে হতে লাগল—এ সংবাদ শোনার আগে আমার মৃত্যু হল না কেন! আর কোন কথা না বলে দুর্গা হিমভিখারীকে কোলে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল।

নারায়ণগঞ্জ থেকে দাদার পত্র এল বাড়ি ঠিক হয়ে গেছে—ঘোষের বাজার লেন—মাসিক ভাড়া আট টাকা। ঢাকা সহরের ভিতর দিয়ে বরাগঞ্জের একটা খাল চলে গেছে। এই খালের যেখানটায় আমাদের নৌকা ভিড়বে সেখান থেকে আমাদের বাসাটা পাঁচ মিনিটের পায় হাঁটা পথ। কাজেই নৌকা থেকে জিনিষপত্র নিয়ে যেতে বিশেষ কষ্ট হবে না—বয়চও বেশী লাগবে না। আমার দাদা আরও লিখেছেন—আগামী রোববার দিন যেন আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছাই। সেদিন তার অফিস বন্ধ, কাজেই কোন অসুবিধা হবে না।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের তৈরী হয়ে নিতে হল। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যা যা আমাদের সাথে যাবে সব বস্তাবন্দী হয়ে গেল।

রবিবার দিন অতি প্রত্যুষে আমরা সবাই নৌকায় গিয়ে উঠলাম। পাড়ার প্রায় সব লোক ঘাটে এসে কাঁদো কাঁদো ভাবে আমাদের বিদায় দেবার জন্য জড়ো হল। রওনা হওয়ার দু একদিন আগে থেকেই দুর্গাদির বেশী দেখা নেই। সহরে যাওয়ার আনন্দে ওর কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম। আর দুর্গাদিও আমাদের কাছেও

পাড়া থাকায় শেষের কয়টা দিন কারো সাথে বেশী দেখাও করেনি—কথাও বলেনি। কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলে উত্তরও বেশী দেয়নি—কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেছে।

নৌকা ছাড়ার প্রাক্কালে দিনভিখারী নৌকার এক কোণে দাঁড়িয়ে শুধু দুর্গাদিকে খুঁজছিল—আর আকুলি-বিকুলি হয়ে এদিক সেদিক তাকাচ্ছিল। শেষ সময় দেখতে পেল দুর্গাদি পায়ের ছিঁড় ঠেলে সামনে এসে অধীর হয়ে জলভরা চোখে কাকে যেন খুঁজছে। ওকে দেখেই দিনভিখারী চিৎকার করে ডাকতে লাগল—দুর্গাদি আয়, তাড়াতাড়ি ছুটে আয়—নৌকা ছেড়ে দিল যে! তুই ছাড়া আমরা কি করে বাঁচব দুর্গাদি? তুই শিগ্‌গির চলে আয়!

দিনভিখারীর সেই প্রাণ মাতানো চিৎকার অগ্রাহ্য করে 'বদর,' 'বদর' বলে নৌকা ছেড়ে দিল। অবশেষে দুর্গা একবার চিৎকার করে বলল—'তোদের আশায় আমি বেঁচে থাকব।' তারপর কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ ঢেকে দুর্গা বসে পড়ল। দিনভিখারী অপলক দৃষ্টিতে দুর্গার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমরা যথাসময়ে বন্দর বাজার বাসায় গিয়ে উঠলাম—দুখানা পাকা ঘর, একখানা টিনের ঘর, আর একখানা টিনের একচালা রান্না করার জন্য, একটি পাতকুয়ো এবং এদিক সেদিক দু চারটা আমগাছ ও কাঁঠালগাছ সমস্ত বাড়িটাই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। মনে হল—আমরা যেন স্বর্গে এসে পৌঁছলাম—চারিদিকেই দালানবাড়ি, রাস্তা-ঘাট সমস্তই ইট দিয়ে বাঁধানো—পথে বেরুলেই ঘোড়ার গাড়ী, সাইকেল, মাঝে মাঝে দু' একটা মোটরগাড়ীও দেখা যায়, এখানে সেখানে দোকান—কত খাবার সাজিয়ে রেখেছে—জীবনে আমরা যা চোখেও দেখিনি। আমি আর দিনভিখারী পথে বেরিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতাম—আর মনে মনে ভাবতাম—এ রকম জায়গাও আছে, তাহলে আমাদের গ্রামের লোকগুলো এত কষ্টে থাকে কেন? তারা সব এখানে এসে পড়লেই পারে। হয়ে আমাদের গ্রামের সমস্ত লোকদের এখানে নিয়ে আসব। এখানে ওরা বেশ থাকবে, খাবে—কোন কষ্ট করতে হবে না। বর্ষাকালে বড়জলে ভিজে, কুঁড়ে ঘরের চালাঘরে আমাদের গ্রামের লোকদের দিন কাটে ভোর হতে না হতেই ভাত জুটুক আর নাই জুটুক লাঙল কাঁধে করে মল কাদায় বেরিয়ে পড়ে—আর সেই সন্ধ্যা বেলায় ঘরে এসে তামাক টানতে টানতে ভাবে—কি করে এক কৌটো চাল জুটানো যায়, তা না হলে যে সমস্ত ছেলেপুলে নিয়ে উপোস থাকতে হবে। এত অভাব, অনটনে ওদের দিন কাটবে কেন, দাদা? ওরা যেন এখানে এসে সবাই যেমন সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, তেমনটি থাকবে।

দাদা বলত—তাইতো, এমন অদ্ভুত অমিল কেন! এখানকার লোকের এতো আছে—আর আমাদের গাঁয়ের লোকদের কিছুই নেই কেন?

বেশ কিছুদিন চলে গেল, ভালোই কাটল প্রথম প্রথম। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল—কি রকম যেন একটা অভাবের অক্টোপাস চারিদিক থেকে আমাদের চেপে ধরতে লাগল।

পূর্বেই বলেছি আমাদের সংসার মোটামুটি বেশ বড়ো—লোকসংখ্যা দশ বারো জন—তার মধ্যে ছয় সাত জন আমরা স্কুল, কলেজে পড়ছি। শুধু আমি একাই একটি ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে পড়াচ্ছিলাম—আর সবাই বেতন দিয়ে পড়াশুনা করছিল। স্কুল, কলেজের বেতন বই-পত্রাদি, বাড়ি ভাড়ার খরচ চালিয়ে, খাওয়া-খাওয়া যোগানোই ক্রমশঃ শক্ত হয়ে উঠছিল। একমাত্র আমার জ্যেঠতুত দাদার রোজগারে এত বড়ো সংসার চালানো অত্যন্ত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমার বড়দা—নরেনের একটা চাকুরি কিছুতেই জুটছিল না। মাঝে মাঝে টেলিগ্রাফ অফিসে ছুটির দরখাস্ত দিয়ে কাজ করত বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ সুরাহা হত না।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

বিশ্ববিদ্যালয় আইন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩৮ বছরের অধিকাল যাবৎ আমি এই কাজে নিযুক্ত ছিলাম, তাই শিক্ষা-দান ক্ষেত্র থেকে চলে যেতে আমার অনুভূতিতে একটা বেদনার মোচড় বোধ করেছি। আজ আমি পরম আহ্লাদের সহিত সেই দিনগুলির কথা স্মরণ করি যখন আমি দেশের যুব সমাজের মধ্যে এক প্রজন্মের বেশী সময় জুড়ে কাজ করেছি। আমি ছাত্রদের ভালবেসেছি, এবং আমি এটাও দাবী করতে পারি যে তাদের মন গঠনে ও তাদের আশা-আকাঙ্খাকে উজ্জীবিত করার ব্যাপারেও আমি যথেষ্ট সহায়তা করেছি। আমার বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ করা হয়েছে যে আমি তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ভাব-ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছে। হ্যা আমি তা করেছি, এবং আমি যে রাজনৈতিক ভাব-ধারণা তাদের দিয়েছি তা সঠিক পথে চলার ভাব-ধারণা, যা তাদের বৈপ্লবিক ভাবাদর্শ থেকে মুক্ত রাখার জন্য সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী এক রক্ষা কবচের কাজ করেছে।

আমি যা প্রচার করেছি, তা হল স্বদেশ প্রেমিকতা যার সঙ্গে মিশে আছে সুশৃঙ্খলা নিয়মতান্ত্রিক পথে জাতীয় জীবনের অগ্রগতি। আমি প্রচার করেছি যে সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই স্বায়ত্তশাসন লাভ আমাদের লক্ষ্য. আর সে লক্ষে পৌছতে হবে একমাত্র আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক পথে চলে। আজ যদি বাংলার কিছু সংখ্যক যুবকের মধ্যে (আর তাদের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়) বৈপ্লবিক আদর্শ স্বীকৃতি লাভ করে থাকে, তবে তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে তা হয়েছে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে যা সর্ব প্রকার প্রচার থেকে কম-বেশী পরিমাণে মুক্ত। কোন শিক্ষক বা প্রচারক মনকে নাড়া দিয়ে উত্তেজিত করতে পারেন ; কিন্তু তিনি এমন কোন উর্বর জমি তৈরী করতে পারেন না যে জমি থেকে বিপ্লবীরা উৎসাহ ও সমর্থন পেতে পারেন। ফলতঃ দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা যদি বিপ্লবের আদর্শকে গ্রহণ করার জন্য সে দেশের মানুষের মনকে প্রস্তুত না করত, তা হলে প্রচারকদের প্রচারপত্রের লেখাগুলি অনুর্বর জমিতেই পতিত হত।

সে যাই হোক, যুবকদের সঙ্গে ক্লাসের মধ্যে সময় কাটান আমার কাছে সব সময়ই একটা আনন্দের বিষয় ছিল। এই শিক্ষা দেওয়া, নির্দেশ দেওয়া ও উৎসাহ দেওয়ার কাজ সেই আনন্দের মধ্যেই রয়েছে। তাদের সঙ্গে থেকে আমিও যৌবনের উদ্যম লাভ করেছি, এবং আজ আমার এই জীবন সায়াহ্নে আমার মনে যদি আশাবাদ অক্ষুন্ন থেকে থাকে, তবে বলতে হবে যে, তা আমি পেয়েছি প্রধানতঃ যুবকদের সঙ্গে আমার নিবিড়তম সম্পর্ক থেকে এবং তাদের প্রতি ও তাদের হিতার্থে আমি যে সক্রিয়ভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছি, তা থেকে। ক্লাসের ঘরগুলি কিন্তু আমার কাছের শিক্ষার স্থল স্বরূপ। আমি যদি তাদের সৎ ও স্বদেশ প্রেমিক হওয়ার শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি, তারও প্রতিদানে আমাকে দিয়েছে তাদের যৌবনের উদ্যম, উৎসাহ ও জীবনের উজ্জ্বল আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। ক্লাস ছেড়ে বেড়িয়ে এসে আমি সর্বদাই অনুভব করেছি যেন আমার যৌবনের গুণগুলি আরও বেড়ে গিয়েছে। এই

গুণগুলি আমার সমস্ত কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আমার দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে এক অত্যুৎকৃষ্ট সম্পদ হয়ে উঠেছিল।

ফ্রেডারিক ডি গ্রেট কখনও কোন স্কুল মাষ্টারকে প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত করতেন না। মহান বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার আমাকে বলেছিলেন যে বাংলার একজন লেপ্টেন্যান্ট গভর্ণরও সেই নীতির অনুসরণ করে চলতেন। তবে যে স্কুল মাষ্টার নানা কাজের মধ্যে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকেন তার এমন সব গুণ না থাকলে চলে না যা জীবনের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। ফ্রেডারিক একাধিক সভাপতি স্কুল মাষ্টার ছিলেন। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের মধ্য দিয়ে আমি যে উপকার পেয়েছি সে সম্পর্কে বাই বলি তা অতিরঞ্জন হতে পারে না। শিক্ষকের কাজ ছেড়ে দিলেও কলেজ কাউন্সিলের সভাপতিরূপে কলেজের পরিচালনার কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছি।

কলেজের এবং শিক্ষার স্বার্থের সঙ্গে আমার সংযোগ সূত্র ছিন্ন হবে তখনই যখন আমার সমস্ত পার্থিব ব্যাপারের সঙ্গে সংযোগের ক্ষেত্রে ছেদ পড়বে।

আমি পাঁচ বছর সিনেটের মেম্বার ছিলাম। সিনেটে এই সিট আমি সরকারী মনোনয়নে পাইনি। পেয়েছি ভোটে আমার, সতীর্থ গ্রাজুয়েট বন্ধুদের ভোটে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইনে রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদের সিনেটে পাঁচজন সদস্য নির্বাচন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই গ্রাজুয়েটদের অন্ততঃ দশ বছর আগের গ্রাজুয়েট হওয়া চাই। আমি একজন প্রার্থীরূপে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং সবচেয়ে বেশী ভোট পেয়ে নির্বাচিত হলাম।

এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হওয়ার পূর্বে গ্রাজুয়েটদের জন্য একটা সংশোধিত নির্বাচনের ব্যবস্থা অনুমোদন করা হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে একটা নিয়ম করে দেওয়াছিল এই যে যারা ১৮৯৭ সালে বা তার পূর্বে এম.এ এবং বি.এ পাশ করেছেন কেবল মাত্র তারাই এই নির্বাচনে প্রার্থীরূপে দাঁড়াতে পারবেন। কেন যে ১৮৯৭ সালকে সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল এবং কেনই বা সেই সাল থেকে পরবর্তী কালে যারা গ্রাজুয়েট হয়েছেন তারা নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন তা একটা ধাঁধাই থেকে গেল। সরকারী মহলের অন্য অনেক ধাঁধার মত এই ধাঁধারও কোন উত্তর দেওয়ার অভিপ্রায় দেখালেন না। এক সময় এই ব্যাপারটা বেশ কিছুটা মন্তব্য ও সমালোচনার সৃষ্টি করেছিল। ১৮৬৮ সালে পাশ করা গ্রাজুয়েটদের উপর কেবল বিশেষ নিষেধাজ্ঞার ছিলনা। তাদের কোন ক্রমেই তুলনামূলকভাবে পূর্ব পূর্ব বছরে পাশ-করা গ্রাজুয়েটদের চেয়ে নিকৃষ্ট বলে বিবেচনা করা যায় না। তাহলে তাদের নির্বাচনে থেকে বাদ দেওয়া হল কেন? যদি এ রকম কোন একটা নিয়ম থাকত যে কেবলমাত্র বিশ এমন কি পঁচিশ বছর পূর্বে যারা গ্রাজুয়েট হয়েছিল, তারাই নির্বাচনে অংশ গ্রহণের যো-া, তা হলেও তার এই রকম একটা অর্থ থাকত যে কেবলমাত্র অভিজ্ঞ গ্রাজুয়েটরা যাতে নির্বাচিত হয়, এরমধ্যে তার একটা ব্যবস্থা আছে। আমার বন্ধুরা বললেন যে সে নিয়ম যদি করা হত, তাহলে আইন প্রণেতাদের উদ্দেশ্য সফল হত না; কারণ, তাদের মত, এই নিয়মটি করা হয়েছে কেবলমাত্র আমাকেই বাদ দেওয়ার জন্য। আমার গ্রাজুয়েট হওয়ার বছর হল ১৮৬৮ সাল।

এই প্রতিবন্ধক সৃষ্টি এত বিবেচনাহীন হয়েছিল যে এর প্রতিবাদে এলবার্ট হলে একটি জনসভা অনুষ্ঠান হয়। সেই সভায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক নেতৃস্থানীয় গ্রাজুয়েট যোগদান করেন। সভায় ঐ নিয়মের পরিবর্তন দাবী করা হল। কিন্তু তাতে কোন ফল হলনা। বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ নিয়মেই চলতে থাকল। বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সুস্পষ্টভাবেই দশ বছর পূর্বে যারা গ্রাজুয়েট হয়েছেন তাদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়।

আমার সিনেটের সদস্য থাকা কালে সব চেয়ে বড় কাজ যেটা হয়েছে, তা হল সরকারের বিবেচনার জন্য কতগুলি রেগুলেশন প্রণয়ন করা। আমি রেগুলেশন প্রণয়ন কমিটিতে ছিলাম। আমাদের কাজ ছিল বড়

কঠিন। সমস্ত সুপারিশটি যে সরকার গ্রহণ করেছেন, তা বলতে পারিনা। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের সুপারিশ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। আমরা সুপারিশ করেছিলাম যে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক। কিন্তু সরকার রেগুলেশনগুলি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য যে কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন, সেই কমিটি এই সুপারিশ নাকচ করে দেন। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করে ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করা কোন ছাত্রের পক্ষে কী করে সম্ভব, অন্যান্য হেঁয়ালীর মধ্যে তাও একটা হেঁয়ালী বিশেষ। রেগুলেশন প্রণেতাগণ ও ভারত সরকারকে এই সমস্ত হেঁয়ালীর সমাধান যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি অবশ্যই করতে হবে।

আমি যখন সিনেটের একজন সেবার নিযুক্ত হলাম তখন ভাইসচ্যান্সেলর ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখার্জি। বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়নে তার অনেকখানি হাত ছিল। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে তিনিই এই আইনটি পরিচালনা করেন, সুতরাং যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই প্রধানতঃ এই বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, স্যার আশুতোষ মুখার্জিকে যুক্তিযুক্তভাবেই সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথমের পদে নিয়োগ করা হয়। তারপরে ভাইসচ্যান্সেলর হলেন মিঃ জাষ্টিস আশুতোষ মুখার্জি। আশুতোষের ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের পরিচয়। তাছাড়া, তার ছিল শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক অবধারণ শক্তি এবং সেই সমস্যাগুলি হাতে নিয়ে তার সমাধান করার অসাধারণ ক্ষমতা। এই গুণের জন্য স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা শক্তিধর পুরুষরূপে পরিগণিত হলেন। তিনি যতদিন ভাইসচ্যান্সেলার ছিলেন (আর তিনি বেশ কয়েক বছর ধরেই সে পদে ছিলেন), ততদিন তিনি পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ পরিচালনা করেছেন; এবং একথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশনগুলিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি নিজের ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা অনেকখানি খাটিয়েছেন যারফলে ছিল তাঁর সমধিকের স্বার্থ-রক্ষার মনোভাব। বাংলার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে সন্দেহ ও উৎকণ্ঠার ভাব ছিল, তার এই বিচার-বিবেচনা আংশিকভাবে তা প্রশমিত করেছে। তাইতো ভাইসচ্যান্সেলরূপে কাজ করার সময় স্যার তারকনাথ পালিত এবং স্যার রাসবিহারী ঘোষ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের জন্য রাজকীয় বদান্যতা প্রদর্শন করেন। আশুতোষের কর্মক্ষমতায় তাদের বিশ্বাস ছিল এবং নিঃসন্দেহে তাঁরা মনে করেছেন যে তাঁর যোগ্য পরিচালনায় তারা যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য অর্থ সাহায্য করেছেন তা সত্যি সত্যিই ভালোভাবে গড়ে উঠবে। আশুতোষের চেয়ে কম নিষ্ঠাবান ও কম শক্তিমান কোন ভাইসচ্যান্সেলর সম্ভবতঃ তাদের মধ্যে এতখানি বিশ্বাস জাগ্রত করতে পারত না। তাঁরই আমলে বিশ্ব-বিদ্যালয় উচ্চতর শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে এক বড় রকমের অগ্রগতি লাভ করে।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় তার একটি কাজ মন্তব্য ও সমালোচনার সম্মুখীন হয়। সে কাজটি হল এই, তিনি রিপন কলেজ বাদে আর সমস্ত প্রাইভেট কলেজ গুলিতে আইনের ক্লাসগুলি তুলে দেন। তাঁর এই কাজের পেছনে হয়ত একটা চিন্তা ছিল, একটি কেন্দ্রীয় আইন কলেজ গড়ে তোলা যে কলেজ এমন মর্যাদার আদর্শে গড়ে উঠবে যে তার শিক্ষা ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকার বড় বড় আইন কলেজগুলির শিক্ষার সঙ্গে সমান মানে উন্নীত হবে। তবে এ কাজটি প্রাইভেট কলেজের আইনের ক্লাসগুলির অনুমোদন বাতিল না করে সেগুলির শিক্ষার মান উন্নয়নের উপর একটুখানি জোর চাপ দিয়েই করা যেতে পারত। শিক্ষাক্ষেত্রে সুস্থ প্রতিযোগিতা শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়তা করে; কোন কিছু পূর্ণ আয়ত্তাধীনে আনার প্রচেষ্টাযুক্ত হলে তা জন-স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মী হিসাবে স্যার আশুতোষ মুখার্জির কাজের কথা এখানেই শেষ করা অসম্ভব। তাঁর অকাল প্রয়াণে বাংলার শিক্ষা ক্ষেত্রে যে দারুণ ক্ষতি হয়েছে তার জন্য শোক প্রকাশ না করে পারা যায় না। বিচারালয় থেকে অবসর গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর

প্রয়াণ ঘটে। বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক অবিস্মরণীয় পুরুষ। তাঁর স্থান অন্যের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন হবে। সারা প্রদেশ জুড়ে তাঁর সম্মানে যে অগণিত শোকযাত্রা ও শোক সভার অনুষ্ঠান হয়েছে তাই তাঁর মৃত্যুতে জাতীয় শোকের সার্বজনিনতার সাক্ষ্য বহন করছে।

১৯০১ সালে আমি আর বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদে ছিলাম না। সেই বছরই আমি ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে একটি পদে প্রার্থীরূপে নির্বাচনে দাঁড়াই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন দরভাঙ্গার বর্তমান মহারাজা। আমি নির্বাচনে পরাজিত হলাম। যে অবস্থার মধ্যে আমি নির্বাচনে হেরে গেলাম, তা ছিল একটা অদ্ভুত ব্যাপার। মহারাজা ও আমার পক্ষে ভোট হয় সমান সমান। উভয়েই পাঁচটি করে ভোট পাই। ব্যাপারটা ভারত সরকারের হাতে গেল। কাউন্সিলের নিয়মানুযায়ী নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে নির্দেশ ঘোষণা করতে হবে। লর্ড কার্জনের সরকার সে নিয়ম চল করলেন। এই সরকার তিন মাসের মধ্যেও কিছু করলেন না। পরে পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে আমার বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্যপদের মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। ফলে আমার পক্ষে আমার নিজের ভোটটি আর দিতে পারিনি।

এটা একটা কূটনৈতিক কৌশল, প্রচলিত নিয়মের বিরোধী কাজ। কোন সৎ বুদ্ধির পরিচয় এর মধ্যে নেই। এর উদ্দেশ্য হল আমাকে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল থেকে বাইরে রাখা। কার্যতঃ হলও তাই। এর আগেও আমি কয়েকবার ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নির্বাচন প্রার্থী হয়েছিলাম। কিন্তু প্রতিবারই আমি পরাজিত হয়েছি। আমি মনে করি সরকারী মহলের প্রভাব আমার বিরুদ্ধে খাটান হয়েছিল। আমার এক বিহারী বন্ধুর কথা বলছি। এই বন্ধুটিকে আমি বেঙ্গল কাউন্সিলে নির্বাচিত হতে সাহায্য করেছিলাম। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি আমার পক্ষে ভোট দিবেন। কিন্তু সময় কালে তিনি তা করতে পারলেন না; কারণ, একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী তার সঙ্গে এবিষয় আলোচনা করে তাকে যে অনুরোধ করেন, তা তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। আমার মনে হয় যেন ঘটনাটি সেই সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করা হয়নি।

চলবে

যকৃতের দোষে বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র
প্রস্তুতকারক শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
কবিকণ্ঠ কুটীর • কুমার খোলা • যশোহর • পূর্ববঙ্গ

ইরান

॥ কালীপদ সরকার ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কাজার পাশার পক্ষে তুরস্কে যে সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছিল, রেজা শাহ পহলবীর পক্ষে ইরানে তা হয় নি বটে, তবে একটি মধ্যযুগীয় অন্ধকার থেকে ইরানকে তিনি যে প্রগতির আলোকে এনেছিলেন এবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইরানের তৈল সম্পদের সিংহভাগ ব্রিটেন কর্তৃক অধিকৃত থাকায় ব্রিটিশের সঙ্গে রেজাশাহের মৈত্রীস্থাপনের সম্ভাবনা ছিল না। কমিউনিজম প্রসারের আশঙ্কা রেজা-শাহকে সোভিয়েত রাশিয়ার সহিতও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়তে দেয় নি। তবুও রাশিয়ার সহিত ইরানের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কূট সম্পর্কের কোনরূপ অবনতি ঘটে নি। বরং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত সোভিয়েত রাশিয়া-পারস্য মৈত্রীচুক্তি ইরানের কূটনীতির ক্ষেত্রে নির্ভরশীল ভিত্তি রূপে গড়ে তুলেছিল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে রেজাশাহ ইরাক, তুরস্ক, ইরান ও আফগানিস্থানের মধ্যে একটি মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করতে সক্ষম হন। এই চুক্তিটি সাদাবাদ চুক্তি নামে পরিচিত। চুক্তিটি রেজাশাহের প্রখর রাজনৈতিক জ্ঞানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কিন্তু 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়', দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই রেজাশাহের রাষ্ট্রজীবনে বিপর্যয়ের ঘনিয়ে উঠল। যুদ্ধে তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ, অথচ ইরানের উপর প্রভুত্ব প্রয়াসী ব্রিটেন ও রাশিয়ার পরিবর্তে শাহের মনোযোগ সমর্থন ছিল জার্মানীর প্রতি। রাশিয়ার ঘোর আপত্তি প্রতিরোধ এবং অবরুদ্ধ জার্মানীর সাহায্যে অস্ত্র রসদ এবং খাদ্য প্রেরণের জন্য মিত্রপক্ষ ইরানকে ব্যবহার করতে উদ্যত হলে রেজাশাহ প্রতিবাদ জানালেন। মিত্রপক্ষ প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে, ইরানের সার্বভৌমত্ব পদদলিত করল। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ ও রুশ বাহিনী ইরান আক্রমণ করল। ইরানের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হল। অবমানিত শাহ শত্রুর নিকট নতি স্বীকারের পরিবর্তে, বিশ বছর বয়স্ক পুত্র শাহ মহম্মদ রেজার অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করে, স্বেচ্ছানির্বাসনে গেলেন। তিন বছর পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর মৃত্যু হল। এইভাবে আধুনিক ইরানের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়কের সম্ভাবনা উজ্জ্বল জীবনের সমাপ্তি ঘটল।

নতুন শাহ মহম্মদ রেজা অবস্থাগতিকে মিত্রপক্ষের দাবী মেনে নিয়ে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে অক্ষশক্তিচক্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ইরানে ব্রিটেন ও রাশিয়া সৈন্য সমাবেশ করল। ভারতবর্ষ থেকে আফগানিস্থান হয়ে ইরান এবং সেখান থেকে রুশযুদ্ধক্ষেত্রে অবারিত খাদ্য, অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ চলল। পারস্য উপসাগরস্থ ইরানের বন্দরগুলি ব্রিটিশ ও যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে গেল। ইরান হল মিত্রপক্ষের অন্যতম প্রধান যুদ্ধ ঘাঁটি। শাহের সহিত মিত্রপক্ষের যে চুক্তি হল, তাতে শর্ত থাকল যে, যুদ্ধ সমাপ্তির ছয়মাসের মধ্যে ব্রিটিশ ও রুশ দখলদার সৈন্য বাহিনী ইরান ত্যাগ করবে। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে, ব্রিটেন তার সৈন্য বাহিনী সরিয়ে নিলেও, সোভিয়েত রাশিয়া উত্তর ইরান থেকে নড়তে চাইল না। সেখানে সে একটি কমিউনিষ্ট রিপাবলিক গড়তে চেষ্টিত হল। মহম্মদ রেজা শাহ জাতিপুঞ্জ পরিষদে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ এনে প্রতিকার দাবী করলেন। কিছুদিন বাদবিতণ্ডা চলল, শেষে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চাপে সোভিয়েত রাশিয়া ইরান থেকে সৈন্য সরিয়ে নিল। ইরান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের পূর্বে, রাশিয়া ইরানে একটি রুশ-ইরান তৈল কোম্পানী গঠনের সম্মতি আদায় করে নিল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ইরানের মজলিস রুশতৈল কোম্পানী গঠনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য

করল, ফলে ইরান-রাশিয়া সম্পর্কে তিক্ততা বৃদ্ধি পেল। যার অবশ্যম্ভাবী ফল হল সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক শাহ বিরোধী কমিউনিষ্ট পন্থী টুডে পার্টি এবং মোসাদ্দেকের অনুকূলে মতপ্রদান।

ইরানের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা অবসান কল্পে শাহ একটি সপ্ত বার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য ছিল প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অর্থ সংগ্রহের পথ ছিল দুটি—ইরানের তৈল সম্পদ এবং বৈদেশিক ঋণ। তৈল সম্পদে হাত দিলে ব্রিটেনের সহিত বিরোধ অনিবার্য, তাই শাহ ঋণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারস্থ হলেন। যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে তিনি সাদর সংবর্ধনা লাভ করলেও, আবশ্যক ঋণের প্রতিশ্রুতি পেলেন না। যুক্তরাষ্ট্র চীনে চিয়াংকাইশেকের পিছনে কোটি কোটি ডলার ঢেলে যে মার খেয়েছিল, সম্ভবতঃ সে কথা মনে রেখেই যুক্তরাষ্ট্র ইরানের শাহকে ভাল করে না বুঝে, প্রচুর ঋণ দিতে অনিচ্ছুক হয়েছিল।

ইরানের তৈল সম্পদ থেকে ব্রিটেন যে বিরাট মুনাফা বছরের পর বছর লুঠছিল তা ছিল ইরানের জাতীয়তাবাদীদের ঘোর অসন্তোষের কারণ। মজলিসে জাতীয়তাবাদী সদস্যদের নেতা মোসাদ্দিক দাবী করলেন, ইরানের অর্থসঙ্কট মোচনের জন্য শাহের উচিত ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানী অধিগ্রহণ। ব্রিটিশ তৈল কোম্পানীটি অবিলম্বে জাতীয়করণের দাবী সোচ্চার হয়ে উঠল। প্রধানমন্ত্রী আলি রাজমারা ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানী জাতীয়করণের পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে আততায়ীর হস্তে তিনি নিহত হলেন। জাতীয়তাবাদী নেতা মোসাদ্দিক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। অনতিবিলম্বে তৈল কোম্পানী অধিগ্রহণ বিল মজলিস কর্তৃক গৃহীত হল। কিছুটা দ্বিধা জড়িত চিত্তে শাহ আইনটি অনুমোদন করলেন। ব্রিটিশ কড়োর প্রতিবাদ জানাল, পারস্য উপসাগর অঞ্চলে রণতরী পাঠাল এবং সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত রাখল। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের পক্ষ অবলম্বনের পক্ষে না থাকায়, ব্রিটেনকে চুপ করে যেতে হল। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে অক্টোবরে ইরানী সৈন্যদল ইঙ্গ-ইরান তৈল কোম্পানী দখল করল। ব্রিটিশ কারিগরী প্রযুক্তিবিদরা ইরান থেকে বহিষ্কৃত হলেন।

তৈল কোম্পানী অধিগ্রহণের পর ইরানের সমস্যা বাড়ল। তৈল উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেল। রাজস্ববৃদ্ধির বদলে রাজস্ব আয় সম্পূর্ণ লোপ পেল। দেশে দেখা দিল ভয়ঙ্কর সংকট ও অর্থনৈতিক সংকটের দ্রুত সমাধানে ব্যর্থ হওয়ায় মোসাদ্দিক প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত হলেন। মোসাদ্দিক কিন্তু ক্ষমতা ত্যাগে সম্মত হলেন না, তিনি তাঁর দলবল নিয়ে শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। তেহেরানের ছাত্র ও শ্রমিকগণ মোসাদ্দিকের সমর্থনে এগিয়ে এল। শাহ রক্তারক্তি এড়াবার উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি দিলেন এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী জাহেদি গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় নিলেন। মোসাদ্দিকের বিপ্লব কিন্তু অধিকদিন স্থায়ী হল না। শাহপন্থী সেনাদল মোসাদ্দিকের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে আসরে নামল। মোসাদ্দিক বন্দী হলেন এবং শাহ মহম্মদ রেজা ইরানে ফিরে এসে ক্ষমতায় বসলেন। ইরানের রাষ্ট্রপরিবর্তন এক তারকার এমন উদয়াস্ত প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়।

শাহের পিতা রেজাশাহ পল্‌হবী ছিলেন সাধারণ ঘরের ছেলে, বড় বনেদী রাজবংশের অধস্তিকারমুক্ত রেজা শাহ একান্তভাবে নিজের বুদ্ধি ও দক্ষতাগুণে সিংহাসনে বসেছিলেন। তাঁর শাসনকাল আধুনিক ইরানের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত। শাহ মহম্মদ রেজাও পিতার অনেক গুণের অধিকারী এবং পিতার অসমাপ্ত কাজকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর, সুতরাং দেশবাসীর আনুগত্য তিনি যে লাভ করবেন তাতে বিস্ময়বোধের কিছু ছিল না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ একদিকে যেমন ব্রিটিশ, ফরাসী, ডাচ ও পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের পতন ঘটাল, অন্যদিকে তেমনি সৃষ্টি করল দুই নতুন বিশ্বশক্তি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি-শিবিরের সহিত নিজেদের যুক্ত করল। প্রতিরক্ষা ও আর্থিক পুনর্গঠনের প্রয়োজনে কোন একটি শক্তি শিবিরে না ঢুকে এদের উপায় ছিল

না। দুই বিশ্ব-শক্তির প্রতিযোগিতার পিছনে শুধু যে ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ ছিল তা নয়, ছিল আদর্শের সংঘাতও। রাশিয়া ছিল যেমন কমিউনিজম বিস্তারের সর্বপ্রধান নায়ক, যুক্তরাষ্ট্র তেমনই ব্যক্তি স্বাধীনতাভিত্তিক গণতন্ত্রের পরিরক্ষক।

ইরান মুসলিম রাষ্ট্র, কমিউনিজম তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম। ইরানের সহিত রাশিয়ার বিগত দুইশত বৎসরের ইতিহাস রুশআগ্রাসন-মসীলিপ্ত। ইরানের বহু অঞ্চল রুশ অধিকারভুক্ত এবং সোভিয়েত রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলে পরিণত। ইরানের পক্ষে সোভিয়েত রাশিয়াকে বন্ধুভাবে গ্রহণ সহজ ছিল না এবং সে কারণে তার রুশ সিবিরে যোগদানের প্রশ্নও ছিল না। পক্ষান্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অকমিউনিষ্ট গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পতাকাবাহী, ইরানের ভূমির উপর যুক্তরাষ্ট্রের অতীত কিংবা বর্তমানে কোন অভিসন্ধি ছিল না, এবং সংকটকালে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় তার পাশে দাঁড়িয়েছে। তাই দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ইরানের শাহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকলেন। এশিয়ায় কমিউনিজম প্রসার রোধের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র বাগদাদ রাষ্ট্র-জোট গড়লে ইরান তাতে যোগ দিল। ইরাক, ইরান, তুরস্ক, পাকিস্তান, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন বাগদাদ জোটের সদস্যকুলকে প্রচুর মার্কিন আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দেওয়া হতে লাগল। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ইরাক জোটের বাইরে চলে গেলে, বাগদাদ জোটের নতুন নামকরণ হল সেন্টো—সেন্ট্রাল ট্রিটি অরগানিজেসন। জোটের সদর দপ্তর বাগদাদ থেকে স্থানান্তরিত হল তেহরানে। ইরানে মার্কিন সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেল। ইরান অত্যাধুনিক বিমান ও সমরাস্ত্রে সজ্জিত হল।

ইতিমধ্যে ইরানের তৈল উৎপাদন কোম্পানীর ভার ন্যস্ত হয়েছিল একটি আর্ন্তজাতিক সংস্থার উপর, যাতে ইরান ছাড়া ছিল ডাচ, ফরাসী, মার্কিন ও ব্রিটিশ প্রতিনিধি। ইরান ব্রিটিশ মালিকানাভুক্ত ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ২৫০ কোটি পাউণ্ড অর্থ প্রদান করল। যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় পারস্য-গল্ফের নিকটে সেন্ট্রাফেরিকেল ও ইস্পাহানে ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হল। দক্ষিণ-পশ্চিম মরু অঞ্চলে নির্মিত হল পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ জলাধার পল্‌রবী বাঁধ। সেচ ব্যবস্থায় তিন লক্ষ একর পতিত ভূমি শস্যশ্যামলিমপূর্ণ হল। বিদ্যুৎ সরবরাহ হতে লাগল বহু গ্রামে।

ভূমি সংস্কারে শাহ মহম্মদ রেজা নিজেই নিজের প্রধান ভূমিকা। তিন লক্ষ একর খাস শাহী কৃষিভূমি তিনি ক্ষেত মজুরদের মধ্যে নামমাত্র মূল্যে বিলি করলেন। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবার জন্য শাহ সকল ভূস্বামীকে আহ্বান জানালেন। অবশ্য ভূমি অধিগ্রহণের জন্য আইনও রচিত হল। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে শাহ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সার্বজনীন ভোটাধিকার, শিল্পে সরকারী অর্থবিনিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং দেশের মূল শিল্প-বাণিজ্য জাতীয়করণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। ভূমিসংস্কারের ফলে সহস্রাধিক অনুন্নত জমিদারদের ১৭০০০ হাজার বৃহৎ কৃষিখামারের মালিকানা ২০,০০,০০০ চাষী পরিবারের মধ্যে বণ্টিত হল; খামার-গুলিতে চাষীদের যৌথ মালিকানা স্থাপিত হল এবং সরকারী ব্যবস্থায় তাদের মূলধন, সার ও চাষের যন্ত্রপাতি দেওয়া হল। ইরান একটি শক্তিশালী আধুনিক রাষ্ট্রের রূপ গ্রহণ করল। বিপুল তৈল সম্পদ অনায়াসে এই উন্নয়ন প্রচেষ্টার জন্য অর্থ জোগাতে সক্ষম হল।

প্রতিকূল থাকল শুধু একটি, তা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব প্রতিহতিতে সোভিয়েত রাশিয়ার শাহ বিরোধী তৎপরতা। দেশের সীমান্তে আমেরিকার শত্রু ঘুর্ণ হবে ইরান, এমন ব্যাপার রাশিয়ার পক্ষে নীরবে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। শুরু হল ইরানে শাহ বিরোধী বিক্ষোভ-আন্দোলন, এ আন্দোলনের শরিক হল কমিউনিষ্ট তাবেদার ছাত্র-যুবক-শ্রমিক দল এবং অবহেলিত মোল্লাতন্ত্রীরা। রাজতন্ত্র যতই জাতীয় স্বার্থ অনুকূল অথবা প্রগতিশীল হোক না কেন, আধুনিক যুগের চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না। সাম্যবাদের প্রচার তরঙ্গের একটি আপাত মধুর আকর্ষণ আছে বাস্তবক্ষেত্রে তার সাফল্য কতটুকু অনেকেই তার হিসাব করতে

(এরপর ১৩ পাতায় দ্রষ্টব্য)

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শচীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে আরও বলেন, 'যেদিন Defence of Act-এর প্রকোপে কয়েক সহস্র যুবক কেবলমাত্র সন্দেহের ফেরে বিনাবিচারে বন্দী হইয়াছিলেন সেই দিন বাঙ্গলার সকল দলই শক্তিহীন হইয়া পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একযোগে কাজ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং অল্প কিছু দিন সেভাবে কার্যও চলিয়াছিল। এই মেলামেশা যদি সমগ্র মত হইত তাহা হইলে হয়ত ফল অন্যরূপ হইতে পারিত। রাসবিহারী ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে যখন একবার কলিকাতার নিকটে কোথাও আসিয়াছিলেন সেই সময় তিনি একবার কলিকাতা অঞ্চলের বিভিন্ন দলের নিকট মেলামেশা করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠান। কলিকাতা অঞ্চলের কোন দলই কিন্তু এই মেলামেশার প্রস্তাবে তেমন গা দেখান নাই। অগত্যা রাসুদাকেও এই চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইতে হয়।

যাহা হোক রাসুদার বিদেশ যাত্রার পরও আমরা পূর্বের মতই অনুশীলন সমিতির সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে লাগিলাম। রাসুদার বিদেশ যাত্রার খরচ এক সহস্র মুদ্রা। এই টাকা সমিতির নিকট হইতেই লওয়া হয়। যে সময় রাসুদাকে বিদেশে পাঠানো হয় তখনও পর্যন্তও পূর্ববঙ্গের এই অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক শক্তি কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। বাঙ্গালার বিভিন্ন বিপ্লব দলের মধ্যে তখন প্রতিযোগিতা চলিয়াছে কোন দল কত কাজ করিয়া অন্য দলকে লজ্জিত করিতে পারে। রাসুদাকে বিদেশে পাঠাইয়া আমরা মনে করিলাম বিদেশ হইতে অস্ত্রের আমদানি করিবার চেষ্টা আমাদের দল থেকেই প্রথম করা হইল। আমরা তখন জানিতাম না যে সতীনবাবুর দলও ঠিক এই সময়েই নিজেদের লোক বিদেশে পাঠাইয়াছেন। দেশে আমরা বিভিন্ন দল এইরূপে বিচ্ছিন্নভাবে কার্য করিতেছিলাম বটে কিন্তু বিদেশে সে সময়ে সকল দলই বোধহয় মিলিত হইয়াছিলেন।"

এই সময় সিঙ্গাপুরে দুইটি ভারতীয় রেজিমেন্ট ছিল। তার একটির সঙ্গে বার্মার মুসলমান বিপ্লবী দলের যোগাযোগ ছিল। সিঙ্গাপুরে কাসিম মনসুর নামে এক গুজরাটি মুসলমান ছিল। রেঙ্গুনে তার পুত্রের কাছে তিনি এক পত্র লেখেন। এই পত্রের সঙ্গে তিনি রেঙ্গুনের তুর্কী কনসুলেট জেনারেলের নিকট এক পত্র পাঠান। সেই পত্রে তিনি লেখেন যে সিঙ্গাপুরে এই সৈন্যদল বিদ্রোহ করে তুরস্কের সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত এবং এজন্য একটি তুর্কী যুদ্ধ জাহাজ সিঙ্গাপুরে আসা দরকার। পত্রখানি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হাতে পড়ে এবং এই সৈন্যদলকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়।

আমেরিকায় গদর দলের লোকেরাও ভারতে যাতায়াত করবার সময় বার্মার ভিতর দিয়ে আসা যাওয়া করত। এর ফলে সিঙ্গাপুরের ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে তারা প্রচার আরম্ভ করে দেন। তারা বার্মায় নিজেদের লোক পাঠায়। ১৯১৬ সালের প্রথম দিকে সোহনলাল পাঠক এবং হসন খাঁ নামে গদর দলের দুইজন সদস্য রেঙ্গুনে এসে নিজেদের কেন্দ্র স্থাপন করেন। সিঙ্গাপুরে সেনাদলের মধ্যে অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়ে গেল। একটি কথা বিশেষ আশ্চর্য্য হই যে সিঙ্গাপুরের বিপ্লব আরম্ভ করবার তারিখ ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী স্থির হয়েছিল। কিভাবে এবং কখন এই ব্যবস্থা স্থির

হয়েছিল তা কেউ জানে না। যাহোক ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী পাঞ্জাবের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও সিঙ্গাপুরের উদ্যোগ ব্যর্থ হয় নি! সিঙ্গাপুরে দুইটি সৈন্য দল ঐ দিন প্রকাশ্যেই ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। এক সপ্তাহের জন্য সিঙ্গাপুর ভারতীয় সৈন্যদলের হস্তগত হল। সিঙ্গাপুর যদি ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত হত তবে সেই বিপ্লবই নিশ্চয়ই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু এক সপ্তাহ পরে রুশ, জাপান এবং ইংরেজের রণতরী এসে সিঙ্গাপুর দখল করে নিল। সিঙ্গাপুরে বিপ্লবাগ্নি নিভে গেল, সিঙ্গাপুর আবার ইংরেজের অধীন হল। কিন্তু এ সত্বেও এই এক সপ্তাহকাল ধরে বিপ্লবীরা স্থানীয় ইংরেজ সেনাদলের সঙ্গে কৃতিত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন এবং সে যুদ্ধে ইংরেজকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু এক সপ্তাহ পরে নূতন সৈন্যদল আসার পরে কিছু বিপ্লবী পালিয়ে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন এবং কিছু ইংরেজের হাতে বন্দী হলেন।

সিঙ্গাপুরের দুর্ঘটনার পরে গদর দলের দুই একজন অবশিষ্ট সদস্য সেখান থেকে বার্মায় চলে এলেন এবং এখানে এসে তারা দেশীয় সৈন্যদলের মধ্যে বিপ্লববার্তা প্রচার করতে লাগলেন। এই সঙ্গে তারা ব্রহ্ম সীমান্তে শ্যামদেশেও জার্মানদের সাহায্যে বিপ্লব আয়োজন চালাতে লাগলেন। উত্তর শ্যাম প্রদেশে জার্মান ইঞ্জিনীয়ারদের অধীনে এই সময় এক রেল লাইন তৈরী হচ্ছিল। এ কার্য্যের অধিকাংশ মিস্ত্রী এবং মজুর ছিল পাঞ্জাবী। আমেরিকা চীন প্রভৃতি দেশ থেকে পাঞ্জাবী গদর বিপ্লবীরা এদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন।

(চলবে)

(১২ পাতার শেষাংশ)

চায় না। তাদের অধিকাংশই থাকে রঙ্গিন স্বপ্নে বিভোর। এরূপ প্রস্তাবে তারা করে গোপনের অস্ত্র হাসব। মুসলমানদের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় তিনটি তাদের ধর্মের অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে স্বীকৃত। ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণা ও সাধনার বিষয় বস্তু নয়। এ সম্বন্ধে জানা দরকার যে—(১) ইসলাম Authoritarian অর্থাৎ হজরত মহম্মদ ও কোরানের শাসন মুসলমান মাত্রের পক্ষেই অলঙ্ঘনীয়, (২) ইসলাম-Equilitarian অর্থাৎ সকল মুসলমান এক ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ, সামাজিক উচ্চনীচত্বের ধর্মবিধানে অস্বীকৃত, (৩) ইসলাম—Totalitarian অর্থাৎ ইহারা অন্যের সহিত ভাগোস-রফা করে কিছু স্বীকার করতে পারে না, তাদের সার্বিক আধিপত্য অপরিহার্য। আধিপত্য নিয়ে অবস্থান, নয় স্বার্থত্যাগ বা বিলয়।

বহুযুগ অতিবাহিত হলেও, এমন কি অনেক ইসলামীয় আচরণ ও সমাজবিধি বর্তমান কালোপযোগী না থাকলেও মোল্লাতন্ত্র মুসলমানদের নিকট তা পবিত্র এবং অপরিবর্তনীয় বলে বিবেচিত। এই কারণে ইরানের গোড়া মুসলমানগণ পহলবী শাহ বংশের বৈপ্লবিক সমাজ পরিবর্তনের বিরোধী। শাহের নব শাসন সংস্কার বিধানে মোল্লাদের সামাজিক আধিপত্য লোপ এবং ব্যক্তিগত ভোগসর্বস্ব বহু ধর্মীয় সম্পত্তিও সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। সুতরাং তাদের ক্ষোভের কারণ কেবল ধর্মীয় নয়, কিছুটা পার্থিবও বটে।

সম্প্রতি ইরান সেন্টো জোটের সদস্যপদে ইস্তাফা দিয়েছে, পরিস্থিতি এখনো অবশ্য জটিল। আগামী ৩০শে মার্চ হচ্ছে ইরানে গণভোট। কি ধরণের শাসনতন্ত্র ইরানবাসী চায় তাই নির্দ্ধারিত হবে গণভোটের মাধ্যমে। ইরানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হোক, ভারতের নিকট তাই কাম্য। ভারতের সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক কখনও তিন হাজার বছরের, উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুতা সত্ত্বে উঠুক দুই দেশের মানুষও তাই চায়।

(সমাপ্ত)

ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ববাংলার উদ্বাস্তু ভাই-বোন ও শিশুরা একটু আশ্রয়ভূমি ও তার সাথে জীবিকা অর্জনের আশায় মরিচঝাঁপির মত অরণ্য সঙ্কুল শ্বাপদ ও হিংস্র জন্তু জানোয়ার পরিবেষ্টিত সুন্দরবনের অভ্যন্তরে নূতন করে ঘর বাঁধবার জন্য মরণ পণ করে কিছুকাল পূর্বে সমবেত হল। বন কেটে ঘর-বসত তৈরী করল, কাঠ কেটে নৌকা ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বানাল; জমি চাষ করে ধান, ডাল, কড়াই ও অন্যান্য ফসল বুনলো। বনে বনে ঘুরে মধু আহরণ করল। কাঠ কেটে, বন্য জন্তু শিকার করে, মাছ ধরে, মধু বিক্রি করে ও চাষ-আবাদ করে তারা দিনাতিপাত করতে লাগলো। নিজেদের চেষ্টার পরিশ্রমে, অসমসাহসিকতা ও অপরিসীম কষ্ট-সহিষ্ণুতার ফলে তারা সরকারী বা বেসরকারী সাহায্য ছাড়াই কলেরাসিষ্টে বিপদসংকুল পরিবেশে স্ত্রী-পুত্রকন্যা নিয়ে বসবাস করতে শুরু করল। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার তাদের কোনরূপ সাহায্য বা অর্থ দেননি বরং মরিচঝাঁপি যাবার পথে বহু বাধা সৃষ্টি করে তাদের ওখানে যাতে পৌঁছান সম্ভব না হয় সেই ব্যবস্থাই করেছিলেন। এই সরকারের দ্বারা সৃষ্ট সকল বাধাবিপত্তি নানা কৌশলে অতিক্রম করে তবে তারা মরিচঝাঁপিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হতে সক্ষম হয় এবং উপরোক্ত উপায়ে স্বাবলম্বী ও স্ব-নির্ভর হয় তারা। সরকার কিন্তু উদ্বাস্তুদের এবম্বিধ সাফল্যে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হন এবং এদের শায়েস্তা করার জন্য বন বিভাগেরও পুলিশের উপর এমন নির্দেশ জারি করেন বলে শুনা যায় যা উক্ত উদ্বাস্তুদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক এবং ওদের জীবন ও জীবিকার পক্ষে মারাত্মক। সরকারের অন্যায় জুলুম, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ওরা দলবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ায়। জোর জবরদস্তি করে ওদের দণ্ডকারণ্য ফেরত পাঠাবার জন্য সরকার নানা ফন্দি আঁটেন এবং ওদের ওপর কড়া নির্যাতন শুরু করেন। সরকারী মোটর বোট, ষ্টিমলঞ্চ ও পুলিশ এবং বনকর্মীদের সাহায্যে সরকার ওদের মরিচঝাঁপি থেকে হটিয়ে দিতে অনেক চেষ্টা করেন, উদ্বাস্তুদের নৌকা ডুবিয়ে দেন, তাদের প্রহার করা হয় এবং চারিদিক দিয়ে ঘেরাও করে ওদের অবরোধ করে রেখে ওদের জব্দ করা হয়। বাঁচবে যে মানবিক ওদের আছে সে কথা সরকার ভুলে যায়। ওরাও মরিয়া হয়ে সরকারের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ঢুকে জীবিকা আহরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কোন সরকারী নিষেধ বা বিধি মানতে অস্বীকার করে এবং নিজের নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের কঠিন তাগিদে বেপরোয়া অভিযান শুরু করে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা—দুর্ভিক্ষের সময়ে মা যেখানে সন্তান বিক্রি করে সেই অর্থে নিজে বাঁচতে চায়—তখন উদ্বাস্তুরা জীবন রক্ষা ও জীবিকা নির্বাহের জন্য যদি সরকারী বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করতে বাধ্য হয়, সেটা কি দোষের? আর্তের কাছে নিয়ম বা নির্দ্দেশের কোন মূল্যই থাকে না।

(চলবে)

(Contd. from 2nd cover)

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Dist—HOWRAH		
Smt. Protiva Roy w/o Sachindra Nath Roy	P. O. Belurmath	150	14. 7. 78
Smt. Parul Bala Das w/o Late Premchand Das	177-5 Mahendra Bhattacharjee Road, P.O. Santragachi	100	12. 10. 78
	Dist—BANKURA		
Sarkar Smt. Bina w/o Bimal Kumar Sarkar	Vishnupur Mission Danga P.O. Vishnupur	100	21. 7. 78
	Dist—BIRBHUM		
Kabiraj Smt. Santi Bala w l o Late Baidyanath Kabiraj	P. O. & Vill Dubrajpur	150	24. 6. 74
	Dist—JALPAIGURI		
Das Hemanta Kumar	P. O. Vill Bholavchabari	200	1. 4. 78
	Dist—WEST DINAJPUR		
Banerjee Smt. Saraju w/o Late Dhirendra Nath Banerjee	Vill Chakbhabaria, Balurghat	100	9. 1. 79
Ghose Smt. Renukona w/o Late Bejoy Ranjan Ghose	New Collegepara Indranu Colony, Raiganj	200	15. 2. 78
	Dist—MIDNAPUR		
Das Amar Chandra	Vill Barbajitpur P. O. Barbasudevpur	200	27. 6. 75
Das Smt. Snehalata (Guna) w l o Late Kanai Jana	P. O. & Vill Basudebpur	200	12. 1. 78
Bhunia Smt. Monorama w l o Late Pratap Chandra	P. O. & Vill Gopalpur	150	27. 10. 78
Laha Smt. Kamala Rani w l o Khudiram Laha	Krishnanagar, P.O. Ghatal	200	26. 12. 78
Mahata Trailokya Nath	Vill Dhansola, P.O. Chandri	200	30. 1. 76
Maity Smt. Hiranmoyee w l o Bhupendra Nath Maity	Vill Labahari, P.O. Kakra	200	25. 11. 78
Patra Smt. Saraswati	Till Potapukhuria, P.O. Mahisgota	100	16. 8. 72

RgedNo. R. N . 24511/71 | Biplabi Bangla Phone 34-1795 | Regd. WB/NC 77

বার্ষিক :—গ্রাহক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

— সম্পাদক মণ্ডলী —

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীসন্তোষকুমার বসু, শ্রীসুশান্ত চ্যাটার্জী।

সম্পাদক—শ্রীসাধি সরল রায়চৌধুরী

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবাসীন ঘোষ। বোম্বাই—শ্রীমধুগোপাল পাল।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল মোহন্তী। প্রচার সচিব—শ্রীকাশীনাথ বসু।

বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৩৯বি বিডনস্কোয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬ ৬ ২৬শে মে, ১৯৭৯	৩২ সংখ্যা

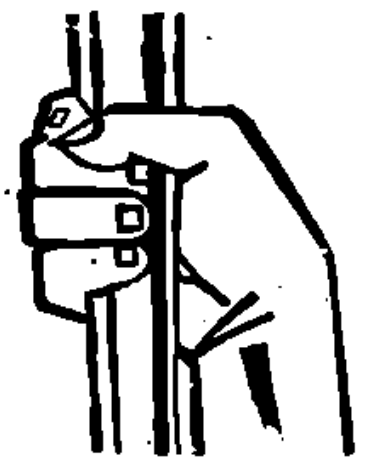

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী

বসুর ৯৪ তম জন্মদিনে

বিপ্লবী পরিষদের

শ্রদ্ধাঞ্জলী—

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	CALCUTTA		
Banerjee Smt. Amiya w/o Late Sushil Banerjee	26, Mahanirban Road Calcutta-29	100	17 12. 78
Chakraborty Smt. Monorama w/o Late Gopal Chakraborty	1/61, Bagha Jatin Colony Block I, Calcutta-47	150	12. 12. 76
Chakraborty Smt. Nirmala w/o Late Niranjan Chakraborty	G-5/8, Labory Estate, Salt Lake Calcutta-64	1 0	1. 10. 76
Dasgupta Santi w-o Dhirendra Lal Dasgupta	36, Naskarpara Road Calcutta-41	100	20. 11. 78
Dutta Smt. Parul w-o Chinta Haran Dutta	26, Ramkamal Sen Lane Calcutta-7	100	5- 9. 78
Dutta Smt. Mulan w-o Late Narayan Dutta	33, Lansdowne Terrais Calcutta-26	200	15. 11. 78
Debnath Smt. Sishubala w-o Late Basudeb Debnath	17, Nehrye Colony Calcutta-40	100	18. 7. 78
Mukherjee Smt. Banya w-o Sudhir Mukherjee	5-5, Satchasipara Road Calcutta-2	100	28. 3. 74
Mukherjee Smt. Kamala (Freedom Fighter,	126, Acharya J. C. Rd., Cal-14	200	25. 5. 78
Roy Smt. Lakshmi w-o Barin Roy	6/1-B,Badur Bagan Lane Calcutta-2	100	8. 1. 79
Roy Bardhan Nani Gopal	18, Regent Colony, Calcutta-40	200	1. 4. 76
Saila Nagendra Nath	27, Iswar Gupta Road, Cal.28	200	2. 7. 76
Sarkar Bhabesh Chandra	Elian Road, Agarpara, Cal-58	200	1. 4. 76
Sen Smt. Usha Rani w-o Late Sreenibas Sen	A-50, Lakshandnagar Colony Nandanbagan Calcutta-28	150	30 5. 78

(Contd. on Tail cover)

সম্পাদকীয়—

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু

পৃথিবীতে যে সব আলোকের শিশু আবির্ভূত হয়ে প্রায় শৈশব থেকেই মানুষকে আলোকতীর্থে চলবার জন্য আহ্বান জানান, বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার মধ্য দিয়ে এই সত্যই প্রতিভাত হয় যে তিনি এসেছিলেন রুদ্রের দূত হয়ে, মানুষকে মুক্তিতীর্থে নিয়ে যাবার পথপ্রদর্শকরূপে। যে বয়সে তিনি অসাধারণ দেশপ্রেম, বৈপ্লবিক নিষ্ঠা ও বিদ্রোহের মানসিকতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তার তুলনা সত্যই দুর্লভ। দশ এগার বছরের বালক ভুল ইতিহাস পড়াবার জন্য শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন এবং গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে স্বমতে দৃঢ় ছিলেন। কোন প্রকার ক্ষমা প্রার্থনা করতে অস্বীকার করায়, তাকে ডুপ্লে কলেজ ছাড়তে বাধ্য হতে হয়েছিল। কিন্তু সেটাই ছিল তার জীবনের সন্ধিক্ষণ। এই বিতাড়নের ফলে তিনি ক্ষুদ্র পরিবেশ ত্যাগ করে বিপ্লব যজ্ঞের মহত্তর পরিবেশে অংশ গ্রহণ করবার ও বিধনির্দিষ্ট মিশন পালন করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

রাসবিহারী ছিলেন দেশমাতার সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর আমিত্ববোধ ছিলনা একটুও। যা কিছু তিনি করতেন, তিনি বিশ্বাস করতেন, যে সেই মহাযন্ত্রীর যন্ত্র হিসাবেই করতেন। গীতার উক্ত "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি, তথা করোমি"— এই জীবন দর্শনকেই তিনিও গ্রহণ করেছিলেন এবং আজীবন দেশসেবায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। উপনিষদ কথিত চরৈ বেতি' (এগিয়ে চলার) নীতিকেই তিনি অনুসরণ করেছিলেন সারাজীবন। এমন মানুষের সাক্ষাৎ ইতিহাসে কদাচিৎ ঘটে। তাঁর নিজের কথায় বলা যায়—"বিপ্লব মানুষের সৃষ্টি নয়। মানুষ যন্ত্র হিসাবে ভগবানের ইচ্ছাকেই পূর্ণ করে। যারা এই বিরাট পরিবর্তন ঘটাবার সুযোগ পান, তারা ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী হন। দৈবশক্তি তাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়। এই গভীর ভগবদ্বিশ্বাস তাঁকে দিয়েছিল দুর্জয় সাহস, ইস্পাত কঠিন সঙ্কল্প, একটা অদ্ভুত বৈপ্লবিক নিস্পৃহা, অসাধারণ চরিত্রবল, জীবনমৃত্যুকে সমান জ্ঞান করবার অদম্য মনোবল।

সৈন্যদের সহযোগীতায় বিপ্লবের দ্বারা ইংরেজদের হঠাবার পরিকল্পনা রচনা করবার প্রধান পথিকৃৎ ছিলেন রাসবিহারী। প্রকৃতপক্ষে, কিশোর বয়স থেকেই তিনি এই স্বপ্ন দেখেছিলেন। যার সন্ধান মেলে তার বাল্য বয়সের উক্তির মধ্যে। যৌবনে ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর বিপ্লবের পরিকল্পনা তাঁরই। জীবন সায়াহ্নে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনেও তাঁর দূরদৃষ্টি, মনীষা ও প্রতিভা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিল। যারা তাঁর পরিকল্পনাকে

সিপাহী বিদ্রোহ বলে ব্যাখ্যা করেন, তারা রাসবিহারীর জীবন ইতিহাসের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন নি। রাসবিহারী ইংরেজদের অধীন সেনাদের মধ্যে স্বাধীনতার বীজ ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য সারা উত্তর ভারতে ঘটিকা সফর করেছিলেন। তাঁর সংগঠন ছিল পেশোয়ার থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। বিশ্বাসঘাতকেরা যদি এই পরিকল্পনা ফাঁস করে না দিত, তবে ভারতের স্বাধীনতোত্তর যুগের এই হৃদয়বিদারক রূপও দেখ্‌তে হত না।

দেশের বাইরে গিয়ে ভারতের অনেক বিপ্লবী বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে দেশের মুক্তি-সংগ্রামকে সফল করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু রাসবিহারী ওখানেও অনন্য ছিলেন। বিশ্রাম কাকে বলে তিনি জান্‌তেন না। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলেই তাঁর জীবনের পরিধি সঙ্কুচিত হয় বহুল পরিমাণে। রাসবিহারী যখন নিজের ভগ্নস্বাস্থ্যের সম্বন্ধে সচেতন হলেন, তখন জাপান সরকারকে প্রভাবান্বিত করে সুভাষচন্দ্রকে জার্মানী থেকে সিঙ্গাপুরে এনে আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের সর্বময় কর্তৃত্বভার তাঁর হাতে অর্পণ করেন। লক্ষ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয় ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর সমাবেশে রাসবিহারী সর্বপ্রথম সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজী' আখ্যায় ভূষিত ক'রে বলেন "ভারতবর্ষের যা কিছু মহত, যাকিছু শ্রেষ্ঠ তারই প্রতিভূ সুভাষচন্দ্র। সর্বজনপ্রিয় এই সুভাষচন্দ্র আজ থেকে আমাদের 'নেতাজী'। আমি এই সংগ্রামের সমগ্র দায়িত্ব নেতাজীর হাতে তুলে দিয়ে অবসর গ্রহণ করলাম"। রাজনীতি ক্ষেত্রে এই প্রকার স্বেচ্ছানির্বাসনের দৃষ্টান্ত বিরল। নেতাজীও রাসবিহারীর মৃত্যুর পর শোক সভায় বলেছিলেন; প্রাচ্য ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের জনক হলেন "শ্রদ্ধেয় বসু মহাশয়।" তাঁর উদ্দেশ্যে আজাদ হিন্দ্‌ সরকারের সম্মান "তমঘা-ই-আজাদ" হিন্দ্‌ ঘোষণা করেন।

শৌর্য্য, বীর্য্য প্রজ্জ্বলিত দেশপ্রেম, নৈরাশ্যবিজয়ী নিষ্ঠা, নির্বিরাম শ্রমশীলতা, আঘাত-সহিষ্ণুতা, ও ভগবানের নিকট নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ চরিত্রের এই কয়েকটী বিশিষ্ট গুণের জন্য তিনি জীবনে এত বিরাট সফলতা লাভ করতে পেরেছিলেন।

দুঃখের কথা, ক্ষোভের কথা রাসবিহারীর চরিত্রের ও অবদানের মূল্যায়ন আজও হয়নি। হীন চরিত্রের লোকেরা তাঁর সম্বন্ধে কুৎসাও রটনা করেছে। তাঁর চিতাভস্ম দেশে ফিরিয়ে আনার অন্তিম ইচ্ছাও পূর্ণ করা হয়নি। নিঃসন্দেহে দেশ ঋবিঋণ পরিশোধ করেনি। রাসবিহারী তাঁর কীর্ত্তিকলাপের জন্যই অমর হয়ে থাক্‌বেন। আমরা বিশ্বাস করি এই বিপ্লবী মহানায়ক পৃথিবীর ইতিহাসে দেশকাল অতিক্রম করে মানুষের মনের মণিকোঠায় সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

মহানায়কের চুয়ানব্বইতম জন্মদিনে আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। রাসবিহারী জিন্দাবাদ।

———

সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর পত্র

টোকিও, জাপান ২৫। ১। ৩৮

প্রিয় সুভাষবাবু,

ভারত থেকে আসা এক সংবাদ সূত্র থেকে জেনে খুশী হলাম যে আপনি কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। বাঙালী হিসাবে আমি আপনার জন্য গর্ব বোধ করছি। ভারতে বৃটিশ অধিকারের জন্য বাঙালীরা অংশত দায়ী ছিল, এবং আমার মতে বাঙালীদের প্রাথমিক কর্তব্য ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য আরও বেশী আত্মত্যাগ করা। বাঙালীরা তাদের আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠুরের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতকে চালিত করবে, বিধির এই বিধান। এই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এবং এই আমার প্রত্যাশা, আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য আপনি কংগ্রেসকে সুনির্দিষ্ট নেতৃত্ব দান করবেন।

বর্তমানে কংগ্রেস একটা সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে। এটি আপাতত একটি নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন এবং তা সরকারের সংগে সহযোগীতা করে চলছে। কোন পরাধীন দেশে নিয়মতান্ত্রিক বা বৈধ সংগঠন কখনই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না, যেহেতু গঠনতন্ত্র বা আইন শাসকরা রচনা করে তাদের নিজেদের স্বার্থে ও প্রয়োজনে। বৃটিশের চোখে যে সংগঠন অনিয়মতান্ত্রিক বা অবৈধ কেবলমাত্র এইরূপ সংগঠন-ই দেশকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কংগ্রেস অনিয়মতান্ত্রিক সংস্থায় পরিণত হয়েছিল, এবং সেজন্যেই তা প্রচুর কাজ করতে পেরেছিল। কিন্তু বর্তমানে তা আবার আগেকার নির্বোধ সংস্থায় ফিরে গিয়েছে। বলতে গেলে কংগ্রেস ও অন্যান্য মডারেট দলগুলির মধ্যে কার্যত কোনই পার্থক্য নেই। আমি বুঝে উঠতে পারি না, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সরকারী পদ গ্রহণ করেছিলেন বলে কংগ্রেসীরা আগে কেন সমালোচনা করেছিল। স্যার সুরেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য মডারেটরা আগেকার তথাকথিত রিফর্মের সময় যা করেছিলেন কংগ্রেসীরা এখন হুবহু তাই করে চলছে। ধরুন সেই সময়কার মডারেটরা সব রাজনৈতিক বন্দীদের অপরাধে মঞ্জুর করার জন্য যে দাবী জানিয়েছিল তার জন্য তারা প্রশংসার পাত্র। এখন কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে কিন্তু তখন সব রাজনৈতিক বন্দীদের অপরাধ মঞ্জুর করে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এই সময়ে দেশকে সঠিকভাবে চালিত করার জন্য কংগ্রেসের যা দরকার তা হচ্ছে বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি। এখন এটি বিবর্তনশীল সংস্থা। এটিকে অবশ্যই একটি বিপ্লবী সংস্থায় পরিণত করতে হবে। সারা দেহ যখন বিষাক্ত হয়ে গেছে তখন কয়েকটি অংগে ঔষধের প্রলেপ দিয়ে কোন লাভ নেই।

অহিংসার ভূতকে ঝেড়ে ফেলতে হবে এবং মুলনীতি পালটাতে হবে। 'সম্ভবপর যে কোন উপায়ে' আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে, অহিংস হোক হিংসাত্মক হোক। অহিংস পরিবেশ ভারতীয়দের নিষ্ক্রিয় মেষেলী পুরুষ করে তুলেছে। বর্তমান জগতে কোন জাতি যদি আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন জাতি হিসেবে দুনিয়ায় টিকে থাকতে চায় তাহলে তার অহিংসার কথা চিন্তা করা উচিত হবে না। এত দীর্ঘকাল ধরে আমাদের কানে 'পার-লৌকিকতার' মন্ত্র দেওয়ার ফলে আমাদের এত বিপত্তি। এই ধারণাকে সম্পূর্ণ খারিজ করতে হবে। 'পার-লৌকিকতার' স্থলে আমাদের প্রথমে 'ইহলৌকিকতা' প্রচার করতে হবে। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার করেছিলেন। দরিদ্রনারায়ণদের জন্য সর্ব প্রথমে অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের সংস্থান করতে হবে। আগে তারা দুনিয়াটাকে উপভোগ করুক। তারপরে স্বর্গের কথা বলা যাবে। মুসলমানরা বলে: পীর, আমীর, ফকির। ফকির হও, তবেই দুনিয়াকে তুচ্ছ করতে পারবে। যদি ফকির হতে না পার, আমীর হও এবং জীবনটাকে উপভোগ কর। আমীর যদি হতে না পার, পীর হও। তার অর্থ একটা কাফেরকে হত্যা কর, তারপরে জনসাধারণ পরলোক গত তোমাকে বা তোমার ভবনকে ভগবান জ্ঞানে পূজো করবে। গীতাও তাই বলে। আমরা যেন আত্মত্যাগ করি যাতে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ভোগ করতে পারে।

কেবলমাত্র একটি বিষয়ে কংগ্রেসের মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিৎ, তা সামরিক প্রস্তুতি। এখনও মোহ যার মুলুক তার। একথা আমাদের মনে রাখতেই হবে। ধর্মের বুলি আউড়িয়ে নিজেদের প্রতারণা করে লাভ নেই। প্রথমে সেনাবাহিনীকে, সেনাবাহিনীর সমস্ত শাখাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কংগ্রেসের আন্দোলন করা উচিৎ। শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি কখনই আমাদের স্বাধীন করতে পারবে না। আসল প্রয়োজন শক্তির। আপনার সমস্ত শক্তি এই একটি বিষয়ে নিবদ্ধ করুন। আমি মনে করি তাঁ মুঞ্জে সামরিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত করে কংগ্রেসের থেকে অনেক বেশী কাজ করেছেন। সর্বপ্রথমে ভারতীয়দের সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব অর্জন করতে হবে। তাদের অর্জন করতে হবে অস্ত্রাগারের অধিকার।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিন্দু-সংহতি, মুসলমানরাও হিন্দু, যখন তারা ভারতে জন্মগ্রহণ করেছে এবং যখন তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তান ইত্যাদি অঞ্চলের মুসলমানদের থেকে পৃথক। ইসলামকে হিন্দু-পক্ষপুটে আশ্রয় দিতে হিন্দু ধর্মের ঔদার্যের অভাব হবে না, অতীতেও যেমন হয়নি। ভারতবাসী মাত্রেই হিন্দু যদিও তারা নানা ধর্মে বিশ্বাসী হতে পারে, যেমন সব জাপানীই জাপানী যদিও তাদের মধ্যে বৌদ্ধ, খৃষ্টান ইত্যাদি থাকতে পারে।

কংগ্রেসের উচিত হবে এশিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করার আন্দোলন সমর্থন করা।

কংগ্রেসের একটা বিশ্বদৃষ্টি থাকা দরকার। ভারতের স্বার্থে ও প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ এবং সদ্ব্যবহার করা উচিত। ব্রিটেনের শত্রুদের সঙ্গে আমাদের মিত্রতা করতে হবে। আমাদের পররাষ্ট্র নীতি হওয়া উচিত এই। বাস্তব রাজনীতি ক্ষেত্রে ভাবাবেগের কোন স্থান থাকবে না। স্বার্থই একমাত্র ভিত্তি। স্বাভাবিক কারণে জাপান এখন ইংলণ্ড, রাশিয়া ও আমেরিকার চক্ষুশূল। তারা যেন তেন প্রকারে জাপানকে পদানত করতে চায়। জাপানের পতনের সঙ্গেই পুনরুজ্জীবিত স্বাধীন এশিয়ার সব আশা বিলুপ্ত হবে। জাপান বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে কংগ্রেস যাদব ভুল করেছে। আমাদের মনে রাখা উচিত, এমন সময় আসতে পারে যখন ইংলণ্ড জাপানের করমর্দন করবে, এবং জাপানের সংকটকালে ভারতীয়দের জাপান বিরোধী কার্যকলাপের কথা জাপানকে স্মরণ করিয়ে ভারতকে নিষ্ফল করে চলবে। এখন ভারতীয়দের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি জাপানকে সমর্থন করা এবং এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বিশ্ব-রাজনীতিতে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করা এবং জাপানের যতখানি সম্ভব ব্রিটেনের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করা।

পরাধীন দেশের পক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনে এক নায়কত্বের একান্ত দরকার। যুদ্ধের সময় যেমন এক-নায়কত্ব অপরিহার্য, তেমনই বর্তমানে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও প্রয়োজন এক্নায়কত্বের। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কিছু পরিমাণে এক্নায়কত্ব দেখা গিয়েছিল, এবং সেই কারণেই সেই আন্দোলন এত সাফল্য লাভ করেছিল।

শান্তির সময় গণতন্ত্র চলতে পারে, কিন্তু যুদ্ধের সময় যদি তা আনা হয় তবে সেই দেশে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

জীবন কি করে ভোগ করতে হয় তাও যেমন আমরা জানি না তেমনি জীবন কি করে বিসর্জন দিতে হয়, তাও জানিনা। আমাদের মুস্কিল এখানেই। এই ব্যাপারে আমরা যেন জাপানীদের অনুসরণ। তারা এখন তাদের স্বদেশের জন্য হাজারে হাজারে মৃত্যুবরণ করছে। এই আত্মশক্তি আমাদেরও জানতে হবে। আমাদের জানতে হবে কি করে মরতে হয়, তারপরে ভারতের স্বাধীনতার সমস্যার আপনি সমাধান হয়ে যাবে।

আপনার উপর আমার আস্থা আছে। সমালোচনা, বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যান। সঠিক পথে দেশকে চালিত করুন, আপনার এবং ভারতের সাফল্য আসবেই।

আশীর্বাদসহ—

আপনার প্রীতিভাজন

স্বাক্ষর :—রাসবিহারী বসু

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক লিখিত 'কোন্ পথে' পুস্তক হইতে শ্রীসন্তোষ ঘোষ কর্তৃক সংগৃহীত।

মিঃ জুলফিকর আলি ভুট্টো

প্রজ্জ্বলন্ত উল্কার ন্যায় উদয় ও নির্জ্যোতি বিলয়—

।। কালীপদ সরকার ।।

বিতর্কিত চরিত্র প্রাক্তন পাকিস্থান রাষ্ট্রনায়ক মিঃ জুলফিকর আলি ভুট্টোর জন্ম ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৯৭৯ এর ৪ঠা এপ্রিল রাত্রি ২টায় রাওয়লপিণ্ডি জেলে ফাঁসীতে। তাঁর পিতা স্যার শাহনওয়াজ ভুট্টো ছিলেন সিন্ধু প্রদেশের লারকানার জমিদার, মাতা হিন্দু রাজপুতানী। লারকানা প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার লীলাভূমি মহেনজোদড়োর পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম। স্যার শাহনওয়াজ এক সময় অবিভক্ত ভারতের বোম্বাই প্রদেশের মন্ত্রী ছিলেন। ভুট্টো পরিবার বোম্বাইবাসী ছিলেন। দেশ বিভাগের পর তাঁরা বোম্বাই ত্যাগ করে লারকানায় চলে যান।

জুলফিকর আলির বাল্যশিক্ষা ঘটে বোম্বাই এর এক মিশনারী স্কুলে। সেখান থেকে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা পাশ করে উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পলিটিকাল সায়েন্সে অনার্সসহ বি. এ. পাশ করে মিঃ ভুট্টো গেলেন ইংলণ্ডে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডুবিসপ্রুডেন্সে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন এবং লিংকন বার থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করেন। ইংলণ্ডের সালমটাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে অধ্যাপনা করে, ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ ভুট্টো দেশে ফিরে এসে, করাচীতে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। বৎসরকাল তিনি করাচীর ল কলেজে সংবিধান আইন বিষয়ে অধ্যাপনাও করেন। পাকিস্থান তথা মুসলিম জগতে শিক্ষাগত যোগ্যতায় মিঃ ভুট্টোর স্থান ছিল অনন্য।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের অদম্য স্পৃহা তাঁকে আইনজীবী ও অধ্যাপকের জীবন থেকে টেনে নিল রাজনীতিতে। পারিবারিক প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা, আর্থিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যময় তারুণ্য এবং বাগ্মীতা অল্পদিনের মধ্যে ভুট্টোকে এনে দিল খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা। পাকিস্থানের রাজনীতির মূলধন ছিল ভারত বিদ্বেষ, মিঃ ভুট্টো সেই মূলধনের দ্বারাই স্বীয় রাজনৈতিক মতকে গড়ে তুললেন। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে জেনারল আয়ুব খান পাকিস্থানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান এবং প্রেসিডেন্টরূপে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি মিঃ ভুট্টোকে তাঁর মন্ত্রীসভায় স্থান দেন, তখন ভুট্টোর বয়স মাত্র ৩০। মিঃ ভুট্টো প্রথমে পাকিস্থানের শিল্পমন্ত্রী, পরে সংখালঘু ও জাতীয় পুনর্গঠন মন্ত্রী, প্রচার মন্ত্রী, শক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রী, কাশ্মীর বিষয়ক মন্ত্রী এবং শেষে পররাষ্ট্র মন্ত্রী হন।

পাকিস্থান কাশ্মীর বিরোধকে উপলক্ষ্য করে এই সময় ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগে ব্যাপৃত হয়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে সে সিয়াটো ও সেন্টো জোটের সদস্যপদ গ্রহণ করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচুর অস্ত্র পেয়ে তার সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করে তুলে। যদিও সিয়াটো ও সেন্টো সামরিক জোট দুটি ছিল কমিউনিষ্ট শক্তি প্রতিরোধের জন্য, পাকিস্থান জোটকে ভারতের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিল। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত

যুদ্ধ বাধলে পাকিস্থান চীনের পক্ষে প্রচারে নামে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ভুট্টো পাকিস্থান কর্তৃক ভারত আক্রমণের উপযুক্ত সুযোগ বলে পরামর্শ দেন, কিন্তু পশ্চিমী শক্তি গোষ্ঠির এ বিষয়ে সমর্থন না থাকায়, প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান ভুট্টোর পরামর্শ গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হন। মিঃ ভুট্টো অতঃপর পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের কিছু অংশ চীনকে উপহার দিয়ে চিনের সহিত পাকিস্থানের মৈত্রীস্থাপনে অগ্রসর হন এবং স্বয়ং পিকিং এগিয়ে পাক-চীন সীমান্ত চুক্তি সহি করেন। এইভাবে মিঃ ভুট্টোর চেষ্টায় চীনের সহিত পাকিস্থানের প্রীতিবন্ধন স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে তাঁরই পরামর্শ ও কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে চীনের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমঝোতায় আসা সম্ভব হয়।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান তার বহু আকাঙ্খিত যুদ্ধে নামে। মিঃ জুলফিকর আলি ভুট্টো ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর বিষোদ্গারের মাত্রা চরমে তুললেন। কাশ্মীর দখলের যুদ্ধ জেহাদে পরিণত হল। কিন্তু পাকিস্থানের সাধ পূর্ণ হল না। খেমকরণের ট্যাংক যুদ্ধের হার হল পাকিস্থানের। মার্কিনী প্যাটন ট্যাংকের সমাধি রচিত হল রণভূমে। ভারতীয় বাহিনীর হাতে লাহোরের পতন আসন্ন হল। প্রমাদ গণলেন প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান। পাকিস্থানের পশ্চিমী মুরুব্বীগণও অবস্থা বুঝে যুদ্ধে বিরতি ঘটাবার জন্য চাপ দিতে লাগল। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারীতে তাসখন্দে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হল। মিঃ ভুট্টো চুক্তিকে ভাল মনে নিতে পারলেন না তিনি ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছর ব্যাপী যুদ্ধের জিগির তুললেন। মিঃ ভুট্টো প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের তীব্র সমালোচনা করতেও লাগলেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে ইস্তাফা দিলেন।

সরকার থেকে বেরিয়ে এসে মিঃ ভুট্টো পাকিস্থান পিপলস পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গড়লেন। দলের আদর্শ হিসাবে তিনি গ্রহণ করলেন সীমিত সমাজতান্ত্রিক মতবাদ। জনগণের সামনে মিঃ ভুট্টো তুলে ধরলেন 'রোটি, কাপড়া ঔর মোকামের' আশ্বাস। প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের পর প্রেসিডেন্ট হন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। ১৯৭০ সালে পাকিস্থানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্থানে ভুট্টোর পি. পি. পি. সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করলেও, পূর্ব পাকিস্থানের প্রায় সকল সদস্য আসন অধিকার করল জাতীয় আওয়ামী লীগ। শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা। জনসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্থানে বেশি আসন ছিল সেই কারণে মুজিবর রহমান সমগ্র পাকিস্থানের সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতা হলেন এবং সরকার গঠনের আইনগত অধিকারও পেলেন। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্থান থেকে পশ্চিম পাকিস্থানের শোষণ ও একাধিপত্য লোপের দাবী নিয়ে নির্বাচন লড়েছিল। সেই আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান হবেন পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী এ সম্ভাবনা পশ্চিম পাকিস্থানীদের আদৌ মনোমত হল না। জুলফিকর আলি ভুট্টোরও ছিল তদরূপ অভিমত। মিঃ ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সহিত হাত মেলালেন এবং গণতন্ত্র সম্মত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলনেতা শেখ মুজিবর রহমান যাতে প্রধান মন্ত্রী না হতে পারেন তারজন্য চক্রান্তে লিপ্ত হলেন।

এই চক্রান্তের ফল শুভ হইল না। মুজিবর রহমান গ্রেপ্তার হলেন এবং পূর্ব পাকিস্থান বিদ্রোহ ঘোষণা করল। পশ্চিম পাকীস্থানী সেনাদল নারকীয় অত্যাচার চালাল পূর্ব পাকিস্থানের উপর। যার পরিণামে ১৯৭১ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ বেধে গেল। মিঃ ভুট্টো হলেন তখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী। এই যুদ্ধে পাকিস্থানের শোচনীয় পরাজয় ঘটল। জেনারেল ইয়াহিয়া খান মিঃ ভুট্টোর হাতে পাকিস্থানের শাসনভার অর্পণ করে বিদায় নিলেন। মিঃ ভুট্টো হলেন তখন পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রী ও সামরিক প্রশাসক। এক কথায় পাকিস্থানের সর্বময় কর্তা, ডিক্টেটর। দুর্যোগের দিনে, পরাজয়ের গ্লানি বরণ করে, দেশের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে হলেও মিঃ ভুট্টো তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৪৩ বৎসর।

প্রেসিডেন্টরূপে মিঃ ভুট্টো পূর্ব পাস্থিানহারা পাকিস্থানকে বিপর্যয় মুক্ত করে যেভাবে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন তা তাঁর রাজনৈতিক দক্ষতা ও কূটবুদ্ধির পরিচয় বহন করে। স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান, ভারতের সহিত সিমলায় চুক্তি সম্পাদন, ৯২ হাজার যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা এবং ভারত কর্তৃক অধিকৃত পাক-ভূখণ্ড উদ্ধার মিঃ ভুট্টোর রাষ্ট্র পরিচালনার আর এক সফল দৃষ্টান্ত। দুঃখের বিষয় মিঃ ভুট্টো শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। উগ্র দেশ প্রেমিক, চপলবুদ্ধি এবং একান্তভাবে সুবিধাবাদী মিঃ ভুট্টো যে পাকিস্থানী সামরিক জান্তার অনুগ্রহে উচ্চতম ক্ষমতায় বসেছিলেন, তারই হাতে ঘটল তাঁর পতন ও অভাবিত মৃত্যু। প্রকৃত প্রস্তাবে মিঃ ভুট্টোর দৃষ্টিতে আদর্শ নিষ্ঠা বলে কিছু ছিল না। গণতন্ত্রের কথা মুখে বললেও বেলুচিস্থান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নির্বাচিত সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের শাসনকে তিনি যেভাবে উৎখাত করে দলনেতাদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিলেন তাতে তাঁর বিচক্ষণতা প্রকাশ পায় নি। গণতান্ত্রিক অধিকার চেয়ে যারা আন্দোলন করছিলেন তাদের দমন কার্যে সেনাবাহিনীর উপর নির্ভরতাই মিঃ ভুট্টোর কাল হয়েছিল।

১৯৭৭ সালে সাধারণ নির্বাচনে ভুট্টোর বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ হয়েছিল। তবে একথা স্বীকার করতে হয়, কারচুপি না হলেও ভুট্টোর দল নির্বাচনে জয়লাভ করত। রাজনৈতিক কারণে নরহত্যার অপরাধে পাকিস্থানের প্রাক্তন রাষ্ট্রনায়কের যে বিচার ও মৃত্যুদণ্ড হল তাকে সুবিচার বলা শক্ত। জুলফিকর আলি সিন্ধুর অধিবাসী না হয়ে যদি পাঞ্জাবী হতেন তাহলে তাঁর পরিণাম হয়ত এমন দুঃখবহ হত না। তবে চরম দুর্দিনে অসহায় কারাবন্দী মিঃ ভুট্টো যে সতেজ নির্ভীকতা দেখিয়েছেন এবং আত্মশক্তিতে ভরপুর হয়ে মৃত্যুকে বরণ করেছেন, তা তাঁর চরিত্রের সকল মালিন্যকে ধৌত করে তাঁকে নিঃসন্দেহে মহত্বগুণে পরিনির্মল করেছে।

———

মহানায়কের বাণী সঞ্চয়ন

আমাদের হাজার হাজার ভাই বোন আমাদের দেশকে মুক্ত, স্বাধীন করবার জন্য এক শতাব্দীর বেশী দুঃখ-দুর্দশা বরণ ও আত্মত্যাগ করেছেন। আসুন, আমরা জেগে উঠি এবং তাদের আরব্ধ প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করি...। আসুন আমরা এমনভাবে কাজ করি, যাতে বিগত দুই বা তারও বেশী যুগধরে মহাত্মা গান্ধীর আরব্ধ কাজ ফলপ্রসূ হয় এবং যাতে এক স্বাধীন জাতির মানুষ হিসাবে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ সন্তানগণ আমাদের কথা চিন্তা করে গর্ব ও শ্রদ্ধা বোধ করে। (ঐতিহাসিক ব্যাঙ্কক সম্মেলন)

●

ভারতের সব ভাইয়েরা, আসুন আমরা ঋজু হয়ে দাঁড়াই, ঐক্যবদ্ধ হই এবং শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কাম কর্মমন্ত্র নিয়ে, ভগবান বুদ্ধের নিঃস্বার্থ সেবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, ইসলাম প্রচারিত আল্লার সত্য হৃদয়ঙ্গম করে, গুরুগোবিন্দ সিং, শিবাজী ও মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের আদর্শ স্মরণ করে আমাদের সকলের একসঙ্গ অভিমুখে অভিযান করি। (১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ ঘোষণা)

●

অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ ঘোষণা, কেবলমাত্র মানুষের চেষ্টায় সফল হয়না—যদি ঐশী প্রেরণা মহাশক্তিরূপে হৃদয়ে তার আবির্ভূত না হয়। মানুষ কাজ করে একমাত্র অন্তরস্থিত অনন্ত মহাশক্তির নির্দেশে। তিনিই কর্মের সুনির্দিষ্ট পথে হাত ধরে তাকে পথ দেখান। তাঁর নির্দেশে তারই পরিচালিত মানুষ আমরা সাময়িক অধীনস্থ যন্ত্র মাত্র।

সংগ্রামের গতিপথে আমরা কোন ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থকে বরদাস্ত করব না। যদি আমরা তা করি, তা হলে আমরা কখনই সাফল্য লাভ করতে পারবোনা—আমাদের পরাজয়ের সম্মুখীন হতেই হবে। ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ অবশ্য দেশের স্বার্থের অনুকূলে হতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু উদাহরণ আছে যেখানে দেশের স্বার্থের উর্দ্ধে ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থ রাখতে গিয়ে জাতি হয়েছে ধ্বংস, দেশ হারিয়েছে তার স্বাধীনতা।

●

আমাদের মন, শক্তি এবং সম্পদ সমস্ত দেশের স্বার্থে নিয়োজিত করাই, আমাদের একমাত্র ব্রত হওয়া উচিৎ।

●

আমরা যেন স্মরণে রাখি, আমরা এক অখণ্ডজাতি—ভারতীয়।

" আমাদের এক উদ্দেশ্য—পূর্ণ স্বরাজ।

●

অন্ততঃ পাঁচযুগ ধরে আমরা অনেক বক্তৃতা শুনেছি। অর্থহীন আলোচনা ও বাকবিতণ্ডা করে আমরা আমাদের সময় নষ্ট করতে পারিনা। যারা প্রকৃতই দেশসেবা করতে চান, তারা বেশী বাজে কথা বলার সময় পেতে পারেন-না।

ইতিহাসের বিস্ময় রাসবিহারী

॥ ক্ষীরোদ কুমার দত্ত ॥

স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর সেনানী এবং আজীবন বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্ম ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে। রক্ত মূল্যে তিনি ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়েছিলেন এবং এজন্য জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত যে কোন মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হননি। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য তিনি আমৃত্যু বিপ্লবের দীপশিখা জ্বেলে রেখেছিলেন। ইতিহাসের এক মহান বিস্ময় এই যে ভারতে রাজপুত, শিখ, মারাঠা প্রভৃতি সামরিক জাতি থাকা সত্ত্বেও যে দু'জন বীর সেনা সশস্ত্র সংগ্রামে ভারতের মুক্তি ক্রয় করতে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা উভয়ই বাঙ্গালী। এঁরা হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও রাসবিহারী বসু। এক কথায় রাসবিহারী ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যই বেঁচে ছিলেন, তাঁর জীবন উৎসর্গও করেছিলেন ভারতের স্বাধীনতার জন্যই। রাসবিহারী ছিলেন আজীবন দেশপ্রেমী, মাতৃভূমির জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ। তাঁর নিজের কথায় ১৫ বছর বয়সে তাঁর বিপ্লব জীবন আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ বাল্যবন্ধু শ্রীশচন্দ্র ঘোষই তাঁকে বিপ্লবী দলে আকর্ষণ করেন। বর্ধমানের দামোদর তীরে সুবলদহ গ্রামে ছিল ঘোষ ও বসু উভয় পরিবারের বাস। উভয় পরিবারই পরে চন্দননগরে স্থানান্তরিত হয়। চন্দননগরেও শ্রীশচন্দ্রের বাড়ীর পাশেই ছিল রাসবিহারীর পিতা বিনোদবিহারী বসুর বাড়ী। শৈশবে দু'জনে শ্মশান থেকে মড়ার খুলি সংগ্রহ করে এনে নির্জন ঘরে খেলতেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করার পরে তিনি কলাসী ভারতের সৈন্যদলে প্রবেশের চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হন। এরপরে ভারতীয় সৈন্যদলে প্রবেশের চেষ্টাও তাঁর ব্যর্থ হয়। ১৯০৫ সালে তিনি ফোর্ট উইলিয়ামে একটি চাকুরী গ্রহণ করেন, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ মাত্র ওখানে ছিলেন। অল্পদিন পরেই তিনি উত্তরপ্রদেশে কসৌলীতে চাকুরী নিয়া যান। কিন্তু ওখানেও তিনি বেশী দিন ছিলেন না। ১৯০৫ সাল শেষ হবার আগেই তিনি দেরাদুন করেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে একটি চাকুরী সংগ্রহ করেন। এখানে বসেই তাঁর বিপ্লব সাধনা সুনির্দিষ্ট রূপ নেয়। তিনি বিখ্যাত বিপ্লবী লালা হরদয়ালের সংস্পর্শে আসেন এবং ১৯১০ সালে হরদয়ালের উত্তর ভারতের বিপ্লবীদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দলের পরিচালনার ভার রাসবিহারীর হাতে অর্পণ করে হরদয়াল আমেরিকায় গিয়ে গদর দল গঠন করেন। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় প্রথম দফে দণ্ডিত আমিরচাঁদ, রাসবিহারী এবং বালমুকুন্দ এই দলভুক্ত ছিলেন! এই মামলা সম্পর্কে পুলিশ প্রথমে রাসবিহারীর সন্ধান করে এবং তিনি ফেরার হন। বড়লাট হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের ঘটনা থেকে এই মামলার উদ্ভব হয়। রাসবিহারী বসন্ত বিশ্বাসের সাহায্যে বোমাটি নিক্ষেপ করেন। (বসন্ত বাবু পরে ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর রাজকীয় সমারোহে বড়লাটের দিল্লী প্রবেশের দিনে নারীদের মধ্যে থেকে বোমাটি নিক্ষেপ করেন।)

১৯১২ সালে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা চলতে থাকাকালে চন্দননগর দলের সহিত অনুশীলন সমিতির মিলন সংঘটিত হয়। এর ফলে রাসবিহারীও অনুশীলন দলের সংস্পর্শে আসেন। ১৯১৩ সালে হরদয়াল আমেরিকায় গদর দল গঠন করে গদর পত্রিকা প্রকাশ করেন। এখানে রাসবিহারীও অনুশীলনদের সঙ্গে মিলে 'লিবার্টি' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

গদর পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ছিল—

আমার নাম কি? — বিদ্রোহ।

আমার কাজ কি? — বিদ্রোহ।

কোথায় বিদ্রোহ? — ভারতে।

কেন ভারতীয়গণ বৃটিশের অত্যাচার আর সইতে পারছে না।

১৯১৩ সালের জুলাই সংখ্যায় লিবার্টি বিপ্লবের জন্য আহ্বান দিল। এই সংখ্যায় ছিল "বিপ্লব সৃষ্টি মানুষের কাজ নয় একমাত্র ভগবানের ইচ্ছায় বিপ্লব হতে পারে। ওয়াশিংটন, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল দত্ত, মদনলাল ধিংড়া প্রভৃতি ভগবানের নির্দেশেই কাজ করেছে। সর্বশিরস্তা ভগবানের নির্দেশেই দিল্লী ষড়যন্ত্রের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এই সমস্ত শহীদদের খণ তখনই শোধ হবে যখন শত শত হাজার হাজার তরুণ আত্ম বলিদানের জন্য এগিয়ে আসবে।

একটা ভয়ঙ্কর বিপ্লব আজিকার প্রয়োজন। দিল্লীর মত বিচ্ছিন্ন ঘটনা অত্যাচারীর মনে বিভীষিকা সৃষ্টি করতে করতে পারে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারে না।"

পরের পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রকাশিত হত—

চাই—হিন্দুস্থানে বিপ্লবের জন্য উৎসাহী বীর তরুণ।

বেতন — মৃত্যু

পুরস্কার — শহীদত্ব

পেন্‌সন্ — স্বাধীনতা

কর্মক্ষেত্র — ভারত

এই প্রচারে উদ্বুদ্ধ হয়েই দলে দলে ভারতীয় তরুণ আমেরিকা থেকে ভারত অভিমুখে রওনা হল যখন জার্মানীর সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ আরম্ভ হল ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে। পরের বিপ্লবীরা আমেরিকায় থাকতেই রাসবিহারীর নাম শুনেছিল। ভারত প্রত্যাবর্তনের পর সবারই মুখে এক কথা, আসন্ন ভারতব্যাপী সশস্ত্র বিদ্রোহে রাসবিহারীকেই তাদের নেতা চাই। রাসবিহারী এই সময় কাশীতে কেল্লার জীবনযাপন করছিলেন। সেখান থেকে পিংলে তাঁর সন্ধান করে বার করেন।

১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার অল্পদিন পরেই দুইবার তাঁর জীবন বিপন্ন হয়। প্রথমবার কাশীতে বোমা বিস্ফোরণে তিনি ভীষণ আহত হন। হরিশচন্দ্র ঘাটে ডাক্তার কালীপ্রসন্ন সান্যালের চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন। দ্বিতীয়বার আহত হন কলকাতা বাদুড় বাগান বস্তীতে। এবারে ব্রিটিশদের বুলেট হাতের আঙুলে এসে বিদ্ধ হয়। বাদুড়বাগান বস্তীতে গোপন বিপ্লবী আশ্রয়ে বসে রাসবিহারী প্রফুল্ল গাঙ্গুলীর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন, টেবিলের উপর ছিল একটা রিভলবার। প্রফুল্লবাবু রিভলবারটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। হঠাৎ একটি গুলি বেরিয়ে গিয়ে রাসবিহারীর আঙুলে বিদ্ধ হয়। এই বাদুড় বাগান বিপ্লবী কেন্দ্র সম্পর্কে যতিলাল রায় লিখেছেন :—

বাদুড় বাগানের বস্তিতে আমাদের বিপ্লবীদের শক্তিশালী সংহতির কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। এইখানে বসিয়া আমরা বাংলায় বিপ্লবের আগুন ছড়াইয়া দিতাম। এইখান হইতে যোগেন্দ্রনাথ মৌলভি বাজারের ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করার জন্য বোমা লইয়া প্রস্থান করেন। এইখানে বসিয়াই প্রফুল্ল গাঙ্গুলী, শচীন সান্যাল, রাসবিহারী ও শ্রীশচন্দ্র ভারতব্যাপী বিপ্লবের চক্রজাল রচনা করিতেন।"

ক্রমে শচীন সান্যাল, পিংলে, কর্তার সিং সারাবা, রাজমুন্দরীর প্রতাপ সিং, ভাই পরমানন্দ, পণ্ডিত পরমানন্দ রামশরণ দাস, যামোহর খরুপ, বিনায়ক রাও, গিরিধর দত্ত প্রভৃতি একে রাসবিহারীর সঙ্গে মিলিত হলেন। জাকোবাবাদ, কোহাট, বান্নু, নৌশেরা, পেশোয়ার, রাওলপিণ্ডি, কেলুম, কর্পূরতলা, মীরাট, ফিরোজাবাদ, লক্ষ্ণৌ, প্রভৃতি সকল সেনানিবাসে আসন্ন বিদ্রোহের সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হল। সবাই জানাল তারা প্রস্তুত, লাহোর যুদ্ধে সৈন্যদের প্রস্তুত করার জন্য মুলাসিং, কাশিসিং রইলেন ফিরোজে, হরনামসিং এবং কর্তার সিং সারাবা রইলেন মীরাটে, শচীন সান্যাল রইলেন কাশীতে। আসন্ন বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র রইল লাহোর রাসবিহারীর তত্ত্বাবধানে। লাহোরে রাসবিহারীর অবস্থান প্রয়োজন, কিন্তু হঠাৎ সরকারী নির্দেশ প্রকাশিত হল, অপরিচিত, অবিবাহিতদের বাড়ীভাড়া দেওয়া চলবে না। রামশরণ দাসের পত্নী রাসবিহারীর স্ত্রীর অভিনয় করতে সম্মত হলেন। বিদ্রোহের পতাকা নির্মিত হল তেরঙা, সমস্ত পতাকা

তৈরী করেছিলেন রাসবিহারীর নির্দেশ মত। পাঞ্জাবে মিয়ানমীর ফিরোজপুর সেনানিবাস প্রথমে বিদ্রোহ শুরু করবে স্থির হল। জেবেওয়াল এবং লোহাট-বাদীতে বোমার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হল। এখানে ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী বোমা প্রস্তুতের কাজ চলতে লাগল।

স্থির হল ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯১৫) সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হবে রাত্রিতে। সেনানিবাসে যেখানে যত ইংরেজ সৈন্য আছে সবাইকে গ্রেপ্তার করা হবে একসঙ্গে বন্দী করে রাখা হবে। পারস্য সীমান্ত থেকে প্রবেশ করবে পাঠানরাই যারা খোজে আফগান সীমান্তের বিক্ষুব্ধ পার্বত্য অধিবাসী-দের নিয়ে। কিন্তু এত বড় ব্যাপারের উদ্যোগ আয়োজন সব পণ্ড হয়ে গেল দুজন বিশ্বাসঘাতকের জন্য, কৃপাল সিং এবং নবাব খান যে বিপ্লবী দলে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তা রাসবিহারীর চোখ এড়ায় নি। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের প্রতি কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে পাছে অভ্যুত্থানে ব্যাঘাত হয় এই আশঙ্কায় তাদের উপর কড়া নজর রাখা হল এবং অভ্যুত্থানের তারিখ এগিয়ে দেওয়া হল ১৯শে ফেব্রুয়ারী। কিন্তু এ সত্ত্বেও বিশ্বাসঘাতকরা যথাস্থানে সংবাদ পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ হল। ফলে ১৮ই ফেব্রুয়ারী থেকেই ধর পাকড় আরম্ভ হয়ে গেল। অস্ত্রাগারের ভার দেশীয় সৈন্যদের হাত থেকে ইংরেজ সৈন্যের হাতে দেওয়া হল। এ করতে গিয়ে দুইটা স্থানে সংঘর্ষ হল। ফিরোজপুরে ৫০ জনের অধিক সৈন্যদের গুলি করে হত্যা করা হল, আহত অনেক শত। স্যার মাইকেল ও ডায়ার বলেন—আমাদের প্রধান অধিনায়ক লিয়াকত হায়াত খান এবং মিঃ এল এল টমকিনের নেতৃত্বে আমাদের পুলিশ দল বিদ্রোহীদের প্রধান কার্যালয় ৪টি গৃহে হানা দেয়। নেতৃস্থানীয় ১৩ জন বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করা হয়। অস্ত্রশস্ত্র, বোমা, বোমা প্রস্তুতের উপকরণাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বিদ্রোহীদের চারটি পতাকা পাওয়া যায়। একটি পতাকা স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে আমার কাছে রক্ষিত রেখেছি। স্বাধীনতার পরে এই পতাকা এনে দিল্লীতে National Archives-এ রক্ষা করা উচিত ছিল। কিন্তু এই ব্যাপক গ্রেপ্তারের মধ্যেও রাসবিহারী তাঁর চতুরতার জন্য গ্রেপ্তার এড়াতে সমর্থ হন। লাহোরে তিনটি ষড়যন্ত্র মামলায় বিদ্রোহীদের অভিযুক্ত করা হল। মোট ২৯১ জন আসামীদের মধ্যে ফাঁসী হল ৪২ জনের; ১০৪ জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। এ ছাড়া ৯৩ জন বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বেকসুর খালাস পেলেন ৪২ জন। ২টি রেজিমেন্টের বিদ্রোহীদের সামরিক বিচারে প্রাণ দণ্ড হল। পূর্ব পরিকল্পনা মত নির্দিষ্ট দিনে সিঙ্গাপুরে লাইট ইনফ্যান্ট্রি বাহিনী এবং ৪৫শ শিখ বাহিনী বিদ্রোহ করেছিল। ৭ দিন ধরে সিঙ্গাপুর সহর সিঙ্গাপুর দুর্গ তাদের দখলে ছিল।

প্রায় ২ মাস পরে ১২ই মে রাসবিহারী জাপানী জাহাজ সেলুকী মারু যোগে কলকাতা বিজিরপুর ডক থেকে গোপনে জাপান যাত্রা করেন। মাতৃভূমি ছেড়ে যাবার সময় গিরিজাবাবু এবং শচীন্দ্রের হাতে ২টি রিভলবার দিয়ে বলেন এ দুটা রেখে দাও তোমাদের কাজে লাগবে।

১৮৫৭ সালের পর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ভারতব্যাপী এত বড় উদ্যোগ আয়োজন আর হয় নাই। উত্তর ভারতের দিল্লী অকলের বিপ্লবী, কাশীর বিপ্লবী দল, অনুশীলন বিপ্লবী দল, চন্দননগর বিপ্লবী দলের সঙ্গে ২৬টি সেনাবাহিনী এ বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল অসামরিক জাতি বলে চিহ্নিত বাঙ্গালী রাসবিহারীর নেতৃত্বে। এটা ইতিহাসের একটা বিস্ময় নয় কি?

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

ও

সবাইকে পড়ান—

ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শাস্ত্রকাররাই বলেছেন "আতুরে নিয়ম নাস্তি"। কিন্তু একটা সভ্যদেশের সরকার কি ভাবে ঐসব উদ্বাস্তু হাজার হাজার নর-নারী-শিশুদের মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করে রাখতে প্রয়াস পায় এবং ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে অগ্রসর হয় তাহাই এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার নয় কি? ছিন্নমূল মানুষেরদল কোথায় সরকারের সাহায্য ও সহানুভূতি পাবে—তা-না সরকার তাদের ওপর খড়্গহস্ত এবং বৈরী মনোভাবাপন্ন। ওরাও ত বাঙ্গালী, বাংলায় বসতি স্থাপন কি ওদের অপরাধ? সরকারী বার্থতার বলি ঐসব উদ্বাস্তুরা কি জীবনভোর এদেশে ওদেশে বেদের টোল ফেলে ফেলেই বেড়াবে? দণ্ডকারণ্য থেকে ওরা কেন চলে এল? কারণ? সরকার যদি তাদের মোটামুটিভাবে জীবন রক্ষার ও জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা বিগত ত্রিশ একত্রিশ বছরেও না করে উঠতে পেরে থাকেন, তবে ওরা নিজেরা নিজেদের ব্যবস্থা করার জন্য শেষ চেষ্টা হিসাবে যদি মরিচঝাঁপির মত মৃত্যুগহ্বরে এসে বাঁচার শেষচেষ্টা করে তবে তা কেন দোষণীয়? কতদুঃখে ওরা দণ্ডক থেকে পালিয়ে এসে সুন্দর বনের যমালয়ে আশ্রয় নেবার আশায় মরিয়া হয়ে উঠেছে তা কি ঘতিয়ে কেউ দেখেছে? ওদের দুঃখ কষ্টের সীমা পরিসীমা ছিল না দণ্ডকে তাই পালিয়ে এসেছে। সুখে যদি সেখানে থাকতে পারত তবে কি দুতের কিল্ খেতে এখানে স্বেচ্ছায় ওরা কোনদিন আসত? কখনই তা সম্ভব হত না। ওদের এই দুরবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার—উভয়েই সমান দায়ী। ওরা এল কেন? কার পাপে ও দোষে ওদের এই শাস্তি হচ্ছে, তার কৈফিয়ৎ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারকেই দেশের জনগণের সমক্ষে দিতে হবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে থেকে বামফ্রন্ট সরকার ফ্যাসিষ্ট-কায়দায় উদ্বাস্তুদের উপর্য্যুপরি বিপর্য্যস্ত করছে কোন অধিকারে এবং কেন? জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে তাদের দুনম্বর নাগরিক প্রতিপন্ন করতে চায় কোন মতলবে, কি সাহসে, কোন অধিকারে এবং কেন এই অমানুষিক নিষ্ঠুরতা? তারা শুধু বাঁচতে চায়, কায়ক্লেষে খেটে খেতে চায় আর তাতেও সরকারের আপত্তি এবং শুধু আপত্তি নয়, তাদের জোর করে মারধোর করে ফের দণ্ডকে ফেরৎ পাঠাতে রাজ্য সরকার নানা অন্যায় ও অযৌক্তিক ব্যবস্থা নিতে কঠিন হৃদয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অগ্রসরমান। সরকার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই এদের ওপর ইতিমধ্যেই এমন অত্যাচার আরম্ভ করে দিয়েছেন যা অসঙ্গ এবং নিন্দার্হ। নিরীহ, অসহায়, নিরস্ত্র উদ্বাস্তুদের ওপর সরকার ইতিপূর্ব্বে বর্দ্ধমানের রামনগরে গুলি চালিয়ে বেশকিছু নরনারী শিশু হত্যা করেছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। বর্দ্ধমানে সেই উদ্বাস্তুরা দণ্ডকে ফিরে যেতে রাজি হয়ে পুলিসের লরীতে গিয়ে উঠে পড়ে ছিল, কিন্তু দারুণ ঝড় জলের জন্য তারা পুলিশকে

অনুরোধ করেছিল যে যেন এত জলে লরী ছাড়া না হয় এবং এই নিয়েই বচসা। ফলে পুলিশের গুলি বর্ষণ ও নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের তথায় ঘটনাস্থলেই মরণ বলে প্রকাশ। এরপরও যদি উদ্বাস্তুরা রাজ্য সরকারের নিষ্ঠুর ও মানবতারহিত সব অভিনব আজ্ঞাপালনে বিরত হয় বা থাকে তবে সাধারণ মানুষ কাকে দায়ী বা দোষী সাব্যস্ত করবে, সরকারকে না উদ্বাস্তুদের ?

সরকার মুখে জাহির করে চলেছেন দিনের পর দিন যে তাঁরা বামপন্থী গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনা করছেন, কিন্তু বাস্তবে যা যা তাঁরা ঘটাচ্ছেন তাকি গণতন্ত্রসম্মত ? লোকে এইরাজ্য সরকারকে এখন ফ্যাসিষ্ট সরকার বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না এবং অনেকের ধারণা এঁরা অলিখিত ও বেআইনী জরুরী অবস্থা ও ব্যবস্থা পশ্চিম বাংলার বুকে চালিয়ে চলেছেন বেপরোয়াভাবে সংখ্যাধিক্যের জোরে, এমন কি এঁদের শরিকদল ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর, এস, পি ও উদ্বাস্তুদের উপর এই অত্যাচার গুলিবর্ষণ মোটেই সমর্থন ত করেননাই, উপরন্তু তাঁরা ব্যথিত, ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। বামফ্রন্টের সরকার নামেই, আসলে তা সি, পি, এম সরকার এবং কাজেই অন্যান্য শরিকদলগুলি নীরব দর্শক ছাড়া আর কিছুই নয়। সি, পি, এম তাই শরিকদলের কথায় কান ত দিচ্ছেনই না, উল্টে তাদের অগ্রাহ্য করে স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে নিজেদের আখের গোছাতে দলপুষ্টি, দলবাজী ও দলসন্তুষ্টি করে চলেছেন এমন নগ্নভাবে যে অন্যান্য শরিকরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। ফলে তাঁরা এই সরকারের উদ্বাস্তু নিধন যজ্ঞে সামিল হতে ত চাইছেনই না, উপরোন্তু কোথাও কোথাও সি, পি, এম এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। এই সরকারের ব্যর্থতার জন্য তাই লোকে সি পি. এম-এর ওপর দোষারোপ করছে এখন। সরকার উদ্বাস্তুদের উপর দোষারোপ করে ঘন ঘন প্রচার করে চলেছেন যে, একদিকে বাংলাদেশ সরকার, অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মধ্যে উদ্বাস্তুদের নিজস্ব সরকার, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সীমানার মধ্যবর্তী মরিচঝাঁপিতে যে উদ্বাস্তুরা বিগত কিছুকাল ধরে বসবাস করছে, তারা এই সরকারের কোন কথায় কর্ণপাত করছেনা ; উপরোন্ত সরকারী আদেশ অমান্য করছে ও নিজেদের মতোই তারা উক্ত বনভূমিতে বিচরণ করছে, বেআইনীভাবে মাছ ধরছে, কাঠ কাটছে যথেচ্ছ মধু আহরণ করছে, সংরক্ষিত বনাঞ্চলের প্রভূত ক্ষতি সাধন করছে,—এককথায় তারা সেখানে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে নিজেদের মতে ও পথে চলছে ; যা এই সরকারের ক্ষমতা গর্ব্বে বারে বারে আঘাত হানছে। সরকারের এই প্রচারে কিন্তু কোনকাজ হচ্ছে না, কারণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানে যে উদ্বাস্তুরা ধন, মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, স্বাধীনরাষ্ট্র বা অনুরূপ কোন ক্ষমতাই চায় না—তারা চায় একটু বাসভূমি আর জীবিকা অন্বেষণের আশা ও আশ্বাস আর সেটুকু তারা এখন ভিক্ষা করে পেতে চায় না—চায় মানুষের অধিকারে বাঁচতে ও বংশধরদের ভবিষ্যতে বাঁচবার স্থায়ী ব্যবস্থা করে পুনরায় তাদের দেশছাড়া হয়ে ছিন্নমূল আগাছার মত পথে ঘাটে ঘুরে মরতে না হয়। এর বেশী কিছুই তারা চায় না, তবু সি,পি, এম এত শংকিত যে কেন—তা তারা বুঝতে পারে না। এই সরকার তাদের দুরবস্থার চাপে ফেলে কেন যে দণ্ডকে পাঠাতে চায় তাও তারা বোঝে না। এই সরকার অর্থনৈতিক অবরোধ, পানীয় জলের অপ্রাপ্তির কঠিন ব্যবস্থা

ও খাদ্যদ্রব্যের ওপর ঘেরাও এর মত হীন বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করে উদ্বাস্তুদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জঘন্য চক্রান্ত করেছেন এবং চারিদিকে সশস্ত্র পুলিশ ঝাঁড়ি বসিয়ে তাদের খাদ্য, পানীয় ও জীবিকা অর্জনের পথে মর্মান্তিক অবরোধ ব্যবস্থা কায়েম করেছেন। খাদ্য, পানীয়, চিকিৎসা ও অর্থাগমের পথগুলি এভাবে অবরুদ্ধ হওয়ায় উক্ত মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা মরিয়া হয়ে নৌকা নিয়ে তথা হতে অন্নের আশায়, পিপাসা নিবারণের জন্য ও জীবিকা সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। পুলিশ সরকারী আদেশে তাদের ওপর চড়াও হয় এবং চতুর্বিধ অবরোধ ব্যবস্থা যাতে না উদ্বাস্তুরা ভেঙ্গে ফেলে বেরিয়ে আসে তারজন্যই তাদের ওপর সরকারী নির্দেশ মান্য করতে পুলিশদল ঝাঁপিয়ে পড়ে, বহু নৌকা ডুবি হয়, উদ্বাস্তুরা প্রাণ হারায় এবং বাঁচার তাগিদে পুলিশের বিরোধীতা করে, পুলিশ সতর্ক না করেই লাঠি চার্জ, গ্যাস (কাঁদানে) ছাড়া প্রভৃতি দমনমূলক কাজ করে। উদ্বাস্তুরা নিরুপায় ও ক্ষুপিপাসায় কাতর হয়ে দলে দলে পুলিশি অত্যাচার বন্ধ করার মানসে ঝটিকাগতিতে বাসস্থান ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এবং হয়ত বা পুলিশের উপরোক্ত কাজে বাধা সৃষ্টি করে: ফলে পুলিশ গুলি চালায় এবং কিছু উদ্বাস্তু গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারায়। গুলিতে হত ও আহত মানুষের সংখ্যা সঠিক কত তা সরকার প্রকাশ করে না দিলে বলা শক্ত। মানুষের অধিকার নিয়ে অবরোধ ভেঙ্গে যারা শুধু বাঁচতে চেয়েছিল তারা গুলিবিদ্ধ হয়ে মরণ বরণ করে ভারতে শহীদের সংখ্যা বাড়াল। তারা ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা চেয়েছিল— এই তাদের অপরাধ এবং এর জন্যই বামফ্রন্ট সরকার তাদের মধ্যে অনেককেই গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করলো। কি নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড?

যাবতীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ এক মাত্রার জন্য
প্রাপ্তিস্থান: শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
শিবকালী কুটির • কুলে পুকুর • বরাহনগর • ২৪ পরগনা

পুস্তক পরিচয়

মুক্তি সংগ্রামে—শ্রীমাখন গুপ্ত। প্রকাশক, ভট্টাচার্য্য ব্রাদার্স
৩০/১, কলেজ রো : কলিকাতা—৯ দাম—পনর টাকা

শ্রীমাখন গুপ্তের "মুক্তি সংগ্রাম" বইখানি প্রচলিত একই ধরণের বইগুলির তুলনায় একটু ভিন্ন ধরণের ও বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। বইখানি শুধু সন, তারিখ ও ঘটনাবলীর নীরস আলেখ্য নয়। মাখনবাবু কবি ও স্বদেশ প্রেমিক। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামকে তিনি অন্তরের মাধুর্য্য ও ভুক্তভোগী প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা দিয়ে চিত্রিত করতে সমর্থ হয়েছেন। লেখনশৈলী ও বর্ণনাও তাই গতানুগতিকতার পথধরে চলেনি। গদ্যের ও পদ্যের অপূর্ব সংমিশ্রণে তিনি সংগ্রামের ইতিহাসকে চিত্তাকর্ষক করে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই বৈশিষ্ট্য অভিনন্দনযোগ্য।

ঘটনাগুলির ও ইতিহাসের পারম্পর্য্য তিনি অতি সুনিপুণভাবে রক্ষা করতে পেরেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আরো বিস্তৃতভাবে বর্ণনা দিতে পারতেন। তবে তাঁকে বোধ হয় বাধ্য হয়েই সংকুচিত থাকতে হয়েছে। ছাপাখানার গণ্ডগোল, কাগজের উচ্চমূল্য। যার ফলে পুস্তকখানির কলেবর বৃদ্ধি হলে স্বভাবতই মূল্যবৃদ্ধি করতে হত। এমনিতেই এই গরীবদেশে পনর টাকা মূল্যটা খুব কম নয়।

তবুও একথা নিঃসংকোচে বলা যায় যে মাখন বাবুর প্রচেষ্টা সকল ও প্রশংসনীয়। তাঁর পথ অনুসরণ করে যদি কোন লেখক ও প্রকাশক কমমূল্যে এমনিতরো প্রচেষ্টায় ব্রতী হন, তবে সেটা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য হবে।

মাখন বাবুর স্বরচিত কবিতাগুলি অতি চিত্তাকর্ষক হয়েছে। আগামী দিনে ছাত্র-যুবকযুবতীরা বইখানি পড়ে যদি স্বদেশ সেবায় অনুপ্রাণিত হন, তবে খুব আনন্দের বিষয় হবে।

প্রচ্ছদপটের ছবিটী অতি সুন্দর ও তাৎপর্য্য পূর্ণ। ছাপাও ভাল। বাংলাদেশের বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এতে আছে। কিন্তু মৌল বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান অনুশীলন সমিতির অবদানের বিবৃতি আরো বিশদভাবে হওয়ার দাবী রাখে। সেদিকে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

আমরা মনে করি নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির কোন উল্লেখ না থাকায় ইতিহাসের একটী অধ্যায় বাদ পড়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের বহু দত্ত ভারতের সহিংস আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিলেন।

আর একটী স্মরণীয় ঘটনা সম্বন্ধে মাখন বাবুর সঙ্গে আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি। হার্ডিঞ্জ সাহেবের উপর বোমা ফেলেছিলেন মহাশয় রাসবিহারী বসু নিজেই, বসন্ত বিশ্বাস নয়। মহানায়ক এ সম্বন্ধে বহুদিন নীরব থাকলেও ১৯৪৩ সালে সিঙ্গাপুর সম্মেলনের পূর্বে একটী বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন যে "প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে আমি বড়লাটকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছিলাম।"

এত বড় দুরূহ কাজে ত্রুটী বিচ্যুতি থাকাই সম্ভব। তবু মাখনবাবু মুক্তি সংগ্রামের একটী শক্ত বনিয়াদ গড়েছেন। পরবর্তী যুগে কেউ তার উপর সৌধ গড়ে তুলতে চাইলে, এই বইখানি তাকে প্রভূত সাহায্য করবে।

আমরা বই খানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শাঃ শঃ রাঃ চৌঃ

গ্রন্থকারের অনুমতি নিয়ে আমরা আনন্দে জানাচ্ছি যে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য বইখানি শতকরা পঁচিশ ভাগ কম মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। বিঃ বাঃ সঃ

পরলোকে প্রখ্যাত বিপ্লবী নির্মলচন্দ্র দাস

গত ১৪ই মে কৃষ্ণনগর হাসপাতালে প্রখ্যাত বিপ্লবী নির্মলচন্দ্র দাস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নির্মলবাবুর অবদান ছিল প্রশংসনীয়।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থদশকে যে একদল ছাত্র ও যুবক দেশমাতৃকার স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্কল্প নিয়ে, ঘরবাড়ী, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ভবিষ্যৎ ত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিবেদন করেছিল, নির্মলবাবু ছিলেন সেই অগ্রপথিকদের একজন প্রধান সৈনিক। ১৯২১ সালে মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি দেশসেবায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। যশোর খুলনা যুব সঙ্ঘের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর বিশিষ্ট সহকর্মী প্রয়াত প্রমথনাথ ভৌমিক ছিলেন এই সংস্থার দার্শনিক নেতা এবং নির্মলবাবু ছিলেন প্রধান সংগঠক। বহু যুবককে তিনি দেশসেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বিশেষ করে খুলনা-যশোরের বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনের মণিকোঠায় তাঁর স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে এবং থাকবে। নির্মলবাবুর কর্মক্ষেত্র শুধু এই দুইটি জেলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় তিনি ছিলেন অন্যতম আসামী। নির্মলবাবু দীর্ঘ দশ বছর কারাবাস ভোগ করেছিলেন। দেউলী বন্দী নিবাসে থাকাকালীন তিনি কমিউনিজম মতবাদ গ্রহণ করেন ও জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ঐ দলের সভ্য ছিলেন।

নির্মলবাবু ছিলেন অত্যন্ত প্রচারে বিমুখ ও বন্ধু বৎসল। বিনয়ী অথচ স্বমতে দৃঢ়। তিনি "স্বাধীনতা" কাগজের প্রথম দিকে মুদ্রণ বিভাগে সংগঠনের কাজে তিনি বিশেষ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। কয়েক বছর আগে তাঁর স্ত্রী বিয়োগ ঘটে। ব্যক্তিগতভাবে সাংসারি বন্ধন ছিন্ন হলেও, নির্মলবাবু জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁর শিষ্য ও সহকর্মী প্রয়াত বিশ্বেশ্বর সেনগুপ্তের পরিবারের সাথে জড়িত থেকে, তাদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের নেতৃত্বে খুলনায় এবং উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষের সময় নির্মলবাবু প্রয়াত নেতা প্রমথ নাথ ভৌমিকের সঙ্গে দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রম করে আর্ত্তত্রাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

আমরা নির্মলবাবুর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের এই দুঃখের দিনে আন্তরিক সমবেদনা জানাই ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

(Contd. from 2nd cover)

Name	Address	Amount Rs.	Date
	24-PARGANAS		
Banerjee Mathuranath	(Suspended)		
Burman Roy Smt. Hagirani w-o Late Debendra Ch. Burman Roy		150	30. 12. 78
Chakraborty Sudhon Ch.	Kadomtala, P.O. Ichapur Nalvabgin	200	1. 10. 78
Dutta Ganga Charan	North Station Road P. O. Agarpara	200	1. 10. 78
Dutta Saradindu	B-9, Chintanow Park P. O. Bansdroni	200	15. 2. 72
Mittra Smt. Bina Rani w-o Late Prafulla Ch. Mittra	Shibbari, Samaddarpara Gobardanga	150	19. 11. 77
	Dist—HOWRAH		
Chandra Smt. Sabita w-o Late Satkari Chandra	P. O. & Vill Maju	200	29. 12. 71
Das Smt. Renuka Bala w-o Late Kanai Lal Das	P. O. & Vill Jhaparda	200	27. 1. 75
Dutta Smt. Labanya w-o Late Jitendra Nath Dutta	Vill Chaldouria P. O. Kalyanpur	200	6. 10. 78
Goswami Smt. Saktirani Devi w-o Late Sachindra Goswami	34, Kanti Goswami Lane P. O. Bally	100	25. 12. 78
	Dist—HOOGHLY		
Bhattacherjee Smt. Mridula w-o Late Shyamendra Nath Bhattacharjee	Vill Sija P. O. Khamargnli	100	25. 1. 78
Bhattacharjee Smt. Sarajubala W-o Late Debendra Bh.	P. G. Mukherjee Ghat Sheoraphuli	150	12. 9 78
Ghose Smt. Mononila w-o Late Kali Charan Ghose	108, Shibtala Street P. O. Bhadrakali	100	10. 7. 78

gedNo. R. N .24511/71 Biplabi Bangla Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
. ...ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা ষাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা ...খ্যা—৩০ পয়সা

২/30

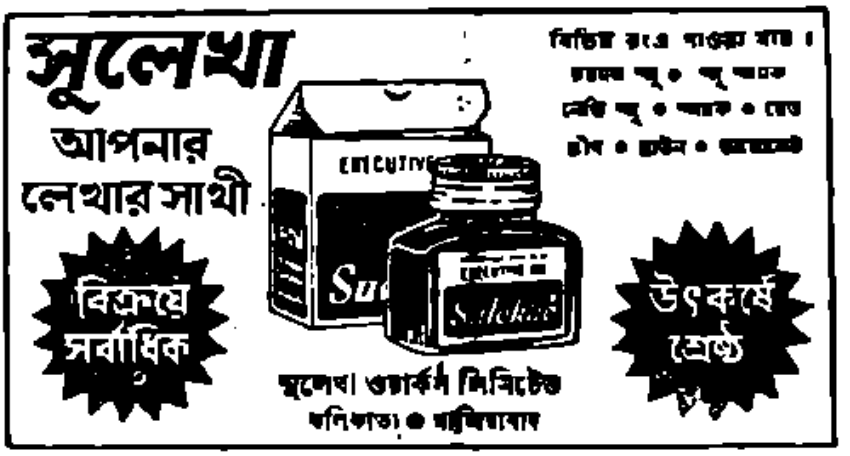

30 MAY 1979

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীঅমলীন চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী।
সম্পাদক—শ্রীসাতি সরল রায়চৌধুরী
বিহার বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতোলা—শ্রীমধুগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীবসীন্দ্র গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পার্টনারসিটি, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাঙলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭১

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬ ২রা জুন, ১৯৭৯	৩৩ সংখ্যা

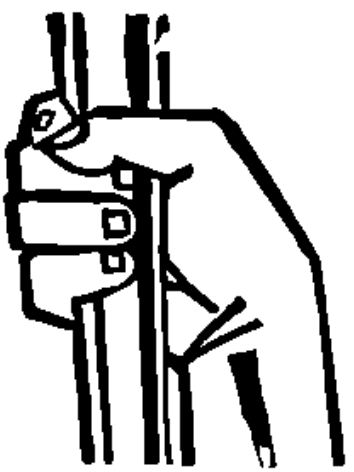

এই সংখ্যায়

বুমেরাং
। সম্পাদকীয় ।

অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ গড়ার উপায়
। শ্রীবংশীধর মুখোপাধ্যায় ।

সাম্প্রদায়িকতা ও তার প্রতিকার
। কালীপদ সরকার ।

দিনের শান্তি এবং রাত্তের ঘুম
। বিমান বৈরাগী ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক নলিনী মোহন ধাপগুপ্ত ।

বিপ্লবীর জীবন দর্শন
। দুর্গেশ ভট্টাচার্য

মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত,
আমি সেই দিন হবো শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবেনা।
অত্যাচারীর খড়্গকৃপাণ ভীম
রণভূমে রণিবে না।
—নজরুল

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Dist—HOOGHLY		
Koley Durgadas	Vill Birati, P.O. Harinkhola P. S. Arambagh	200	15. 8. 72
Nandy Smt. Shyama Sundari w-o Late Jogendra Nath Nandy	Kundurghat, P.O. Chandernagur	100	1. 10 76
Roy Smt. Kamala Bala w-o Late Balai Krishna Roy	P. O. & Vill Baradongul	200	1. 10. 76
Saha Smt. Renuka w-o Late Suresh Chandra	23/2, Kotrong Ghoshpara Lane P. O. Hind Motor	200	15. 1. 79
	Dist—MIDNAPUR		
Dey Smt Kamala Bala w-o Late Bholanath Dey	Ballanpur, Middapur Tran	100	1. 10. 76
Gayen Smt. Sindhu Bala w-o Late Manindra Gayen	Vill Jagannath Ghat P. O. Halubari	150	13. 10. 78
Hatira Hara Krishna	P. O. & Vill Purba Guragram	200	15. 8. 72
Jana Smt Satangini w-o Late Surendra Nath Jana	Vill Kaburbheri P. O. Bhaguanpur	100	26. 11. 75
Maity Smt. Hemangini w-o Late Amulya Kr. Maity	Vill Matkal Chak P. O. Jarka	100	24. 10. 78
Mishra Smt. Pitambari	P. O. & Vill Patashpur	100	1. 10. 76
Samanta Shantosh	Vill Ramkhali P.O. Mangalamoro	200	6. 4. 74
	Dist—NADIA		
Neogi Smt. Binapani w-o Late Abani Kanta	Vill Gorapara P. O. Chakdah	100	27. 7. 78
Chakraborty Amalendu	C/o Smt. Lananya Prova Sanyal Aluminium Qr. P.O. Kotrong	200	2 4. 74

(Contd. on 3rd cover)

সম্পাদকীয়—

বুমেরাং

পশ্চিমবঙ্গের শাসকগোষ্ঠী বিগত কয়েকদিনে কয়েকটী সর্বনাশা নজীর সৃষ্টি করেছে, যার প্রতিক্রিয়া আগামীদিনে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আজ যারা এই অদ্ভুতনীতির প্রবর্তন করেছেন, একদিন সেটা যে তাদের উপরই 'বুমেরাং' হয়ে আঘাত হানতে পারে এমন আশঙ্কাও অমূলক নয়। বরং ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে, সেটাইস্বাভাবিক।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা সমস্যার মোকাবিলা করতে বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার, যাকে প্রকৃত পক্ষে সি পি. এম সরকার বলেই আখ্যাত করা যায় চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের সর্ব প্রচেষ্টা নিবদ্ধ থাকছে শুধু নিজ দলের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এবং সেজন্য এই সরকারের শরীকদলের সভ্যদের উপরও অত্যাচার চালানো হচ্ছে, এমনকি তাদের হত্যাও করা হচ্ছে। গোটা রাজ্যের বিদ্যুৎ-উৎপাদন, শিক্ষা, জমি-বণ্টন প্রভৃতি বহু ক্ষেত্রেই এই মানসিকতার নগ্নরূপ প্রকাশ পাচ্ছে। এর ফলে এককথায়, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের নাভিঃশ্বাস উঠেছে এবং গোটা রাজ্যের ভবিষ্যৎ ঘনতম অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। পশ্চিম বাংলার মানুষ গ্রামে, গঞ্জে, শহরে যেখানেই বাস করুন না কেন, প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায়, প্রতি মিনিটে যন্ত্রণাভোগ করতে বাধ্য হচ্ছেন। জনসাধারণের তরফ থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠতে সুরু করেছে, একমাত্র অন্ধ ও বধির ভিন্ন সকলেই দেখতে পাচ্ছেন ও শুনতে পাচ্ছেন। প্রতিবাদ জানাবার এবং প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার মত সাধারণ মানুষের কোন সংগঠন না থাকাতে শাসকদল যদি ভেবে থাকেন যে অন্যায় অবিচারের শকট তারা পশ্চিমবাংলার উপর দিয়ে অবাধে চালিয়ে যেতে পারবেন, পুলিশ ও তাদের কাডারদের সাহায্যে, তবে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। মানুষ যখন শাসকদলের উপর বিরূপ হয়, যখন তাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে, অথচ সংগঠনের অভাবে কার্য্যকরী পন্থা খুঁজে পায়না, যখন বিরুদ্ধ দলেরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, নিজেদের ভাবমূর্ত্তি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। এটা তাদের সর্বজন স্বীকৃত গণতন্ত্রসম্মত অধিকার। এরমধ্যে অন্যায় কিছুনেই। অবশ্য প্রতিপক্ষদল যদি সহিংস পথে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আগ্রহী হন তারা যদি দেশের আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করেন, তবে সরকারের পক্ষে প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে সমস্যার মোকাবিলা করতে অগ্রসর হন। তবে তাদের পক্ষে অসঙ্গত নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের কোন ব্যাপারে দলীয় কাডারদের নিয়োগ করে ঠেঙ্গারে বাহিনীতে পরিণত করার দৃষ্টান্ত ত ফ্যাসিষ্ট দেশেই পাওয়া যায়।

কিছুদিন পূর্বে কংগ্রেস দলের শোভাযাত্রার উপর পুলিশ ও দলীয় কাডাররা যুগ্মভাবে নগ্ন আক্রমণ করেছে এটাই হল কংগ্রেসে দলের অভিযোগ। মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের জোর

করে ঘরে আগুন লাগিয়ে, বস্তাবন্দী মালের মত স্থানান্তর করার কাজেও এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল বলে শাসকদল ব্যক্তির সকলেরই অভিযোগ। উদ্বাস্তুদের বুঝিয়ে স্থানান্তরিত করা হলে একই পরিবারের শিশু ও তাদের পিতামাতারা কি করে বিযুক্ত হয়ে পড়তে পারেন, এটা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। লালদীঘির লালবাড়িতে বসে খবরের কাগজের লোক ডেকে বিবৃতি ঝেড়ে দিলেই, সেটা বেদ বাক্য বলে মেনে নিতে না পারলে মানুষকে খুব দোষ দেওয়া যায় কি? সরকার কোন দল বিশেষের 'ঠেঙ্গারে বাহিনী'কে সমকারী কাজে ব্যবহার করার অধিকার কোথা থেকে পেলেন, তার জবাব সাধারণ মানুষ অবশ্যই দাবী করতে পারেন। এটা কোন গণতান্ত্রিক কাঠামোতে ঘটতে পারে না দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে। এ কাজ সংবিধান বহির্ভূত কাজ। একাজ মানুষের উপর অন্যায় অবিচারের জলন্ত নমুনাস্বরূপ একাজ গণতান্ত্রিক কাঠামোতে আইনসঙ্গতভাবে গঠিত ভিন্নদলের গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার নক্কারজনক দৃষ্টান্ত। তা ভিন্ন। এই ধরনের অপকর্মের মধ্যে যে সর্বনাশা বীজ বপন করা হচ্ছে, বর্তমান শাসকদলের স্থলে অন্য কোন দল ক্ষমতালাভ করলে, কি ফসল তাদের তুলতে হতে পারে, এটা ভুলে গেলে অতি সামান্য দূর দৃষ্টির ও অভাব সূচিত হবে। সরকার যদি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে চান, তবে একটী বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন করে লোকের মন থেকে সন্দেহ ও আশঙ্কা দূর করতে রাজী আছেন কি? অতীতে বর্তমান শাসকদলের লোকেরা ত কথায় কথায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করতেন। এটা নিশ্চয়ই একটী গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতি। কিন্তু ক্ষমতালাভ করে কি বদলে গেল মতটা?

একটি রাজ্যে যখন গণতন্ত্র ও সংবিধান বহির্ভূত কাজ চলে, যখন গোটা রাজ্যের জনজীবন বিপর্যস্ত হবার সম্মুখীন হয়, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের কি কোন দায়িত্ব এবং কর্তব্য নেই? তারা কি শুধু টুটো জগন্নাথ হয়েই দিল্লীর মসনদে বিরাজ করবেন? একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয় যে একটি নির্বাচিত সরকারকে খেয়াল-খুসী মত বরখাস্ত করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু যখন এই সরকারের বিরুদ্ধে অগণতান্ত্রিক কাজ করার অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন সূত্র থেকে, তখনও কি কিছু করণীয় নেই কেন্দ্রীয় সরকারের? অসংখ্য কমিশনও বসান হয়েছে, কোটি কোটি টাকাও খরচ করা হচ্ছে, কোন ব্যক্তি বা দলের লোকদের বিচার করার জন্য। তবে এহেন গুরুতর অভিযোগের বিরুদ্ধে মৌন হয়ে থেকেই কর্তব্য শেষ হবে? বিধান সভায় অর্জিত সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সরকার কোন অন্যায় অবিচার করলেও তার বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটি করা যাবে না। এটাই কি গণতন্ত্রকে রক্ষা করার পদ্ধতি? কোন দল, পত্রপত্রিকা, ব্যক্তি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেই ত তাদের ষড়যন্ত্রকারী। কায়েমী স্বার্থের সমর্থক ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হচ্ছে। এউ দুর্বিসহ অবস্থা থেকে কি কোন প্রতিকার লাভ করা যাবে না সংবিধান সম্মত উপায়ে?

———

অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ার উপায়

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত মূলতঃ একটি কৃষি প্রধান দেশ ;

তাই ভারতীয় অর্থনীতি অনেকাংশে কৃষি নির্ভর, যদিও বর্তমানে এদেশ শিল্প সমৃদ্ধির পথে দ্রুত-অগ্রসরমান। ভূমিহীন কৃষকেরাই বিগত শতাব্দির কিছু পূর্বে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে শিল্প শ্রমিক হতে বাধ্য হয়েছে—অর্থনৈতিক চাপে ও বিবর্তনে। বৃহৎ শিল্প সংস্থাগুলি, যথা :—পাটকল, সুতা ও বস্ত্রবয়ন কল, লৌহশিল্প ও ইস্পাত নির্মাণ কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতির কারখানা, তৈল নিষ্কাশন কল, লৌহ ও ইস্পাত ঢালাই কারখানা, রেল ইঞ্জিন ও বগি নির্মাণ কারখানা, বনস্পতি তৈরীর কল, মেশিন ও প্ল্যান্ট কারখানা, মোটর, জেনারেটার, পাখা, কুলার, হিটার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারখানা, মোটরগাড়ী, ট্রাক্টর, রেল ইঞ্জিন তৈরীর কারখানা, জাহাজ, রণতরী—ক্রিজেট, সাবমেরিন, বিমান, ট্যাঙ্ক যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর কারখানা, খনি থেকে তরল, অভ্র, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, পেট্রোলিয়াম, বিভিন্ন ধাতু ও ধাতব পদার্থ ইত্যাদি উৎপাদক কর্মকাণ্ড, ধাতু নিষ্কাশনী কল, রাসায়নিক ঔষধপত্র প্রস্তুতের কল, নানা যানবাহন তৈরীর কল, চাল, চিনি ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরীর কল প্রভৃতি নানা কর্মকাণ্ডে শ্রমিক কর্মীর একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয় এবং ভূমিহীন কৃষক, আদিবাসী অরণ্যচারী অনুন্নত শ্রেণীর অবহেলিত মানুষ ও হিন্দু সমাজ পরিত্যক্ত অসহায় মানুষ এবং শিল্পপতিদের দ্বারা নিযুক্ত আড়কাঠির মাধ্যমে প্রলুব্ধ সহায় সম্বলহীন দুঃস্থ মানুষ উক্ত কলকারখানায়, খনি গর্ভে, খনিমুখে ও চা বাগানগুলিতে শ্রমিক ও কুলি-কামিনরূপে নিয়োগের পিতৃ-পিতামহের আবাসভূমি ছেড়ে কাজে যোগ দেয়, এবং ঐসব কৃষি শ্রমিকরাই ধীরে ধীরে এভাবেই শিল্প-শ্রমিকে রূপান্তরিত হয় এবং পরবর্তীকালে ঐসব পতিত-জমি ও তৎসংলগ্ন দাগোয়া চরজমি যা সময়মত ইজারা হোলা ও চাষ অভাবে প্রায় পতিত হয়ে পড়ে ছিল, সেখানে নূতন করে কলকারখানা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে কারণ কৃষিকর্মে নিযুক্ত মানুষগুলোরা যখন শিল্প-শ্রমিক হতে বাধ্য হলো—অবস্থার চাপে পড়েই হোক বা লোভে পড়েই হোক, তখন বহু জমি পতিত হয়ে পড়ে থাকতে লাগলো আর শিল্প-পতিরা তা জলের দরে কিনে কলকারখানা তথায় গড়তে শুরু করলো। সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয়েছে যে বৃহৎ শিল্পের চেয়ে ক্ষুদ্রশিল্পে কম মূলধনে অধিক কর্মসংস্থান সম্ভব হয় এবং ইহা একটি প্রমাণিত সত্য বলে সকলেই মেনে নিয়েছে।

তাই ক্ষুদ্র শিল্পকে বলা হয়—Labour intensive Method of Production এবং বৃহৎ শিল্পকে বলা হয়—Capital intensive Method of Production। আর ভারতের মত জনবহুল অথচ দরিদ্র দেশে, তাই ক্ষুদ্রশিল্পে, কুটীরশিল্পে ও হস্তশিল্পে সর্বাধিক মনোযোগ ও উৎসাহ দেওয়া জাতীয় স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন। ভারত গ্রাম প্রধানদেশ ও ভারতের প্রায় শতকরা আশি (৮০) ভাগ লোক গ্রামে বাস করে এবং গ্রামবাসীরা মূলতঃ কৃষির ওপর নির্ভরশীল ; কিন্তু কৃষকেরা সারা বছরই কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকে না। ফলে বছরে প্রায় ছয়-সাত মাস কৃষিকর্মে নিয়োজিত মানুষের বল কর্মহীন হয়ে অলস থাকতে বাধ্য হয়। এদের কর্মহীন থাকা-কালীন মূলধন বা হস্তশিল্পে যদি সময়মত নিয়োজিত করা সরকারী বা বেসরকারী প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়, তবে নিশ্চয় উক্ত কৃষি শ্রমিকেরা অনায়াসে কাজ পায় ও তাহারা কুটিরোদ্যোগের মাধ্যমে নিজ নিজ আর্থিক অভাব নিরসনে সক্ষম হয় এবং সমগ্রভাবে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার একটা পথ পাওয়া যায় এবং বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার অল্পক্ষেত্রেই, বিশেষ করে ক্ষুদ্রশিল্পে [illegible] ও পরিচালনে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে

বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে অন্যান্য গ্রামোন্নয়নমূলক কাজগুলিও সাথে সাথে অগ্রসর হতে পারে—যেমন পেয় ব্যবস্থা, শস্য ঝাড়াই-বাছাই ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদি। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন, নচেৎ কোন গঠনমূলক বা উন্নয়নমূলক কাজই গ্রামে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে না। এ কাজ সরকারকেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এখনই সম্পন্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যেতে হবে। অন্যথায় দেশের অগ্রগতি স্তব্ধ বা সীমিত হয়ে পড়বে—যা কারোরই অভিপ্রেত হওয়া কাম্য নয়।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনয়নের পথ প্রশস্ত করে, অবশ্য ১৯৪৭ সালে ভারত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পেয়েছে; কিন্তু এখনও দীর্ঘ বত্রিশ বছরেও ভারত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে বললে অত্যুক্তি করা হবে না। তবে একথা সত্য যে সে চেষ্টা আগেও চলেছে এখনও চলছে, আর লক্ষ্যও তাই। এর কারণও অনেক—যথা:—দৈব দুর্বিপাক, পররাষ্ট্র দ্বারা বার বার আক্রান্ত হওয়া, লক্ষ লক্ষ মানুষের অত্যাচারিত হয়ে বাস্তুহারা হওয়ার ফলে ভারতে আগমন, রপ্তানী বাণিজ্যে অকারণও হঠাৎ ঘাটতি, আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাস, অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী, প্রমশিল্পে ঘন ঘন ধর্মঘটজনিত কারণে মূল্যবৃদ্ধি, শিল্পে ধীরে চলা নীতির প্রসারে উৎপাদনে সীমাহীন ঘাটতি ইত্যাদি। উক্ত কারণে অর্থনৈতিক অগ্রগতি বারে বারে ব্যাহত হতে বাধ্য হয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশে এসব বিপদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সত্যই কঠিন ও দুরূহ। কারণ কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমজীবিদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারগুলি খর্ব করা যায় না, অথচ বর্তমানে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি কলে-কারখানায়, বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্যে, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য লগ্নীকারী সংস্থায়, যানবাহন পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারী শিল্পসংস্থা, সরকার অধিকৃত শিল্প-বাণিজ্যে, ডাক-তার বিভাগে, রেল ও রেল ইঞ্জিন-বগি নির্মাণ কারখানায়, এমনকি হাসপাতালে পর্যন্ত যে ধীরে চল নীতি গ্রহণের মাধ্যমে আর না হয় ঘন ঘন ধর্মঘটের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যাহত করতে বা সবকিছু অচল করতে শ্রমিক কর্মচারীদের আরো কিছু বেশী অর্থ ও সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করে তোলে এবং শ্রমিক কর্মচারীরা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই নিজ নিজ ইউনিয়ন নেতার পরামর্শে উক্ত ধীরে চল নীতির ও ধর্মঘটের সামিল হয়। যারা সহজে সামিল হতে না চায়, তাদের ওপর বলপ্রয়োগ ও অন্যান্য অন্যায় চাপ সৃষ্টি করা হয়, ফলে হয়ত উক্ত ধীরে চল নীতি বা ধর্মঘট সফল হয়; কিন্তু সমগ্রভাবে সারা দেশে তার যে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় এবং উৎপাদনে ঘাটতি ও অচলাবস্থার জন্য মূল্যবৃদ্ধির কারণে অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা যেভাবে বিচলিত ও বিপর্যস্ত হয় তা পরবর্তিকালে অর্থনৈতিক বনিয়াদকেও সমভাবে বিপন্ন করে। তাই ধর্মঘট ব্যতিরেকে আপোষ মিমাংসার দ্বারা শ্রমিক অসন্তোষ নিরসন করা অবশ্য কর্তব্য। সেক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারীদের দাবী দাওয়া, অযৌক্তিক বা অমূলক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা বলে সরকার ও জনগণ বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করবে, সেক্ষেত্রে সরকারকে অভিজ্ঞতা বলে জাতীয় ক্ষতিকর সকল প্রচেষ্টাকে স্তব্ধ করে দিতেই হবে জাতীয় স্বার্থে। নচেৎ অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমি এরূপ অন্যায় কারণে একবার নড়বড়ে হয়ে গেলে তা পুনরুদ্ধার করা বাস্তবে কঠিন হয়ে পড়বে এবং জনগণই তাতে সবচেয়ে বেশী অসুবিধা ও অসুবিধা ভোগ করবে। ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা সীমিত ও কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্নগামী হতে বাধ্য হবে যা মোটেই অভিপ্রেত নয়। ক্রয়ক্ষমতা বর্ধিত হলেই তবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাঙ্গা হয়। এদেশে শ্রমিক নেতারা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক-কর্মচারীদের কখনও উৎসাহিত করেন না বা পরামর্শ দেন না, যদি কেউ কখনও এজন্য করতে যান তবে তাঁর নেতৃত্বের অবসান ঘটে, কারণ এতাবৎকাল কমিউনিষ্ট শ্রমিক নেতারা দলপুষ্টির জন্য ও শ্রমিক মনস্তুষ্টির জন্য উৎপাদনকে যথাসম্ভব মন্থর করার জন্য সম্ভাব্য প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে।

(চলবে)

RASHBEHARI BASU'S appeal to the Indian People before the momentous A. I. C. C. Session of 9th Aug. '42

(Dated 28th July '42)

Friends,

The hour has struck. We must break the Shackles with which the British has bound us hand and foot. For long we have suffered tyranny of the worst type of domination. All our suffering must now came to an end and India must be free.

During the two Centuries of British rule, our sacred motherland has been reduced to a state of utter poverty and helplessness. Before the advent of the British, for four thousand Years, our Country had held up the beacon light of civilisation to the rest of the World.

We had contributed to the peace, progress and prosperity of humanity in a large measure. India was then known to the World as the land of plenty and perfection. India was then the seat of the World's learning and Culture. The fame of Indian handicrafts echoed in the far corners of the Globe.

But in two Centuries of British rule, our flourishing industries have been mercilessly destroyed; our popular educational systems have been sedulously wiped out; enlightened India has been reduced to the state of a home of destitutes; our far famed national wealth has been constantly drained out of our Country. The Indian masses, that is the teeming millions of Indian peasantry have been reduced to a state of starvation and chronic indebtedness..... British imperialist exploitation has been robbed us of our most valuable measures. We have been made to lose everything of which we were justly proud.

India has lost everything but she has not lost her soul. Centuries of appression and exploitation have not been able to kill her soul. India has awakened and we are now conscious of our great loss. Thanks to Mahatma Gandhi; Indian awakening in the last few decades has been phe-

nomenal. Through his action and teachings, Mahatmaji has made us realised that the hot lause of our degradation and degeneration is our cultural and spiritual enslavement.

Mahatmaji has convinced us that, unless we Indians regained our confidence in our own culture and unless we learned to rely upon our own strength, we could never stand up for ourselves and defy our mighty appressors. He has laboured for the last twenty years and India's millions have been trained along these lines. You, in India, of course, know all these better than I do. Every one of us knows that India is now ready for the final battle. At last, the time has come for the final trial of strength. Mahatma Gandhi has sent his historic ultimation to the British to recognise India's independence immediately. It will be the happiest day for India if this national demand is accepted by the British.

But I have my own doubts about it, as you too undoubtedly have. History clearly records the fact that the British do not understand the language of reason and justice. We, therefore, have to be prepared for the inevitable struggle Let us not forget that our national selvation lies in fighting this battle under the leadership of Mahatmaji with all the grim determination that we can command ..... one thing is certain. The British will have to leave India any way.

I earnestly implore one great compatriots like Mr. Jinnah and others to give up their stand against the National Congress in this hour of crisis for the sake of greater cause of India's freedom. I request Mr. Jinnah to keep in abeyance for the moment his demand for Pakistan and to lead the struggle for the liberation of entire Hindusthan.

Our next battle must be waged on such a scale as the World has never seen before. We must not miss this golden opportunity. We must realise that if we fail to act as one united nation at this most opportune moment, our fate will be sealed for ever.

We the Indians in East Asia are keenly alive to the seriousness of the present situation and we are prepared to play our part from without, I want to assure you all that if we are compelled to act because of British stubborness, we will do so on our own

initiative. We will march with our own men and we will depend upon your cooperation and support.

Those who will march will be your compatriots and will obey your command and not the command of any foreign power. I want to assure you once again most solemnly, that we in East Asia Shall act only if you fail in your efforts to drive the British out of our Motherland. Bande Mataram.

Broadcast from Thailand on the 5th Aug '42

.....Friends and severed leaders, When I Started my political career forty years ago, I was a firm believer in Violence as the only weapon with which we could liberate India. Since then, I have watched with intense interest, the marvellous growth of the spiritul force that Mahatma Gandhi has released.

It is this spiritual force that will be pitted against the deadhist weapon in British armery. As I have stressed time and again, this is our last battle for independence and this time we must win. If we lose this opportunity, another chance may never occur again, Therefore I say : We must be ready to meet any contingency. And I beg to assure you again that we for our part, are ready.

Need I tell you more ? Bear with me for a while, if I tire you with my repeated appeals. I Say again : Here and now is our heaven-sent opportunity. We take it and we win. We miss it and we are lost forever... .....India has a mission to fulfil. Our sacred motherland had a glorious past. She enriched the culture and civilisation of the entire world. It is my firm belief that India is about to regain her ancient glory and her proud place among the World's nation. It is therefore, **our bounden duty to make tIndia the India of the Indians,** in name as well as in fact.

Friends, in the sacred name of our motherland, I implore you once again to rally round Mahatma Gandhi in the coming battle for freedom. Think of India's glorious past, her present degradation aed the brilliant future that awaits hnr. Let us march forword with faith in ourselves and in India's destiny. Do not look back, do not falter, go on to battle to Victory and to complete independence.

——

দিনের শান্তি এবং রাতের ঘুম

নিবারণ বৈরাগী

পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসুদের বামফ্রন্ট-সরকারকে লোকে রাস্তা ঘাটে বাজারে সদরে অন্দরে যাহা বলিতেছে তাহা কাগজে ছাপানো যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে বাম ফ্রন্টকে যে আখ্যা দেওয়া হইতেছে তাহা শুনিলে কানে আঙুল দিতে হয়। সম্ভবত ইহারা সকলেই চক্রান্তকারী।

এই সকল লোক অবশ্যই শোষক শ্রেণীর। জ্যোতি বসুর বাজাকী অর্থাৎ এই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র সেই ১৯৭৭ সনেই বলিয়াছিলেন তিনি শোষক শ্রেণীর দিনের শান্তি এবং রাতের ঘুম কাড়িয়া লইবেন। রাজ্যের শতকরা ১০ জন মানুষের দিনের শান্তি এবং রাতের ঘুম গিয়াছে। অতএব পশ্চিমবঙ্গের সাড়ে চার কোটি লোকই শোষক শ্রেণীর। মন্ত্রীপ্রবর "মাননীয়" ব্যক্তি তাহার কথা মিথ্যা হইতে পারে না।

বিড়লা টাটা গোয়েঙ্কা বাঙুর প্রভৃতি জ্যোতি বসু এবং তাহার সাকরেদবৃন্দ, অশোক মিত্র সমেত, নিশ্চয়ই শোষক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাহাদের দিনের শান্তি এবং রাতের ঘুম কাড়িয়া লওয়া হয় নাই।

সাধারণতঃ সাড়ে চার কোটি মানুষের জীবনে শান্তি নামক বিলাসিতার উপকরণটি নিতান্ত চটুল। রাতে ঘুম হউক বা না হউক, সকালে শয্যা ত্যাগ করিতে হয়। সরকারি কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির লোক হইলে অবশ্য দশটায়ও শয্যা ত্যাগ না করিলে চলে; উহাদের অফিস কাছারী লইয়া মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। সেখানে মামার জোর (অর্থাৎ জ্যোতি বসু) আছে। শোষকদের তো অফিস কাছারী কারখানা ইত্যাদি বাদ দিবার উপায় নাই। অতএব সকালে উঠিতে হইবেই।

হাতমুখ ধুইবারও জল নাই। রাতে বিদ্যুৎ ছিল না (সকালেও নাই), সেই হেতু পাম্প চলে নাই। নলকূপের সামনে লাইন। সময় যায় যাক। বিরক্ত হইলে চলিবে না। বিরক্তি মানেই বামফ্রন্ট বিরোধী চক্রান্ত।

সকাল বেলার বাতাসটি মিষ্ট। অশোক মিত্ররা এখানে উহা কাড়িয়া লইতে পারে নাই। কিন্তু বাজারটা আগুন। তবু ভাগ্য ভালো বলিতে হইবে; বাজার বসে সকালে। অফিস ছুটির পরে বাজার করিবার ব্যবস্থা থাকিলে রোজ কতগুলি লাশ পড়িত কে জানে।

ট্যাক এবং আহার্য দ্রব্যাদির মধ্যে ব্যবধান দুস্তর হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরে কী অবস্থা হইবে? সে কথা বামফ্রন্ট কী জানে! সকল দোষ তো কেন্দ্রের। আর তিরিশ বছরের কংগ্রেস শাসনের।

বাজার হইতে যাহা কিছু আনা সম্ভব তাহা ব্লেড দিয়া কাটিতে হইবে। নহিলে সারা বাড়ির কুলাইবে না। কৃপণ গৃহিনী। সংসার বাঁধিবার শখ তথাপি দূর হয় না। ইহার উপর আবার ছেলে মেয়ে। অপোগণ্ডগুলির বায়নাকারও শেষ নাই। দুধ চাই। বিস্কুট চাই। লেখাপড়ার নক্সাও চাই।

ফ্যামিলি প্ল্যানিং-য়ের হিড়িকটা আগে পড়িলেই বোধ হয় ভালো ছিল। তবে তো বসু ঘোষ মিত্র চক্রবর্তী ভট্টাচার্য আদি রাইটার্স বিল্ডিংসের কর্তাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত! থুড়ি এই সকল চিন্তাও পাপ। বামফ্রন্ট বিরোধী চক্রান্ত।

পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধ সমাপ্ত। কিন্তু না, শান্তি নাই। মহম্মদ আমিন ওৎ পাতিয়া রহিয়াছেন। মিনি বাস সকলের জন্য নহে। স্পেশাল মার্কা মারা যাহারা তাহাদের রাজদুলালী বলতে হয়। অন্য যে সকল যান বাহন তাহাদের থেঁয়োড় বলা সঙ্গত। কিংবা তাহাও নয়, ইহাতে করিয়া যাতায়াত করিতে গোরু ছাগলেরাও অস্বীকৃতি জানাইবে। এইগুলিকে বরং বলা যায় গুদাম, যাহার মধ্যে আলু পটল কুমড়ো গাদা করিয়া বোঝাই করা রহিয়াছে।

এই এক আশ্চর্য মেটামরফসিস। কাফকার গল্পে জলজ্যান্ত মানুষটা আরশোলা হইয়া গিয়াছিল। আর কলিকাতায় মানুষগুলো আলু পটল কুমড়ায় পরিণত হইয়া যায়। ধন্য মহম্মদ আমিন! শোষক শ্রেণীকে কেমন করিয়া পেষণ করিতে হয় তিনি তাহা জানেন।

ইতিমধ্যে সাইরেনের শব্দ। পৌ বাবু যাইতেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশী গাড়ী। সামনে পেছনে পুলিস। পথ ছাড়ো। তাহার শান্তি যেন বিঘ্নিত না হয়। তিনি যে শোষিত মানুষ। আহা! চকিতে একটি কল্পনা আসিতে পারে। জ্যোতি বসু যদি আই সি এস পাশ করিতে পারিতেন। তবে ত' এতদিনে রিটায়ার করিয়া কালিম্পঙে 'কটেজ'-বাসী হইয়া বসিয়া বসিয়া তিনি অ্যালসিয়ান কুকুরের গলায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বিলাতের স্বপ্ন বুকে লইয়া কাটাইতেন। কুকুর তিনি বড্ড ভালোবাসেন কিনা।

এ রাজ্যে ক্রেসীদের বেহায়াপনার সীমা নাই। তাহারা এ-হেন জ্যোতি বসু এবং তাহার সাকরেদগণের শান্তি বিঘ্নিত করতে গিয়াছিল। সুতরাং লাঠির ঘায়ে হাড় তো ভাঙ্গবেই। টিয়ার গ্যাসে চোখের জল করিবে বৈকি, এই রাজ্যে বসিয়া বামফ্রন্ট বিরোধী চক্রান্ত। গোস্তাকি আর কাহাকে বলে! বলিতেছে, বিদ্যুৎ চাই। বিদ্যুৎ কি জয়নগরের মোয়া?

অফিসে বসিয়াও কি শান্তি আছে? আলো নাই বাতাস নাই। তবু কাজ তো তুলিতেই হইবে। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখা যায় কো-অর্ডিনেশন বাবুদের পারা নাই। উহারা রাজার জামাই, অতএব ...। রাজার যেহেতু সাড়ে চার কোটি মেয়ে থাকিতে পারে না সেই কারণে চার কোটি বঙ্গ সন্তানের কপালে আদর জোটে না। অধিকন্তু তাহারা শোষক শ্রেণীর। কাজে কাজেই কারখানা অথবা অফিসেই বা তাহারা শান্তি পাইতে চায় কোন সাহসে? শান্তি কি অত সস্তা? মুড়ি মুড়কি?

অফিস ছুটির পরে খোলা ময়দানে বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লওয়া যায়। হাত পা ছড়াইয়া

ঘাসের উপর বসা কিংবা একেবারে চিৎপাত হইয়া শুইয়া পড়িবার ইচ্ছাও হইতে পারে। সারা দিনে অতটুকুই শান্তি।

বেশিক্ষণ উপভোগ করিবার উপায় নাই। ছিনতাইয়ের ভয় আছে। দেহপসারিনীদের আক্রমণেরও আশঙ্কা আছে। বামফ্রন্টের আমলে উহাদের বংশবৃদ্ধি অবারিত হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং চলরে মুসাফির। পথে পথে ছায়া গাঢ়তর হইতেছে, প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে। তারপর শুধু অন্ধকারই দৃশ্যমান। হায় রে কলিকাতা।

বাড়িতে লণ্ঠনটাও হিসাব করিয়া জ্বালাইতে হয়। কাল আবার কেরাসিন তেল মিলিবে কিনা জানা নাই। লেখাপড়ার দায় একেবারে চুকাইয়া দিবার ব্যবস্থা পাকা হইতেছে। রাজ্যের হাতে অধিক লণ্ঠন নহে, মোমবাতি চাই।

তথাপি অন্ধকারের জয় হোক। ছেলেমেয়ে কর্তা গিন্নী মিলিয়া অন্তত রাস্তার নলকূপে গা মাথা ভেজানো চলে। অশোক মিত্রকে ফাঁকি দিয়া একটু শান্তি চুরি করা।

তারপর অবশ্য অবিমিশ্র অশান্তি। নিদ্রাশূন্য রাত্রি, অশোক মিত্রদেরই জয়।

অশোক মিত্রদের তূনিরে অনেক অস্ত্র। মশককুল উৎসাহে আত্মহারা। তাহাদের সঙ্গীতের তালে তালে প্রহর গড়াইয়া চলে। এক সময় বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়: হে ইন্দ্র, হে মরুৎ দেবতাগণ! তোমাদের গর্জনে বর্ষণে বাত্যাবিক্ষোভে এই যন্ত্রণার অবসান কর। সোমরস দিয়া যজ্ঞ করিবার সাধ্য নাই। কিন্তু রাজ্যের সাড়ে চার কোটি শোষকের শোণিত এখনো রহিয়াছে, তাহা পান করিয়াই তোমরা তৃপ্ত হও। জ্যোতি বসু, অশোক মিত্রদের শান্তি, নিদ্রা, আরাম নিষ্কণ্টক হউক। বাঙলার শ্মশানে বাম-ফ্রন্টের পতাকা পত পত করিয়া উড়িতে থাকুক।

সৌজন্য-সপ্তাহ (১৮ মে, ১৯৭৯)

যাবতীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায় অব্যর্থ ফলপ্রদ

আমলা ঘৃত কুমারী

আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

প্রাপ্তিস্থান: শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী

নীলকণ্ঠ কুটির • কুমার পুকুর • বারাসত • ২৪ পরগণা

সাম্প্রদায়িকতা ও তার প্রতিকার

॥ কালীপদ সরকার ॥

মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের দাবি মেনে নিয়ে, অশেষ ক্ষয়ক্ষতি ও দুঃখবরণ স্বীকার করে, যখন ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ হল তখন অনেকেই মনে করেছিল 'সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান চিরতরে সুসম্পন্ন করা গেল। ধারণাটা যে কত বড় ভ্রমাত্মক ছিল তা বিভাগ-পরবর্তী-কালের সম্প্রদায়িক সংঘর্ষগুলি ভালোভাবে প্রমাণ করে। জামসেদপুরের সাম্প্রতিক ঘটনা তার একটা দৃষ্টান্ত। এই ব্যর্থতার মূলে যেমন আছে ভারতীয় মুসলমানদের চিন্তাধারায় মৌলিক পরিবর্তনের অভাব, তেমনি আছে সংখ্যালঘুদের ভারতীয় জাতীয় জীবন প্রবাহে এক করার সরকারী প্রয়াসের অপ্রতুলতা। অতীতের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাব থেকে মুসলমানরা এখনো মনে হয় সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। পাকিস্থান ভেঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব এবং পাকিস্থানের অস্থির ঘটনাবর্তও তাদের মনোভাবের উপর সামান্য প্রতিক্রিয়াই করতে পেরেছে। ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে এ সম্পর্কে ধর্মনিরপেক্ষ উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ছাড়া, গঠনমূলক সুনির্দিষ্ট ভূমিকা দেখা যায় না। বরং মুসলিম ভোটের জন্য ক্ষমতাসীন দলের হেলেনামি প্রকারান্তরে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয়ই দিয়েছে। অন্য রাজনৈতিক দলগুলিও এ বিষয়ে দোষমুক্ত নয়। মুসলমান গরিষ্ঠ নির্বাচন কেন্দ্রে এখন পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দল এমন কি কমিউনিস্টদলও যে অমুসলমান প্রার্থী দাঁড় করাতে পারে না, তার দ্বারা কি মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না ?

ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতে মুসলমানগণ পূর্ণ নাগরিকের অধিকার ভোগ করে। মুসলমানদের মধ্য থেকে প্রশাসক, মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, বিচারক এমন কি রাষ্ট্রপতিও হন। দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানগণ যথাযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। সংখ্যাবৃদ্ধিতেও তারা এগিয়ে চলেছে। সাড়ে চার কোটি বেড়ে ছয় কোটি চৌদ্দ লক্ষে পৌঁছেছে। (১৯৭১ সালের আদমসুমারী) এই বৃদ্ধির হার হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধির শতকরা হারের চেয়ে অধিক। বর্তমানে মুসলমানগণ ভারতের জনসংখ্যার ১১ শতাংশ। ভারতের সাতটি রাজ্যে মুসলমান সংখ্যা শতকরা ১১ ভাগের বেশি। লাক্ষা দ্বীপে তারা হল শতকরা ৯৪, কাশ্মীরে ৬৫, অসামে ২৫, পশ্চিমবঙ্গে ২০, কেরলে ১৯, উত্তর প্রদেশে ও বিহারে যথাক্রমে ১৫ ও ১৩। পাকিস্থানের মন্ত্রী মিঃ কোরেশী ১৯৫৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিনসটন সহরে এক বিদ্বৎ সমাবেশে বলেছিলেন, আগামী একশত বৎসরে বা তার কম সময় মধ্যে ভারতীয় মুসলমানগণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু ১৯৭১ সালের লোকগণনা রিপোর্ট তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে।

উইলফ্রেড স্মিথ তাঁর বিখ্যাত "ইসলাম ইন মডার্ন হিস্ট্রি" গ্রন্থে লিখছেন—"পাকিস্থানের আচরণ ভারতের মুসলমানদের দুঃখ ও নিরাপত্তার অভাববোধের মুখ্য কারণ। ভারতের মুসলমানদের প্রতি অবিচারের চিন্তা নিয়ে পাকিস্থান এত উদগ্রীব, যে সীমান্তের ওপার থেকে দুঃসংবাদের জন্য তারা যেন কান পেতে থাকে। ভারতে হিন্দু-মুসলমান সৌহার্দের সম্ভাবনা তাদের শিরঃপীড়া জন্মায়। ভারতে মুসলমানদের শ্রীবৃদ্ধির সংবাদ পাকিস্থান শুনতে চায় না। পাকিস্থানী মনোভাবের এ এক বিস্ময়কর।"

উক্ত গ্রন্থে মি: স্মিথ অন্যত্র বলেছেন—"ভারতীয় মুসলমানগণ মনে প্রাণে ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্থান গড়ে তুলতে এবং ইসলামের উন্নতির পরিবর্তে ভণ্ড, অপদার্থ রাজনীতিকদের খেয়ালের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় মুসলমানরা ভারতেরই নাগরিক এই বাস্তব সত্যকে তাদের মেনে নিতে হবে। বহুসমস্যা সত্বেও ভারত আধুনিক বিশ্বের মহত্তম সাধনার পথে যে এগিয়ে চলেছে সে কথা স্বীকার করতে বাধা নেই। সেই ভারতের নাগরিকত্ব লাভ বিশ্ব সমাজে বড় কম কথা নয়। মুসলমানদের পক্ষে ভারতের বিরাট উন্নয়ন কাজে যুক্ত হওয়া ছাড়া অন্য পথ নেই। তাদের সমস্যার সমাধান ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির মাঝে নিহিত। ভারত তার জয়যাত্রায় মুসলমানদেরও সঙ্গী করে নিয়ে যাবে।"

দেশে কিছু রাজনৈতিক দল আছে যাদের চিন্তা ও কর্ম ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পরিপন্থী। তারা প্রায়ই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের কথা বলে। দেশের শতকরা ৮৭ শতাংশ অধিবাসী সম্প্রদায় নয়, তারাই জাতি। এই সহজ কথা এরা বুঝতে চায় না। এই দলগুলি পূর্বে মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করেছে এবং এখনও তার পিছনে মদত দেয়। নতুবা মুসলিম লিগকে তুষ্ট করে রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা করায়ত্ত রাখার তাগিদে, এরা কেরলে একটি মুসলমান পরিষ্ঠ জেলা গঠন এযুগে করবে কেন?

একটা কথা এ সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, স্বাধীন ভারতে যে সকল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে এবং সে সম্পর্কে যে সকল তদন্ত কমিশন বসেছে, তার রিপোর্টগুলি থেকে জানা যায় যে অধিকাংশ-ক্ষেত্রে দাঙ্গা বাধাবার মূলে ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক। এই সব তদন্ত কমিশনে মুসলমান বিচারকও ছিলেন।

সোভিয়েত রাশিয়ার ২২ কোটি অধিবাসীর মধ্যে ২ কোটি ৪০ লক্ষ মুসলমান। ভারতের মতই মুসলমান সংখ্যা এক দশমাংশ। সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্গত উজবেকিস্থান, কিরঘিজিস্থান, তাজেকিস্থান, তুর্কমানিস্থান এবং কাজাগিস্থানে তাদের বাস। বংশ, ভাষা ও ধর্মে স্লাভ জাতীয় রাশিয়ানদের থেকে এরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ষোড়শ শতাব্দীতে জার আইভান মহা এশিয়ার এই মুসলমান অঞ্চলটি রুশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। সোভিয়েত সংকার এই অঞ্চলে গোষ্টিভিত্তিক কতকগুলি পৃথক সোভিয়েত রিপাবলিক গঠন করেছেন তবে মুসলমান অধিবাসীদের সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদের অধীনে কমিউনিষ্ট সদস্য গঠিত একটি ধর্ম-সংস্কৃতি পরিচালক কমিটি রেখেছেন। কমিটির হাতে আছে ব্যাপক ক্ষমতা, মসজিদের মোল্লা নিয়োগ পর্য্যন্ত। মেয়েদের বোরখা পরিধান ও অবাঞ্ছিত ধর্মসংস্কারের বিরুদ্ধে কমিটি প্রচার চালায়।

শিক্ষার ব্যাপারে মসজিদ সংলগ্ন মোক্তাবগুলি তুলে দিয়ে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত সরকারের শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা বে-আইনী হয়েছে। নিরক্ষরতা নির্মূল প্রায়, এই মুসলমান অঞ্চলগুলির শিক্ষিতের হার এশিয়ার জাপান ও ইজরাইলের পরেই।

সাম্প্রদায়িকতার প্রতিরোধে সব চেয়ে বেশি সার্থক হয়েছে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আরবী হরফের ব্যবহার তুলে দিয়ে রোমান রুশীয় হরফের প্রচলন। এই ব্যবস্থার দ্বারা একদিকে যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নের মুসলমানদের সহিত প্রতিবেশী উত্তর ইরান আফগানিস্থান ও সিংকিয়াং এর মুসলমানদের ধর্ম ও কৃষ্টিগত সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্ভব হয়েছে, অন্যদিকে ইসলাম ধর্মগ্রন্থগুলি রুশীয় হরফে মুদ্রিত হওয়ায় তাদের হ্রাস পেয়েছে।

মুসলিম সোভিয়েত রিপাবলিকগুলির নিজেদের জাতীয় কাব্য সাহিত্য রচনার অধিকার আছে কিন্তু তা লিখতে হয় রুশীয় হরফে এবং রাষ্ট্রের আদর্শ ও মতবাদ অনুযায়ী।

মুসলমানগণ এই সব বিধিনিষেধ ও পরিবর্তন মেনে নিয়ে, মধ্য যুগীয় ইসলামিক চিন্তা ভাবনার দাসত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। তারা এখন সোভিয়েত রাশিয়ার ভাগ্যের সহিত নিজেদের সামিল করে প্রগতিও উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। রাশিয়ার মুসলমানদের দৃষ্টান্তভারতীয় মুসলমানদের অনুসরণ করা কি উচিত নয়? ভারতে এতটা বাধা নিষেধ নেই।

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যালঘু চরিত্র বহাল রাখার দাবি, ভারতের সিভিল কোডের বিধান অস্বীকার করে মুসলিম ব্যক্তি-আইন সংরক্ষণ, মসজিদের সামনের রাজপথবাহী হিন্দু ধর্মীয় মিছিল আক্রমণ, প্রকাশ্য স্থানে গরু জবাই করে গো-মাংস আহার ইত্যাদি কর্ম মুসলমানদের পক্ষে না যুগ-ধারণা সম্মত, না জাতীয় সমন্বয় সাধক।

ভারতের মুসলমানগণ বংশ ও ভাষায় হিন্দুদের সহিত অভিন্ন। ধর্মসাধনা ব্যক্তিগত বিষয়, হিন্দুদের মধ্যেই বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষ আছে। ইসলামের সহিত হিন্দুধর্মের বিরোধ নেই। উভয়ের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক জীবন অভিন্ন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মিলনের অন্তরায় একটিমাত্র, তা হল মুসলমানদের গো-মাংস আহার। গো-মাংস ভোজন কোন ধর্মের অঙ্গ নয়, আহার-অভ্যাসমাত্র। অভ্যাস প্রয়োজনবোধে পরিবর্তনীয়।

প্রাচীন আর্যগণ গো মাংস আহার করতেন, ভারতের প্রাক-আর্য অধিবাসীদের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং গো-জাতির অশেষ উপকারিতা হেতু আর্যগণ গো হত্যা ও গো-মাংস আহার ত্যাগ করেছিলেন। সম্রাট বাবর এবং সম্রাট আকবর সেই কারণে সাম্রাজ্যে গো-হত্যা বন্ধের আদেশ দিয়েছিলেন। স্থায়ী সম্প্রীতি ও মিলনের মহান জাতীয় প্রয়োজনে, সংখ্যালঘুদের মধ্যে যারা গো-মাংস ভোজন করেন, তারা সহজেই আহার অভ্যাস পরিবর্তন করতে পারেন। এই পুরাতন পৃথিবীতে ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তন ও জীবজন্তুর বিবর্তনের কারণে খাদ্য-পরিচ্ছদের কত রূপান্তর ঘটেছে তা কি কেউ বলতে পারে? অভ্যাস ত্যাগ একটা সাময়িক অসুবিধা জন্মায় মাত্র।

আচার্য বিনোবাভাবে ঋষিতুল্য, তাঁকে কেউই সাম্প্রদায়িক অথবা অবৈতনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বলতে পারে না। হিন্দু-মুসলমান সৌহার্দ্যের জন্য আবশ্যক বাস্তব চিন্তা প্রসূত পথটির তিনি সন্ধান দিয়েছেন। সম্প্রদায় ও দল নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী আচার্যের যুগ-সিদ্ধান্তকে সফল করে তুলুন। বিষয়টি লঘুচিত্ত বিচার্য নয়।

———

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

বয়কট ও "স্বদেশী" আন্দোলন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই রকম আলাপ-আলোচনা যখন চলছিল, তখন পরবর্তীকালে যাকে আখ্যা দেওয়া হয় 'বর্জন আন্দোলন' বলে, সেই আন্দোলনের বীজটি মনের মধ্যে গড়ে উঠলো। আমাদের আলাপ আলোচনার মধ্যে এই এই চিন্তাটি খুব বড় হয়ে মনের উপরে সজোরে এসে ধাক্কা মারল। এই বয়কট আন্দোলনের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা ও লেখা হয়েছে। কার উদ্ভাবনী চিন্তা থেকে এই ধারণাটির সৃষ্টি হয়েছে, আর কবেই বা প্রথম প্রকাশ লাভ করেছে? এই প্রশ্ন দুটির উত্তর সঠিকভাবে দেওয়া খুব সহজ নয়। কোন উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার মধ্য দিয়ে জনতা যখন জেগে ওঠে তাদের গোপন হৃদয়-তন্ত্রীগুলিতে যখন স্পর্শ লাগে এবং কোন বড় রকমের দুর্ভোগ বা প্রবল আকাঙ্ক্ষার দ্বারা জেগে ওঠা সুপ্ত শক্তিগুলি কোন অভিপ্রীতি লক্ষ্যে নিয়ে যেতে বেগবতী হয়ে জাতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনার প্রতিশ্রুতি বহন করে, তখনকার সেই নৈতিক পরিবেশে নতুন নতুন ভাবধারায় সকল হয়ে ওঠে। কারণ গোটা সমাজের মনই তখন সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সামগ্রিকভাবে এক জাতীয় চিন্তা গড়ে তোলার কাজে অবদান যোগায়।

ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস্ এবং পার্লিয়ামেণ্টের মধ্যে গৃহ বিবাদ শুরু হওয়ার পূর্বক্ষণে ইংল্যাণ্ডের সামাজিক অবস্থা কিরূপ হয়েছিল লর্ড মেকলে তার এক সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। আমার যৌবনকালে আমি সে বিবরণ পাঠ করেছি। আসন্ন সংঘর্ষের বিষয় কিভাবে জাতির অন্তর সব চিন্তাকে ছাপিয়ে উঠেছিল, কিভাবে সে ভাবনা ইংল্যাণ্ডের ঘরে ঘরে অনুপ্রবেশ করে রন্ধনশালার চুল্লীর কাছেও তা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিভাবে তা লোকের মনের কল্পনা ও উদ্বেগকে জাগিয়ে তোলে এবং আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপদান করে—এসব কথাই সেকালের লেখায় আছে। লর্ড কার্জনের বাংলা বিভাগের ফলে এদেশেও কতকটা সেই রকমেরই এক সর্বনিম্ন আগ্রহবোধকে এ দেশের লোকের মনে জাগিয়ে তোলে। গোটা সমাজই এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। তাদের প্রদেশ সম্পর্কে এ রকম কাণ্ড পূর্বে তারা কখনও দেখেনি। বিস্ময়ে এবং ক্রোধে তারা ছটফট করতে লাগল। এই ক্রোধের মাত্রা আরও বেড়ে যায় 'রেলভিভিয়ারে' কনফারেন্স করার প্রহসন দেখে। এই কনফারেন্সে জনমতের প্রতি মর্যাদা দেখাবার একটা ভড়ামি করা হয়েছিল। জন-মানসের এই অবস্থার মধ্যে ব্রিটিশ বাণিজ্য দ্রব্য বর্জন করার চিন্তা সাধারণের মধ্যে দেখা দিল। কে এই বর্জনের কথা প্রথমে চিন্তা করেন, তা আমি বলতে পারি না। তবে হয়ত কয়েকজনে একই সময়ে একই ভাবে চিন্তা করে থাকতে পারেন। এই বিদেশী বর্জনের কথাটি প্রথমে প্রকাশ পায় পাবনা জিলায় এক জনসভায়। পরে মফঃস্বলের অন্যান্য সহরগুলিতে ও জনসভায় এই বর্জনের কথা ধ্বনিত হয়। চীনারা আমেরিকার বাণিজ্য দ্রব্য বর্জনে যে সাফল্য লাভ করে, এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে তা বিঘোষিত হয়। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে সেই সংবাদ পুনরায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এই বর্জন আন্দোলনের মধ্যে একটি শিল্প-আন্দোলনের ঢেউও দেখা দিল। এই আন্দোলনটিও জন-মনের উপর অধিকার বিস্তার করতে শুরু করল। 'স্বদেশী' আন্দোলন ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছিল। এখন তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। শিক্ষিত সমাজের এক অংশ এদিকে ঝুঁকে পড়েন। তাদের সংখ্যাও ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। শিল্পের ব্যাপারে আমরা যে অসহায় সেদিকে ক্রমেই বেশী করে নজর পড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গেই এটা বুঝতে পারা গেল যে, বয়কট আন্দোলনের যা প্রকৃতি এবং এর কর্মক্ষেত্র বিস্তারের যে সুযোগ আছে, তাতে এই আন্দোলন একা দুদিকে যার জরুরীর মত কাজ

করবে। একদিকে তা শিল্প গড়ে তোলার কাজ করবে, অন্যদিকে আবার তা রাজনৈতিক কাজেও লাগবে।

আমাদের আলোচনার বৈঠকগুলিতে বেশ কয়েকদিন ধরে উৎকণ্ঠিত আগ্রহ নিয়ে এই বয়কটের ভাব ধারণা নিয়ে আলোচনা হয়। এই পর্যালোচনাকালে আমাদের মধ্যে একটি সুন্দর ঐকমত্য গড়ে ওঠে। আমরা বুঝতে পারলাম যে সে সময়ে জন-মনের অবস্থা যেভাবে দানা বেঁধে উঠেছে তাতে বয়কট আন্দোলন সাধারণভাবে জনগণের সমর্থন লাভ করবে। আমাদের এই পূর্ব ধারণা যে যুক্তিযুক্ত হয়েছিল আন্দোলনের ফল পরিণতিই তা পরিপূর্ণভাবে প্রমাণিত করেছে।

এই বয়কট আন্দোলনকে সমর্থন করার ব্যাপারে কেবলমাত্র একটি বিষয় নিয়ে একটুখানি আপত্তির ভাব দেখা দিয়েছিল এবং তা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনাও হয়েছিল। বিষয়টি হল, আমাদের ইংরেজ বন্ধুরা এই আন্দোলনকে কি চক্ষে দেখবেন। তারা কি একে সমর্থন করবেন? আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন? তারা কি এই আন্দোলনকে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্বেষ ঘোষণা বলে মনে করবেন না? ইতি পূর্বে আমি যতদূর লক্ষ্য করেছি তাতে বলা যায় যে এই কলকাতায় এমন অনেক ইংরেজ আছেন যারা দেশ বিভাগকে এবং যে অবস্থায় ও যেভাবে তা করা হয়েছে, তা সমর্থন করেননি। তারা আমাদের পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং আমাদের কাজে নৈতিক সমর্থন জানিয়ে আসছেন। আমাদের মনে এরকম একটি ভাবনা ছিল যে আমরা যেন এমন কিছু না করি যার ফলে তারা বিরূপ হতে পারেন, বরং যাতে তাদের সহানুভূতি পেতে পারি আমরা সে রকম কাজই করে যাব। কারণ, তাদের সহানুভূতি অনেক সময়ই আমাদের খুব সাহায্য করেছে। তাছাড়া, আরও একটা ভাবনার বিষয় ছিল। তাহলে এই যে আমরা তার সরকারের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ জনমতের কাছে আবেদন করতে যাচ্ছি। এটা আমাদের বেশ জানা ছিল যে লর্ড কার্জনের ইচ্ছিয়া অফিস তাদের সব-শক্তি দিয়ে চেষ্টা করবে যাতে দেশ তাদের যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তার যেন কোন রকম নড়-চড় না হয়। এই আন্দোলনকে ব্রিটিশ জন-সাধারণ কি চক্ষে দেখবে সে সম্পর্কে আমাদের মনে একটা প্রশ্ন ছিল।

এই জন্যই গোড়ার দিকে এই আন্দোলন ব্রিটিশ-বিরোধী ছিল না। এমন কি পরবর্তীকালেও যখন আন্দোলন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল, তখনও তা ব্রিটিশ বিরোধী হয়নি—যদিও সরকারী মহলের সমালোচনা করা আন্দোলনকে ব্রিটিশ বিরোধী বলে প্রচার করতে চেষ্টা করেছে। আমরা ব্রিটিশ পক্ষের মতামত কী হতে পারে তা যাচাই করে দেখতে উদ্যোগী হলাম। এখানকার ইংরেজরা নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে বেশী ভাল করে তাদের নিজেদের দেশবাসীর মেজাজ-মর্জি ও মতামত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন। ব্রিটিশ জনগণের কাছে দেশ বিভাগ যাদের জন্য আবেদন করতে যাচ্ছি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করে—এর চেয়ে মূর্খতা আর কি হতে পারে? দেখা গেল যে আন্দোলনের সংগঠকদের সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। তারা নির্বোধের মত এমন কাজ শুরু করতে গেলেন না যাতে ব্রিটিশ জনমত তাদের আবেদনের প্রতি কর্ণপাত না করতে পারে।

তাই টাউন হলের সভায় এ বিষয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তা এমন ভাষায় রচিত হল যাতে বোঝা গেল যে তারা সাবধানতা ও সতর্কতার সঙ্গে এ কাজে এগোতে চান এবং এমন কোন মহলকেই ক্ষেপাতে চান না যাদের আনুকূল্য তারা লাভ করতে পারেন। কয়েকজন ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করে তাদের মন বুঝবার ভার আমাকে দেওয়া হল। বুঝবার বিষয় হল, তারা এ রকম কোন প্রস্তাব গ্রহণের পরামর্শ দেন, কি না এবং যদি তারা সপক্ষে মত দেন, তা সে প্রস্তাবের বক্তব্য কি রকম হওয়া উচিত। আমি তাদের সঙ্গে যে যোগাযোগ করেছি, তা ছিল গোপন ব্যাপার। তাই এত দিন পরেও সেই গোপনীয়তা রক্ষা করে তাদের নাম প্রকাশ করা উচিত হবে না। কিন্তু তারা সকলেই—একজনও বাদ ছিলেন না—প্রস্তাবিত কার্যক্রম গ্রহণের পক্ষেই পরামর্শ দিলেন। এই প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে গ্রহণের জন্য মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্যের বাড়ীতে শেষ বৈঠকটি বসে।

(চলবে)

বিপ্লবীর জীবন দর্শন

॥ দুর্গেশ ভট্টাচার্য্য ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাবা ক্রমশঃই অস্থির হয়ে উঠতে লাগলেন। তার একটা ভয় হয়ে উঠল—তবে কি এদের লেখাপড়া হবে না, খাওয়া-দাওয়া জুটবে না—অনাহারে মরতে হবে—এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে ক্রমশঃই বাবার শরীর খারাপ হয়ে যেতে লাগল।

এমনি করে যখন দিন কাটছিল, তখন হঠাৎ একটু আশার আলোক দেখা দিল—আমার বড়দা, নরেশ ভট্টাচার্য্য টেলিগ্রাফ অফিসে একটি চাকুরি পেয়ে গেলেন—তবে এটা চাকা সহরে নয়—আসানসোল অফিসে। দাদা আর বিলম্ব না করে সেখানে চলে গেলেন। বাকা আর খাওয়া খরচা চালিয়ে আমাদের অন্য কিছু সাহায্য তিনি করতে পারতেন না। কাজেই আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই প্রায় রয়ে গেলাম।

নানা দুশ্চিন্তায়, অভাব অনটনে বাবার শরীর ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়তে লাগল। আশায় মানুষ বেঁচে থাকে, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। বাবার সেই সীমাও যেন পার হয়ে গেল। তার রক্ত-আমাশয় দেখা দিল। প্রথম প্রথম তিনি কাউকে কিছু বললেন না। ধীরে ধীরে রোগটা যখন বেড়ে গেল, তখন আর গোপন রাখা সম্ভব হল না। প্রকাশ হয়ে পড়ল সবই, কিন্তু ভালো চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য তখন আমাদের ছিল না। আমাদের কোন প্রকারে কায়ক্লেশে ভাত খাওয়া চলছিল মাত্র—আজ ঘটিটা কাল বাটিটা বিক্রি করে। এ অবস্থায় বাবা কিছুতেই ডাক্তার আনতে দিলেন না—এক ফোঁটা ঔষধও খেলেন না। সেই সময় রক্ত আমাশয় একটা শক্ত রোগ ছিল। আজকালকার মত ঔষধ তখন বেরোয়নি, কাজেই অনেক লোক তখন এ অসুখে মারা যেত।

ঔষধ না খাওয়ার ফলে বাবার রোগ ধীরে ধীরে বেড়েই যেতে লাগল। অনেক অনুরোধ, উপরোধ করেও বাবাকে ঔষধ খাওয়ানো গেল না। বাবা যেন আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন। আমরা নীরবে সব কটি ভাই বাবার মৃত্যু দিনের অপেক্ষা করতে লাগলাম—নিঃসহায় বালকের মত।

বাবার কথামত বড়দাকে টেলিগ্রাফ করা হল—যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি চলে আসার জন্য। বাবা যেন শেষের কটা দিন নরেশের অপেক্ষায় বেঁচে রইলেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বাবা শুধু নরেশের কথাই জিজ্ঞাসা করলেন। ক্রমে ক্রমে সব শেষ হয়ে গেল, কিন্তু নরেশ এসে পৌঁছতে পারল না।

পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে বাবার মৃত্যু হল—না খেতে পেয়ে, বিনা চিকিৎসায়! মানুষের জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে, কিন্তু এমন ঘটনা বিরল। আমরা এতগুলো ভাই বেঁচে থেকেও বাবার মুখে এক ফোঁটা ঔষধ দিতে পারলাম না—একজন চিকিৎসক এনে দেখাতে পারলাম না। দিনের পর দিন ভুগে ভুগে তিনি মৃত্যু বরণ করলেন। অসহায় বালকের মত তার মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদিতে দেখলাম—নরেশ এল না—তাকে বোধহয় আমার শেষ কথা বলে যেতে পারলাম না—এই কথা বলতে বলতে তার শেষ নিঃশ্বাস রোধ হয়ে এল!

বড়দা এলেন—কিন্তু বাবাকে দেখতে পেলেন না। নূতন চাকুরি—ছুটি নিয়ে এদিক সেদিক থেকে কিছু টাকা সংগ্রহ করে বড়দা যখন এসে পৌঁছলেন, তখন বাবা আর ইহজগতে নেই! অধীর হয়ে দাদা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। তাকে এ সময়ে সান্ত্বনা দেবার মতই বা কে ছিল? কাঁদতে কাঁদতে অধীর হয়ে দাদা মেঝেতেই জ্ঞান হারালেন।

(চলবে)

(Contd. from 2nd cover)

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Dist—WEST DINAJPUR		
Bardhan Smt. Ananta Prova w-o Late Surendra Nath	P. O & Vill Subongonj Raigunj	100	30. 9. 78
	Dist—JALPAIGURI		
Roy Smt. Taru Bala w-o Late Jatin Roy	Ukilpara, Jalpaiguri Town	100	1. 10, 76
	Dist—DARJEELING		
Poddar Smt. Putolimaya Devi (Freedom Fighter) w-o Late Saraju Prosad Poddar	Manteriot Rd. P.O. Kurseong	400	1. 10. 76
Paul Raimohan	Qr. No. 47B, Mahananda Colony P. O. Prodhannagar, Darjeeling	200	1. 4. 76
Ghose Bankim Chandra	College Para (Welf) P. O. Siliguri	200	15. 8. 72
	Dist—BANKURA		
Dawn Smt. Nandarani w-o Late Bijoy Krishna Dawn	P. O. & Vill Indas	150	31. 1. 79
Hazra Smt. Kalidasi w-o Late Amarendra Krishna Hazra		200	1. 12. 73
	Dist—PURULIA		
Mahato Khudiram	Nathurdih, P. O. Majhaira	200	1. 10. 76
	Dist—MURSHIDABAD		
Gupta Smt. Ashalata w-o Late Nityananda Gupta	71/1 L, Nirupama Devi Road P. O. Bishnupur		

RgedNo. R. N .24511/71

Biplabi Bangla
Phone : 34-1795

Regd. WB/NC 77

বার্ষিক :—গভাক ১৫.০০ টাকা

ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা

মূল্য—৩০ পয়সা

C/36

6 JUN 1979

— সম্পাদক মণ্ডলী —

শ্রীঅনাদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীঅরুণচন্দ্র সেন, শ্রীপুলিন চ্যাটার্জী।

সম্পাদক—শ্রীসাতি শরণ রায়চৌধুরী

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতার—শ্রীনন্দগোপাল পাল।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীশীতল গুহ।

বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বন্ধুচরণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

বিপ্লবী বাঙলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ১লা আষাঢ়, ১৩৮৬ ১৬ই জুন, ১৯৭৯	৩৪, ৩৫ সংখ্যা

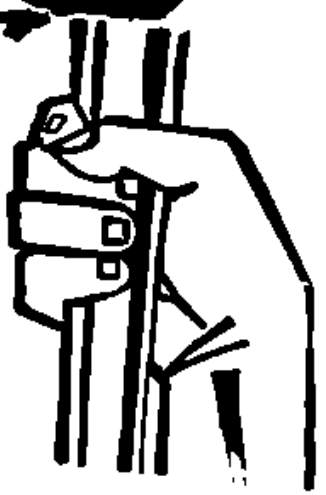

এই সংখ্যায়

কলংক!
। সম্পাদকীয় ।

অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ গড়ার উপায়
। শ্রীকমীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক বলিনী মোহন দাশগুপ্ত ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস
। ক্ষীরোদ দত্ত ।

গ্রন্থ আলোচনা

'দুর্গতির আগে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক'

—রবীন্দ্রনাথ

প্রবীণ বিপ্লবীর পত্র

জগদীশ,

আশা করি ভাল আছ। আমার শরীরটা একেবারেই ভাল যাইতেছে না। তার উপরে Operation Marichjhanpi র খবর পাইবার সময় হইতে কেমন যেন অবশ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। অর্ধ শতাব্দীর বেশী আগে মনের অবস্থা আর একবার এই রকমই হইয়াছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের খবর পাইয়া। তখন বয়স ছিল তরুণ। দেহে ও মনে প্রচণ্ড জোর ছিল। সঙ্কল্প কঠোরতর হইয়াছিল—ওই জানোয়ারগুলাকে খেদাবার জন্য। সঙ্কল্প গ্রহণ এখন বয়সের চাপে অর্থহীন হইয়া গিয়াছে। খবরের কাগজে যখন শুনিলাম ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সাহেব রেডিওগ্রাম পাঠাইয়াছে যে কার্য সম্পূর্ণ সুসম্পন্ন, তখন জেনারেল ডায়ারের সদম্ভ উক্তির কথাই বার বার মনে পড়িয়াছে। ঠিক যেন একই চিত্র। হতাশা এবং অবসন্নতা কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। প্রমোদ, জ্যোতি, রাধিকা মহাশয়দের উল্লাসও সে সময়কার ইংরেজ কর্তাদের উল্লাসের মতই শুনাইতেছে। সে সময়টার কথা তোমাদের মনে থাকার কথা নয়—তখনও তোমরা নাবালক। কিন্তু আমার অত্যন্ত স্পষ্ট মনে আছে এবং স্পষ্ট স্মরণ করিতে পারিতেছি। অমানবিক বর্বরতা মৃত্যুর দুয়ারে দাড়াইয়া সহ্য করিতে হইতেছে। কি আর লিখিব।

একটা কথা মাঝে মাঝে মনে হয়। বর্বরতা অনেক ক্ষেত্রে দুর্বলতার লক্ষণ। বর্তমান ক্ষেত্রে আমার তাই মনে হয়। সংগ্রামের কথা ওরা খুব বেশী বলে, কিন্তু সংগ্রামের ঐতিহ্য ওদের কিছুই নাই। শেষ পর্যন্ত ওরা টিকিবে না। অন্য কেউ নাই বলিয়াই ওরা উঠিয়াছে। বন্যার সময় ওদের অনেকের যে চেহারা দেখিয়াছিলাম সেটা ধীরে ধীরে যেন মিলাইয়া যাইতেছে। কিন্তু অন্য উৎকৃষ্টতর কেউ নাই। তোমার ইন্দিরা নির্ভরতাকেও আমি সমর্থন করি না। তথাপি তোমাকে আপন মনে করি বলিয়াই শেষ দিনের মনের কথা লিখিলাম—

ইতি—

সম্পাদকীয়—

কলংক !

ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারের প্রায় দেড় বছরের শাসনকালের মধ্যে গত ছ'মাসে বেশ কয়েকটি বড়ো রকমের হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলো, যা বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বামফ্রন্ট তথা সি. পি. এম. দল ও তাঁদের সরকারের প্রতি রাজ্যের সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত 'ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা বিল' নামক একটি বিলকে কেন্দ্র করে। ত্রিপুরা আদিতে ছিল উপজাতি অধ্যুষিত, এখানকার রাজাও ছিলেন উপজাতি শ্রেণীর। দেশবিভাগের পর, এই রাজ্যটির চারপাশের এলাকা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় দলে দলে বাঙালী, হিন্দু ও খ্রীষ্টান উদ্বাস্তুরা ময়মনসিং, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এখানে চলে আসেন এবং বন কেটে বসত করেন। কালক্রমে, এই উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যায় গরিষ্ঠতা লাভ করে এবং উপজাতিরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েন। এই সংখ্যালঘু উপজাতি সম্প্রদায় কোন কোন ক্ষেত্রে বাঙালী মহাজন দ্বারা শোষিত হলেও বাঙালীদের সংস্রবে সার্বিকভাবে তাঁদের উন্নতিইহয়। এবং শোষণ থেকে তাদের রক্ষার জন্য কংগ্রেস সরকারের আমল থেকেই বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালান হয়।

এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার অনেক প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু ক্ষমতাসীন হয়ে তাঁদের জন্য বিশেষ কিছু করেন নি। পূর্বোক্ত বিলের মাধ্যমে তাঁরা এই সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টি করতে চাইলেও উপজাতিদের স্বার্থ এতে কতটা রক্ষিত হবে তা বিতর্কের বিষয়, কারণ বর্তমানের উপজাতিরা দীর্ঘ দিনে প্রায় বাঙালীই হয়ে গেছেন। কিন্তু ত্রিপুরার বাঙালী উদ্বাস্তুরা, এই বিল রাজ্যের সংহতি ও শান্তি বিনষ্ট করবে বলে আশংকা করছেন। তাঁদের মতে, এর দ্বারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিপন্ন হবে এবং বাঙালী উদ্বাস্তুদের আরো একবার উদ্বাস্তু হতে হবে। এই আশংকার যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতিও এই মতই পোষণ করেন, পরন্তু, তাঁদের ধারণা রাজ্যের সি. পি. এম. দল এই বিলকে সন্ত্রাস সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে এবং এর দ্বারা প্রকৃত সমস্যার কোন সমাধান হবেনা।

'আমরা বাঙালী' নামক একটি রাজনৈতিক দল বাঙালী উদ্বাস্তুদের সমর্থনে ও এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামায় গত কয়েক মাসের সংঘর্ষগুলি ঘটেছে—যার মধ্যে কয়েকটি পুলিশের সঙ্গে ও অধিকাংশই সি. পি. এম দলের সঙ্গে। সাম্প্রতিক তেলিয়ামুড়ার সংঘর্ষে এপর্যন্ত ১৬ জন নিহত ও ৫০ জন আহত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এই ঘটনাকে নিন্দা করে 'আমরা বাঙালী'কে 'বাঙালীর কলঙ্ক ও শত্রু এবং সকলের শত্রু বলে

অভিহিত করেছেন। অথচ এই মহাজ্ঞানী জ্যোতি বসু ও তাঁর দলই মাত্র কয়েক বছর আগে ডঃ বিধান রায়ের আমলে দণ্ডকারণ্যে বাঙালী উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন করেছিলেন। এই জ্যোতি বসুর পূর্বসুরীরাই 'পৃথক পাকিস্তান' রাষ্ট্রের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন দেশবিভাগের পূর্বে। সাম্প্রতিক মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুনিধনও এই জ্যোতি বসু ও তাঁর দলেরই ঘৃণ্যতম নিষ্ঠুরতার জলন্ত নজীর। আজ বাঙালী উদ্বাস্তুর স্বার্থে, বাঙালীর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের আদর্শে একটি দল যখন আন্দোলনে নেমেছে তখন একদিকে সি পি, এমের ঠেঙাড়ে বাহিনী সেই আন্দোলন দমনের নামে ত্রিপুরায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে তাদের মহান নেতা জ্যোতি বসু সাংবাদিকদের কাছে আন্দোলনকারীদের 'বাঙালীর শত্রু, ও কলঙ্ক' প্রভৃতি বলে নিন্দা করেছেন। সত্যই কি বিচিত্র এই মার্কস্‌বাদী রাজনীতি তথা সি, পি, এমের কার্যকলাপ! কতো অনায়াসে এঁরা নিজেদের মুখোস পাল্টান! আমরা শুধু দেশবাসীকে আহ্বান জানাই—আপনারাই বিচার করুন, কারা প্রকৃতপক্ষে বাঙালী জাতির কলঙ্ক! বাঙালীর স্বার্থে যাঁরা আজ আন্দোলনে নেমেছেন তাঁরা না বাঙালী উদ্বাস্তুদের দুঃখে এককালের বিগলিত প্রাণ ও তাঁদেরই বিরুদ্ধে এই বর্তমানে সংহার-মূর্তি বামফ্রন্ট তথা সি, পি, এম দল?

অমরলোকে বিপ্লবতাপস স্বদেশ নাগ

অনুশীলন সমিতির সভ্য বিপ্লবী স্বদেশ নাগ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রলেন গত বৃহস্পতিবার (৭ই মে, ১৯৭৯) কলকাতার পি. জি. হাসপাতালে। ছাত্রাবস্থা থেকেই বিভিন্ন সংগঠনমূলক কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। বিপ্লবগুরু ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ)-এর সহকর্মী হিসাবে এই বিপ্লবপথিক ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ও অন্যান্য রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯৩২ সাল থেকে একাধিকবার জেল ভোগ করেন। দেশ বিভাগের পর বিপ্লবী স্বদেশ নাগ বাংলাদেশেই থেকে যান এবং সেখানকার বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত হয়ে পাক-সরকারের নির্যাতনের শিকার হন। আজীবন অকৃতদার এই অক্লান্ত বিপ্লবতাপসের অমর আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাই।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিশ্বলাল কাপুর নামে জনৈক শিখ আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে আসার সময় প্রথমে সাংহাই আসেন। সাংহাইয়ের জার্মান কর্তৃপক্ষ এবং পরে বেশ কিছু টাকা ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য ব্যাঙ্ককে জার্মান কনসালের নিকট পাঠান। এই টাকার কিছু অংশ বার্মা প্রবেশকারী শিখদের জন্য ব্যয় হয়। বাকীটাকা ব্যাঙ্ককের এক উকীলের হাত দিয়ে বাঙলার বিপ্লবীদের নিকট পাঠানো হয়। কিন্তু এই বাঙালী বিপ্লবী সমস্ত বিষয় ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রকাশ করে দেন।

বিপ্লব প্রচেষ্টার বহির্ভারতীয় অধ্যায় এবং আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, জার্মানিতে বার্লিন কমিটির উদ্যোগে ইন্ড জার্মান ষড়যন্ত্রের সঙ্গেই জড়িত ভারতের হতীন্দ্রনাথের বাঘেশ্বর সংগ্রামে আত্মদান। আবার—হরদয়ালের উদ্যোগে আমেরিকা ক্যুবতে যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, রাসবিহারীর নেতৃত্বে অনুশীলন চক্রনগর এবং গদরের বিপ্লবীদের মিলিত প্রচেষ্টা এবং সৈন্য বাহিনীদের বিদ্রোহী করে তাদের সাহায্যে ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়াস তাই পরিণতি।

রাসবিহারীর উদ্যোগে সমগ্র ভারতে অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি পর্ব শেষ হয়েছিল, দিন খন পর্যন্ত নির্ধারিত হয়ে ছিল। ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ১৬টি বিদ্রোহী সৈন্য দল বিদ্রোহ ঘোষণা করবে স্থির ছিল। এই বিদ্রোহের চেষ্টা শুধু মাত্র যে ভারতের অভ্যন্তরে নিহিত ছিল তা নয়, ব্রহ্মদেশ এবং সিঙ্গাপুর প্রভৃতি পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য বাহিনী ছিল তারাও একযোগে বিদ্রোহ করবে স্থির ছিল। ভারতে এই বিদ্রোহ কার্যে পরিণত হয়নি। কিন্তু সিঙ্গাপুরে এই ব্যর্থতার শোচনীয় পরিণতি 'মর্মান্তিক'।

সিঙ্গাপুর কেল্লায় এই সময় পঞ্চম শক্তির তিনটি বাহিনী মোতায়েন ছিল। শিখ ও পাঠান নিয়ে এই সৈন্য-দল গঠিত, গদর আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ আমেরিকা হয়ে ভারতে আসা-যাওয়ার পথে এই সৈন্য বাহিনীতে ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলবার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনী-গুলি যেইদিন বিদ্রোহ করবে সিঙ্গাপুরে পঞ্চম বাহিনীও তাদের সঙ্গে যোগ দেবে, পঞ্চমবাহিনীর নেতৃবৃন্দ এই ব্যাপারে তাদের সম্মতি জানান। ফলে বিদ্রোহের দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল পঞ্চম বাহিনীর রাজ আনুগত্যও ততই শিথিল হতে লাগল, তাদের অবাধ্যতা এবং নিয়ম শৃঙ্খলতার প্রতি উদাসীনতায় রেজিমেণ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দণ্ডনীয় হতে লাগল।

২১শে ফেব্রুয়ারীর দুই একদিন আগের কথা সেইদিন ছিল সৈন্য বাহিনীর কুচকাওয়াজের দিন। সৈন্যদল কুচকাওয়াজের ক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলো বাহিনীর সুবাদার মেজর দাতীখাঁ কুচকাওয়াজে উপস্থিতই হলেন না। কিছু সংখ্যক সৈন্য অন্যদিনের মত শপথে টহল দিতে বেরিয়ে পড়ল, কেউ বা বাজারে চলে গেল।

সৈন্যদলের এ ব্যবহারে শ্বেতাঙ্গ অফিসারগণ বিস্মিত হলেন। সুবাদার মেজর দাতিখাঁর ডাক পড়ল অফিসে। তিনিও বুঝলেন কেন তাকে ডাকা হয়েছে। তিনিও প্রস্তুত হয়েই অফিসে ঢুকলেন। অফিসে দুজন শ্বেতাঙ্গ অফিসার তিনি নিয়ম অনুযায়ী তাদের অভিবাদন করলেন না। অফিসারদ্বয় ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। একজন চীৎকার করে বললেন, "তুমার কা বাচ্চা প্যারেড নে ক্যাও নহি আয়া?" বলামাত্র কোমর থেকে রিভলবার বের করে গুলি চালালেন দুজন অফিসারই নিহত হলেন। সুবাদার মেজর দাতি খাঁ তৎক্ষণাৎ বাইরে এসে শিখ ও পাঠান সৈন্যদের দল ইন এর হুকুম দিলেন। অস্ত্রাগার দখল ও অস্ত্রসস্ত্র সৈন্যদলের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। এরপরে আরম্ভ হল শ্বেতাঙ্গ হত্যার পালা। কেল্লার সমস্ত ইংরেজ অফিসারকেই হত্যা করা হল। শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের হত্যা করার পরে ভারতীয় সৈন্যদল বেরিয়ে পড়ল সহরে। বেসরকারী শ্বেতাঙ্গদের অনেকে নিহত হলেন।

সিঙ্গাপুরের তিনদিকে সমুদ্র। একদিকে খাঁড়ি, খাঁড়ির ওপারে জহরবাক্ রাজ্য। এই রাজ্যের অধিপতি একজন মুসলমান নবাব। সিঙ্গাপুরের সঙ্গে এই মূল ভূখণ্ড একটি সেতুর দ্বারা যুক্ত। শিখ ও পাঠান সৈন্যদল প্রথমেই সমস্ত সহর দখল করে নিলেন। তারা স্থির করলেন জহরবাক্ রাজ্যের অধিপতি মুসলমান নবাবকেই মালয় ও সিঙ্গাপুরের 'স্বাধীন শাসক' বলে ঘোষণা করা হবে। পরদিন সকালবেলা একদল সিপাহী সেতু পেরিয়ে ওপারে চলে গেলেন নবাবকে এই শুভসংবাদ জানাবার জন্য। নবাব সমস্ত সংবাদ গম্ভীরভাবে শুনলেন। এমনভাব দেখালেন যে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি সংবাদদাতা বিদ্রোহী নেতাদের দ্বিপ্রহরে ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু আসলে এটা ছিল তার ফন্দী। তিনি স্থির করেছিলেন নিমন্ত্রিত সৈন্যদল যখন দ্বিপ্রহরে আহারে বসবে তিনি বিনা যুদ্ধে সকলকেই গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করবেন। পূর্বাহ্ণেই সমস্ত ব্যবস্থা তিনি ঠিক করে রাখলেন।

দ্বিপ্রহরে যথারীতি বিদ্রোহী নেতারা আহারে বসতেই নবাব ফোন করে যথাস্থানে সংবাদ দিলেন। নেতারা সহরের কতকগুলি ট্রাক ও মোটরগাড়ী সংগ্রহ করে রেখেছিল। তাই নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই তারা নবাব ভবনে এসে উপস্থিত হলেন। মুহূর্তের মধ্যে বিদ্রোহীদের হাতে হাতকড়া পরানো হল। ট্রাকে করে তাদের নিয়ে যাওয়া হল সিঙ্গাপুর জেলখানায়। বিদ্রোহীরা এইভাবে নেতৃহীন হয়ে পড়লেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্রোহীগণ আত্মসমর্পণ করলেন না। সিঙ্গাপুর কেল্লা যথারীতি বিদ্রোহীদের দখলেই রইলো।

তৃতীয় দিন সকালের দিকে এক রণ-জাহাজ এসে উপস্থিত হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফরাসী এক ইংরেজ এক সঙ্গেই লড়েছিল। সিঙ্গাপুর সহরে এ পর্যন্ত সাদা আইন বলবৎ ছিল কিন্তু শ্বেতাঙ্গগণ ছিলেন সমুদ্র মধ্যে জাহাজে। রণ-জাহাজ আসতেই তিন ঘণ্টার জন্য সাদা আইনের বিরতি ঘোষণা করা হল। জাহাজের সৈন্যদল ব্যাণ্ড বাজিয়ে মার্চ করে কেল্লার দিকে অগ্রসর হল। কেল্লায় শিখ ও পাঠান সৈন্যরা প্রথমদিকে তাদের কোন বাধা দিলেন না। কিন্তু ঢালু পথে ধাক্কাধাক্কি আসতেই তারা প্রচণ্ড বেগে গুলি বর্ষণ আরম্ভ করলেন। কত সৈন্যরা প্রায় সকলেই হত বা আহত হলেন। এরপরে সিঙ্গাপুর কেল্লা আরও তিনদিন বিদ্রোহীদের হাতে ছিল। ষষ্ঠ দিনে একখানি জাপানী যুদ্ধ জাহাজ এসে উপস্থিত হল। কিন্তু তারা রণবাহিনীর মত যোকাবিলা করল না। দূর থেকেই কামান দাগিয়ে তারা অগ্রসর হতে লাগল। কেল্লার সিপাহীরাও কামানের গোলার এর প্রত্যুত্তর দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু কেল্লার নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই তখন বন্দী। বিদ্রোহীদের চেষ্টায় বিশেষ ফল হল না। জাপানীরা নির্ভুল গোলা বর্ষণে দুর্গ প্রাচীর ভেঙে এগিয়ে আসতে লাগল। দুর্গের শিখ ও পাঠান সৈন্যদল এবারে বুঝলেন তাদের প্রতিরোধ চেষ্টা অর্থহীন। তাই তারা সাদা নিশান উড়িয়ে দিলেন। জাপানীবাহিনী পতাকা উড়িয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে দুর্গে প্রবেশ করল। কিন্তু এই আত্ম-সমর্পণের আগে জাপানী কামানের গোলা বর্ষণে ভারতীয়দের কম সৈন্য হতাহত হয়নি। ভারতে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছে এই মনে করেই সেদিন তারা প্রাণ দিয়েছিল। কিন্তু মাতৃভূমি থেকে বহুদূরে ভারতের এই বীর সন্তানদের কাহিনী ভারতে পৌঁছল না। কেউ জানল না তাদের বীরত্বের কথা। স্বাধীনতার জন্য তাদের এই আত্মবলির কাহিনী স্বাধীনতার ইতিহাসে বহুদিন পর্যন্ত স্থান পায়নি।

ঐদিনই পরে একখানি সৈন্য বোঝাই ব্রিটিশ সৈন্য জাহাজ সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছল। তারাই জাপানীদের হাত থেকে কেল্লার দখল নিল। ভারত থেকে বহুদূরে সিঙ্গাপুরে ভারতীয় সৈন্যদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রচেষ্টাও ভারতে ১৯৪৫ ফেব্রুয়ারীর স্মৃতিই বহন করছে। তাদের এক প্রচেষ্টা সেদিন সফল হয়নি, কিন্তু তবুও তারা সেদিন মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছিল এটা মিথ্যা নয়।

(চলবে)

Freedom Struggle and Anusilan Samity

গ্রন্থের আলোচনা

অনুশীলন সমিতির ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে সম্পাদক শ্রীশৈলেশ চন্দ্র ঘটক মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত Freedom Struggle and Anusilan Samity গ্রন্থটি পাওয়ার প্রতীক্ষায় ছিলাম। সম্প্রতি জনৈক বন্ধুর সৌজন্যে বইটি পেয়ে পড়ার সুযোগ পাওয়ায় সৌভাগ্য মনে করছি। বিপ্লবী বন্ধু ও অনুশীলন দরদীদের দৃষ্টিগোচরে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বইটি প্রাথমিক পাঠে আমার প্রতিক্রিয়া সাধারণভাবে প্রকাশ করা হল।

অনুশীলন সমিতি একটি গতিশীল গোপন বিপ্লবী সংস্থা। সমিতির জন্মকাল হতে স্বাধীনতা লাভের শেষ সংগ্রাম পর্যন্ত সমিতির কার্যকলাপ অধিকাংশই গোপন। দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী দলের রণকৌশল ও নেতা পরিবর্তন হয়েছে। সংগ্রামী দেশে ইহাই স্বাভাবিক। কোন আন্দোলনের আদি নেতা আন্দোলনের সকল সময়ের নেতা থাকেন না। যে কোন আন্দোলন গোড়ায় যেভাবে আরম্ভ হয়, যেসকল লোক দ্বারা পরিচালিত হয়, এমন কি যে উদ্দেশ্য, যে আদর্শে, তা শুরু হয়, ক্রমে তার বহু পরিবর্তন ঘটে, এবং পূর্বে যেসব ব্যক্তি যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হতেন, পরে সে যোগ্যতার মাপকাঠিতে সরে পড়তে বাধ্য হন এবং নতুন নেতৃত্ব দায়িত্ব গ্রহণ করে।

রামমোহন—বঙ্কিম—বিবেকানন্দ যে ভাবধারায় বাংলাকে সঞ্জীবিত করেছিলেন তাহাই স্বদেশী আন্দোলনরূপে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ, কান্তকবি, রজনীকান্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, মনমোহন বসু, গোবিন্দলাল রায় প্রভৃতির লেখায় যে দেশাত্মবোধ দেখা দেয় তাহাই বাংলার যুবকদের বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেয় স্বতঃস্ফূর্ত দেশাত্মবোধের আবেগে বিপ্লবে ঝাঁপাইয়া পড়ে। কেহ পথ দেখায় নাই, পথই পথ চিনাইয়াছে। কর্মীর পর কর্মী এই পথে ছুটিয়াছে। নেতা পিছাইয়া পড়িলে স্বাধীনতা আকাঙ্খাই কর্মীদের পথ নির্দেশ দিয়াছে। ইহাই জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ।

এই স্বাভাবিক বিকাশেই বিপ্লবী আন্দোলনের রূপ পেয়েছে অনুশীলন সমিতির ধারাবাহিক বৈপ্লবিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে। ১৯০২ সালের ২৯শে মার্চ দোল পূর্ণিমার দিন অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯০২—১৯০৮, ১৯০৮—১৯১২, ১৯১২—১৯১৮, ১৯১০—১৯৫০ এবং পরবর্তী কাল এই কয়টি স্তরে অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক কার্যকলাপ নয়া মোড় নিয়েছে এবং বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানের রূপ ও দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়েছে। বইটিতে এই পরিবর্তনের গুরুত্ব তেমনভাবে প্রকাশ পায় নাই। এমন কি বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে গণ অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরা হয় নাই। রাসবিহারীর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল পেশোয়ার

হ'তে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত ১৯টি মিলিটারী ক্যান্টনমেন্টের সৈন্যবাহিনী, বাংলার ও ভারতের অন্যান্য স্থানের বিপ্লবীরা। বিদেশ হতে ভারতীয় বিপ্লবীরা এই অভ্যুত্থানে সামিল হয়েছিল বিভিন্নভাবে সমুদ্রপথে ও হাঁটাপথে। সৈনিক কৃপাল সিং এর বিশ্বাসঘাতকতায় সারা ভারতব্যাপী স্বাধীনতা ঘোষণা করা সম্ভব না হলেও সিঙ্গাপুরে 15th Mahammadan platoon এবং 35th Sikh regiment স্বাধীনতা ঘোষণা করে প্রায় এক সপ্তাহ নিজেদের আসন কায়েম রেখেছিল। বইটিতে এই দুই রেজিমেন্টের অভ্যুত্থানকে সারাভারতব্যাপী অভ্যুত্থানের অংশরূপে দেখান হয় নাই। ইহাতে বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানের দীপশিখা উজ্জ্বল করা হয় নাই, অনুশীলনের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ম্লান করা হয়েছে।

১৯২৪ সালে অনুশীলনের ব্যাপকভাবে জন সংযোগ কর্মপন্থা বলে রূপ পায় ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এবং All Bengal Student Association (A. B. S A.) এর ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে। বইটিতে A B S A এর ভূমিকা ন্যায্য মূল্য পায় নাই, অথচ ভারতে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনে এম, এন, রায়ের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রতিফলিত করা হয়েছে। এই সমস্ত বিচ্যুতির কারণ বইটি লেখার প্রচেষ্টায় বিপ্লব দরদী, দেশের হিতকামী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি জড়িত ছিলেন না, যদিও যাঁদের দ্বারা বইটি লেখা হয়েছে, তাঁরা অত্যন্ত গুণী ও জ্ঞানী এবং তথ্য সংগ্রহে ও পরিবেশনে পরিশ্রমের ও অধ্যাবসায়ের ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু গোপন বিপ্লবী দলের কর্মকাণ্ড বর্ত্তমান জনমানসে তুলে ধরতে হলে চাই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী যার দ্বারা আন্দোলন জনগণের নিকট শিক্ষণীয় ও আদর্শ হয়। বিপ্লব আন্দোলনের যথার্থ কর্মপ্রচেষ্টা প্রমাণ করা সব সময় সম্ভব নয়। গোপন কার্য্যে অতিরঞ্জনও সম্ভব, অতি নিন্দাও সম্ভব। কাজেই যে সমস্ত ঘটনায় দেশবাসী দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হবে সেই সমস্ত ঘটনাই উজ্জ্বল করে ধরা উচিত। লেখকদের এই দিকে দৃষ্টিভঙ্গীর ত্রুটি ছিল। যেমন :-

বইটির ৬৫ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে Barin's clash with Jatin took such a turn that Arabinda had to come to Calcutta from Baroda in 1994 and to settle the dispute by expelling Jatin from the Anusilan Samity এই বিবৃতির নজির দাঁড় করান হয়েছে হেমচন্দ্র কানুনগোর লেখা 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা' গ্রন্থে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে 'বাংলায় বিপ্লব বাদ' প্রণেতা বিশিষ্ট লেখক নলিনী কিশোর গুহের মন্তব্য 'এই পুস্তকে সাধারণভাবে বাংলার বিপ্লবীদের সম্পর্কে বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে এবং সেই সূত্রে বাঙ্গালী জাতি ও বাংলার সমাজ সম্পর্কে যে হতাশার চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা বহুলাংশে একদেশদর্শিতায় বিকৃত। সমগ্র আন্দোলনের সহিত পরিচিত না থাকায় উহা অসত্য বলিয়াই বিবেচিত।'

৪০-৪১ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে unable to withstand the brutal torture Khudiram was compelled to give clue to the police acting on which the latter wounded up almost all persons connected with Arabinda and

Barin on 2 May 1908 (Ref Book Upendranath Banerjee—নির্বাসিতের আত্ম কথা) উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় নির্ভর করে ক্ষুদিরামের বৈপ্লবিক তিতিক্ষার উপর কটাক্ষ করা সমীচিন হয় নাই, ন্যায় সঙ্গতও নয়। শহীদের চরিত্র ম্লান ও কলঙ্কিত করার মত কোন তথ্য পরিবেশন করা বিপ্লব আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।

অনেক ভুল ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ও ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে ও তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

(১) ৯৮ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে The groups which formed a federation under the leadership of Jatindranath Mukherjee were the Shankar math group of Barisal, the group operating in Calcutta and neighbouring districts commonly known as Bepin Ganguly group, Atul Ghosh's group and Harikumar Chakraborty's group, the Sadhana Samaj of Mymensingh commonly known Suren Ghosh's group, Madaripur group led by Purna chandra Das, the north Bengal group of Jatindramohan Roy and Chittagong group এই তথ্যের কোন reference নাই Chittagong group তখন সৃষ্টিই হয় নাই।

(২) ১০১ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে The Anusilan Samity also sent Kedareswar Guha, Tarak nath Das, Abani Mukherjee, Dhirendra nath Sarkar, Suren Kar, Gopen Chakraborty, Birendranath Dasgupta for exploring the possibilities of getting arms from outside the country,

গোপেন চক্রবর্ত্তীকে সেই সময় বিদেশে পাঠান হয় নাই, বিদেশে পাঠানর মত বয়স ও তাঁর হয় নাই। অবনী মুখার্জি ১৯২১ সালে আত্মগোপন অবস্থায় ভারতে আসেন। অবনী মুখার্জি আসার পর গোপেন চক্রবর্ত্তীকে রাশিয়ায় পাঠান হয়।

(৩) ১৩১-১৩২ পৃষ্ঠায় বিপ্লবী নেতা নলিনী কান্ত ঘোষের নেতৃত্বে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের বিবরণ সঠিক পরিবেশিত হয় নাই, বাস্তবে এই সংগ্রাম আরও বীরত্বপূর্ণ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচায়ক এবং বৈপ্লবিক দৃঢ়তার ও আমরণ সংগ্রামের ইতিহাসে।

(৪) ১৮৬ পৃষ্ঠায় ১৯২২ সালে অবনী মুখার্জির ভারতে আগমনের পর অনুশীলনের সঙ্গে যোগাযোগ প্রসঙ্গে সুভাষ চন্দ্র বসুই অনুশীলন নেতা প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলীর সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করেন এ বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই।

(৫) ২৩২ পৃষ্ঠায় অনুশীলন ও যুগান্তরের মিলন প্রয়াসে যুগান্তরের যাদুগোপাল মুখার্জি ও সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ ছিলেন উল্লেখ করা হয়েছে, ছিলেন যাদুগোপাল মুখার্জি, মনোরঞ্জন গুপ্ত ও ভূপতি মজুমদার।

(৬) ১৪২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে Lalit Dutta of Dacca, Bejay Banerjee of Faridpur and Prutul Bhattacharjee of Comilla active Anusilanites also joined the ucar group which they describe as the advance group.

Lalit Dutta নামে কোন বিপ্লবী কর্মী ঢাকায় ছিলেন না। প্রতুল ভট্টাচার্যের বাড়ী ছিল ময়মনসিংহ জেলায়, কর্মক্ষেত্র ছিল প্রধানতঃ কলিকাতা Erretaতে ভুল সংশোধন করে Comilla স্থলে mymensingh করা হয়েছে।

(৭) ৩১০ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে Abani mukherjee who had been sent from India to Tokio to contact Rash Behari in Japan.

অবনী মুখার্জিকে ভারত হ'তে পাঠান হয় নাই। অবনী মুখার্জি ১৯১১ সালেই বার্লিনে গিয়ে প্রবাসী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টায় ব্রতী হন ও টকিয়োতে রাসবিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

(৮) ৩১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে It seems that Bhupati Mazumder had gone of Sanghai on receeving a call from Rash Behari who was at Sanghai at that time and was in close touch with the German consul general there.

মনে হয় sedition committee Report ভিত্তি করেই লেখক এই সিদ্ধান্তের চেষ্টা করেছেন। ইহা ঠিক নয়। রাসবিহারী বসুর সঙ্গে Bhupati Mazumder এর সেই সময় যোগাযোগের ব্যবস্থা হয় নাই। Sedition Committee নিজেদের সুবিধায় অনেক ঘটনার সমাবেশ করেছে।

সরকারী রিপোর্ট এবং বিভিন্ন লেখকের বিশেষ করে স্বাধীনতার পূর্বে প্রকাশিত পুস্তকে অনেক বিভ্রান্তিপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ আছে। এই সমস্ত ঘটনা ও তথ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো চেষ্টা হলে পুস্তকটি আরও মনঃপুত হত।

ত্রিদিববাবুর লেখা বইটির Introduction খুবই সমতাপূর্ণ হয়েছে এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবী আন্দোলনের অবদান ন্যায্য ভূমিকা পেয়েছে।

সর্বশেষ বইটি প্রকাশ করার জন্য প্রকাশককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

—গ্রন্থ সমালোচক

অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ার উপায়

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অন্যান্য জাতীয়তাবাদী শ্রমিকনেতাও ত একই নীতি অনুকরণ বা অনুসরণ করে এসেছে এবং এখনও তাই করছে নিজেদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার তাগিদে। ফলে জাতীয় ক্ষতি মাত্রা ছাড়িয়ে বর্তমানে প্রায় চরম বিপদের মুখে এসে থম্‌কে দাঁড়িয়েছে, তবু রাষ্ট্র নায়কদের এখনও চেতনা হয়নি। এই বিপদজনক অবস্থা যে ভারতে আর চলতে দেওয়া সমীচিন নয় তা অনেকেই উপলব্ধি করেছে, তবে রাষ্ট্রনায়কদের কানে কখনও যে জল ঢুক্‌বে তা বলা বড়ই কঠিন। বহির্বাণিজ্যে সুফল আশা করতে হলে উৎপাদিত মালের পড়তা খরচ এমন একটা সীমার মধ্যে রাখতে হবে যাতে অপরাপর দেশে তৈরী মালের সঙ্গে মূল্যের প্রতিদ্বন্দ্বীতায়—বিশ্বের বাজারে বিক্রেতা হিসাবে ভারতের অস্তিত্ব বজায় থাকে এবং ক্রমোন্নতি ঘটে। বাস্তব অবস্থা কিন্তু বর্তমানে এর বিপরীত এবং সে কারণে রপ্তানী বাণিজ্যে ভারত বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারছে না। এর মূল কারণ আভ্যন্তরীণ বাজারে দ্রব্যমূল্য ক্রম-বর্দ্ধমান, ফলে উৎপাদনে ক্রম-ব্যয়বৃদ্ধি এবং সাকুল্যে পড়তা খরচ সব সময়েই মাত্রাতিরিক্ত বেশী। অথচ রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার ছাড়া ও রপ্তানীকৃত মালের মূল্য বাবদ বিদেশী মুদ্রা অর্জন ব্যতিত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় করা যায় না।

ইংরাজ রাজশক্তি যখন ভারত ছেড়ে চলে যায়, তখন আমাদের সম্পদ বলতে ছিল—ভূমিজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, বিপুল মনুষ্যশক্তি সম্পদ, আর যৎকিঞ্চিৎ শিল্প-সম্পদ, এবং যৎসামান্য জলজ সম্পদ। এই ষষ্ঠ প্রকার সম্পদের সদ্ব্যবহার, সংরক্ষণ, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ, আহরণ ও ব্যবস্থাপনা যদি সুষ্ঠুভাবে আমরা একটি সুনির্দ্দিষ্ট ও যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে এতকাল ধরে করে উঠতে পারতাম, তবে নিশ্চয় আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন এক বিশেষ পর্য্যায়ে উন্নীত হ'ত যে অদ্যকার মত শতকরা চল্লিশজন মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে এখনও বাস করতে বাধ্য হতো না। ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থা সুপরিচালিত করা এখনও বাস্তবে সম্ভব হয়নি, ফলে ভূমিহীন কৃষকের দল দারিদ্র সীমার নীচে আজও বাস করে। অথচ এই কৃষকদের শ্রমশক্তি একটি বিরাট জাতীয় সম্পদ যা আজও অবহেলিত, বঞ্চিত এবং ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে আলস্যে মগ্ন। এরজন্য দায়ী রাষ্ট্রের কর্ণধাররা যাঁরা এর সম্ভাব্য প্রতিকার করতে পারেনি, যদিও এই অপচয় জাতীয় অপচয় এবং সত্যই ক্ষতিকারক। সন্তোষজনক কৃষির প্রসার এখনও হয়নি, যদিও—সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ আয়োজন বিগত কিছুকাল ধরে জোর কদমে শুরু হয়েছে। তবে আরো দৃঢ় ও বাস্তবভিত্তিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বনজ জলজ ও খনিজ সম্পদগুলি আহরণে যে প্রচেষ্টা এতাবৎকাল চালান হয়েছে তা সত্যই অকিঞ্চিৎকর ও লক্ষ্যমাত্রার অনেক নিচে। কাজেই খনিজ সম্পদ, বিশেষ করে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানে, উত্তোলনে ও তাহা

পরিজ্ঞাতকরণে আরো পূর্বে এবং আরো অধিক-মাত্রায় অনুসন্ধানে ও প্রাপ্তির পরে তার ব্যবস্থাপনায় অধিক মনোযোগী হওয়া অবশ্য করণীয় ছিল ; কিন্তু তা হয়নি বরং অবহেলা করা ও অনাগ্রহ দেখান হয়েছে।

মনুষ্য শক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহার অর্থাৎ সমস্ত কর্মক্ষম সুস্থ-সবল ব্যক্তিকে কোন না কোন কাজে নিয়োজিত করা এদেশে এখনও সম্ভব হয়নি, ফলে সীমাহীন বেকার কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা আজো এত অধিক আর সেই বেকার সমস্যাই জাতীয় অন্যান্য সমস্যার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলেই মনে হয়। এই কঠিন সমস্যা সমাধানের সাথে আরো বহু গুরুতর সমস্যাই সমাধিত হবে, যথা—অপুষ্টি, দারিদ্র, মনুষ্যশক্তির ক্রমাগত অপচয় ইত্যাদি। মনুষ্যশক্তির অকারণ অপচয়ে মানুষের অধিকারকে খর্ব্বকরা ও জাতীয় ক্ষতি স্বীকার করা হয়েছে, এর প্রতিকার এখনই চাই। তবেই জাতীয় আয়ও বাড়বে এবং মানুষও দারিদ্রের হাত থেকে মুক্তি পাবে। মনুষ্য-শক্তির সদ্ব্যবহারে ভারতীয় অর্থনীতিও শক্ত মাটিতে দাঁড়াতে সক্ষম হবে, আর দেশের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে। ভারত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এত পশ্চাদপদ কেন ? কেন বেকারের সংখ্যা কমার বদলে ক্রম-বর্দ্ধমান ? প্রতি বছরই বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলছে কেন ? এর কারণগুলির মধ্যে অন্যতম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণে ও প্রণয়নে গলদ ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং সরকারের অবিমৃষ্যকারীতা। এ ছাড়া অন্যান্য কারণের মধ্যে বিশেষ কারণ, সীমাহীন বর্দ্ধিত জনসংখ্যা যা এখনও ক্রম-বর্দ্ধমান এবং যাকে সীমিত করা কোন উপায়েই রাষ্ট্রের পক্ষে এখন বাস্তবে সম্ভব হয়নি। এই ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা সত্যই উদ্বেগের কারণ ও নূতন নূতন সমস্যা সৃষ্টির কারণ হয়েছে।

ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি বাস্তব অবস্থা ভিত্তিক না হয়ে কল্পনা প্রসূত হয়েছিল বলেই এই দুরবস্থা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আর তা ছাড়া উহা রূপায়ণেও বহু ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা গেছে। সরকারী প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি—কোথাও প্রশাসনিক অকর্মণ্যতায়, কোথাও মূল পরিকল্পনা রচনার ভুলে ও কল্পনাবিলাসে। উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি সার্থকভাবে রূপায়িত হলে কিছু না কিছু কর্মসংস্থান সম্ভব হতো ও বেকারী কমতো, কিন্তু তাও ঈপ্সিত লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছতে পারেনি। বৃহৎ বৃহৎ প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, অথচ ব্যয়ের তুলনায় কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে বেশ কম এবং পরিকল্পনার ব্যর্থতা তাতেই সূচিত হয়েছে। ছোট ছোট প্রকল্পের দ্বারা তুলনামূলকভাবে অধিক কর্মসংস্থান সম্ভব হ'তো এবং ব্যয়ের মাত্রাও তাতে কম হ'তো, কিন্তু সরকার সেদিকে যথোপযুক্ত দৃষ্টি দিতে অপারগ হয়েছে এবং ফলে সমস্যা নিরসনের পরিবর্তে নূতন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সরকারী ব্যর্থতায়। অর্থনীতি তাই বিপর্য্যস্ত ও বিপথগামী হতে বাধ্য হয়েছে, ফলে বিপদ সর্বত্র বিরাজমান। সাধারণ মানুষ আরো দরিদ্র হচ্ছে ধনিক-বণিক শ্রেণীর লোকেরা মাত্রাতিরিক্ত ধনের অধিকারী হচ্ছে এবং একথা স্বীকৃত সত্য। এই অসম অর্থনীতি ও বিরাট ধন বৈষম্য রাষ্ট্রশক্তিকে পর্য্যন্ত পঙ্গু করে দিয়েছে : ফলে রাষ্ট্রনায়করা পর্য্যন্ত উক্ত বনিক শ্রেনীর তাঁবেদারে পরিণত হ'তে চলেছেন যা দেশের পক্ষে চরম ক্ষতিকারক ও অসম্মানজনক। ধনিক-বণিকরাই প্রশাসনকে প্রভাবিত করছে আর্থিক ক্ষমতার জোরে, এমনকি সরকারও স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত বললেই সত্যভাষণ হয়। নির্ব্বাচনের সময়ে প্রত্যেক রাজনৈতিকদলই

উক্ত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দুয়ারে দুয়ারে নির্বাচনী খরচ জোগাড়ের জন্য ধর্ণা দেয় এবং নির্বাচন শেষে যে দল বা দলসমষ্টি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তারা এদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক অন্যায় ও অপরাধের পরোক্ষ শরিক হতে বাধ্য হয় এবং এই বীভৎস অবস্থার হাত থেকে কারোরই রেহাই নেই—এ কথা বাস্তব সত্য। বিগত বত্রিশ বছর ধরে এই অবস্থার সঙ্গে প্রত্যেকেই আমরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জড়িত, ফলে যা হবার তাই হয়েছে। এখনও হুঁশিয়ার হবার সময় আছে, রাষ্ট্রনায়কেরা সে দিকে সজাগ হবেন কি? ধনিক-বণিক সম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তিও রাজ্য ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারের ওপর সমান শক্তিতে কার্যকরী এখনও হয় এবং অতীতেও তাই হয়ে এসেছে। জাতীয় আয় বিগত বত্রিশ বছরে যতটুকু বেড়েছে, তার প্রায় সবটুকুই ভারতের ধনিক-বণিকদের ভোগে লেগেছে—সাধারণ মানুষ হয়ত এর ছিটেফোঁটা যৎকিঞ্চিৎ সামান্যই পেয়েছে। এই বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণেই সমস্ত শক্তি নিঃশেষে ব্যয়িতও দেউলিয়া হয়ে গেছে এবং তাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন আজও ভারতের পক্ষে সম্ভব হয়নি। রাষ্ট্রীয় শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ যেমন দরকার সেইরূপ আর্থিক-শক্তির বিকেন্দ্রীকরণও অত্যাবশ্যক এবং তা সম্ভব একমাত্র গান্ধীজির প্রদর্শিত পথে—গ্রাম স্বরাজ গঠনের মাধ্যমে, যা গান্ধীজি বারে বারে হুঁশিয়ারী দিয়ে দেশবাসীকে ও রাষ্ট্রনায়কদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন তাঁর ভাষণের ও বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে। ভারতের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সংগঠন গান্ধীজির আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের মাধ্যমেই সম্ভব; কারণ যন্ত্রের সরলীকরণ ও বর্তমান আত্ম-কেন্দ্রিক মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ছাড়া তা কিছুতেই ও কখনই সম্ভব নয়। যৌথ চিন্তা, যৌথ ঘামার, যৌথ উদ্যোগ ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা এবং যৌথ জীবন যাত্রার শিক্ষা গ্রহণ না করা পর্যন্ত ভারতের গ্রামগুলিকে স্বয়ম্ভর করা যাবে না এবং সুখী ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র গড়া সুদূরপরাহত হবে। সহনশীলতা, পরার্থপরতা, কর্মপটুতা, সংহতি স্বজাত্য বোধ ও প্রীতি, সার্বিক চিন্তা, স্বদেশ প্রেম, সামগ্রিক দৃষ্টি, নিয়মনিষ্ঠা, মিতব্যয়িতা, শ্রমনিষ্ঠা, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং দেশরক্ষায় সদাজাগ্রত মনন-শীলতা প্রভৃতি সদগুণের অধিকারীরাই বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসন পায় এবং সে কারণে সদ্য-স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতবাসীদের উক্ত সদ্‌গুণের অধিকারী হতেই হবে। তবেই এই বিশাল দেশ তার বিপুল জনসংখ্যাকে গ্রামস্বরাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থনৈতিকক্ষেত্রে স্বাবলম্বী ও স্বয়ম্ভর করে তুলতে সক্ষম হবে। রাষ্ট্র ও জনগণকে একই চিন্তায় আত্ম-নিয়োগের দ্বারা ও বাস্তব কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রাম-স্বরাজ গঠনের পথে ত্বরিত গতিতে অগ্রসর হবার প্রস্তুতি অবিলম্বে কার্যকরী করে তুলতেই হবে। ইতিমধ্যে বহু মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছে, অপচয় হয়েছে বিপুল মূল্যবান সম্পদের, কাজেই অযথা আর সময়ক্ষেপ বা কালহরণ না করে এখনই ভারতীয় অর্থনীতিকে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে এমনভাবে বিকেন্দ্রীকৃত করতে হবে যাতে দরিদ্র-শ্রেণীর দারিদ্র ঘোচে অচিরেই এবং সরকারকেই এ ব্যাপারে বাস্তবভিত্তিক কর্মপ্রচেষ্টা চালাতে হবে অবিরত এবং সাধারণ মানুষ সেই সব প্রচেষ্টার সামিল হয়ে সরকারের সহযোগীর ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করবে। তবেই প্রার্থীত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে।

গ্রামীণ প্রকল্প, গ্রামীণ কৃষিব্যবস্থা, ভূমিসংস্কার,

গ্রামীণ কুটীর ও হস্তশিল্প এবং প্রয়োজন বোধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রচেষ্টা অবিলম্বে রূপায়িত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং বৃহৎ শিল্পগুলি কেবলমাত্র রপ্তানীবাণিজ্যে লিপ্ত থাকবে, আভ্যন্তরীণ বাজারে গ্রামীণ শিল্পেরই একাধিপত্য থাকবে, তবেই কৃষি ও শিল্প সমৃদ্ধ, বনজ ও খনিজ সম্পদের আকর ভারত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বীয় বৈশিষ্ট ও শক্তিমত্তার পরিচায়ক হবে! প্রশ্ন হতে পারে, গান্ধিজী পরিকল্পিত গ্রামস্বরাজ বলতে আমরা কি বুঝি এবং কেবলমাত্র ঐ পথেই কি দেশের অর্থনৈতিক সুদৃঢ় বুনিয়াদ গড়া সম্ভব হবে? না কি ঐ ব্যবস্থার সাথে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপযোগীতাকে স্বীকার করি? সেক্ষেত্রে বক্তব্য এই যে, গান্ধীজির পরিকল্পনাকে মূল ভিত্তি হিসাবে পুরোপুরি গ্রহণ এবং সেই ব্যবস্থাকে বাস্তবানুগ রূপায়ণের জন্য মাত্র যেটুকু বিজ্ঞান ভিত্তিক ও আধুনিক উপকরণ ও যন্ত্র-সরঞ্জামের একান্ত প্রয়োজন অবশ্য গ্রহণীয় বলে কার্যাক্ষেত্রে অনুভূত হবে, সেটুকুর সাহায্য গ্রহণ ও তার সহিত সমন্বয় সাধনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা নিশ্চয় চালান হবে এবং লক্ষ্য থাকবে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতির দিকেই। কোনরূপ ছুৎমার্গের স্থান থাকবে না। গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হলেই বিরাট ও বিশাল ভারতভূমি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হবে, আর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও তাই।

কি কিভাবে ও কোন কোন মূল-লক্ষ্য স্থির রেখে গ্রামস্বরাজ গঠনের কাজে অগ্রসর হলে প্রকৃতপক্ষে ভারতের গ্রামগুলি স্বয়ম্ভর হয়ে উঠবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সুসামঞ্জস্যের ভিত্তিতে সবল ও সুস্থির আকার লাভ করবে; সেই ব্যবস্থা গ্রহণের রূপরেখা নিম্নরূপ হইলেই ভাল হয়:—

প্রতিটি গ্রামের অধিবাসীরা যাতে তাদের দৈনন্দিন জীবন ধারণের জন্য নিম্নতম প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের যোগান পায়, স্বাস্থ্যরক্ষায় সক্ষম হয়, শিক্ষার আলোক পায় মাথাগোঁজার মত কুটির বা আশ্রয়স্থল পায়, রোগে সুচিকিৎসার সুযোগ পায়, বিশুদ্ধ পানীয় জল পায়, বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের মত পরিবেশ পায়, দেহসৌষ্ঠব গঠনের জন্য যথোপযুক্ত প্রশস্ত ফাঁকা জায়গা বা মাঠ পায়, যানবাহনের সুযোগ সুবিধা পায়, উপজীবিকার ক্ষেত্র ও সুযোগ পায় জীবনের মান উন্নয়নের পথ পায়, এককথায় অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা পানীয় জল, উপজীবিকার ব্যবস্থা, আনন্দ আহরণের ব্যবস্থা, সুস্থ স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, রাস্তা-ঘাট ও পরিবহনের সহজলভ্য ব্যবস্থা, আনন্দ আহরণের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ শক্তি, ছোটখাট যন্ত্রপাতি, যানবাহন, পাঠাগার, সংরক্ষিত পুষ্করিণী অথবা কোন নদ-নদী, খেলার মাঠ, পূজা পার্বণের জন্য দেবস্থান বা মসজিদ বা গীর্জা, মৃতদেহ সংকারের জন্য শ্মশান বা কবরস্থান ইত্যাদি জীবন যাত্রা নির্বিঘ্নে নির্বাহের উপযোগী সব রকম নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর ও উপকরণের আবশ্যকমত চাহিদা মেটাবার সুযোগ সুবিধা পায়, তার সম্যক ব্যবস্থা গ্রামবাসীদের নিজেদের চেষ্টা ও শ্রমের মাধ্যমে একক ও যৌথভাবে করে নিতে হবে এবং সরকারও ঐসব জনকল্যাণমূলক কাজে যথাসম্ভব সাহায্য ও সহযোগীতা দেবে। আর গ্রাম বাসীরা পরস্পরের ওপর আস্থাশীল ও নির্ভরশীল হবে, তারা নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বজায় রাখতে সদা সচেষ্ট থাকবে এবং কোন ক্ষেত্রে যদি এর বিপরীত অবস্থা কোথাও ঘটার আশংকা দেখে, তৎক্ষণাৎ যৌথ প্রচেষ্টায় তা নিরাকরণের জন্য সর্ব্ব শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগকরে বিবাদমান উভয় পক্ষকে সমঝোতায় ও মীমাংসায় আসতে সাহায্য ও সহযোগীতা করবে।

(চলবে)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

বয়কট ও "স্বদেশী" আন্দোলন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বৈঠকে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হবে বলে স্থিরীকৃত হল।—

যে পর্য্যন্ত দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহৃত না হচ্ছে, সে পর্য্যন্ত ব্রিটিশ জনসাধারণের উদাসীন্যের এবং তারই ফল স্বরূপ ভারত সরকারের ভারতীয় জনমতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের প্রতিবাদে মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ পণ্য-সামগ্রী বর্জনের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, এই সভা তার প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করছে।'

এতে বোঝা যাচ্ছে যে বয়কট আন্দোলনটি ছিল একটি সাময়িক কর্মপন্থা। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাময়িকভাবে তা অবলম্বন করা হয়েছিল। সে উদ্দেশ্য সফল হলেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। এর একমাত্র লক্ষ্য ও অভিপ্রায় ছিল বাংলার একটা প্রতপ্ত অভিযোগের প্রতি ব্রিটিশ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। দেশ বিভাগের পরিকল্পনাকে সংশোধিত করে অভিযোগ দূরীভূত করলেই বয়কটও থেমে যাবে। সে অঙ্গীকার পালন করা হয়েছিল।

এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না যে বয়কটের মধ্যে সময় সময় একটু বাড়াবাড়ি দেখা দিয়েছিল। তবে একথাও ঠিক যে সব নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যেই এই আত্মঘাতী দুর্বলতা থেকে যায় এবং তা দেখা দেয় সাধারণ মানবীয় প্রকৃতির অন্তর্নিহিত চারিত্রিক ত্রুটির ফলে। সমস্ত কাজের মধ্যেই—তা সে যত পবিত্র ও মহৎই হোক না কেন—একদল নরমপন্থী ও আর একদল চরমপন্থী থাকবেই। তাই যে বাড়াবাড়ির কথা বলা হয়েছে, তা অল্পবিস্তর পরিমাণে আনুষঙ্গিকভাবে সমস্ত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যেই এসে পড়ে। কিন্তু সেই বাড়াবাড়িকে জনসাধারণের কোন অভিযোগের প্রতিকার লাভের জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে কখনও কোন যুক্তিরূপে দেখান হয়নি। তা যদি হত, তাহলে মানুষেরই ইতিহাসের অনেক বড় বড় অধ্যায়ই অলিখিত থেকে যেত এবং আত্মদান ও স্বদেশ প্রেমের মহৎ প্রেরণাময় অনেক দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম। কারণ, এই মহৎ দৃষ্টান্তগুলি প্রায়ঃ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামের সহিত সংযুক্ত থাকতে দেখা যায়। একথা কে বলবে যে যেহেতু দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলায় বিপ্লবী প্রচার কার্য্য চলছে—যা নিঃসন্দেহে খুব সীমাবদ্ধ ও অকিঞ্চিৎকর প্রভাব পরিধির মধ্যেই আছে—সেই হেতু নিয়মতান্ত্রিক কর্ম প্রচেষ্টাকে পরিহার করতে হবে? ভারতের অগ্রগতির পথে যারা শত্রুভাবাপন্ন তারা এর চেয়ে ভাল আর কিছু ভাবতে পারে না। যারা ভারতের উন্নতিকামী বন্ধু তারা সে অবস্থাকে একটা বিপর্য্যয় বলেই মনে করবেন।

বয়কট প্রস্তাবটি উত্থাপনের ভার দেওয়া হয়েছিল বাবু নরেন্দ্রনাথ সেনের উপর। নরেন্দ্রনাথ তার অনুগ্র মনোভাব ও স্বদেশ প্রেমিকতার জন্য এই কাজের পক্ষে বেশ উপযুক্ত লোক ছিলেন। তখনকার দিনে বাংলার নেতাদের মধ্যে এই কাজের জন্য এতটা যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তি পাওয়া এক রকম অসম্ভব ছিল। নরেন্দ্রনাথের খ্যাতি ও প্রভাব ছিল তখন তুঙ্গে। তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কোন ভারতীয়ের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীন পত্রিকা বলতে তখন একমাত্র এইটিই ছিল নিজ বিশ্বাসে অবিচল থেকে সাহসিকতার সহিত দীর্ঘ দিন তিনি তার নিজ দেশের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তার প্রশান্ত ও সংযত মনোভাব সকলের কাছেই সম্মান অর্জন করেছে। এমন কি যারা ভারতের উচ্চা-

তিলাককে বন্ধুত্বের দৃষ্টিতে দেখতেন না তারাও তাঁকে সম্মান করতেন। যদি দেশ পরাধীন না হত তবে তিনি তাঁর স্বদেশবাসীর প্রীতির উপর অধিকার বজায় রেখে চলতে পারতেন, তাহলে খুবই ভাল হত। কিন্তু হায়! সেটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। যে জনপ্রিয়তা এক সময় তাঁর দেশবাসীর বিবেচনার গুণে একটা শক্তিরূপে স্থান করে নিয়েছিল জীবনের শেষের দিকটায় তার সেই অসাধারণ জনপ্রিয়তার দীপ্তি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে দেশের মধ্যে এনার্কিষ্ট কার্যাবলীর বিস্তৃতি তাঁর আবেগ প্রধান অন্তর প্রকৃতিকে কতকটা অস্থির করে তোলে। তিনি এনার্কিষ্ট আন্দোলনের বিস্তারকে উদ্বেগ ও আতঙ্কের দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করলেন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রবক্তা সরকারী কর্তৃপক্ষের সমর্থন করতে গিয়ে এতটা আগ্রহী হয়ে পড়লেন যে একটি দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র প্রকাশনের জন্য সরকারী অর্থ সাহায্য গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করে ফেললেন।

সরকারের এই কৌশলটি ইংরেজ জাতির রীতি-প্রকৃতির অনুগামী হয়নি এবং এর মধ্যে বিজ্ঞতারও পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ, এ রকম পদ্ধতি কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তবে এটা প্রকৃতপক্ষেই একটা জাতীয় পরিতাপের বিষয় যে বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর মান এবং প্রভাব এমন একটি সাংবাদিক উদ্যোগের সমর্থনে কাজে লাগাতে দিলেন যে উদ্যোগকে আগাগোড়াই তাঁর স্বদেশবাসী নিন্দা করে আসছেন। যা হোক এটা তাঁর কর্ম-জীবনে একটিমাত্র ত্রুটি। অন্যথায় তাঁর কর্ম-জীবন খুবই উজ্জ্বল, অনন্যসাধারণভাবে উজ্জ্বল এবং কাজের উপযোগী। আমাদের সময়ের ইতিহাস তিনি লিখবেন, তিনি নরেন্দ্রনাথকে তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে যথার্থই একজন নিষ্ঠাবান জনসেবক এবং ভারতের উন্নতির পথে একজন উৎসাহী ও নিষ্ঠাবান কর্মীরূপে যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন। সর্বদা সাবধানে ও সতর্কতার সহিত পদক্ষেপ করতে তিনি অভ্যস্ত তিনি যদি অতি কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ে ভুল পথে পা বাড়িয়ে থাকেন তাহলে আমাদের মধ্যে কে এমন নিষ্কলুষ এবং মানবীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত আছেন যিনি তাঁর প্রতি অপবাদের প্রথম ঢিলটি ছুঁড়ে মারতে পারেন?

আমার মনে পড়ে শক্ত মানুষ নরেন্দ্রনাথের সেই দিনগুলির কথা যখন বয়সের ভার কিংবা নৈরাশ্য এসে তাঁর মহৎ প্রকৃতির উপর কোনরূপ আঘাত হানতে পারেনি, যখন তিনি ছিলেন দুই রোগশয্যার কাছে একটা আহত স্বরূপ, যখন রোগের শঙ্কারা তাঁর সৌম্য দীপ্ত উপস্থিতি দেখেই ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে যেত। তাঁর মৃত্যুর আগের দিন আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। তখন আগষ্ট মাস, শনিবার দিন। নরেন্দ্রনাথ সেন বিছানায় শুয়ে পড়ে আছেন। এত দুর্বল যে কথা বলতেও পারছিলেন না ঠিক মত। কিন্তু তবু তাঁর মানসিক বল অটুট ছিল। কোন কথাই আমাদের মধ্যে বলা হল না। কেবলমাত্র পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টির বিনিময়ই হল। তিনি আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যে মনে হল যেন সে চাহনির মধ্যে অতীতের সমস্ত স্মৃতিগুলি জেগে উঠেছে। তাঁর গণ্ডদেশে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আমিও দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমার প্রীতির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালাম। আমার চক্ষুও অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে গেল। সেই মৃত্যু গৃহের বিভীষিকাময় পরিবেশের মধ্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম অশ্রুকে রুদ্ধ করতে। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে এলাম। আমার মনে তখন এই ভাবই জেগে উঠল যে আমার সমসাময়িক সহকর্মীরা সকলেই একে একে চলে যাচ্ছেন 'এই জগতটাকে অন্ধকারের মধ্যে আমার কাছে ফেলে রেখে।'

এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে বয়কট প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ইংরেজ-শাসকদের দ্বারা পরিচালিত কোন সংবাদপত্রে সে রকম কোন বিরূপ সমালোচনা হয়নি। অন্ততঃপক্ষে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে পরবর্তীকালে এই আন্দোলনের যেরূপ তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছিল, তা করা হয়নি। ইংলিসম্যান সংবাদপত্র এ বিষয়ে যা কিছু বলেছে, তা হল এই—'বয়কটের নীতি সাফল্য লাভ করলে তা অবশ্যই মত বিরোধকে আরও তিক্ত করে তুলবে; আর যদি সফল না হয় তাহলে তা আন্দোলন

ও তার সমর্থকদের অবস্থা অসম্ভব করে তুলবে। ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা গোটা আন্দোলনকে একটু তাচ্ছিল্য করতে চাইল। কিন্তু এটা একটা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন বলে নিন্দা বা প্রতিরোধ করার কোন লক্ষণ দেখায় নি। 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা যা লিখেছে, তা হল এই :—

"বয়কট প্রস্তাব রচনা ও গ্রহণের দায়িত্ব যারা নিয়েছেন, তারা নিঃসন্দেহে চীনের দৃষ্টান্ত দ্বারা উত্তেজিত হয়েছেন এবং তারা এতদূর আশীবাদী হয়ে পড়েছেন যে তারা ধরে নিয়েছেন যে চীনারা আমেরিকার পণ্য বর্জন করে যেরূপ সফল হয়েছে ও আমেরিকার বাণিজ্যের ক্ষতি করেছে বলে মনে করা হয়, এখানেও ইয়োরোপীয় পণ্য বর্জন করে তারা সে রকম করতে পারবেন। তাদের এই ধারণা ইয়োরোপীয় মহলে একাধিক কারণে হাস্যেরই উদ্রেক করবে। তবে তা যাইহোক না কেন, সরকারের পক্ষে এরকম মনে করা ভুল হবে যে গোটা আন্দোলনটা একটা অসার বুদ্বুদ মাত্র। বরং কিছুদিন ধরে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে প্রদেশের লোকেরা প্রতিবাদ করার জন্য অন্য রকম এবং আরও শক্তিশালী উপায় অবলম্বনের শিক্ষা পাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে যে নতুন সম্ভব্য কর্ম প্রচেষ্টার স্তর দেখা দিয়েছে, সে সম্পর্কে সরকারের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।"

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহলের মতামত সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করলাম এই জন্য যে এতে বুঝা যাবে যে পরবর্তীকালে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিবর্তন ঘটেছে তা হচ্ছে আন্দোলনের সাফল্যে সরকারী মহলে যে উত্তাপ দেখা যায় তারই প্রতিফলন। আমলাতন্ত্রে সরকারী আমলারা কোন সময়ই কোন নতুন পরিস্থিতি বা অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনার উদ্ভবের সঙ্গে সামাল দিতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সম্ভব আমলারা পূর্ব নজিরের আলোতে এবং পুরাতন ধুলি মাখা ফাইল খতিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে খুশী থাকে এবং মনে করে যে ঠিকই করেছি। কিন্তু যখনই দিকচক্রবালে মেঘ দেখা দেয় যখনই সামনে ঝড়ো হাওয়ার অশুভ ইঙ্গিত দেখা যায়, তখনই তাদের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ফাইলের মধ্যে তখন আর কোন নির্দেশ পায়না ; তখন তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে ; বিচার বিবেচনা হারিয়ে ফেলে ; মানসিক অশান্তি তখন তাদের প্রতিরোধের দিকে ঠেলে দেয় এবং কোন বিপদের আশঙ্কা না থাকলেও বিপদ কল্পনা করে বীরত্বের কাজে হাত লাগায় যার ফলে বাস্তবিকই সেই অশান্তি এসে দেখা দেয়, একটুখানি বেশী বুদ্ধি খাটালে ও প্রশমনের চিন্তা থাকলে যে অশান্তিকে এড়ান যেতে পারে।

এর আগে ভারতে কখনও বয়কট আন্দোলনের কথা চিন্তাও করা হয়নি বা সেদিকে কোন প্রয়াসও দেখা যায়নি। এটা ছিল একটা বলিষ্ঠ চিন্তার ব্যাপার। কিন্তু ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার মত সমস্ত পর্যবেক্ষকদেরই প্রথম প্রথম মনের ঝোঁক ছিল একে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার দিকে। কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই উহা যে সাফল্য অর্জন করল তা প্রকট করে দিল যে এর পেছনে প্রবল জনমত রয়েছে। সব দিক থেকেই কম বেশী পরিমাণে সমর্থনের মনোভাব না থাকলে বয়কট আন্দোলন অবশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। এই আন্দোলনের সাফল্য সবলের কাছেই এক সত্যের আবির্ভাব রূপে প্রকাশ পেল। সাফল্য সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের যে ধারণা ছিল, আন্দোলন সে ধারণাকেও ছাপিয়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু আমলাতন্ত্র সেদিন এতে কোন শিক্ষালাভ করেনি। তারা তাদের ফাইলে যা নেই এবং তাদের মেরেস্তার তৈরী ধুলায় যা পবিত্রীকৃত নয়, এমন কিছু থেকে কোন শিক্ষালাভে অভ্যস্ত নয়। জনমতের প্রবল বিস্ফোরণে আমলাতন্ত্র হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তারা ক্রোধে ফেটে পড়ল, আত্মসংযম হারিয়ে ফেলল ; দমনমূলক কাজে হাত লাগাল। একটুখানি কৌশল অবলম্বন করলে, একটুখানি আপোষ ও সামঞ্জস্য করে চললে যে কাজ হাসিল হত, দমন-নীতির প্রয়োগ করে তা তারা করতে লেগে গেল। ফলে অগ্নিশিখাকে আরও প্রজ্বলিত করে তুললো।

(চলবে)

FAKE FREEDOM FIGHTERS MAY BE PROSECUTED

—Hindustan Times

May 2, 1979

New Delhi.

New Delhi, May 1—Freedom fighters who have been drawing political pension on false affidavits may soon face prosecution.

The Union Government has already cancelled the pension in 632 cases and the beneficiaries have been asked to pay back the pension amount wrongly drawn by them.

In Bihar alone, payment of pension has been stopped in 362 cases. This figure does not include cases where the Treasury and District Officers have, on their own, stopped pensions where they found that the annual income of the recipient exceeds Rs. 5,000.

The State Government has also reported that 191 government employees, 25 legislators and members of other representative bodies are getting pension. Inquiries are being made to verify their income so as to determine whether they are eligible for it.

It is pointed out that the recovery of pension amount irregularly drawn and launching of prosecution, where necessary will arise only after the pension is finally cancelled. Cancellation is being done after an opportunity is given to the persons concerned to explain the reason for drawing pension under such circumstances and after reverification of his representation is made to the State Government.

The Government has received representations that recovery of pensions already paid would cause hardships to the persons concerned.

It has decided that where pension has been cancelled on account of the decision not to recognise mutinies and movements and where applicants had been sanctioned pension earlier and they had drawn it in good faith, the recovery will be waived, but each case will be considered on merit. The question of waiving recoveries where applicants had drawn the pension in good faith the matter is also under examination.

In fact, the whole scheme is under review in view of the heavy recurring expenditure involved and also because many nongenuine freedom fighters have been drawing pension.

———

চিঠিপত্র

শ্রদ্ধেয় 'বিপ্লবী বাংলা' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মান্যবরেষু,

আপনার সম্পাদিত বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'বিপ্লবী বাংলা' রীতিমত পাচ্ছি ও পেয়ে আনন্দ লাভ করছি। এই তথ্যসমৃদ্ধ ও আদর্শবাদী পত্রিকাখানি যদি স্বল্পসংখ্যক তরুণের মনেও স্বদেশের জন্যে আত্মত্যাগের প্রেরণা জাগায়, তবেই আপনাদের উদ্যম সার্থক হবে।

বিগত ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ২৬শে মে তারিখে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্যে আপনারা যে সংখ্যাটি প্রকাশ করেছেন, তার সম্পাদকীয়তে দুটি ভুল চোখে পড়লো। প্রথমত: 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' এটি গীতার বচন নয়, এটি প্রাত:স্মরণীয় শ্লোকের শেষ দুটি চরণ। প্রথম দুটি চরণ হচ্ছে—'জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি: জানাম্যা ধর্মং ন চ মে নিবৃত্তি:।' দ্বিতীয়ত: 'চরৈবেতি চরৈবেতি' 'এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো' বৈদিক মন্ত্র হলেও উপনিষদের মন্ত্র নয়, আমরা এই মন্ত্রের সাক্ষাৎ পাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। আর সকলেই জানেন, প্রাচীন ভারতে চতুরাশ্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই বেদের চারটি বিভাগ করা হয়েছে—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্।

আমার এই ক্ষুদ্র পত্রখানি 'বিপ্লবী বাংলায়' প্রকাশিত হলে বাধিত হবো। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

ভবদীয়—

১৭ই জ্যৈষ্ঠ

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী

(উপরে আলোচিত ভুলগুলি 'বিপ্লবী বাংলা' সম্পাদকের অনবধানতাবশত: ঘটেছে এবং এজন্য আমরা দু:খিত। ভুল সংশোধনের কষ্ট স্বীকারের জন্য শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয়কে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। (স: বি: বা:)

RgedNo. R. N .24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | বাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

19 JUN 1979

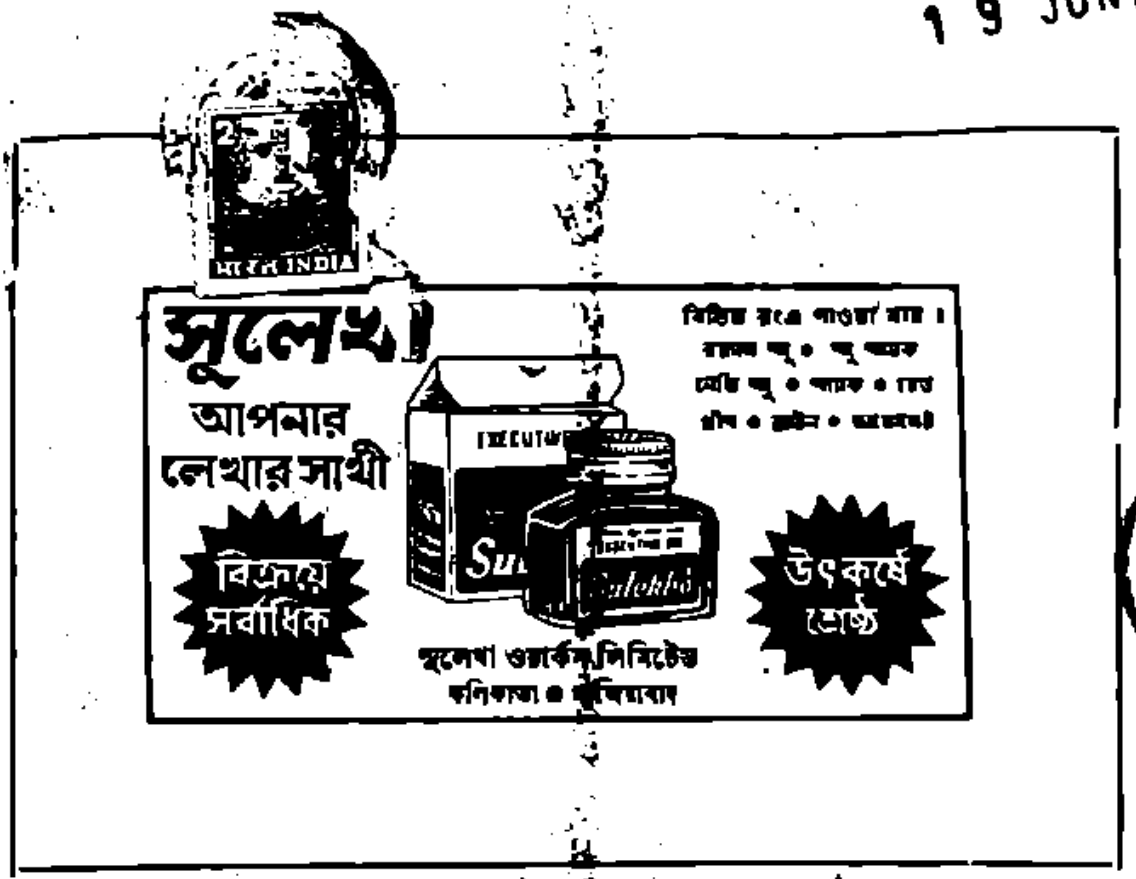

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীঅনাদি চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি), শ্রীউমেশচন্দ্র নন্দী, শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী।
সম্পাদক—শ্রীঅনিল পরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেঙ্গালা—শ্রীমদনগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীবীরেন গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বঙ্কিমদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :—লিটিং পাবলিসিটি, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাংলা

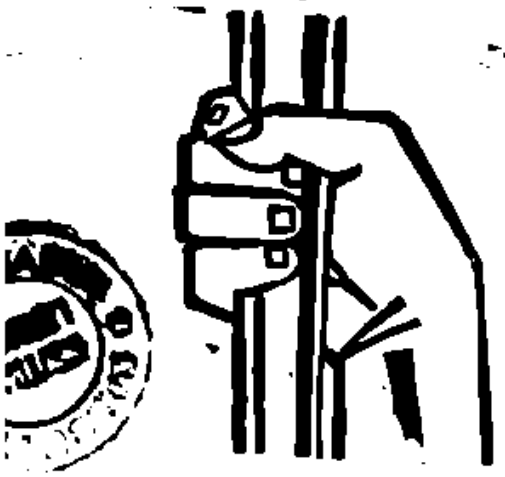

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ৮ই আষাঢ়, ১৩৭৬ ২৩শে জুন, ১৯৭১	৩৬ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

রাজনীতি ও নৈতিকতা
। সম্পাদকীয় ।

অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ গড়ার উপায়
। শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক রজিনী মোহন দাশগুপ্ত ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস
। ধীরোদ দত্ত ।

ডিনোসারের ক্ষুধা
॥ শ্রীসতীকুমার সেন ॥

তিনিই বীর যিনি এই সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া একহস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন।

—স্বামী বিবেকানন্দ

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Dist—CALCUTTA		
Banerjee Smt. Hasbibala w-o Late Adhir Kr. Banerjee	18/11, Biren Roy Road West Calcutta—34	100	28. 6. 78
Banerjee Smt. Parul w-o Late Amiya Banerjee	Block : M, Flat—IV, Govt. Housing Estate, C. N Roy Road Calcutta—39	100	L. 10. 76 (Enhancement)
Burman Smt. Rangibala w-o Late Pancher Singh Kishan Singh	C/o Manto Burman, 5, Mahindra Chatterjee Lane Calcutta—46	200	5. 12. 77
Basu Roy Priya Lal	14-B, Circus Range. Calcutta—19	200	1. 10. 76 (Enhancement)
Bhattacharyya Smt. Chhayarani w-o Late Khagendra Nath	27, Gobra Gorasthan Road Calcutta—46	200	24. 8. 78
Bhattacharyya Jagannath	87-B, Raja Dinendra Street, Calcutta—6	200	1. 4. 78
Chakraborty Smt. Indu w-o Late Sudhir Chandra	10-A, Kabir Road, Calcutta—26	100	2-. 2. 79
Chakraborty Smt. Saila Bala w-o Late Ram Ranjan	18, Thakurdas Banerjee Road Calcutta—56	200	28. 3 74
Kanjilal Adhir	Choudda Bigha Nimta Calcutta-49	203	28. 3. 74
Mitra Ardhendu	13, Sarkar Bye Lane Calcutta—7	203	1. 10. 76
Roy Ashim Kumar	2/42, Ashokenagar Colony Regent Park. Calcutta—40	200	1 10. 76

(Contd. on 3rd cover)

সম্পাদকীয়—

রাজনীতি ও নৈতিকতা

রাজনীতিতে ডিপ্লোমেসি বলে একটা কথা আছে, যার অর্থ রাজনীতিবিদ্‌রা নিজেদের খেয়ালখুসীমত করে থাকেন। কিন্তু ডিপ্লোমেসি নিছক কপটাচরণও নয়, মিথ্যা ভাষণও নয়। সুযোগ সুবিধামত বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ পদ্ধতি ও নীতি অবলম্বন করাকেই প্রকৃত ডিপ্লোমেসি বলে। অবশ্য সব সময়ই ডিপ্লোমেসির প্রয়োগ করতে হয়, দেশের স্বার্থ ও মঙ্গলের জন্য। নিছক ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা বা দলবাজী করার জন্য কখনও নয়। ক্ষেত্রবিশেষে কখনও রাজনীতি বিদেরা সত্যকে কিছু পরিমাণে গোপন করে থাকেন বটে, কিন্তু তাহা মিথ্যাকে আশ্রয় করা বা প্রশ্রয় দেওয়া কোন কোন মর্য্যাদাসম্পন্ন মানুষ বা দলের করণীয়। বর্তমান শাসকদল যদি মনে করে থাকেন যে তারা খুব কুটনৈতিকভাবে চলছেন, যার ফলে তাদের রাজত্ব পূর্ণ পাঁচবছর তো থাকবেই, এবং পরবর্তী পাঁচ বছরও তাঁদের হটাতে পারবে না কেউ, তবে মারাত্মক ভুল করছেন।

পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আজ যারা ক্ষমতাসীন, তারা কিন্তু সব অপকর্মকে 'বুটা হ্যায়' বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন। মানুষ খুন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করলে, জবাব মিলছে 'এটা কিছু নয়।' অত্যাচার, অবিচারের ফিরিস্তি দাখিল করলে জবাব হচ্ছে 'ওটা ষড়যন্ত্র।' দেখা যাচ্ছে একটা জবাব সদাসর্বদা বস্তা থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে এবং সেটা হল 'না'। অর্থাৎ সব মায়া, মতিভ্রম এবং চক্রান্ত। কখনও কখনও অদ্ভুত কৈফিয়ৎ দেওয়া হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে শাসকদলেরাই হত, অত্যাচারিত লাঞ্ছিত হচ্ছেন অনেক বেশী। একথাও বলা হচ্ছে যে একজনের ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে, শাসকদলের একজন খুন হবার পর। অর্থাৎ সভ্য সমাজে আইন শৃঙ্খলাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যার যা খুশী অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। জোর করে জমি দখল করলে বা ফসল কেটে নেওয়ার সময় প্রতিবাদ করতে গেলে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের গোচরে আনলে প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না। উপরন্তু শুনিয়ে দেওয়া হচ্ছে এমন চমৎকার প্রশাসন নাকি ভূ-ভারতে কোথাও নেই। মরিচঝাঁপিতে পুলিশ ও ঠেঙ্গাড়ে বাহিনী মারধর করেছে, জোর জবরদস্তি করে লঞ্চ ভর্ত্তি করেছে, শেষ পর্য্যন্ত ঘরে আগুন লাগিয়েছে। কৈফিয়ৎ দেওয়া হচ্ছে, ওসব দুষ্কৃতকারীদের কাজ। যে এলাকাতে দীর্ঘদিন ধরে ঔষধপত্র, পানীয়জল, খাবার পর্যন্ত নিতে দেওয়া হয়নি, যে এলাকাতে বিনানুমতিতে এম, পি, এম, এল, এ দের পর্য্যন্ত ঢুকতে দেওয়া হয়নি কড়া পাহারার মাধ্যমে, সেখানে শত শত পুলিশের উপস্থিতিতে দুষ্কৃতকারীরা ঢুকল কোন রন্ধ্র দিয়ে? তারা কি সরকার থেকে অনুমতি পেয়েছিলেন? অথচ দুষ্কৃতকারীদের নামে সমস্ত দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন একজন মন্ত্রীবর। যদি কেউ বলে সরকারী বক্তব্য মিথ্যা, কল্পনাপ্রসূত, হৃদয়হীন এবং দলবাজীর জঘন্য নিদর্শন, তার কি ভুল বলা হবে?

চিন্তাশীল মানুষেরা মনে করছেন যে নৈতিকতা বোধের অভাবই এরজন্য দায়ী। সত্যের প্রতি এমন অমানবীয় অশ্রদ্ধা ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজে অভূতপূর্ব। সমস্ত

মূল্যবোধকে যারা এইভাবে হত্যা করছেন, বহু মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস যে তারা নিজেদের কবর খুঁড়ছেন নিজহাতেই।

বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে কিন্তু এমন কখনও ছিলনা। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে যে সব মহামানব এদেশে নেতৃত্বদান করেছেন, তাঁদের নিজেদের ছিল অসাধারণ চরিত্রবল, উচ্চ আদর্শনিষ্ঠা, সত্যানুরাগ, মানবদরদ, মানবীয় মূল্যবোধের উপর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। এই ভাবেই দেশের মানুষকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন এবং নৈতিকবলে বলীয়ান করে তুলেছিলেন এবং তার ফলেই এ দেশের মানুষ হাসিমুখে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরেছে, দীর্ঘদিন কারাবাস করেছে, বহুরকমের স্বার্থত্যাগ করেছে নিদারুণ দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে। দেশের মধ্যে তখন 'মানুষ' তৈরীর সাধনা চলছিল এবং সে ব্যাপারে সিদ্ধিলাভও ঘটেছিল আশ্চর্য রকমের। কিন্তু আজ? নেতৃস্থানীয় লোকেরা মিথ্যার কাঞ্চনজঙ্ঘায় চড়ে বসেছেন, নৈতিকমূল্যবোধকে চিরতরে নির্বাসন দেবার নিকৃষ্ট কাজে ময়। দলের ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করতে সচেষ্ট না হয়ে, দলবাজীর খাতিরে তাদের কুকর্ম সমর্থন করছেন।

বাংলাদেশের স্বর্ণযুগে যে প্রচ্ছন্নস্তর সন্ন্যাসী দল উদ্দেশ্য লাভের জন্য 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি কাড়াকাড়ি' করার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন, তাদের আর সন্ধান মিলছে না। মিলতেও পারে না। কারণ যেমন বীজ বপন করা হচ্ছে, ফসল তো তেমনিই হবে। সাময়িকভাবে বিশেষ কোন ভূমিকা পালনের জন্য যাত্রার দলের ছেলেরাই যথেষ্ট। কিন্তু কাজ যেখানে জাতি গঠনের, সেখানে সর্ব-ত্যাগী, অমিতবল কাণ্ডারী তৈরী করতে না পারলে, সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়; এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের মধ্যে কেউ এ কথা বুঝছেন না একথা বিশ্বাস করা শক্ত। হয় তারা গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন, অথবা নিজেদের সৃষ্ট ক্রাচষ্টাইনদের ভয়ে ভীত। ফলটা কিন্তু ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। চারিদিকে একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি হচ্ছে। দেশ ও জাতি উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। আজ প্রয়োজন রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ, রাসবিহারী বসু ও নেতাজীর মত পথ-প্রদর্শক ও শিক্ষাগুরু, যাদের সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে নৈতিকতাবোধের চরম উৎকর্ষ ঘটেছিল। এমন প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারলেই পাওয়া যাবে ক্ষুদিরাম, সত্যেন, প্রফুল্ল, গোপীনাথ, বিনয়-বাদল-দীনেশের মত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও দেশের মধ্যে প্রাণ-গঙ্গা বহাবার অকৃত্রিম ভগীরথের দল। সেটাই হবে ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এত সাধকের সাধনা, এত শহীদের আত্মাহুতি, এত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রক্তদান, সবই কি ব্যর্থ করে দেবে আধুনিক কংসেরা? আমরা বিশ্বাস রাখি শেষ পর্যন্ত কংসই ধ্বংস হবে, কারণ কংসকারায় কংস-হন্তারা জন্ম নেবে অচিরেই এবং কুশাসন, দুঃশাসন, অন্যায় অত্যাচার, নৈতিকতাহীনতার অবসান ঘটবেই। বাংলা মায়ের শ্যামল প্রান্তরে তূর্যবাদকেরা বিপ্লবের বাঁশী বাজিয়ে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে এবং অপমানিত মনুষ্যত্বকে রক্ষা করবেই। সেই নব-অরুণোদয়ের উদ্দেশ্যে আমরা স্বাগত জানিয়ে রাখি, দুর্দিনের এই দারুণ-দিনে।

———

অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ার উপায়

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গ্রামের সমুদয় কর্ষণ যোগ্য জমিতে ফসল ফলাবে সেই গ্রামের চাষীরা, পতিত জমি উদ্ধার করে চাষের উপযোগী করবে তারাই ও উদ্ধারকৃত জমিতে ফসল বুনবে তারাই এবং যতকিছু ফসল ঘরে উঠবে সকলেই তার সমহারে ভাগ পাবে। চাষের যাবতীয় খরচ গ্রামের ষোলআনা মানুষ সমহারে বহন করবে, কারণ এর মালিক ত গ্রাম ষোল আনা। অনুরূপ ভাবে গ্রাম্য তাঁতিরা কাপড় গামছা বুনবে, দর্জিরা সেলাইয়ের কাজ সকলের জন্যই করবে। কুমোরেরা মাটির বাসন, পুতুল তৈজসপত্র গড়বে। কামারেরা চাষের ও গৃহস্থালীর জন্য লৌহ ও ইস্পাতের লাঙ্গল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করবে। কলুরা ঘানি বসিয়ে তেল ও খোল তৈরী করবে। মুচিরা চর্ম দিয়া পাদুকা ও অন্যান্য বহু অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ তৈরী করবে। ছুতোর কাঠ দ্বারা নিত্য-প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই বানাবে। রাজমিস্ত্রিরা ও ঘরামীরা ঘরবাড়ী, শস্য গোলা স্কুল, পাঠাগার, দেবস্থান, দরগা, স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদি গঠনের কাজ করবে। স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান গ্রাম্য যুবকেরা গ্রামরক্ষী বাহিনীর কাজ করবে। গ্রাম্য শিক্ষিত-জনেরা বিদ্যালয়, পাঠাগার, ধর্ম্মস্থান প্রভৃতি পরিচালনা ও সভাব্যক্ষেত্রে শিক্ষকতা ইত্যাদি কাজ করবে ও সমগ্র গ্রাম্যবাসীর স্বার্থ রক্ষায় বিভিন্ন কর্ম্মরত লোকজনদের কাজ ঠিক ঠিক ভাবে এগুচ্ছে কিনা তাও তদারক ও পরিচালনায় যথা-সাধ্য সাহায্য ও সহযোগীতা দেবে। এরাই সবদিকে স্বার্থহীন নজর রেখে সবাইকে সুপরিচালিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দ্দেশ দেবে যাতে সকলক্ষেত্রেই-ঈপ্সিত ফল লাভ বাস্তবে সম্ভব হয়। এছাড়া যাদের কবিরাজী বা ডাক্তারী বা হোমিও-প্যাথী বিদ্যায় সম্যকজ্ঞান আছে তারা গ্রামের সুচিকিৎসার ভার নেবে। 'প্রসূতি সদন', 'মাতৃ মঙ্গল' জাতীয় সেবা ও চিকিৎসা পরিচালনার ব্যাপারে ঐসব বিদ্যায় পারদর্শী বা সুদক্ষ ধাত্রীরাই এর দায় ও দায়িত্ব নেবে। গ্রামে প্রায়শই সুদক্ষ ধাই-মাদের দেখা যায়। ব্যায়ামাগারের ও খেলা-ধূলার জন্য গ্রামের সুদেহী স্বাস্থ্যবান তরুণেরা দায়িত্ব নেবে। "স্বাস্থ্যই সম্পদ"—একথা গ্রাম বাসীদের বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে উক্ত তরুণ তরুণীরাই বোঝাতে পারবে এবং তাতেই মানুষ স্বাস্থ্য বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক থাকবে।

গ্রামের সকলে মিলে ঐকামত হয়ে নিজেরাই নিজেদের জন্য এমন এক আদর্শ পঞ্চায়েত গঠন করবে, যে পঞ্চায়েতের অনুশাসন, নিয়মনিষ্ঠা ও নির্দ্দেশ সবার কল্যাণে গ্রাম ষোল আনা মেনে চলে। এইরূপ পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচিত সদস্যরা সুনীতিপরায়ণ, নিরপেক্ষ ও স্বার্থহীন হয়ে দলমতের উর্দ্ধে থেকে গ্রাম উন্নয়নমূলক কল্যাণকর কাজগুলি সম্পূর্ণ করবে এবং এরজন্য যা যা ব্যয় হবে সকলেই তা সমহারে বহন করবে সানন্দে।

সরকার এরূপ উন্নয়নশীল সকল গ্রামে বিদ্যুৎ শক্তির যোগান দেবে ত্বরিতের সাথে, যাতে ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করা তথা সহজ হয় ; ফলে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন স্কুল শিক্ষকরা ও শ্রমজীবিরা এবং চাষের কাজের পর অলস থাকা বা কর্মহীন চাষীরা কাজ পাবে। এই ব্যবস্থায় গ্রামের প্রায় সবলোকেই কাজ পাবে বারমাস এবং গ্রামের উপার্জনের হার মাথাপিছু বেশ ভাল রকম বর্দ্ধিত হবে। কুমোর, কামার, তাঁতি জেলে, মালা, তেওর, কলু, ধরামী, রাজমিস্ত্রী, ছুতোর, মুচি, কাঁসারি, সাধারণ শ্রমজীবি, কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক ডাক্তার কবিরাজ, ধাত্রী, সেবিকা, রক্ষীবাহিনী পূজারী, কথক পুরোহিত মোল্লা ব্যায়ামবিদ্ পাঠাগার-চালক, কর্মপরিদর্শক, কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শী প্রভৃতি সকল কাজের মানুষ যে সব কর্মোদ্যোগগুলিকে চালনা করবে তার পরিচালন ব্যয় কিন্তু গ্রামের বোল আনা মানুষকেই বহন করতে হবে ; কারণ এর বাঞ্ছিত সুফল গ্রামে সকল মানুষই ভোগ করবে নিজেদের সক্রিয় সহযোগীতায়।

পঞ্চায়েত কর্তারা এর দেখাশুনা, তদারকি ও ব্যবস্থাপনার ভার নেবে, তারাই হবে গ্রামের অভিভাবক ও পরিচালক, তাদের আন্তরিক নিষ্ঠা ও যোগ্যতার ওপরই সমগ্র পরিকল্পনাটির সার্থক রূপায়ণ বাস্তবে সম্ভব হবে। সে কারণ দল-নিরপেক্ষ, সৎ, জ্ঞানীগুণী, স্বার্থত্যাগী ও যোগ্যতা-সম্পন্ন মানুষদের পঞ্চায়েতের কর্তা হিসাবে ঐকামত হয়ে সকলে একযোগে নির্বাচন করতে হবে ; নচেৎ উপরোক্ত সমস্ত পরিকল্পনাটি সামগ্রিকভাবে ব্যর্থ হবে। গ্রামে সুবিচারের ভারও এই পঞ্চায়েতের উপর বর্তাবে, গ্রামবাসীর নিকট থেকে উন্নয়ন কর - পঞ্চায়েতই আদায় করবে এবং তা সমস্ত গঠন কর্মীদের মধ্যে বন্টন করে দেবে। অর্থাৎ স্বয়ং-শাসিত ও স্বচ্ছন্দ গ্রাম-সমষ্টি গ্রামীণ অর্থনীতিকে উন্নত ও স্থিতিশীল করতে উপরোক্ত উপায়ে সক্ষম হবে, ফলে গ্রামপ্রধান ভারতের সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সংগঠন সফলতা লাভের পথে অগ্রসর হবে এবং অচিরেই ভারতের পক্ষে এরূপ বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ ধীরে ধীরে বাস্তবে সম্ভব হবে বলে বিশ্বাস করি।

যকৃতের দোষ, বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায় অব্যর্থ ফলপ্রদ

আমলা ঘৃত কুমারী

আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ ডাকমাশুল আলাদা

প্রাপ্তিস্থান:- শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
ঠিকানা কুটীর • কুল গ্রাম • মেদিনীপুর • পশ্চিমবঙ্গ

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

বয়কট ও "স্বদেশী" আন্দোলন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে উদ্ভূত এই প্রত্যক্ষ বিরোধের সমস্তটা সময় জুড়ে যে ঘটনাগুলি ঘটেছে, তা আমি এই মাত্র যা বললাম তাকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করেছে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে জনমতকে দাবিয়ে রাখার জেদী প্রয়াস সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। ফলে এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যা ঘটে থাকে, দমন-নীতি প্রয়োগের কুফল নিজেদের উপরই গিয়ে পড়ল। তাই আরও বেশী করে দমননীতির প্রয়োগ প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং আরও বেশী পরিমাণে লক্ষ্যণীয়ভাবে তাদের নীতিতে তারা ব্যর্থ হন। অপর দিকে জন সাধারণের মধ্যে উত্তেজনা, অস্বস্তি ও অসন্তোষ দ্রুত গতিতে বেড়েই যেতে থাকে।

এই দমননীতি যে ছাত্র সমাজকে গভীরভাবে চঞ্চল করে তুলল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা আতিশয্যে সময় সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। যখন কোন একটা আবেগের ঝোঁক সমস্ত সমাজকে আলোড়িত করে তোলে, তখন যুবক ও আবেগ-প্রবণ লোকেরাই সেই ঝোঁকের জোয়ারের ধাক্কা পূর্ণভাবে অনুভব করে। সর্বকালে সব যুগে কোন আন্দোলনের প্রবক্তাগণ যুবকদের কাছেই তাদের বাণী প্রচার করে গেছেন। ঐশী শক্তি চালিত খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবর্তক নিজেই বলেছেন, 'শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও।' গ্রীস, ইটালী, আমেরিকা, জার্মানী—পৃথিবীর সর্বত্র যখনই কোন নীতি কথা প্রচারিত হয়েছে যখনই কোন আশার বাণী শোনান হয়েছে, তরুণেরাই তখন তাতে বিপুল উৎসাহ ভরে সাড়া দিয়েছে।

এই মহান জাতীয় আন্দোলনে সাহায্য করার জন্য আমি তরুণদের কাছে আবেদন করলাম। আদালত অবমাননার জন্য আমাকে যখন কারাগারে প্রেরণ করা হয়, তখন তরুণেরা কিরূপ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল তা আমি দেখেছি। আমি বুঝতে পারলাম যে তরুণেরা জনমত গঠনের এক জোট সৃষ্টি করে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। তা না হলে আমরা সাফল্য অর্জনের কোন আশা করতে পারব না। অসংখ্য সভায় আমি তাদের আহ্বান জানিয়েছি এবং বিপুলভাবে সাড়া পেয়েছি। তরুণদের এই সাড়া দেওয়ার মূলে রাজনৈতিক কারণের চেয়ে অর্থনৈতিক কারণই ছিল বেশী করে। দেশ বিভাগ অবশ্য তাদের মনকে অতি গভীরভাবেই নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু তারা বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রচারের দিক অপেক্ষা 'স্বদেশী' আন্দোলন বিস্তারের দিকেই বেশী পরিমাণে সংশ্লিষ্ট ছিল।

তাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা এতটা বর্ধিত হয়েছিল যে ইতিপূর্বে আমি আর কখনও সে রকম দেখিনি। সত্যি কথা বলতে কি, তখন কোন স্কুল বা কলেজের ছাত্রের পক্ষে ক্লাশে বা কোন বক্তৃতা কক্ষে বিদেশে তৈরী কাপড় পরে যাওয়া ছিল বিপজ্জনক। বিদেশী কাগজে তৈরী কোন খাতা পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বিতরণ করা হলে ছাত্ররা তা গ্রহণ করত না। আমার মনে আছে রিপণ কলেজিয়েট স্কুলের একটি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র বিদেশী কাপড়ে তৈরী একটি সার্ট পরে স্কুলে এসেছিল। যেই মাত্র তা অন্য ছাত্রদের নজরে পড়ল, সেই মাত্রই তা পিছন দিক থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া

হয় : অরের জন্য ছেলেটি আরও নিগ্রহের হাত থেকে রেহাই পেল। এই রকমের আরও একটি ঘটনার কথা বলছি। রিপণ কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষা হচ্ছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের মধ্যে বিদেশী কাগজে তৈরী উত্তর পত্র বিতরণ করেন। কিন্তু ছাত্ররা সে কাগজ স্পর্শও করল না। এত প্রবল ছিল তাদের মনোভাব যে তাকে উপেক্ষা করা বিপজ্জনক বলে মনে হল। তাই দেশে প্রস্তুত কাগজের ব্যবস্থা করতে হল। তারপরে যথারীতি পরীক্ষা চলতে থাকে।

ছাত্রদের এই উৎসাহই ক্রমে জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে তাদের মধ্যেও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলল। এ রকমটি ইতিপূর্বে আর কখনও অনুভূত হয়নি। এ এক অদ্ভুত বিস্ময়কর জন-জাগরণ। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ আমাদের গৃহাঙ্গণেও গিয়ে পৌঁছল। মহিলাদের হৃদয়ও তা জয় করে ফেলল। মহিলাদের মধ্যে উৎসাহের মাত্রা পুরুষের চেয়েও বেশী করে দেখা দিল। আমার একটি ছোট্ট নাতনীর কথা বলছি। বয়স তার মাত্র পাঁচ বছর। আমার এক আত্মীয় তাকে একজোড়া জুতা কিনে দিয়েছিল। কিন্তু সে তা গ্রহণ করল না ; কারণ জুতা জোড়া ছিল বিদেশী। 'স্বদেশী' 'স্বদেশী', 'স্বদেশী' ভাব আকাশ-বাতাস ছেয়ে ফেলল। এ কথা বলা বিন্দু-মাত্র অতিরঞ্জন হবে না যে আমাদের তরুণেরাই ছিল এই বিরাট নৈতিক পরিবর্তনের স্রষ্টা।

আমার জীবনে আমি বিপ্লব দেখিনি। কল্পনা করেও ধারণা করতে পারছি না, এর স্বরূপ কি রকম। কিন্তু 'স্বদেশী' আন্দোলনের প্রবল বন্যার মধ্যে আমার মনে হয় যেন আমি বিপ্লবী আন্দোলন দেখা দেওয়ার পূর্বে গণ-চেতনার মধ্যে যে বিরাট পরিবর্তন ও প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়, তার কিছুটা ধারণা করতে পেরেছি। সে এক অদ্ভুত, বিস্ময়কর পরিস্থিতি। বৃদ্ধ-যুবা, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই সেই উত্তেজনায় হেলতে দুলতে লাগল, ছটফট করতে লাগল। এমন কি, যেন কি এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল। কোন যুক্তি নেই, বিচার-বিবেচনাও থেমে গেল। কেবল একটি মাত্র প্রবল, শক্তিশালী আবেগ গোটা সমাজের হৃদয়কে আন্দোলিত করে চলল। জীবনের সব কিছুকেই যেন সেই আবেগের দিকে টেনে নিয়ে গেল। একজন খ্যাতনামা ডাক্তার তার এক ছোট্ট রোগিনীর কথা বললেন। মেয়েটির বয়স ৬ বছরের বেশী হবে না। 'স্বদেশী' আন্দোলনের জোয়ারের সময় রোগের ঘোরে প্রলাপের মধ্যে মেয়েটি চিৎকার করে বলল যে সে কোন বিদেশী ওষুধ খাবে না।

এটা কেমন করে হল? প্রতিটি মানুষ এত অভিভূত হয়ে পড়ল কি কারণে? বাইরের দৃশ্য বা অবস্থা দেখে সে কারণকে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে মোটের উপর একথা বলা যায় যে এর পেছনে রহস্যময় বলে যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠকের দৃষ্টির সামনে থেকে সরে যায়। স্বদেশী আন্দোলনটি বঙ্গভঙ্গ রদের আলোড়নের সঙ্গে সৃষ্ট হয়নি। বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন যে জাতীয় জাগরণের সৃষ্টি করেছে, স্বদেশী আন্দোলন তারই সমকালীন। মানুষের মন এমন কোন নিশ্ছিদ্র সন্ধান কক্ষের মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবে আবদ্ধ থাকে না যেখানে জলও প্রবেশ করতে পারে না। এটা একটা সজীব যান্ত্রিক গঠন। তাই যখনই এর কোন দিকে কোন নতুন অনুভূতি দেখা দেয়, তখনই তা সমস্ত যন্ত্রটাকেই স্পর্শ করে এবং সেই অনুভূতি

মানুষের সমস্ত কাজের ভিতর দিয়েই প্রকাশ পায়। গত শতকের আশীর দশকের প্রথম দিকে যখন কংগ্রেসের আন্দোলন শুরু হয়, তখন এ রকম একটা মন্তব্য এক শ্রেণীর লেখকের মধ্যে (মনে হয় এরা ভারতের স্বার্থের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নয়)—প্রকাশ পেত যে কংগ্রেসের এই আন্দোলন রাজনৈতিক বিষয়ে না হয়ে সমাজ সংস্কারমূলক সমস্যা নিয়ে হলেই ভাল হত ; এবং এইভাবে সামাজিক ও ঘরোয়া বিধি-ব্যবস্থার সন্তোষজনক উন্নয়ন সাধন হলে পরে রাজনৈতিক আন্দোলনকে আরও ভাল-ভাবে কাজে লাগান যেতে পারত। আমাদের জাতীয় অগ্রগতি যে পদ্ধতিতে ঘটেছে তার সম্পূর্ণ রূপটাই এই বিশ্বাসকে মিথ্যা প্রমাণই করে দিয়েছে। সমাজ সংস্কার, শিল্পের পুনরুজ্জীবন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি—সব কিছুই আমাদের জাতীয় জাগরণের পিছনে পিছনে চলে এসেছে। আর তার মূলে আছে আমাদের নেতাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ। এইভাবে আর একবার এই সত্য প্রমাণিত হল যে সমস্ত সংস্কারমূলক কাজই একটি আর একটির সঙ্গে যুক্ত, একে অন্যের উপর নির্ভর-শীল এবং তা পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটায় এবং পারস্পরিক কার্য্য সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একে অন্যকে শক্তিশালী করে তোলে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কার্য্যাবলী কেশবচন্দ্র সেনকে মানুষের প্রসারিত সংস্কারমুখীন আবেগ ও প্রবণতার প্রতি আবেদন করতে সহায়তা করেছে। আবার কেশব-চন্দ্রের কাজ পর্য্যায়ক্রমে কৃষ্ণদাস পাল ও আরও অনেককে তাদের কাজে সাহায্য করেছে। এছাড়া পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে পরিচিত, পাশ্চাত্য রীতি-নীতি ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ যে সমস্ত নতুন রাজ-নৈতিক চিন্তাশীল গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে, তারাও চিরাচরিত পথ ত্যাগ করে তাদের কাজের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছেন। তারা সোজাসুজি শিক্ষিত সমাজের প্রতি, এমন কি জন-সাধারণের প্রতিও তাদের আবেদন জানাতে থাকেন। এইভাবে নতুন চিন্তা, নতুন আদর্শ ও কর্ম পদ্ধতি জনগণকে আলোড়িত করে তুলল। তাদের মধ্যে এমন একটা গতিবেগের সঞ্চার করল যা এই জাগ্রত জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কর্ম প্রয়াসের মধ্যে সাফল্য লাভ করল।

এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ শিল্পেরও পুনরুজ্জীবন দেখা দিল। নিষ্ঠাবান কর্মীরা নতুন ভাবনা নিয়ে দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এই কাজে আদি পথিকৃৎদের মধ্যে ছিলেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। যোগেশচন্দ্র ছিলেন এক বেশ সমৃদ্ধ পরিবারের লোক। এই পরিবারের স্যার আশুতোষ চৌধুরী কলকাতা হাইকোর্টের একজন জজ ছিলেন। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে বারের একজন সদস্য। তিনি 'উইক্‌লি নোটস্' নামে একটি আইনের সাময়িক পত্রিকার প্রবর্তন করেন। আইন বিষয়ক পত্র-পত্রিকার মধ্যে এই পত্রিকাটির বেশ স্বীকৃতি ও প্রামাণিকতার স্থান আছে। তবে তিনি কেবলমাত্র একজন আইনজীবীই নন। স্বদেশের শিল্পের উন্নয়ন হচ্ছে তার কাছে এক অপ্রতিরোধ্য মোহাবেশসঞ্জাত কাজ। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানরূপে স্বদেশী শিল্পদ্রব্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। এটা হয়েছিল ১৮৯৬ সালে। তারপরে ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সময়েও তাঁরই পরিচালনায় আরও বৃহৎ আকারে এই রকম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন।

এইভাবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বিক্ষোভ যখন দেখা দেয়, তার আগে থেকেই 'স্বদেশী' আন্দোলনের জমি প্রস্তুত হয়েই রয়েছিল ; এবং জনগণের মধ্যে যে রাজনৈতিক উদ্দীপনা জেগে ওঠে তা স্বদেশী শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। ভাবের দিক থেকে স্বদেশী আন্দোলন ছিল আমাদের শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার আন্দোলন। কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আমাদের ছিল না সে ক্ষমতা ছিল অন্যের হাতে। সুতরাং আমাদের গৃহ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার চারদিকে শুল্ক প্রাচীর গড়ে তোলার প্রয়োজন হল। সে প্রাচীর তো আইন সভার নির্দেশ মত হওয়ার কোন উপায় ছিল না, তাই জন সাধারণের দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারাই সে প্রাচীর গড়ে তুলতে আমরা চেয়েছিলাম। কেবলমাত্র এক সার্বিক অন্তর অনুভূতির তাড়নায় আন্দোলিত অতিমাত্রায় ভাবাবেগের দ্বারা চালিত জনগণের মধ্যেই এই প্রকার আন্দোলন সাফল্য লাভ করে।

ইয়োরোপীয় পত্র-পত্রিকাসমূহ সমস্ত ব্যাপার-টাকে একটা প্রকাণ্ড ভুল কর্ম মনে করল। এদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে এটা একটা নয় দিনের চমক ছাড়া আর কিছুই নয়। সে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মিলিয়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেল যে সে চমক দীর্ঘ দিন ধরেই চলল এবং যে ৬ বছর বাংলা খণ্ডিত অবস্থায় ছিল সে ৬ বছর ধরে এই চমক খুব প্রবলভাবেই কাজ করেছে। পাশ্চাত্যের অর্থনীতি সম্পর্কে বিজ্ঞ যে সমস্ত বিদেশী পর্যটক ভারত দর্শনে সে সময়ে এসেছিলেন তারা বিস্মিত হয়ে গেলেন। বাংলার মানুষ যে বছরের পর বছর ধরে বেশী দাম দিয়ে নিজেদের দেশে তৈরী পণ্য সামগ্রী কিনবে, কম খরচে সমগুণ সম্পন্ন বা অধিক গুণসম্পন্ন বিদেশী পণ্যদ্রব্য না কিনে, তা তাদের গভীর নিষ্ঠা ও আত্ম-ত্যাগের মনোভাবেরই অলন্ত প্রমাণ বহন করে। যখনই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তখনই তারা এই মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। সে মনোভাবের অভাব কখনও হয়নি। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় তাদের এই নিষ্ঠা ও আত্ম-ত্যাগের প্রতি সব সময় সুবিচার করা হয়নি।

সমাজের মধ্যে যখন একটা প্রবল, প্রচণ্ড ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়, তখন তার গতিবেগ কোন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, জীবনের সর্ব-ক্ষেত্রেই তা অনুপ্রবেশ করে। অবিলম্বেই 'স্বদেশী' আন্দোলন একটি সমাজ শক্তিরূপে দেখা দিল। এই স্বদেশবাদ তার শক্তির উদ্দামতার দিনগুলিতে আমাদের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের সমস্ত গঠনটাকেই রাঙিয়ে দিল। কোন বিবাহে এমন কোন বিদেশী দ্রব্য যৌতুকরূপে দেওয়া যেত না যা স্বদেশে তৈরী হতে পারে ; পুরোহিতগণ দেবতার কাছে উৎসর্গের সামগ্রীর মধ্যে কোন বিদেশী জিনিষ দিলে তা উৎসর্গ করতে অস্বীকার করেন ; কোনও উৎসব অনুষ্ঠানে বিদেশী লবণ বা চিনি ব্যবহার করলে নিমন্ত্রিত অতিথিগণ সে উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাজি হতেন না। জনমতের চাপ এত প্রবল ছিল যে কোন বাঙ্গালী বিদেশী ধুতি বা শাড়ী কেনার কথা চিন্তাও করতে পারত না। যদি কেউ সস্তায় বলে তা কিনতে উৎসুক হতেন, তবে তা তাকে করতে হত অন্ধকারে গোপে যখন কেউ তাকে দেখতে পাবে না ; কিংবা কেউ দেখতে পেয়েছে বলে মনে হলে রাতের নিরাপদ আড়ালে লুকিয়ে থেকে সে দৃষ্টি তাকে এড়িয়ে যেতে হত।

(চলবে)

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এরপরে আরম্ভ হল বিচার। বিদ্রোহী সৈন্যদের বিচার হল লোকচক্ষুর অন্তরালে। বিচার হল একতরফা, হতভাগ্য বিদ্রোহীদের পক্ষ সমর্থনের কোন ব্যবস্থাই হল না। কারণ তারা তখন পরাজিত। জাপানী আক্রমণের সময় যারা কেল্লার বাইরে ছিলেন অথবা বাজার করতে গিয়েছিলেন তাদের বিচার হল না কারণ তাদের পাওয়া গেল না। তবুও বিচারের ফলে তারাও সৈন্যবাহিনী থেকে বিতাড়িত হলেন। কেল্লার মধ্যে যাদের পাওয়া গেল তাদের বিচার হল সামরিক আদালতে।

কোর্টমার্শালেও বিচারের দণ্ড দেওয়ার আগের মুহূর্তে দণ্ডের কথা শুনিয়ে দেওয়া হয়। একদিন ঢোল শহরতে, শহরে প্রচার করে দেওয়া হল বিদ্রোহী বন্দীদের বিচারের হুকুম শোনানো হবে। জনসাধারণ তা দেখতে পারে পরিখার ওপার থেকে। প্রথম দিনে ছয়জন বন্দীকে এনে পর পর সারি বেঁধে দাঁড় করানো হল। তাদের সামনে বন্দুক লক্ষ্য করে দাঁড়িয়ে আছে কুড়ি পঁচিশ জন গোরা সৈন্য। গোরা কণ্ঠে সহসা ধ্বনিত হল, 'Thus justice is done'! এইভাবে ন্যায় বিচার হয়, তারপর আবার সেই গোরা কণ্ঠস্বর— 'Ready! Fire.' ২০/২৫টি বন্দুক একসঙ্গে গর্জন করে উঠল, মুহূর্তের মধ্যে ছয়জন বিদ্রোহী ভূতলশায়ী হলেন ছয়টি ষ্ট্রেচার এল, এলেন একজন ডাক্তার। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন; দেহগুলি মৃত কিনা। মৃত বলে ঘোষণা করার পরে দেহগুলি অন্যত্র অপসারিত করা হল। জনতা বিষণ্ণ মনে ঘরে ফিরে গেল।

এর তিন চারদিন পরে ঘোষণা করা হল, আজ বাইশ জনের বিচারের শুনানী হবে। এদের মধ্যে আছেন বিদ্রোহী নেতা ডাণ্ডি খাঁ। সেদিনও জনতা এসে দাঁড়াল পরিখার ওপারে। দুর্গ প্রাচীরের বাইরের গায়ে বাইশটি খুটি লাগানো হল। সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় একশত গোরা সৈন্য। তারা বন্দুক নিয়ে অর্ধেক দাঁড়িয়ে অর্ধেক হাঁটু ভাঙ্গা অবস্থায় বন্দুক লক্ষ্য করে। কিছুক্ষণ পরে বন্দীদের নিয়ে আসা হল। তাদের পরনে পায়জামা, গায়ে কুর্তা এবং হাতে সামরিক ইউনিফর্ম। বন্দীরা নিজেরাই হেঁটে এসে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়ালেন। প্রত্যেকের সঙ্গে দুজন করে সৈন্য, মাঝখানে দাঁড় করানো হল গৌরবর্ণ ডাণ্ডি খাঁকে। বন্দীরা এসে দাঁড়াতেই গোরা সৈন্যদলের প্রতি হুকুম হল attention! তারা বন্দীদের প্রতি রাইফেলের লক্ষ্য স্থির করল, এর পরে বন্দীদের প্রতি দণ্ডাদেশ পড়ে শোনানো হল মালয় ভাষায়, উর্দু ভাষায় এবং ইংরেজী ভাষায়। তারপরেই আবার সেই কণ্ঠস্বর 'Thus justice is done! এবং তারপরেই Ready, fire.' এবারে একশত রাইফেল একসঙ্গে গর্জন করে উঠল, প্রত্যেকটি রাইফেলের থেকে দুবার fire হল, বিদ্রোহীরা সকলেই ধরাশায়ী হলেন। কেবল বিরাটকায় ডাণ্ডি খাঁ, তখনও দুবার গুলি খেয়েও দাঁড়িয়েছিলেন, তাই আবার হুকুম হল Fire, আবার দুটি গুলি এসে ডাণ্ডি খাঁর বুকে বিদ্ধ হল, এবার তিনি ভূতলশায়ী হলেন। এ দৃশ্য দেখে অনেকেই সহ্য করতে পারছিলেন না। কেউ ডাকছিলেন, খোদা, খোদা, যারা হিন্দু তারা ডাকছিলেন ভগবানকে কেউ বা [illegible]

এর পরেই পূর্বদিনের মতই ডাক্তার এল, এল ট্রেচার। ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা গেল, কেউ কেউ তখনও মরেনি। তাদের কানের কাছে পিস্তল রেখে গুলী করে প্রাণবায়ু বের করে দেওয়া হল। এরপরে আরও কয়েকবার এমনি করে বিচারের প্রহসন চলল। প্রায় শতাধিক বিদ্রোহী বন্দী ইংরেজের প্রতিহিংসার বলি হল। এইভাবে সমাপ্ত হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ব্যর্থ প্রচেষ্টা। শেষ হল, ভারতভূমি থেকে পরম লাইট ইনফ্যান্ট্রির বিদ্রোহ প্রয়াস।

সিঙ্গাপুরে যখন এই বিদ্রোহ দমনের প্রয়াস চলছিল রাসবিহারী তার আগেই জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরই ইংরেজ কর্তৃপক্ষ রাসবিহারীর সন্ধান করে। তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য সাড়ে বারো হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল, ধরা পড়লে তাঁর প্রাণদণ্ড অনিবার্য ছিল। কিন্তু তাই প্রাণরক্ষার জন্য তিনি পালিয়ে জাপানে যাননি। অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার নেতৃত্ব গ্রহণ করেই রাসবিহারী বুঝেছিলেন বিপ্লবী সংগঠন আশ্চর্যজনকভাবে ত্রুটিহীন। বিপ্লবীদের নিকট যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ছিল না বলেই তাদের সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। এবং এই কারণেই তাদের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তাই তিনি জাপানে যাবার সিদ্ধান্ত করেন। সেখান থেকে অস্ত্র আমদানী করে পুনরায় সশস্ত্র অভ্যুত্থান করার উদ্দেশ্যে। তিনি স্থির করেছিলেন, যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হলেই তিনি তা নিয়ে দেশে ফিরে আসবেন, এবং সৈন্যবাহিনীর উপর নির্ভর না করে অসামরিক সংগঠন নিয়েই সশস্ত্র বিপ্লব আরম্ভ করবেন। (চলবে)

পরলোকে বিপ্লবী শ্রীশান্তি দাস

প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীশান্তি দাস বিগত ১২ই জুন মঙ্গলবার কলিকাতায় পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব হতেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৬ বৎসর। তার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা বিদ্যমান।

শান্তি দাসের আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার পাইক পাড়ায়। ছাত্র-জীবনেই তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। কর্মব্যাপদেশে তাকে ব্রহ্মদেশে যেতে হয় এবং সেখানেও সমিতি নির্দেশিত পথে বিপ্লব কার্যে অংশগ্রহণ করেন। বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিযোগে আরো ২১ জন সঙ্গীসহ তাকে ১৯৩২ সালে গ্রেপ্তার করে বার্মা ষ্টেট প্রিজনার আইনে বন্দী করা হয়। পরে বার্মা সংশোধিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি প্রবর্তিত হ'লে তাকে উক্ত আইনে আবদ্ধ করে আকিয়াব, আরওয়াড়ি, রেঙ্গুন প্রভৃতি জেলে রাখা হয়। ১৯৩৮এ তিনি মুক্তিলাভ করেন। অনাবিল, নিরহঙ্কার, বন্ধুবৎসল এই বিপ্লবীবন্ধুর স্মৃতির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা এবং শোকসন্তপ্ত আত্মীয়বর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

পরলোকে প্রখ্যাত বিপ্লবী অনন্ত কুমার চক্রবর্তী

গত ৪ঠা জুন প্রখ্যাত বিপ্লবী অনন্ত কুমার চক্রবর্তী (ভোলা নামেই পরিচিত) পরলোক গমন করিয়াছেন।

অনন্ত বাবুর রাজনৈতিক জীবন দীর্ঘ এবং বৈচিত্রপূর্ণ ছিল। তাঁর বিপ্লবী জীবন সুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। প্রয়াত বিপ্লবী নেতা জিতেন্দ্র নাথ কুশারীর নেতৃত্বে। প্রয়াত বিপ্লবী প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। Arms Act অনুসারে বিচারে ৫ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তারপর ১৯২৬ সালে আলিপুর হত্যা মামলায় স্পেসাল ট্রাইবিউনালে যাবৎজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

নেতা জিতেন কুশারী যুদ্ধ শেষে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন আন্তরিকতার সঙ্গে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন। অনন্তবাবুও নেতার সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন বটে, তবে সহিংস বিপ্লবে—আন্দোলনের উপর তাঁর আস্থা কখনও শিথিল হয়নি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বে তিনি দীর্ঘ দিন বন্যাত্রাণের কাজেও বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করে জনগণের সেবা করেন।

তিনি বিশিষ্ট বিপ্লবী সন্তোষ মিত্র হরিনারায়ণ চন্দ্র ও অন্যান্য সতীর্থদের সঙ্গে যুক্ত থেকে বিপ্লবের জয়যাত্রাকে বিশেষ সাহায্য করেন।

নলিনী গুপ্তের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। বোমা তৈরীতেও তাঁর প্রভূত দক্ষতা ছিল।

১৯২৭ সালে আলিপুর জেল থেকে অনন্তবাবুকে বর্মা পাঠায়। রেঙ্গুন জেল, বোর্সন জেল। মান্দালয় জেল প্রভৃতি ঘুরিয়ে, ১৯৩৩ সালে তাঁকে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠান হয়।

অনন্তবাবু ছিলেন আদর্শ বিপ্লবী, চরিত্রবান, নির্ভীক এবং দেশপ্রেমিক। বিংশ শতাব্দীতে যে সব বাংলা মায়ের সন্তান হাসিমুখে আত্মত্যাগ ও দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম সারির একজন।

আমরা তাঁর আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সমবেদনা জানাই ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

ডিনোসারের ক্ষুধা

॥ শ্রীসতীভূষণ সেন ॥

আদিম যুগে বিরাট দেহ, বিরাট অস্থি ও বিরাট ক্ষুধা নিয়ে একদল ডিনোসার, [DINOSAR] পৃথিবীতে বাস করত। নিজের দাপটে দুনিয়া জয় করে তারা যদৃচ্ছা বিচরণ করত। হঠাৎ কি যে হল, পৃথিবী থেকে একদম লুপ্ত হয়ে গেল ডিনোসার। মাটির নীচে শুধু পড়ে রইল তাদের অস্থি। পণ্ডিতেরা হিসেব করে দেখেছেন ওরা দৈর্ঘে ছিল তিরিশ গজ, ওজনে তিরিশ টন।.....

দেশ বিভাগের পরে পূর্ববাংলা পড়ল পাঠান পাঞ্জাবীদের সুবেদারীর মধ্যে। লম্বায় ছফুট, টকটকে রং, মুখে চোস্ত উর্দু বাত। দেখলেই ভক্তি হয়, ভয়ও। তারা নতুন সংবিধান রচনা করল। সেই সংবিধানে বাঙ্গালীর জন্য দাওয়াদ দেওয়া হল। মার্শালতন্ত্র চীনের সঙ্গে প্রনয় কিম্বা কলহ করবেন, বাঙ্গালীর অধিকার রইল তার খরচ যোগাবার। আফগান ও বালুচ সীমান্ত বিদ্রোহ দমন যদি জরুরী হয়ে পড়ে কোরবানি খাওয়ার অধিকার পাবে বাঙ্গালী। কাশ্মীর প্রশ্ন যদি গরম করে তুলতে হয়, বাঙ্গালীর চালাও অধিকারে থাকবে হিন্দু ভাইদের উপর হামলা করবার। দিল্লীওয়ালা আর বিপ্লবীরা ফ্যাক্টরী স্থাপন করবেন, বাঙ্গালীর একচেটে অধিকার সস্তায় কুলিগিরি করবার। সকলেই বললেন, পাঠান-পাঞ্জাবীদের ছায়ায় আশ্রয় লাভ করাই হবে বাঙ্গালীর পরম সার্থকতা।

পদ্মাপাড়ের মানুষ ওরা নদীর সঙ্গে ভারি মিল। এমনিতে ঠাণ্ডা, কুলকুল করে অভ্রান্ত ধারায় বয়ে যায়। আবার নদীর মতই জীবনেও অকস্মাৎ ঝড় ওঠে। তখন কোথা থেকে ডেকে উঠে বান, ঘূর্ণির আক্রমনে পড়ে ভেঙ্গে পড়ে। রাতারাতি দুনিয়ার রূপ বদলে যায়। সোনাদানা নয়, জমি জরাৎ নয়, কাজিয়াটা লেগেছিল মুখের কথা নিয়ে। তাই থেকে কি যে হয়ে গেল, পাঠান পাঞ্জাবী আর পাকিস্থান, লুপ্ত হায় গেল বাংলা দেশ থেকে। সেই অতিকায় ডিনোসরের মতই।

সন্দেহ নেই, আজ পশ্চিম বঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার অতীব শক্তিমান। তাদের আসন সংখ্যাই তার প্রমাণ। গতবছর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে একমাত্র আধিপত্য লাভ করেছেন। শত্রুপক্ষের ঘাঁটিগুলি ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়েছেন। মানুষ তাদের ভয় করে। খরায় দেশ জ্বলছে, একবিন্দু জল দেবার চেষ্টা নেই, তবু মানুষ কিছু বলে না। বিদ্যুতের অভাবে কল কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সরকার একে একে সেগুলি অধিগ্রহণ করে চলেছেন। কারো সাহস নেই যে প্রতিবাদ করবে চারদিকে খুন খারাবি, রাহাজানি ডাকাতি, মানুষ মুখ বুজে সহ্য করছে। সরকার তার সমর্থকদের ময়দানে জমায়েত করছে আর ডাণ্ডার ভয় দেখিয়ে আমাদের ঠাণ্ডা রাখছেন।

আমাদের জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্র সরকারের অধিকারে। প্রতিটি সমস্যার দিকে সরকারের শনির দৃষ্টি। ক্ষমতা করতলগত করার পরে, প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ও উচ্চশিক্ষার অন্যান্য পরিচালনা কমিটিগুলির পরিচালনা ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন। ক্যাডারে ক্যাডারে কমিটিগুলি ছেয়ে ফেলেছেন। এখন ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি উচ্চশিক্ষার কোর্সে ভর্তির জন্য যে সব প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষা ছিল, তা বাতিল করে দিয়ে, কেবলমাত্র মার্কসবাদে দীক্ষিত ছাত্রদের জন্য দরজা খোলা রাখছেন। শুধু উচ্চশিক্ষা নয়, নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের মত, নদীর ঢেউ গুনবার, তুচ্ছ কাজটিকেও অবহেলা করেন নি।

শিক্ষা কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে, বড় বাড়ীর মানুষগুলো একদম খাটে না। অথচ ওদের অনেক আয়। ওরা খায় অনেক, আর আমরা মরি খিদের জ্বালায়। পুরানো ধাঁচে চললে চলবে না। শুধু ফসল বাড়ানো নয়, দুধ মাছ জোটাবার চেষ্টা নয়। আসল কাজ হল নতুন কাঠামো গড়া। আমাদের ফসল যাতে অন্য কেউ কেড়ে নিতে না পারে আমাদের হয়েও দুধ মাছ যাতে অন্যের পেটে না যায়, তার পাকাপাকি ব্যবস্থা করা চাই। সেজন্য প্রয়োজন হলে আমাদের লড়াই করতে হবে।—শ্রেণীশত্রুদের খতম করার জন্য তাতিয়ে তোলা হচ্ছে সদ্য সাক্ষরতা প্রাপ্তদের।

সে যুগে আমরা মার্কসবাদের নাম শুনিনি, শুনে এসেছি তিনটি শত্রুর কথা। প্রথম শত্রু ছিল ইংরেজ, দ্বিতীয় শত্রু দারিদ্র্য, এবং তৃতীয় ও শেষ শত্রু আমাদের অতীত। প্রথম শত্রুকে বিতাড়িত করে দেশ স্বাধীন হল ; দ্বিতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই সুরু হল। দিকে দিকে কারখানার চিমনী উঠতে লাগল, ডাম বেঁধে সেচের জল আনা হল। এই লড়াইতে প্রথম শত্রু ইংরেজ হয়েছিল আমাদের সহায়। সে Technical Know How দিয়ে সাহায্য করল, আমরা কারখানায় উৎপাদন বাড়ালাম। ইংরাজের কাছ থেকে অধিক ফলনের কলাকৌশল শিখলাম, মাঠে মাঠে সবুজ বিপ্লব আরম্ভ হল। কিন্তু বাধা আসতে লাগল আমাদের অতীত থেকে, অস্পৃশ্যতা জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা থেকে। ওগুলোকে খতম করাই এখন প্রথম কাজ। ঐ যে বলেন 'যুদ্ধ-কালীন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে' সেই রকম করে। কাজ উদ্ধার করা নিয়ে কথা, কি উপায়ে উদ্ধার করা হল সেটা C P M-এর যাঁরা নেতা, একদা তাঁরা আমাদের এই সব কথা শিখিয়েছেন ; আজ তারা মার্কসবাদী। অতএব শ্রেণী শত্রুদের খতম করার কাজই প্রাধান্য পাবে।—ক্ষমতার ক্ষুধা, সে বড় মারাত্মক বস্তু।

অনেক যুদ্ধের পরাজিত বীরদের নিয়ে, অনেক মৃত সৈনিকদের কবর থেকে তুলে এনে, জনতা দল গঠিত হয়েছে। তাঁদের শক্তি নেই, সংগঠনও তথৈবচ। যেটুকু আছে, তা আছে ঐ ক্যাডার ভিত্তিক R. S. S-এর। তাঁরা তো এখনো সাম্প্রদায়িক যুগে বিচরণ করছেন। গো-মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন। সেদিন পাটনার সাধুকে তাতিয়ে তুললেন। ভাগ্যে সাধুবাবার অনশনটা ছিল রাজনৈতিক, তাই মোরারজী 'ইতি গজ' করে তাঁকে আত্মঘাতি সঙ্কল্প থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন।

একটা নিরীহ প্রাণ রক্ষা হল ; এবং একটা মহা রক্তপাতের সম্ভাবনা দূর হল। এখন দেশের অবোলা গরুদের প্রাণ কি উপায়ে রক্ষা হবে সেটাই ভেবে পাচ্ছেন না জনতা সরকার। দুধ দুলে একবিন্দু দুধ পাওয়া যাবে না, সে গরুদের বসে বসে খাওয়াবে কে ? কৃষক না সরকার ? একজনের তো নিজের বুড়ো মা-বাপ আর কচি কাচাদের মুখে দুটো দানা দেওয়ার সঙ্গতি নেই। অন্যজনের মুরোদ নেই অর্দ্ধেক প্রজাকে দুবেলা খাওয়াবার। একবিন্দু গোচারণ ভূমি অবশিষ্ট নেই কোথাও, যে গরুগুলিকে ছেড়ে দিয়ে চোখ বুঁজে থাকবেন। শেষে এই উপোষী গরুগুলিকে ভব-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে কি শিয়াল কুকুর ?

বহুদিন আগে পথ অবরোধ করে যাঁরা গো-হত্যা নিবারণের নামে স্বাক্ষর সংগ্রহ করতেন, আজ তাঁরাই মোরারজীকে দিয়ে আইন প্রনয়ণ গো-হত্যা নিবারণ করছেন। গো খাদকদের মুখের খাদ্য কেড়ে নিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলাই তাঁদের রাজনীতি। ভারতীয় মুসলমান এখনো ভুলতে পারেন নি যে তাঁরা বাদশার জাত। ওদের রক্ত স্বভাবতই গরম। তাই আজে বাজে Issueতে ওদের ক্ষেপিয়ে তোলা ভারি সোজা। ভারি সোজা, শেষটায় ওদের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে সরে পড়া। এই খেলা দেখেছি লক্ষ্ণৌ এর দাঙ্গায়, দেখেছি বেনারসের অলিতে গলিতে। আর সেদিন দেখলাম জামসেদপুরে। এবার বোধহয় কলকাতায় ঐ খেলা দেখানো হবে, তারই তোড় জোড় চলছে। এই উপায়ে কি পূর্ব-ভারত জয় করতে পারবেন R. S. S. ?

আমাদের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অতীতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, কি শেষটায় জনতার শাসনকালে দেশব্যাপী ব্যাপক সাম্প্রদায়িক সংগ্রামের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলবে ? আর গান্ধীজীর আশ্রমের চিরকালের সেবক নিরীহ বিনোভা হবেন সেই Spear head ?

...দৈর্ঘে তিরিশ গজ, ওজনে তিরিশ টন এই ছিল ডিনোসারের মোটামুটি আকার ও ওজন। প্রায় আট নয় তলা বাড়ীর সমান উঁচু, ওজনে দশটা বোঝাই গাউস তিনটনি ট্রাকের কনভয়ের সমান। এতবড় দেহটা জলে কাদায়, পাহাড়ে জঙ্গলে টেনে নিয়ে বিচরণ করার মত শক্তি ছিল দেহে। এই মহাশক্তিমান অতিকায় প্রাণীগুলো পৃথিবী থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কি করে ?

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এত বড় দেহে ওদের ব্রেন ছিল অতিশয় ক্ষুদ্র। এত বুদ্ধি ছিল না যে বিরাট দেহ-যন্ত্রটির ব্যবহার করতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেনি, তাই প্রকৃতি ওদের বর্জন করেছে।

অন্য একদল পণ্ডিত আবার এই থিওরি মানতে চান না। তাঁরা বলেন তখনকার প্রাকৃতিক অবস্থায় ওদের দেহযন্ত্র ছিল নিখুঁত। তাঁরা অনুমান করেন ডিনোসরের শত্রু ছিল তার জঠরের বিরাট ক্ষুধা। সে ক্ষুধার তাড়নায় সে একদিন পৃথিবী জয় করেছিল, সেই ক্ষুধাই হয়েছিল তার মৃত্যুর কারণ। একদিনের শক্তির উপাদান অপরদিনের মৃত্যুর উপাদানে পরিণত হয়েছিল।

———

(Contd. from 2nd cover)

Name	Address	Amount Rs.	Date
Roy Smt. Manorama w-o Late Srisbchandra Roy	29-A, South End Park, Cal.—29	2 0	21. 2. 74
Roy Smt. Santasree	141A/2J South Sinthee Road Calcutta—50	100	19. 1. 78 (till married)
Unm[illegible] of Smt. Aruna Roy			
Sanye[illegible]	5/247, Jatindranagar, Cal.—56	150	2. 3. 78
w-[illegible] Sanyal			
She[illegible] Rani	177-C, Kalighat Road	100	3. 5. 79
v[illegible]ndra Shembi	Calcutta—26		
	Dist—24 PARGANAS		
B[illegible]udha Rani	Vill Kamdabari, Mitali Sangh	150	1. 1. 79
[illegible]adavlal Biswas	Math P. O. Garia		
D[illegible]ndubasini	Vill Amtola P. O. Kanyanagar	100	1. 10. 76
[illegible]Raman Chakraborty			(Enhancement)
J[illegible]Gopal	Vill Purba Tej Sulberia (Dhalua) P. O. Panchpatra Via Saria	200	19. 8. 78
[illegible]shoke Kumar (a)	Nana Ghose. Vill Thuba, P. O. Taki	200	1. 10. 76
[illegible]ari Harihar Ram	123-3, K. D. Road P. O. Garifa, P. S. Naibati	200	15. 8. 72
M[illegible]k Smt. Chhaya w/o Chunilal Mallick	Garulia Main Road, Shyamnagar (Pinkal)	100	1. 10. 76 (Enhancement)
Mazumdar Smt. Nirupama w-o Late Dinesh Chandra Mazumdar	309-I. Ashokenagar	150	5. 6. 78
Maity Smt. Karunamoyee w-o Late Byomkesh Maity	P. O. & Vill Debnagari P. S. Namkhana	100	25 10. 78
Mukherjee Smt. Renuka w-o Kanailal Mukherjee	14, Ramnarayan Chatterjee Lane P. O. Ichapur, P. S. Noapara	150	5. 2. 79

RgodNo. R. M .24611/71 | Diplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
পাক্ষিক :—গ্রাহক ১৫.০০ টাকা | বাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৭৫ পয়সা

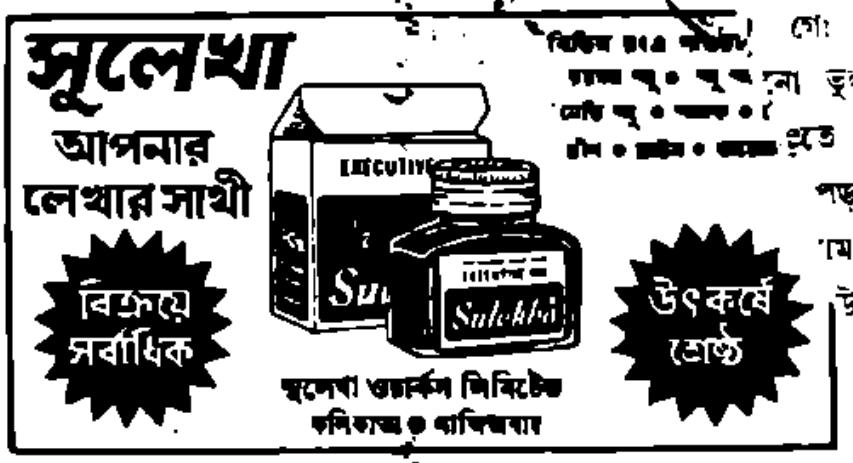

2 6 JUN 1975

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি), শ্রীঅবেশচন্দ্র নন্দী, শ্রীপুলক চ্যাটার্জী।
সম্পাদক—শ্রীমতি সরল রায়চৌধুরী
বিদেশ বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতার—শ্রীনবগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল গুপ্তগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীবীরু গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বক্সরদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পার্টনারসিটী, ১১৭ নং, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাঙলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবর—১৯৭১

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ১৫ই আষাঢ়, ১৩৮৬ ৩০শে জুন, ১৯৭৯	৩৭ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

দেওয়ালের লিখন
। সম্পাদকীয়

ছাগমুণ্ড প্রজাপতি
॥ দীপঙ্কর ভরদ্বাজ ॥

Quo Vadis ?—কোথায় চলেছে ?
॥ কালীপদ সরকার ॥

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস
। কীরোদ দত্ত ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত ।

ঋষি বঙ্কিমের স্বদেশিকতা ও অবদান
। শ্রীঅনীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

'দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয়, তবেই দেশ প্রকাশিত।'

—রবীন্দ্রনাথ

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount Rs.	Date
	Dist—24 PARGANAS		
Roy Smt. Prova Rani	172, East Kankinara Road (Kantadong) P. S Jagatdal	200	17. 12. 78
w-o Late Nalini Kanta Roy	Present Address— C/o K. D Biswas P. O. & Vill Fingapara		
Roy Chowdbury Smt. Anima	Kayadanga, P. O. Kalyangarh	100	25 7. 78
w-o Late Ranjit Roy Chowdhury			
Sen Smt. Saraju Bala	Vill .Noopara, Kalibari Road	100	1. 10. 76
w-o Late Jogendranath Sen	P. O. Barasat		(enhancement)
Sengupta Smt- Asha	57, Barasat Road, Chandanpukur	200	19. 8. 74
w-o Late Nirmalya Sengupta	P. S. Titagarh		
Shom Smt. Saila Bala	P. O. & Vill Media Colony	100	23. 12. 77
w-o Late Rajbihari Shom	P. S. Swarupnagar		
	Dist—HOOGHLY		
Chakraborty Smt. Santisudha	Vill Sukharia, P. O. Somra	150	8. 1. 78
w-o Late Suresh Chakraborty			
Goswami Rajendra Nath	P. O Sheoraphuli, P. S. Serarpur		
Maitra Smt Sandhya Rani	39 Makaltala Lane	150	18. 2. 79
w-o Late Maniklal Maitra	P. O. Bhadrakali		
Mallik Bankim Chandra	P. O. & Vill Chunair	200	1. 10. 76
	P. S. Arambagh		(enhancement)
Sengupta Sudhindra Mohan	P. O. & Vill Goghat	200	1 10. 76
Talapatra Smt. Pankajini		100	10. 1. 7?
w-o Late Bhupendra Talapatra			

(Contd. on 3rd cover)

সম্পাদকীয়—

দেওয়ালের লিখন

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিকতা ও ভয়াবহ নৈরাজ্যের ঘনমেঘ জমে উঠছে। রক্তপাত, অগ্নিসংযোগ, সম্পত্তিহানি, জীবনহানিও ঘটছে, বিহার ও উত্তর প্রদেশে যথাক্রমে জামসেদপুর ও আলিগড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা এর আগেও ঘটেছিল এবং আবারও ঘটছে। নতুন করে পশ্চিমবাংলার নদীয়াতেও এই ব্যাধি সংক্রামিত হয়েছে। ইতিমধ্যে হরিজন ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের উপরও প্রভূত অত্যাচার হয়েছে। কিন্তু দেশের মানুষ গভীর বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করছে যে কর্তৃপক্ষ এই পুরাণো রোগের প্রাদুর্ভাবই বন্ধ করতে পারছেন না, নির্মূল করা ত দূরের কথা। শেষ পর্য্যন্ত দেশের পরিস্থিতিটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা ভেবে চিন্তাশীল ও দেশপ্রেমিক মানুষেরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন এবং সরকার পক্ষের অযোগ্যতা ও অপদার্থতা দেখে হতবাক হয়ে পড়ছেন।

যেমন সাধারণ চিকিৎসা জগতে রোগীর রোগ নিরাময় করতে হলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মূল নির্ণয় করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, রাষ্ট্রে যখন কোন ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তখনও ঠিক একইভাবে রোগের মূল কারণ খুঁজে বের করে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে, রোগ প্রশমিত হয় না। দেশের মধ্যে একাত্মতাবোধের অভাবই হল মৌল ব্যাধি। একথা অনস্বীকার্য্য যে বিদেশী শাসকেরা এই দেশে অনৈক্যের বীজ বপন করে গিয়েছে। আমাদের নেতারাও কিন্তু সেই ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। দেশের মধ্যে তাই আজো সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা ও অনৈক্যের আগুন তুষের আগুনের মত ধিকিধিকি করে জ্বলছে এবং সামান্য কারণে তার পুনরাবির্ভাব ঘটছে। ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, দুর্বল হস্তে এই অবস্থার মোকাবিলা করার চেষ্টা হয়েছে। বর্ত্তমান নায়কেরা কি বুঝেও বুঝতে চাচ্ছে না যে তোষণনীতি ও সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করার ফলেই দেশটা শেষ পর্যন্ত ছুটকরো হয়েছে। কোন স্থিতিশীল সফলতা লাভ করা যায়নি। সত্য বটে যে কিছু দুষ্কৃতকারীরা এই কাজে উস্কানী দেয় কখন হীন নিজস্বার্থের জন্য কখনও বিদেশী রাষ্ট্রের প্ররোচনায়। কিন্তু এই ক্ষুদ্রসংখ্যক লোকদের দমন করা কি এমনই অসাধ্য কাজ? তবে ত প্রশাসনের কোন মূল্যই থাকে না এবং সে প্রশাসনকে জিইয়ে রাখার জন্য দেশবাসীরা রক্ত-জল-করা টাকা দেবে কেন? কেন তাদের এখনই প্রশাসনক্ষেত্র থেকে চিরদিনের জন্য নির্বাসিত করা হবে না? এই প্রশ্নই জনমানসে জেগে উঠেছে।

এই রোগের মৌল কারণ এবং সমাধান সম্বন্ধে কিছু বলাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সর্বোপরি ভারতবাসীই সমান সুযোগসুবিধা ভোগ করার অধিকারী, এই চেতনাবোধের অভাবই সব সঙ্কটের জন্য দায়ী। কোন বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মানুষকে তোয়াজ করে, তা ভোটের আকাঙ্খাই হোক, বা ব্যক্তিগত লোভ চরিতার্থতার জন্যই হোক, কোন সুফল হবে না। প্রত্যেক সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে দেশটা সব দেশবাসীরই এবং ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক বা আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা দেশদ্রোহিতার তুল্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। দেশদ্রোহিতার ন্যায্য প্রাপ্য যে শাস্তি তাও দেশদ্রোহীদের পেতে হবে। নিরপেক্ষতার প্রমাণ রাখতে হবে প্রশাসকদের। হিন্দুর জন্যে এক আইন, মুসলমানদের জন্য ভিন্ন আইন, চাকুরী ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি পরিত্যাগ করতে হবে এখনই। মিজোরামে যারা অ-মিজোদের থাকতে দিতে চায় না, তাদেরই দেশত্যাগ করতে বাধ্য করতে হবে। এখানে দোলাচলচিত্ত হলে চলবে না। হরিজন ভোট, মুসলমান ভোট ইত্যাদি আদায়ের জন্য যে রাজনীতিবিদরা এই সর্বনাশের ইন্ধন জোগাচ্ছেন, তাদেরও কঠোর হস্তে দমন করতে হবে, তা তারা যে কোন ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক হোন। ভোটের লালসায় অন্যায়কারীদের সাজা না দিয়ে, উপর উপর লম্বা চওড়া নীতিবাক্য উচ্চারণ করলে, দেশকে বাঁচান সম্ভব হবে না। অথচ এ সত্য কখনই অস্বীকার করা যাবে না যে বহু মানুষের জীবন আহুতি ও অশেষ দুঃখকষ্টবরণ করার ফলেই দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। যারা আজ অন্যের তৈরী ভোজ্যদ্রব্য স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে দেশপ্রেমিক সেজে ভোগ করছেন তাদের মগজে একথা ঢুকিয়ে দিতে হবে।

দেশের ভবিষ্যৎ আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে চলেছে। দলীয় কলহে মত্ত এবং দলগত প্রতিষ্ঠালাভের জন্য দেশের মঙ্গলসাধন করা সম্ভব হচ্ছে না বলেই অনেকে মনে করেন। রেডিও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বা সভাসমিতিতে সার্থকতার যত দাবী তোলা হোক না কেন, দেশের মানুষ অনুভব করছে যে এ সব ফাঁকা আওয়াজ, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ধোকাবাজী মাত্র। দেশ না বাঁচলে কেউ বাঁচতে পারে না। এই সহজ সরল ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে জব্দ করার কাজে যে শ্রম, অর্থ, সময়, উদ্যোগ, করা হচ্ছে তার চেয়ে একাজ অনেক বড় এবং অবশ্যকরণীয়ও বটে, যদি ভারতবাসী বলে স্বাক্ষর রাখতে চান রাজনীতিবিদরা। এছাড়া অন্যকোন পথও নেই। এখনও সতর্ক না হলে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হওয়া সুনিশ্চিত।

প্রসঙ্গক্রমে অন্য একটি গুরুতর পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার যখন দুর্বল হয়ে পড়ে শুধুমাত্র ক্ষমতা রক্ষার জন্য প্রশাসকদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়, তখন দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে অমনোযোগ এসে যায়। ফলে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে, অর্থনৈতিক জীবন বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে, মৌল আদর্শ থেকে মানুষ বহুদূরে সরে

যায়। সঙ্গত কারণেই মনুষ্যত্বের অবক্ষয় ঘটে। তখনই এই সব দুষ্টশক্তি মাথাচাড়া দেয়, বিদেশী চক্রান্তকারীরাও সর্বস্তরে অশান্তি, হাঙ্গামা সৃষ্টি করে মুনাফা শিকার করতে চায়। অসন্তোষের আগুনও ক্রমবিস্তার লাভ করে। জনতাদলের বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা একসময়ে পুলিশ ও মিলিটারিতে বিদ্রোহের ডাক দিয়েছিলেন। নিয়তির পরিহাস আজ সেটা ঘটছে. যদিও ভিন্ন কারণে। আজ পুলিশের গণ্ডগোল ঠেকাতে সি, আর, পি, ডাকতে হচ্ছে, সি. আর. পির গণ্ডগোল ঠেকাতে মিলিটারী ডাকতে হচ্ছে। এর পরের ধাপ কি হবে ভাবতেও শিহরণ জাগে। আজ শুধু ক্ষীণকণ্ঠে, জনতাকে ঠিক কীভিয়ে বললেই সমস্যার সমাধান হবে না। দেওয়ালের লিখন পড়তে হবে নতুবা পরিত্রাণ নেই কারো। এই প্রসঙ্গে একজন দার্শনিক সংবাদ-পত্র সেবীর মন্তব্য উদ্ধৃত করলে অসঙ্গত হবে না।

"Each event is a poretnt, each despatch a warring of the gathering catastrophi, picked together, they tell a story that should have made statesman weep and act. The hand-writing on the wall is clear enough. But the statesmen cannot read them while they run."

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী জিতেন মুখার্জি

গত ২০শে জুন ফরিদপুরের বিশিষ্ট বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী জিতেন মুখার্জি পরলোক গমন করিয়াছেন। যৌবনে তিনি বিপ্লবী নেতা পূর্ণ দাসের সংস্পর্শে আসিয়া বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। তিনি পূর্ণ দাস মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শান্তি সেনার একটি বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। দেশ সেবার জন্য বহুদিন কারাবাস করিয়াছিলেন এবং নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়াছিলেন। তাঁর চরিত্রবল, আদর্শনিষ্ঠা ও দেশপ্রেম অনুকরণ যোগ্য।

আমরা তাঁর পরিবার বর্গকে সমবেদনা জানাই এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

আমি যদি বলি,—এই সেদিন শিবের সঙ্গে দেখা করে এলাম,—কেউ বিশ্বাস করবেন কি?—আপনি,—নিজে হয়তো একটু অন্যমনস্ক থাকলে প্রশ্ন করবেন,—'শিব?—কে তিনি?—কোন পাড়ায় থাকেন, বলুন তো।'

আপনি অন্যমনস্ক না থাকলে, অবশ্যই এ প্রশ্ন করবেন না। কারণ এ প্রশ্নের জবাবটি অবশ্যি সবাই জানে,—আপনিও জানেন।—শিব তো মাত্র একজনই আছেন;—যিনি দেবের দেব মহাদেব;—শাস্ত্রে যাকে 'রুদ্র' বলেই উল্লেখ করেছে। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের চিরন্তন কল্যাণস্বরূপ, নির্বিকার, গুণাতীত।—আমাদের দেশের তীর্থস্থানে যত দেবদেবীর মন্দির আছে (অবশ্য শিবের মন্দির ছাড়া) সবগুলি একত্রে মিলিয়েও যে সংখ্যা হবে,—একমাত্র শিবের মন্দিরের সংখ্যার তুলনায় তা' নিতান্তই নগণ্য হয়ে

ছাগমুণ্ড প্রজাপতি

শ্রীদীপঙ্কর ভরদ্বাজ

যাবে। সেই শিবের কথাই বলছি। —যিনি পশুপতিনাথ, বিশ্বনাথ, অমরনাথ, বৈদ্যনাথ, তারকেশ্বর, ভুবনেশ্বর এই সব নানান নামে নানান তীর্থস্থানের অভ্যাখানায় সিদ্ধি, চরশ বা গাঁজার গোঁয়া ওড়ালেও, অনাদি, অব্যয় ও অক্ষয় হয়ে বসবাস করছেন কৈলাস ধামে।—

এইবার নিতান্ত সঙ্গতভাবেই আপনি অবশ্য জানতে চাইবেন যে লেখক, গঞ্জিকা, সিদ্ধি গয়রহের ব্যবহারে বা সেবনে অভ্যস্ত কিনা—এবং তার স্বভাব-চরিত্র নিতান্ত স্বাভাবিক ও সুস্থ কিনা—

আপনার সন্দেহ বা অনুমানের বিপক্ষে উপস্থিত করব,—এমন কোন প্রমাণাদি আমার হাতে নেই—তা' গোড়াতেই স্বীকার করে নিচ্ছি ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটের উপর আমার কোনদিনই আস্থা ছিল না বলে সে সব কখনও সংগ্রহ করা হয়নি: আর আমার মত এমন নাম-গোত্রহীন অজ্ঞাত পরিচয় লেখককে কে-ই বা সে সব দেবে?—

অতএব আপনার সিদ্ধান্ত যদি আমাকে নেশাসেবী বলে ঘোষণা করে, বাধ্য হয়েই তার জন্যে আপনাকে রাজনীতিকদের মত গালিগালাজ করতেও যাবো না;—আর শুধুমাত্র এই কারণেই যদি আমার লেখাটা না পড়েন,—তবে তা' পড়ার জন্যে মাথার দিব্যিও দিতে যাবো না আবার কেউ যদি নিজের কৌতূহলবশে এই অবাস্তব লেখাটা পড়েই ফেলেন,—আর লেখাটার থেকে নিজের মনোমত কোন গভীর তাত্ত্বিক আলোচনার আভাষ বের করে নেন,—তাতেও কোন আপত্তি করবো না।—এই গোড়ার কথাটা বলে নেওয়াই নিরাপদ; কারণ আজকাল আপদ কোন চুলোর দুয়ার থেকে এসে যে জোটে,—তা' বলা যায় না।—

যা' হোক, এই ভূমিকার পরে সাহস করেই বলতে পারি—হ্যাঁ, সেদিন শিবের সঙ্গে দেখা করতে কৈলাসেই গিয়েছিলাম; জানি, আপনার মনে অনেক প্রশ্নই উঁকি দিচ্ছে। কৈলাসধামে যাবার পথটা কী?—কী কারণে বা উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম,—কৈলাসটা কেমন জায়গা, ইত্যাদি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই আপনার মনে আসছে।

তা' আপনি যা-ই বলুন, বা যে প্রশ্নই করুন,—আমি কিন্তু আমার নিজের বেছে নেওয়া পথটি ছাড়াতে প্রস্তুত নই —অর্থাৎ, আমি আমার নিজের কথাই বলে যাবো।—তাতে যদি আপনার কিছু বক্তব্য বা জ্ঞাতব্য থেকে যায়, তবে সেটি বর্তমানে মূলতুবি

রাখুন। পরে সম্ভব হলে আপনাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করা যাবে।—

এবার আমার কথাগুলিই বরং একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন।—

শিবের সঙ্গে দেখা করার স্বপক্ষে আমার কয়েকটা কারণও ছিল, একটা বিশেষ উদ্দেশ্যও ছিল। সেই কারণগুলি আর উদ্দেশ্যটির কথাটিই গোড়াতে না বলে নিলে,—আপনার বিচার বুদ্ধিকে পরিতুষ্ট করার আশা করতে পারি না; তাই আগেই বলে নিচ্ছি।—

বর্তমানকালে, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শেষ পদের এই দেশের,—মানে, ভারতবর্ষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করে,—কোন কল্যাণ, মঙ্গল বা শুভের বিন্দুমাত্রও বহুদিন যাবত দেখতেই পাচ্ছিলাম না। বহু বড় বড় গ্রন্থাগারে, বহু ইতিহাস, বিজ্ঞান দর্শন ঘেটে আর দেশের নানা আন্দোলন ও মতবাদের বিশ্লেষণ করে—কোথাও সেই বস্তু খুঁজে না পেয়ে,—অবশেষে দৃষ্টিটা স্বাভাবিকভাবেই এসে গেল ভারতীয় সংস্কৃতির উপরেই। 'স্বাভাবিকভাবে' বলছি এই জন্যে, যে,—যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তাধারার কল্যাণে এদেশী সংস্কৃতিটাকে নিতান্তই অকেজো বলে গণ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম,—তবুও সেকালে, অর্থাৎ আমাদের শিক্ষাসাঙ্গ করার যুগে,—ইংরেজদের রাজত্ব খুব জমজমাট হলেও,—পরিবেশটা ছিল মোটামুটি এদেশীই।—আবার পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষানবিশি শেষার ফলে—কোন অস্তি-পদার্থকেই নাস্তি-পদার্থ বলে গণ্য করতে পারছিলাম না। সেই বহু নিন্দিত, বহু অবহেলিত ভারতীয় সংস্কৃতি নামক ব্যাপারটাকেও তাই এক কথায় নস্যাৎ করার বিরুদ্ধেই মনটা একটু নাড়াচাড়া দিয়েই উঠেছিল।—তাই আরো একটু এগিয়ে গেলাম।—এটাই স্বাভাবিক।

এগিয়েই দেখতে পেলাম ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়াটা দেবদেবীতে একেবারেই ঠাসা। অগ্নি বায়ু, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী,—কে নেই?—

আরো একটু এগিয়ে মনে হল, এই দেবতারাণ্যের মাঝখান থেকে সবার উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শিব।—আর সব দেবতা ভাব-পদার্থ হয়ে এদেরই অঙ্গে মিলিয়ে গেছেন, অথবা এদের আধিপত্য মেনে নিয়ে, নিজেদের কর্তব্য করে যাচ্ছেন। এই সাকার ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শিবও অবশেষে ভাব-পদার্থ হয়ে নিরাকার নিরঞ্জন ব্রহ্মেই মিশে গেছেন। কিন্তু সাকারের পূজা অর্থাৎ ভক্তি ও সেবা ছাড়া নিরঞ্জন নিরাকারকে ধরবার কোন পথ নেই, এই [illegible] তাঁরা পরব্রহ্মে উধাও হয়ে গেছেন।

কিন্তু থাক।—আমি [illegible] বিলাবার চেষ্টায় ছিলাম না।—আমার খোঁজাখুঁজির তখন সাময়িক নিবৃত্তিও এসে গেছে।—আমি তো খোঁজ করছিলাম কল্যাণ, মঙ্গল বা শুভের।—পেয়ে গেলাম স্বয়ং শিবকে। 'শিব'—শব্দের অভিধানগত অর্থই হল কল্যাণ, মঙ্গল বা শুভ।—আর সেই শিবই হলেন একেবারে দেবাদিদেব মহাদেব।—আমার অনুসন্ধিৎসার সাময়িক নিবৃত্তি তো হয়েই গেল।—মনে হল, একটা যেন পথ পেয়ে গেলাম।—পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা আমাকে বঙ্কিম চাটুয্যের 'কৃষ্ণ-চরিত্রের' ধরণে একটা থিসিস্ লেখার পথে টেনে নিয়ে গেল। একটা থিসিস্ লিখেও ফেললাম।—কিন্তু থাক। পরের কথা পরেই হবে,—আগের কথাই আগে বলে নিই।—

থিসিস্ লেখার আগে ভাবলাম,—আমাদের শ্রদ্ধেয়—স্বর্গীয় জাতীয় অধ্যাপক সুনীতি চাটুয্যে মশায়, শেষ বয়সে আমাদের হিন্দু অবতার দাশরথি রামচন্দ্রের সম্বন্ধে যে থিসিসের সারমর্ম শুনিয়ে ছিলেন,—তা' মোটেই সর্বজনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। তাই তাঁকে বহু গালাগালি শুনতে হয়েছিল। কিন্তু আমি বলব, তাঁর সেটা নিজের বোকামির জন্যেই। প্রথম বোকামি হল,—তাঁর মৌলিক গবেষণার জন্যে তিনি রামচন্দ্রকে বেছে নিলেন কেন ?—রামচন্দ্র তো অবতার মাত্র। দ্বিতীয় বোকামি হল,—আদি দেবতা বিষ্ণুকে ছেড়ে যখন রামচন্দ্রকে বেছেই নিলেন, তখন তাঁর উচিত ছিল, ত্রেতা যুগে জন্মগ্রহণ করে অযোধ্যার দরবারে গিয়ে সেই থিসিস্ পেশ করা, আর রামচন্দ্রের একটি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে নেওয়া। তারপরে সেই থিসিস্ জনসমাজে প্রচার করা। তিনি তা করতে পারেন নি। কারণ তা' সম্ভবপর নয়। অযোধ্যা এখনও আছে, কিন্তু রামচন্দ্র সেখানে নেই, এমন কি তিনি আজ এই পৃথিবীতেও নেই। বাল্মীকির রামায়ণে, সরযূ নদীর জলে, রামচন্দ্রাদি চার ভাইয়ের দেহ বিসর্জনের স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে। রামচন্দ্র আজ যেখানে আছেন হয়তো বা সুনীতি কুমার আজ সেখানেই গিয়ে থাকবেন ;—নিজের ভুল ত্রুটি সংশোধন করে, নিজ থিসিসের স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টির চেষ্টায়ই কিনা, তা বলতে পারবো না।—কারণ সেখানে আমি আজও যাইনি।

এইসব ভেবে-চিন্তে অবশেষে ঠিক করলাম, থিসিস্ আমি লিখব,—সেটি হবে শিব সম্বন্ধে। আর সম্ভব হলে, খোদ শিবের কাছে গিয়ে সেটি তাকে পড়ে শোনাব,—তাঁর অনুমোদন হলে গণেশ ঠাকুরকে ধর পাকড় করে গণ-সমর্থন লাভ করা তেমন শক্ত কাজ হবে না। ডাক-সাঁইটে পণ্ডিত সুনীতিবাবুর মত আমাকে কেউ চেনেনা; কিন্তু নিতান্ত অপণ্ডিত বা অপ-পণ্ডিত হলেও আমি স্বর্গীয় জাতীয় অধ্যাপকের মত বোকা নই। তাঁর মত বোকামি আমি করবো না বলেই স্থির করেছিলাম—শেষ পর্য্যন্ত তা' করিও নি।

এই হল আমার কৈলাস-ধামে গমন ও শিব-সাক্ষাৎকারের গোড়ার ইতিহাস।—কারণ এবং উদ্দেশ্য দুইই জানালাম।—রামচন্দ্র বিষ্ণু-ঠাকুরের এক নর-অবতার বিখ্যাত দশ অবতারের অন্যতম। সেইজন্য তাঁর নর দেহের নিয়ম-কানুন মেনে নিয়ে দেহত্যাগ করা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু শিবের দেহত্যাগের কোন উল্লেখ কোন বেদ-পুরাণ-উপনিষদে পেলাম না।—যা' পেলাম,—তা' হল একেবারে বিপরীত সংবাদ। শিব হলেন মৃত্যুঞ্জয়,—অনাদি, অব্যয়, অক্ষয় ব্রহ্ম। বেদে গোড়াতে তাঁর নাম 'শিব' ছিল না বলা হত 'রুদ্র'। আর তাঁর পজিসনটি রাখা হয়েছে অগ্নি, বায়ু, বরুণ—এইসব যুদ্ধবাজ দেবতাদের দলে। যে তিনটি মাত্র সূক্তে তাঁর কথা আর মহিমার বর্ণনা আছে তাতে বলা হয়েছে, তাঁর হাতে রয়েছে বজ্র ; তিনি চারিদিক তোলপাড় করে সব কিছু লণ্ড ভণ্ড করে দেন, কিন্তু ক্ষণিক মাত্র সময়ে বিদ্যুৎ-মালার চমক লাগিয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে অন্ধকার মুক্ত করে পথও দেখান।—এই রুদ্রই পরে 'শিব' নামে বিখ্যাত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে যে সব পৌরাণিক কাহিনী যুক্ত হয়েছে,—তাতে রয়েছে নিষ্কাম, নির্বিকার নির্লিপ্ত চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে অসীম শক্তির পরিচয়। সমুদ্র মন্থনের ফলে উদ্ভূত 'হলাহল' নামক বিষ পান করে, নীলকণ্ঠ হয়ে তিনি দেবাসুর যুদ্ধে বিধ্বস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করেছেন।

(চলবে)

'Quo Vadis ?—কোথায় চলেছ ?

॥ কালীপদ সরকার ॥

কংগ্রেসের দ্বিধাবিভক্তি এবং জনতা দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব ভারতের জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক শক্তির ভবিষ্যৎ মেঘাচ্ছন্ন করে তুলেছে। কমিউনিষ্টরা সেই সুযোগে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের কথা ভাবছে। গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতায় এসে, ভিতর থেকে গণতন্ত্রকে অকেজো করে দিয়ে দলতন্ত্র স্থাপনের কমিউনিষ্ট কৌশল এখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী বলে বিবেচিত নয়।

মার্কসবাদের সহিত গণতন্ত্রের মৌলিক বিরোধ বর্তমান। 'মার্কসবাদ এক বিশেষ আদর্শ ও কর্মপন্থার ভিত্তিতে ঐতিহাসিক বিবর্তনকে নিজের কাঠামোর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করে এমন এক সমাজ গড়তে চান যেখানে মানুষ তার চিরন্তন প্রকৃতিগত বৈচিত্রকে দমন করে একটিমাত্র বিধিবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থায় জীবন ধারণ করবে এবং সেই কঠোর নিয়ন্ত্রণের বাঁধাপথে চলতে চলতে একদিন শ্রেণীহীন সমাজ ও নৈরাজ্যে পৌঁছবে।' মার্কসবাদের এই ভবিষ্যতত্ত্ব 'প্রি-ডেষ্টিনেশন' তত্ত্বের ন্যায় নিছক বিশ্বাসনির্ভর হলেও, মার্কসবাদীরা একে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ বলে মনে করেন এবং গোঁড়ামির সহিত অনুসরণ করতে চান।

তাই কমিউনিষ্টরা গণতন্ত্রের পক্ষে যত বড় বড় কথাই বলুন না কেন, তা অসার ছদ্ম আবরণ ছাড়া আর কিছু মনে করা চলে না।

কার্লমার্কস সমগ্র মানব ইতিহাসকে বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যায় বিশ্লেষিত করেছেন। তাঁর মতে সমাজ বিবর্তনের মূলে একমাত্র অর্থনৈতিক কারণ নিহিত। অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসংগ্রাম তার প্রকৃতি। মানুষের সহজাত সুখপ্রীতি বিচারবুদ্ধি এবং সমাজের সামগ্রিক কল্যাণচিন্তা প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তি সমাজ বিবর্তনে কোন উপাদান জোগায় নি। ধর্ম, সাহিত্য, কাব্য, ও রাধ্যাত্মিক চিন্তা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে ঢেকে রাখবার ছলনা কৌশলমাত্র। জড়বাদনির্ভর এই কমিউনিষ্ট তত্ত্ব মানুষকে বেশী স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক করে তুলে, যা মানুষকে আদিম প্রবৃত্তি অনুসরণে তাড়িত করে এবং সেই কারণে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থাকে কঠোর ও সন্ত্রাসমূলক করতে হয়।

কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রনায়করা লক্ষ্য করেছেন যে, তাঁদের সমাজব্যবস্থাকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করেই শুধু টিকিয়ে রাখা সম্ভব কিন্তু যেহেতু রাশিয়া এবং চীন ভৌগলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, সেই হেতু তাদের চারপাশে শক্ত যবনিকা তুলে দিতে হয়েছে।

কমিউনিষ্ট সমাজ ব্যবস্থা যদি আকর্ষণীয় হত, তাহলে কমিউনিষ্ট পূর্ব-জার্মানীর পঞ্চাশ লক্ষ অধিবাসী-যাদের সকলই প্রায় শ্রমজীবী প্রচণ্ড বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পশ্চিম জার্মানীতে চলে আসবে কেন? এবং সোভিয়েত রাশিয়াকেই বা দেশত্যাগ বন্ধ করার জন্য বার্লিন প্রাচীর গড়তে হবে কেন? লক্ষ্য করার বিষয় যে, গণতন্ত্রী পশ্চিম জার্মানী ছেড়ে একজন মানুষও কিন্তু পূর্ব-জার্মানীর কমিউনিষ্ট স্বর্গরাজ্যে যাবার জন্য পা বাড়ায় নি।

মার্কসবাদের চিত্তহারী আকর্ষণ আর এখন নেই। মার্কসবাদের প্রয়োগ ক্ষেত্র কমিউনিষ্ট

রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আদর্শগত মতভেদ, জাতীয় স্বার্থসঞ্জাত বিরোধ এবং ব্যাপক শোষণবাদ মার্কস ভাবিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করে দিয়েছে।

কমিউনিষ্ট চীন মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের সহিত মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী এবং ইসলামীরাষ্ট্র পাকিস্থানের পিছনে মদত দেয়। রাশিয়া মোল্লাতন্ত্রী আরব দেশগুলির বন্ধুত্ব কামনা করে। আদর্শবাদ ধূম্র যবনিকা মাত্র।

কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পূর্ণবিলোপ, প্রতিটি মানুষের সামর্থানুযায়ী কাজ এবং প্রয়োজন ভিত্তিক পারিশ্রমিক প্রাপ্তির অধিকার এবং সকল শ্রেণীর কর্মীর সমবেতন প্রবর্তিত হয় নি। পরন্তু শ্রমের প্রকৃতি, গুণ ও পরিমাণ অনুযায়ী পারিশ্রমিক দানের বিধান স্থাপিত হয়েছে। ফলে শ্রেণীহীন সমাজ গড়ার সূচনাতেই 'গুণকর্ম বিভাগশঃ' নবতর শ্রেণীবিন্যাস আত্মপ্রকাশ করেছে।

ধর্মকে হটিয়ে দিয়ে তার শূন্যস্থানে প্রচলিত হয়েছিল রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনায়ক পূজা। তাতেও সমস্যার সমাধান হয় নি। ধর্মকে আফিমের নেশা' বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় নি। রাশিয়ার চার্চগুলিকে সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে এবং মস্কোর অর্থোডক্স চার্চের মহামান্য পেট্রিয়ার্কের পদটি সাড়ম্বরে আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যৌথ খামারের কাজ ভালভাবে না হওয়ায়, বহু যৌথ খামারের ভূমি পরিবার পিছু ভাগ করে দিয়ে চাষ করানো হচ্ছে। কল, কারখানা এবং অফিস চলে গুপ্তচর, গোয়েন্দাপুলিশ এবং সশস্ত্র সান্ত্রীদলের নিয়ন্ত্রণে। শ্রমিক বিক্ষোভ, ধর্মঘট এবং কর্মে শৈথিল্য প্রদর্শন সেখানে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ। সন্ত্রাসসচকিত সেই কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে শ্রমিক কর্মচারী সবাই এক রেজিমেন্টের অর্ডারের অধীন। তারজন্য সেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ব্যবসা ভাল ফল দেয়।

পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতে শ্রমিক বিক্ষোভ ও কর্মশৈথিল্যের কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ব্যবসায় লোকসান ও অপচয় ঘটে। বহু অর্থনীতিকের অভিমত,—বিনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন, বিপনন এবং সম্প্রসারিত প্রতিযোগিতা হল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর অর্থনৈতিক ভিত্তি। ভারতের মিশ্র অর্থনীতি দুই নৌকায় পা রেখে চলার মত।

কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি, বেকারি নিরসন ও চাকুরির নিরাপত্তা ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু উন্নতির মান পশ্চিম জার্মানী, জাপান, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন প্রভৃতি অকমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের চেয়ে এখনো নিচে। চাকুরির নিরাপত্তা এখন সকল দেশেই আইন দ্বারা সুরক্ষিত। কাজের অধিকারও উন্নত দেশগুলিতে স্বীকৃত এবং যতদিন কর্মপ্রার্থীর তার পছন্দ ও গুণানুগত কর্মসংস্থান না হয়, ততদিন তাকে সরকার বেকার ভাতা দেয়। পছন্দমত বৃত্তি গ্রহণের স্বাধীনতা ও সুযোগের জন্য প্রতীক্ষা হল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে বেকারির প্রধানতম হেতু।

(চলবে)

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাসবিহারী জাপানে এসেছেন এ সংবাদ অল্পদিনের মধ্যেই আমেরিকায় গদর নেতৃবৃন্দ জানতে পারেন। এজন্য গদর নেতা ভগবান সিং জাপানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য। রাসবিহারী এই সময় জাপানে গোপন জীবন যাপন করছিলেন পি এন ঠাকুর নামে। ভগবান সিং এর আগে রাসবিহারীকে কখনও দেখেননি। সুতরাং জাপানে তাঁর সন্ধান পাওয়া তার পক্ষে সহজ ছিলনা। এ সত্ত্বেও এ বৈঠকে অপ্রত্যাশিতভাবে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে যায়। দেখে অবস্থানকালে রাসবিহারীর প্রায়ই কলকাতায় বাদুর বাগানে যাওয়া আসা করতেন। একদিন সেখানে কথা বলছিলেন অনুশীলন নেতা প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে সামনের টেবিলের উপর ছিল একটা গুলিভরা রিভলবার। প্রতুলবাবু সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটা গুলি বেরিয়ে গিয়ে রাসবিহারীর হাতের আঙুলে বিদ্ধ হল। এর ফলে রাসবিহারীর আঙুলে চির-দিনের জন্য ক্ষত হয়ে রইলো। এই ঘটনার কথা ভগবান সিং আমেরিকায় বসেই শুনেছিলেন। শুনেছিলেন। জাপানে বিপ্লবী বৈঠকে সেদিন রাসবিহারীকে দস্তানা পরে উপস্থিত হতে দেখে ভগবান সিং ধরে ফেললেন তিনি নিশ্চয়ই রাসবিহারী বোস। ভগবান সিং-এর অনুমান মিথ্যা হয়নি। উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ হয় এবং বিপ্লব কর্মে উভয়ই উভয়কে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেন। এই সময় পূর্ব এশিয়ার যাবতীয় কেন্দ্রের ভার [illegible] ভগবান সিং। তাদের এ ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে মিলিত পরিকল্পনায় স্থির হলযে জার্মানরা ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেলিমেনের পথে ব্রীজ আক্রমণ করবে। চীনের জার্মানরা দুইদলে বিভক্ত হয়ে একদল শঙ্ঘাইয়ের দলের সঙ্গে যোগ দিবেন এবং অন্যদল ব্রহ্মের নির্বাসিত রাজবংশের উত্তরাধিকারীকে পুরোভাগে নিয়ে উত্তর ব্রহ্ম আক্রমণ করবেন। ঠিক এই সময়ই তিনখানি জার্মান জাহাজ কিছু অস্ত্রশস্ত্র এবং কিছু জার্মান সৈন্য নিয়ে আন্দামানের বিপ্লবী বন্দীদের মুক্ত করে কলকাতা পৌঁছবেন। পারস্য, আফগানিস্তান এবং বেলুচীস্থানে যে সমস্ত ভারতীয় বিপ্লবী ঐ সময়ে ছিলেন তারাও ঐদিক থেকে একই সময় ভারত আক্রমণ করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু ভারতীয় বিপ্লবীদের অভিযোগ এই যে জার্মানদের সঙ্গে মিলিতভাবে এই পরিকল্পনা স্থির হওয়া সত্ত্বেও এটা কার্যে পরিণত করবার জন্য কোন আন্তরিকতা তাদের ছিল না। কিন্তু এসত্ত্বেও গদর বিপ্লবীদের বিপ্লব প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে তানয়। ভারত প্রত্যাগমনকালে সিঙ্গাপুর, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলকে উত্তপ্ত করে তোলেন। সিঙ্গাপুর কেল্লায় বিদ্রোহীরা অন্তরীণ জার্মান অফিসারদের মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে স্থির হয়েছিল তারা বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন এবং কামানে কিভাবে গোলা বর্ষন করতে হয় ভারতীয় সৈন্যদের তা শিখিয়ে দেবেন। কিন্তু জার্মান অফিসারগণ মুক্তি পেয়েও বিদ্রোহীদের কোন রকম সাহায্য করে নাই। এই জন্যই শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ

আত্ম সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। গদর পার্টির পক্ষ থেকে সিঙ্গাপুরের বিদ্রোহ পরিচালনা করছিলেন মূল চাঁদ সিং। বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পরে তিনি চীনে পালিয়ে যান। মূলতঃ জার্মান গভর্নমেন্ট ভারতীয় বিপ্লবীদের পূর্ব এশিয়ায় কোনরূপ সাহায্যই করে নাই। কথা ছিল বিদ্রোহ আরম্ভ হলে জার্মান পোত ভারতীয়দের সাহায্যে উপস্থিত হবে এবং মিলিত প্রচেষ্টায় ভারত অভিমুখে অগ্রসর হবে। কাজে এই জার্মান সাহায্যের উপর নির্ভর করাই বিপ্লবীদের পক্ষে ভুল হয়েছিল। অবনী মুখার্জী এবং এম এন রায়ের সঙ্গী কণা চক্রবর্তী বা পাইন ও এই সময় ধরা পড়েন। জাপানে গোপনে অধিক দিন অবস্থান করা রাসবিহারীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই জাপান গভর্নমেন্ট জানতে পারলেন পি এন ঠাকুর ভারতীয় বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী। এর অল্প কিছু আগে হেরম্বলাল গুপ্তও আমেরিকা থেকে জাপানে এসেছিলেন। জাপান সরকার তাদের উভয়কেই গ্রেপ্তার করে ইংরেজ হস্তে সমর্পণ করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। প্রকাশ ইংরেজ গভরমেন্টের প্ররোচনাতেই তারা এই কাজ করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু বিশিষ্ট কয়েকজন জাপানীর চেষ্টায় এই ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়। স্বাধীন দেশ হিসাবে জাপানের এইরূপ হীনকার্য তারা অনুমোদন করতে পারেনি। এই সময় লালা লাজপত রায়ও জাপানে ছিলেন। লালাজী হেরম্বগুপ্ত এবং রাসবিহারী তিনজনের প্রতিই জাপান গভর্নমেন্ট নির্দেশ দিলেন যে পাঁচদিনের মধ্যেই তাদের জাপান ত্যাগ করতে হবে। লালাজীর সাথে জাপান ত্যাগ করতে হবে। লালাজীর পক্ষে জাপান ত্যাগ করতে কোন অসুবিধা ছিলনা, তিনি যে কোন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতেন, অথবা দেশে ফিরে আসাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল। হেরম্ব গুপ্তর পক্ষেও আমেরিকার দ্বার অবারিত ছিল কিন্তু রাসবিহারীর পক্ষে ভয় ছিল তিনি জাপান ত্যাগ করামাত্র ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রেপ্তার করবে এবং ঐ অবস্থায় তাঁর মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। লালজী আদেশ পাওয়া মাত্রই জাপান ত্যাগ করলেন। রাসবিহারীর জাপানী বন্ধুরা তাঁকে এবং হেরম্ব গুপ্তকে লুকিয়ে রাখলেন ব্লাক ড্রাগণ সোসাইটি নামে এক জাতীয়তাবাদী সংস্থার নেতার গৃহে। এই নেতা সোমার কন্যাকেই রাসবিহারী পরে বিয়ে করেন।

(চলবে)

যকৃতীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায় অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ প্রতি [illegible]
প্রাপ্তিস্থান:- শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
[illegible]

ঋষি বঙ্কিমের স্বদেশিকতা ও অবদান

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণার নৈহাটির সন্নিকটে কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তনের পরে সর্ব্বপ্রথম যে দুইজন ছাত্র বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, বঙ্কিম তারমধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটিকলেকটারের চাকুরী হয়। সরকারী চাকুরীর নিয়মানুসারে বাংলার প্রায় সব মহকুমা শহরে তিনি বদলি হন ও তাঁর এই কর্ম্মব্যাপদেশে বিভিন্ন জীবিকার ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সাক্ষাত পরিচয় ঘটে। ফলে তাঁর যুগের সর্বস্তরের মানুষের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দারিদ্র্য, আচার-আচরণ, শোষণ-শাসন, সামাজিক ও বৈষয়িক ন্যায়-অন্যায় এবং পারস্পরিক বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ লাভ তাঁর পক্ষে সহজেই সম্ভবপর হয়। তিনি ব্যথাভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই সব ব্যবস্থা ও অবস্থা অনুধাবন করেন এবং দুঃখী, সহায়সম্বলহীন সাধারণ মানুষের কি করে কথঞ্চিৎ-দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা যায় তার বাস্তব কোন না কোন উপায় নির্দ্ধারণে সদা সর্বদা চিন্তামগ্ন থাকেন। একদিকে সরকারী কাজের গুরুদায়িত্ব বহন ও অন্যদিকে জনগণের দ্রুত মঙ্গল সাধন, এই দুই অবশ্যকরণীয় কাজ কিভাবে সম্পন্ন করা যায় সেই চিন্তায় তিনি বিভোর হয়ে পর-দুঃখকাতর দেশহিতৈষী বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গভীর আলোচনান্তে স্থির সিদ্ধান্তে এলেন "বঙ্গদর্শন" পত্রিকা প্রকাশ অবিচল প্রত্যয় নিয়ে তিনি অচিরেই করবেন এবং ঐ পত্রিকার সম্পাদনা ও উহার যাবতীয় ব্যয়ভার তাঁর উপর ন্যস্ত রহিল। বঙ্কিম তাঁর সুদক্ষ লেখনী সঞ্চালনে বাংলায় এক নূতন প্রাণবন্যার প্রবাহ সৃষ্টি করলেন। "বঙ্গ দর্শন" দিকে দিকে বিস্তার লাভ করে, মানুষের মনে শিহরণ সঞ্চার করল। যেমন তার তীক্ষ্ণ ভাষা তেমনি তার গভীর ভাব আর অঙ্গসৌষ্ঠবও মনোরম। শিক্ষিত বাঙ্গালী, বিশেষ করে জমিদার শ্রেণীর বাবুরা প্রমাদ গুণলেন—বঙ্কিমের দ্বারা উদ্ঘাটিত বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। জমিদারদের অত্যাচার, অবিচার, জবরদস্ত জুলুম, ও প্রজাকে অন্যায়ভাবে জব্দ করার ফন্দিতে মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা দায়ের এবং অনুরূপ অন্যায় ঘটনার কথা বঙ্গদর্শনে প্রকাশ পেতে লাগল। সামাজিক নির্যাতন, বৈষম্য, অবিচার ও এক-দেশদর্শিতার কথাও পক্ষপাতহীনভাবে যথানিয়মে প্রকাশিত হতে থাকলো। গরীব চাষী, খেতমজুর, কুমোর, কামার, তাঁতি, নাপিত, ধোপা, গোয়ালা, ঘরামী, রাখাল, মুচি, মেথর, ডোম, হাড়ি, চাঁড়াল—এরা বঙ্গ দর্শন পড়তে পারতোনা বটে, তবে গ্রাম্য বিদ্যালয়ের কোনও কোনও শিক্ষকের মাধ্যমে জানতে পারতো। "বঙ্কিম চন্দ্র" তাদের কথা সাধারণ্যে প্রকাশ করে মানুষের মনে এক নূতন চিন্তাধারা বহন করে আনছেন, মানব চেতনার জাগরণে ঐকান্তিক আগ্রহে যাতে করে এই অধমরা ঘুমন্ত মানুষের দল তাদের অধিকারের বিষয়ে সজাগ সতর্ক হয় ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সংঘবদ্ধ

ভাবে সদলবলে অগ্রসর হতে পারে। বিবিধ প্রবন্ধে,—বাংলার কৃষককুল শিরোনামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো তাতে অধিকাংশ জমিদারের নানারূপ অন্যায় শোষণ ও অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী যথাযথরূপে প্রকাশিত হলো। বাংলার ঘরে ঘরে কি নির্মম ও অমানবিক জঘন্য অত্যাচার নীলকর সাহেবরা শুরু করেছে এবং চাষী নিজের খোরাকীর জন্য নির্দিষ্ট জমিতে চাবুকের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে চাষ করতে বাধ্য হচ্ছে, ধান নয় নীল। তা যে কি করুণ ও মর্মভেদী তা চাষী সম্প্রদায়ই ভুক্তভোগী হিসাবে জানে অন্যের সে বিষয়ে কোন ধ্যানধারণাই নেই—সে সব বিষয়ই বঙ্কিম তার উক্ত পত্রিকায় ঘন ঘন প্রকাশ করতে থাকেন। বন্ধু ও একান্ত সুহৃদ দীনবন্ধু মিত্রকে দিয়ে নীল-দর্পণের (নাটকের) সংলাপ লেখান ও তা বঙ্গ দর্শনে প্রকাশ বঙ্কিমেরই সাহসিকতায় সম্ভব হয়। ইংরাজের অধীনে চাকুরীরত থাকা কালে এই অভূত-পূর্ব সাহসিকতা বঙ্কিমের মধ্যেই দেখা গেছে। ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা ও কঠিন ব্যঙ্গ সাহিত্য রচনায় বঙ্কিমের জুড়ি নাই, তাঁর যুগে ছিল না। "মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত", "কমলাকান্তের দপ্তর" কি সেই সাক্ষ্যই বহন করে না? তিনি নিজে একজন প্রখ্যাত সুবিচারক হয়েও সেইকালে কিরূপ বিচারের নামে প্রহসন বা বিচার বিভ্রাট বা অবিচার হতো বিশেষ করে দেশী মানুষের ক্ষেত্রে তা ঐ মুচিরাম গুড়ের মুখে দেশবাসীকে জানাতে কার্পণ্য করেন নি। অত্যাচারে-অত্যাচারে জর্জরিত বাংলার আসল কঙ্কালসার চেহারা, কমলাকান্তের নেশাঘোরী মুখ-নিসৃত বাণীতে পরিস্ফুট করা হয়েছে। এ হলো সাহিত্যের আইরনিস। কমলাকান্তের অবতারণা শুধু অপূর্ব নয়, অভূতপূর্ব বাংলা সাহিত্যে, আর বঙ্কিমই এর জনক।

বঙ্কিমের যুগে দেশী মানুষের উপর সবচেয়ে বেশী অত্যাচার চালাত ইংরেজ ধনিক-বণিকরা আর এদেশী জমিদাররা জমিদারদের অকথ্য-অত্যাচার থেকে চাষীকে বাঁচাবার উপায় বাংলে ছিলেন বঙ্কিমই; কারণ চাষীদের যে কোনরূপ সংঘবদ্ধতা বা জোট্ তখন ছিলনা। বঙ্কিমের অক্লান্তশ্রম ও তদানীন্তন কিছু উদারপ্রাণ গ্রামা তরুণের সাহসিকতায় চাষীরা সংঘবদ্ধ হতে সচেষ্ট হয়; তাহাই পরবর্তীকালে "রায়ত সভা" নামে এক শক্তিশালী কৃষি সংগঠনে পরিণত হয় এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বেই এই "রায়ত সভা" বাংলার কৃষককুলের অনেক ন্যায় সঙ্গত অধিকার আদায় করে নেয়। স্যার সুরেন্দ্রনাথ একসময়ে এই রায়ত সভার দায় নিজ স্কন্ধে তুললেন। বাংলার রায়তী চাষীর মুখে সেদিন প্রথম হাসি ফুটে ওঠে। বাংলার চাষী ফসল ফলাতো, যা সবাই খেতে পেত কেবল চাষী উপবাসী থাকতো এই ছিল বাস্তব অবস্থা তখন, কারণ জমিদারের প্রাপ্যগণ্ডা (ন্যায় ও অন্যায়), ধাতক মহাজনের ঋণ শোধ ও তার সুদ ফসল মাধ্যমে, অন্যান্য চাষের খরচ, বীজ ধানের মূল্যাবাবদ দেয় মায় সুদ সমেত এরপর আর কত উদ্বৃত্ত থাকে যে চাষী নিজে বা তার পরিবারের লোকজনেরা খায়—এই হলো আসল অবস্থা। চাষী কেবল সারা বছর ঐ বলদগুলোর মত খেটেই মরে, বিনিময়ে যা পায় তা নেহাতই যৎকিঞ্চিৎ, বঙ্কিম এই ব্যাপার সরেজমিনে দেখে বড় ব্যথা পেলেন। তিনি দেখলেন যে,—যে হলো চষে, সে গেল ভেসে। তাঁর সেই কলম শুধু চাষীকে বাঁচায় নি, বাঁচিয়েছে সারা বাংলার সাধারণ মানুষকে, তথা ভারতের

কোটি কোটি নরনারীকে। তাঁর চিন্তাধারা সারা দেশে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাঁর জীবদ্দশাতেই এবং পরবর্তীকালে তাই আবার সারা বিশ্বে চমক হেনেছিল। ঋষি বঙ্কিমের অমর মন্ত্র "বন্দেমাতরম" লক্ষ লক্ষ তরুণের কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ইংরাজের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছিল আর কাতারে কাতারে মানুষ প্রাণ আহুতি দিয়েছিল দেশ মাতৃকার বেদীমূলে ঐ মন্ত্র সম্বল করে। "বন্দেমাতরম" কি অসীম শক্তিধর বাণী তা বারে বারে সংগ্রামের পথে প্রমাণিত হয়ে গেছে। বঙ্কিম শুধু কবি, সাহিত্যিক, সমাজসংস্কারক নন, তিনি ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ ও অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। তাঁর ধর্মতত্ত্ব প্রবন্ধে তাঁর শ্রীকৃষ্ণচরিত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবৎ প্রবন্ধে যে গভীর ও আন্তরিকধর্মভাব ও তাকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার যে কলাকৌশল তা অনাস্বাদিত থাকলে জীবন ব্যর্থ বলে মনে হবে। বঙ্কিম একাধারে জাতির শিক্ষক, শিল্পী, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, ধর্ম বিচারক ও সুসাহিত্যিক। তিনিই জাতীয় জনজাগরণের হেতু আবার পথিকৃত, তাঁর এই যে বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশ ও বিকাশ আমরা দেখতে পাই তা পরম ভাগবৎ ছাড়া বাস্তবে দুর্লভ। যে মাতৃমূর্তির ধ্যান তাঁর "আনন্দমঠে" পাই তা সমগ্রজাতিকে ভাবসাগরে উদ্বেলিত করে স্বাধীনতাকাঙ্খায় প্রাণ বলি দিতে প্রবুদ্ধ করে এক অমোঘ অতীন্দ্রিয় শক্তিতে ভরা দুরন্ত নেশায়। ভারতের জনজাগরণের পথিকৃৎ, বাংলা মায়ের দুঃখে কাতর হয়ে যে লেখনী ধারণ করেছিলো; তা শুধু সার্থক হয়েই স্থির থাকে নি, তা যুগ হতে যুগান্তরে দেশ হতে দেশান্তরে তোমার অমর মন্ত্রকে সফল করে তুলছে। তোমার উপন্যাস, প্রবন্ধ সমাজচিন্তা, রসরচনা ধর্মালোচনা, ব্যঙ্গরসাশ্রিত সুতীক্ষ্ণ শায়ক দেশকালপাত্র ছাড়িয়ে বহু উর্দ্ধলোকে রসোত্তীর্ণ ও সর্বজন স্বীকৃত বাংলাভাষায় স্থায়ী সম্পদ যা যুগ যুগ ধরে "গৌড়জন আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"। সত্যদ্রষ্টা ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিম বাঙ্গালীর বাহুবলের যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন তা সত্যই সেদিন তিনি প্রত্যক্ষ করে ছিলেন আর বাংলার তরুণের সামনে যে আদর্শবাদ ও কষ্টসহিষ্ণুতার প্রতিশ্রুতি তিনি আশা করে ছিলেন তাও অনেকাংশে সফল হয়েছে। বঙ্কিম বাংলার ঘরে ঘরে স্বাদেশিকতায় যে প্রাথমিক আশা-আকাঙ্খা পোষণের ও দায়-দায়িত্ব পালনের এক রূপরেখা অঙ্কিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাই পরবর্তীকালে বিশাল ও বিপুল আকার ধারণ করে। ফলশ্রুতি দেশের স্বাধীনতা লাভ। স্বদেশিকতার মূর্ত প্রতীক ও বিগ্রহ, ঋষি বঙ্কিমের শুভ জন্ম লগ্নে সমগ্র জাতি, তার জাতীয় শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও পরম আপন জন ও দেশপ্রেমের জীবন্ত প্রতিমূর্তি এবং বন্দেমাতরমের উদ্গাতাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করে নিজেকে ধন্য মনে করে। এই ক্ষুদ্র লেখকও প্রণত তোমার শ্রীচরণে সর্বক্ষণ, তুমি গুরু, গুরবে নমঃ।

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

ও

সমাজিক প্রদান—

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

স্বদেশবাদ ও 'বন্দেমাতরম্'

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আমরা অনেক কথাই শুনেছি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির এতটা প্রভাব ছিল না। আজকাল সেই সংবাদপত্রগুলির প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে। আজ দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি সুস্পষ্ট ভাষায়ই অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি তাদের যে ঝোঁক আছে তা প্রকাশ করছে। কিন্তু যা সত্য ঘটনা, তা অস্বীকার করা যায় না। তা হচ্ছে এই যে স্বদেশবাদ আমাদের বাসভূমিতেও গার্হস্থ্য জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার সঙ্গে তুলনা করলে বলতে হয় যে নন-কো-অপারেশন আন্দোলন তার কাছে দাঁড়াতেই পারে না। নন্-কো-অপারেশন আন্দোলন, এমন কি তার সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী কেন্দ্রগুলিতেও (বাংলায় অবশ্য সে কেন্দ্রের সংখ্যা বেশী নেই) একটা সামাজিক শক্তি হয়ে দাঁড়ায় নি। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন তার কার্য্যকালে যে শক্তি ও প্রভাব বিস্তার করেছিল তা একটা সমাজ শক্তি হয়ে উঠেছিল। এই বাংলাদেশেই অসংখ্য গ্রাম আছে যেখানে চরকা ও খদ্দর লোকের কাছে অপরিচিত থেকে গেছে। আমি অবশ্য এমনটি না হওয়াই কামনা করি। কিন্তু সত্য যা তা বলতেই হবে। কোন শিল্প আন্দোলন যদি কোন বিরোধমূলক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে চলে তবে তা সাময়িকভাবে একটা হুজুক প্রেরণা লাভ করতে পারে এবং তার ফলে সে আন্দোলন অনেকখানি এগিয়েও যেতে পারে : কিন্তু পরিণামে এই রাজনীতির সঙ্গে একত্রে চলার ফলে তাকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। শিল্পকে পরিচালিত করতে হবে ব্যবসায়িক পন্থায়। এই ব্যবসা বুদ্ধিই শেষ পর্য্যন্ত এই শিল্পের গতিপথ ও উন্নতির ধারাকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করবে। পুঁজি, সংগঠন ও বিশেষজ্ঞের জ্ঞান—এই তিনটিই হচ্ছে শিল্পোদ্যোগের মূল ভিত্তি। স্বদেশ প্রেমের প্রেরণা এ কাজে নিশ্চিতভাবেই সহায়তা করবে। কিন্তু তা করবে সাময়িকভাবে। কারণ সে প্রেরণা দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে আর থাকবে না।

সময় সময় একথা বলা হয়ে থাকে যে আমাদের গণ-আন্দোলনগুলি প্রাণহীন। এই প্রাণহীনতার কারণ স্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে আমরা সব সময় জন-সাধারণকে আমাদের সঙ্গে নিচ্ছি না। এই প্রশ্নটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার সময় বা স্থান এটা নয়। জন-সাধারণ তাদের বিশেষ কোন স্বার্থের সঙ্গে জড়িত নয় এমন কোন আন্দোলনের সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেনা। সমস্ত বড় বড় আন্দোলনই বুদ্ধিজীবী নেতাদের দ্বারাই সৃষ্ট হয়; তারাই তা পরিচালনা করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন। জন-সাধারণ যা করে, তা হল কম-বেশী পরিমাণে

সেই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও নৈতিক সমর্থন। কোন কোন বড় বড় ঘটনার সময় তারা সোচ্চার হয়ে ওঠে যখন তাদের অন্তরে কোন গভীর অনুভূতির আলোড়ন সৃষ্টি হয়। যখন তাদের প্রতি অতীতের কোন অন্যায় অত্যাচারের স্মৃতি কিংবা বর্তমানের কোন অত্যাচার বোধ জেগে ওঠে। এই অবস্থায় তারা বিক্ষোভ প্রদর্শনে নেমে পড়ে যা সময় সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। 'স্বদেশী' আন্দোলন তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থবোধের প্রতি সার্থক আবেদন করেছিল। তাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণের এরূপ বিচার বোধ ছিল যে তারা বুঝতে পেরেছিল যে এই আন্দোলন যদি সফল হয় তাহলে তা তাদের বৈষয়িক সুযোগ সুবিধা লাভের এক নব যুগের আবির্ভাব ঘোষণা করবে।

পঞ্চাশ বছর আগে আমি যখন দেশের কাজে নেমেছিলাম তখন আমার তিনটি লক্ষ্য ছিল। সে লক্ষ্য আমাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎসাহিত করে রেখেছে এবং আমি আমার রাজনৈতিক জীবনের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে সে লক্ষ্য অনুযায়ী আমার সাধ্যমত কাজ করার প্রয়াস পেয়েছি। আমার লক্ষ্যগুলি ছিল এই—(১) আমাদের একটি সর্ব-জনীন সাধারণ স্বার্থের উন্নয়ন বিধানের জন্য ভারতের সর্ব শ্রেণীর মানুষকে একটিমাত্র মঞ্চে এনে তাদের ঐক্যবদ্ধ করা। (২) তাদের উন্নতি বিধানের জন্য প্রথম অপরিহার্য্য সর্ত হিসাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ স্থাপন করা (৩) সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি সাধন করে তাদের আমাদের গণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা। এর মধ্যে প্রথম দুটি লক্ষ্য সাধনের জন্য আমি ১৮৭৬ এবং ১৮৭৭ সালে সারা ভারতে ভ্রমণ করেছি। অসংখ্য জন সভায় ভারতীয়দের মধ্যে একতা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা করেছি এবং আমাদের জাতির একটি বড় রকমের অভিযোগের প্রতিকার আদায়ের জন্য সার্বজনীন দাবী উত্থাপন করে সারা ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছি। স্বদেশী আন্দোলন আমার জীবনের এই তিনটি লক্ষ্যের মধ্যে একটি লক্ষ্যে পৌছবার এক মহান সুযোগ এনে দিয়েছিল এবং আমি সেই আন্দোলনকে সানন্দে তৎপরতা ও উৎসাহের সহিত আঁকড়ে ধরলাম।

দেশের সর্বত্র স্বদেশী সভার আয়োজন করা হল। আমাদের প্রদেশের সীমা ছাড়িয়ে ও অনেক জায়গায় সেই সভার অনুষ্ঠান হতে লাগল। আমার স্বাস্থ্য ও শক্তি সামর্থ্য নিয়ে যতগুলি স্থানে সম্ভব আমি উপস্থিত থেকে বক্তৃতা করেছি। এই সমস্ত বক্তৃতা প্রায়ই বাংলা ভাষায় করেছি। এই সময়টা ছিল অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ এবং কাজও করতে হত দুর্দান্ত পরিশ্রম করে। কাজ করতে কেউই পিছপা হননি। সকলেই নিজ নিজ সাধ্যমত কাজ করেছেন। আমরা অনেক অজানা এবং অদ্ভুত জায়গায় ঘুরেছি। কোন কোন স্থানে যাওয়াও ছিল একটা কঠিন কাজ। অদ্ভুত অদ্ভুত খাওয়াও আমরা খেয়েছি। কিন্তু তাতে আমরা কেউ কিছুই মনে করিনি। কোন কিছু সম্পর্কেই আমরা কোন আপত্তি বা অভিযোগ করিনি। দূর দূর অঞ্চলে আমাদের যেতে আসতে নিদারুণ কষ্ট ও অসুবিধা হয়েছে। মালেরিয়া ও কলেরা রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও আমরা ঘুরেছি। আমাদের উৎসাহই ছিল আমাদের রক্ষাকবচ। কোন রোগেই আমরা আক্রান্ত হব না কোন বিপদই আমাদের স্পর্শ করবে না—কাজের উৎসাহের মধ্যে এই বিশ্বাসই আমাদের নৈতিক টীকা নেওয়ার মত

কাজ করেছে। সে টাকা কখনও বিফল হয়নি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের একজন সাথীর কথা উল্লেখ না করে পারছি না এবং বলতে কি তা এখুণি করছি; কারণ তাকে আমরা চিরদিনের মত হারিয়েছি। আমি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের কথা বলছি। তিনি ছিলেন 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক। এক মারাত্মক ব্যাধিতে তিনি ভুগছিলেন, যে ব্যাধির নাম ব্রাইটস্ ডিজিজ। তা সত্বেও আমন্ত্রণ পেলেই তিনি যে কোনও স্বদেশী সভায় উপস্থিত থাকতেন। তিনি সভাগুলিতে একটি নতুন রীতির প্রচলন করেন। সেই রীতিটি আজও আমাদের সভা সমিতি ও বিক্ষোভ শোভাযাত্রা ইত্যাদিতে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। রীতিটি হচ্ছে এই সমস্ত অনুষ্ঠান একটি সময়োপযোগী দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের দ্বারা শুরু করা। কাব্য বিশারদের অতি সুন্দর সঙ্গীত প্রতিভা ছিল। নিজে তিনি গান করতে পারতেন না, কিন্তু তিনি অতি চমৎকার সঙ্গীত রচনা করতেন। এই সঙ্গীতগুলি স্বদেশী সভায় গাওয়া হত। শ্রোতাদের হৃদয়ে তা গভীরভাবে রেখাপাত করতে কখনই ব্যর্থ হয়নি। সঙ্গীত রচনার ক্ষমতা ছিল তার একটি প্রকৃতি দত্ত স্বাভাবিক গুণ। হিন্দী ভাষায় তার সে রকম খুব পাকা দখল না থাকা সত্বেও তার রচিত 'দেশকি ইয়ে ক্যা হালত' হিন্দী সঙ্গীতটি ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ হৃদয়-গ্রাহী সঙ্গীত। দেশী জিনিষ ফেলে বিদেশী জিনিষ গ্রহণের প্রতি যে মোহ আছে, তাকে প্রচণ্ডভাবে নিন্দা করা হয়েছে এই সঙ্গীতে। ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে হাজার হাজার লোকের সমক্ষে যখন এই গানটি গাওয়া হয় তখন সেই বিশাল শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে তা এক প্রবল অশান্ত উত্তেজনার মধ্যে টেনে নিয়ে যায়।

কাব্য বিশারদের সঙ্গে সর্বদাই দুজন ওস্তাদ সঙ্গীত শিল্পী থাকতেন। তারা স্বদেশী সভাগুলিতে উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত গান করে শুনাতেন। কাব্য বিশারদ নিজেই তাদের শিক্ষা দিতেন ও বেতন দিয়ে ভাষণ পোষণ করতেন। নিজে ধনী ব্যক্তি না হলেও বাইরের কারও কাছে তিনি তাদের ভরণপোষনের জন্য কোনও সাহায্য চাইতেন না। একজন বড় ধরণের বক্তা তিনি ছিলেন না; কিন্তু একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন। বিদ্রূপাত্মক রচনা লিখে ভারতের প্রগতি বিরোধী শক্তিগুলির উপর তীব্র ও নির্মমভাবে আক্রমণ চালাতেন। স্বদেশের কাজে আত্মনিবেদিত-প্রাণ কাব্য বিশারদ দেশ-মাতার সেবার কাজে কখনই কুণ্ঠিত ছিলেন না। মনে আছে, ১৮৯৯ সালে গায়ে জ্বর নিয়ে তিনি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। সে সময় তার উপর একটি মানহানির মামলার পরোয়ানা ও ঝুলছিল। নিজের স্বাস্থ্য বা শরীর সম্পর্কে তার কোন রকম ভ্রূক্ষেপই ছিলনা। নিজের দৃঢ় ইচ্ছা নিয়েই চলতেন; এমনকি সে ব্যাপারে তার ছিল একটা একগুয়েমী ভাব। কারও উপদেশ বা বাদপ্রতিবাদের উপরে ছিল তার নিজের ইচ্ছা। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি দ্রুত মৃত্যুর গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর নিকট আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবগণ ভাবলেন যে তার স্বাস্থ্যের যদি উন্নতি সাধন করতে হয়, যদি তাকে তার এই স্বদেশ প্রেমোন্মাদনার পরিণতি থেকে বাঁচতে হয়, তাহলে তাকে তার স্বদেশ প্রেমের ক্ষেত্র থেকে দূরে সারাতে হবে। একজন বন্ধু ডাক্তার হিসাবে এক যাত্রী বাহী জাহাজে জাপান যাচ্ছিলেন; (চলবে)

(Contd. from 2nd cover)

Name	Address	Amount Rs	Date
	Dist—MIDNAPUR		
Chakraborty Smt. Kanak w-o Late Indra Bhusan (alias Indu Bhusan)	P. O. Hijli Cooperation Colony	100	21. 4. 77
Giri Smt. Biraj Bala w-o Late Prasanna Giri	Vill Bhobanipur, P.O. & P. S. Danton	100	15. 8. 72
Maity Smt. Kiran Bala w.o Late Maheswar Maity	P. O. & Vill Jashorajpur	100	1. 10 76 (enhancement)
Routh Smt. Hiran Bala w-o Late Motilal Routh	Vill Bahi Charel P. O. Radhaballavpur	100	14. 8. 78
	Dist—PURULIA		
Mahato Smt. Pramila w-o Late Umesh Mahato	P. O. & Vill Majhihira	100	23. 1. 79
	Dist—HOWRAH		
Manna Radha Gobinda	Vill Purba Bagnon P. O. Bagnan	200	1. 10. 76 (enhancement)
Sen Kumari Ranu d-o Late Dwaraka Nath Sen,	50, Sree Arabindo Road, Salkia	150	29. 8. 78
	Dist—BIRBHUM		
Sircar Hemendra Narayan	National Sugar Mills, Refuge Coly P. O. Ahmedpur	200	20. 9. 73
	Dist—WEST DINAJPUR		
Deshi Smt Duma (Sarkar) w-o Late Hriday Deshi (Sarkar)	Vill Durgapur, P O. Shehole P.S. Kumarganj	150	7 7. 76
	Dist—NADIA		
Chaudhury Sribas	P. O & Vill Ashachia P. S. Kaliganj	Arrears from 1. 6 75 to 31 10. 76	
Mukhopadhyaya Jiban Krishna	Nagendra Nagar P. O Krishnanagar	200	1. 10 76 (enhancement)
Bhattacharjee Bhab Taran	Taherpur Colony, Plot No. 745 Block Road-9	200	

RgedNo. R. N .24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. W B/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

৫/১০

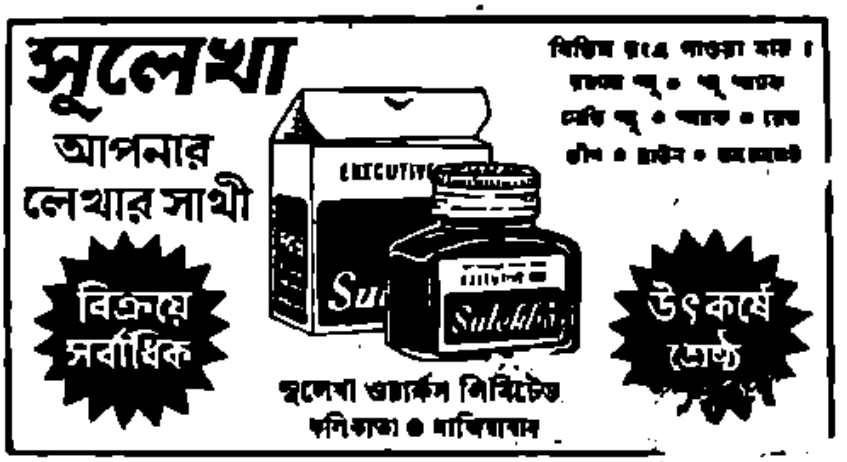

4 JUL 1979

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীঅবনেশচন্দ্র নন্দী, শ্রীপুলক চ্যাটার্জী।
সম্পাদক—শ্রীসাধি পরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবরীন ঘোষ। বেঙ্গালা—শ্রীরঙ্গগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅমিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীবীরেন্দ্র গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৯নং বন্ধুদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাঙালী

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে-

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ২২শে আষাঢ়, ১৩৮৬ ৭ই জুলাই, ১৯৭৯	

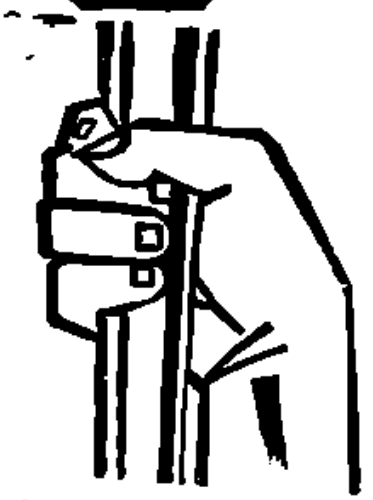

এই সংখ্যায়

কুইট মিজোরাম
॥ শ্রীগো

সংক্ষিপ্ত জীবনী সবেরা খাতুন
॥ শচীন্দ্রনাথ গুহ

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস
। ব

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক মলিনী মোহ

ন তোমার রূপ দেখি গো।
স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
মন্ত মায়ের স্নেহ!
গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি!'

Shri A. V. S. Krishnan
Under Secretary to the Govt. of India,
Ministry of Home Affairs,
New Delhi,

Sir,

Ref. No. 3/2/79-FF (P) dt. 12th April 1979.

With regard to above, I beg to make the following submissions :

There is no doubt that the Andaman prisoners had suffered difficulties charact istic of the situation but it is wrong to hold that every convict staying in the mainland jails elsewhere had been free of troubles and lived in comparative ease. There are known ca when firing inside the jail or camps resulted in the death of prisoners ; scores commit suicide in and outside the prison walls, some died from bites of serpants, wild animals a abid dogs, not a few had been beaten to death by the police when placed in their charge internees in distant villages, some died of disease at out of the way places without medi rtreatment whatsoever. The Deoli camp was a veritable death trap. The conditions prev: jng in the camp were no less but more regorous than the conditions prevailing in the Cellu Jail This will be evident from a comparison of the number of casualties in inland camps e and the Cellular Jail.

Moreover, prisoners who had experience of both types of jails when re arrest after release, preferred the Cellular jail for a transfer and their request was granted. H there not been some redeeming feature, the request to be removed to the Andamans wou never had been made.

The present scheme was adopted abouttlen years ago. While there had been increase in the amount of pension, prices of edible and all other articles have since increas many times. So much so, the Government had to revise the pension of their own servants cent per cent. Most of the Freedom Fighters arranged their meals in cheap hotels and establishments of poor relations, In every case there is discontant over the rate of paym for two meals a day and the arrangement for regular meals has been disrupted. Hundreds freedom fighters have to remain satisfied with prepared food purchased from nearby vendors.

Taking every point into consideration it is imperative that every freedom fighi except those who have already been pleced above wants, be immediately provided with a lur sum of Rs 1,000 only, to meet the debts already incurred while the case for a generous i crease of the monthly pension is favourably considered.

Yours faithfully,
Sd/- K. C. Ghosh

কুইট মিজোরাম

। শ্রীসতীভূষণ সেন ।

ভেবেছিলাম ওদের ভারত বিদ্বেষ কমেছে। এতদিন পরে মিজোরামে শান্তি এসে দেখছি সব ভুল। জুন মাসের প্রথমে বিদ্রোহী MNF সংগঠনের পক্ষ থেকে চরমপত্র প্রচারিত হ যে এক মাসের মধ্যে অ-মিজোদের সকলকে মিজোরাম ছাড়তে হবে। যারা ছাড়বে না তাদের বির ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভীতি প্রদর্শন যে শূন্য গর্ভ নয়, দেখাবার জন্য দেরি না করে ১৪ই জুন তারি P. W. P-র S. D. O-কে হত্যা করল।...ইদানীং কিন্তু MNF-এর মতিগতি পরিবর্তনের ল দেখা গেছিল। বিশেষতঃ ব্রিগেডিয়ার সাইলো মন্ত্রীসভা গঠন করে মিজোরামের শাসনভার গ্র করার পরে।

অবশ্য 'কুইট মিজোরাম' নোটিস প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের টনক নড়া উচিত ছি 'কুইট' নোটিস তো এই প্রথম নয়। আগেও দুবার প্রচারিত হয়েছে। কোনবারই সেগুলো ক ভয় দেখানো নোটিস ছিল না। ৭৩ সালের নোটিসের পরে গভর্ণরের উপর মারাত্মক আক্রমণ হয়েছি ভাগ্যক্রমে তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন. কিন্তু জন্মের মত পঙ্গু হয়ে রয়েছেন। ৭৪ সালের নোটি পরে নিহত হয়েছিলেন ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ। ৭৮ সালে কোন নোটিস ছাড়াই, বর্তা গভর্ণরের উপর আক্রমণের একটি ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, যেটা ভাগ্যক্রমে ধরা পড়ে যায়। সে অবস্থ এ বছর নতুন করে নোটিস প্রচারিত হওয়ায় স্বভাবতঃই সরকারের আরো সজাগ হওয়া উচিত ছিল।

S. D. O.র হত্যার পরে অবশ্য এখন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এ সেটা রক্ষাও করা হবে বেশ কিছুদিন। তাতেই তো আর শান্তি আসবে না। শ' দেড়েক শি গেরিলা বাংলাদেশের নতুন ঘাঁটি থেকে মিজোরামে প্রবেশ করেছে ; তাদের মোকাবিলা না করা প স্বাভাবিক অবস্থাও ফিরে আসবেনা। তারপরে রাজনৈতিক উপায়ে MNF-এর সঙ্গে বোঝাপড়া কর হবে। দেশের মধ্যে সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে চরমপন্থীদের একঘরে করে ফেলতে হবে। যতা তা না হচ্ছে. ততদিন মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না। শান্তিপ্রিয় নাগরিকও স্বস্তির নিঃ ফেলবে না। কাজগুলি সহজ নয় মোটেও এবং কেন্দ্রিয় সরকারের পরিপূর্ণ ও অকুণ্ঠ সমর্থন ছাড়া হ ওঠাও সম্ভব নয়। তা কি পাবেন মুখ্যমন্ত্রী ? তিনি যে 'জনতার ফাইলের' লোক নন। যে-'ফাইল'

আবার কাছাড়ের মানুষ প্রতিশোধ নিতে গিয়ে, আর এক অনর্থের সৃষ্টি করে বসেছে শিলচরের খবর প্রচারিত হতে না হতে হাজার দশেক মিজো নাকি সমবেত হয়েছিল কাছাড় মিজো সীমান্তে, কাছাড়ের 'বিপন্ন' মিজোদের উদ্ধারের জন্য। তাদের রুখতে না পারলে কি অবস্থা

পাঠানো সম্ভব হয়। শিলচরের ঘটনার ফলে, নরমপন্থী মিজোদেরও সহানুভূতি গেছে চরমপন্থীদের দিকে। MNF শক্তিবৃদ্ধি করার সুযোগ পেয়েছে।

কাছাড়ে যে মিজোরা নিহত ও আহত হয়েছেন, তারা কেউ S. D. O. হত্যার জন্য দায়ী, একথা পাগলেও বলবে না। এদের উপর আক্রমণ শুধু যে অকারণ তাই নয়, কাপুরুষতাও বটে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সময় এই রকমই হয়ে থাকে। অপর সম্প্রদায়ের নিরীহ বিপন্ন প্রাণ ভয়ে ভীত মানুষদের উপর আক্রমণই হয় কাপুরুষদের বীরত্ব দেখাবার নিরাপদ উপায়। শিলচরে মিজোদের উপর আক্রমণের নিন্দার ভাষা নেই। নিহত S. D. O. শিলচরের মানুষ হলেও নয়। শিলচরের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী সাইলোর কাজ আরও কঠিন হয়ে পড়বে।

ব্রিগেডিয়ার সাইলো ভারতীয় বাহিনীর একজন অবসর প্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার। ১৯৬২ সালে তিনি Punjab Regiment এ কমিশন লাভ করেন। অবসর গ্রহণ করেন Assam Regiment-এর ব্রিগেডিয়ার-রূপে। সৈনিক জীবনের শেষ কয়েক বছর তাঁর খুবই মানসিক অশান্তির মধ্যে দিয়ে গেছে। ৬৬ সালে লালডেঙ্গা যখন ভারতের সংগে সম্পর্ক অস্বীকার করে মিজো বিদ্রোহের ডাক দিলেন, তখনও সাইলো Active Service-এ। তাঁর ছেলে 'ক্যাপ্টেন' সাইলো বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়ে লালডেঙ্গার একান্ত সচিব পদে নিযুক্ত হলেন। ছেলের চোখে তিনি হলেন বিশ্বাসঘাতক Collaborator, আর ভারতীয় আর্মির চোখে হয়ে পড়লেন দেশদ্রোহীর পিতা, বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

অবসর গ্রহণের পরে, Emergency-র সময়, তিনি মিসায় বন্দী হলেন; মুক্তিলাভ করলেন জরুরী অবস্থা অবসানের পরে। এরপর রাজনীতিতে যোগদান করে, নিজে পৃথক দল গঠন করলেন, Mizo Peoples Conference। নির্বাচনে জয়লাভ করে মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। ছয় বছর অরাজকতার পরে মিজোরামের জনতা অবশেষে শান্তির পথ বেছে নিল। তাদের চোখে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি একদিকে মোরারজী ও অন্যদিকে লালডেঙ্গার সংগে আলোচনা করার শক্তি রাখেন।

তিনি প্রকাশ্যে লালডেংগার রাজনীতির সমালোচনা করেছিলেন। ভূতপূর্ব মিসাবন্দী হিসাবে 'জনতা'-দলে যোগ দেওয়াই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু তিনি নির্বাচনে 'জনতা'র সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাকে পরাজিত করেছিলেন। লালডেংগার নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা সত্ত্বেও ভোট কিছু কম পাননি। শাসনভার গ্রহণ করার পরে প্রথম কাজই হয়েছিল সরকারকে কলুষ মুক্ত করার প্রচেষ্টা। সেই কাজে প্রথমে পঞ্চাশ জন ঠিকাদারকে Black List করতে হল। এই নতুন ধনী ঠিকাদার গোষ্ঠী ছিলেন মিজোরামের নির্বাচনী রাজনীতির মেরুদণ্ড। তাদের পকেটে হাত পড়ায় কয়েক মাসের মধ্যেই এল শাসন সংকট। 'মিসাবন্দী' অতএব ইন্দিরা কংগ্রেসের শত্রু, 'ঠিকাদার হত্যা' অতএব 'জনতা'রও

কংগ্রেসের মিলন এই প্রথম দেখা গেল ভারতে। তবু ব্রিগেডিয়ার সাইলোকে গদীচ্যুত করা সম্ভব হল না। কিন্তু বিপদ আসলো অন্যদিক থেকে।

১৯৬৬ সালের ব্যর্থ বিদ্রোহের পরে লালডেঙ্গা পাকিস্তানে পলায়ন করেছিলেন। আয়ুবখাঁর সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় মিজোরাম সীমান্ত থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে changtlang এ ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। এখান থেকেই তিনি শাষণ পরিচালনা করতেন। ট্যাক্স আদায় করা এবং ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করে তাদের ট্রেনিং দেওয়া হত এখানেই। আয়ুব খাঁর মধ্যস্থতায় চীনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হওয়ার পরে মিজো যুবকরা চিনে গিয়ে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে আরম্ভ করে এবং চীনের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রে সাজিত হয়ে ফিরে আসতে থাকে। এদের ছোট ছোট squad এ ভাগ করে মিজোরামের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হত বিশেষ বিশেষ কাজের ভার দিয়ে।

৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার পরে, লালডেঙ্গা বাংলাদেশ ছেড়ে ইসলামাবাদ পলায়ণ করেন। chantlang এর আশ্রয় কেন্দ্র ভেঙ্গে যায়। MNF নতুন ঘাঁটি স্থাপন করে বর্মায়। তখন থেকে লালডেঙ্গার প্রতিপত্তি কমতে থাকে। নেতৃত্ব অধিকার করেন রিয়াকুঙ্গা, স্বয়ংখ্যাত 'ব্রিগেডিয়ার জেনারেল।' বর্মার 'চিন রাইফেলস' পল্টনের ভূতপূর্ব হাবিলদার। চীন উপজাতীয় অঞ্চলে বিশেষ পরিচিত। ততদিনে বর্মা সরকারের বিরুদ্ধে চীনদের বিদ্রোহ প্রায় দমিত হয়ে এসেছিল, তাই বর্মার এই ঘাঁটিটি খুব নির্ভরযোগ্য ছিলনা। রিয়াকুঙ্গা ভারত সরকারের সঙ্গে একটা সম্মানজনক সমাধানে আসবার চেষ্টা করছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীরূপে ব্রিগেডিয়ার সাইলো উপর থেকে তাকে সাহায্য করতে লাগলেন।

তখন লালডেঙ্গা ইসলামাবাদ পরিত্যাগ করে নয়াদিল্লীতে এসে উদয় হলেন এবং পৃথকভাবে মোরারজীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ভারতীয় সংবিধান স্বীকার না করা পর্যান্ত মোরারজী কোন আলোচনায় রাজি হলেন না। লালডেঙ্গা দিল্লীতেই রয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়ার সঙ্গে মোরারজীর পরিচয় হয়েছে। জিয়া মোরারজীর হৃদয় জয় করেছেন। মোরারজীর একটা মস্ত বড় দুর্বলতা এই যে যার সঙ্গেই ইন্দিরার কলহ, তাকেই তিনি আপনজন মনে করেন। আর যার সঙ্গে মিত্রতা তাকেই মনে করেন শত্রু। জিয়ার অনুরোধে মেঘালয়ে রাখা সিদ্দিকীর গোপন ঘাঁটিগুলি ভেঙ্গে দিলেন মোরারজী। আর ওদিকে জিয়া তলে তলে লালডেঙ্গাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করলেন বাংলাদেশের Chantlang এ। লালডেঙ্গার প্রতিপত্তি বাড়ল, রিয়াকুঙ্গার শক্তি কমল। MNF ঘাঁটি সরে এল বর্মা থেকে বাংলাদেশে। দিল্লীতে বসে লালডেঙ্গা পরিচালনা করতে লাগলেন। আগুন আবার জ্বলে উঠল মিজোরামে।

উত্তরপূর্ব সীমান্তের জাতিগুলি সম্বন্ধে এতদিন আমাদের কোন কৌতূহল ছিল না। ধরে নিয়ে ছিলাম ওরা আমাদেরই অংশ। এতদিনে আমরা ওদের সম্বন্ধে সজাগ হয়েছি। সজাগ হয়েছি তাদের অদ্ভুত কৃষ্টির জন্য নয়, তাদের পীরিতের জন্যও নয়। সে সব তো নতুন কিছু নয়, বরাবরই শুনে এসেছি। চীনের আক্রমণের আগেও আমাদের সজাগ করে নি। আক্রমণের পরেও [illegible]

হয়েছি আমরা সজাগ হয়েছি ওদের আভ্যন্তরিণ রাজনীতিক আন্দোলনের শক্তি ও গভীরতা দেখে। তা আজ বুঝবার চেষ্টা করছি এই পাহাড়ী মনগুলিকে।

মিজোরা এদেশে এসেছে দক্ষিণ পূর্ব এসিয়া থেকে। অনেকদিন আগেই এসেছে, তবু ভারতে অন্যান্য স্থানের জন সমষ্টির তুলনায় তারা নবাগত। Ethnologically বা জাতিগত বিজ্ঞানের হিসাবে সীমান্তের ওপারের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক। তারা কতকগুলি ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বাস করত। যাদের ভাষা পৃথক, গ্রাম দূরে দূরে পর্ব্বত শিখরে অবস্থিত। গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কোন একাত্মবোধ ছিল না: ছিল শুধু সন্দেহ ও শত্রুতা। ব্রিটিশ তাদের দেশ অধিকার করে নি, রাজত্ব করেছে শুধু নামে। ওরা যখন ব্রিটিশ ভারতের সমতলে নেমে এসে উৎপাত করেছে, লুঠতরাজ করেছে, তখন ব্রিটে একটা Positive Exeedition পাঠিয়েছে এই মাত্র। মিজোরা সেটা মনে গেঁথে রাখেনি, সুযো পেলেই আবার নেমে এসেছে। ব্রিটেনও আইনের শাসণ প্রতিষ্ঠিত করতে চায় নি ওদের দেশে। সব ঝামেলায় যায় নি।

ব্রিটিশ শাসণ নয়, মিজোদের এক সূত্রে বেঁধেছিল খৃষ্ট ধর্ম। 'ঈশ্বর এক এবং মানুষ মানুষের ভাই' এই জ্ঞান তাদের দিয়েছিলেন শ্বেতাঙ্গ মিশনরীরা। দিয়েছিলেন প্রেম ও সেবার মধ্য দিয়ে বিশ্বাস অর্জ্জন করে। এদের ছোট ছোট পার্বত্যগোষ্ঠীগুলি শুধুমাত্র নিজের গোষ্ঠীর মানুষদের মানুষ বলে মনে করত অন্য সকলেই ছিল তার কাছে অমানুষ ও শত্রু। Tribal Mind এর এই সংকীর্ণতা প্রথম ভাঙে খৃষ্টধর্ম ও তার বাণী। মনের সংকীর্ণতা লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে জন্ম নিল area energy. যার সংগে তুলনা চলে, সপ্তম শতাব্দীর আরব মরুর বেদুইনদের মধ্যে 'ইসলামের প্রেম ভ্রাতৃত্বের বাণী' প্রচারের ফলে যে মহাশক্তির জন্ম হয়েছিল তার। মিজো গোষ্ঠীগুলির বিচ্ছিন্নতা বিবা ও শত্রুতা দূরীভূত হয়ে তাদের একটি জাতিতে পরিণত করল।

রাজনৈতিক চেতনা এসেছে পরে। সেটা আসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। জাপানের ও ব্রিটেনে সৈন্যদল ওদের দেশটার উপর যুদ্ধ করে ছারখার করে দেয়। কিন্তু রেখে যায় রাজনৈতিক চেতনা রাজনৈতিক চেতনা: আর সেই সংগে আধুনিক যুদ্ধের কলাকৌশল। ব্রিটিশ ও জাপানী উভয় দলে মিজো যোদ্ধার অভাব ছিল না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হতে না হতে সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এসিয়া জীবন্ত হয়ে উঠল। তারা আ ব্রিটিশ ফরাসী ও ডাচদের অধীন হয়ে থাকতে চাইল না। সংগ্রাম সুরু হয়ে গেল, ইন্দোনেশিয়া থেকে বর্মা পর্য্যন্ত। বর্মার পাশেই তো মিজোরাম, সে দেশেও ঢেউ লাগল। তারাও চুপ করে বসে রই না। ওদের রাজনৈতিক চেতনা এসেছে দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়া থেকে। ওদের যোগাযোগ ছিল বর্মা 'চিন কাচিন' প্রভৃতি উপজাতিদের সংগে, ভারতের সংগে নয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও ও কখনো সরিক হয় নি। আজ এদের সামনে প্রশ্ন, স্বাধীন হয়ে ওরা কি করবে? একদিকে সদ্যস্বাধী শান্ত সমাহীত ভারতের নাগরিক অধিকার, অন্য দিকে অশান্ত দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ার রোমান্টিক হাতছানি

সংক্ষিপ্ত জীবনী 'সবেরা খাতুন'

॥ শচীন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা ॥

চব্বিশ পরগণা জিলার পারুলিয়া গ্রাম নিবাসী জনাব গোলাম রসুলের প্রথমা কন্যা সবেরা খাতুন চৌদ্দ বৎসর বয়সে উক্ত জিলার হাড়োয়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত 'মিঞা' পরিবারে যে সময় নববধূ রূপে আগমণ করে তখন এই মেয়েটির প্রকৃত চরিত্র মাধুর্য অপরে উপলব্ধি করতে সক্ষম না হলেও স্বামী মোস্তাক আহমেদের পক্ষে অসুবিধা হয়নি। তাই স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করেন। স্ত্রীর চরিত্রে নির্ভীকতা ও শিক্ষা গ্রহণে আকুল আগ্রহ দেখে মোস্তাক মিঞা নিজের ক্ষমতানুযায়ী নির্জনে লেখাপড়া শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে সবেরা মিঞা পরিবারের বংশ মর্য্যাদা রক্ষা করে সুগৃহিনী করে তুললেন। এই সবেরা খাতুনই পরবর্তীকালে বিপ্লবী সংস্থা অনুশীলন সমিতির সঙ্গে কিভাবে জড়িত হয়ে পড়েন এবং সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন তাহারই কিছু বিবরণ উল্লেখ করা হচ্ছে।

বিভিন্ন জেল, বন্দী নিবাস, থানা অন্তরীণ থেকে হাড়োয়া থানায় ১৯৩৩ সনে নজরবন্দীরূপে বদলি হয়ে আসি। মোস্তাক মিঞা আমার আসার পূর্বেও এই থানায় আটক রাজবন্দীদের সংস্পর্শে এসেছেন কিন্তু কোন বিপ্লবী রাজবন্দী তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি, আমার আসার কিছুদিন পরে তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে আলাপ পরিচয় করে নিলেন এবং আমিও ওকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে দ্বিধা করিনি। কয়েকদিন পরে ওর ছোট শ্যালক কুদ্দুসকে পড়াবার জন্য আমার কাছে পাঠাতে কুদ্দুসকে শুধু লেখাপড়ায় সাহায্য করিনি আমার মনের মত করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে কিছুদিন বাদেই কুদ্দুস দিদির সঙ্গে দেখা ক আমন্ত্রণ জানালো। ওকে বলে দিলাম, মোস মিঞার তরফ থেকে আমন্ত্রণ না এলে যাওয়া না। দুই একদিনের মধ্যেই স্বয়ং গৃহস্বা আহারের নিমন্ত্রণ জানালেন। আমিও সা গ্রহণ করলাম, তবে রাত্রি দশ ঘটিকার পূর্বে যা চলবে না। রাজবন্দীকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়া বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিতেই একটু জোরের বললেন এ নিমন্ত্রণ শুধু তাহার একার তরফ থে নয় কুদ্দুসের দিদিরও। যেতেই হবে। মো ভাই নম্র ও নির্ভীক ভাষায় আরও বললেন, যে শুনে বিপদ মাথা পেতে নিতে আপনার বোন য সাহস করছে তখন আর কি বলার আছে। আ রাত্রে অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে মোস্তাক মিঞা অনুসরণ করে দিদির কাছে উপস্থিত হয়ে বি আয়োজন দেখে আনন্দ ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আ আসন গ্রহণ করলাম। সন্ধ্যার পর অধিক র বন্দী গৃহে অনুপস্থিতির অপরাধ ও উহার পরি জানা ছিল।

প্রথম দিন আহারে বসে সরল শক্ত মানুষটি দেখে আনন্দই হলো। দিদি কথা বলেন, অ নির্বাক আবহাওয়া কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আ

করলেন নিমন্ত্রণকারীদের সম্মান রক্ষা করে তাড়াতাড়ি আহার শেষ করলাম। বিদায় নিয়ে আসার সময় বলে এলাম, আবার আসব, তখন কথা হবে। দিদি শুধু বললেন, আপনার সুযোগ সুবিধা মত যখন খুসী আসবেন। আপনার কাছে অনেক কিছু জানার আছে। দিদি তখন তিনটি সন্তানের মা হয়ে যে দুঃসাহসের পরিচয় দিলেন, তাতে মনের আশা সফল হল। সে রাত্রে ঘুম হয়নি। ভেবেছি পর্দানশিন মুসলমান রমণী, গৃহবধূ। প্রতিবেশীরা সংস্কারাবদ্ধ দুর্বল ও আতঙ্ক গ্রস্থ। ভেবেছি সফল-কাম হবো তো! সর্বপ্রকার সাহায্য পাবো কি! অনুশীলনের ভাবধারা গ্রহণ করবে ত! কিন্তু আমার সকল চিন্তার অবসান ঘটালেন আমার দিদিই। স্পষ্ট বলে দিলেন 'আমি ঠিক আছি। আপনি অত চিন্তা করবেন না।' নিশ্চিত হলাম। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। দিদি ক্রমে ক্রমে আরও শক্তিশালিনী হয়ে উঠলেন। এর পরের অধ্যায় চমৎকার। তখন আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা চলছে। অনুশীলন সমিতির ফেরার সভ্যরা চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে সমিতির সংগঠন কাজে ব্যস্ত। আলিপুর জেল থেকে পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, নিরঞ্জন ঘোষাল, সীতানাথ দে (ব্রহ্মচারী) ও হরিপদ দে পালিয়েছে। গোয়েন্দা অতি তৎপর। হঠাৎ একদিন প্রফুল্ল সেন এসে হাজির। অনেক আলোচনা হল। বসিরহাট মহকুমার দায়িত্ব নিতে হল। টাকি, ভেবলা স্কুলের কয়েকটি ছেলে আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করে। তাহাদের আহার ও রাত্রিবাস সুবিধানুযায়ী আমার গৃহে বা দিদির বাড়ীতে। দিদি নির্দ্বিধায় সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কয়েকবার আসা যাওয়ার পর ফেরার প্রফুল্ল সেন রাজবন্দীর গৃহে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মহা বিপদ। আমার গৃহে রাখা যায় না। ভাবলাম সব বুঝি পণ্ড হয়। দুশ্চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত। নিরুপায় হয়ে মোস্তাক ভাইকে সমস্ত জানাতে বাধ্য হলাম। প্রফুল্ল সেন (সত্যবাবু) ফেরার আসামী, যে বাড়ীতে ধরা পড়বে সে বাড়ীর উপর পুলিশের কতটা অত্যাচার হবে তাও বলেছি। ওরা নিঃসঙ্কোচে বলে দিলেন, রোগী ওদের বাড়ীতেই থাকবেন, এবং ওরাই দেখা শুনা করবেন। রোগী ওদের বাড়ীতেই রাখা হল। কয়েকদিন সেবা-শুশ্রূষা পেয়ে রোগী আরোগ্য লাভ করে গন্তব্যস্থানে চলে গেলেন। সে যুগে এতটা সাহসের পরিচয় অল্প লোকই দিয়েছে। দিদি যতদিন বেঁচে ছিলেন দিদি আমাদের দিদিই ছিলেন।

মুক্ত পেয়ে একটিবার মাত্র দেখা হওয়ার পর অনেক বৎসর অবধি এ পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। ১৯৪৬ সনের সেই কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় হঠাৎ একদিন আমার যোগসূত্র শ্রীমান কুন্দুসের সঙ্গে দেখা হয়, সকলের কুশল সংবাদ জানার সময়টুকুই শুধু পেয়েছিলাম। তারপর দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কোন যোগাযোগ ছিল না ১৯৬০ সাল একদিন অফিসে বের হওয়ার সময় বাড়ীর সম্মুখে একটি যুবক ও একজন মহিলা উপস্থিত। যুবকটি নামের সঙ্গে পদবী ভুল করে জিজ্ঞাসা করলো, শচীন রায় গুহের বাড়ীর কোনটি? গলির মুখে রায় পদবীর এক ভদ্রলোকের বাড়ী দেখিয়ে দিলাম। এই সময়ের মধ্যে ভদ্রমহিলার দিকে আমার দৃষ্টি ছিল না। মহিলার বেশভূষার বৈশিষ্ট্য থাকলেও তা তেমন চোখে পড়ার মত নয়। একমাত্র পায়ে জড়ানো সাদা চাদরখানাই বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দেয়। আমার কণ্ঠস্বর শুনে মহিলা যুবকটিকে বললেন, 'ওরে এই তোর মামা।' তাঁর কণ্ঠস্বর

আমাকে বিচলিত করল। তাঁর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই আমি হতবাক, তিনি বলে উঠলেন, 'দাদা আমাকে চিনতে পারলেন না।' আবেশ ভরে উত্তর দিলাম 'হা দিদি আসুন'। সুদূর গ্রাম থেকে দিদি আমার কলকাতার বাড়ীতে আসতে পারেন তা আমার কল্পনাতীত। আনন্দে মন ভরপুর। জিজ্ঞাসা করলাম এভাবে এলেন কি করে? উত্তর হলো 'আশ্চর্য হবেন না। আমি এখন সবই পারি। হাড়োয়ার কত পরিবর্তন হয়েছে দেখে আসবেন।' তখন শুধু একথাটাই ভাবছিলাম পর্দানশিন রমণী ঘরের বাইরে চলে এলেন তারপর যে সমস্ত কথা হলো তাতে বুঝলাম দিদির মানসিক অবস্থা এতটুকুও বদলায় নি। এরপর কতবার হাড়োয়ায় গিয়েছি, একাকী ও দুই একটি বন্ধুসহ। দিদি ও তার পরিবারের অপর সকলের আতিথেয়তা ও সহজ সরল কথাবার্তায় সকলেই মুগ্ধ। কেউ কেউ বলেন এরকমও হয়। জাতিধর্ম স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে মানুষকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে অনুশীলন কর্মীরা দল গঠন করেছিলো বলেই ভারতের সর্বত্র এই বৈপ্লবিক সংস্থা এতটা প্রসার লাভ করতে পেরেছিলো এবং ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হওয়ার ইহা একটি বিশেষ কারণ।

দিদি অনুশীলন সমিতিকে ভুলতে পারেননি, আমার সঙ্গে ত কতবার দেখা হয়েইছে। দিদি অনুশীলন ভবনের বাৎসরিক প্রতিষ্ঠা দিবসে সকলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য অনুশীলন ভবনেও এসেছেন। আজ আর দিদি নেই। গত ১০ই জুন বেলা ১১টা ২৬ মি: দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে স্বামী, ৪ মেয়ে, ৫টি ছেলে ও অগণিত আত্মীয়-স্বজন রেখে ৬৯ বৎসর বয়সে নিজ গৃহে পরলোক গমন করেন। এ রোগের জ্বালা যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হয়ে পড়ে। দিদি সে যন্ত্রণার কথা একটিবারও প্রকাশ করেননি। কি সহ্য করার ক্ষমতা। প্রতিদিন কোরাণ পাঠ এবং পাঁচবার নিয়মিতভাবে নামাজ পড়া আমার নিজের চোখে দেখা অসীম শক্তিশালিনী এই মহিয়সী মহিলার অমর আত্মা শান্তিতে থাকুক ইহাই আমাদের কামা।

পরলোকে আমাদের দিদি সবেরা খাতুন

অনুশীলন সমিতির, বিশিষ্ট গৃহী সভ্যা বিপ্লবী মহিলা সবেরা খাতুন বিগত ১০ই জুন বেলা ১১টা ২৬ মিনিটে ২৪ পরগণা জেলার হাড়োয়া গ্রামে নিজ গৃহে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসর।

তার নির্ভীকতা, নিষ্ঠা ও ত্যাগের কথা স্মরণ করে আমরা তার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং তার রেখে যাওয়া স্বামী, পুত্র কন্যা ও অগণিত আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা। তার লোকান্তরিত আত্মা শান্তিলাভ করুক—আন্তরিকভাবে কামনা করি।

নদীয়ার কলঙ্কিত অধ্যায়

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত বেশ কিছুকাল যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত আবহাওয়া মুক্ত ছিল। যখন উত্তর প্রদেশের বারানসী ও পরে আলিগড়ে সাম্প্রদায়িক জঘন্য সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গেল, তখনও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-বজায় ছিল; আর প্রায় ঘরের দরজায় জামশেদপুরে যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিভৎসরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম তখনও আমরা আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব নিয়ে নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে কালযাপনে নিরুদ্বেগ চিত্তে ব্যস্ত রইলাম। বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করলেন যে পশ্চিমবঙ্গে এ বিপদের আশংকা নেই কারণ সরকার সজাগ ও সতর্কভাবে উক্ত বিপদজনক পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুত এবং দাঙ্গাকারী সমাজ বিরোধীদের ওপর সরকারী নজর সুতীক্ষ্ণ: আর তাছাড়া প্রশাসন যন্ত্র এ বিষয়ে বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে হুঁসিয়ার। সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের উভয় সাম্প্রদায়ের জনগণ একপ্রকার স্থির নিশ্চিৎ ছিল যে যেখানেই যা কিছু ঘটুক না কেন এখানে কোনমতেই উক্ত বিষাক্ত পরিবেশ কিছুতেই সৃষ্টি করা সম্ভব হবেনা। ইতিপূর্বে বারানসীর, আলিগড়ের ও জামশেদপুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘঠনের পশ্চাতে যে আর, এস. এস (রষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের) এর গোপন হস্ত ছিল বলে অনেক দেশনেতা সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে ছিলেন ও কেউ কেউ জমিয়ত ই-ইসলাম প্রতিষ্ঠানের ও আনন্দ-মার্গীদের এব্যাপারে যোগসাজস আছে বলে মন্তব্য করেছিলেন তা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ও সরকারের ভালমত জানা ছিল এবং সে কারণেই উক্ত সব বিভেদকামীও সাম্প্রদায়িক বিষদুষ্ট ক্ষতিকারক সংগঠনগুলির ওপর সরকারের যথোপযুক্ত নজর রাখার প্রয়োজন ছিল—বৃহত্তর জনস্বার্থের খাতিরে। কিন্তু বাস্তবে বোধ হয় প্রশাসনিক দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে দুস্কৃতকারীর দল অতি সাবধানে তলে তলে নদীয়ার বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে সীমান্তের লাগোয়া গ্রামগুলিতে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়াতে শুরু করে নানা ছল ছুতায়। নদীয়া জেলার সীমান্ত বরাবর চুরি, ডাকাতি রাহাজানি, এমন কি মধ্যে মধ্যে নারীধর্ষণের মত জঘন্য হীন কাজের খবরও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতো; আর একাজে উভয় সম্প্রদায়ের দুস্কৃতকারীর দল যে সক্রীয় ও লিপ্ত ছিল সে কথা প্রশাসনের জানা ছিল। নদীয়া জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় গত কিছুকাল যাবৎ আইন ও শৃঙ্খলা যে মাঝে মাঝে বিঘ্নিত হচ্ছিল তা জেলা প্রসাসন জানতো, অথচ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দৃঢ়তা ও সদিচ্ছার অভাব পদে পদে পরিলক্ষিত হচ্ছিল। মারদাঙ্গা, খুনজখম, চোরাচালানদারী, গরুচুরি ও ডাকাতি তথায় নিত্যদিনের ঘটনায় পর্য্যবসিত হয় আর প্রশাসন যন্ত্র দর্শকের ভূমিকা নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। দুষ্কৃতকারীদের দলাদলি, রেসারেসি

পরস্পরকে আক্রমণ, হনন এবং লুঠের বখ্‌রা নিয়ে ঝগড়া ও বোমাবাজী, এমনকি গুলি বিনিময় ইত্যাদি হীন সমাজ বিরোধী কার্য্য নদীয়ার বহু এলাকায় প্রায় দিনই সংঘটিত হতো যা সংবাদপত্রে প্রকাশ পেত। সাম্প্রদায়িক মন কষাকষি উক্তসূত্রেই দেখা দেয় যা অকস্মাৎ বিভিন্ন থানা এলাকায় মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে ও শেষ পর্য্যন্ত মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নদীয়ায় আত্মপ্রকাশ করে এবং খুন, জখম, গৃহদাহ, লুঠপাঠ চাপড়া থানায়, কোতয়ালী থানায়, বোদ কৃষ্ণনগর শহরে ও অন্যত্র অভাবিতরূপে ছড়িয়ে পড়ে। বহু মানুষ হত, আহত, লুণ্ঠিত ও সর্বশান্ত হয় এই ভীষণ দাঙ্গায় এবং উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই চরম ক্ষতিগ্রস্থ ছন্নছাড়া ও গৃহহীন হয়ে সরকারী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। মৃত্যুর সংখ্যাও বড় কম নয়, বরং উল্লেখযোগ্যভাবে অধিক আর মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে হতাশায় ভুগতে বাধ্য হয়। এই বিভৎস ও বিপর্য্যয়কারী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে ঘটবে তা কেউই কল্পনা করতে পারে নি। জেলা প্রশাসনের কাছে গোয়েন্দা সংবাদও তা নোটেই পূর্বাহ্নে প্রকাশ পায় নি যে কেন তা বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার। জেলা প্রশাসন সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল এবং তাই দাঙ্গা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নির্মম হস্তে দমন করা সরকারের পক্ষে বাস্তবে সম্ভব হয়নি, ফলে নদীয়ার মানুষ কঠিন আঘাত জর্জরিত ও হতচকিত হয়ে পড়ে হঠাৎ এই বিস্ফোরণে। তারা ধারনাই করতে পারেনি যে এরূপ আভাবিত ও অকস্মাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অহেতুক বলি তারা হবে এবং চরম বিপদের মধ্যে নিপতিত হবে।

যে নদীয়া বাংলার তথা ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতি ধর্মালোচনার পীঠস্থান একদিন ছিল, যে নদীয়ার সর্বদেশের সর্বকালের প্রাণের ঠাকুর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়ে প্রেমের বন্যায় মানুষে মানুষে সম্প্রীতির নিগূঢ় ও নিকট সম্পর্ক-স্থাপিত করে সর্বধর্ম্মের সমস্ত মানুষকে এক ঈশ্বরীয় ভাবলোকে উন্নীত করে ছিলেন সেই পূত পবিত্র মানবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠানকে কি করে ও কেমনভাবে এই নক্কারজনক হীন জঘন্য মনোভাব প্রসূত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এমন আকস্মিকভাবে সংঘটিত হল তা বিশেষ যত্নের সাথে অনুসন্ধান করা ও তার মূল উৎপাটিত করা এখন সরকার ও জনগণের এবং বিরোধীদলগুলির একান্ত অবশ্য কর্ত্তব্য কাজ। প্রয়োজনবোধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা জনস্বার্থে একান্ত আবশ্যক। ভবিষ্যতে যাতে এই বিষাক্ত আবহাওয়া পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন এলাকায় ছড়িয়ে না পড়তে পারে তারজন্য সকলে মিলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পরস্পর বিশ্বাস স্থাপনের মত মধুর পরিবেশ গড়ে তোলার বদ্ধ পরিকর হতে হবে। মানবকল্যাণে, দেশের নিরপত্তা রক্ষায় ও সংহতির অবশ্য প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে সর্বশক্তি, শুভবুদ্ধি ও পারস্পরিক শুভেচ্ছার দ্বারা প্রতিরোধ করতেই হবে। আশার কথা বিলম্বে হলেও সরকারী প্রশাসন এই দাঙ্গা রক্ষার জন্য এখন বেশ তৎপর। জনগনেরও এব্যাপারে সরকারের সহিত পূর্ণ সহযোগীতা করা অবশ্য কর্ত্তব্য অন্যথায় জনগণই (উভয় সম্প্রদায়ের) সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে দেশের উন্নতি বিঘ্নিত হবে, সংহতি বিনষ্ট হবে ও দেশ দুর্বল হয়ে পড়বে।

সম্প্রতি নদীয়ায় যে সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বিনামেঘে বজ্রপাতের মত রাত্রিকালীনতে হঠাৎ ঘটে গেল, এর পশ্চাতে কাদের পঙ্কিল হস্ত কাজ

করেছে তা সরকারকেই গোয়েন্দাদপ্তরের মাধ্যমে দ্রুত আবিষ্কার করতে হবে নচেৎ পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্রও যে এইরূপ ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হবে না সে বিষয়ে নিশ্চয়তা কোথায়? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিতান্ত একটা ক্ষণিকের হঠাৎ উত্তেজনায় ঘটে যাওয়ার মত সাধারণ ব্যাপার নয়, এর পিছনে নিশ্চয় একটা পূর্ব-পরিকল্পনা ছিল এবং ইন্ধন যোগাবার ব্যবস্থাও ছিল। সেই ব্যাপারে কারা কারা পশ্চাৎ-পটের নায়ক ও নিয়ন্ত্রনকারী ছিল তাদেরও খুঁজে বার করার দায়িত্ব সরকারের ও জনগণের এবং উভয় সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের। এর অঙ্কুরে বিনাশ দেশের ও দশের স্বার্থে একান্ত আবশ্যক। যতদূর সংবাদে জানা গেছে তাতে মনে হয় বাংলা-দেশী গরু চোরের দল, ডাকাতের দল ও চোরা চালানকারীর দাস সীমান্ত পেরিয়ে নদীয়া জেলায় বারবার হানা দেওয়ায় এখানকার মানুষের মনে বিশেষ ক্ষোভ বহুদিন ধরেই পুঞ্জিভূত হয়েছিল; তার উপর সম্প্রতি ঐ সব সমাজ বিরোধীরা এত অধিকমাত্রায় অত্যাচার, নির্যাতন ও ক্ষতিসাধন করে যে এপারের মানুষেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং বিরোধের সূত্রপাত বোধ হয় এখানেই ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে, উপরোক্ত নারীধর্ষণের ঘটনাও মানুষকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। সম্প্রীতি ক্রম-বিলিয়মান হয়ে সংঘর্ষের জমি তৈরী হতে শুরু হয় এবং এই অবকাশে আর, এস, এস, জমিয়ৎ-ই-ইসলাম, আনন্দমার্গী ও আমরা বাঙালী প্রভৃতি সংগঠনগুলি এর সুযোগ নেয় বলে শুনা যায়; ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হয়ে উঠে। ঐ সব সংগঠনগুলির সস্তা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শ্লোগান সাধারণ মানুষের মনে ক্ষণিক বিভ্রান্তি আনে; হঠাৎ উত্তেজনা সৃষ্টি করে ও বিপক্ষগামী হওয়ার মানসিকতার জন্ম দেয় যা সত্যই সংহতি রক্ষার পক্ষে মারাত্মক রকমের বিপদ-জনক আর নদীয়াতে সেই কৌশল অবলম্বিত হয়েছে বলে অনেক চিন্তাশীল দেশপ্রেমিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সত্যকার আগ্রহী ব্যক্তিগণ অনুমান করেন এবং তাঁদের এবম্বিধ অনুমানের মূলে যে যথেষ্ট যুক্তি আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হতে পারে, ঐ সকল সংগঠনগুলি পশ্চিমবঙ্গে তেমন শক্তিশালী নয় তবে কিভাবে তারা এই হীন প্রচেষ্টার ইন্ধন যোগাতে সক্ষম হল? ত্রিপুরায় সম্প্রতি 'আমরা বাঙালী'র যে বিভেদকামীর ও বিচ্ছিন্নতাবাদীর নগ্নমূর্তিও বিভৎস কার্য্যকলাপ দেখলাম তারপরেও কি তাদের আসল চেহারা ও উদ্দেশ্য বুঝতে আমাদের কিছু বাকী রইল? কোল-কাতার পার্কসার্কাসের নিকট আনন্দমার্গীদের উন্মত্ত তাণ্ডবলীলা একহাতে উন্মুক্ত কৃপাণ ও অন্যহাতে মড়ার খুলি নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিসের নাকের ডগায় যে মিছিল পরিচালিত হল তা আর যাই হোক না কেন সভ্যতা বা শালীনতা নিশ্চয় নয় বরং ঐ দৃশ্য দৃষ্টিকটু ও বর্বরতার পরাকাষ্ঠা বলেই ধারণা হয় এবং পুলিশ যে কেন এই অতি বিভৎস এক নারকীয় ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল, বাধা দিল না, তা বোধগম্য নয়। দেশে কি কোন সরকার নেই না সরকার একেবারেই ক্লীব? ইন্দিরা গান্ধী এই আনন্দমার্গীদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন ইতিপূর্বে জনস্বার্থে, তা কি ভুল ছিল? দেশের সংহতির স্বার্থে ইন্দিরা গান্ধী আনন্দমার্গীদের সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে যে কঠিন ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল যুক্তি সম্মত, সঠিক ও সময়োচিত।

(চলবে)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

স্বদেশবাদ ও 'বন্দেমাতরম্'

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তার আত্মীয় স্বজনেরা কাব্য বিশারদকে তার সঙ্গে জাপানে যেতে বলেন। তারা মনে করেছিলেন যে সমুদ্র যাত্রা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর হবে। যে কোন কারণেই হোক এই প্রস্তাবটি আমার কাছে কখনই ভাল মনে হয়নি। এরমধ্যে কেমন যেন একটা ভাবী অমঙ্গলের পূর্বাভাস আমার মনে বারে বারে উঁকি দিচ্ছিল। এটা হয়ত বা এজন্যও হতে পারে যে আমার মনের গভীরে দেশের কাজের চিন্তা বড় হয়ে দেখা দেওয়ায় আমার বিচার বুদ্ধির উপরে রঙিন ছোপ লেগে গিয়েছিল। সে যাই হোক, আমি কাব্য-বিশারদকে প্রতি নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলাম। তিনি আমাকে তার রাজনৈতিক গুরু বলতেন। এরকম আরও অনেকে আমাকে তাদের রাজনৈতিক গুরু বলে মনে করতেন। তবে কাব্য বিশারদের মত এতখানি উদ্দীপনা ও শ্রদ্ধা আর কারও মধ্যে ছিল না। তারা অনেকে তাদের গুরুর প্রতি কাদা ছুড়ে মারতেও প্রস্তুত ছিল। কাব্য বিশারদ এক সময় জাপান যাবেন না বলে মনস্থির করে ফেললেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চাপের কাছে নতি স্বীকার করে যেতে রাজি হলেন। হাওড়া ষ্টেশনের কাছে তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আমরা তখন কলকাতা থেকে অল্প কিছু দূরে বেঙ্গল-নাগপুর রেল লাইনের পথে মুগকল্যানে একটি স্বদেশী হুভাকরে ফিরে আসছিলাম। তিনি আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন; আমি আশীর্বাদ জানালাম। কিন্তু হায়! আর আমাদের ভাগ্যে পুনর্মিলন ঘটল না। ফেরার পথে সমুদ্রে তাহার মৃত্যু ঘটে।

এইভাবে বাংলা তার এমন একজন খাঁটি স্বদেশ-প্রেমিক সাংবাদিককে হারাল যিনি আমাদের ভাষা সম্পদকে তার পক্তিশালী লেখনী মুখে এমনভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন যাতে তার ব্যক্তিগত শত্রুদের নিকট তিনি একটা আতঙ্ক বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। অবশ্য তিনি ব্যক্তি বিশেষের নিন্দা-বাদের উর্ধে ছিলেন না যেটা ছিল আমাদের দেশীয় ভাষায় এক ধরণের সাংবাদিকতার বাণী এক মারত্মক বিষের মত। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা আজও পর্য্যন্ত তা থেকে মুক্ত হতে পারিনি। তার কোন কোন রচনায় গার্হস্থ্য জীবনের পবিত্রতাকে লঘু ও বিদ্রূপ করা হয়েছে; সেগুলি আমাদের সকলের কাছে অবশ্যই পরিতাপের ও নিন্দনীয় বিষয়। কিন্তু তার কঠোরতম ব্যক্তিগত আক্রমণ-গুলি হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যারা ভারতের উন্নতির পথে শত্রুতা করছে এবং তাও আবার অনেক সময় করা হয়েছে ছদ্মবেশী বন্ধুরূপে, হিতকাঙ্খীর মত। কলকাতায় তার মৃত্যু সংবাদটি পাওয়া যায় ১৯০৭ সালের ৭ই জুলাই তারিখে। এরই পনেরোদিন পরে বারাসতে ২৪ পরগনা জেলা সম্মেলন হল। তার রচিত স্বদেশী সঙ্গীত দিয়ে যখন সেই সম্মেলন শুরু হল, তখন শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যিনি চোখের জলে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন না করেছেন। দোষত্রুটি তার অনেক ছিল। কিন্তু তা সত্বেও তিনি গভীর

বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে দেশ সেবা করে গেছেন। দেশ সেবার মধ্যে যে সাহস তিনি দেখিয়েছেন, কোনও সময়েই তার একটুও নড়চড় হয়নি।

তবে একজন মহান "স্বদেশী" কর্মী চলে গেলেও "স্বদেশী"র কাজ কর্ম বাহত হয়নি। সমস্ত বড় বড় আন্দোলনই ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রতিভার কাছে যতই ঋণী হউক না কেন, কোন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি পুরুষের উপর ও তা খুব বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল নয়। তারা বীজ বপন করেন। সে বীজ নতুন মানুষ সৃষ্টির জন্যে ফল ধারণ করে, সেই নতুন মানুষেরা হয়ত সর্বদা বীজ বপনকারীদের সমকক্ষ না হতে পারেন; তারা তাদের কাজের ভার গ্রহণ করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। কাব্য বিশারদের উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে সে যুগের স্বদেশীভাব যে প্রবল ও ব্যপক উত্তাপের সৃষ্টি করেছিল তারই এক প্রতিফলন ঘটেছিল।

জনমতের এই উত্তাল জাগরণে সরকার শঙ্কিত হয়ে পড়লেন তারা দমন নীতির প্রয়োগ করতে লেগে গেলেন। ফলে জনমত আরও বেশী করে জেগে উঠতে থাকে। ট্যাকিটাসের বিবরণে জানা যায় যে এগ্রিকোলা এই রকম একটি সূক্ষ্ম মন্তব্য করেছিলেন যে একটি সাম্রাজ্যকে শাসনে রাখার চেয়ে একটি গৃহ-পরিবারকে শাসনে রাখা বেশী কঠিন কাজ। কোন পরিবারে বিপর্যয় দেখা দিলে তা কালের শুভ বুদ্ধির নিরাময়কারী প্রভাবে সৌহার্দ্যপূর্ণ উপদেশের সাহায্যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। সাধারণত: কাল অতিক্রমণ ও শুভ-বুদ্ধি এসব ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। কিন্তু আমলাতন্ত্রের ধরণই আলাদা। তাদের আছে অসীম ক্ষমতা; সে ক্ষমতায় তারা বলীয়ান। কোন অভাবিত-পূর্ব ঘটনা যদি ঘটে, তাহলে তারা তাদের সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে সহজ পন্থায় সেই ঘটনার মোকাবিলা করতে প্রলব্ধ হয়। দমন নীতির প্রয়োগ অতি সহজ ব্যাপার এবং তার কার্যাকারিকতা সম্পর্কেও কোন সন্দেহ নেই। এজন্য যে অত্যধিক মূল্য দিতে হয় এবং পরিণামে যে তা নৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে খুব তাড়াতাড়ি, কাজ করার উৎসাহে সে কথা তাদের মনেই আসে না। সাময়িকভাবে হয়ত দমন-নীতি সাফল্য লাভ করে: কিন্তু তা স্থায়ী অনিষ্ট ঘটায় এবং ভবিষ্যতের অশান্তির বীজ বপণ করে রাখে।

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে ছাত্রগণ এবং ছাত্র নয় এমন তরুণেরা স্বদেশী আন্দোলনে এক প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। তাদের উৎসাহ সমস্ত সমাজ জীবনকেই উজ্জীবিত করে তোলে। তারা এই স্বদেশী আন্দোলনের স্বেচ্ছাব্রতী মিশনারীরূপে আত্মপ্রকাশ করল। কর্তৃপক্ষ তাদের কার্য্যাবলীকে খর্ব করা ও শাসনে আনা প্রয়োজন বোধ করলেন। জেলায় জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটরা ফতোয়া জারি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধানদের জানিয়ে দিলেন যে যদি স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকগণ তাদের ছাত্রদের স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বয়কট ও পিকেটিং এবং অন্যান্য অপকর্ম থেকে প্রতি নিবৃত্ত না করেন তাহলে তাদের স্কুল ও কলেজগুলিকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে না. স্কলারশিপের জন্য প্রতিযোগিতা করার যে সুযোগ ছাত্রদের দেওয়া হয়েছে, তা বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়কে অনুমোদন প্রত্যাহার করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। মফঃস্বলের স্কুলগুলিকে এই সার্কুলার পাঠিয়ে দেওয়া হল।

সার্কুলারে কলকাতার ছাত্র ও মফঃস্বলের

দের মধ্যে একটা পার্থক্য করা হল। কিন্তু
াতার ছাত্ররা তাদের মফঃস্বলের ছাত্র-বন্ধুদের
স্বদেশী আন্দোলনে সমান উৎসাহী। দিনের
দিন স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনার সময় বেশ
সংখ্যক ছাত্র ময়দানের কোনে দাঁড়িয়ে দেখত
হোয়াইট এণ্ডয়ে লেইড ল'র বাড়ীতে বিদেশী
য কিনতে যাচ্ছে। ভারতীয় ক্রেতাদের তারা
বাধ করত বিদেশী দ্রব্য না কিনতে; আর
যদি ইতিমধ্যেই কিছু কিনে ফেলে থাকেন
লে আর যেন কখনও এ রকম অন্যায় কাজ না
। আমার কাছে সে সময়ে এ রকম একটা
দ পৌঁছে যে, এই সমস্ত যুবকদের মধ্যে
কজন একজন ফ্যাসান দুরস্ত বাঙ্গালী মহিলা
হোয়াইট এণ্ডয়ে লেইড ল'র দোকান থেকে
য় আসছিলেন, তখন তার পায়ের উপর লুটিয়ে
এবং তাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে প্রার্থনা
র যে তিনি দেশে তৈরী সেই রকম জিনিষ
ত আর যেন বিদেশী জিনিষ না কেনেন।
এই সার্কুলার উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে
। সব দিক থেকেই এর নিন্দাবাদ হল।
কি যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা সাধারণতঃ সরকারী
ও কার্য্যাবলীর সমর্থন করে থাকে, তারাও এই
ারের নিন্দায় এগিয়ে এল। ষ্টেটস্‌ম্যান
া এই সার্কুলারের উপর মন্তব্য করে এমন
প্রয়োগ করল যে ভাষা সেই থেকে প্রকৃত
খারাপ কাজের নিন্দা করা ছাড়া ষ্টেটস্‌ম্যান
স্তম্ভে বর্জন করে আসছে। ষ্টেটস্‌ম্যান ঘোষণা
—'সত্যি আমাদের নাম জানা প্রয়োজন, এই
ক অফিসারটি কে যার পরামর্শ মত লেপ্টেন্যান্ট
এই আদেশে স্বাক্ষর দিয়েছেন।' এটিকটি
কোন লোক গভর্ণমেণ্টকে ভুল পথে চালিত করছে
যে, হয় প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ
নতুবা গত কয়েক সপ্তাহের অলীক ভীতি প্রদর্শনের
মুখে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়েছে।' এই মন্তব্য
করে পত্রিকাটি তার বক্তব্যের উপসংহার টেনে
বলল—'স্পষ্টতঃ গভর্ণমেণ্ট এক ছেলে মানুষী নিষ্ফল
নীতি গ্রহণ করে ভুল পথে চলেছে। এ নীতির
ফল হবে এক দল শহীদের সৃষ্টি করা।' এই হল
ছাত্রদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে প্রথম যে
সারকুলার জারি করা হয় তার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ
একটি প্রধান ইংরেজী সংবাদপত্রের ভাষ্য। কিন্তু
ফতোয়ার পর ফতোয়া জারি করা চলতে থাকে
প্রত্যেকটি সারকুলারই চলমান উত্তেজনায় ইন্ধন
যোগাতে থাকে, এবং যে অশুভকে আরও বাড়িয়ে
তোলে।

এই সব সারকুলারের মধ্যে একটি ছিল
'বন্দেমাতরম্' সারকুলার। এটি জারি করেছিল
পূর্ববঙ্গ সরকার। এই সারকুলার অনুযায়ী প্রকাশ্যে
'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দেওয়াকে বে-আইনী বলে ঘোষণা
করা হল। একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে
খুঁজে বার করা হল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিটির ব্যাখ্যা
করার জন্য। এই কর্মচারীটিকে আমাদের প্রাচীন
শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলে মনে করা হয়।
তিনি ব্যাখ্যা করে জোর দিয়ে বললেন যে
'বন্দেমাতরম্' হচ্ছে প্রতিহিংসার কালী মায়ের নিকট
প্রার্থনা। এই ধারণা তিনি কোথায় পেলেন তা
খুঁজে বার করা কঠিন ব্যাপার। 'বন্দেমাতরমের'
প্রথম কয়েকটি পংক্তি হল একটি সঙ্গীত। এই
সঙ্গীতের মধ্যে আছে মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি ও

করি যে মাতা সকলেরই জননী, আমার স্বদেশ জননী'—এই হল 'বন্দেমাতরম্' কথাটির সরল ও সহজ অর্থ। কিন্তু সরকারী কর্মচারী মহলে ক্রোধ ও উত্তেজনার ভাব প্রকাশ পেয়েছিল তারই মধ্যে এই নির্দোষ, পবিত্র সংক্ষিপ্ত ধ্বনির মধ্যে একটা কদর্থ খুঁজে বার করা হল এবং পূর্ববঙ্গ সরকার কতৃক রাস্তায় 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি বন্ধ করার জন্য এক সারকুলার ঘোষণা করা হল। আমরা এ ব্যাপারে আইনজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করলাম। কলকাতা বারের একজন খ্যাতনামা এডভোকেট মিঃ পুঘের অভিমত আমাদের পক্ষেই গেল এবং ঐ সারকুলার যে আইন সম্মত নয়, তা সাব্যস্ত হল।

বরিশাল সম্মেলনে এই ধ্বনিটি একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছিল। সে বিষয় পরে ইতাবসরে সকৃতজ্ঞ চিত্তে একথা বলতে চাই যে এরপরে এ বিষয়ে সরকারী মহলের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছে এবং সঙ্গীতটি সম্পর্কে যে জাতীয় ধারণা গড়ে উঠেছে, তা স্বীকৃতি লাভ করেছে একবার আমি উত্তরবঙ্গে এক সৈন্য সংগ্রহের সভায় যোগদান করতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি দেখলাম যে এই মহান জাতীয় সঙ্গীতটি গীত হচ্ছে গান চলার সময় সমস্ত দর্শক ও শ্রোতাদের সঙ্গে ব্রিটিশ অফিসারগণও দণ্ডায়মান হলেন। রাজকীয় সৈনিকের উর্দি-পরা বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের সৈন্যগণ যখন বিভিন্ন সহরে পরিভ্রমণে যায় তখন তাদের দেশবাসীগণ তাদের 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করে সম্বর্ধনা জানায়। তা সৈন্য সংগ্রহ সভায় তারা যখন কেউ কিছু বলেছে তখন কেউ কেউ অফিসারদের পূর্ণ সম্মতি নিয়ে তাদের সমক্ষেই একথা ঘোষণা করেছে যে জার্মানদের পরিখা আক্রমণ করার সময় স্বদেশ গৌরব বোধ দান করবে তেমন আর কিছু করবে না।

এক সময় নিষিদ্ধ অবাঞ্ছিত ও দলিত হলেও 'বন্দেমাতরম্' এখন সর্বভারতীয় জাতীয় ধ্বনি পরিণত হয়েছে। এখন ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তি যখন কোন গণ-অনুষ্ঠানে স্বদেশ প্রেমের উচ বোধ করেন, তখন এই 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ক তাদের চিত্তের হর্ষভাব প্রকাশ করে থাকেন। প্রসঙ্গে আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হল এই বর্তমানে সরকারী কর্মচারীরা এ কথা করেন যে 'বন্দেমাতরম্' হচ্ছে রাজদ্রোহীদের শ ভঙ্গ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য লোক জড় ক ধ্বনি।

'বন্দেমাতরম্' হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র চাটার্জির সুপ চিত উপন্যাস 'আনন্দমঠে'র একটি সঙ্গী প্রারম্ভিক কয়েকটি কথা। এটি একটি বা গান। কিন্তু সংস্কৃত শব্দে সঙ্গীতটি এমন স যে সারা ভারতের প্রতি অংশেই শিক্ষিত লোকে এটি বুঝতে পারে। এর শব্দ প্রয়োগের সু ভঙ্গী, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, এর আকুল স্বদেশ-প্রে সঙ্গীতটিকে জাতীয় সঙ্গীতের মহিমায় ও মর্য্যা প্রতিষ্ঠিত করেছে। বড় বড় জাতীয় সমাবে সভার কাজের প্রারম্ভে এই সঙ্গীতটি গেয়েই স কাজের উদ্বোধন হয়ে থাকে। স্বদেশী আন্দোল 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের বিরাট ভূমিকা সম্প বঙ্কিমচন্দ্র চাটার্জির হয়ত সে রকম কোন পূর্ব ধা ছিল না। যে সুনিশ্চিত স্থান সমস্ত জাতীয় স সমিতি, বিক্ষোভ, শোভাযাত্রায় এই সঙ্গীতটি অ করেছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সে সম্পর্কে কোন চি হয়ত ছিল না।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯১৪-১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে স্ত্র অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা এবং উহার সঙ্গে বহির্ভারতের যোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট স্য শান্তিনিকেতনের কৃষি-বিভাগের শ্রী কেদারেশ্বর বলেন—১৯১২ সালে অনুশীলন সমিতি আমাকে দেশে পাঠাইতে মনস্থ করে। সেপ্টেম্বর মাসে াতে সমিতির নেতৃস্থানীয় নরেন্দ্র নাথ সেনের ন্ত তার নারিন্দা বাড়ীতে আমাদের বিপ্লব চেষ্টায় বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ রিয়া জার্মান সাহায্য গ্রহণের বিষয়ে অনুশীলন মিতির পক্ষ হইতে বিদেশে যাওয়া সম্পর্কে আমার ন্ত নরেন বাবুর শেষ কথা হয়। কলিকাতা তে মাদ্রাজ হইয়া কলম্বো যাই। কলম্বো তে যাই লণ্ডন। লণ্ডন হইতে ম্যাঞ্চেষ্টার যাই। মার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আশুতোষ গুহ তখন ম্যাঞ্চেষ্টারে লেন তাহাকে বলি আমি কেমেষ্ট্রী শিখতে র্মানীতে যাইতেছি। গুপ্ত উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত রিনা। আমাদের ন্যাশনাল কলেজের সহপাঠী ন দাসকে আমার যাওয়ার কথা জানাইয়া পত্র ই লণ্ডন হইতে বার্লিন। সেও ছিল কেমেষ্ট্রীর ত্র। তাহার ঠিকানা ঢাকাতে নরেন সেনই দিয়া-লেন। জ্ঞান দাস চিঠি অনুযায়ী বার্লিন ষ্টেশনে সে। আমি তাহার বাসায় যাই। ঐ বাসায় াপক বিনয় সরকারের ভাই ধীরেন সরকার কতেন তিনিও ছিলেন ন্যাশনাল কলেজে থাকিতেন জার্মানীতে "হালে"। তিনিও ন্যশনাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। আমি অবিনাশ বাবুর নিকট হালে থাকি প্রথমে তাহাকেও গোপন উদ্দেশ্য জানাইনা। পরে তাহাকে সব জানাই এবং গোপনে ঢাকায় পত্র দেওয়ার প্রয়োজনের কথা বলি। তিনি Phenolphthaleine Solution দ্বারা গোপন চিঠি লেখার ব্যবস্থা করিয়া দেন তদনুযায়ী ঢাকায় গোপন ঠিকানায় পত্র দেই। ১৯১৩ সালের এপ্রিল মে মাসে প্যারিসের রুয়াদি পন্থসিওতে গিয়া আমি মাডাম কামার সঙ্গে দেখা করি। প্রথম সাক্ষাতেই হাত জোড় করিয়া বলেন "বন্দেমাতরম" আমাকে একটি ছোট কোঠায় নিয়ে যান এবং বলেন এইখানে থাকতো সাভারকার। আমি আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বলি এবং কি করিয়া অস্ত্র পাইতে পারি জানিতে চাই। আমার কথা শুনিয়া তিনি উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "আমাকে বড্ড ওয়াচ করছে। অস্ত্র আমি তোমাকে দিতে পারিব, ভালো প্যাকিং করিয়া পাঠাইতে হইবে। অবশ্য প্যাকিং খরচ পড়িবে অনেক, আর চন্দন নগরে পাঠাইতে পারা যাইতে পারে।" এ সময়ে মাডাম কামা তাহার চেয়ার আমার কাছে নিয়া আসিয়া সন্তর্পনে এবং স্নেহে কথা বলিতেছিলেন। আমি একবার সম্বোধনে সিষ্টার বলিয়াছিলাম তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন," না ছেলে, আমি তোমার মা, তুমি

কে সবকথা বলিয়া এবং পূর্বোক্ত গোপন নাম ঢাকায় পত্র দেই দুই তিন খানা পত্র পাঠাই । কোন উত্তর পাইনা। পত্র দেওয়া হইয়াছিল শীলনের বিশিষ্ট কর্মী সুরেনবসুর বারোন নবদ্বীপ গর লেনের গোপন ঠিকানায়। এই ঠিকানায় ন ভারত এবং লিবার্টি ছাপা হইত। নরেন ঐ পত্রগুলি বটে কিন্তু পুলিশ খুলিয়াছিল । তাহার সন্দেহ হয় তিনি যে আমার পত্র াছেন এবং পত্র পাইয়া টাকা পাইয়াছেন সংবাদ পাই। তবুও টাকা আসিতে দেরি ছে দেখিয়া আমি ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী আমেরিকা চলিয়া যাই। নিউইয়র্কে ন থাকিয়া যাই শিকাগো। সেখানে কসমো ান হোটেলে বন্ধু প্রমথ সাহা ছিলেন। আইওতে গিয়া সুধীন। বসুর সংগে সাক্ষাৎ ত বলেন। এই সময় ১৯১৪ সালের জুলাই জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে। আই ও তে ষ্টেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্ত্তী হই বৈপ্লবিক কাজকর্মও করিতে থাকি। অক্টোবর সহসা একদিন পুরাতন সহপাঠী ধীরেন্দ্রনাথ র জার্মানী হইতে আমার নিকটে আসেন। র্কে আমার খোঁজ করিয়া তিনি আইওএতে আমার সন্ধানে আসেন। একান্তে ডাকিয়া নি আমায় বলেন এবার জার্মান গভর্ণমেন্ট রাজী হ য়াছেন আমাদের ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্দে প্রচুর সাহায্য পাঠাবেন, স্থল ও সমুদ্র পথে সব ব্যব পাকাপাকী হইয়াছে। আমিও এ কাজে লাগি গিয়াছি। আপনি ভারতে চলিয়া যান এবং সেখা গিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য বিপ্লবী নেতাদের ব্যব করিতে বলুন। আপনি উৎসাহিত করিতে থাকুন এ বিদ্রোহ সফল করা যায়। ধীরেন বাবু আমা ভারতে আসার জন্য কিছু অর্থ দিলেন। আ তৎক্ষণাত ভারতে ফিরিতে রাজী হইলাম। এক সশস্ত্র বিদ্রোহে লাগিতে পারিব বলিয়া উৎসাহি হইলাম সহজে নেওয়া যায় এইরূপ সামান্য জিনি পত্র লইয়া পরদিনই ভারতে যাওয়ার জন্য প্রস্তু হইলাম। সানফ্রান্সিসিসকোতে তারকনাথ দা সংগে সাক্ষাত করিলাম এবং সব বলিলাম। তার দাস খুব উৎসাহ দিল এবং বলিল আপনার সং এই ষ্টীমারেই গদর পার্টির বহু লোক যাইতেছে জাপানী ষ্টীমার সেকেণ্ড ক্লাশে যাইতেছি। ষ্টীমা আসিয়া দেখি আই ওয়া হইতে ভূপেন মুখার্জ যাইতেছে এবং বার্লিন হইতে মহারাষ্ট্রীয় যুব নারসন রাও আসিতেছেন। (চলবে

যাবতীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী
মূল্য ৩.৫০ মাশুল অতিরিক্ত

Phone : 34-1795

ষাক :—ষডাক ১৫.০০ টাকা ষাণ্মাষিক ঃ—৮.০০ টাকা মূল্য—৩০ পয়

c/31

10 JUL

— সম্পাদক মণ্ডলী —

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীঅরবিন্দ বক্সী, শ্রীপুষ্প ভট্টাচার্য।

সম্পাদক—শ্রীসাজি সরল রায়চৌধুরী

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতার—শ্রীমন্মথগোপাল পাল।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীমণীন্দ্র গুহ।

বিপ্লবী বাঙলা

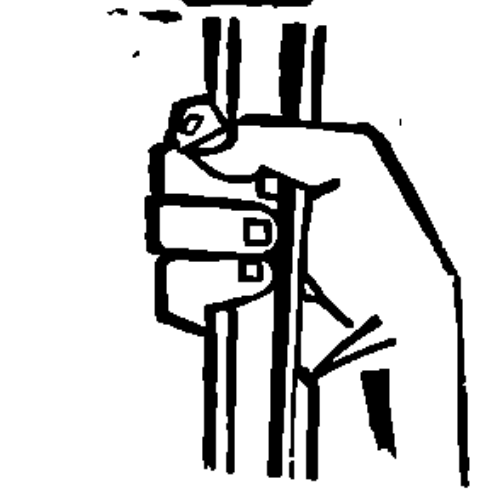

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬. 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭.

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ১৯শে আষাঢ়, ১৩৮৬ ১৭ই জুলাই, ১৯৭৯	৩৯ সং

এই সংখ্যায়

পরিণতি কোথায় ?
। সম্পাদক

Quo Vadis ?—কোথায় চলেছে ?
॥ কানাইলাল সরকার

নদীয়ার কলঙ্কিত অধ্যায়
। শ্রীসৌধর বন্দ্যোপাধ্যায়

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগু

'আমি সেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি না, যিনি এ জীবনে আহার না দিয়ে পর জন্মে শান্তির আশ্বাস দেন।'
—স্বামীজী

সম্পাদকীয়—

পরিণতি কোথায় ?

দীর্ঘদিন ধরে এদেশে অর্থনীতিক্ষেত্রে একটি ক্রমবর্দ্ধমান বিপর্য্যয়ের সূচনা আত্মপ্রকাশ করছিল ধীরে ধীরে। আজ সেই বিপর্য্যয় ভয়ঙ্কর রূপ ধরে নিজেদের সৃষ্ট ফ্রানক্রেন ষ্টাইনের মত সমগ্র অর্থনীতিকে পর্য্যুদস্ত করে দেবার অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। রাষ্ট্র প্রধানরা আজ সন্ত্রস্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়েছেন এবং নানা প্রকার সমাধান দিচ্ছেন। বলা বাহুল্য আমরা দায়িত্বজ্ঞানহীন শুধু পাইয়ে দেবার রাজনীতির কথাই বলছি। দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনকে নেতারা দায়িত্বহীনভাবে পরিচালনা করে আসছেন। কর্ত্তব্য কর্ম না করলে পাওয়ার কোন অধিকার থাকতে পারে না', একথা কখনও তারা শেখান নি। রাজনৈতিক নেতারাও ভোটলাভের আশায় নির্বাচনের পূর্বে অযৌক্তিক ও অসম্ভব দাবী মেটাবার আশা আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলেন শ্রমিক ও কর্মচারীদের মনে। সে সময় তারা হয়ত ভেবে দেখেন না যে এই প্রকারের সুযোগ সুবিধা দেওয়া কতটা সম্ভব অথবা ভাবেন যে নির্বাচনের বৈতরিণী একবার পার হতে পারলে, আর এ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতিমত কাজ না করলেও বিশেষ কিছু এসে যাবে না। আজ কিন্তু পরিস্থিতিটা এমন বিপজ্জনক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে আর নীরব থাকা সম্ভব হচ্ছে না। আজ রাষ্ট্রপরিচালকদের মধ্যে কেউ কেউ এ সত্য অনুভব করছেন যে জনসংখ্যার অনুপাতে ক্ষুদ্র সংখ্যক শ্রমিক ও কর্মচারীদের পৌনঃপুনিক দাবী মেনে নিলে দেশের অর্থনীতির ধ্বংস অনিবার্য্য এবং অগণিত মানুষের দুঃখ কষ্টের ও দুর্ভোগের অবধি থাকবে না এবং রাজকোষও প্রায় শূন্য হয়ে পড়বার আশঙ্কাও বিদ্যমান। কাজকর্ম অচল করে দেবার ভীতির নতি স্বীকার করার এটা একটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। দেশের সর্ব্বৃহৎ অংশের স্বার্থের প্রতি চরম ঔদাসীন্যেরও এটা একটি লজ্জাজনক স্বাক্ষর। তাই আজ ইস্পাত মন্ত্রী ও অর্থ মন্ত্রী ত্রাহি ডাক ছাড়ছেন। কেউ বলছেন জনমত যাচাই করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এ ব্যাপারে। কেউ বলছেন দাবীদার সংযত করতে হবে এবং তাদের জনস্বার্থের প্রতি সজাগ করতে না পারলে, অর্থনীতির কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে। ক্রমাগত পেতে পেতে তাদের লালসা ও পাওয়ার মানসিকতা এমন স্তরে পৌঁছেছে যে তা আর পূরণ করা অসম্ভব। দেশ ও স্বার্থকে বলিদান না করে। ভাবতে খুব অবাক হতে হয় যে মন্ত্রীসভার মধ্যেই এমন কেউ কেউ আছেন যারা এখনও এই পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিতে বদ্ধ পরিকর। কারণটা অবশ্য দুর্বোধ্য নয়। মন্ত্রী হবার আগে এরা ট্রেডইউনিয়ন নেতা ছিলেন এবং তখন সম্ভব অসম্ভব দাবী তুলে মানুষকে ক্ষেপিয়ে দেবার কাজে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে কিছুমাত্র দ্বিধা প্রকাশ করেন নি।

আপৎকালীন অবস্থা জারি করার পূর্বে রেলওয়ে ধর্মঘট করে দাবী আদায়ের জন্য সমগ্র দেশকে অচল করে দিতেও চেষ্টার ত্রুটী করেন নি। তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ আজ মন্ত্রীসভায় আসনলাভ করেছেন। তাদের ত আর পিছু হটবার উপায় নেই, কারণ পিছু হটলেই চরম বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু সমস্যাটা যখন নগ্নভাবে এবং ভয়াল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে, তখন আর এড়িয়ে না গিয়ে, সামনাসামনি মোকাবিলা করাই একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। তবে সেজন্য নীতি নির্দ্ধারকদের সাহস, আন্তরিকতা ও দেশ প্রেমের স্বাক্ষর রাখতে হবে। অসঙ্গত, অন্যায্য, শ্রেণীভিত্তিক অযৌক্তিক দাবীদারদের দৃপ্তকণ্ঠে, বজ্রনির্ঘোষে বলে দিতে হবে, So far no furtner যতটা হয়েছে, সেখানেই সীমারেখা টেনে দিতে হবে জনস্বার্থের খাতিরে। সংগে সংগে অন্য কয়েকটি ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট সকলকেই বুঝিয়ে দিতে হবে এক তরফা দাবীপূরণ করা বেশীদিন চলে না। শ্রমিককে ও শ্রমিকনেতাদের ও বুঝিয়ে দিতে হবে যে পারিশ্রমিক ও উৎপাদন ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে সমর্থন করা চলে না। এদের অভাব অভিযোগ আছে, সে অভাব অভিযোগ পূরণ করার বিরুদ্ধে কোন চিন্তাশীল মানুষই নন। তবে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা এতদিন যেভাবে চলে এসেছে, সেটা অচল অসমর্থনযোগ্য ও পক্ষপাতিত্ব মূলক। তা ভিন্ন পারিশ্রমিক বৃদ্ধির সংগে উৎপাদন বৃদ্ধি যদি সমান তালে না চলে, তবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে, মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, অর্থনীতি বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে ত কোন পক্ষেরই মঙ্গল সাধিত হয় না। দেশের ব্যবসায় বানিজ্য যে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার প্রমাণ দেশের মধ্যে ও বিদেশের সংগে ব্যবসায় বাণিজ্যের অবনতি ঘটার মধ্যেই মিলছে। ইস্পাতমন্ত্রী একটি খুব প্রনিধানযোগ্য কথা বলেছেন। যাদের কোন ট্রেড ইউনিয়ন নেই, একতরফাভাবে শুধু কি তাদের ন্যায় সংগত দাবীকে উপেক্ষা করা হবে? সরকার যদি চাপের কাছেই মাত্র নতি স্বীকার করেন, তবেত অন্যদেরও সেই একই প্রকার আন্দোলনের পথে ঠেলে দেওয়া হবে। আজ যদি কৃষক সম্প্রদায় তাদের বিশেষ দাবী আদায়ের জন্য একটা ঋতুতে কৃষিকর্ম্ম বন্ধ করেন, তবে দেশের মানুষের কি অবস্থা হতে পারে, এটা ভেবে দেখার সময় এসেছে। খাদ্য উৎপাদন বন্ধ হলে ত সব মহারথীরাই বরাশায়ী হতে বাধ্য হবেন। সরকারের পক্ষে একটা জাতীয় বেতননীতি নির্দ্ধারিত করার সময়ও এসেছে। এ সমস্যাকে অবহেলা করলে সবারই ধ্বংস অনিবার্য্য হয়ে উঠবে।

সরকারকে অবশ্যই দেখতে হবে যে জনসাধারণ, যাদের মধ্যে এই কর্মচারী ও শ্রমিকরাও অন্তর্ভুক্ত, যাতে ন্যায্য মূল্যে অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র সহজেই পেতে পারেন। বেতনবৃদ্ধিও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি একটি দুষ্ট চক্রের মত কাজ করে। বেতন বাড়ালেই দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ঘটে, যার ফলে বেতন বৃদ্ধির প্রকৃত সুযোগও সঙ্কুচিত হয়। আবার দ্রব্যমূল্য বাড়লেও বেতন বৃদ্ধির দাবী অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। সরকারকে এই দুষ্টচক্র ভাঙ্গতেই হবে। অন্যথায় তাদের অযোগ্যতার কোন ক্ষমা

থাকতে পারে না। আজকাল দেশের মধ্যে একটি অদ্ভুত মানসিকতার প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। দলীয় স্বার্থে বেপরোয়া হয়ে সমগ্র দেশের স্বার্থের কথা ভাবা হচ্ছে না। নিজেদের প্রাধান্য ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা শ্রেণী আন্দোলনকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, দেশের সর্বস্তরের মানুষের কথা না ভেবে। এই মানসিকতার গতি রুদ্ধ করতে না পারলে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। সর্বোপরি দেশের অর্থের অপচয় বন্ধ করতে হবে। গৌরী সেনের টাকার শ্রাদ্ধ করে দেশ-বিদেশে কখনও সপরিবারে, কখনও বা সপরিষদ ভ্রমণ করার প্রবণতাকে বন্ধ করতে হবে। অপচয় বন্ধ করতে পারলে, উৎপাদনমূলক কাজকর্মে অর্থ বিনিয়োগ করে দেশের সমৃদ্ধিসাধন করার পথ বহুল পরিমাণে প্রশস্ত হবে। চুরি বন্ধ করতে পারলে, ট্যাক্সের বোঝাও অনেক পরিমাণে কমান হবে বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। এই দুর্দিনের পরিপ্রেক্ষিতে একটা সুস্থ সকলনীতি নির্দ্ধারণ করার একান্ত প্রয়োজন। সকলকেই মনে রাখতে হবে দেশের মানুষের টুটি টিপে ধরে কেউ বহাল তবিয়তে থাকতে পারবে না। পারবেনা সাধারণ মানুষকে বলি দিয়ে জাতির ক্ষীরটুকু নিয়ে সরে পড়তে। দেশের সম্পদকে সম-বিভাজন করে না দিতে পারলে, দেশের মধ্যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে বাধ্য, এ কথা সকলকেই মনে রেখে কাজ করতে হবে।

———

পরলোকে বিপ্লবী ভাইসেন

মৈমনসিংহের যুগান্তর দলের সক্রীয় কর্ম্মী ভাইসেন গত ১৯শে জুন করোনারি থ্রম্বসীসে আক্রান্ত হয়ে মৈমনসিং শহরে পরলোকে গমণ করেন। তিনি অকৃতদার, দেশবিভাগের পরও তিনি তার প্রিয় কর্মস্থল পূর্ববাঙ্গলা ছেড়ে আসেন নি। সক্রীয়ভাবে তথাকার বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে বহুবার কারাবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়ে ছিল ৫৯ বৎসর। এই মহান বিপ্লবীর বিদেহী আত্মার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের একান্ত প্রিয় সহকর্ম্মী ছোটক সেন ও অন্যান্য পরিজনের প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাই।

'Quo Vadis ?—কোথায় চলেছ ?

॥ কালীপদ সরকার ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুতরাং কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির বৈষয়িক উন্নতি অথবা শ্রমিক কল্যাণের পিছনে মার্কসবাদের দান অকিঞ্চিৎকর। পরিকল্পনা ও অনলস কর্মই হল উন্নতির ভিত্তি, যা অকমিউনিষ্ট দেশেও ঘটছে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির বিষয়ে ঐ একই প্রযোজ্য।

অবশ্য ব্যবহার প্রমাণবাদ জড় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার বিস্ময়কর সাফল্যের সঙ্গে মানুষের আন্তর বিবর্তনের কোন সম্পর্ক নেই

একদিন সবাই মনে করত যে, উন্নত প্রযুক্তি জ্ঞান মানুষের পার্থিব প্রয়োজন মিটিয়ে, মানুষের দারিদ্র্য ও আর্থিক অসাম্যজনিত অশান্তি দূর করে দেবে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, প্রযুক্তিবিদ্যার উৎকর্ষ মানুষের লোভ ও ক্ষমতার আকাঙ্খাকে দিন দিনই বাড়িয়ে তুলছে। ফলে, সমাজে অভাবজনিত বিক্ষোভের অবসান না ঘটিয়ে, অসন্তুষ্টির যন্ত্রণাকে তীব্রতর করছে। এনেছে আণবিক অস্ত্রের মৃত্যু ভয়।

মানবতা বিসর্জিত কু-বিজ্ঞান থেকে জড়বাদের উৎপত্তি যা হল কিনা মার্কসবাদের পাদভূমি, যা ধারণা ভাবনায় মানব সমাজকে প্রাক-সভ্যতা যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে কোথাও শ্রমিক বিপ্লবের দ্বারা কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মার্কসের ইস্তাহার মত বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষও কখনো এক হয়ে সংগ্রামে নামে নি। শ্রমিক আন্তর্জাতিক ঐক্য এখনো শুধু কাগজে কলমে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার সামরিক বিপর্যয় না ঘটলে এবং জার দ্বিতীয় নিকলাস যদি মর্যাদাবোধ অগ্রাহ্য করে সংকল্পমত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর সহিত পৃথক সন্ধি করে, যুদ্ধ থেকে সরে যেতেন—১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যা লেনিন করেছিলেন—তাহলে জারকে সিংহাসন ত্যাগ করতে ও সপরিবারে মরতে হত না এবং রাশিয়ায় বোলশেভিক বিপ্লব ঘটত না। মার্কস সাহেবের সমাজতন্ত্রও পুঁথিবন্দী হয়ে কেতাবঘরে পড়ে থাকত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের নির্বুদ্ধিতার ফলে স্তালিন পূর্ব-ইউরোপ অধিকারে আনতে সক্ষম হন, যার মূখ্য ভূমিকা ছিল রেড আর্মির, শ্রমিক বিপ্লবের নয়। পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলিতে রুশিয়া নির্ভর কমিউনিষ্ট সরকার গঠন ও সংরক্ষণের মূলেও সেই রুশ সামরিক শক্তি বিদ্যমান। চীনের ক্ষেত্রেও প্রতিপক্ষের সামরিক বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণের ঘটনা দেখা যায়। পৃথিবীর সর্বত্র এবং সর্বকালে এমন অবস্থাতেই রাষ্ট্র বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যে হবে না এমন নয়। আর্থিক অবদান এখানে গৌণ। সুযোগের সদ্ব্যবহার হল আসল কথা।

কমিউনিষ্টদের যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ক্ষমতা দখলের আর একটি কৌশল। এ সম্বন্ধে তৃতীয় কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের নির্দেশনামা পরিষ্কার ভাবে বলেছে, —"কোন দেশে ক্ষমতাসীন দলের ব্যর্থতার কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যখন একই উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে, তখন তাদের একত্রে কাজ করার সুযোগ হয়। এই দলগুলির মতাদর্শ বিভিন্ন হলেও, অনেক ক্ষেত্রে এদের নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গড়া যায়। এক সঙ্গে কাজ করার ফলে কমিউনিষ্টদের পক্ষে শরিক দলগুলির সদস্যদের সহিত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা সম্ভব হয়। কমিউনিষ্টরা তখন শরিকদলগুলির আদর্শ ও নেতৃত্বের প্রতি তাদের সদস্যদের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জাগিয়ে,

অথবা বিচ্ছিন্নতা এনে, শরিকদলগুলিকে সহজেই কোপাট করতে পারবে।

"ছোটদলগুলি যদি কমিউনিষ্টদলের যুক্তফ্রন্টে যোগ না দেয় তাহলে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ও বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণা করতে হবে। তারা যদি কমিউনিষ্টদলের যুক্তফ্রন্টে যোগ দেয়, তখন যথাসময়ে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের সর্বসম্মত কর্মসূচী রূপায়ণে প্রতিবন্ধকতার অভিযোগ তুলে, শরিকদলের সদস্য ও সমর্থকদের তাদের দলের বিরুদ্ধে লাগিয়ে, কমিউনিষ্ট পার্টির স্বার্থে ব্যবহার করতে হবে।"

এই ঐতিহাসিক নির্দেশনামা সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। অবস্থা বাস্তব ঘটনাপ্রবাহে পরিদৃশ্যমান।

সোভিয়েত রাশিয়ায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একদল তরুণ বিজ্ঞানী, লেখক, অধ্যাপক এবং সাহিত্যিক মার্কসবাদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হয়েছেন দেখা যায়। তাঁরা ষাট দশক থেকে রাশিয়ায় মানবিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেছেন। তাঁদের এই বিদ্রোহ আন্দোলন বর্তমানে সাংস্কৃতিক পর্যায়ে সীমিত। আন্দোলনের ভিত্তি সমাজের বিস্তৃত গভীর স্তরে নিষ্ক্ত বলে স্তালিনী পদ্ধতিতে আন্দোলনকে পিসে ফেলা সম্ভব হয় নি।

বিদ্রোহী দলের প্রথম সারিতে আছেন সোভিয়েত সরকারের প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী লিতভিনফের পুত্র পদার্থ বিজ্ঞানী প্যাভেল লিতভিনফ, ভাদিমির বুকোভস্কি, আলেকজান্দার গিনজবার্গ, অগস্ত্রি জিনিয়েভস্কি, পিতর প্রিগোরেংকো, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যিক সলঝিনিৎসিন, ইউলি দ্যাসিয়েল, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী একাডেমিসিয়ান সাখারভ, ঐতিহাসিক রয় মেদেদভ, ভ্যালেরি চালিদজ প্রমুখ সুধীবৃন্দ।

মার্কসবাদ বিরোধী মতবাদ প্রচারের ফলে এঁদের কয়েকজনকে দেশ ত্যাগ করতে হলেও আন্দোলন বন্ধ হয় নি। বিদ্রোহীদের নির্ভুল যুক্তি সম্মত সিদ্ধান্তগুলি বরং সোভিয়েত রাশিয়ার শাসককুলের উপর পরোক্ষ প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয়। যার প্রতিফলন হল, হেলসিংকি বিশ্ব সম্মেলনে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবিক অধিকার রক্ষার প্রস্তাবে সোভিয়েত রাশিয়ার সম্মতিদান এবং ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার নূতন সংবিধান অধিগ্রহণ।

নোবেল পুরস্কার বিরোধী প্রয়াত রুশ সাহিত্যিক ও কবি এবং ডাক্তার 'কিভাগো' গ্রন্থের স্মরণীয় লেখক বরিস্ পাস্তারনকের আশা এত শীঘ্র পল্লবিত হয়ে উঠবে তা হয় ত তিনি ভাবতে পারেন নি। অসম্মান, অবহেলা এবং নির্যাতনে কাতর পাস্তারনক তাঁর শেষ রচনা 'নোবেল প্রাইজ' কবিতার প্রতিটি ছত্রে অনুবেদনার ছাপ রেখে গেছেন। কবিতার বাংলা অনুবাদ—

"খাঁচার পশুর মত আমি হারিয়ে গেছি;
দূরে কোথায় মানুষ আছে,
আছে মুক্তি, আছে আলো।
আমার পিছনে আছে শিকারীর
পদধ্বনি,
কোন পথ নেই, মুক্তির পথ নেই।
তবু এই নিদারুণ মুহূর্তে বলি,
বিশ্বাস রেখেছি ভবিষ্যতে,
বিশ্বাস করি সত্যের জয় একদিন হবে,
অসত্য ও অশুভের অবসান ঘটবে।"

আমরা ইতিহাস খুঁজে বেড়াই, কথায় কথায় বিতর্ক করি। অনেক সময়ই প্রচার সাহিত্যের শিকার হই। উপরোক্ত দশটা লাইন লৌহ যবনিকা ভেদ করে বাইরে এসে যে ইতিহাস ছড়িয়ে গেছে আর কি তুলনা আছে কোথায়ও।

এবার আমরা ফিরে যাব আমাদের কথায়। দেশের সংকটাবৃত অবস্থার কথায়।

পাকিস্থানের নির্মীয়মান পরমাণু বোমা (?), মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রভাবিত চীন-পাকিস্তান-বাংলাদেশের আঁতাতের সম্ভাবনা এবং ভারত মহাসাগরে বিশ্ব শক্তিদ্বয়ের সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি থেকে দেশের বিপদাশংকা যতটা তার চেয়ে বেশী সংকটের কারণ হল দেশের জনসাধারণের মধ্যে ভয়াবহ স্বার্থসর্বস্ব মনোবৃত্তি এবং দায়িত্ববোধশূন্য শৃঙ্খলাহীন আচরণের ক্রম বিস্তার। এই আচরণের পিছনে আছে নৈতিক মূল্যবোধের অবনমন এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব।

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকারের ব্যর্থতা সংগঠিত বিভাগে শ্রমিক কর্মচারীদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করে ধাপে ধাপে বেতন বৃদ্ধি মঞ্জুর, অসংগঠিত বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়া, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য, অফিস আদালতে কর্মশৈথিল্য, হাসপাতালে অরাজকতা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-ব্যবসায়ে ক্রমাগত লোকসান, পরিবহনের দুরাবস্থা প্রভৃতি হল সংকটের পূর্বাভাস এবং কমিউনিষ্ট বীজ বপনের উর্বর ক্ষেত্র।

বহু রাষ্ট্র বিপ্লব ও ধর্ম বিপ্লব পার হয়ে জাতি হিসাবে ভারত যে বেঁচে আছে তার কারণ ভারতের সমন্বয়বাদী সমাজ দর্শন। বাস্তব জগতের অনন্ত বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও বহুত্বকে স্বীকার করে, শ্রেণী সংগ্রামের পরিবর্তে, শ্রেণীসমন্বয় হল ভারতীয় সংস্কৃতির মৌল অবলম্বন। জাতীয়তাবাদ যার প্রাণশক্তি।

জাতি জীবন্ত ততদিন, যতদিন দেশের জন্য, জাতীয় সংস্কৃতির জন্য মানুষের আত্মত্যাগের প্রেরণা অটুট থাকে। আত্মবিশ্বাস, সাহস, দেশপ্রেম, অনলস কর্ম এবং বলিদানের প্রস্তুতিই পারে জাতিকে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও একদেশদর্শী মার্কসীয় দলতন্ত্র শাসন থেকে রক্ষা করতে। অনুপ্রেরণার শক্তি ও দৃষ্টান্ত জোগাতে হয় রাষ্ট্রনায়কদের।

পণ্ডিত নেহেরুর প্রধান মন্ত্রীত্ব কালের শেষ দিকে 'নিউ ইয়র্ক পোষ্টের' বিশেষ প্রতিনিধি মি: ম্যার্কস্ লারনার শ্রীনেহেরুর সহিত তাঁর এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—"বর্তমান কালের ভারতীয় তরুণদের মধ্যে প্রাক-স্বাধীনতা যুগের আদর্শনিষ্ঠা এত কম কেন? আমার এই প্রশ্নের কোন জবাব মিঃ নেহেরু দিতে পারেন নি। মিঃ নেহেরু একাধারে প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, কংগ্রেস দলের নেতা, জাতির শিক্ষক ও পিতৃতুল্য, ত আমার মনে হল ভারতীয় জাতি ও মিঃ নেহেরুর মধ্যে কোথাও যেন বড় রকমের একটা ফাঁক রয়ে গেছে।

আমি যে পরিবর্তনের কথা বলেছিলাম মি: নেহেরু তা মেনে নিলেও, এক বিষাদম্লান নীরবতা ছাড়া তাঁর নিকট থেকে কোন উত্তর মিলে নি।"

পণ্ডিত নেহেরুর পরেও অবস্থার যে কিছু পরিবর্তন হয়েছে এমন মনে করা কঠিন। আদর্শের আপদকে তো অনেকদিন আগেই চুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য ও অবদানকে ভুলের তলা থেকে একজন শুধু কি জানি কেন টেনে বের করেছিলেন।

সঞ্চিত অর্থের ন্যায় দেশবাসীর শুভেচ্ছা ও সহনশীলতা সম্বল করে, স্রোতে ভাসমান তরীর আত্মতুষ্ট আরোহীর ন্যায় যে রাষ্ট্রনায়কবৃন্দ নিরুদ্দেশ ভেসে চলেছেন সারা দেশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে, তাঁদে সামনে আমাদের সেই ঐতিহাসিক প্রশ্ন—'Quo Vadis' অর্থাৎ কোথায় চলেছ?

———

নদীয়ার কলঙ্কিত অধ্যায়

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

আনন্দমার্গীরা এত টাকা পায় কোথায় এবং এমন রোশনাই ও জাঁকজমক করার মূলে বিদেশী টাকার খেলা নেই ত? জমিয়ৎ-ই-ইসলাম ভারতীয় মুসলমানদের মনে যখন তখন যত্র তত্র হিন্দু প্রতিবেশীর সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করার সুযোগ পায় কি করে? এদের সংযত ও সংহত করার দায়িত্ব ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের—তারা কি করে? আগুন নিয়ে এভাবে খেলতে দেখলেও সরকার নীরব কেন? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এভাবে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লে কি আমাদের গৌরব বৃদ্ধি হবে না কলঙ্কের ডালি নিয়ে বিশ্বের দরবারে হেঁট মাথায় দণ্ডায়মান থাকতে হবে? সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যে বা যারাই ছড়াবে তাদের সঙ্গে সঙ্গে কারাভ্যন্তরে রাখা জাতীয় স্বার্থে একান্ত অবশ্য করণীয় কার্য্য—সে কথা কি সরকার জানে না, বা বোঝে না? ভারতের বৃহত্তর জনসংখ্যার কল্যাণের বাস্তব তাগিদে সাম্প্রদায়িকতার মূলোৎপাটন এখনই দরকার, ইতিমধ্যে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ভাবে বহু এলাকায় এর প্রকাশ দেখা গেছে এবং এই অপরাধ বারে বারে অনুষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ আসে কোথা থেকে এবং কেন? তার তথ্যানুসন্ধান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারগুলির প্রাথমিক দায় ও দায়িত্ব, অথচ সরকারগুলি সে ব্যাপারে 'গয়ঃ গচ্ছ' নীতি নিয়ে অতি ধীর পদক্ষেপে এগুতে অভ্যস্ত কেন? আর বাংলাদেশ সরকার নদীয়ার এই অপ্রীতিকর ঘটনার সুযোগ নিয়ে যে সব মিথ্যা রটনার অবতারণা করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে চলেছে তা কূটনৈতিক রীতি বিরোধী ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত অতি জঘন্য কার্য্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কোথায় সাম্প্রদায়িক প্রীতির প্রসার ঘটাবেন বাংলাদেশ সরকার, তা নয় তাঁরাই ক্ষতিকর, উত্তেজনাকর ও সন্ত্রাসজনক রটনার সৃষ্টি করে চলেছেন।

এই দাঙ্গায় প্রায় দেড় হাজার নদীয়াবাসী নদীয়া ছেড়ে বাংলাদেশে চলে গিয়েছিল এবং তাদের বাংলাদেশে আটকে রাখা হয়েছে বলে মন্ত্রী রাধিকা ব্যানার্জি জানান। তিনি ত্রাণকার্য্যে নদীয়ায় এসে ঐ সব ভীত সন্ত্রস্তদের পুনরায় মাতৃভূমিতে অর্থাৎ নদীয়ায় ফিরে আসার আবেদন করেছেন। তারা ফিরে এলেই সকল রকম সাহায্য পাবে। রাধিকাবাবু জানান, এক হাজার বাড়ী যা দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা পুনরায় তৈরীর জন্য প্রত্যেককে পাঁচশো করে টাকা দেয়া হবে সাহায্য হিসাবে। ইতিমধ্যে চার হাজার ধুতি, শাড়ী, বেশ কিছু লুংগি, শিশুদের জন্য ছয় হাজার জামা-প্যান্ট, পাঁচশো ব্যাগ গুঁড়া দুধ, আড়াই হাজার ত্রিপল এবং নগদ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দাংগা বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী হিসাবে সরকার দিয়েছে বলে রাধিকাবাবু জানান। এই সংবাদ থেকেই সাম্প্রদায়িক দাংগার ভয়াবহ ব্যাপকতা ও মারাত্মক ক্ষতির পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। জনতা সভাপতি ফজলুর রহমান সংবাদিক বৈঠকে কলিকাতায় বলেন: পশ্চিমবংগ সরকার ও আই. জি, পুলিশ যদি আগে থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন, তবে চাপড়া ও কৃষ্ণনগরে সাম্প্রদায়িক দাংগার ঘটনা ঘটত না। তিনি আরো অভিযোগ করে বলেন যে, উপদ্রুত এলাকার অধিবাসীদের মনে সাহস ও আস্থার ভাব ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরকার এখনও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেননি। চাপড়ার গ্রামে গ্রামে সীমান্তের ওপার

থেকে দলবদ্ধ ভাবে হানা দিয়ে যে সব ডাকাতি হয়েছে তা বন্ধ করার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ছিল এখনও নেওয়া হয়নি। বহু গ্রামেই পুলিস নেই, মানুষের মন থেকে ভয় ভীতি দূর হবে কি করে? রহমান সাহেবের উক্ত অভিযোগ গুরুতর। তিনি শীঘ্রই বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী করেছেন—জনস্বার্থে ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ নির্মূল করার অভিপ্রায়ে। নদীয়া জেলায় যে এমন একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটতে পারে, সে রকম কিছু খবর সরকার ইনটেলিজেন্স বিভাগের মাধ্যমে পাননি, ফলে পূর্বাহ্নে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও কিছু নেওয়া সম্ভব হয়নি। এই প্রশাসনিক অপদার্থতায় সরকার উদ্বিগ্ন ও দিশেহারা হয়ে পড়ে, ফলে দাংগার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে ও বহু মানুষ ছিন্নমূল হয়ে আশ্রয়-চ্যুত হয় এবং হত ও আহত হয়। এই দুঃখজনক অবস্থায় শান্তি ও সংহতি ফিরিয়ে আনতে দলমত পথ নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা একযোগে কৃষ্ণনগর, চাপড়া ও অন্যান্য উপদ্রুত এলাকায় শান্তি মিছিল বার করেন—মানুষের মনে আস্থার, সৌহার্দের ও বিশ্বাসের ভাব ফিরিয়ে আনার অভিপ্রায়ে। ইহা সত্যই সুলক্ষণ ও আশার কথা, কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধানেরা শান্তি মিছিলে কোথাও কেউই যোগ দেয়নি কেন? কি এর অন্তর্নিহিত রহস্য? কোথায় বাধা? কেন এই হীনতা ও দীনতার শিকার হলো পঞ্চায়েত প্রধানেরা? বিশেষ করে চাপড়ার গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত-সমিতিগুলির প্রধানেরা সাম্প্রদায়িক মৈত্রী রক্ষার শান্তি-মিছিলে যোগ দিতে অস্বীকার করে, অথচ চাপড়া থানা এলাকাই সবচেয়ে বেশী উপদ্রুত ও ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। মনে হয় সীমান্তের ওপারের ডাকাত দলের ও সমাজ-বিরোধীদের ঘন ঘন ও ভয়ঙ্কর অত্যাচারের ভয়েই তারা শান্তি-মিছিলে যোগ দিতে সাহস করেনি। রাজ্য-সরকারের এ বিষয়ে এখনই তদন্ত করা ও সমগ্র ব্যাপার খুঁটিয়ে দেখা দরকার, নচেৎ এইসব পঞ্চায়েত প্রধানরা গ্রামবাসীর বিপদের দিনে কি কাজে লাগবে? এমন পঞ্চায়েত প্রধানদের প্রয়োজনই বা কি? এরা অপ্রধান হয়ে থাকলেই বরং গ্রামবাসীর পক্ষে মঙ্গল। ইতিমধ্যে নয় দিন অতীত হলো, তবু নদীয়ার উপদ্রুত এলাকায় সেরকম উল্লেখযোগ্য উন্নতির লক্ষণ দেখা না যাওয়ায় রাজ্য-সরকার উদ্বিগ্ন। পাকিস্তানি আমলে দুষ্কৃতকারীরা প্রায়ই সীমান্ত অতিক্রম করে নদীয়ার গ্রামাঞ্চলে উৎপাত—উপদ্রব করত, সে বদ-অভ্যাস তাদের আজও অব্যাহত দেখা যায়। রাজ্য-সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে কঠোর মনোভাব নিয়ে বাংলাদেশী সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে বসে এর একটা বিহিত ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হবে যাতে বাংলাদেশী দস্যুরা ও দুষ্কৃতকারীরা ভবিষ্যতে এই প্ররোচনা ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করতে না পারে। তাদের সংযত করতে না পারলে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘন ঘন সংঘঠিত হবে এইসব প্ররোচনাদাতাদের ব্যক্তি স্বার্থ। সীমান্তে কড়া পাহারার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারকে এখনই করতে হবে, অন্যথায় সাম্প্রদায়িক অশান্তির অনুপ্রবেশ ও আশংকা থেকেই যাবে, যা জাতির পক্ষে, দেশের পক্ষে ও সরকারের পক্ষেও চরম অশুভ ও বিপদজনক। এই ত কয়দিন আগে সীমান্তবর্তী গ্রাম নবীনগরে এক দোতলা বাড়ীর উপর বৃহস্পতিবার (২৮শে জুন ১৯৭৯) বেপরোয়া গুলি বর্ষণের অভিযোগে নয় ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছে, ঘটনাস্থলে তদন্ত চালিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যবহৃত বুলেট উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করা সব বুলেটই পাকিস্তানে তৈরী বলে পুলিস অফিসার

জানান। এই ঘটনা কি আমাদের চোখ খুলে দেবে না, যে প্ররোচনা কোথা থেকে কিভাবে আসছে এই নষ্টামি ও দুষ্টামি রুখতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার অতি শীঘ্রই যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা নেবে এই আশাই করব।

নদীয়ার কলঙ্কিত অধ্যায়ের জের যেন পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোনও এলাকায় কেউ না এরপর টানতে পারে এবং এ বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গের সদা সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, আর সরকারকে তার ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগকে এ ব্যাপারে সক্রীয় ও তৎপর রাখার ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে করতে হবে, যাতে করে এই বিপদ অন্যত্র আর ঘটার সুযোগ না পায়। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে দুটি সংস্থা বেশ ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে. সস্তা ও মুখরোচক শ্লোগানের দৌলতে। মানুষ সহজেই প্ররোচিত হচ্ছে ও এদের প্রশ্রয় দিতে উন্মুখ হয়ে রয়েছে বলে মনে করার যথেষ্ট যুক্তি সঙ্গত কারণ আছে। সরকার নিশ্চয় এ বিষয়ে সংবাদ রাখেন। 'আমরা বাঙালী' দল ত্রিপুরায় বেশ শক্ত জমিতে দাঁড়াবার মত অবস্থায় উপনীত হয়েছে স্বল্পকাল মধ্যেই, আর তারা এখন কোন ধর্মীয় দল নয় ; বরং দৃঢ় সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক দলের ভূমিকা নিতে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের বাঙালী স্থানের দাবী ও প্রচার অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে প্রাদেশিক বিভেদ, বিসংবাদ ও অনর্থক অশান্তি না ডেকে আনে। অবস্থা ক্রমশঃই বিপদজনক হয়ে উঠছে যা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। বেকার বাঙালীদের কাছে তাদের বক্তব্য বেশ ভাল মতেই সমর্থন পাচ্ছে। পরিণামের চিন্তা কারোরই মাথায় নেই। কি ভীষণ দুর্দিন যে আসন্ন ও প্রতীক্ষারত তা ভাবলেও শরীর এবং মন শিহরিত হয়, কারণ অবাস্তব ও উদ্ভট সব পরিকল্পনা এবং তার ঘন ঘন প্রচার সাধারণ মানুষের মনকে বিভ্রান্তির পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুত গতিতে। "আনন্দমার্গী" ও "আমরা বাঙালী" বোধহয় একরন্তে দুটি বিষময় ফল, যা খেতে অল্পমধুর আর খেলেই অচীরে অপমৃত্যু : তবু আপাতমধুর প্রলোভনে ভুলে মানুষ ঐ দিকেই শনৈঃ শনৈঃ ধাবমান কল্পিত অমৃতের আস্বাদনের লোভে। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু—এ কথা ক জনে জানে বা বোঝে ? হায় বাঙালী, জানতা উক্ত কল্পিত বাঙালীস্থান, তোমার মৃত্যু কাদের প্রথম অবদান। আমরা ভারতীয় ভারতবর্ষ আমাদের দেশ—এ যদি না করতে পার তবে শীঘ্রই বিপদগ্রস্থ হবে, কারণ ক্ষণিকের মোহ ও উত্তেজনা স্তিমিত হতে দেরী হবে না, তখন কোথায় কার দ্বারে দাঁড়াবে ? অতীতে এই ভেদ বুদ্ধি বাংলার ও বাঙালীর অনেক ক্ষতি সাধন করেছে এবং ভবিষ্যতেও এর কুফল মারাত্মক আকারে আমাদের আঘাত করবে, যে আঘাত সহ্য করার শক্তিও তখন আর আমাদের থাকবে না। সরকার যদি ঠিকমত যত্ন সহকারে অনুসন্ধান করেন, তবে নিশ্চিত দেখতে পাবেন যে এই সব বিভেদ-বিসংবাদ সৃষ্টিকারী দল কাদের স্বার্থে ও কাদের টাকায় চলে ও কি কি তাদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। রহস্য উদ্ঘাটিত হলেই দেখা যাবে বিদেশী রাষ্ট্রের টাকায় ও তাদের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থেই এসব দলের উৎপত্তি যা ভারতের তথা ভারতীয়দের ন্যায্য স্বার্থের পরিপন্থী। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যেমন দেশের ও মানুষের পক্ষে চরম ক্ষতিকারক, প্রাদেশিক বিভেদ ও অশান্তি তেমনই বিপদজনক। বাঙালীরা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই বাস করে না, তারা ভারতের ও বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার জীবন ও জীবিকার সন্ধানে বসবাস

(১১ পাতায় দ্রষ্টব্য)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

স্বদেশবাদ ও 'বন্দেমাতরম্'

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দান্তে যখন ইটালীর ঐক্য সঙ্গীত গেয়েছেন, তখন তাঁরও কোন ধারণা ছিল না যে তাঁর সঙ্গীতকে ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডি কোন ব্যবহারিক কাজে লাগাবেন, অথবা ইটালির লোকদের রাজনৈতিক বিবর্তনে ইহা কোন ভূমিকা পালন করবে। প্রতিভাশালী লোকেরা তাদের চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে যান। তার কিছু কিছু উপযুক্ত জমিতে পতিত হয়। মহাকাল তার শক্তি দিয়ে তাকে পালন করেন। পরে তা সুপরিপক্ক হয় এবং প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদন করে ভবিষ্যৎ মানুষের অবর্ণনীয় মঙ্গল সাধন করে।

'স্বাদেশী' আন্দোলনের আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী

স্বদেশী আন্দোলন আমাদের সব রকম কাজেই উৎসাহের মাত্রা খুব বাড়িয়ে দেয়। সাহিত্য, রাজনীতি ও শিল্প—সবক্ষেত্রেই সে উৎসাহ দেখা যায়। এই জাতীয় ভাব-প্রবণের ধাক্কা পুরা মাত্রায় লাগে সাহিত্যের উপর। গদ্যে ও পদ্যে সে ভাবধারা প্রকাশ পেতে থাকে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও এমন উৎসাহের সঞ্চার হয় যে তা ইতিপূর্বে দীর্ঘ দিনের মধ্যেও কখন দেখা যায়নি। স্বদেশী জনসভাগুলিতে বাংলা ভাষায় যে সমস্ত বক্তৃতা করা হয়, নতুন ভাব প্রেরণায় সঞ্জীবিত সে সমস্ত বক্তৃতা ছিল বাগ্মীতার এক একটি নিদর্শন। এটা খুব দুঃখের বিষয় যে বক্তৃতাগুলি সংরক্ষিত হয়নি। নন-কোঅপারেশন আন্দোলনে এই বাংলাদেশে অন্ততঃ সে রকম দেখতে পাচ্ছি। বাংলার হৃদয়ে কোথায় সেই সার্বিক বিকাশের আবেশ স্পন্দন, যে স্পন্দন বাঙ্গালীকে একটি উচ্চতর সামাজিক ও নৈতিক জীবনে উন্নীত করেছিল। অথবা সাহিত্যে এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কোথায় আমরা সেই স্বদেশ প্রেমানুভূতির উদ্ভিকিরণ দেখতে পাচ্ছি যা সকল হেয়, নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য বিষয়বস্তুকে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে জাতীয় জীবনকে ঊর্ধে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে তাকে এক মহত্তর ভাগ্যের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করে পূর্ণতা দান করতে চেয়েছে? আজ আমরা এর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কেবল কথা আর কথা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল কথার মালা। আর আছে হিংসা ও বিদ্বেষ যা স্বদেশ প্রেমের আলোয়ান গায়ে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে; কিংবা এর ভালোর দিকের কথাও যদি বলতে হয়, তাহলেও বড় জোর একথাই বলা যায় যে এটা মানবতার স্বার্থের বৃহত্তর ব্যাপারে একটা বিচ্ছিন্নতাবাদী পৃথক জীবনবাদী আন্দোলন। এর অর্থ হল জাতি হিসাবে আমরা বহির্দেশীয় মানব গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্করহিত হয়ে আলাদাভাবে বেঁচে থাকব, উন্নতি সাধন করব জাঁকিয়ে উঠবো; যে জীবন রসে মানব-সমাজ পুষ্ট হয় তার ধারা আর আমাদের মধ্যে বইবে না; জগতের অন্যান্য অংশের মানব সভ্যতা, শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির সাহায্য ছাড়াই, অভুক্ত থেকে আমাদের জীবন ধারাকে নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত করতে হবে; আর সেই বিচ্ছিন্নতার আহ্লাদে উল্লসিত হয়ে গর্ব

বোধ করব। এ চিন্তা আমার কাছে অসহনীয়। এ রকম অবস্থা যদি হয়, তাহলে আমাদের জাতীয় জীবনের ঊর্ধগতি রুদ্ধ হবে। আমরা বামন হয়ে পড়ব, আর অন্যরা হয়ে উঠবে দৈত্য।

যাক, এসব মন্তব্য থাক। স্বদেশী আন্দোলনের চরম প্রভাব বিস্তার কালে আমাদের যে সমস্ত বহু মুখী উন্নতি ঘটেছে তার বিবরণ দেওয়া যাক। অন্ততঃ শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় কর্ম প্রেরণা অপূর্ব উৎসাহ লাভ করেছে। একটার পর একটা সাবানের কারখানা, দিয়াশলাইয়ের কারখানা ও কাপড়ের কল গড়ে উঠতে লাগল : তাঁতশিল্পও তার নিজের ক্ষেত্রে বেশ উৎসাহ পেল। তাঁত শিল্পীরা এক রকম ধ্বংসের পথেই চলছিল। ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্রাদি তাদের ব্যবসা ধ্বংস করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন তা পুনরুজ্জীবিত হল। আমি হুগলী জেলার হরিপালে গিয়েছিলাম একটি সভায় যোগদান করতে। সেখানে বহু তন্তুবায় শ্রেণীর লোক বাস করেন। তারা আমাদের আশীর্বাদ করলেন। আমরা তাদের বাড়ীতে গিয়েছি। তাদের ঘর দরজার পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য দেখে বুঝতে পারলাম যে তাদের সমৃদ্ধি ফিরে এসেছে। সারা দেশেই তখন এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। সরকারী বিবরণেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সাময়িক উৎসাহের আতিশয্যে এবং গৃহ-শিল্পের বিকাশে সাহায্য করার অতি আগ্রহে ব্যবসা সংগঠনের প্রাথমিক কর্তব্যগুলি সম্পর্কে সব সময় সতর্কতার সহিত চিন্তা করা হয়নি। এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগের যে প্রয়োজন আছে সে দিকে যথেষ্ট পরিমাণে খেয়াল করা হয়নি। পুঁজির অভাব হয়নি ; তা পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সেই পুঁজি বিজ্ঞতার সহিত নিয়োগ করা হয়নি। ফলে অনেক ব্যবসা ফেল করল এবং তার ফলে স্বদেশী ভাবনা ভয়োদ্যম হয়ে পড়ল।

দুঃখের সহিত এটা বলতেই হচ্ছে যে সরকার শিল্পোন্নয়ন আন্দোলনকে সাহায্য করার এই সুযোগ গ্রহণ করেন নি। সরকার যদি এগিয়ে এসে উপযুক্ত বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে এই আন্দোলনকে সাফল্যের পথে সুপরিচালিত করার জন্য নেতৃত্ব দান করতেন, তাহলে তা তাদের স্বকৃত কর্মের ফলে উদ্ভূত রাজনৈতিক তিক্ততা উপশমিত করত এবং শিল্প সমস্যার সমাধানে অনেকখানি অগ্রগতি হত। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের রাজনৈতিক উত্তেজনা হয়ত বা সরকারী মনোভাবকে পেয়ে বসেছিল। তাই তারা এই আন্দোলন সম্পর্কে ঔদাসীন্য এমন কি শত্রুতার পথ বেছে নিলেন। কিছু কিছু ছেলে-মানুষী উত্তেজনাপূর্ণ কাজের বাড়াবাড়ির জন্য

(৯ পাতার শেষাংশ)

করে। তাদের কথাও মনে রেখে এগুতে হলে, নিশ্চয় আমরা 'আমরা বাঙালী' দলের চিন্তাধারাকে প্রশ্রয় দেব না বা তাদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভুলপথে পা বাড়াব না। আনন্দমার্গীদের সম্বন্ধে ভারত সরকার যতশীঘ্র কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ততই মঙ্গল। ভারতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাম্প্রদায়িক এবং প্রাদেশিক সম্প্রীতি সম্প্রসারণের প্রয়োজন আজ সর্বাধিক। সংহতি ছাড়া দেশের বহু কষ্টার্জিত স্বাধীনতাও বিপন্ন হতে পারে এবং দেশ রক্ষার প্রাথমিক কাজ দেশের সংহতির সংরক্ষণ, সম্প্রদায় সম্প্রদায়ে প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করণ ও একজাতি এক প্রাণ একতার মহান আদর্শের অনুশীলন ও তা সর্বশক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে। জয় হিন্দ।

(সমাপ্ত)

ছেলেদের ধরে নিয়ে সাজা দিতে আরম্ভ করল, এবং মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করে বেশ কয়েকটি তরুণ শহীদের বাহিনী সৃষ্টি করলেন। এইভাবে তরুণদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ বপন করা হল যার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই অশুভ অরাজকতা হিংসাত্মক কার্যাবলী ঘটতে আরম্ভ করল। আমাকে দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে এই হিংসাত্মক ঘটনাবলীর শেষ পরিণতি যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আমরা এখনও পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না।

তবে আমাদের ছেলেদের এই উত্তেজনায় বাড়াবাড়ি এবং অপর পক্ষে সরকারী দমননূলক কাজের আতিশয্য সত্ত্বেও স্বদেশী আন্দোলন ঠিকই এগিয়ে চলেছে। আগা-গোড়াই এই আন্দোলনের প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল আমাদের সাধারণ পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে, আমাদের ধুতি ও শাড়ীর ব্যাপারে ম্যাঞ্চেষ্টার ও বিদেশী বাজারের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করা। বোম্বে আংশিকভাবে ধুতি ও শাড়ীর সরবরাহ করছিল। স্বদেশী আন্দোলনের চরম ক্ষণে বোম্বের কাপড়ের কলগুলি বেশ বাড়-বাড়ন্ত হয়ে ওঠে। তবে বাংলা যাতে কিছু পরিমাণে তার নিজের অভাব পূরণ করতে পারে সে বিষয়েও চিন্তা দেখা দেয়। হুগলী নদীর তীরে শ্রীরামপুরে একটি কাপড়ের কল ছিল। কিছুকাল আগে থেকেই এটির অস্তিত্ব বজায় আছে। সিদ্ধান্ত হল যে এই কলটিকে কিনে নিয়ে এর কাজ সম্প্রসারিত করা হবে। এ কাজের জন্য ১৮ লক্ষ টাকার দরকার। সেই টাকা তোলার জন্য আবেদন প্রচার করা হল। অন্যান্যদের মধ্যে সেই আবেদনে আমিও স্বাক্ষর করেছিলাম। টাকাটা সহজেই পাওয়া গেল। অধিকাংশ টাকাই আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাজ থেকে, এমন কি মেয়েদের কাছ থেকেও, পাওয়া গিয়েছে। মিলটি কেনা হল, সম্প্রসারিত করা হল এবং এর নামও বদলে দেওয়া হল। এর নাম দেওয়া হল 'বঙ্গলক্ষ্মী মিল'। মেয়েদের প্রতি সম্ভ্রম দেখাবার জন্যই এই নামকরণ করা হয়; কারণ, তারা এই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কার্যকরী ভাবে আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। মিলটির বিচিত্র ইতিহাস আছে। বারে বারে এর উত্থান পতন ঘটেছে। তা অভিজ্ঞতা লাভ করতে হলে তার জন্য মূল্য দিতেই হয়। আমরা তাই দিয়েছি এবং এর ভিতর দিয়ে যে জ্ঞান লাভ করেছি নিঃসন্দেহে তার মূল্যবান ফল ফলবে। মিলটি এখন একটি নতুন জীবন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। আমি আশা করি এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন হবে। (চলবে)

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী নলিনী সেনগুপ্ত

ময়মনসিংহের যুগান্তর বিপ্লবী দলের একনিষ্ঠ কর্মী নলিনী সেনগুপ্ত গত মে মাসে কলকাতায় পরলোক গমন করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কংগ্রেসের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তার অবদান স্মরণীয়, মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৭৯। আমরিক, বন্ধুবৎসল, মানবদরদী এই বিপ্লবীর স্মৃতিতে আমরা শ্রদ্ধা জানাই—তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

RgedNo. R. N . 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. W B/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা . | ষাণ্মাষিক ।—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

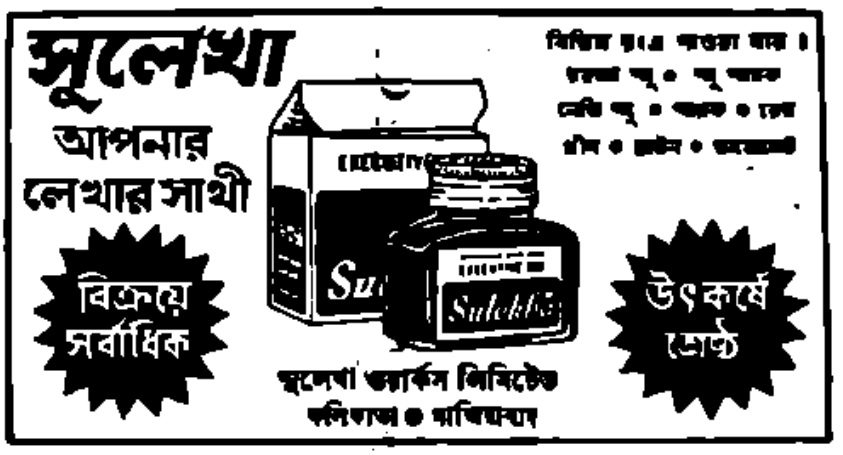

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীউদ্দেশচন্দ্র নন্দী, শ্রীপুলি চ্যাটার্জী।
সম্পাদক—শ্রীসাতি শরণ রায়চৌধুরী
বিপ্লবীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন্দ্র ঘোষ। বেতালা—শ্রীনন্দগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীশীষ গুহ।
বিপ্লবী বাংলা ভাণ্ডারের :—৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩০০০৭
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাঙালী

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭৯

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৮৬ ২১শে জুলাই, ১৯৭৯	৪০ সংখ্যা

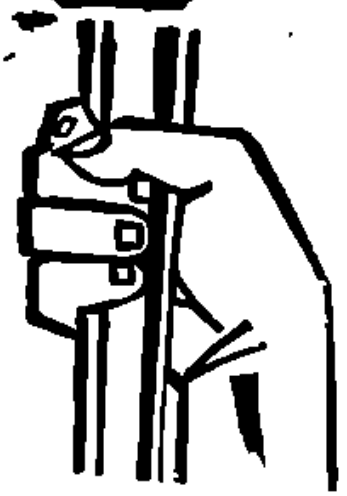

এই সংখ্যায়

এত উষ্মা কেন ?
। সম্পাদকীয়

শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ বিপ্লবী বারীন ঘোষ
।। চম্পক দাশ

একটি পুরাতন কাহিনী
।। প্রিয়ভূষণ সেন

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত

বর্ত্তমান যুগে মার্কস্‌বাদ
।। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাস ।

প্রশ্ন আমার
।। উষা দাশগুপ্ত

"মহৎ প্রচেষ্টাকে মহৎ দৃষ্টি দিয়ে দেখলেই মহত্বের আসন লাভ করা যায়।"

—স্বামীজী

সম্পাদকীয়—

এত উষ্মা কেন ?

গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতিই জনগণের কল্যাণের পক্ষে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই ধারণাই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মানুষ বিশ্বাস করে। ভিন্নমত পোষণ করে এমন দেশও আছে। তাই যুগপৎ গণতন্ত্রের ও একনায়কতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। কালের বিচারে কোন পদ্ধতি সর্বজনগ্রাহ্য হবে, তা বলা শক্ত। ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বেছে নিয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্রের জোয়ারে ভেসে এসে মাঝে মাঝে প্রশাসনের মধ্যে ক্ষমতা লাভ করে কিছু লোক, যাদের রীতিনীতি কোনক্রমেই গণতন্ত্রের মর্য্যাদা বা জনপ্রিয়তা বাড়ায় না, বরং মানুষকে গোটা ব্যবস্থার উপর বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের জনৈক মন্ত্রীর কার্য্যকলাপ ও অশালীন কয়েকটি উক্তি এই মানসিকতাকে বাড়িয়ে তুলছে।

বিদ্যুৎ সঙ্কটের ফলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জীবনে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে সঙ্কট দিনদিন ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। সঙ্কটের সঠিক কারণ নির্ণয় করে প্রতিকারমূলক ও প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বরং এই সমস্যাকে আরো ঘোরালো করে তুলছেন কয়েকটি মানুষ, যারা এখানকার প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে আছেন। মুখ্যমন্ত্রী দেশে থাকতেই বেসরকারী সংস্থার ইঞ্জিনিয়রদের নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে এই সঙ্কট সমাধানে তাদের সাহায্য চেয়েছিলেন। তারা রওনা হলেন কাজ করতে, অথচ কার্যকালে দেখা গেল, সব ব্যবস্থা বানচাল করে দিলেন বর্তমান বিদ্যুৎ মন্ত্রী। তার ব্যবহারে ক্যাবিনেটে নাকি বিস্ময় ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব, যিনি মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহধন্য বলে অনেকেই মনে করেন, মন্ত্রীকে না জানিয়েই এই কাজ করেছেন বলেই মন্ত্রী মহাশয়ের উষ্মার কারণ বলে সংবাদে প্রকাশ। কিন্তু এই নাটকের পরবর্ত্তী কিছু অংশ রীতিমত চমকপ্রদ। বিভাগীয় সচিব নাকি প্রশ্ন করেছেন মন্ত্রীকে যে তিনি ভদ্রলোক কি না। তিনি বিভাগ থেকে পদত্যাগ করে, কাজ করতে রাজী হয়েছেন এই সর্ত্তে যে ভারপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ মন্ত্রী ডাকলে তিনি যাবেন না। একজন সরকারী কর্মচারীর এই প্রকার ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার অত্যন্ত অশোভন ও অসঙ্গত। মন্ত্রীর কাজকে কেউ সমর্থন করবেন বলে মনে হয় না। তাঁর ক্ষোভের কারণ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে জন্য তিনি বিভাগীয় সচিবকে কৈফিয়ৎ চাইতে পারতেন এবং প্রয়োজনবোধে তাকে সাসপেণ্ড করতে পারতেন। কিন্তু যে গুরুতর সমস্যা জনজীবনকে বিপর্য্যস্ত করে চলেছে তার সমাধানের পথ রুদ্ধ করে দিলে সেটা জনস্বার্থ বিরোধী কাজ

বলে গণ্য হবে। বিভাগীয় সচিব যে মেজাজে মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন, সেটাত Service Rules এর আওতার বাইরে। মন্ত্রী ও আমলার এই কোন্দল যদি শুধু ব্যক্তিগত স্তরে নিবদ্ধ থাকত, তবে একে প্রহসন বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু এই বিবাদের ফলে, জনস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হল যার প্রত্যক্ষ ফল ভোগ করতে হবে সাধারণ মানুষকে। তাই এটা নিন্দনীয়, দুর্ভাগ্যজনক ও লজ্জাজনক ঘটনা।

এই মন্ত্রী মহাশয় অতীতেও কিছু কিছু অশালীন কাজ করেছেন। বিরোধীদলের নেতাকে তিনি মর্য্যাদাহানিকর বিশেষণে ভূষিত করেছেন। এখন প্রকাশ, সহযোগী মন্ত্রীর রিপোর্ট তিনি কেটে দিয়েছেন অবজ্ঞাভরে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবার ভয়ও দেখিয়েছেন। আজ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওভারড্রাফট্ বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতার বয়ান নির্দ্দিষ্ট করে দিতে চেয়েছিলেন। এই ভদ্রলোকের কথাবার্ত্তাও অনেক সময় হাস্যোদ্দীপক। একটি প্রশ্নের জবাবে নাকি তিনি বলেছেন যে তিনি ভদ্রলোক নন, কিন্তু কমিউনিষ্ট। কমিউনিষ্ট হলে ভদ্রলোক হওয়া যায় না এটাই কি তার প্রতিপাদ্য বিষয়? তবে যে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে উনি ভদ্রলোক কিনা জানেন না, তবে কমিউনিষ্ট নয়, এই অভিমতই কি গ্রহণ করছেন? এই ভদ্রলোকের অন্য যে গুণই থাক, দেশ সেবার কোন ঐতিহ্য আছে বলে জানা যায় না। হঠাৎ জনতাদলের স্রোতে কমিউনিষ্টদের মনোনীত প্রার্থী হয়ে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন, যদিও ভোট ভাগাভাগির ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রীত্ব লাভ করার পর, তার কিছু অদ্ভুত উক্তি ও কাজ কর্ম্মের জন্য তার উপর মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছেন, সেটা উনি জানেন এবং বুঝছেন কি না জানি না।

গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে কিছু কিছু অযোগ্য ও ঐতিহ্যহীন মানুষকে ক্ষমতাসীন দলে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে দেখা যায়। কিন্তু তাদের পরিচয় বেশীদিন চাপা থাকে না। এই মন্ত্রী মহাশয় সেই দলভুক্ত একজন? তা হলে ত তার সম্বন্ধে সতর্ক হবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যেমন দলের তরফ থেকে, তেমনি সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে। মানুষের মনে সন্দেহ লাগাটাই স্বাভাবিক যে, যে মন্ত্রী সহযোগীদের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে পারছেন না, সমস্যার লঘু গুরু জ্ঞানের পরিচয় যিনি দিতে পারছেন না, তিনি অর্থ মন্ত্রকের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কাজ কি করে করছেন।

নির্বাচনের সময় বেনো জলের মত কিছু লোক ঢুকে পড়ে সব দলেই। তখন সকলের যোগ্যতা ও গুণের পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু নির্বাচনের পর যখন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, যখন বিশেষ বিশেষ কাজ ভাগ করে দেবার ব্যবস্থা হয়, তখন ত প্রত্যেকেরই সাধ্য, ক্ষমতা ও যোগ্যতার বিচার করা উচিত। অনেক গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের সময় দল নির্বাচনে জয়ী হলে, কাদের মন্ত্রীত্ব দেবে ও কার কার উপর কোন বিভাগের ভার থাকবে, এ কথা পরিষ্কার করে

জানাতে হয়। এতে জনসাধারণের পক্ষে তাদের যোগ্যতা পরিমাপ করে দেখার সুবিধা হয়। তাদের অতীত ইতিহাসের পাতা উল্টে তাদের সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করতে পারে। আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা না থাকায়, তস্বিরের জোরে নবাগতরা অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করতে পারে, এমন কি একজন কালোবাজারী, একজন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, অসততার অভিযোগে সন্দিগ্ধ ব্যক্তিও কৌশলে ক্ষমতাসীন হয়ে বসে। আজ এদেশে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে, এমন কোন ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে করে সুযোগসন্ধানীরা কোন স্বীকৃতি না পায়, চরিত্রবান, আদর্শনিষ্ঠ যোগ্য ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিরাই যথাযোগ্য সম্মান, সমাদর ও পদমর্যাদা লাভ করতে পারে। গণতান্ত্রিক অধিকার বলতে এটা নিশ্চয়ই কেউ মেনে নেবেন না যে, যে কেউ যে কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন এবং অসমর্থ হলেও বলীয় ভোটের জোরে জনসাধারণের উপর চেপে বসে থাকতে পারেন।

আমরা প্রত্যাশা করব, লালদীঘির নাটকের এখানেই যবনিকাপাত হবে। পশ্চিম-বাংলা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নানাভাবে ঐতিহ্যপূর্ণ একটি দেশ হিসাবে সর্বভারতীয় স্তরে, তথা পৃথিবীতে, মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। সেই উজ্জ্বল ভাবমূর্তিকে যদি কেউ নষ্ট করে, তবে তার কোন ক্ষমা থাকতে পারে না। যে পশ্চিমবাংলা বিশ্বজয়কর বিপ্লবীদের জন্মভূমি, সেখানে শিবা-নৃত্য কেউ দেখতে চায় না। সর্বস্তরে যোগ্য বাঙ্গালীই প্রতিষ্ঠিত হোন এবং দেশের সেবা কার্যে আত্মনিয়োগ করুন, এটাই এখানকার মানুষের কামনা।

যকৃতীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩,৩০
প্রস্তুতকারক— শ্রীভবনীমোহন চক্রবর্তী

শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ বিপ্লবী বারীন ঘোষ

॥ চম্পক দাশ ॥

এ বছর বিপ্লবী বারীন্দ্র ঘোষের জন্ম-শতবর্ষের বছর। এই উপলক্ষে তাঁর উদ্দেশ্যে একটি শ্রদ্ধালিপি এখানে প্রকাশিত হলো।

যে দুটি স্রোতধারা ভারতের সংগ্রামে সহায়তা করেছিল, তার একটি সশস্ত্র সংগ্রামের পথ এবং অন্যটি ছিল অহিংসা আন্দোলন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অহিংসা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে এই সংগ্রাম যেমন ভারতবর্ষ ব্যাপী প্রসারিত হয়ে জনমতকে সংগঠিত করতে সহায়তা করেছে, অপরপক্ষে যুগান্তর অনুশীলন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গড়ে উঠে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী দল উপদল বিপ্লব তথা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ধরে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যপথে পৌঁছবার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ায় ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে নেতাজীর নেতৃত্বে সংগঠিত আজাদ হিন্দ সৈনিকদের সংগ্রামই এর চরমতম প্রমাণ। সুতরাং স্বাধীনতার উত্তরকালে কংগ্রেস কিংবা অন্যকোন দলই এ দাবী করতে পারে না যে, ভারতের স্বাধীনতা একমাত্র তারাই এনেছে। সে যাই হোক, মহাবিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ও মতবাদের শুধু সমর্থকই ছিলেন না, ছিলেন ধারক এবং পরিপূর্ণ বাহক। কথায় কর্মে এবং লেখায় সব কিছুতেই তিনি ছিলেন ক্ষাত্রতেজোসম্পন্ন মাতৃমুক্তি যুদ্ধের একজন নির্ভীক সৈনিক ; এবং তিনি তাঁর আদর্শ এবং কর্মকে রূপায়িত করার প্রয়োজনে লড়াইও করেছেন নির্ভয় নির্ভীক-চিত্তে। বারীন্দ্র কুমারের এই সংগ্রামী জীবনের শুরু ইং ১৯০৫ সালে এই সময়ে তাঁর বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর। এই সময় তিনি ইংল্যাণ্ড থেকে কলিকাতায় এসে তাঁর মতাদর্শে বিশ্বাসী কিছু তরুণ কর্মীকে সংঘবদ্ধ করেন এবং 'ভবানী মন্দির' নামে একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় বারীন্দ্রকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে সশস্ত্র সংগ্রামের পদ্ধতি প্রকাশ করেন।

এর পরই 'বর্তমান রণনীতি' নামে দ্বিতীয় একখানা পুস্তিকাও তিনি রচনা করে প্রকাশ করেন। বর্তমান রণনীতিতে গেরিলাযুদ্ধের কৌশল বর্ণনার সঙ্গে পাশাপাশি তিনি জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ হওয়া সম্পর্কে বেশ কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সহকর্মী বিপ্লবীদের বিপ্লব চেতনাকে সুদৃঢ় এবং সুসংহত করতে সক্ষম হন। অবশ্য এই পুস্তিকাদ্বয় অর্থাৎ ভবানী মন্দির এবং বর্তমান রণনীতি শুধুমাত্র কর্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় ইংরাজ সরকারের দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়। কিন্তু বারীন্দ্রকুমার যখন যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করে তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের বাণী প্রচার করতে থাকেন তখন আর বিপ্লবী দলের উদ্দেশ্য ইংরাজ সরকারের নিকট গোপন থাকে না। তাই দেখা যায় যুগান্তর প্রকাশের দু' বছরের মধ্যেই সরকারী নিষেধাজ্ঞা নিষিদ্ধ হয়ে প্রকাশ বন্ধ হয়। অবশ্য যুগান্তর বন্ধ হওয়ায় বারীন্দ্রকুমারের বিপ্লবী জীবনের অপমৃত্যু ঘটেনি কিংবা থেমে থাকেনি।

বরঞ্চ এই ঘটনা তাঁকে প্রকাশ্যভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করেছিল। এই সময় তিনি বোমা তৈরীর বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাস এবং অপর একজনকে ফ্রান্সে পাঠান। হেমচন্দ্র দাস ফ্রান্স থেকে বোমা তৈরীর বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বারীন্দ্রকুমার কলিকাতার মুরারিপুকুরের এক বাগানবাড়ীতে বোমা তৈরীর এক গোপন কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই বোমা তৈরীর ঘটনার জন্যই ইতিহাসে তিনি বোমার বারীন নামে পরিচিত হয়েছেন এবং কলিকাতার মুরারিপুকুরের সেই অখ্যাত বাগানবাড়ী আজ ইতিহাসখ্যাত বিপ্লবতীর্থ নামে চিহ্নিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে আরো যে ঘটনা সত্যতা হচ্ছে. মুরারীপুকুরে বারীন্দ্রকুমার প্রতিষ্ঠিত বোমা তৈরীর এই কারখানার উৎপাদিত বোমাই ছিল সেই সময়ের ভারতব্যাপী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রধান মারণাস্ত্র এর জলন্ত প্রমাণ মজফফরপুরে কিংসফোর্ড হত্যার ঘটনা। সেদিন ৩০শে এপ্রিল, ১৯০৮ সাল বাংলার দুই কিশোর ক্ষুদিরামও প্রফুল্লচাকী অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য এই মুরারীপুকুরের তৈরী বোমাই ছুঁড়েছিল। এবং এই ঘটনার সূত্র থেকেই ইংরাজ সরকারের সুচতুর পুলিশ একদিন মুরারীপুকুরের বোমার কারখানা আবিষ্কার করে অতর্কিত আক্রমণে বিপ্লবী নায়ক বারীন্দ্রকুমার সহ সাঁইত্রিশ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। এবং ইং ১৯০৮ সালের মে মাসে এই ধৃত সাঁইত্রিশ জন বিপ্লবীর নামে আলিপুরে এক মামলা দায়ের করে। এই মামলাই আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। এ ছাড়া এই মামলায় আসামীদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। বিচারে কয়েকজনের সঙ্গে বারীন্দ্রকুমারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ হওয়ায় তিনি আন্দামানে নির্বাসিত হন।

ইতিহাসের ছাত্রমাত্রই মহাবিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের বিপ্লবচেতনা এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের উপরোক্ত ঘটনার সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় রয়েছে। এ ছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামের যে কাহিনী মোটামুটি-ভাবে আমরা জেনেছি তাতেও এই মহাবিপ্লবীর বিনিময়প্রত্যাশাহীন অবদানের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এতসব জেনেও কার্যতঃ এই স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষটির প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধানিবেদন করে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পেরেছি তা কি আমরা যথাযথভাবে অনুধাবন করেছি? আমরা যারা আজকের তরুণ যুবক কখনো কোন অলস অবসর মুহূর্তে কি ভেবে দেখেছি মহাবিপ্লবী ধূমকেতু সদৃশ বারীন্দ্রকুমারের জন্ম ও শিক্ষা-জীবন ইংল্যাণ্ডের মাটিতে এবং সেখানকার শিক্ষাভবনে হওয়া সত্ত্বেও আমাদের এই স্বদেশের জন্য তিনি ইংরাজ শাসকের প্রধান শত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন।

এই বিপ্লবী মহাতাপস ইং ১৮৮০ সালের ৫ই জানুয়ারী ইংল্যাণ্ডগামী একটি জাহাজে সমুদ্রের বুকে জন্মগ্রহণ করেন। এবং এই কারণেই তাঁর নামকরণ করা হয়েছিল বারীন্দ্র। পরবর্তী সময়ে সেই বারীন্দ্রই কিনা পরিণত হয়েছেন সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের ত্রাস সৃষ্টিকারী বোমার বারীনে। এসব কিছুও আমরা অনেকে জানি। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে থেকে তরুণ বয়স অবধি অতিবাহিত করে সেখান-কার জল-হাওয়া পরিবেশ শিক্ষা পোষাক-পরিচ্ছেদে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সব কিছুকে উপেক্ষা করে কেন এসেছিলেন ভারতের পরাধীনতার বন্ধন মুক্তির জন্য সর্বস্ব দানে নিজেকে নিঃশেষ করে

দিতে? শ্বেত দ্বীপবাসিনী কোন শ্বেত সুন্দরীই কেন তাঁকে পারেনি বশ করে ভোগ বিলাসে আবদ্ধ করে রেখে সংকল্পচ্যুত করতে? ভোগ বিলাস কিংবা উচ্চাকাঙ্খা এর কোনটাই কেনই বা তাঁকে লণ্ডনের মাটিতে ধরে বেঁধে রাখতে পারেনি? তবে কি তরুণ বারীন্দ্রকুমার এসবের চেয়ে আরো বেশী কিছু প্রত্যাশা করেছিলেন ভারতের মাটিতে? হাঁ। ব্যক্তিগত সুখের চেয়ে তিনি আরো বেশী যা চেয়েছিলেন তা হচ্ছে সামগ্রিক সুখশান্তি অর্থে ভারতের স্বাধীনতা এবং ভারতবাসীর সার্বিক শোষণ মুক্তি। এই স্বপ্নই তরুণ বারীন্দ্রকুমারকে আকর্ষণ করে সুদূর ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে আসার প্রেরণা জুগিয়েছিল। যথার্থই বারীন্দ্রকুমার ছিলেন মুক্তি-পাগল দামাল সন্তান। যে দামাল সন্তানদের অধিক প্রাণবন্ত, চঞ্চল, উদ্দাম করে তোলার প্রেরণা দিতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ও লিখতে হয়েছিল 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' কবির সে আহ্বানে হাজার হাজার তরুণ অরুণ প্রাণ নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে হাসিমুখে ইংরাজের বিচারের নামে প্রহসনে ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু সত্যই কি ঐসব নিষ্কাম তাপসেরা দেশবাসীর নিকট অক্ষয় অমরত্ব পেয়েছে? হয়ত অনেকের বিচারে প্রকৃতই এরা অমর অক্ষয়। এবং সংগ্রামের দলিল আর ইতিহাসেও তারা অমর হয়ে রয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কি প্রত্যাশা ছিল এই অক্ষয় অমরত্ব? নাকি আরো কিছু? দেশের স্বাধীনতার পূরবর্তী অবস্থায় দেশবাসীর জন্য তাঁদের যা কামনা ছিল তা কি স্বাধীনতার পরবর্তী দীর্ঘ সময়সীমার মধ্যে সুসম্পন্ন হতে পেরেছে? না হওয়ার কোন সম্ভাবনার ক্ষীণ আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? আমরা উত্তরপুরুষ তাঁর এই মহান ত্যাগের মূল্যায়ন করে দেশের অগ্রগতি এবং জাতীয় শ্রীবৃদ্ধিতে সামিল হতে না পেরে নিজেরা নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থেকে সর্বদা আত্ম-সুখের সন্ধানে মত্ত থেকে কি প্রমাণ করছি না যে, আমরা তাঁর সকল প্রকার নির্যাতন এবং ত্যাগের কানাকড়িও মূল্য দিচ্ছি না?

আজ ভারতের স্বাধীনতার ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও এদেশের অজানা আজাদী সন্তানদের একজন বারীন্দ্রকুমারের প্রতিই বা আমরা কতটা শ্রদ্ধা এবং সম্মান নিবেদন করতে পেরেছি তা ভেবে দেখার সময় কি আজও হয়নি? বিশেষতঃ যে মানুষটি অখ্যাত মুরারিপুকুরকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ভারতব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্ররূপে চিহ্নিত করেছেন সে মুরারিপুকুরের অধিবাসীরাই বা কতটা কি করেছেন এই মানুষটির জন্য? অথচ মুরারিপুকুরের মানুষের বেশ একটা অংশ ইচ্ছে করলে বারীন্দ্রকুমারের জন্য অনেক কিছুই করতে আজো পারেন। অবশ্য কিছু যে হয়নি তা নয়। যা হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় বিগত বিশ বছর যাবৎ মাঝে মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বহু নেতার শুভাগমনে মুরারি-পুকুরের মাটি নতুনভাবে হয়েছে ধন্য এবং গর্বিত। আর মুরারিপুকুর রাস্তার নাম করা হয়েছে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সরণি। এই ভাবেই মহা-বিপ্লবীর প্রতি আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করে শ্রদ্ধা নিবেদনের কাজ শেষ করেছি। গভীর বিশ্বাস নিয়ে মুরারিপুকুরের সমস্ত অঞ্চল ঘুরেও দেখতে পেলাম না বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের কোন মূর্তি কিংবা স্মৃতি স্তম্ভ। অবশ্য স্মৃতি বললে যদি কোন সংস্থাকে ধরা যায়, তাহলে পেয়েছি তাঁর নামে একটি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর একটি ক্লাব। একটির নাম বিপ্লবী বারীন ঘোষ বিদ্যামন্দির অপরটির নাম বিপ্লবী বারীন ঘোষ স্পোর্টিং ক্লাব। কিন্তু কোন মূর্তি আজো কোথাও খুঁজে পাইনি। ৫ই জানুয়ারী ১৯৭৯ এই মহাবিপ্লবীর জন্মশতবর্ষারম্ভে এলজ্জাকে গোপন করার কোন জায়গা ভারতের বুকে খুঁজে পাওয়া যাবে কি? [সৌজন্য লোকসেবক]

একটি পুরাতন কাহিনী

॥ শ্রীসতীভূষণ সেন ॥

বসন্ত কাল। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। Lagoon টির চারিদিকে বিস্তীর্ণ খাগড়া বন। তারই একটি কাঠির পেছন থেকে উঁকি দিচ্ছিল একটি ছোট্ট লোমশ জীব। জলের নীচ থেকে কি একটা বেরিয়ে আসবে, তারই আশায় উদগ্রীব হয়ে চেয়ে ছিল।

আজ যে স্তন্যপায়ী জীবরা পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছে, হাতি ঘোড়া বাঘ সিংহ রূপে সর্বত্র বিচরণ করছে, তাদেরই আদি পুরুষ এই জীবটি লম্বায় বড় জোর দশ সেন্টিমিটার হবে। তার বৈজ্ঞানিক নাম Pantothere, তবে আমরা ছোট্ট করে ওকে 'পল্টু' বলব। সে তো আমাদেরও আদি পুরুষ। 'পল্টু' খুঁজছিল যা অবশেষে তাকে দেখতে পেল। পাড় থেকে প্রায় ৩০ মিটার পূবে একটা চ্যাপ্টা বল ভেসে উঠল। আকারে তার চেয়ে সামান্য বড়, ব্যাস প্রায় ১৫ সেন্টিমিটার। বলটি ভাসতে ভাসতে আসছিল। ঠিক যে স্রোতে ভেসে আসছে তা নয়, আবার কোন কিছুর সঙ্গে বাঁধা বলেও মনে হয় না। আসলে ওটি একটি অসাধারণ নাক। মালিক জলের নীচে আত্মগোপন করে বিচরণ করছেন। মাথার তালুর উপরে নাকটি অবস্থিত। নিঃশ্বাস নেওয়ার ভারি সুবিধা। আবিষ্কার মন্দ করেনি প্রাণীটি।

এতক্ষণ পরে নাকটি ধীরে ধীরে জল ছেড়ে উপরে উঠতে লাগল। নাকের নীচে দেখা গেল মাথাটি, তার নীচেই গলা। প্রায় ৭ মিটার দীর্ঘ মহিমাময় সেই গ্রীবা, জলের নীচ থেকে বেরিয়ে, ঘুরে ফিরে চারদিক সমীক্ষা করতে লাগল। দেখতে ভারি সুন্দর। নাকের দুপাশে চোখ দুটি যখন নিশ্চিন্ত হল যে ভয়ের বা সন্দেহের কিছু নেই, তখন জলের নীচ থেকে উঠতে লাগল ইমারতের মত বিশাল একটি দেহ। উঠছে কি উঠছে না, এমনি ধীরে ধীরে।

প্রাণীটি একটি সরীসৃপ জাতীয় জীব। যে সময়কার কথা বলছি, সেই আদিম যুগে পৃথিবীতে ওদেরই ছিল রাজত্ব। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল প্রাণীটি সাঁতার দিয়ে আসছে। কিন্তু দেখা গেল তা নয়। সে হ্রদের তলায় মাটিতে পা ফেলে হাঁটছে। জলে ডুবে ছিল বলে এতক্ষণ পা দেখা যায় নি। যতই তীরের কাছে এসে পড়ল, ততই তার চলনে সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য ফুটে উঠতে লাগল। দেহের পেছনে, জলের নীচ থেকে বেরিয়ে এল একটি সুদীর্ঘ লেজ। নাকের আগা থেকে ডগা পর্যন্ত পুরো ২৬ মিটার।

জন্তুটির ভালো নাম diplodocus, আমরা ডাক নাম রেখেছি দীপালী। ডিনোসোর বংশে এরা যে সব চেয়ে বড়, তা নয়। স্বভাব চরিত্র খুবই শান্ত, ভয়েরও কিছু নেই। বলা বাহুল্য, সে একটি

নারী, উদ্ভিন্ন যৌবনা, বয়স প্রায় ৭০ এর কাছাকাছি। সম্পূর্ণ নিরামিশাষী। জলজ উদ্ভিদের মধ্যে গাছের কচি আগা চাখতে চাখতে এগিয়ে চলছিল তীরের দিকে। তার ছোট্ট মাথাটি এক এক জাতীয় উদ্ভিদের কাছে গিয়ে বাছাই করে, তারপর দাঁতে কাটছিল।

আহারের কাজটি মোটেও সহজ নয় ওদের। ওপরের পাটিতে পিনের মত ক্ষুদে ক্ষুদে দাঁত, নীচের পাটি একদম ন্যাড়া, দাঁত নেই মোটেও। ওপরে দাঁত নীচে মাড়ি, এর মধ্যে গাছের পাতা ধরে কেটে নিয়ে গিলে ফেলা চলে: রসিয়ে চাবিয়ে চাবিয়ে ভক্ষণ করার উপায় নেই। অথচ চর্বণ না করলে হজম করা কঠিন। তাই চর্বণ কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করবার হাতিয়ার সন্ধানে তাকে তীরের কাছে আসতে হয়েছে। চর্বণের জন্য এবং আরও একটি আকর্ষণে। সে আকর্ষণটি কিসের তা বুঝবার ক্ষমতা নেই, আগে কখনো অনুভব করেনি এরকম ক্ষুধা। তাই সেটিকে মুলতুবি রেখে, প্রথমে চর্বণ সমস্যা সমাধানেই মন দিল। জল ছেড়ে তীরে উঠল। শুকনো নদীর Bed এ মাথা নীচু করে খুঁজতে লাগল। পাথরের নুড়িগুলি উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল। একটিও পছন্দ হল না। ধারগুলো বড় বেশী খোঁচা খোঁচা, একেবারে পালিশ নয়।

খুঁজতে খুজতে বিরক্ত হয়ে উঠল। যেমন বস্তুটি চাই, তা কি সহজে পাওয়া যায় দুনিয়ায়? ইতিমধ্যে আর একটি প্রাণী যে কাছে এসে পড়েছে, অন্যমনস্ক দীপালী লক্ষ্যই করে নি। এটি একটি স্থলচর মাংসাশী ডিনোসার। এরা চতুষ্পদ হলেও পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে হাঁটে। সামনের ছোট পা দুটি থাকে, নখ দিয়ে শিকার ধরবার জন্য। আকারে সে দীপালীর কাছেও ঘেঁসতে পারে না, কিন্তু দ্রুতগামী হওয়ায় ওদের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচা কঠিন। প্রকাণ্ড মাথা, মস্ত হাঁ, ভয়ঙ্কর দুপাটি খাঁজ কাটা দাঁত।

যখন একেবারে কাছে এসে পড়েছে, তখনো দীপালী মাথা নীচু করে নুড়ি খুঁজছে। মাথা নীচু দেখে জন্তুটা মনে করল, শিকার তাকে দেখে ভয় পেয়েছে। প্রাণী জগতে এই এক দুর্বোধ্য রহস্য ভয় পেলে তার রক্ষা নেই। শিকারী আক্রমণ করবেই। মাংসাশী জন্তুটা পেছনের শক্ত পা দুটির উপর ভর দিয়ে ছুটে এল। সামনের ছোট পা দুটি তৈয়ার হয়ে গেল শিকারকে নখ দিয়ে জাপ্টে ধরার জন্য। নজর রাখল শুধু লেজটার কাছে গিয়ে না পড়ে। জলচরদের ঐ এক মহা অস্ত্র, তাদের লেজ।

ততক্ষণে দীপালীও দেখে ফেলেছে শত্রুকে। সে চট করে দেহটাকে ঘুরিয়ে জন্তুটার পথ রোধ করল। আর পর মুহূর্তেই বিশাল লেজটি তুলে আছাড় মারল শত্রুর গায়ে। লেজের সেই একটা লাথিতেই মাংসাশী জন্তুটা উড়ে গিয়ে পড়ল ঝোপের ওপারে। সামনের একটি ছোট পা ভেঙ্গে গেল আর কেঁউ কেঁউ করতে করতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। আবার নুড়ি খুঁজতে লাগল দীপালী।

যা খুঁজছিল, সেই বস্তুটি পেয়ে গেল অবশেষে। পাথরটি ওজনে প্রায় ১ কিলো। গোল এবং মসৃণ। দুটো দিক একটু চাপা। বার দুয়েক নাক দিয়ে ঠেলে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল, তারপর মুখে তুলে নিল। গলাটি উঁচু করে টুক করে গিলে ফেলল। পাথরটি নেমে গেল গলার নলী দিয়ে। যেখানে

পৌছাল, সেখানে আরও ছয়টি মুড়ি ছিল, সেগুলি একটু ছোট। সে যখনই হাটবে বা নড়াচড়া করবে তখনই মুড়িগুলোর ঘসায় শিল নোড়ার মত, চর্বণ কার্য্য সমাধা হতে থাকবে। একেবারে বিনা পরিশ্রমে! মাড়ির দাত নেই তো কি হয়েছে।

কৌশল আরও অনেক আবিষ্কার করেছে দীপালীরা। যেখানে ওদের বাসা, সে এক দুর্ভেদ্য কেল্লা। অন্য কোন প্রাণী যাওয়ার চেষ্টা করলে কাদায় ডুবে মরবে। ওরা যখন পা পাতে কাদায় ডুবে যায় না। হাঁসের পায়ের মত চেপ্টা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে পা চারটি। নিরাপদে হেঁটে যায় কাদার উপর দিয়ে। কিম্বা ধরুন ওদের অস্ত্র লেজটির কথা। এমনিতে ঐ বিশাল লেজ তুলে আছাড় দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। পেশীতে অত শক্তি নেই ওদের। আমরা যেমন Crane এর সাহায্যে কম শক্তি ব্যয় করে বহুগুণ ভারি জিনিষ ওঠা নামা করাই, সেই কৌশল ওদের জন্মায়ত্ত। মাথার নীচ থেকে লেজের শক্ত পেশী পর্য্যন্ত ওদের Crane-এর শিকল। তাই লেজে এত শক্তি।

আঁধার নেমে আসছিল। এতক্ষণে দীপালীর বাড়ী ফেরার কথা। এক পালে তারা ১৫ জন এক জায়গায় বাস করে। সে না ফিরলে যে কেউ চিন্তিত হবে তা নয়, অন্যরা জানতেও পারবে না যে কেউ আসেনি। যাওয়ার গরজ তারই হওয়ার কথা ; কিন্তু আজ নদীমুখ ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে করছিল না। কি একটা অস্পষ্ট আকাঙ্খা তাকে আকুল করছিল। ঠিক বুঝতে পারছিল না কিসের এই ক্ষুধা। ওদের Brain এত ছোট এমন অপরিণত, যে বুদ্ধি কিংবা বিচার কিম্বা স্মৃতি, এসব বস্তুর স্থান হয় না সেখানে। বিপদের সম্ভাবনায় সাবধান করে দেয় তার অনুভূতি বা intuition। আজ যে উত্তেজনা অনুভব করছিল, যার তাড়নায় সে দল ছুট হয়ে পড়ে আছে এখানে এ অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি। পরদিন সকালে পল্টু যখন বাসা ছেড়ে বাইরে এল, দেখল গত রাতের সেই বিশাল সরীসৃপটা তখনো সুদীর্ঘ গলা পাকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার যাচ্ছে Lagoon এর দিকে, আবার ফিরে আসছে খড়ি পাহাড়ের নীচে।

ভোরের হাওয়ায় দীপালী তখন নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। একটা মিষ্টি পরিচিত গন্ধ ভেসে আসছিল ফার্ণ গাছগুলোর দিক থেকে। একটু পরেই দেখতে পেল পুরুষ Diplodocus টিকে। একেই তো কলা থেকে খুঁজছিল দীপালী। পরস্পর পরস্পরের দিকে এগিয়ে গেল, জড়িয়ে ধরল গলা দিয়ে গলা।...সারা সকাল কেটে গেল। অবশেষে তারা পরস্পরকে ছেড়ে দিল।যে পথ দিয়ে সে এসেছিল, সেই পথ দিয়ে পৃথক পৃথক ফিরে গেল পালের আশ্রয় স্থলে। সেখানে তিনটি পুরুষ, সাতটি নারী আর পাঁচটি ছোট শিশু বাস করে।

অনেক দিন পরে আর একরকম অস্থিরতা অনুভব করল দীপালী। সে অস্থিরতা আর সহ্য করা যায় না। সে আবার চলল খড়ি পাহাড়ের দিকে। পাড়ে উঠে লেজ দিয়ে ঝেঁটিয়ে একটা গর্ত করল। পা দিয়ে দাপিয়ে, মুখ দিয়ে মাটি সরিয়ে, গর্তটিকে বড় করল। শেষে বসে পড়ল সেইখানে। নয় দিনে মোট ৩৭টি বড় বড় ডিম পড়ল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে লেজ দিয়ে ঝেঁটিয়ে বালি এনে ডিমগুলি

ঢেকে দিল। লেজ দিয়ে ঝেঁটিয়ে কাঠের টুকরো আর শুকনো পাতা এনে আবৃত করল স্থানটি। তারপর ওদের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। তার যা কাজ হয়ে গেছে। ডিম থেকে যদি বাচ্চা ফোটে ভাল। যদি না ফোটে, বয়ে গেল দীপালীর!

পল্টু এই মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিল। দীপালী জলে নামতে না নামতে সে তরতরিয়ে পৌঁছে গেল অকুস্থলে। দেখল একটি ডিম ভাল করে ঢাকা পড়ে নি। মস্তবড় ডিম, তার চেয়ে আকারে বড়। যা খাদ্য আছে, অনেক দিন চলে যাবে, সে জানে কদিন দেরী করলে ডিমের ভেতরটা শক্ত হবে, তখন খেতে বড় মজা। তাই আরো কিছু পাতা ও মাটি দিয়ে ঢেকে দিল ডিমটি।

চারদিন রোদে ভাজা ভাজা হওয়ার পরে পল্টু ফিরে এল ডিমের কাছে। সঙ্গে আরো দু-তিনটি পল্টুকে নিয়ে। সবাই মিলে ওপরের ডিমটিকে কামড়াতে লাগল। ডিমের ওপরের আবরণটা চামড়ার মত শক্ত। দাঁত বসানো গেল না, তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ডিমটি অনাবৃত হয়ে পড়ল। এমন সময় আর একটি ডিনোসার এসে পড়ল সেখানে। সে একেবারে ছোট জাতের ডিনোসার, তবু এক কামড়ে ডিমটি ভেঙ্গে ফেলে, ভেতরের সবটুকু পদার্থ খেয়ে চলে গেল। পল্টুরা ফিরে এসে দেখল, ডিমের খোলায় যে খাদ্য লেগে আছে, তাতেই ভুরি ভোজ হয়ে যাবে তাদের।

সূর্যের তাপে যথাসময়ে অন্য ডিমগুলি ফুটল, বাচ্চা বের হল ৩৬টি। তারা বাতাস শুঁকে দেখল, তারপর instinct-এর নির্দেশে লাইন করে ছুটল জলের দিকে। কয়েক মিটার যেতে না যেতে আকাশ থেকে একটা উড়ন্ত Reptile ছোঁ দিয়ে একটিকে উঠিয়ে নিয়ে গেল বাসায়। তার ক্ষুধিত বাচ্চারা হাঁ করে ছিল। দীপালীর চারটি বাচ্চা একে একে গেল ওদের পেটে। এর পর সেই ছোট ডিনোসার যে প্রথম ডিমটি খেয়েছিল, সে এসে পড়ল। ৬টি বাচ্চা গেল তার ভোজে। লাইন ভেঙ্গে বাচ্চারা তখন ছুটছে জলের দিকে। ৩৬টি বাচ্চা, হয়েছে ২৬টি। উপরে শত্রু নীচে শত্রু। শেষ পর্য্যন্ত ১২টি বাচ্চা কোন মতে জলে গিয়ে পড়ল; পড়তে না পড়তে একটা বড় মাছ, শক্ত মাথা, মস্ত মস্ত দাঁত, গপ গপ করে ৭টিকে গিলে ফেলল। আর একটা মাছ নীচ থেকে খাই দিয়ে উঠে ধরল আর একটিকে। ৩৭টি ডিমের মধ্যে ৪টি মাত্র বাচ্চা শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছল দলের ঘাঁটিতে।

দীপালী জানতেও পারল না এরা তারই বাচ্চা। অন্যদের সঙ্গে সেও বাচ্চাদের পরিচর্য্যা করত, শিক্ষিত করত জীবনধারণের কৌশল। তারা বড় হতে লাগল; রোগা রোগা সাপের মত লিকলিকে দেহগুলিতে মাংস লাগল, সুন্দর হয়ে উঠল। দীপালী ও একজন পুরুষ সঙ্গী একদিন নিয়ে গেল তাদের নদীমুখের সেই পুণ্য ভূমির সঙ্গে পরিচয়ের জন্য। যে স্থানগুলি দীপালীদের জীবনের সঙ্গে অদৃশ্য সূতো দিয়ে বাঁধা। যেখানে আসতে হবে বারবার, আসতে হবে মুড়ির অন্বেষণে, আসতে হবে সঙ্গীর সঙ্গে বিহারে, আসতে হবে বংশ বৃদ্ধির প্রয়োজনে আসতে হবে জীবন যেদিন বিকল হয়ে পড়বে, সেদিনও।

ওরা মাত্র নদীমুখে পৌঁছেছে, ঘুরে ফিরে দেখছে, তখনই দীপালী পুরুষ সঙ্গীটি বিপদের সম্ভাবনায় সচকিত হয়ে উঠল। বিপদ সঙ্কেত দিয়ে ছুটল lagoon-এর দিকে। মুখ তুলে

দীপা দেখল এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। দুপায়ে ভর করে ওদের দিকে ছুটে আসছে এক ভীষণ দর্শন জন্তু, উচ্চতায় ৫ মিটার। প্রকাণ্ড মাথা, ঘাটো গলা, মুখে দুপাটি খাঁজ কাটা দাঁত!

ওর নাম allosaurus, মাংসাশী ডিনোসারদের রাজা। এক কামড়ে দীপাদের মত প্রাণীর পলা দুখণ্ড করে ফেলা ওর পক্ষে ছেলেখেলা। এই ড্রাগনটা যখন লাফিয়ে পড়ল দীপাকে ধরবার জন্য, সে লেজের একটি তিন টনি ঘায়ে তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করল। নিজেও অক্ষত রইল না। ড্রাগনের সামনের পায়ের ১৫ সেন্টিমিটার লম্বা নখের আঁচড়ে কালা কালা হয়ে গেল একধার। ড্রাগনটা ছিটকে পড়েছিল, উঠে আবার তেড়ে এল। লেজের আর এক ঘায়ে আবার পড়ল ছিটকে। সে তখন দীপাকে ছেড়ে লাফিয়ে উঠল পুরুষ সঙ্গীটির ঘাড়ে। পিঠে নখ বসিয়ে কামড়ে ধরল গলা। গলার হাড়গোড় ভেঙ্গে গেল, বেচারা মাটিতে পড়ে আছাড়ি পিছাড়ি করতে লাগল মুক্ত হওয়ার চেষ্টায়। কামড় কিছুমাত্র শিথিল হল না, এক থাবলা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গিলে ফেলল ড্রাগনটা। থেমে গেল দীপার সহচরের মৃত্যুযন্ত্রনা।

আরও দু'থাবলা মাংস ছিঁড়ে খেয়ে ফেলল ড্রাগন। ততক্ষনে জল থেকে কুমিররা উঠে এসেছে, তাদেরও ভাগ চাই। রক্তের গন্ধ পেয়ে উড়ে এসেছে মাংসাশী সরীসৃপ দল। এক গর্জনে সকলকে বিতাড়িত করল ড্রাগন। ছোটখাট লুঠেরার দল এক এক করে আসতে লাগল, নিরাপদ দূরত্ব থেকে দেখতে লাগল রাজার ভোগ। খাওয়া শেষ হলে তাদের দিকে শেষ গর্জন ছুঁড়ে দিয়ে রাজা প্রস্থান করলেন। তখন এগিয়ে এল প্রাণীজগতের ঝাড়ুদারেরা। তাদের মধ্যে পল্টুরা কয়েকজনও ছিল। এক রাত্রির মধ্যে সাফ করে ফেলল ৩৩টন ওজন দেহটিকে। তীরে পড়ে রইল বিশাল কঙ্কালটি।

আহত দীপালীও তার সন্তানেরা ফিরে গেল lagoon-এ।.....তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। দীপালী বুড়ো হয়েছে। একটা নতুন উত্তেজনা মাঝে মাঝে অনুভব করে। ড্রাগনের আঁচড়ের ব্যথাটা বেড়ে উঠছিল কিছুদিন ধরে। অন্যদের সঙ্গে মিশতেও আর সুখ পায় না। অনেক দিন খড়ি পাহাড়ের দেশে যায় নি। সেই দেশের মিষ্টি হাওয়া যেন তাকে ডাকে। এ ডাক পুরানো কোন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। সম্পূর্ণ অপরিচিত নতুন এক আকর্ষণ। যাকে অস্বীকার করা যায় না, আবার ধরা দিতেও মন চায় না।

সে আট দশ দিন আলসেমি করে কাটালো। তারপর চলল সেই ডাকের আকর্ষণে ধরা দিতে। পথে এটা ওটা দাঁতে কাটল, একটা উষ্ণ শয্যায় কিছুক্ষণ ডুবে রইল। ঘুরতে ঘুরতে শেষটা পৌছে গেল খড়ি পাহাড়ের নীচে সেই শান্ত গভীর জলাশয়ে! দীর্ঘ গ্রীবা ঘুরিয়ে চারদিক দেখল। অনেক আনন্দ অনেক বেদনার নীরব দর্শক এই স্থান! তার বিশাল রাজত্বের মধুরতম নিকেতন। মন স্থির করে সে একটি গভীর স্থান বেছে নিল, দেহটি কাদার মধ্যে শুইয়ে দিল। আহত বেদনার্ত স্থানটি ডুবে গেল জলে। শেষে সুন্দর দীর্ঘ রাজহংশের মত গ্রীবাটি হারিয়ে গেল জলের নীচে। তখনও নাকটি ভেসে রইল শেষ বারের মত বুকভরে মিষ্টি বাতাস নেওয়ার জন্য।

Ref "Centennial"—By James Michener

বর্তমান যুগে মার্কসবাদ

॥ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাস ॥

মার্কসবাদ বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান যেমন দিন দিন সংশোধিত ও উন্নত হয়, মার্কসবাদ ও সামাজিক পরিবেশে সংশোধিত হয়ে সমাজকে এগিয়ে নেয়।

সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতি কারো খেয়ালখুশী অনুযায়ী হয় না; বৈজ্ঞানিক নিয়মে এগিয়ে চলে। মানব সভ্যতার একটি স্তরে জার্মান-ঋষি কার্ল মার্কস উৎপাদনে যন্ত্রের বিকাশ লক্ষ্য করে ইহার প্রতিফলন সামাজিক জীবনে কি ভাবে বৈষম্য ও বিভেদ সৃষ্টি করেছে এর একটা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ মানব-সমাজের নিকট উপস্থিত করেন এবং যন্ত্রের বিকাশ সমাজ কল্যাণে কিভাবে প্রয়োগ করা যায় সেই তত্ত্বই আবিষ্কার করে প্রকাশ করেছেন। মার্কস তাঁর জীবনে তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বের বাস্তব সাফল্য দেখে যেতে পারেন নাই। মহামতি লেনিন রুশ দেশে প্রথম মার্কসীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বিপ্লব সম্পন্ন করেন এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো স্থাপনে সফল হন ১৯১৭ সালে। লেনিনের নেতৃত্বে রুশদেশে সমাজবাদের সার্থক রূপায়ণে মার্কসীয় তত্ত্বের অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন হয়েছে। পরবর্তী যুগে বিশেষ করে বর্তমান শতকের মাঝামাঝি যে সব দেশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ মুক্ত হয়েছে তাদের শাসন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র কাঠামো মার্কসীয় তত্ত্বের ভিত্তিতেই দেশীয় সংস্কৃতি ও পরিবেশ অনুযায়ী রূপ পেয়েছে। যারা এই অগ্রগতি লক্ষ্য করতে অসমর্থ তারা বৈজ্ঞানিকদের তথ্য ও মতের পরিবর্তন দেখে বিজ্ঞানকে উপহাস করাই পর্য্যায়েই পড়েন।

সোভিয়েতে মার্কসবাদের সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্য করে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে (১৯৩৬) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সোভিয়েত সম্বন্ধে বলেছিলেন ইতিহাসে গণতান্ত্রিক নীতির এমন বাস্তব প্রয়োগ কখনও হয় নাই। ১৯২৬ সালে গান্ধীজী বলেছিলেন বলশেভিক আদর্শের পিছনে রয়েছে অসংখ্য পুরুষ ও নারীর শুদ্ধতম আত্মদান, এই আদর্শের জন্য তারা সব কিছু দিয়েছে। এই আদর্শ পবিত্রতা লাভ করেছে লেনিনের মত নায়কের আত্ম-নিবেদনে। এই আদর্শ কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। সোভিয়েত বিপ্লবের সফলতায় উৎসাহিত হয়ে তিলক ১৯১৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর মাদ্রাজের এক সভায় বলেছিলেন সময়ের প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের সংগঠনের কর্তৃত্ব বেড়ে চলবে এবং শ্রমিকরাই হয়ে উঠবে শাসক। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে (বোম্বাই, ১৯২০) সভাপতি লাজপৎ রায় বলশেভিক বিরোধীদের কুৎসার জবাব উল্লেখ করে বলেন রাশিয়া সম্পর্কে পুঁজিবাদী ও সরকারী তথ্য গলাধঃকরণ করতে তিনি রাজী নন। পুঁজিবাদী ও সাম্রাজবাদী তথ্যের চেয়ে বলশেভিক তথ্য অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য ও মানবিক। ডিসকাভারি অব ইণ্ডিয়া (১৯৪৫) গ্রন্থের

লাইফ্ ফিলসফি অংশে জওহরলাল নেহরু লিখেছেন সোভিয়েত বিপ্লব সমাজকে এক বিরাট লাফে এগিয়ে দিয়েছে। জ্বালিয়েছে এক উজ্জ্বল শিখা যাকে নির্বাপিত করা যায়নি এবং নতুন সভ্যতার দিকে পৃথিবী অগ্রসর হতে পারে তার ভিত্তি স্থাপন করেছে। ১৯৩০ সালে রাশিয়া হতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন রাশিয়ায় না এলে এ জন্মের তীর্থ দর্শন অসমাপ্ত থাকত। কি অসম্ভব এদের সাহস। এরা একটা নতুন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে, দেরী সইছে না। আমি যা বহুকাল ধ্যান করেছি এরা তা কাজে লাগিয়েছে। ১৯৩৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর জওহরলাল সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলেন, আমি মনে করি আজকের পৃথিবীর সামনে মূলতঃ কোন এক ধরণের কমিউনিজম আর কোন এক ধরণের ফ্যাসিবাদের মধ্যে একটা বেছে নিতে হবে। আমি পুরাপুরি প্রথমটির পক্ষে অর্থাৎ কমিউনিজমের পক্ষে আমি মনে করি কমিউনিজমের মূল আদর্শ ও তার বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাসের ব্যাখ্যা যথার্থ।

ভারতের নেতৃবৃন্দের এই সমস্ত উক্তিতে প্রমাণিত হয় রাশিয়ায় মার্কসবাদ যে রূপ নিয়েছে তা জাতীয়তাবাদ বিরোধী নয়ই, বরঞ্চ সর্বদেশে বর্তমান যুগে জাতীয় জাগরণ এইরূপই গ্রহণ করবে, ইহাই একমাত্র প্রগতিশীল পন্থা এবং সমাজের সুস্থ অগ্রগতি ও শান্তির পথ।

১৯৪১ সালে ২২ জুন প্রাতঃকালে বিশাল নাৎসি বাহিনী সোভিয়েত ভূখণ্ডে প্রবেশ করে, লাল ফৌজ ইহার মোকাবিলা করে। তখন ইংরাজ মনীষী জর্জ বার্ণাড যা ভবিষ্যৎ বাণী করলেন রাশিয়া হিটলারকে পর্যুদস্ত করে হয়ে উঠবে বিশ্বের আত্মিক কেন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যু শয্যায় বার বার বলেছেন সোভিয়েত হারবে না হারতে পারে না।

সোভিয়েৎ কেবল নিজের দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষাই করে নাই, অন্যান্য দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায়ও সাহায্য করেছে। ভারত ও সোভিয়েত একযোগে রাষ্ট্রসঙ্ঘে বর্ণ-বৈষম্য ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছে। কাশ্মীর ও গোয়ায় যখনই আঞ্চলিক অখণ্ডতার উপর আক্রমণ এসেছে তখনই সোভিয়েত ইউনিয়ান ভারতের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। ১৯৪৫ সালে জেনাভা সম্মেলনে সোভিয়েত রাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ বলেন, ভারত ইতিহাসের এক নূতন ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে এবং যে সব দেশ তাদের জাতীয় স্বাধীনতার সংহতি সাধন করে বিশ্বসভায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণের প্রয়াস পাচ্ছে ভারতের নাম তাদের পুরোভাগে। যখনই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা ও সংহতির উপর আঘাত আনতে চেয়েছে তা প্রতিরোধ করার জন্য সোভিয়েত বন্ধুত্ব চূড়ান্ত রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। কাশ্মীর গোয়া, তাসখন্দ চুক্তি; পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে বিরোধ, ভারত সাগরে মার্কিন ঘাঁটি নির্মাণ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সব বিপদেই সোভিয়েত ইউনিয়ান আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। পারস্পরিক প্রয়োজনে ভারত সোভিয়েত শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৭১ সালের আগাষ্ট মাসে। সোভিয়েত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ভারতের ভূমিকাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করে। ১৯৭১ সালের ভারত সোভিয়েত চুক্তি

আকস্মিক সঙ্কট নিরসনের জন্য হয় নাই। দুই দেশের ইতিহাস ও চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা নীতিসম্মত সিদ্ধান্ত।

১৯৪১ সালে ইংরেজ মনীষী জর্জ বার্ণাড শ যা বলেছিলেন তাই আজ সত্য হয়ে উঠেছে। রাশিয়া হয়ে উঠবে বিশ্বের আত্মিক কেন্দ্র, বাস্তবে পরিণত হয়েছে যুদ্ধোত্তর যুগে রুশদেশের প্রতি পদক্ষেপে। যুদ্ধোত্তর যুগে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ হতে মুক্তির আন্দোলন আফ্রিকার পরাধীন অঞ্চলে নির্যাতিত চিলিতে, কিউবাতে, ইরাণে, আফগানিস্তানে ভিয়েৎনামে প্রভৃতি যেখানেই হউক না কেন রাশিয়া পাশে দাঁড়িয়েছে। চীন বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন শত শত কোটি টাকার মূল্যের সম্ভাব্য সব রকমের বৈষয়িক সাহায্য চীনকে দিয়েছিল। চীন কখন দাম দিতে পারবে কিংবা আদৌ দিতে পারবে কিনা একথা চিন্তা না করেই চীনকে গোটা শিল্প প্লান্ট, খনি ও পরিবহণ সরঞ্জাম দিয়েছিল। ভবিষ্যতে সেদেশ অন্যের ভূখণ্ড গ্রাস করার প্রচেষ্টা করবে সোভিয়েত চিন্তা ধারার বাইরে, মূলতঃ এই কারণেই চীন সোভিয়েত বিরোধ। অন্য কোন দেশ সোভিয়েত আঘাত করে না। ভারতের জাতীয় চরিত্রেও সেই রকম স্বতন্ত্র সত্ত্বা আবহমান কাল হতে বিদ্যমান। ভারতীয় জাতীয় সত্তায় মিশে আছে সমাজতন্ত্রের মূলমন্ত্র, একাত্মবোধ, বিশ্বজনীনতা আত্মশুদ্ধি ও আত্মত্যাগ। মার্সবাদ বা কমিউনিজমের মূল কথাও ইহাই। এই নীতির ভিত্তিতে লেনিন রুশদেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল বলেই রুশদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন সংস্কৃতি সত্বেও রুশদেশের একাত্মবোধ দৃঢ় ও ইস্পাত কঠিন এবং চীনা কমিউনিষ্টদের বিচ্যুতি ও সাম্রাজ্যবাদের হীন চক্রান্ত সত্বেও কমিউনিজমের ভ্রাতৃত্ব বোধ যার যার জাতীয় সত্তায় মিলিত হয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ছে ও সদ্য স্বাধীন দেশগুলি এই পথেই অগ্রসর হতেছে। ভারতের জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে রুশদেশের নীতির এই সামঞ্জস্য আছে বলেই ভারত রাশিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। কারোর ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না এই মিলন ও সহযোগিতা, ইহা ইতিহাসের নির্দেশ ও কালের বিধান।

সমাজতন্ত্রই সমাজব্যবস্থার একমাত্র পথ আমরা স্বীকার করি। কিন্তু মার্কসবাদ ভারতীয় সংস্কৃতিতে শিক্ষিত করে বিশ্বের দরবারে এগিয়ে চলার সম্বিৎ এখনও ঘুমন্ত। কিউবা, কোরিয়া, ভিয়েৎনাম যা পেরেছে আমরা তা পারছি না। কেহ কেহ বৈদান্তিক সমাজবাদই আমাদের একমাত্র পথ, এই ধরণের প্রচার দ্বারা হৈয়ালি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস করছে। এদের জানা দরকার বৈদান্তিক চিন্তা ধারা মার্কসবাদ প্রত্যাখ্যান করে না। কিন্তু পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে প্রাচীন কাঠামো বসান যায় না। নতুনের আহ্বানে সাড়া দিয়েই চলতে হবে।

আশা ছিল ইন্দিরাজীর নেতৃত্বে দেশবাসীর সঠিক পথের সন্ধান মিলবে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে তাঁর শাসনে। কিন্তু ইন্দিরাজীর চরিত্রে ও রাজনীতিতে ভারতের জাতীয় সত্তার দুইটি প্রধান উপাদান, আত্মশুদ্ধি ও আত্মত্যাগের অভাবছিল; সেইজন্য ইন্দিরাজীকে থেমে যেতে হল, ভারত আশা ইন্দিরাজীকে প্রত্যাখ্যান করল।

ইন্দিরাজী প্রত্যাখ্যানের ভিতর দিয়ে পশ্চিমবাংলায় সি, পি, এম-এর অভ্যুদয়ে ভারতের পূর্ব গগনে নতুন সূর্য্যের উদয়ের ভরসায় দিন গুনছিল ভারতের জনগণ; ভেবেছিল মার্কসবাদ লেনিনবাদের আদর্শে গঠিত সি, পি. এম আত্মশুদ্ধি ও আত্মত্যাগের আদর্শ সামনে রেখে এগিয়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেল দলবাজিতে এরা মোহগ্রস্ত হয়ে মূল নীতি ভ্রষ্ট হল, ফলে প্রশাসনে পরিচ্ছন্নতা আনতে সক্ষম হল না, অধিকন্তু—উচ্ছৃঙ্খলতা ও সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাও বেড়ে গেল। মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের মূল সত্য হতে সরে গিয়ে মহান লেনিনের চিন্তাধারা ও আদর্শ ম্লান করে দিল। অথচ মাত্র ৫ কোটি লোকের দেশ ভিয়েৎনাম মার্কসবাদ লেনিনবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিংশ শতকের ইতিহাসের অন্যতম দেশপ্রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পঁচিশ বৎসর ধরে বীরত্বের সঙ্গে ফরাসী এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে ভিয়েৎনাম স্বাধীনতা অর্জন করেছে। দেশকে সংহত করে সমাজতন্ত্রের সার্থক রূপ দিয়েছে, ইহা সম্ভব হয়েছে বলেই ১০০ কোটির জন সংখ্যার দেশ মহাচীনকে আশ্চর্য্য প্রতিরোধের দ্বারা হটিয়ে দিয়েছে। এই কারণেই ভিয়েৎনাম বহির্বিশ্বের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও সহানুভূতি পেয়েছে।

স্বাধীনতার ৩০ বৎসর পরও আমাদের দেশাত্মবোধ এমন পর্য্যায় যে এখনও বর্ণ-বৈষম্যের জন্য, সাম্প্রদায়িকতার জন্য ভাষার স্বীকৃতি দাবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগিয়াই আছে অথচ রাশিয়া বহু জাতীর বহু ভাষার, বহু সংস্কৃতির দেশ হয়েও সকল জাতির সকল ভাষার সকল সংস্কৃতির একাত্মবোধের সামান্যতমও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কাজেই দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে: দেশের সর্বপ্রকার সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখতে দুনিয়ার সকল মানুষের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হতে বর্তমান যুগে মার্কসবাদ লেনিনবাদই একমাত্র পথ রাশিয়া ও তার সহযোগী সমাজতান্ত্রিক দেশ বাস্তবে প্রমাণ করেছে। আমরাও সেই পথে অগ্রসর হলে আমাদের স্মরণীয় নেতাদের ও মনীষীদের আশীর্বাদ লাভ করব এবং এগিয়ে যেতে পারব। ভারত আত্মা অভিন্ন এই একাত্মবোধ দেশে নব জাগরণের ও দেশপ্রেমের জোয়ার এনে দিবে। ধুয়ে মুছে যাবে সকল রকমের বিচ্ছিন্নতা, স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতা।

———

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

ও

সবাইকে পড়ান—

প্রশ্ন আমার

—উদয় দাশগুপ্ত।

বন্ধুরা শোন, ব্যথা মোর যত
লুকিয়ে রয়েছে তারা শত শত
হৃদয় গভীরে মোর,
যখন দেখি এ পৃথিবীর পরে
মানুষ হয়েও ধুঁকে ধুঁকে মরে
মনে ওঠে মোর ঝড়।

সৃষ্টির সেরা নামে শুধু তারা,
ধুঁকিয়া মরিছে পথে ঘাটে যারা
জীবন করিছে ক্ষয়,—
খাবার লাগি কুকুরের সাথে,
জীর্ণ বসনে ভাঙ্গা থালা হাতে,
মানুষ কি তারা নয়?

সমাজের এটা কেমন বিচার?
অবিচার আজ হয়েছে আচার
শোষক শুষিয়া বিলাস ব্যসনে
পেয়ে যায় কেন পার?
প্রশ্ন আমার।

আজ তোমায় দিতে হবে উত্তর'
কত কালে এই বঞ্চিত মানুষ নেবে তার অধিকার,
প্রশ্ন আমার।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

'স্বদেশী' আন্দোলনের আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্বদেশী আন্দোলনের শুরু থেকেই এটা বোঝা গিয়েছিল যে শিল্পের উন্নতি করতে হলে ব্যাঙ্কের সুযোগ সুবিধা লাভ করা অপরিহার্য্য-রূপে প্রয়োজন। ইয়োরোপীয়ানদের পরিচালনাধীন ব্যাঙ্কগুলি আমাদের ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে চাহিদা মত সাহায্য না করার জন্য একটা অসন্তোষের ভাব দেশের মধ্যে ছিল। ফলে আমাদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। গড়ে উঠলো বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। ভারতীয়গণের দ্বারা পরিচালক মণ্ডলী গঠিত হল; ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণে, ভারতীয় ম্যানেজমেণ্টে ব্যাঙ্ক চালু হল। এই ব্যাঙ্কের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে বাংলাদেশে ভারতীয় ব্যাঙ্কের ব্যবসা সাফল্য লাভ করতে পারে। কিন্তু বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের মতই এই ব্যাঙ্কেরও ভাগ্য বিড়ম্বনা ঘটেছে। ব্যাঙ্ক এক সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। ভাগ্যক্রমে সে সংকট এখন কেটে গেছে।

ভারতীয় তত্ত্বাবধানে বীমা কোম্পানী গড়ে ওঠার ব্যাপারেও স্বদেশী আন্দোলন প্রভূত পরিমাণে প্রেরণা জুগিয়েছে। বর্জন আন্দোলনের এক স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠানে এক বক্তৃতা দানকালে আমি বলেছিলাম যে বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠার দিকে আমাদের কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করা অবশ্য প্রয়োজন। আমার প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং কয়েকটি বীমা কোম্পানী স্থাপিত হল। তার মধ্যে ন্যাশনাল এবং হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ বীমা কোম্পানী দুটি বেশ সুপরিচিত ও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয় ৭ই আগষ্ট। বঙ্গ ভঙ্গ আইনের প্রতিবাদে প্রথম বিক্ষোভের দিন ছিল এটি। এই বিক্ষোভ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। মিঃ জে, চৌধুরীর নেতৃত্বে কলকাতার যুবক দল কলেজ স্কোয়ার থেকে টাউন হল পর্য্যন্ত এক বিরাট শোভাযাত্রা করে এগিয়ে যায়। সমস্ত ভারতীয় দোকান পাট বন্ধ হয়ে যায়। নগরীর যে সমস্ত অংশে ভারতীয়গণ বাস করতেন, তা সমস্তই যেন পরিত্যক্ত অঞ্চল বলে মনে হল। কিন্তু টাউন হলের চারিপার্শ্বস্থ অঞ্চলই ছিল প্রাণ চাঞ্চল্য ও উৎসাহ উদ্দীপনার স্থান, এক বিশাল জনতা সেখানে সমবেত হন। তারা দলে দলে ঠেলেঠুলে টাউন হলের উপরের দিকে উঠতে লাগল; উপর নীচ সবটাই লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ভিড় উথলে পড়ে বারান্দা ছাপিয়ে শেষে চত্বরে গিয়ে জমল। আমরা ঠিক করলাম, তিনটি সভা করা হবে, দুটি হবে টাউন হলের উপর ও নীচের তলায়, আর একটি হবে ময়দানে বেন্টিংকের প্রতিমূর্তির কাছে। টাউন হলের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আমি এই ঘোষণা করলাম। আমার ঘোষণা শুনে সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। বিশাল জনতা নিজেরাই নিজেদের ভাগা-ভাগি করে নিয়ে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সভায় গিয়ে জড় হল। জনতার মধ্যে এজন্য কোন বিশৃঙ্খলা দেখা

যায় নি, বা কেউ একবার এদিক আর একবার ওদিক ছুটোছুটি করে নি। নন-কো-অপারেশন আন্দোলন জেগে ওঠার সময় থেকে ছাড়া অন্য সব সময়ই আমাদের দেশের জনগণের শৃঙ্খলাপরায়ণতা তারিফ করার মত এবং বিদেশী পর্যটকেরা, যারা আমাদের বড় বড় প্রতিবাদ সভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ সমাবেশ প্রত্যক্ষ করেছেন, প্রবল উত্তেজনার সময়ও তাদের শৃঙ্খলা ও নেতাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। এদেশের লোক যে তাদের নিজেদের ব্যাপার নিজেরাই পরিচালনা করার যোগ্য, এটা তারই কিছুটা প্রমাণ বহন করে।

তিনটি সভায়ই আমি বক্তৃতা করি। জনগণের মধ্যে উৎসাহের সীমাপরিসীমা ছিলনা। এখানে আমি একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলছি যার ভিতর দিয়ে তৎকালীন স্বদেশী অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যাবে। একটি প্রস্তাব উঠেছিল যে, যে গভীর দুঃখ বেদনাময় পরিস্থিতি আমাদের এখানে একত্রিত করেছে তার নিদর্শন প্রকাশের জন্য টাউন হলের উপর তলাটাকে কাল কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হোক। এই কাজের ভার দেওয়া হল হোয়াইটওয়ে লেইড ল এণ্ড কোম্পানীকে। তারা ঠিক ভাবেই এ কাজটি করে দিল, যেদিন সভা হবে সেদিন সকাল বেলা মিঃ হ্যালিম গজনবি আমার কাছে এসে বললেন যে, যে কাল কাপড় দিয়ে হলটি ঢাকা হয়েছে তা বিদেশী কাপড়। তা যদি সরিয়ে না ফেলা হয়, তা হলে, তিনি আশঙ্কা করছেন যে গোলমাল হতে পারে, খুব তাড়াতাড়ি করে একটা আলোচনা বৈঠক বসল, কারণ সময় আর বেশী নেই। ঠিক যখন সভা আরম্ভ হওয়ার কথা সেই সময়ের মধ্যেই সব আমদানী বস্ত্রগুলি সরিয়ে ফেলা হল। লোকের মনোভাব এত উচ্চ গ্রামে উঠেছিল যে আমরা তা উপেক্ষা করতে পারলাম না। শুরুতেই আমরা নিজেদের শিবিরে মতান্তরের ফাটল ধরতে দিতে পারি না।

এর পরে কাজ শুরু হয়ে গেল। প্রথম বিক্ষোভ সভার সাফল্যই জনমনে আত্মবিশ্বাস এনে দিল এবং জাতীয় চেতনাকে আরও বাড়িয়ে দিল। এই সভা সারা বাংলাদেশেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। আমি যত সভায় যোগদান করেছি এবং সংগঠনে অংশগ্রহণ করেছি, এর চেয়ে প্রতিনিধিমূলক সভা আর দেখিনি। বঙ্গ-বিচ্ছেদ জন-মানসকে এত আঘাত দিয়েছে যে সে রকম আঘাত কোন কিছুতেই তারা পায়নি। ঐক্যবদ্ধ অবিভাজ্য বাংলা তার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মুখে আওয়াজ তুলে রোষে গর্জে উঠলো। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সমস্ত প্রতিনিধি কলকাতার এই সভায় যোগদান করতে এসেছিলেন তাঁরা এই দৃঢ়তাপূর্ণ সঙ্কল্প নিয়ে নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে গেলেন যে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও স্বদেশীকে সমর্থন চালিয়েই যেতে হবে। দুটি আন্দোলনই পাশাপাশি চলতে লাগল। একটি আর একটির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রূপে এগিয়ে যেতে থাকে। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে পণ্য আমদানির পথ রুদ্ধ করে দিল। যে সমস্ত মাড়োয়ারী সেই সব বিদেশী দ্রব্যের ব্যবসা করতেন তারা প্রমাদ গণলেন। তারা আমাদের কাছে প্রস্তাব দিলেন যে, যে পরিমাণ বিদেশী পণ্য সামগ্রী তাদের কাছে মজুদ আছে তা যেন বাজারে ছাড়বার সুযোগ করে দেওয়া হয়। আমরা এই সর্তে তাদের সে সুযোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলাম যে যে বিদেশী পণ্য তাদের হাতে আছে তাছাড়া তারা আর নতুন করে বিদেশী পণ্য আমদানী করবেন না। এ নিয়ে অনেক দীর্ঘ আলোচনা হয়, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি।

(চলবে)

RgedNo. R. M .24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | বাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

e/30 24 JUL 1979

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীগঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীঅম্বিকাচক্র নন্দী, শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী।
সম্পাদক—শ্রীশান্তি শরণ রায়চৌধুরী
বিপ্লবী বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেহালা—শ্রীব্রজগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। কার্যালয় সচিব—শ্রীজীব গুহ।
বিপ্লবী বাংলা কার্য্যালয় :—৪নং বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ নং চেলপ সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাঙালী

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭৯

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ১১ই শ্রাবণ, ১৩৮৬ ২৮শে জুলাই, ১৯৭৯	৪১ সংখ্যা

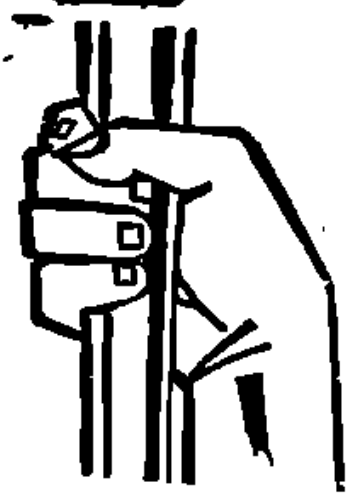

এই সংখ্যায়

দেশ ও জাতিকে বাঁচান
। সম্পাদকীয় ।

গণতন্ত্রের সমাধি অনভিপ্রেত
। শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস
। ক্ষীরোদ দত্ত ।

মার্কসবাদের পটভূমি ও পরিণতি
।। কালীপদ সরকার ।।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত ।

বাঁচতে চাই
।। উমা দাশগুপ্ত ।।

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু
দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে
যাত্রীরা হুঁসিয়ার"

সম্পাদকীয়—

দেশ ও জাতিকে বাঁচান

বর্তমান জনতা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে দিল্লীর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যে বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় শেষ হল, সেটা অপ্রত্যাশিত বা আচমকা কোন ঘটনা নয়। আমরা ত জনতা দলের জন্মলগ্নেই তার ভাগ্যাকাশে শনি ও রাহুর সম্মিলিত অনুপ্রবেশের যে কথা বলেছিলাম তারই পরিণতি আজ প্রত্যক্ষ করা গেল। কোন পাঁচমিশালী গোষ্ঠি যাদের আদর্শগত কোন মিল নেই, পন্থাগত ও সংস্থাগত অমিলও প্রচুর, শুধুমাত্র ক্ষমতালোভ ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষকে মূলধন করে বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না, এই সত্যও আজ প্রমাণিত হল। অকালমৃত্যু যাদের অবধারিত ছিল, তারা এতদিন গদী স্থল করে থাকল কি করে, এটাই জনমানসে দুর্বোধ্য বলে প্রশ্ন জাগিয়েছে। যা হবার হয়ে গিয়েছে, তা নিয়ে শোক করা বা আনন্দ প্রকাশ করাটা গৌণ। মুখ্য প্রশ্ন হল এই ঘটনার স্রোত দেশকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, সেটাই গভীর ভাবে ভেবে দেখা। তিক্ত অভিজ্ঞতা, কিন্তু স্বচ্ছদৃষ্টি নিয়ে আগামী দিনের পরিকল্পনা রচনা করতে হবে, দেশের মানুষকে ও রাজনীতিবিদ্‌দের। অন্যথায় জোড়াতালি দিয়ে কোন কাজ করলে, ব্যর্থতা ও মারাত্মক সঙ্কটের আবার ও পুনরাবির্ভাব ঘটবে।

বর্তমান সরকারের পতন ঘটেছে, কিন্তু তাতে দেশের সঙ্কটমোচন হয়েছে বলতে পারলে আমরা খুসী হতাম। কিছু 'আয়ারাম ও গয়ারামদের' নিয়ে আবার নতুন করে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান হচ্ছে নতুন সরকার গঠন করার জন্য, তা দেখে নিশ্চিন্ত হবার কোন কারণ নেই। বরং দুদিন আগেই হোক বা পরেই হোক, অনাগত ভবিষ্যৎ একইভাবে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে শুধুমাত্র আরো কয়েকজন উচ্চাভিলাষী মন্ত্রীত্বলোভী সুযোগসন্ধানীদেরই নিজস্বার্থ চরিতার্থ করার একটা সুযোগ দেওয়া হবে। দেশের রাজনীতিতে যে লজ্জাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তার দ্বারা দেশ ও জাতির ভাবমূর্তি কলুষিত হবে।

শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের প্রধানমন্ত্রী হবার বহুদিনের আকাঙ্খা পূর্ণ হয়েছে। যদিও তার শেষটা রীতিমত অযোগ্যতা ও অপদার্থতার স্বাক্ষর রেখে গেল অত্যন্ত মর্মান্তিক ভাবে। তাঁর কিন্তু এখনও চৈতন্যোদয় হয়েছে বলে মনে হয় না। আবার ও প্রধানমন্ত্রী হবার নির্লজ্জ প্রয়াস চালাচ্ছেন তিনি। মঞ্চের পার্শ্বে আরো যে দুইজন দাবীদার ওঁত পেতে বসেছিলেন তারাও ব্যক্তি-

গত উচ্চাশাকে পূরণ করতে সব রকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। ঘটনার চাপে নতুন একজন দাবিদারও আসরে সমাগত। সকলেই অঙ্ক কষছেন, যোগবিয়োগের অঙ্ক নিয়ে খুব ব্যস্ত। বাল্যজীবনে অঙ্কশাস্ত্রকে অবহেলা করার জন্য প্রকৃতি প্রতিশোধস্পৃহা নিয়ে বৃদ্ধবয়সে এদের অঙ্ক কষতে বাধ্য করেছেন কিনা জানি না। তবে এটা ধ্রুব সত্য যে দুই আর দুইয়ের যোগফল চারের বেশী বা কম হতে পারে না। তা ভিন্ন রাজনীতি ক্ষেত্রে আজকের অঙ্কের উত্তর কাল বদলে যাবে না, এমন কথাও কেউ বলতে পারে না। কাজেই এই অঙ্ক কষা ব্যর্থতার অনুশীলনী হবে মাত্র।

দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশের রাজনীতিবিদরা রাজনীতিকে একটা ব্যবসায়ে পরিণত করেছেন। তাই হামেসা দলবদল ও আনুগত্যের পরিবর্তন করতে এদের বিবেকের (অবশ্য যদি থাকে) কোন দংশন নেই। অবশ্য এই কাজের মাধ্যমে প্রাপ্তিযোগের অস্তিত্ব আছে বলে অনেকেই সন্দেহ করেন। যে অঙ্কটা সকলেরই কষা উচিৎ, যাকে বলা যায় দেশ প্রেম, চরিত্রবল ও স্বার্থত্যাগকে মূলধন করে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করা, সে পথে কেউ পা বাড়াচ্ছেন না। সবাই ন্যায়নীতি, আদর্শ ও দেশের ভবিষ্যৎকে বিসর্জন দিয়ে, বেয়ালে মৎসশিকার কাজেই সর্বস্বপণ করে ফয়দা তুলতেই সচেষ্ট। এই সর্বনাশা মানসিকতাকে সমূলে বিনষ্ট করতে না পারলে, দেশের সর্বনাশ অনিবার্য হয়ে উঠবে, একথা স্মরণ করেই ভবিষ্যতের পথ পরিক্রমা করার প্রয়োজন আজ সবচেয়ে বেশী। সে কাজ সুসম্পন্ন করতে হলে, নতুন মুখ, নতুন রক্তের আমদানী করা ভিন্ন কোন উপায় দেখি না। কিভাবে সে কাজ করা সম্ভব? এই প্রশ্নের সদুত্তরের উপর দেশের ভাগ্য পরিবর্তন ও আশাপূরণ নির্ভর করছে, এ কথা ভুললে ধ্বংস অনিবার্য্য।

প্রথম কথা পুরানোদের সুযোগ দিয়ে বিশেষ কোন লাভ হবে না। কোন দলেরই যখন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, তখন কোন দলকেই জাতির ভাগ্য নিয়ে ছেলেখেলা করতে দেওয়া উচিৎ নয়। দুই তিন দল মিলে সরকার গঠন করলেই সব সমস্যার সমাধান হবে, একথা মনে করা মূর্খতার চূড়ান্ত নিদর্শন হবে। আবার বিভিন্ন গোষ্ঠির সুযোগ সন্ধানীরা নিজ নিজ দলীয় ও ব্যক্তিগত লোভ পূরণ করার জন্য সচেষ্ট হবেই, বিশেষ করে তারা যখন জানে যে তাদের সমর্থনের উপর সরকারের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। বর্তমান রাজনৈতিকদল ও দলভুক্তদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই এটা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগত মানসিকতা ত্যাগ করে এরাই দেশের কল্যাণযজ্ঞে ব্রতী হবেন, একমাত্র বদ্ধ উন্মাদভিন্ন একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। আবারও একটা জগাখিচুড়ি সরকার গঠন করলে অনর্থ অর্থব্যয় হবে, আদর্শের অপমৃত্যু ঘটবে, দেশের ও জাতির বর্তমান ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। সমস্ত অন্তর দিয়ে সকলকেই এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

নতুন করে নির্বাচন ভিন্ন অন্য কোন সমাধান আছে বলে মনে হয় না। অবশ্য নির্বাচন যে একটি সর্বরোগহর ঔষধ, একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সরকার যখন গণতান্ত্রিক

কাঠামোর মাধ্যমে গড়তে হবে, তখন নির্বাচন না করে কোন বিকল্প পদ্ধতি দেখা যায় না। বর্তমানে সব দলের সদস্যদের নতুন নির্বাচনে খুব আপত্তি। কারণ বুঝতে কষ্ট হয় না। বহু কষ্টে হাওয়ার জোরে অথবা বন্দোবস্ত করে অপ্রত্যাশিতভাবে যে সুযোগ সুবিধাভোগের ব্যবস্থা করা গিয়েছে পাঁচ বছরের জন্য, তার থেকে সরে এসে নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করতে এরা রাজী নন। ধ্রুবকে পরিত্যাগ করে অধ্রুবের পথে পা বাড়াবার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে এরা খুবই সচেতন। তা ভিন্ন, যে কীর্তিকলাপের স্বাক্ষর এরা রেখেছেন, তা নিয়ে জনসমক্ষে হাজির হওয়াও দুরূহ। তবে এদের আপত্তিটা গ্রাহ্য করার প্রশ্ন নেই। ভবিষ্যতে অস্থিরতা সৃষ্টি করে দেশের গোল্লায় যাবার পথ প্রশস্ত করে, আখেরে যে খুব একটা স্থায়ী লাভ হয় না, এটা এদের মগজে ঢুকিয়ে দিতে হবে জোর করে। এদের এই শিক্ষাও দিতে হবে যে নির্বাচিত হবার পর যা খুশী তাই করলে সকলেরই ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন হতে বাধ্য। দেশের ভোটারদের ও অন্যান্যদের একটা শিক্ষা দেওয়া যাবে এর দ্বারা। হুজুগে মেতে, লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি ও নির্বাচনী ধাপ্পার শিকার হয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করলে, তাদেরও ভবিষ্যৎ চিরদিনই এইরকম দোলায়মান থাকবে। ভোটারদের কর্তব্য হবে, সব দলের কর্মসূচী বিচার বিশ্লেষণ করা, তাদের বলতে বাধ্য করা. নির্বাচনে জয়ী হলে কে কোন বিভাগের ভার প্রাপ্ত হবেন, যেমন ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মানুষেরা করে। তা ভিন্ন যাদের অতীত কলঙ্কমুক্ত নয়, অযোগ্যতার দোষে দুষ্ট, তাদের কোন রকমেই সমর্থন করা হবে না, সে যে দলের ছাপই তাদের থাকুক না কেন। আর নির্বাচনকে এমন ব্যয়বহুল করে দেওয়া উচিৎ নয়। এখানে জনগণ প্রভূত কাজ করতে পারেন। প্রথমতঃ সৎ, জ্ঞানী, গুণী, অথচ ধনী নন্ এমন মানুষদের বুঝতে দিতে হবে যে তারা নির্বাচনপ্রার্থী হলে জনসমর্থন তাদের মিলবে। টাকা পয়সা খরচ করাটাকে যদি জনগণ অসমর্থনযোগ্য বলে রায় দেন, তবে সুবিধাবাদীদেরও যেমন শিক্ষা হবে, দেশের মধ্য থেকে সৎ, ও আদর্শচরিত্র লোকেরা দেশ-গঠনের কাজে এগিয়ে আসবেন। জনগণ যদি সচেতন না হন, তবে এই প্রকার দুরবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। তাদের মনে রাখতে হবে People get the Goverament, they deserve. তারা যদি অযোগ্য, অসৎ, আদর্শহীন, চরিত্রহীন প্রতিনিধি নির্বাচন করেন, তবে তার ফলভোগ তাদের অবশ্যই করতে হবে। এ দেশের এই দুর্দিনে যদি তাদের সামনে আবার নির্বাচনের সুযোগ আসে, তবে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহার কোনটা করবেন এটা তাদের খুব সতর্কতার সঙ্গে নির্দ্ধারণ করতে হবে। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে যেমন বীজ বপন করবেন তারা তেমনি ফসলই তাদের তুলতে হবে।

আমাদের রাষ্ট্রপতি মহাশয় এই সঙ্কটমোচনের জন্য নানা প্রকারে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বোধশক্তি, বিচার শক্তি, ও দেশপ্রেমের উপর আমাদের পরিপূর্ণ আস্থা আছে। তাঁর নিকট আমরা একটি অনুরোধ রাখতে চাই। গণতন্ত্র যদি ব্যর্থ হয়, অন্যতন্ত্র সে স্থান দখল করবে। কারণ প্রকৃতি কোন শূন্যতা বরদাস্ত করে না। আমরা জানি যে বর্ষা ঋতুর অবসান না হলে নির্বাচন

করা সম্ভব নয়। অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করা সম্ভব কিনা আইনসঙ্গতভাবে এটা নির্দ্ধারিত করা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সুযোগ পেয়েও যারা ব্যর্থ ও অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছেন, তাদের কাউকেই আর শাসন কর্তৃত্বভার দেওয়া নিরর্থক হবে। এরা আবারও ব্যর্থ হবে এবং একদা বিদেশী শাসক যে আমরা দেশ শাসনের অযোগ্য এই অপবাদ দিয়েছিল, সেটাকেই প্রমাণিত করার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকবে। জনগণের ভাগ্যকে জনগণকেই নির্দ্ধারিত করতে দেওয়াই কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। অধীর আগ্রহে দেশবাসী তাঁর নির্দেশের দিকে তাকিয়ে থাকবে। ঐতিহ্যপূর্ণ, গৌরবময় এবং বহু মহামানবের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষের জয় হবেই। এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের আছে। তবে ক্ষমতালিপ্সু, অর্থগৃধ্নু ও দেশহিতৈষণাবর্জিত মানুষদের সময় দিলে, দেশেরও দশের প্রভূত অকল্যাণ হবে বলেও আমরা বিশ্বাস করি। দেশকে ও জাতিকে বাঁচান, এই আমাদের আহ্বান।

———

মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী স্মৃতিরক্ষা কমিটি

৩২/৮, চণ্ডীঘোষ রোড, কলিকাতা—৪০

মহাশয়,

আগামী ৯ই আগষ্ট ১৯৭৯ বৃহস্পতিবার সকাল ৯ ঘটিকায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর নবম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইবে। প্রবীণ অধ্যাপক ত্রিপুরা শঙ্কর সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের পৌরহিত্যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হইবে। বিপ্লব সাধনার সার্থক প্রতীক মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সমাধিতে এই স্মরণীয় দিনে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করিতে আপনাকে সবিনয় অনুরোধ করিতেছি। অনুষ্ঠানে সময়োচিত স্বদেশী সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকিবে। ইতি—

নিবেদক—

১২ই জুলাই, ২৯৭৯

স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষে

দীনেশচন্দ্র ঘটক, সম্পাদক।

বাঁচতে চাই

—উদয় দাশগুপ্ত।

পেটে নেই ভাত, চলে না যে পা,
চাকুরী জোটে না তবু,
কেমনেই সৎ থাকব যে আমি
আলোটা যে নিভু নিভু।

পথে পথে ঘুরি যখন, তখন
দেখি প্রাসাদের সারি,
সুগন্ধে মোর জিভে আসে জল
মুচড়ে ওঠে যে নাড়ি।

বিরানী, পোলাও, মাংসের ঘ্রাণ
পাগল করে যে ক্ষুধিত এ প্রাণ
কত দিন আর এভাবে ঘুরিয়া
সৎ ভাল হয়ে রব?
এক দিন শেষে ক্ষুধার জ্বালায়
চাহিয়া কাড়িয়া খাব।

তখন এ সমাজ আইনের চোখে
হব আমি অপরাধী
বিচারের নামে প্রহসন হবে,
আমি ধরা পড়ি যদি।

পৃথিবীতে আমি এসেছি বাঁচিতে
চাই তার অধিকার,
বাঁচতে না দিলে কেন এনেছিলে
দোষ বল আজ কার?

ক্ষিধে পেলে যদি খেতে চাই ভাত
সেটাই কি অপরাধ?
বাঁচতে চাওয়া কি দোষের? পৃথিবী
কার নেই সেই সাধ?

একদিকে দেখি প্রাচুর্য্যে ভরা
জীবনের জয় গান,
অপর দিকেই অন্ধকারেতে
চলে যায় কত প্রাণ!

এই কি বিচার পৃথিবী তোমার?
যদি হয় তবে মানবো না আর
নতুন নিয়ম গড়ে নেবো মোরা
আছে তার অধিকার।

অনেক ঠকেছি ভাল হয়ে থেকে
ঠকতে রাজি না আর।
বে-আইনের বুলি শুনিয়ে বলি—
এবার পাবেনা পার!

———

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরে জানি আমরা একই উদ্দেশ্যে চলিয়াছি। কানাডা হইতে অনেক শিখ সানফ্রান্সিস্কোতে আসিয়াছিল। তাহারাও এই ষ্টীমারে চলিয়াছে ভারতে বিপ্লব করিতেই। আমরা এক ষ্টীমারেই আসিলাম বটে কিন্তু পরিচিত হইলাম না। তাহারাও অগ্রবর্তী হইয়া আসিল না। পূর্ব হইতে অনুশীলন সমিতির মন্ত্রগুপ্তিতে অভ্যস্ত থাকায় প্রয়োজনভিন্ন কোন কথা বলিতাম না। যাই হোক জাপানে আসিয়া ইয়াকোহামায় হোটেলে থাকি এবং পরবর্তী ষ্টীমারেই কলম্বো পৌঁছাই। জার্মানীর সাহায্য পাওয়া যাইবে, অস্ত্র এবং অর্থের অভাব হইবে না—বিদ্রোহ সংগঠনের জন্য সংস্থা গড়িয়া তুলুন এই Message বহন করিয়াই আমি ও ভূপেন মুখার্জি কলিকাতা আসিয়া পৌঁছি। তখন একেবারে 'টাঁসা' সাজিয়াছি ভূপেন ও আমি পরস্পরের ঠিকানা নিলাম। কলিকাতায় আসিয়া ক্রমে ক্রমে জানিলাম আমাদের অনুশীলন দলের প্রধান নেতারা সবাই Arrest হইয়াছেন। অথচ আমার কারও না কারও সঙ্গে দেখা করাই চাই। পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তবুও আশা হইল অনুশীলনের এত কর্মী একজন না একজনের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হইবে। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন কি ডিগ্রোমা নিয়ে আসিয়াছ? আমি বলিলাম practical শিখিয়া আসিয়াছি। যাই হোক আশা লইয়াই রোজ রাস্তায় ঘুরি এবং বিভিন্ন পার্কে যাই। হঠাৎ হেদোর নিকট পরিচিত বিপ্লবী বন্ধু অনুশীলনের 'ঠাকুরের' সঙ্গে (অনুকূল চক্রবর্তী) দেখা হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, বড়ও সবাই arrest হইয়াছেন আমরা ছেলে-ছোকরারা আছি, তবে দল ভালই চলিতেছে।" আমি জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগের কথা, সাহায্য গ্রহণের কথা, organisation সেই উদ্দেশ্যে চালাইবার কথা সবই তাহাকে বলিলাম। তিনি সব শুনিয়া বলিলেন, "এরা সব ধরা পড়িলেও আমাদের দল রাসবিহারী বাবুর সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতেছে। এখন তিনিই আমাদের নেতা। তিনি বর্তমানে বেনারসে আছেন। সেখানে আমাদের বর্তমানের প্রধান Centre বা কেন্দ্র। কাজেই আপনারা আজই বেনারস চলিয়া যান।' রাসবিহারীর গোপন ঠিকানা লইয়া আমি ও ভূপেন ঐ দিনই বেনারস যাত্রা করিলাম। অনুকূল চক্রবর্তী রাসবিহারীবাবুর নিকট আমাকে একখানা পরিচয় পত্র দিলেন। তাতে লেখা ছিল—'আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু ১৯১২ সালে বিদেশে পাঠানো হইয়াছিল। তাহার কাছেই সব শুনিবেন।' রাসবিহারীর সরাসরি ঠিকানা ছিল না। গোটা দুই ঠিকানা ছিল মাঝখানে। এক ব্যক্তি আমাদের রাসবিহারীর নিকট লইয়া গেল। তিনি চিঠি দেখিয়া সামান্য দুই একটা কথা বলিয়াই বলিলেন—'আমরা অত্যন্ত watched

এখানে আর আলাপ করিব না। আপনি সন্ধ্যায় বিশ্বনাথের মন্দিরের গলির মোড়ে আসিবেন। পরে যথাস্থানে আপনাকে লইয়া যাইবে। যথা সময়ে সেই guide আমাকে এবং ভূপেনকে গঙ্গা তীরে আনিয়া একটি ছোট বোটে উঠাইল। পরে একটি বড় নৌকায় উঠিতেই নৌকা দূরে নদীবক্ষে লইয়া গেল। রাসবিহারী আমাদের জন্যই নৌকায় অপেক্ষা করিতেছিলেন মাঝিরা ধীরে ধীরে নৌকা বাহিতে লাগিল। আমার মনে হইল মাঝিরা বিশ্বস্ত জানাশুনা লোক। নৌকার ছাদে গিয়া বসিতেই রাসবিহারী বলিলেন, 'আচ্ছা এবার বলুন।' আমরা বার্লিনে যে পার্টি গঠিত হইয়াছে এবং ধীরেন সরকার যাহা বলিয়াছিলেন সব বলিলাম। স্থলপথে আফগান সীমান্ত দিয়া এবং সমুদ্রপথে সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া অস্ত্র প্রেরণের চেষ্টা হইতেছে আমরা শুনিয়া আসিয়াছিলাম। আমি সেই কথা বলিলাম। রাসবিহারী সকল কথা নীরবে মনোযোগের সহিত শুনিলেন। দুই একটি প্রশ্ন ও করিলেন পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—'এ বেশ ভালই হইয়াছে। আপনারা বিদেশে যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে জার্মানীর সাহায্য কবে আসিবে, কার্যতঃ কবে আসিয়া এখানে পৌঁছাইবে কিছুই নিশ্চিত বলা যায় না, আমরা এই অনিশ্চিত আশায় বসিয়া থাকিতে পারি না। একটু থামিয়া বলিলেন—'শুনুন আমরা একটি নির্দিষ্ট দিনে ভারতব্যাপী Armed Revolution 'সশস্ত্র বিদ্রোহ' আরম্ভ করিব। আমরা সৈন্যদের হাত করিবার কাজে অনেক দূর আগাইয়াছি; আপনারা সত্বরই পূর্ববঙ্গে গিয়া organisation বাড়াইতে থাকুন। অথবা এখানে যদি পুলিশের দৃষ্টি পড়ার অসুবিধা থাকে তবে Northern India-তে কাজ করিতে পারেন।' আমরা তাঁকে জানাই যে আমরা পূর্ববঙ্গে গিয়াই সশস্ত্র বিপ্লবে লিপ্ত হইব। এরপরে আমরা দুজনে বিদায় লইলাম। মনটা উৎফুল্ল হইল। আমরা জানিলাম সৈন্যবাহিনী আমাদের হইয়া যুদ্ধ করিবে। আমি কলিকাতায় আসিয়া অনুকূল চক্রবর্তীর সঙ্গে তার গোপন আড্ডায় দেখা করিলাম।

(চলবে)

যকৃতের পেটের ব্যথা, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায় অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র
প্রাপ্তিস্থান: শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
শিলচর কুটীর • কুমার গ্রাম • গুয়াহাটী • ডিব্রুগড়

মার্কসবাদের পটভূমি ও পরিণতি

॥ কালীপদ সরকার ■

মার্কসবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে দার্শনিক কার্লমার্কস সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। কারণ মানুষের চিন্তা ও কর্ম তার বংশ, শিক্ষা এবং পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। যিনি যত বড় চিন্তাবিদই হোন না কেন কেউই প্রাকৃতিক প্রভাবমুক্ত নন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর এক সঙ্গতিপন্ন ইহুদী পরিবারে কার্ল মার্কস জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন জার্মান সরকারের আইন বিভাগের অফিসার। মার্কস বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস দর্শন, অর্থনীতি এবং আইন বিষয়ে পড়াশুনা করেন। ছাত্র জীবনে তিনি দার্শনিক হেগেলের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হন।

এই সময় ইউরোপে বসবাসকারী ইহুদীদের জীবন ছিল নৈরাশ্য দুঃখময়। হাজার বছর আগে নিজেদের বাসভূমি ইজ্‌রাইল থেকে বিতাড়িত হয়ে ইহুদীগণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নেয়। বহুকাল সেই সব দেশে বাস এবং সেখানকার নাগরিকত্ব লাভ করলেও, ইহুদীরা স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত এক হয়ে মিশে যেতে পারে না। তারা তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে। ইহুদীরা যথেষ্ট বৈষয়িক ও শিক্ষাগত উন্নতি লাভ করলেও সর্ব্বত্র অশ্রদ্ধার পাত্র ছিল। খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী ইউরোপবাসীদের দৃষ্টিতে ইহুদীরা ছিল সেই ক্ষমার অযোগ্য জাতির মানুষ যারা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছিল। তা ছাড়া ঘৃণার কারণ ছিল ইহুদীদের অহমিকাপূর্ণ ধর্মতত্ত্ব,—যে তত্ত্ব অনুসারে তারা নিজেদের chosen people of God অর্থাৎ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে প্রচার করত এবং কোন এক ভবিষ্যৎকালে ঈশ্বর ত্রাণকর্তা রূপে আবির্ভূত হয়ে তাদের পৃথিবীর অধীশ্বর করবেন বলে আত্ম গরিমা জাহির করত।

ইহুদীরা ছিল রাষ্ট্রহীন, নির্বান্ধব, যাযাবর মানুষের মতো। স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের ভাল চোখে দেখতই না, রাষ্ট্রের নিকট থেকেও তারা সুবিচার পেত না। কার্ল মার্কসের অন্তরে স্বজাতীয়দের দুর্গতির ছাপ পড়া ছিল খুবই স্বাভাবিক।

উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপের দেশগুলিতে উগ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র (Nation State) গড়ে উঠতে থাকায়, স্বাতন্ত্র্যবাদী ইহুদীদের অবস্থা শোচনীয় হয়। বহু ইহুদী পরিবার এই সময় ইউরোপ ত্যাগ করে। একমাত্র রাশিয়া থেকে আড়াই লক্ষ ইহুদী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চলে যায়।

অনিশ্চিত প্রবাস জীবনে ইহুদীরা পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছিল প্রধানতঃ অর্থ লগ্নি কারবার ওকালতি, ডাক্তারী, শিক্ষকতা এবং চাকুরি। তারা বাস করত সহরে। কৃষি ও ভূ-সম্পত্তি অর্জন থেকে

তারা বিরত ছিল। কৃষি ভিত্তিক পল্লী জীবনের শান্তিময় পরিবেশ সম্পর্কে ইহুদীরা অনবহিত ছিল। নিজেদের দেশ না থাকায়, স্বদেশ প্রীতি যে কি বস্তু ইহুদীদের পক্ষে তার মর্ম উপলব্ধি করা সহজ ছিল না। দেশপ্রেম ও জাতীয়তা বোধ ইহুদীদের মনে ঈর্ষা ও বিরাগ জন্মাত। বলা বাহুল্য যে বর্তমান ইহুদীরাষ্ট্র ইজরাইল তখন স্থাপিত হয় নি। তা ছিল সে সময় চিন্তার অতীত।

মার্কস তত্ত্বে জাতীয়তাবাদ বর্জিত শ্রমিক আন্তর্জাতিকতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ এবং কৃষকের ভূমিকার গৌণত্ব প্রদান অনেকের মতে মার্কসের ইহুদী মানসিকতাসঞ্জাত। প্রয়োগ ক্ষেত্রে মার্কসের তথাকথিত জাতিস্বার্থ মুক্ত আন্তর্জাতিকতার তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। চীনের কমিউনিষ্ট বিপ্লবে আবার কৃষকদের ভূমিকাই ছিল প্রধানতম।

কার্ক মার্কসের সময়ে ইউরোপে দ্রুত শিল্প বিপ্লব ঘটতে থাকে। যার ফলে, শ্রমজীবী মানুষের একটা বড় অংশ কলকারখানা সন্নিহিত বস্তিব্যারাকে বাস করতে শুরু করেন। শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত বাসগৃহ, শিক্ষালয়, চিকিৎসা কেন্দ্র, বীমা, চাকুরির নিরাপত্তা প্রভৃতি ব্যবস্থা তখন ভালভাবে গড়ে উঠে নি। জমিদার, শিল্প মালিক, যাজক এবং আমলাবর্গ ছিল সমাজের কর্তা। পূর্ণবয়স্ক নরনারীর ভোটাধিকারভিত্তিক অবাধ নির্বাচনসম্মত স্বাধীন গণতন্ত্রের তখন উদ্ভব ঘটে নি। অধিকাংশ দেশেই ছিল স্বৈরতন্ত্রী রাজার শাসন। শিক্ষা ছিল অনগ্রসর। স্বাধীন সংবাদপত্র এবং সংগঠিত জনমত ছিল না বললেই চলে।

ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-স্বাধীনতা ভ্রাতৃত্বের বাণী নিস্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। সমাজ-সাম্যের চিন্তা দার্শনিকদের মনে উদিত হলেও, সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থা কিভাবে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে নিয়োগ করা সম্ভব এবং কি পন্থা অবলম্বনে ক্রমবর্দ্ধমান ব্যক্তিগত মালিকানাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে আনা যেতে পারে সে সম্বন্ধে কোন সুনির্দ্দিষ্ট কর্মধারা তাঁরা উদ্ভাবনে সমর্থ হন নি। তাঁদের সমাজতন্ত্রের কথা ছিল ভাসাভাসা। টমাস হেড্‌সকিন, টমসন্, রবার্ট ওয়েন, ফোরে, সেন্ট সাইমন, প্রুঁধো প্রমুখ মনীষীরা ছিলেন এই ধরণের সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা। অন্যদিকে তলস্তয়, রাস্কিন প্রভৃতির চিন্তাধারা ছিল অন্তর বিপ্লব নির্ভর সহজ সরল শোষণমুক্ত নতুন সমাজ গঠনের পক্ষে। পূর্বোক্ত সমাজতন্ত্রবাদী ও নৈতিক বিপ্লব বাদী দার্শনিকগণ এক বিষয়ে কিন্তু অভিন্ন মতাবলম্বী ছিলেন, তা হল—মহৎ আদর্শের কর্মপন্থাকেও মহৎ হতে হবে।

কার্ল মার্কসই সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রবাদকে একটি নির্দ্দিষ্ট কর্মপন্থা ও ভবিষ্যৎতত্ত্ব দ্বারা চিত্তগ্রাহী-রূপে উপস্থাপিত করেন। মহান আদর্শের রূপায়ণ পন্থাকেও যে মহান হতে হবে এই নীতি বচন তিনি মানেন নি। ইতিহাসকে মার্কস বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যায় বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করতে চাইলেন যে, সমাজ বিবর্তনের মূলে একমাত্র অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান। অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সংগ্রাম হল যার বাস্তব প্রতিক্রিয়া।

আদিম মানবসমাজ দলপতি, পুরোহিত, সামন্ত, নৃপতির ক্রমশাসন পার হয়ে বর্তমানে ধনতন্ত্রী শাসন পর্বে উপনীত হয়েছে। ধনতন্ত্রী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত এখন শ্রমিকশ্রেণী। আরব্ধ সংগ্রামে শ্রমিক-শ্রেণীর জয় সুনিশ্চিত। শ্রমিক একনায়কত্ব শাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ঘটবে এবং তার জায়গায় শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে উঠবে। যথা সময়ে, এই শ্রমিক এক নায়কত্ব শাসনে, মনুষ্যসমাজ শ্রেণীহীন, শোষণহীন, রাষ্ট্রহীন, স্বশাসিত, নৈরাজ্যে পৌছবে।

মার্কসের মতে মানুষের সকল প্রেরণার উৎস অর্থনৈতিক: সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, খৃষ্টধর্ম, শিল্পকলা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে গোপন রাখার আবরণ। সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থাকে করায়ত্ত করার জন্য যে শ্রেণী সংগ্রাম চলছে, তাতে সমন্বয়ের স্থান নেই। সমাজ স্থাপনের আদি পর্বে শ্রেণীর উৎপত্তির কারণ কি ছিল এবং কোন কালে সেই কারণের বিলয় সম্ভব কিনা এ সম্পর্কে মার্কসতত্ত্ব খুব স্পষ্ট নয়। যে ইহুদী ধর্মীয় অনুশাসন চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত নেবার নির্দেশ দেয়, করুণা ও ক্ষমা যার নিকট দুর্বলতার পরিচয়, পশু হত্যার ব্যাপার পর্যন্ত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন যার আচরণ-বিধি, সেই ইহুদী কার্ল মার্কসের ভাবনায় শ্রেণীতে শ্রেণীতে মিলনের বদলে খুনোখুনির তত্ত্ব যে কেন্দ্রবিন্দু হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না।

ইউরোপের নেশন ষ্টেটগুলি ছিল ইহুদীদের চক্ষুশূল, মার্কস নেশন ষ্টেটগুলির ধ্বংস সাধনে উদ্ভাবন করলেন শ্রমিক আন্তর্জাতিকতা তত্ত্ব। কারখানার শ্রমিকগণ এক স্থানে সন্নিবিষ্ট এবং কিছু পরিমাণে গৃহ-পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। রাষ্ট্রের উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। কার্ল-মার্কস তাঁর পরিকল্পিত বিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিলেন সেই কারখানার শ্রমিকদের। শ্রমিকদের দাবির যুক্তিযুক্ততা স্থাপনে তিনি উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর নতুন মূল্যতত্ত্ব দিলেন। তিনি বললেন—সামগ্রীর উপাদান হল শ্রম, শ্রমই রূপান্তরিত সামগ্রী। মূলধন, কাঁচামাল, উদ্যোগের কোন অবদান নেই উৎপাদন ব্যবস্থায়। শ্রমদান করে যে শ্রমিক সেই হল উৎপাদন শিল্পের প্রকৃত মালিক। মার্কসের মূল্যতত্ত্ব অর্থনীতির বিচারে সঠিক না হলেও, শ্রমিকদের সংগ্রামের পিছনে শক্তি জোগাতে সক্ষম হল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কার্ল মার্কস এবং তাঁর সহযোগী ফ্রেডারিক এঙ্গেলস এক যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বললেন—'হে সর্বহারার দল, তোমাদের দেশ নেই, রাষ্ট্র নেই। আসন্ন সংগ্রামে দাসত্ব-শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার মতো তোমাদের কিছুই নেই। তোমাদের সামনে প্রসারিত বিশ্বের সম্পদ তোমাদের জয়ের প্রতীক্ষায়। শাসকদল তোমাদের ভয়ে কম্পমান। দুনিয়ার মজদুর এক হও।'

ফল হল নেতিবাচক। জার্মানী অথবা ফ্রান্সের শ্রমিকরা রাষ্ট্রহীন ছিল না। তাদের উপার্জন এবং জীবনমান ইউরোপের সাধারণ মানুষের চেয়ে অনুন্নতও ছিল না। মার্কস ও তাঁর অনুগামীরা প্যারিসে যে শ্রমিক-বিদ্রোহের আয়োজন করেছিলেন তা ব্যর্থ হল। নেশন ষ্টেটের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিদ্রোহ রটাবার প্রয়াস সফল হল না। (চলবে)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

স্থির চূড়ান্ত ব্যবস্থা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অক্টোবর মাস দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল। দিনটি ছিল ১৬ই অক্টোবর—যে দিনটি বঙ্গভঙ্গ কার্য্যকরী রূপ নেবে বলে ধার্য্য হয়েছিল। বাংলার কাছে এ দিনটি হল একটি জাতীয় শোকের দিন। আমরা সে দিনটিকে শোক-দিবসরূপেই পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। সমস্ত দেশ আমাদের সে ডাকে আবেগের সহিত সাড়া দিল। মফঃস্বলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এক কার্য্যক্রম স্থির করা হল এবং তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হল। সে কার্য্যক্রম ছিল এইরূপ: (১) রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান। সকলের হাতে রাঙ্গা সূতা বেঁধে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। এই রাখী বন্ধন ব্যাপারটি একটি পুরানো দিনের প্রথা। তাকে নতুন করে প্রবর্তন করা হল। বাংলার বিচ্ছিন্ন প্রদেশের সঙ্গে পুরানো অবিভক্ত বাংলাকে সৌভ্রাত্র বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখার প্রতীকরূপে এই রাখী-বন্ধন অনুষ্ঠানটি করা হয়। (২) ১৬ই অক্টোবর দিনটিকে অনশন দিবসরূপে পালন করা। কোন ঘরেই উনুন জ্বালান হবে না; কেবলমাত্র রুগ্ন ও অসমর্থ ব্যক্তিগণ ছাড়া আর কারও জন্য রন্ধন কার্য্য হবে না; দোকানপাট সব বন্ধ থাকবে; কাজকর্মও সব স্থগিত রাখা হবে; সকলকে খালি পায়ে চলতে হবে; দেহ মনের পরিশুদ্ধির জন্য প্রাতে গঙ্গা-স্নান করতে হবে। এই কার্য্যক্রম ছিল একটা আত্ম-অস্বীকৃতির ফরমানের মত। কিন্তু সকলেই সানন্দ চিত্তে এই ফরমান গ্রহণ করলেন এবং ঘটনার পারম্পর্য্য এটাই প্রমাণ করল যে জাতির মন-প্রাণ এর মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু এটাই এই কর্ম যজ্ঞের শেষ কথা নয়। স্থির হল যে দিনটিকে একটি গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করে চিহ্নিত করে রাখা হবে। আমি একটি মিলন মন্দির (ফেডারেশন হল) গড়ে তোলার প্রস্তাব করলাম। কারণ দেশ বিভাগ রদ করা বা উহার কোন সংশোধন হয়নি ধরে নিয়ে পুরানো অবিভক্ত বাংলার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন অংশের একটা মিলন-স্থলের প্রয়োজন আছে যাতে উভয় অংশের অবিভাজ্যতা ও ঐক্য সূচিত হয়। সেই অবি-ভাজ্যতা ও ঐক্যের প্রতীক চিহ্নরূপে এই ফেডা-রেশন হল গড়ে তোলার প্রস্তাব করি। এই ধারণাটি আমার মনে জাগে প্যারিসের হোটেল দ্য ইনভেলিডেস্ দেখে। সেখানে দেখেছি মহা প্রতাপশালী নেপোলিয়ানের সমাধি স্তম্ভের চারিদিক ঘিরে আরও অনেক সম্মানের মাল্যভূষিত মূর্তি বসান আছে। এই মূর্তিগুলি হল বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণের। সে সময়ে দেখেছি আলসাস ও লোরেইনের প্রতিনিধিগণের মূর্তিগুলি ছিল ধূলায়িত ও বস্ত্রদ্বারা আবৃত। আমার মনে হল যেন আমাদের এই রকম একটা স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার

যেখানে আমরা বাংলার সমস্ত জেলাগুলির মূর্তি স্থাপন করে পৃথকীকৃত জেলাগুলির মূর্তিকে ততদিন পর্য্যন্ত ঢেকে রাখব যতদিন পর্য্যন্ত সে জেলাগুলি অপর মূলদেশের সঙ্গে মিলিত না হয়। ফলটি আমাদের অন্যান্য নাগরিক জীবনের প্রয়োজনও সাধন করবে। আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার স্মৃতি এই ফল বহন করবে এবং এইভাবে আমাদের পুনর্মিলনের প্রয়াসকে চির-জাগরূক করে রাখার কাজে প্রেরণা যোগাবে।

প্রস্তাবটি বিশেষ যত্ন ও চিন্তার সহিত বিবেচনা করা হল। স্বর্গতঃ স্যার তারকনাথ পালিত এবং রামকৃষ্ণ মিশনের ভগিনী নিবেদিতা গভীর আগ্রহের সহিত প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন। ভারতের হিতৈষিণী সেই মহাপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতা তাঁর সমস্ত জীবনকে ভারতের সেবায় উৎসর্গ করে ভারতের মাটিতে তা শেষ করে গেছেন। আর স্যার তারকনাথ পালিত বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে একজন রাজার মত বদান্য ব্যক্তি রূপে ভবিষ্যৎ বংশাবলীর নিকট চিরকাল পরিচিত থাকবেন। তা ছাড়াও তাঁর ছিল বহু দিকে বহু বিষয়ে বিস্তারিত একটা সহানুভূতিশীল মন। তাঁর হৃদয় যখন আন্দোলিত হয়ে উঠতো তখন তিনি সম্পূর্ণ সক্রিয় ভাবেই আমাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতেন এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি আইনজীবীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে এক মহান বন্ধুর মত আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত আমাদের সাহায্য করতেন ও দেশের স্বার্থকে বিপদ থেকে রক্ষা করতেন। দেশ বিভাগকে রদ করার কাজে আমাদের সমস্ত প্রয়াসের সঙ্গে তিনি মনে প্রাণে জড়িত ছিলেন। একটি সাংঘাতিক ব্যাধিতে আক্রান্ত অবস্থায় থাকা কালেও যখনই তিনি সমর্থ হতেন আমাদের সঙ্গে থাকতেন এবং সাহায্য করতেন। তাঁর স্বচ্ছ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন নির্দেশ আমাদের কাছে অতি মূল্যবান সাহায্য বলে মনে হত।

১৬ই অক্টোবরের অনুষ্ঠানসূচি কেবলমাত্র ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দেশ বিভাগ রদ আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলন ছিল এক সংযুক্ত আন্দোলন। সিদ্ধান্ত হল যে একটি অর্থ ভাণ্ডার গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটি বড় রকমের সভা করা হবে। এই অর্থ ভাণ্ডারের প্রধান কাজ হবে তাঁত শিল্পকে সাহায্য করা।

সংক্ষেপে এই হল ১৯০৫ সালের ১৫ই অক্টোবরের কর্মসূচি—যে দিনটিতে বঙ্গভঙ্গ শুরু হবে। আগের দিন সারা রাত ধরে আমাদের কর্মীরা পরের দিনের সমস্ত কাজ কি ভাবে সম্পন্ন করা হবে তার বন্দোবস্ত করেন। নিদারুণ খাটুনিতে তারা শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লেও তাদের উৎসাহ বিন্দুমাত্রও কমেনি। তাদের মন সব সময়ই এই প্রত্যয় নিয়ে উৎফুল্ল ছিল যে তাদের কার্য্যসূচি অবশ্যই সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপালিত হবে। রাত্রি প্রভাত হল, অতি প্রত্যুষকাল থেকেই কলকাতার রাস্তাগুলি সব বিপুল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে মুখরিত হতে লাগল। যুবক বৃদ্ধ নির্বিশেষে দলে দলে লোক রাস্তা পরিক্রম করে নদীর তীরে স্নানের ঘাটের দিকে যেতে থাকে। স্থানে স্থানে তারা থেমে গিয়ে পথচারীদের হাতে রাখী পরিয়ে দেন। এই সমস্ত দলের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে সংকীর্তনের দলও ছিল। তারা 'বন্দেমাতরম্' ও অন্যান্য স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক সঙ্গীত করতে করতে পথ পরিক্রমা করেন। স্নানের ঘাটগুলি ক্রমবর্ধমান নারী-পুরুষের জনতায় স্ফীত হয়ে পূর্ণ হয়ে গেল। তাদের সকলের হাতেই ছিল কিছু পরিমাণ

রাখীর গুচ্ছ। সেই রাখী তারা বন্ধুদের, পরিচিত ব্যক্তিদের এমন কি অপরিচিত পথচারীদেরও হাতে পরিয়ে দেন।

প্রত্যূষে উঠে আমি বিডন স্কোয়ার, সেন্ট্রাল কলেজ এবং অন্যান্য স্থানে ঘুরে দেখলাম: সর্বত্রই বিপুল জন-সমাগম। তাদের কাছে বক্তৃতা করলাম। দলে দলে লোক এসে আমার পায়ের ধুলো নিতে লাগল: আমিও তাদের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করলাম। এ দিনটি ছিল বাস্তবিকই একটি বেঁচে থাকার মত দিন, একটি মহান অনুপ্রেরণার দিন যে দিনটি হয়ত বা কারও জীবনে একবারই মাত্র আসে; আবার এ দিনটি কঠোর ও নিরলস পরিশ্রমের দিনও ছিল বটে।

ফেডারেশন হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান সভার নির্দিষ্ট সময় ছিল বিকেল ৩টা। নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বেই কাতারে কাতারে লোক এসে সভাস্থলকে পূর্ণ করে দিল। সমবেত জনতার স্ফীতি বাড়তে বাড়তে উপচে পড়ে সামনের রাস্তাকেও এমনভাবে ঢেকে ফেলল যে রাস্তা দিয়ে লোক চলাচলও অসম্ভব হয়ে পড়ল। এ রকম একটা হিসাব করা হয়েছিল যে অন্ততঃ ৫০ হাজার লোক জড় হয়ে থাকবে এই সমাবেশে। তথাপি এই বিশাল জন-সমাবেশ এত শান্ত ও সুশৃঙ্খল ছিল যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একজন পুলিশেরও প্রয়োজন হয়নি। পুলিশের কোন লোক সেখানে দেখাই যায়নি। থানায় থানায় অবশ্য প্রচুর পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বা যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের কোন প্রয়োজনই হয়নি।

ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের কাজ মিঃ আনন্দমোহন বোস করবেন বলে স্থির হয়েছিল। অন্য প্রসঙ্গে অন্যত্র আনন্দমোহন বোস সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলেছি। দেশ ভাগের ফলে বিভিন্ন জেলাগুলির কোন একটি জেলার লোক তিনি। ময়মনসিংহ জেলার লোক। দেশ ভাগকে তিনি যে কেবলমাত্র একটি জাতীয় বিপদ বলেই মনে করতেন, তা নয়; এটা তার কাছে একটা ব্যক্তিগত উৎপীড়ন বলেও মনে হয়েছিল। কিন্তু এই সময়টায় তিনি চলৎশক্তি-হীন হয়ে পড়েছিলেন। এক সাংঘাতিক রোগ তাঁকে আক্রমণ করে ১২ মাসের কম সময়ের মধ্যেই তাঁকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। রোগে তিনি শয্যাগত হয়ে পড়লেন। কিন্তু অন্যান্য মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের মত তিনিও তাঁর শারীরিক কষ্ট যন্ত্রণার ঊর্ধে থেকে নিজের সম্বিৎ রক্ষা করে চলেছেন এবং অবসন্নতা ও শেষের দিন ঘনিয়ে আসার গভীর ছায়াপাত সত্ত্বেও দেশের কাজে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকে। আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তারা বললেন যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা-ধীনে তাঁকে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের কাজ সমাধা করতে অনুমতি দেওয়া হেতে পারে। আমাদের কাছে এটা একটা পরম পরিতোষের কারণ বলে গণ্য হল যে বঙ্গমাতার এমন একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানের দ্বারা এই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হবে যাঁর স্বদেশ-প্রেমের তাড়নাকে স্বৈরাচারী শাসন কর্তৃপক্ষ যুগ-পরম্পরাগত প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত ঐক্যের বন্ধনকে ছিন্ন করে আলোড়িত করে তুলেছে।

রোগ শয্যায় শায়িত থেকে প্রতিদিন সেই মারাত্মক রোগের নতুন নতুন উপসর্গের আক্রমণের মধ্যেও তিনি যে ভাষণটি প্রস্তুত করেন, তা শরীরের উপর মনের আধিপত্য যে কতখানি প্রবল তারই এক বিস্ময়কর প্রমাণ বহন করে। (চলবে)

গণতন্ত্রের সমাধি অনভিপ্রেত

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকারীদল ও বিরোধীদল থাকবেই। দেশের যে কোনও একটি রাজনৈতিকদল নির্ব্বাচনে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করলে সরকার গঠন করতে পারে অথবা বিভিন্ন রাজনৈতিকদলের নির্বাচিত বিধায়কগণ পরস্পরের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে, এক সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে পারে। যে দল বা দলসমষ্টি সরকার গঠন করে, তার বিপরীত মতাবলম্বী অন্য একটি বা একাধিক দল এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে বিরোধীদল গঠন কোরে সরকারের গৃহীত নীতির বা কার্য্যাবলীর গঠনমূলক সমালোচনায় জনস্বার্থে মুখর এবং প্রয়োজনবোধে জনস্বার্থে সরকার বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমেসরকারকে সুপরিচালিত হতে সাহায্য করে। ইহাই গণতান্ত্রিক রীতিসম্মত প্রথা। যদি বিরোধী দল সদাসতর্ক থেকে জন-কল্যাণমূলক কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেয় ও সহ-যোগীতা করে, তবে জনসাধারণের পক্ষে ও সরকারের পক্ষে তা মঙ্গলজনক হয়। সরকারের বিঘোষিত নীতির সঙ্গে তার কাজের যদি তফাৎ দেখা যায় বা বিঘোষিত নীতির প্রায় বিপরীতধর্মী কার্য্য সংগঠিত হতে দেখা যায়, তবে সে ক্ষেত্রে বিরোধীদলের ভূমিকা ও কার্য্যাবলী সম্পূর্ণ সরকার বিরোধী হওয়া একান্ত আবশ্যক—দলস্বার্থে নয়, জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে। বিরোধীদলের সঠিক ভূমিকাগ্রহণ বহু ক্ষেত্রেই সরকারী অন্যায় আচার আচরণ ও ভুল-ভ্রান্তিকে স্তব্ধ করে সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে; তাই বিরোধী দলের নিষ্ঠা, কর্মকুশলতা ও সঠিক পন্থা গণতান্ত্রিক দেশে বড়ই মূল্যবান ও জনস্বার্থে একান্ত অপরিহার্য্য। যে কাজ করে তারই ভুল হওয়া স্বাভাবিক কারণ মানুষই ভুল করে, ভুল স্বীকারও করে এবং ভুল বুঝতে পারলে সে পথ পরিহার করে—যাতে ফের ভুল না হয়। সরকারকে সব সময়েই বহু জনহিতকর কাজ পরি-চালনা করতে হয় এবং সরকারের কাজই তাই। তা ছাড়া প্রচলিত আইনের সংশোধন, নূতন নূতন আইন প্রণয়ন, আইনমোতাবেক জনস্বার্থে কাজ হয় কিনা তা দেখা ইত্যাদি বহুতর জটিল কার্য্যে সরকার সদাই ব্যস্ত থাকে। ফলে ভুলত্রুটি হতেই পারে এবং বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় ভুল ত্রুটি হয়, এমন কি ভুল ত্রুটি মারাত্মকভাবেই হয়; আর তার কুফল ভোগ করে জনগণ এবং তারাই এর ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই যে কোন বিবেকবান সরকার বিরোধীদলের বক্তব্য ও সমা-লোচনামূলক কার্য্যকে মর্য্যাদাসহকারে শোনে ও লক্ষ্য করে এবং জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে তা গ্রহণ কোরে সরকার তার নীতি নির্দ্ধারণ করে বা নীতি পাল্টায়। সরকার ও বিরোধীপক্ষ উভয়েই জনস্বার্থ ও জনকল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয় এবং গণ-তান্ত্রিক দেশে সাধারণ মানুষ উভয়ের নিকট এরূপ আচার ও আচরণ প্রত্যাশা করে এবং বাস্তবে তার ব্যতিক্রম দেখলেই তারা বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়। সরকার ও বিরোধীপক্ষ উভয়েই জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা সংগঠিত, অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় এই

জনপ্রতিনিধিরাই জনগণের আশা আকাঙ্খা ও অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারে উদাসীন, অমনোযোগী ও ও বিমুখ, বরং জনগণ এঁদের দ্বারা অবহেলিত, উপেক্ষিত ও বঞ্চিত হয় প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই। গণতন্ত্রে দেশের প্রকৃত মালিক হলো জনসাধারণ, সে কথা উক্ত বিধায়করা নির্বাচনান্তে ভুলেই যান বোধ হয়, নচেৎ এই দুরবস্থা ও অব্যবস্থা কি করে আজও চলে? পশ্চিমবঙ্গ একটি গণতান্ত্রিক রাজ্য। এবং বামফ্রন্ট নামে কোয়ালিশন দলটি নির্বাচনের মাধ্যমেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সরকার দখল করেছে ১৯৭৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে। ইতিমধ্যে প্রায় দুবছর সময় অতিক্রান্ত হলো, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বাসী এখনও এই সরকারের কৃতিত্বের নিদর্শন কিছুই দেখতে পেলেন না। অপরপক্ষে এই সরকারের আমলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য আকাশ ছোঁয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে উঠেছে। এমন ক্রম-উর্দ্ধমুখি দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি। শান্তি শৃঙ্খলা পদে পদে তীব্র বেগে ভাঙ্গনের পথে ধাবমান, যাকে রোধ করার শক্তি বা সদিচ্ছা এই সরকারের তরফে এখনও দেখা যায় নি। সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বক্ষেত্রে এমন সীমাহীন নির্লজ্জ দলবাজী, দলপুষ্টি, দলতুষ্টি ও দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণের নির্মম প্রচেষ্টা, প্রকাশ ও প্রচার কেহ কখনও এতকাল দেখে নি। বিদ্যুৎ-ঘাটতি তুঙ্গে; দরিদ্র, কৃষক, মজদুর, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। রুজি রোজগার চ্যুত, হতোদ্যম, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, অবসন্ন, হৃতাশাময় মানুষ তাই ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ। বিদ্যুৎ-বিভ্রাট প্রায় সর্বত্র, ঘন ঘন লোড শেডিং হচ্ছে ফলে দেশবাসীর নাভিশ্বাস শুরু হয়ে গেছে।

গ্রামাঞ্চলে ভূমি সংস্কারের নামে দলের লোকদের দ্বারা জোর জবরদস্তি দ্বারা অপরের জমি দখল করিয়ে দেওয়া, অপরের জমির ফসল জোর করে কেটে পার্টি অফিসে জমা রাখা ও পরে তা বেআইনী ভাবে বাজেয়াপ্ত করা গায়ের জোরে ও পুলিসকে অন্যায় ও বেআইনীভাবে দূরে সরিয়ে রেখে দলের ক্যাডার দিয়ে অবিচার, অত্যাচার, অনাচার দুরাচার জুলুম ও জবরদস্তিভাবে মারধোর কোরে সকলকে দাবিয়ে রেখে, যথেচ্ছাচার চালু করে গ্রাম বাংলাকে সন্ত্রস্ত ভীত ও মৃতপ্রায় অবস্থায় নিয়ে আসা ও দল প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি বেআইনী ও অন্যায়ের পর অন্যায় কার্য্য যত্র তত্র চালিয়ে যাওয়া এটাই কি সরকার পরিচালনার একমাত্র মূখ্য কাজ? মানুষের ঘরে ঘরে অশান্তি ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের বাস্তুহারা করা কি সরকারের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কাজ? গণ-তন্ত্রের সমাধি রচনায় এ সরকারের এত ব্যস্ততা কেন? কি এর উদ্দেশ্য? মুখে গণতন্ত্রী আর কাজে বৈর তন্ত্রী এই সরকার কি চায়? সি, পি, এম, দল আর কত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে দেশের মানুষকে কেবলই বিভ্রান্ত করবে?

এটা সাধারণ মানুষ বেশ জোর গলায় বলতে আরম্ভ করেছে "এরা কবে বিদেয় হবে?" এর পরও সরকার চারিদিকে চক্রান্তের খোয়াব দেখছে না আতঙ্কে চক্রান্তের বুলি আওড়ে ক্যাডারদের স্লোক বাক্যে চাঙ্গা রাখছে? বামফ্রন্ট সরকার তথা সি, পি, এম সরকার নিজেদের জ্ঞাতসারে বিগত দুবছরের ব্যর্থ প্রশাসন পরিচালনার কথা সর্বসমক্ষে ঢাকা দেবার অত্যুগ্র বাসনায় অযথা চক্রান্তের ধুয়া তুলে বাঁচবার শেষ চেষ্টা চালাচ্ছে। সব জেনে শুনেই নিজেদের প্রশাসনিক ব্যর্থতা ঢাকতে চক্রান্তের মুহুমুহু বুলি কপচানই তাদের একটা হীন কায়দা— যা জনগণের বুঝতে আজ আর বাকি নেই। "চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না।"

বিবেকানন্দ বলে গেছেন এবং এর চেয়ে নিষ্ঠুর সত্য কথা আর কিছুই নেই—অন্ততঃ ভারতবর্ষে।

সি, পি, এম দলপতিরা এটা হয়তো জানেন না, না জেনে শুনে বোকা সেজে বসে আছেন আত্ম স্বার্থে ঘোর আচ্ছন্ন ও মগ্ন হয়ে। ঈশ্বর তাদের রক্ষা করুন। এই সরকারের নীতি ও কার্য্যক্রম বহু ক্ষেত্রেই সংবিধান বহির্ভূত ব্যাপারে পরিণতি লাভ করছে। যেমন মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের বিতাড়নের সময় পুলিসের সঙ্গে প্রায় ছ হাজার মাস্তানধারী ক্যাডারকে বেআইনীভাবে মরিচঝাঁপিতে প্রেরণ ও উদ্বাস্তুদের উপর নিপীড়ন, নির্য্যাতন, ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে নারী ও শিশুদের নিক্ষেপ করা, অহেতুক ভাঙা পেটা, কিল-চড়-লাথি মারা টেনেহিঁচড়ে জোর জবরদস্তি করে লঞ্চে তোলা, গায়ের জোরে অনিচ্ছুক সব উদ্বাস্তু পরিবারকে জোর করে লরিতে ওঠান ইত্যাদি লোমহর্ষক নৃশংস কার্য্যাবলি। চরম নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠার মাধ্যমে ঐ সব দণ্ডকপ্রত্যাগত মরিচঝাঁপিতে বসবাসকারী উদ্বাস্তু ভাই, বোন, শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন অসহায় মানুষের উপর সাম্প্রতিকালে সি.পি, এম সরকার ও সি. পি, এম দল যে নিদ্দয় পাষণ্ডোচিৎ, বর্বর, অমানুষিক মানবতাবিগর্হিত ও ভারতীয় সংবিধানবিরোধী নীচ ও হীন প্রচেষ্টায় উক্ত উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপি থেকে গায়ের জোরে উৎখাত করল তা নজির বিহীন এক চরম বর্বরতা আখ্যাত হয়ে ইতিহাসে স্থান পাবে। এর প্রতিক্রিয়া যে কি ভয়ঙ্কর মারাত্মক আকার ভবিষ্যতে ধারণ করবে তা কল্পনা করলে আতঙ্কে গা শিউরে ওঠে। মরিচঝাঁপির সম্বন্ধে উক্ত বিবরণ প্রায় অধিকাংশ সংবাদপত্রেই স্থান পেয়েছে এবং বিরোধী দল ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল একযোগে এর বিরুদ্ধে কমিশন বসাবার প্রস্তাব রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উত্থাপিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে বিরোধীদের এই সাধু প্রচেষ্টা প্রচুর জনসমর্থন লাভ করেছে এবং গণতন্ত্রে এই জন্যই বিরোধীদলের ও সরকার বিরোধী ব্যক্তিবর্গের ও অন্যান্য রাজনৈতিকদলের এত অধিক প্রয়োজন ও মর্য্যাদা। কিন্তু সি, পি, এম দল বিরোধীদের এই ন্যায় সঙ্গত, সংবিধান সম্মত, জনকল্যাণমূলক সত্যকার হিতব্রতী সাধু প্রচেষ্টাকে বানচাল করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে সং ও নিষ্ঠাবান বিরোধীপক্ষ, জনগণ, বিধান সভার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে তারস্বরে প্রচার শুরু করে দিয়েছে, কোথাও পথসভার মাধ্যমে, কোথাও দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে, কোথাও বা অন্যান্য উপায়ে। প্রচারের বক্তব্য কি? না বামফ্রন্ট সরকারকে গদীচ্যুত করার জন্য কায়েমী স্বার্থবাদীরা জোটবদ্ধ হয়ে সি, পি, এম তথা বামফ্রন্ট সরকারের উচ্ছেদের জন্য সবাই মিলে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছে। একবারও সি, পি, এম, দল ও সরকার ভাবছেন। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের উপর পুলিস ও দলীয় কর্মীরা যে নৃশংস অত্যাচার করল তা হিটলারের ইহুদী নিধন যজ্ঞের চেয়েও হীনতর পন্থায় সংঘটিত হলো—যা ইতিহাস কোনদিনও ক্ষমা করবে না, আর এ কাজ যে সংবিধানবহির্ভূত তা কমিশন বসালেই উক্ত উদ্বাস্তুদের সাক্ষ্যদাবুদের দ্বারা প্রমাণিত হবে। সংবাদপত্রও অতিরঞ্জিত করে সংবাদ পরিবেশন করে নি আর পুলিসও সরকারের বিনা হুকুমে এই নৃশংস ও অমানবিক অত্যাচার চালায় নি। সরকারের সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে ও হৃদয়হীন হুকুমে উক্ত জঘন্য কার্য্য মরিচঝাঁপিতে নির্মমভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ।

(চলবে)

RgedNo. R. N .24511/71 | Biplabi Bangla Phone : 34-1795 | Regd. WB/NC 77

বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

ক্ষীরোদ কুমার দত্ত প্রণীত

বিপ্লবী পুস্তকমালা

১। [illegible] —১'৫০

২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮'০০

৩। অনুশীলন সমিতির পি. মিত্তির—২'০০

৪। সোহাগী সংগ্রাম কাহিনী—১'০০

৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১'২৫

৬। কলতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—'৪০

৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—'৬০

৮। স্বাধীনতার শহীদ মা ও মেয়ে—'৪০

৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—'৬০

১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—'৪০

১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—'৪০

১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—'১৫

১৩। দেশ যাদের ডোবেনি (১)—১'০০

১৪। দেশ যাদের ডোবেনি (২)—২'০০

১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—'৫০

১৬। ১৩ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১'০০

১৭। হাডিঞ্জ হত্যা প্রচেষ্টা—'১৫

১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—১'০০

১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—'৪০

২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১'৫০

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাস—৩'০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার—২'০০

1 AUG 1979

প্রাপ্তিস্থান :—৪নং বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

শৈলশ্রী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

— সম্পাদক মণ্ডলী —

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীভূদেবচন্দ্র নন্দী, শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী।

সম্পাদক—শ্রীশান্তি শরণ রায়চৌধুরী

বিপ্লবীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীধীরেন ঘোষ। বেতালা—শ্রীব্রজগোপাল পাল।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। কার্যকর সচিব—শ্রীসুধেন্দু সোম।

বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

বিপ্লবী

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাজাতী' সমকালেবারে—১৯৭৮

অষ্টম বর্ষ.	শনিবার ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৮৬ ৪ঠা আগাষ্ট, ১৯৭৯	৪২ সংখ্যা

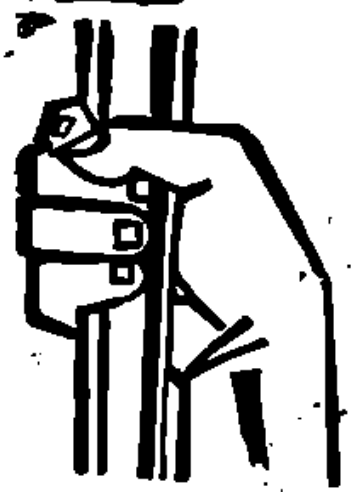

SEVEN SINS

Politics Without Principle,

Wealth Without Work,

Pleasure Without Conscience,

Knowledge Without Character,

Commerce Without Morality,

Science Without Humanity,

Worship Without Sacrifice.

—MAHATMA GANDHI, 192

সম্পাদকীয়—

যেতে নাহি দিব

দীর্ঘ পঞ্চকাল ধরে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা নিয়ে যে নাটকের অভিনয় চলছিল, সৌভাগ্যক্রমে তাঁর যবনিকাপাত ঘটেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃশ্যে অবতীর্ণ হয়ে নাটকের অভিনেতারা নিজেদের ও দলের যে স্বাক্ষর রেখেছেন, তাতে না দলের, না নিজেদের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন নীতির বা আদর্শের বালাই নেই, ছিল শুধু ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খার নির্লজ্জ প্রকাশ। এটা শুধু ক্ষমতাকাঙ্খী দলগুলির সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়, এটা ব্যাপকভাবে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সুবিধাবাদই একমাত্র মূলধন ছিল সবারই। সকাল সন্ধ্যায় মত বদল করেছেন অনেকেই। অবশ্য এই মতি ও আনুগত্য পরিবর্তনের কারণ হিসাবে কেউ কেউ বলেছেন নগদ প্রাপ্তিযোগ বিশেষভাবে ক্রিয়াবান ছিল। একথা বলতে কোন দ্বিধা নেই, দেশের স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত এবং দলগত স্বার্থই প্রাধান্য পেয়েছিল সর্বত্র। দেশে ও বিদেশে ভারতবর্ষের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়েছে বিশেষভাবে। আরো যে একটি গুরুতর প্রশ্ন জেগেছে চিন্তাশীল মানুষদের মনে, সেটা হল ভারতবর্ষের মানুষ গণতন্ত্রের যোগ্য মর্যাদা দিতে জানেনা। এ প্রশ্নও জেগেছে এখানে কি গণতন্ত্র অচল হয়ে যাবে। ভারতের রাষ্ট্রপতিকেও বিষম সঙ্কটে পড়তে হয়েছিল যথাকর্তব্য নির্দ্ধারণ করতে। কাজটা অত্যন্ত দুরুহ ছিল, তাঁকে বহুদিক ভেবে ও চিন্তা করে কাজ করতে হয়েছে। একদল চমকপ্রদ খবর প্রদানকারী সংবাদপত্রসেবী তো তাঁর গুঢ় উদ্দেশ্য, এমন কি ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা পূরণের মানসিকতার অস্তিত্ব খুঁজে বের করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে দ্বিধা করেন নি। শেষ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রপতি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তাকে অগণতান্ত্রিক বা অসাংবিধানিক বলে অভিহিত করার কোন যুক্তি দেখা যায় না। যেভাবে দুই প্রতিদ্বন্দী লজ্জা, ঘৃণা, আদর্শত্যাগ করে, একটা জোড়াতালি দেওয়া সরকার গঠন করতে প্রয়াসী ছিলেন প্রধান মন্ত্রীর পদ দখল করবার বাসনায়, সেটা রীতিমত লজ্জাকর। এই পরিস্থিতিকে আরো ঘোরালো করে তুলেছিলেন সমর্থক দলগুলি। তাঁরাও কোন ন্যায়নীতি ও আদর্শের ধার ধারেন নি। কে কিভাবে ঘোলাজলে সব থেকে বেশী ফয়দা তুলতে পারবেন, এটাই ছিল তাদের লক্ষ্য। অবশ্য এত ছোট ছোট দলকে ভোট দিয়েছে দেশের মানুষ, যে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতালাভ করে কোন কাজ করার পথে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল। সুস্থ গণতান্ত্রিক কাঠামোতে দুই বা তিনটী দলের অস্তিত্ব থাকলে এই রকম অস্থির পরিবেশের সৃষ্টি হতে বাধ্য। আমরা বারবার এবিষয়ে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। জন্মনিয়ন্ত্রণের মত দলনিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন আজ অনস্বীকার্য্য হয়ে পড়েছে। জনগণ যদি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করেন এবং বিচার বিশ্লেষণে পরিণত বুদ্ধির

পরিচয় না দিতে পারেন, তবে তাদের ভাগ্য নিয়ে সুবিধাবাদীরা চিরদিনই এইভাবে জুয়া খেলবে, নিজেদের আখের গুছিয়ে নেবে, জনস্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে। এ কাজ যদি দেশের মানুষ না করতে পারেন সুষ্ঠুভাবে, তবে গণতান্ত্রিক অধিকার দাবী করার তাদের যোগ্যতা থাকতে পারে না। এ সত্য আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এটা ছিল আগামী দিনের কর্তব্য। বর্তমান অবস্থায় সব দল ও দলনেতাদেরও বিশেষ কর্তব্য আছে। অবশ্য শ্রীচরণ সিং-এর জীবনের সর্বোচ্চ আশা পূরণ হয়েছে প্রধান মন্ত্রীর পদলাভ করে। কিন্তু লাভ করার পর, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সফলতালাভ করার কাজটা বর্তমান অবস্থায় খুবই কঠিন। তার চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ মোটেই নয়। অতীতের ভুলত্রুটীকে সংশোধন করে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি পথপরিক্রমা না করেন, তবে আবারো ব্যর্থতা অনিবার্য। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ চরিতার্থ করার মানসিকতাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে। রাজনীতিবিদ্‌রা কেউই ধোয়া তুলসী পাতা নন। প্রত্যেকেরই দোষত্রুটী আছে। তাই বলে নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য, সব কাজ ভুলে যে শুধু ভিন্নমতাবলম্বীদের জব্দ করার মানসিকতাকে বর্জন করা দরকার সম্পূর্ণভাবে, এই নীতি যে কত ভ্রান্ত, আজ আর বলে বোঝাবার কোন প্রয়োজন নেই। এই বিরাট দেশে ভিন্নমত পোষণকারী ও ভিন্নপথ ধরে চলার সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করা সম্ভব হবে না। ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য ছিল, সেই গৌরবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবে দেশের স্বার্থ বিরোধী কাজ করলে কারো ক্ষমা নেই। এই নীতিকেই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে রূপায়িত করতে হবে সকলের স্বার্থে। অন্যথায় কোন পরিত্রাণের পথ দেখতে পাওয়া যায় না। এইত গেল ক্ষমতাসীনদলের কথা।

বিরোধী দলগুলিরও কর্তব্য আছে। তাদেরও দেখতে হবে যে নিছক গোষ্ঠী বা দলের স্বার্থসাধন করাটাই একমাত্র লক্ষ্য না হয়। দেশের ও দশের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হওয়াই তাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। প্রতিযোগিতা শুধু ক্ষমতা দখলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না ক'রে দেশের মানুষের কল্যাণ সাধনের মধ্যে সব শক্তি, সামর্থ, বিচার, বুদ্ধি নিয়োজিত করা উচিৎ। শাসকদলের যে কোন প্রকারে বিরোধিতা করাটাই একমাত্র কাজ নয়। যেটুকু তাদের পূর্বগামী সরকার পারেন নি, সেটুকু সুসম্পন্ন করে, দেশের আরো সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করার কর্মসূচীই গ্রহণ করা উচিৎ। যে যাই করুন সেটা যদি দেশের পক্ষে কল্যাণপ্রদ না হয়, তবে এই অস্থিরতা চলতেই থাকবে এবং কারো কোন ভবিষ্যত থাকবে না।

শ্রীচরণ সিং-এর বহুদিনের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। তবে তাঁর পায়ের তলায় কোন দৃঢ়ভিত্তি নেই। বহু মানুষ স্বার্থান্ধ হয়ে তাঁকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসবেন যতদিন তাঁরা বুঝবেন, তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকবে। আবার অন্যত্র বেশী সুযোগ পাবার সম্ভাবনা থাকলে, তাঁর বিরোধিতা করতে পশ্চাৎপদ হবেন না। প্রকৃত শত্রু মিত্রকে চিনতে হবে তাঁকে, সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগী আদর্শনিষ্ঠ, দেশপ্রেমিকদের একত্র সংগঠিত করে, দেশ সেবার কাজে আত্মনিবেদন করতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতি ও রাজনীতিবিদদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রমাণিত হবে যে এরা আর যাই হোক, বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই নতুন নির্বাচনের জন্য তৈরী হতে হবে। তখন বাছাই করে এমন একটি দল স্থাপন করতে হবে, যাদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হবে নিপীড়িত, বঞ্চিত দেশবাসীদের জন্য একটি কল্যাণরাষ্ট্র গঠন করা। এই কাজে হয়ত অনেক পুরানো বন্ধুকে ত্যাগ করতে হবে। নতুন বন্ধুকে স্বাগত জানাতে হবে। আর একটি কাজ যদি করে যেতে পারেন যার মাধ্যমে সুবিধাবাদী রাজনীতির সমাধি রচনা করা যাবে। সেটা হল, দলত্যাগীদের ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে চিরদিনের মত নির্বাসিত করা। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে যদি এইকাজ সম্পূর্ণ সমাধা নাও করতে পারেন, তবুও এই পরিবেশের একটি দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে যেতে পারেন, তবে দেশের ইতিহাসে তাঁর নাম সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। দেশ চায় খাঁটি দেশপ্রেমিক, দেশ প্রেমের মুখোসধারী সুবিধাবাদী নয়। শ্রীচরণ সিংকে মনে রাখতে হবে যেভাবে বিভিন্নগোষ্ঠী ও দল নিয়ে তিনি ক্ষমতাসীন হয়েছেন, তাদের উপর কোন নির্ভরযোগ্য ভরসা রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাঁকে চিরস্থায়ী কোন ভাল কাজ করতে হলে, নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন রক্ত ও নতুন মুখের আমদানী করতে হবেই। অন্যথায় বিকলতা অনিবার্য্য। রাজনৈতিক পালাবদলের প্রতিশ্রুতি যদি এই নব দিগন্ত সৃষ্টি করতে পারে, তবে দেশের মানুষ তাকে স্বাগত জানাবে আনন্দের সঙ্গে। শ্রীচরণ সিং-এর সামনে উত্থান ও পতন, দুইয়েরই পথ খোলা আছে। তাঁকে একটি বেছে নিতে হবে।

পরলোকে বিপ্লবী যাদব চৌধুরী

বিপ্লবী যাদব চৌধুরী বিগত ৫ই জুলাই ক্যান্সার হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বহতেই তিনি লিভার ক্যানসার রোগে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বৎসর। তাঁর স্ত্রী ও তিন পুত্র বিদ্যমান।

ফরিদপুর জেলায় ছিল তাঁর বাস। ছাত্র জীবনেই তিনি বিপ্লবী অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। পরবর্তীকালে তিনি বিপ্লবী ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হয়ে কারাবরণ করেন, নিরহংকার, অমায়িক, বন্ধুবৎসল এই বিপ্লবীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং শোকসন্তপ্ত আত্মীয়বর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

সমাধান কোন পথ ?

॥ মলয় ঘোষ ॥

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সম্প্রতি আংশিকভাবে সম্পন্ন হলো। একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাত থেকে রাষ্ট্রপতির সনদবলে শাসনক্ষমতা অধিকার করলেন একটি সংখ্যালঘু সরকার—যার স্থায়িত্ব ও ভাগ্য নির্ভর করছে আসন্ন আস্থাভোটের উপর। পটপরিবর্তনের পটভূমিকায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলি কে কি ভূমিকা নিয়েছিল, তা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য।

নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী চরণ সিং-এর অধীনস্থ জনতা (এস) দল—অন্যান্য কয়েকটি দলের সক্রিয় সমর্থনে ক্ষমতায় আসে। দেশের অন্যতম বৃহত্তম দল কংগ্রেস (ই) এই দলটিকে ধর্মনিরপেক্ষতা, সংখ্যালঘু তথা হরিজনদের নিরাপত্তাদান প্রভৃতি কয়েকটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় শর্তে সমর্থন জানায়। কংগ্রেস (এস) দলের নেতৃত্ব চরণ সিং মন্ত্রীসভায় অনুপ্রবেশ করে। এছাড়া সি, পি, আই, আন্না ডি, এম. কে, সোস্যালিষ্ট প্রভৃতি দলগুলিও এই সরকারকে সমর্থন জানায়। বামজোটের দলগুলি যথা সি, পি, এম, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর, এস, পি ও পি ডব্লিউ পি তাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখে এই যুক্তিতে যে, পূর্বতন জনতা দল, সাম্প্রদায়িকতাকামী জনসংঘ ও আর এস এস প্রভাবিত। অন্যদিকে চরণ সিং-এর জনতা (এস) দলও কংগ্রেস (আই) এর সমর্থনপুষ্ট। অবশ্য সি, পি, এম দল সাময়িকভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে নরম মনোভাব দেখায় কিন্তু শ্রীমতি গান্ধীকে লেখা চরণ সিং-এর একটি পত্র জনসমক্ষে প্রকাশিত হওয়ার ফলে নিজেদের বামপন্থী ভাবমূর্তি বজায় রাখতে তারা নিরপেক্ষ থাকারই সিদ্ধান্ত নেয়। পক্ষান্তরে সি, পি, আই দল জনসংঘের সাম্প্রদায়িক জঙ্গী মনোভাবের কাছে আত্মসমর্পণ অপেক্ষা ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থনপুষ্ট দলকেই সমর্থন জানায়—যেহেতু দ্বিতীয় দলটি তাদের মতে প্রথমটি অপেক্ষা কম বিপজ্জনক। নবীন মন্ত্রীসভাগঠনে অন্যান্য দলগুলি নিজ নিজ শক্তির ভিত্তিতে সরকারে অংশ গ্রহণের দাবী জানালেও কংগ্রেস (আই) দল এই কোয়ালিশন সরকারে না গিয়ে বাইরে থেকে সমর্থন জানাবে বলে ঘোষণা করে।

সাম্প্রতিক এই রাজনৈতিক ডামাডোলে কয়েকটি বিষয় মানুষের কাছে খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে গেছে। সেগুলি হল, প্রথমতঃ ভারতের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার আশেপাশে প্রতিপত্তিশালী যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের অথবা প্রধান দলগুলির অধিকাংশেরই অত্যধিক ক্ষমতালিপ্সা। এই ক্ষমতার লোভ মানুষ দেখেছে কিষাণ নেতা চরণ সিং-এর মধ্যে, দেখেছে কট্টর ইন্দিরাবিরোধী মহান কংগ্রেসী ঐতিহ্যবান, অথবা গোঁড়া নীতিবাদি দৃঢ় মনোভঙ্গীসম্পন্নরূপে সুখ্যাত মোরারজীভাইয়ের মধ্যেও। যে চরণ সিং শ্রীমতি

গান্ধীকে তিহার জেলে পাঠিয়েছিলেন, মোরারজী সরকারকে একটি নপুংসক সরকার বলে অভিহিত করেছিলেন শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লোভে সেই চরণ সিং-এর দ্বিধা হয়নি শ্রীমতি গান্ধীরই সমর্থন ভিক্ষার। যে চ্যবন আদিঅন্ত কংগ্রেস ও কংগ্রেস (ই) এর ঐক্য প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন, কেবল শ্রীমতি গান্ধীর অনুহাতে—নিজেদের সর্বসমক্ষে পরিচিত করেছেন কট্টর ইন্দিরাবিরোধী রূপে, তাঁর বিন্দুমাত্র বাধেনি সেই দলেরই সমর্থনপুষ্ট একটি সরকারে উপপ্রধান মন্ত্রীর লোভনীয় পদটি অধিকার করতে – এছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিও তাঁর দল দখল করেছেন। এমনকি স্বয়ং মোরারজী দেশাইও রাষ্ট্রপতির দেওয়া অন্তিম সময়ের মধ্যে নিজের দলের প্রতি সমর্থন চেয়ে দূত পাঠিয়েছিলেন বিশ্ববন্ধু গুপ্তকে—এই শ্রীমতি গান্ধীরই কাছে। মূল দলগুলি ব্যতিরেকে অন্যান্য দলগুলিও প্রায় অনুরূপ আচরণ করে গেছে, যাদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের আন্না ডি এম কে চরণ সরকারের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে শ্রীমতি গান্ধীরই অনুরোধে।

এই বেলার মধ্য দিয়ে আরও একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেছে যে দীর্ঘ দিন ধরে অসংখ্য মামলা সাজিয়ে, বিশেষ আদালত বসিয়ে এবং 'সঞ্জয়' নামের দোহাই দিয়েও 'ইন্দিরা গান্ধী' নাম্নী মহিলাটিকে ভারতীয় রাজনীতি থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া তো যায়ই নি বরং এসব কলংকের (!) বোঝা নিয়েও তাঁর জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই গেছে। বরং বলা যায়, যতো তাঁর নামে নিন্দা রটেছে, তাঁর জনপ্রিয়তাও বেড়েছে প্রায় সমহারে। তার প্রমাণ সম্প্রতিকালে বিহারের বেলচীতে ও পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলি পরিদর্শনে এলে এই সাধারণ মহিলাটির কাছে অসংখ্য অতিসাধারণ মানুষের ভিড়। যারা কেঁদেছে, নিজেদের দুঃখ জানিয়েছে, প্রতিকার চেয়েছে। যারা রাজাকে রাজা করে—আর যাদের হাতেই প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার কলকাঠি। পূর্বতন জনতা শাসনে যতো সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বেড়েছে, হরিজন নিধন ঘটেছে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে, অবনতি হয়েছে দেশের অর্থনীতির—মানুষ ততোই বেশী করে চিন্তা করেছে আগের সময়ের কথা, তুলনা করেছে মনে মনে। যে জরুরী অবস্থাকে 'এক ভয়ংকর অন্ধকারময় দিনগুলি' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, মানুষ সেই দিনগুলিই বরং অধিকতর কাম্যছিল বলে মনে করেছে। অন্যদিকে দেশের বামপন্থী দলগুলি যে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলে—যার হাতিয়ার সাধারণ মানুষ—দরিদ্র, নিরক্ষর আর পিছিয়ে পড়া বঞ্চিত জনসাধারণ—তারও একটা বিশাল অংশ আজও রয়েছে শ্রীমতী গান্ধীর পেছনেই, তাঁকে নিজেদের মুক্তিদাত্রী হিসাবে মনে করে। এ সত্য অনেকের কাছে অরুচিকর হলেও সত্য। অতএব জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটনের ক্ষেত্রেও অন্ততঃ এখনও পর্যন্ত জনসমর্থনের জন্য শ্রীমতী গান্ধীর ওপরেই নির্ভর করতে হবে।

এই পরিস্থিতিতে শ্রীমতি গান্ধীর ইন্দিরা কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে অথবা এই দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে কেন্দ্রে একটি স্থিতিশীল সরকার গড়ে তোলা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়—যেহেতু জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণেরই সরকার দেশে সংহতি ও নিরাপত্তা আনতে পারে। তাই চরণ সিং নেতৃত্বাধীন বর্তমান সংখ্যালঘু সরকারের আয়ুকাল কতো দিন এসম্পর্কে জনসাধারণের মনে ও রাজনৈতিক

মহলে ইতিমধ্যেই সংশয় দেখা দিয়েছে। (প্রসঙ্গত: স্বাধীনতা পরবর্তী কংগ্রেসী শাসনের সময়কালকে মুক্তপক্ষে ২৮ বছর ও মোরারজী দেশাই নেতৃত্বাধীন জনতার শাসনকালকে ২৮ মাস ধরে হিসাব করলে বর্তমান মন্ত্রিসভার আয়ুষ্কাল ২৮ দিন—এটাই অন্তত. গাণিতিক নিয়মানুসারে অনুমান করা যায়। রাষ্ট্রপতির কথানুসারে গণতান্ত্রিক নীতি রক্ষার্থে চরণ সিং যদি আস্থা ভোট ডাকেন—তবে তাঁর সরকারের জয়লাভ সম্পর্কে আশাত্মক সম্ভাবনাই পরিলক্ষমান। অন্যদিকে, আস্থাভোট না ডাকলেও তাঁকে বিরোধী দলগুলি মূলত. জনতা সংসদীয় দলের অনাস্থা প্রস্তাবের মুখোমুখী হতে হবে—যার ফলাফলও তাঁর পক্ষে বিশেষ সুখকর হবে না বলেই মনে হয়।

এমতাবস্থায় এই অচল পরিস্থিতির একমাত্র দাওয়াই—মধ্যবর্তী নির্বাচন—যার দ্বারা একটি সুদৃঢ় ও আস্থাভাজন কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে তোলা সম্ভব। যতোদিন না নির্বাচন হয়, একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসাবে রাষ্ট্রপতির পরিকল্পিত 'জাতীয় কমিটি' সরকার পরিচালনা করতে পারে লোকসভা ও রাজ্যসভার প্রতিটি দলের সক্রিয় সহযোগিতা ও পরামর্শে। জোড়াতালি দেওয়া নড়বড়ে একটি সংখ্যালঘু সরকারের হাতে দেশের কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতা বেশিদিন ন্যস্ত থাকলে, তা রাজ্যে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও যথেচ্ছাচারের সৃষ্টি করবে যা সামগ্রিকভাবে এই বিশাল দেশের সংহতিকেও বিপন্ন করে তুলবে।

———

মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী স্মৃতিরক্ষা কমিটি

৩২/৮, চণ্ডীঘোষ রোড, কলিকাতা—৪০

মহাশয়,

আগামী ৯ই আগষ্ট ১৯৭৯ বৃহস্পতিবার সকাল ৯ ঘটিকায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর নবম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইবে। প্রবীণ অধ্যাপক ত্রিপুরা শঙ্কর সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের পৌরহিত্যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হইবে। বিপ্লব সাধনার সার্থক প্রতীক মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সমাধিতে এই স্মরণীয় দিনে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করিতে আপনাকে সবিনয় অনুরোধ করিতেছি। অনুষ্ঠানে সময়োচিত স্বদেশী সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকিবে! ইতি—

নিবেদক—

১২ই জুলাই, ২৯৭৯

স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষে

দীনেশচন্দ্র ঘটক, সম্পাদক।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

স্থির চূড়ান্ত ব্যবস্থা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তার এই ভাষণটিকে আমি তাঁর বাগ্মিতার শ্রেষ্ঠ অবদান বলে মনে করি। শ্রেষ্ঠ বাগ্মিতাপূর্ণ একাধিক বক্তৃতা শুনবার সুযোগ যিনি পেয়েছেন তার কাছে এই ভাষণটি তার মধ্যে একটি। প্রকৃতপক্ষে মাত্র অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই যা ঘটে গেছে তা বিবেচনা করলে এই ভাষণটিকে মৃত্যুকালীন রাজহংসের শেষ সঙ্গীতের মত তাঁর জীবনের শেষ মহান সঙ্গীত বলা যায়। এই ভাষণটি সভায় পাঠ করার সম্মান আমাকে দেওয়া হয়, কারণ বন্ধুবর এতটা দুর্বল ছিলেন যে তা পাঠ করার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। তিনি বাস্তবিক পক্ষে পায়ে ভর করে দাঁড়াতেই পারতেন না। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর চিকিৎসকগণ-সহ তাঁকে একখানা চলৎশক্তিহীন রোগীর চেয়ারে করে সভাস্থলে নিয়ে আসা হল। জনতা দাঁড়িয়ে উঠে বিপুল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালো। জনতার সেই সম্বর্ধনার দৃশ্য দেখে মনে হল যেন মৃত্যুর জগৎ থেকে জেগে ওঠা ব্যক্তিকে অভিবাদন জানান হচ্ছে। কয়েক মাসের মধ্যে জন-সাধারণ আনন্দমোহন বসু সম্পর্কে, তাঁর রোগের দিন দিন অবনতি ও দ্রুত শেষ পরিণতির দিকে তাঁকে টেনে নিয়ে যাওয়ার খবর ছাড়া আর কিছু জানতে পারেনি।

সম্বর্ধনার সোরগোল থেমে গেলে মঞ্চের ওপরে আসন ছেড়ে দাঁড়ালেন স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি। তিনি বাংলা ভাষায় এক হৃদয়গ্রাহী ও বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণে দৃঢ়ভাবে দেশবিভাগকে নিন্দা করে আনন্দ মোহন বোসকে সভাপতিত্বে বরণ করার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। হর্ষধ্বনির মধ্যে সে প্রস্তাব গৃহীত হল। একটি রাজনৈতিক সভায় স্যার গুরুদাস ব্যানার্জির আবির্ভাব এবং সেখানে একজন বক্তার ভূমিকা গ্রহণ করা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনায় কর্তৃপক্ষের চোখ খুলে যাওয়া উচিত। দেশ বিভাগের প্রতিবাদে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে সে আন্দোলনের পেছনে দেশবাসীর যে কত গভীর অনুভূতি রয়েছে স্যার গুরুদাসের আবির্ভাবে সে তাৎপর্য্যই প্রকট হয়ে উঠেছে। কোন বিচারক রাজনীতির মধ্যে যাবেন না। স্যার গুরুদাসের মতে একজন প্রাক্তন বিচারকেরও রাজনীতির মধ্যে যাওয়া উচিত নয়। স্যার গুরুদাসের এই অভিমত আমরা গ্রহণ করতেও পারি, নাও করতে পারি। তবে কোন কোন বিচক্ষণ ভারতীয় বিচারক অন্য মত পোষণ করেন এবং তাঁরা অবসর গ্রহণের পরে সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু স্যার গুরুদাস সে মত পোষণ করেননি। তিনি তার মতে দৃঢ় ছিলেন, এবং তার সেই শান্ত অথচ দৃঢ় সঙ্কল্পই তার ব্যক্তিত্বকে একটা বিশিষ্টতা দান করেছে। কিন্তু এই ঘটনায় সম্ভবতঃ তিনিও সেই সর্ব ব্যাপক অদম্য স্বদেশানুভূতির প্রভাবের কাছে হার মেনেছেন যে স্বদেশানুভূতি আমাদের গৃহাঙ্গনের হেঁসেলে পর্য্যন্ত বিস্তার

লাভ করেছে এবং যুবা-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই হৃদয়-মন অধিকার করে ফেলেছে। সকলেই তীব্রভাবে দেশ বিভাগের প্রতিবাদ করেছে। কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক লোক নিরপেক্ষতার ভান করে; আর সরকারী চাকুরী প্রার্থীরা ও চাটুকাররা খুসীর ভাব দেখায়।

সভার সভাপতির নাম প্রস্তাবের পরে আমি তাঁর ভাষণ পাঠ করি। আমার মনে হয় উপস্থিত সেই বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেই আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন। কারণ, পরে আমাকে বলা হয়েছিল যে আমার সেই ভাষণ পাঠ আনন্দমোহন বোসের বাড়ী থেকেও শোনা গিয়েছিল। তাঁর বাড়ী ছিল রাস্তার বিপরীত দিকে। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে একজন শিখ পুরোহিত ছিলেন—নাম বাবা কাউর সিং। তিনি গুরু নানকের বংশের লোক, উচ্চ সামাজিক মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি অনুষ্ঠানের মঙ্গলাচরণ করলেন। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের ঠিক পূর্বক্ষণে স্যার আশুতোষ চৌধুরী ইংরেজীতে রচিত নিম্নলিখিত ঘোষণা বাণী পাঠ করলেন। পরে ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বাংলা অনুবাদ সকলকে জানিয়ে দেন।

'যেহেতু সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রতিবাদ সত্ত্বেও গভর্ণমেন্ট বাংলাদেশকে ভাগ করার সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা যুক্তি সঙ্গত বলে মনে করছেন, সেই হেতু আমরা এতদ্বারা প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ হচ্ছি ও ঘোষণা করছি যে জাতি হিসাবে আমরা আমাদের প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করার কুফলকে সাধ্যমত সর্ব প্রকারে প্রতিরোধ করব এবং আমাদের জাতির অখণ্ডতা রক্ষা করব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।—এ, এম, বোস'

সভার অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার ঠিক পূর্বক্ষণে 'বেঙ্গলী' অফিসে বসে এই ঘোষণা বাণী সম্পর্কীয় যাবতীয় কাজ-কর্ম স্থির করা হয়। সেখান থেকে আমরা ফেডারেশনের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে যাই। পরবর্তীকালে এ রকম একটা কথা উঠেছিল যে আমাদের কোন ঘোষণা বাণী প্রচার করার অধিকার নেই। সে কাজের অধিকারী হচ্ছে কেবলমাত্র শাসন কর্তৃপক্ষ। এই প্রশ্নের আইনগত দিক সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারি না। তবে এটা ঠিক যে সে প্রশ্ন সে সময়ে আমাদের কোন অসুবিধার মধ্যে ফেলেনি। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে অবিভাজ্য ঐক্যের সম্পর্ক রয়েছে তারই স্মৃতিকে চির জাগরূক রাখার জন্য যে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে তার উপযুক্ত পরিসমাপ্তি-রূপে আমরা এই ঘোষণা বাণীটি প্রচার করি। দেশ বিভাগের অশুভ প্রভাবকে প্রতিরোধ করার জন্য এবং জাতির অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য আমরা যে সঙ্কল্প-বদ্ধ হয়েছি হলঘরটি হল তারই জীবন্ত প্রতীক। আমরা অনুভব করেছিলাম যে একটা বড় ঘটনাকে উপলক্ষ করেই এক সুস্পষ্ট এবং দৃঢ় বিবৃতি প্রকাশ করে বিষয়টি সাধারণের গোচরীভূত করা উচিত।

হলঘর নির্মাণের জন্য অতঃপর আমরা ফেডারেশনের জমিটা কিনে নিলাম। তবে এই স্মৃতি রক্ষা ব্যবস্থার আর প্রয়োজন থাকেনি। কারণ সীমান্তের নিকটবর্তী কিছু অঞ্চল ছাড়া বাংলা ভাষা-ভাষী জনগণ দেশবিভাগ ব্যবস্থার সংশোধনের ফলে পুনর্মিলিত হয়েছে। যে স্মৃতি মন্দিরের কাজ ছিল আমাদের প্রদেশের বিচ্ছিন্নতাকে এবং সেই বিচ্ছিন্নতাকে বিদূরিত করার জন্য পুনর্মিলন সাধনের কর্তব্যকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া, তা যে কেবলমাত্র অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে তা নয় তা এখন একটা তীব্র সংঘর্ষের স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখার ফলে বেদনা-

দায়ক হতে পারে। সে স্মৃতিকে এখন বিস্মৃতির যবনিকার আড়ালে চলে যেতে দেওয়া ভাল।

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে আনন্দমোহন বোসকে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাস্তার ওপারে তাঁর নিজ বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হল। শ্রম ও কষ্ট স্বীকারের জন্য তাঁর স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয়নি। তাঁর অদম্য মনোবল ও মহান প্রেরণা তাঁকে রোগের মধ্যেও যেমন স্থির রেখেছে সভার অনুষ্ঠানের মধ্যেও তাঁকে সেই ভাবে শক্তি জুগিয়েছে। তবে সভার নৈতিক পরিবেশ এবং উপস্থিত বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীর স্বদেশ প্রেমোদ্দীপ্ত দৃঢ় মনোভাব ও উৎসাহের জ্বালাময় আবেগের মধ্যেও এমন কিছু ছিল যা তাঁকে কষ্ট ও ও শ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করেছে। তাঁর আত্মীয় স্বজনগণ খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পরে যখন তারা দেখলেন যে তাদের এই মহা-প্রাণ আত্মীয় কঠিন সামলে উঠেছেন এবং সময়োপযোগী মর্য্যাদা ও বাগ্মীতা সহকারে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন, তখন তারা খুব আনন্দিত হলেন। শরীরের যে রকম অবস্থা নিয়ে তিনি সে কার্য্য সম্পাদন করেছেন তা তাঁর সেই রুগ্ন শরীরের পক্ষে একটা চরম পরীক্ষাই বলতে হয়।

সমস্ত অনুষ্ঠান পর্বের পরে সেই বিশাল জনতা খালি পায়ে রাস্তা দিয়ে ঘুরে ফিরে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় ২ মাইল দূরে রায় পশুপতিনাথ বোসের বাড়ীতে গিয়ে সমবেত হল। আগে থেকেই একটা সিদ্ধান্ত হয়ে ছিল যে তাঁর প্রাসাদোপম বাড়ীর সামনের জমিতে মিলিত হয়ে দেশীয় শিল্পের সাহায্যের জন্য গঠিত জাতীয় অর্থ ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহ করা হবে। সেই উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা আগেই করে রাখা হয়েছিল। স্যার আশুতোষ চৌধুরী, মিঃ জে. চৌধুরী, মিঃ অম্বিকাচরণ মজুমদার, আমি নিজে এবং আরও কয়েকজন মিলিত হয়ে দলবদ্ধ ভাবে খালি পায়ে সেই কাঁকরময় তপ্ত রাস্তা দিয়ে হেঁটে সেখানে গেলাম। সেখানে পৌঁছে গিয়ে দেখলাম জায়গাটায় ক্রমবর্ধমান বিশাল জনতা ঠাসাঠাসি করে অবস্থান করছে। পথ করে এগিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। সকলে হুড়োহুড়ি করে আমার পায়ের ধুলো নেওয়ার জন্য ছুটে আসছে। সেখানকার সেই দৃশ্য সম্পর্কে একটি দৈনিক সংবাদপত্র যে বিবরণ দিয়েছিল, তা থেকেই সে অবস্থার কথা ভালভাবে বোঝা যাবে।

'এই সময় তাঁর বন্ধুরা এসে তাঁর চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁকে জনতার ধাক্কাধাক্কির চাপ থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করেন। কিন্তু জনতা হতাশ হয়ে আর্তস্বরে বলতে থাকে যে আমরা বাবু সুরেন্দ্রনাথকে দেখার জন্য ও তাঁর আশীর্বাদ লাভের জন্য সারাদিন কিছুই না খেয়ে বহু দূর পথ পর্যটন করে এখানে এসেছি। এইভাবে তিনি যখন সভাস্থল ছেড়ে চলে আসার সময় রাস্তায় এসে দাঁড়ান, তখনও জনতা চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ধরে। আলিপুর কোর্টের প্রবীণ সরকারী উকিল বাবু দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সে সময় ঘটনাক্রমে তাঁর গাড়ীতে সেখানে ছিলেন। তিনি তখন তাঁকে জনতার চাপ থেকে বাঁচান।'

সেই দিনই অল্প কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ৭০,০০০ টাকা সংগৃহীত হয়। অল্প অল্প করে দেওয়া চাঁদায়ই এই টাকাটা উঠেছিল। আর এই দান হচ্ছে বাংলার মহান মধ্যবিত্ত সমাজের লোকদের। রাজা মহারাজারাও অবশ্য দিয়েছেন। কিন্তু তার পরিমাণ সামান্য। এই টাকা তোলার জন্য কোন রকম ক্যানভাস করতে হয়নি। এই দান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

সাময়িক ভাবাবেগের বশেই লোক টাকা দিয়েছে। তাঁত ও অন্যান্য গৃহ শিল্পের উন্নয়নে উৎসাহ দান কার্যেই এই অর্থ ব্যয় করা হবে। একটি তাঁত শিক্ষা বিদ্যালয়ের জন্য কিছু টাকা ব্যয় করা হয়েছিল; কিন্তু তা চলেনি এবং প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দিতে হয়। উদ্বৃত্ত টাকাটা এখন কয়েকজন ট্রাষ্টির নিয়ন্ত্রণে ইম্পেরিয়াল ব্যাংকে গচ্ছিত রয়েছে। এই গচ্ছিত টাকার সুদ থেকে লেডি কারমাইকেল কর্তৃক গঠিত হোম ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ এসোসিয়েসন এবং ভারতীয় নারীদের শিল্প শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি শিক্ষায়তনে মাসে মাসে কিছু টাকা দেওয়া হয়ে থাকে।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবরের পরবর্তী মাস-গুলি ছিল দারুণ উত্তেজনা ও অশান্তির কাল। সরকারী নীতি, বিশেষ করে স্যার ব্যামফিল্ডফুলারের কর্তৃত্বাধীন পূর্ববঙ্গ সরকারের নীতি এই উত্তেজনা-পূর্ণ পরিস্থিতিকে আরও বাড়িয়ে তোলে। তিনি কতকটা পরিহাসের ছলে এবং কতকটা ভারিক্কি মেজাজে ঘোষণা করে বসলেন যে তাঁর দুইটি স্ত্রী আছে—একটির নাম হিন্দু, অপরটির নাম মুসলমান। তবে তার মধ্যে মুসলমান বিবিটিই তার প্রিয়। একজন শাসনকর্তা যিনি প্রকাশ্যে এই রকম একটা আপত্তিকর কৌতুক প্রদর্শনে মত্ত হতে পারেন, তিনি যে তার উচ্চপদের মোটেই যোগ্য ব্যক্তি নন, তাই প্রমাণ করে। সিভিল সার্ভিসের লোকেরা তার কাছ থেকেই তাদের কাজের নজির—এই' ভাবে লাভ করে। এর ফল দাঁড়াল এই যে কুলার কৌতুক করে যে নীতি ঘোষণা করলেন তার সঙ্গে মিল রেখেই তার প্রশাসন কার্য্য চলতে থাকে। তাঁর এই নীতির ছোঁয়াচ বিচারশালায়ও লাগে, এবং একটি বিখ্যাত মামলাকে কেন্দ্র করে এক ভ্রান্ত বিচারকের উপর কলকাতা হাইকোর্টের উপযুক্ত তিরস্কার বর্ষণ করা হয়। ১৯০৭ সালে কুমিল্লা দাঙ্গা-হাঙ্গামার মামলা নামে যে বিখ্যাত মামলাটি রুজু করা হয়েছিল, সেই মামলার বিচারকে খারিজ করে দিয়ে হাইকোর্ট মন্তব্য করেন: 'এই মামলায় যারা সাক্ষ্যদান করেছেন, তাদের হিন্দু এবং মুসলমান – এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করে এক শ্রেণীর সাক্ষ্যকে গ্রহণ করে এবং অন্য শ্রেণীর সাক্ষ্যকে বরবাদ করে দিয়ে যে পদ্ধতিতে বিজ্ঞ বিচারক বিচার করেছেন, তা কঠোরভাবে সমালোচনার যোগ্য। বিজ্ঞ বিচারকের উচিত ছিল জন-সাধারণের কোন পক্ষের প্রতি পূর্ব থেকেই সহানুভূতিশীল না হয়ে তার সামনে যে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত হয়েছে কেবলমাত্র তার উপর ভিত্তি করেই বিচার বিবেচনা করা।'

এটা অত্যন্ত কঠোর ভাষা। হাইকোর্টের সাবধানতা, সঙ্গতি বোধ ও বিচার বিভাগীয় সম্ভ্রম-পূর্ণ মহান ঐতিহ্য আছে। তাইতো হাইকোর্ট এই ভাষা প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু যদি কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব এবং একের থেকে অপরের প্রতি বেশী সহানুভূতি দেখানই নতুন পূর্ববঙ্গ সরকারের একমাত্র দোষ হত, তাহলেও পরিস্থিতি অতি শীঘ্রই যে ভাবে উদ্বেগজনক হয়ে পড়েছিল তা হত না। দেশ বিভাগের পরক্ষণেই চলল দমন-নীতির প্রয়োগ যার ফলে গভর্নমেণ্ট আরও সংকটে পড়ল এবং অবস্থার জটিলতা আরও বেড়ে গেল। রাস্তায় কেউ 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে পারবে না। এ কথা পূর্বেই বলেছি। প্রকাশ্য স্থানে সভা-সমিতি করা চলবে না, যে সব অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ ভাবে বেশী সংখ্যক লোক বসবাস করে সে সব স্থানে

(১২ পাতায় দ্রষ্টব্য)

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কলিকাতা হইতে বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গেলাম। সেখানে পূর্ব পরিচিতের সন্ধান করিয়া প্রাপ্ত ঠিকানা মত ঢাকা কেন্দ্রে গেলাম। কিছুকাল ঢাকা ও চট্টগ্রামে আত্মগোপন করিয়া থাকি। ট্যাশ ফিরিঙ্গির মতই থাকিতাম। ঢাকা গিয়া দেখিলাম পূর্বেই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সংবাদ পৌঁছিয়াছে এবং বড় ও ছোট শহরে ও পল্লীকেন্দ্রে ছেলেরা সব তৈরী হইতেছে। অভ্যুত্থানের ব্যাপারে অধিকতর পরিণতির কোন সংবাদ থাকিলে তাহার আদান প্রদান চলিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে ঢাকা, ঢাকা হইতে বিভিন্ন কেন্দ্রে আবার বেনারস হইতে আসিত কলিকাতায়। এমনি নিয়মিত সংবাদ বাহক আসা যাওয়া করিত। আমি মৈমনসিংহে কিশোরগঞ্জে যাই। সেখানে মা থাকিতেন। পুলিশ ভয়ানক খুঁজিতেছে। অবস্থা ভাল বুঝি না। তাই শেষ রাত্রিতে রওনা হইয়া ১৭ মাইল পায়ে হাঁটিয়া একটা ষ্টেশনে আসিয়া ঢাকা চলিয়া আসি। তিনদিন পরে ঢাকার আড্ডায় থাকিয়াই খবর পাই সশস্ত্র বিদ্রোহের প্ল্যান বিফল হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট উত্তর ভারতের বহু সৈন্য এবং বিদ্রোহের নেতাদের ধরিয়া ফেলিয়াছে। এই দুঃসংবাদের পরে ভগ্ন দেহ মনে কলিকাতা আসি। ট্যাশ সাজিয়াই রহিয়াছি। এদিকে সমুদ্রপথে অস্ত্র আমদানীর যে প্ল্যান ছিল—তাহাও গভর্ণমেণ্ট জানিয়া ফেলে—আয়োজন ব্যর্থ হয়। দুই রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। এখানে থাকিলে গ্রেফতার হইতে হইবে। পরামর্শ-ক্রমে জাপানে যাওয়াই স্থির করিলাম। কলিকাতা হইতে বাহিরে কোথাও যাওয়া ভয়ানক বিপদ। চট্টগ্রাম হইয়া যাওয়াই স্থির করি। এবং ট্যাশ ফিরিঙ্গি হইয়াই আছি। ঢাকা-কেন্দ্র হইতে চট্টগ্রামের গোপন ঠিকানা দেয়। গোপনে সেখানেই আছি। চট্টগ্রাম হইতে কোষ্টলে ষ্টীমারে সিঙ্গাপুরে আসিয়া—ঐ দিনই জাপান গামী ষ্টীমারে উঠি। পুলিশ-পাশ লইতে হইবে। একটা পুলিশকে কিছু টাকা দিয়া পাশ সংগ্রহ করিয়া ষ্টীমারে উঠার পরক্ষণেই ষ্টীমার ছাড়ে—আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ি। টোকিও হইতে সানফ্রানসিস্কোয় গেলাম। পরে রাসবিহারীর সঙ্গে একবার দেখা হয় টোকিওতে। আমাদের প্রয়াস সফল হয় নাই। জীবনও সফল হয় নাই। কিন্তু আজ পরিণত বয়সেও কয়েকটি স্মৃতি অনড় হইয়া আছে। (১) নরেন সেনের ১৯১২ সালেই বিদেশে লোক পাঠাইবার প্রয়োজনবোধ ও সুদিন আসিবে বলিয়া তাঁহার অনন্ত বিশ্বাস; (২) ম্যাডাম কামার মধ্যে বন্দিনী ভারতমাতার জন্য অকৃত্রিম বেদনাবোধ; তিনি যেন ভারতমাতারই প্রতিচ্ছবি; (৩) বারাণসীর গঙ্গাবক্ষে রাসবিহারীর মধ্যে বিপ্লবীর দৃঢ় প্রত্যয়। অন্তরের আগুন এমন করিয়া চাপিয়া রাখিয়া বাহিরে মুখচ্ছবিতে সংযত প্রশান্তি—শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীতেই সম্ভব। ইহা ভুলিবার নয়। আর ভুলিবার নয়—বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের ভারত স্বাধীন করিবার জন্য সেই সময়কার উৎসাহ। ভারতীয় ছাত্রগণ সবাই সে পূর্ব হইতে

কোন বিপ্লবী দলভুক্ত ছিল—তাহা নহে। কিন্তু বাংলার শ্যামশ্যাল কলেজের ছাত্রগণ সবাই এবং অন্যান্য ছাত্রগণ জার্মান যুদ্ধ বাধিলে,—ভারতে যাও, বিদ্রোহের কথা প্রচার কর, এই আহ্বানে সাড়া দিল। ইহাতে সর্বত্র মন্ত্রগুপ্তি (যাহা সাফল্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন) রক্ষিত হয় নাই, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক অনেককেই চঞ্চল করিয়াছিল। তবে পূর্ব হইতে সুসম্বদ্ধ কেন্দ্রীয় শক্তিসম্পন্ন সংস্থা না থাকায় অনেক শক্তির অপচয় হইয়াছে—সাফল্যলাভ সম্ভব হয় নাই। তথাপি প্রবাসী ভারতীয় যুবক ছাত্রদের সেই দিনের দেশের ডাকে ফিরিবার চাঞ্চল্য ভুলিতে পারি না'

রাসবিহারীর নেতৃত্বে অনুশীলন, গদর বিপ্লবী দল এবং চন্দননগর বিপ্লবী দলের ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উদ্যোগ আয়োজন এইভাবে অপ্রত্যাশিত ভাবে স্তব্ধ হয়ে গেল। বিপ্লবীরা আশা করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা শেষ অধ্যায় শীঘ্রই টানা যাবে। বিশ্বযুদ্ধের অনুকূল আবহাওয়ায় ইংরেজ সাম্রাজ্য ভারত থেকে হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের বিশ্বাসঘাতকতায় তাদের সে আশার আলো অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল। এর পরের অধ্যায় সম্পূর্ণ ভাবে ইংরেজের অনুকূলে গেল। তারা নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করে পাঞ্জাবে লাহোরে নয়টি ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করলেন। যে সকল সৈন্যবাহিনী সশস্ত্র অভ্যুত্থানে যোগ দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন তাদেরও নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে সামরিক আদালতে নামেমাত্র বিচার করে গুলি করে হত্যা করা চলতে লাগল। এই অবস্থায় বাঙলাদেশের অনুশীলন বিপ্লবীরা সবাই ফেরার জীবন গ্রহণ করলেন। এর আগেই আসামের বিভিন্ন স্থানে এবং পূর্ব ও উত্তর বাঙলার কয়েকটি

(১০ পাতার শেষাংশ)

সামরিক পুলিস মোতায়েন করা হল এবং এই পুলিসের দল সম্মানিত হিন্দু সমাজের লোকদের উপর মারপিট চালাতে লাগল। ফলে জনসাধারণের মনে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। একটি স্বদেশী সার্কুলার প্রকাশের জন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হল। বরিশালের শ্রদ্ধাভাজন, সর্বজনমান্য নেতা বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের বিরুদ্ধে মিঃ জ্যাক্ এই রকম এক অভিযোগ দিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অশ্বিনী বাবু দেওয়ানী মামলা করে নিন্দাবাদের জন্য আদালতের বিচারে ক্ষতিপূরণ লাভ করেন। উৎপীড়ন চরমে ওঠে যখন ১৯০৬ সালের এপ্রিলে বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে প্রতিনিধিগণের উপর মারপিট করা হয় ও জোরজবরদস্তি করে সম্মেলন ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

কেন্দ্রে ফেরার বিপ্লবীদের আড্ডা গড়ে উঠেছিল। এই সকল স্থানে থেকে বিপ্লবীরা তাদের অভীষ্ট সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য উদ্যোগ আয়োজন চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

উত্তর বাঙলার পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার আটঘাড়িয়া থানার গণ্ডগ্রাম তেনিজলা গ্রামে ছিল এইরূপ একটি বিপ্লবী কেন্দ্র। গ্রামের লোকেরা জানতো তাদেরই পাশে দুর্ধর্ষ একদল বিপ্লবী এসে ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করে দিয়েছেন, বিপ্লবীরা সকলেই সবসময় এক কেন্দ্রে থাকতেন না প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কেন্দ্রে তারা ঘুরে বেড়াতেন। তেনিজলা কেন্দ্র থেকে সেখানকার অধিবাসী কখনও কখনও অন্য কেন্দ্রে গিয়ে আশ্রয় নিতেন এবং অন্য কেন্দ্র

থেকে নূতন বিপ্লবী এসে সেই স্থান পূর্ণ করতেন। এই ভাবে বিপ্লবীদের গোপন জীবন চলছিল। সশস্ত্র এই বিপ্লবের উদ্দেশ্যে তারা আগে থেকেই ছিলেন গৃহহারা। পাছে পুলিশ তাদের অবস্থান জানতে পারে এজন্য তারা বাধ্য হয়েই ঘর ছেড়েছিলেন।

সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা শেষ হলেও বিপ্লবীরা স্থির করেছিলেন যে তারা সংঘর্ষের পথ ত্যাগ করবেন না। ইংরেজের পুলিশ এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের গ্রেপ্তার করতে এলে তারা তাদের বাধা দেবেন এবং প্রয়োজন হলে লড়াইয়ে মৃত্যুবরণ করবেন। এই সময় এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রামের জন্যই ছিল তাদের প্রস্তুতি। সশস্ত্র অভ্যুত্থান পর্ব শেষ হয়ে যাবার পরে দুই বৎসর কাল এই ভাবে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সেটা হল ১৯১৭ সালের মাঝামাঝি সময়। তেনজিনা গ্রামে একদল বিপ্লবী এসে আস্তানা নিয়েছে। কি জানি কি ভাবে এ সংবাদ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছে গেল। তারা গোপনে এই কেন্দ্রে হানা দেবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। সহসা একদিন গভীর রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে পুলিশের শ্বেতাঙ্গ কর্তা বিপ্লবী কেন্দ্রে উপস্থিত হলেন। বিপ্লবীরাও এ জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তারা আসন্ন সংগ্রামের জন্য তৈরী হলেন। এজন্য রাত্রে নিদ্রা তাদের ছিল না। দিনরাত্রি সব সময়েই বিপ্লবী কেন্দ্রে পাহারার ব্যবস্থা ছিল। তারা পালা করে এক একজন কয়েক ঘণ্টা করে পাহারা দিতেন। পুলিশ কর্তার সঙ্গে ছিল প্রায় দুইশত পুলিশ। তারা তেনিজনার আশ্রয় কেন্দ্রটি এসেই ঘিরে ফেলল। বিপ্লবীরাও গৃহ মধ্যে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। উভয় পক্ষের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জন করে উঠল। বিপ্লবীরাই প্রথম আঘাত হানলেন। বিপ্লবী কেন্দ্রে সেদিন মাত্র ছিল দুজন বিপ্লবী। গোবিন্দ কর এবং নিকুঞ্জ পাল।

সুতরাং সংগ্রাম প্রায় এক পক্ষেরই হল। গোবিন্দ কর ভীষণভাবে আহত হলেন, তার দেহে বন্দুকের সাতটি গুলি ঢুকে গেছে। নিকুঞ্জ পালের আঘাত অপেক্ষাকৃত কম হলেও তিনি অনাহত নন। গোবিন্দ কর চলৎশক্তি রহিত কাজেই পুলিশ কর্তৃপক্ষ সহজেই তাকে ধরে ফেললেন। নিকুঞ্জ পাল আহত হয়েও পাট ক্ষেতের মধ্য দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু পালাবেন কোন পথে? যে দিকে যাচ্ছেন সেই দিকেই পুলিশ। শেষ পর্যন্ত তিনিও ধরা পড়লেন। রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দুজনেরই বিচার হল। দুজনেরই বার বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কিন্তু বেশী দিন তাদের কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় নাই। এর অল্প দিন পরেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত বিপ্লবীদের মুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করলেন। ১৯২৬ সালের মধ্যে অধিকাংশ বিপ্লবীকেই মুক্ত করে দেওয়া হল। গোবিন্দ কর এবং নিকুঞ্জ পাল দুজনেই ১৯১২ সালে মুক্তি পেলেন কিন্তু তাদের বিপ্লবী প্রচেষ্টা এখানেই শেষ হয় নাই। ১৯২৬ সালে গোবিন্দ কর ফ্যাক্টরী ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেন ফ্যাক্টরী ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি অভিযুক্ত হন এবং বিশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। নিকুঞ্জ পাল অনুশীলন দলভুক্ত ছিলেন না, তিনি ছিলেন চন্দননগরের বিপ্লবী কিন্তু সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় এই সময় সবাই এক হয়ে গিয়েছিলেন কোন দলের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। অনুশীলন এবং চন্দননগর দল এক হয়েই বিপ্লবের কাজ করে যাচ্ছিলেন।

(চলবে)

গণতন্ত্রের সমাধি অনভিপ্রেত

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এরপরও যদি এই সরকার নিজের কৃতকর্মের সাফাই গাইবার জন্য মরীয়া হয়ে প্রচার করে যে বামফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য দিকে দিকে চক্রান্ত চলছে, তবে জনগণ কি তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকবেন। সি, পি, এম ক্যাডারদের মারদাঙ্গার ভয়ে? না তা থাকবে না, বরং এই সরকারের গণতান্ত্রিক মুখোসের তলায় যে স্বৈরতান্ত্রিক আসল স্বরূপ তা প্রকাশ করে দেবে—সভা সমিতির মাধ্যমে, আন্দোলনের মাধ্যমে ও কমিশন বসাবার তীব্র দাবীতে এবং সেটাই হবে গণতন্ত্রের আসল প্রকাশ ও বিকাশ। যে সি, পি, এম দল ও সরকার কোমর বেঁধে শ্রীমতী গান্ধীর আমলে জরুরী অবস্থাকালে যেসব স্বৈরতান্ত্রিক কার্য্যাবলী সংগঠিত হয়েছে বলে জনতা সরকারকে কমিশন বসাতে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করেছে ও এখনও সেই সি, পি, এম সরকার ওদল অঘোষিত জরুরী ব্যবস্থার মাধ্যমে কি উদ্বাস্তুদের ওপর অন্যায় জুলুম, অত্যাচার, অবরোধ, মারধোর এমনকি নিরস্ত্র শিশু, নারী, বৃদ্ধ ও পুরুষের ওপর গুলি বর্ষণ করেনি—বর্দ্ধমানের রামনগরে ও সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি ও তৎসন্নিহিত এলাকায়? উদ্বাস্তুরা কি ভারতীয় নাগরিক নয়? তাদের স্বাধীন মানুষ হিসাবে কি বাঁচার কোন অধিকার সি, পি, এম দল ও বামফ্রন্ট সরকার স্বীকার করে না? তবে কেন এই নিষ্ঠুর ও বর্ব্বর ব্যবহার, জঘন্য অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড?

বিরোধীদল ও সরকার বিরোধী বিধায়কগণ মুখে কুলুপ এঁটে চুপচাপ বসে থাকবার জন্যই কি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন? না সরকার বিপথগামী হলে, তাকে সংযত ও সংহত করে জনহিতে কাজে লাগাবার জন্য?—কোনটা সঠিক? জ্যোতিবাবুরা বহুকাল বিরোধী আসনে বসে থেকে কি মৌনীবাবা সেজে বসেছিলেন না সরকারের সমালোচনায় সর্ব্বক্ষণ মুখর ছিলেন? না আন্দোলনের পর আন্দোলন সৃষ্টি করে তদানীন্তন সরকারকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন, তখন ত কেউ এই সব ভূয়া চক্রান্তের কথা ভাবে নি বা বলে নি বা কল্পনাও করে নি। এখনকার সি, পি, এমের মত তখন ত কংগ্রেসী বা অন্য কোনও সরকার বা সরকারী দল ত এই ছেঁদো, বস্তা পচা ও কল্পিত চক্রান্তের কথা বলে নি বা চক্রান্তের এমন চাতুর্য্যপূর্ণ খোয়াব দেখে নি। সি, পি, এমের সবই কি অনাসৃষ্টি! বহু কষ্টে, বহু মিথ্যা প্রচার দ্বারা ও বহু অর্থব্যয়ে দখলীকৃত এই সরকার, বামফ্রন্ট চালাবার অধিকার হারাবার ভয়ে অযথা ভীত, সন্ত্রস্ত ও ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে কেন? তারা কি সুষ্ঠুভাবে সরকার চালাবার যোগ্যতা দু'বছরে এখনও অর্জন করতে পারে নি? তাই কি তারা ছিন্নমূল গুল্মের মত কাতরতা প্রকাশে এত অধিক ব্যগ্র? হায় সি, পি, এম দল ও বামফ্রন্ট সরকার! তোমার নাভিশ্বাস উঠেছে তাই নিদানের আশায় ঘন ঘন জনসভা ডাকা, ক্যাডারদের জমায়েৎ করে বোঝাবার চেষ্টা যে বিরোধীরা বড়ই কাঁপরে

কেলার চেষ্টায় আছে—হয় ত সরকার হাতছাড়া হয়ে যাবে। অতএব ক্যাডাররা প্রস্তুত থাকো গদীচ্যুত হলেই যেন পশ্চিমবঙ্গে তোমরা মারদাঙ্গা লাগিয়ে মানুষজনকে বুঝিয়ে দিতে পারো যে সি, পি, এম সরকারে থেকেও বিরোধীদের রাম পেটান্ পেটায় এবং সরকার হাতছাড়া হলেও জনগণকে বিলাতি ধোলাই দিতে তারা বেশ পোক্ত। কিন্তু দুঃখের কথা কেউই চায় না যে এই সরকার পাঁচ বছরের আগে খতম হয়ে যাক, সকলেই আশা করে, এই সরকার যেন দলবাজী বন্ধ করে জনগণের প্রকৃত বন্ধুর মত হৃদয়বান হয়ে ন্যায়সঙ্গত সংবিধানসম্মত কাজ কোরে মানুষকে রক্ষা করে—এখানে কেউই চক্রান্ত করছে না, তবে সরকারকৃত অন্যায় অযৌক্তিক কার্য্য, অবিচার ও দলীয় শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সকলেই সোচ্চার; কারণ তাঁরা নির্মল ন্যায়সঙ্গত সমষ্টিসম্পন্ন উন্নত ধরণের এক প্রশাসন চায় যার মাধ্যমে সকলেই সমান সুযোগ সুবিধা ও ন্যায়াধিকারের আশ্রয় পায়। এখানে মানুষের মনে সরকার আতঙ্ক সৃষ্টি করে চলেছেন যা অতীতে কখনও হয় নি। শিক্ষা ক্ষেত্রে দলীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য এই সরকার যে হীন পন্থা অবলম্বন করে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে দলের কুক্ষিগত কোরে শিক্ষার চির সমাধি রচনায় উদগ্রীব তা বহু শিক্ষাবিদ পণ্ডিতজন ও নিরপেক্ষ জ্ঞানী ব্যক্তিরা উপলব্ধি করে তার প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই মুখর হয়েছেন এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়ে তা প্রতিরোধ করার জন্য জনগণকে ও দেশের শিক্ষিত জনমানসের কাছে আবেদন করেছেন; শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ দল নিরপেক্ষ রাখার অভিপ্রায়ে যা সর্বজন স্বীকৃত ন্যায় ও নীতি সঙ্গত পন্থা। এই সরকার দলীয় স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রাস কোরে, শিক্ষার ইতি করতে চায়—শিক্ষার মূল লক্ষ্যকে চিরকালের মত স্তব্ধ করে দিতে চায়। কারণ প্রকৃত শিক্ষিত জনমানস পদে পদে এদের মুখোস খুলে দেয় এবং এদের চাতুর্য্যপূর্ণ কৌশল জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিয়ে সাধারণ মানুষের দরবারে এদের হেয় প্রতিপন্ন করে। প্রকৃত শিক্ষার প্রসার ও প্রচার এই সি, পি, এম দল কোন মতেই সহ্য করতে পারে না, তাই তারা শিক্ষাকে নিম্নগামী করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে দলীয় অনুপ্রবেশ যে প্রকট তা প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ব-বিদ্যালয় স্তর পর্য্যন্ত সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিষ্কার ভাবে পরিস্ফুট। শিক্ষা ব্যবস্থাকে দলীয় স্বার্থে নিয়োগে সরকার বাঁধনহারা হীন কর্মপ্রচেষ্টা চালাচ্ছে যা প্রকৃত শিক্ষিত জনের চোখে শুধু বিসদৃশ নয়, উদ্বেগজনক ও বিরাট ক্ষতিকর যা দেশের মধ্যে সমূহ বিপদ ডেকে আনবে। এখনই এই বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে যার পরিণাম দলনিরপেক্ষ ভাল ছাত্র ছাত্রীদের ভোগ করতে হচ্ছে। বিরোধী দল এই সরকারকে হুঁশিয়ারী দিয়ে সাবধান করতে চায়, যাতে শিক্ষাক্ষেত্রে সি. পি, এম বা অন্য কোনও রাজনৈতিকদলের অনুপ্রবেশ না ঘটে এবং তাঁরা শিক্ষাকে সকল রাজনীতির উর্দ্ধে রাখতে চান। সম্পূর্ণ রাজনীতি নিরপেক্ষ প্রকৃত শিক্ষাবিদগণের হাতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাঁরা ন্যস্ত করে, জনগণকে নিঃসংশয় করতে চান দেশের বৃহত্তর ও মহত্তর স্বার্থের খাতিরে যা সকলেরই কাম্য। বিরোধীরা সমালোচনা করলে, সভা সমিতি করে বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা প্রকাশ ও প্রচার করে দিলে সরকার এত রুষ্ট ও অভিসন্ধি প্রয়োগে এত হীন মনোভাবাপন্ন হন কেন? তবে কি আজ পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের আড়ালে বামফ্রন্ট সরকার নিজ অভিরুচি ও সুবিধানুযায়ী স্বৈরতন্ত্র চালু করতে উন্মুখ? সি. পি. এম দলের নেতৃস্থানীয়

প্রধান ব্যক্তিদের বক্তব্যে ও ক্রিয়াকলাপে অন্ততঃ সেইরূপ গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে কি ভাবে গণতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করে, এই সরকার স্বৈরতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের সাংবিধানিক সমস্ত অধিকার হরণ করার অভিপ্রায়ে অগ্রসরমান। অবস্থা প্রায় তদ্রূপ, কারণ সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস প্রায় সমাগত। সি. পি. এম দলের কর্মী বা সমর্থকরা ছাড়া আর সকলেই এই সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতায়, সংবিধানবহির্ভূত ক্রিয়াকর্মে এবং মানুষের ওপর অযথা অত্যাচারে আতঙ্কিত, ভীত, সন্ত্রস্ত ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত।

চূড়ান্ত ব্যর্থতার প্রতীক বামফ্রন্ট সরকার দিনের পর দিন যে সৃষ্টিছাড়া জনক্ষতিকর নজির সৃষ্টি করে চলেছে তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। এরা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই একাজ করছে, ফলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দুঃখ কষ্টের সীমা পরিসীমা নেই। চরম নির্লজ্জতার প্রতিমূর্ত্তি সি, পি, এম সরকার সাধারণ মানুষের বিপর্য্যস্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে নির্মম রাজনৈতিক খেলার পৈশাচিক উন্মত্ততায় মেতে উঠেছে, দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, এর শেষ পরিণামে যে কোথায় নিয়ে গিয়ে দেশকে দাঁড় করাবে—কি দীনতায় ও হীনতায়, তা ভাবলে মন ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সংসদীয় গণতন্ত্রকে স্বীকার করে নিয়েই, এরা সংসদীয় গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনের মাধ্যমেই সরকার গঠন করেছে, অথচ সরকার দখল করার পরমুহূর্ত্ত থেকেই নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে এরা দেশকে শনৈঃ শনৈঃ ধ্বংসের মুখে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর কেন্দ্রীয় সরকার পরোক্ষে এদেরই মদৎ যোগাচ্ছে—কি চমৎকার সুব্যবস্থা! এ রাজ্যে যখন সংবিধান বহির্ভূত ও গণতন্ত্রের পরিপন্থী সব কার্য্যকলাপে বামফ্রন্ট তথা সি. পি. এম সরকার নির্ব্বাধায় ও নির্দ্বিধায় সমাধা করে মহা উল্লাসে জনগণের ক্ষতি সাধন কার্য্য চালিয়ে যাচ্ছে তখন গণতন্ত্রের প্রধান প্রবক্তা প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই কি নীরবে ও নিভৃতে তা অবলোকন করেই চুপচাপ ঘরে বসে থাকবেন—কোন প্রতিকারের প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ পর্য্যন্ত করবেন না? কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব কি তাতে সঠিকভাবে পালিত হবে? পশ্চিম বঙ্গের মানুষ কি ভারতীয় নাগরিক নয়? তবে এই চূড়ান্ত হতাশা ও চরম বিপদের মধ্যে তারা জীবনযন্ত্রণা ভোগ করতে কেন বাধ্য হবে? কি তাদের অপরাধ? কেন এই বৈষম্য? কেন্দ্রীয় সরকারের কি এই সব অন্যায় ব্যবস্থাসকল রোধ করা বা রোধ করার জন্যই যথা শীঘ্র সম্ভব কমিশন বসিয়ে তার প্রতিকার করা কর্তব্য নয়? দেশের সংহতি বিনষ্ট হলে কি কেউ রেহাই পাবে? তখন এই সব অনাচার অত্যাচার, দুরভিসন্ধিমূলক ক্ষতিকর কাজ, অবিচার ও সংবিধান বহির্ভূত কর্মসমষ্টি কি সারা দেশের মানুষের পক্ষে সীমাহীন বিপদ ডেকে আনবে না?

(চলবে)

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন

ও

সবাইকে পড়ান—

RgedNo. R. N .24911/71 | Biplabi Sangh | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
পাক্ষিক :—বার্ষিক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

- 8 AUG 1979

বিপ্লবী পুস্তকমালা

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায়ের—৩'০০
বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদারের—৩'০০

গোপাল কুমার দত্তের

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১'৫০
২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮'০০
৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২'০০
৪। সৌদামনি সংগ্রাম কাহিনী—১'০০
৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১'২৫
৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—'৪০
৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—'৬০
৮। স্বাধীনতার শহীদ মা ও মেয়ে—'৪০
৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—'৮০
১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—'৫০
১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—'৪০
১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—'১৫
১৩। দেশ বাঁধের ডোমেনি (১)—১'০০
১৪। দেশ বাঁধের ডোমেনি (২)—২'০০
১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—'৫০
১৬। ১৯ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১'০০
১৭। হাতির হত্যা প্রচেষ্টা—'১৫
১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৪'০০
১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—'৪০
২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১'৫০

প্রাপ্তিস্থান :—৪নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

বৈশাখী—১/১/৬/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-১০

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীপুলক চ্যাটার্জী।
সম্পাদক—শ্রীনাথি শরণ রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবাসীন ঘোষ। বেতালা—শ্রীব্রজগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅমিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীসুবেন্দু সোম।
বিপ্লবী বাণী কার্যালয় :—৪নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পার্টনারশিপ, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

৮ম বর্ষ ৪৩—৪৯ সংখ্যা

১৮ই আগষ্ট, ১৯৭৯ শনিবার ১লা ভাদ্র, ১৩৮৬

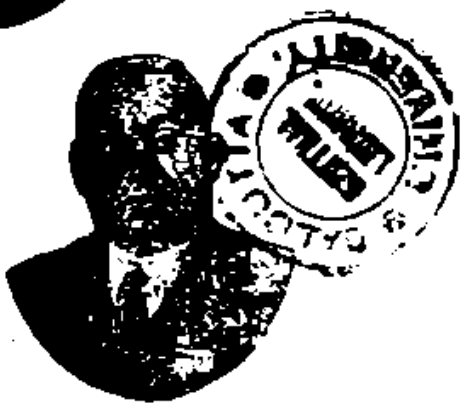

৩২তম স্বাধীনতা দিবসে

বিপ্লবী পরিষদের

শ্রদ্ধাঞ্জলী—

সম্পাদকীয়—

স্বাধীনতা

স্বপ্ন দেখেছিলাম একদিন আমরা, স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন। পরাধীন দেশের হীনমন্যতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম রক্তের মূল্য দিয়ে। পাণিপথ থেকে পলাশী—দেশ কালের ব্যবধান আর চিরন্তন বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস, সব মুছে ফেলতে চেয়েছিলাম—মূল্যায়নের সময় এসেছে আজ, তাই প্রশ্ন, পেরেছি কি?

যদি পারতাম তবে নেতাজীকে যারা বিশ্বাসঘাতক বলেছিল তারা রাজনীতির আসর জমিয়ে বসে থাকতো না। ৪০ কোটি মানুষের দেশ ৫ কোটি দেশদ্রোহীর কথায় বিভক্ত হত না। ঘাতকের দল বিশ্বসভায় ন্যায়বিচারপ্রার্থী হতো না।

ক্ষুদিরাম! তোমাদের প্রণাম করি আর দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করি, তোমাদের স্বপ্ন আমরা সফল করতে পারিনি। আপোষ করে চলেছি আমরা, অন্যায়ের সাথে আপোষ। গান্ধীজীর দেশে জন্মেও সত্যনিষ্ঠ হতে পারিনি, কৌশলের নামে নীতিহীন সুবিধাবাদকে গ্রহণ করেছি প্রতিপদে।

স্বাধীনতার জন্য শেষ লড়াই আজও শেষ হয় নি। আরও অনেক, অনেক রক্ত চাই মুক্তির জন্য, ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারের জন্য, বিভক্ত ভারতের মিথ্যার ইতিহাসকে মুছে ফেলার জন্য। সমাজতন্ত্র আর আপোষতন্ত্র একসঙ্গে গড়ে উঠতে পারে না, তবু সেই চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছি নিরন্তরভাবে।

বেতার-ঘোষকের কণ্ঠে শুনি, "আমরা যেমন করেছি এমন কেউ করে নি। ওরা যারা আঁস্তাকুড়ে চলে গেছে, ডাঃ ঘোষ, ডাঃ রায়, প্রফুল্ল সেন ওরা কেউ কিছুই করেনি, করেছি আমরা, খাদ্য সমস্যা মিটিয়েছি ভূমি সমস্যা মিটিয়েছি।

বিশ্বাস করুন আপনারা, গ্রামে গঞ্জে অনেক ঘুরি, গত এক বছরের মধ্যে আমি একটাও সন্তুষ্ট মানুষ দেখিনি দেশে। না, এরা সবাই প্রতিক্রিয়াশীল এবং চক্রান্তকারী নয়, বোমা পিস্তল নিয়ে দেশের শাসনব্যবস্থাকে উল্টে দিতে চায় না, বরং ভাগ্য বলে মেনে

নিয়েছে সবকিছু—কাছাকাছি পতাকা উত্তোলন হলে কাছে এসে দাঁড়ায়, মন্ত্রীরা গাড়ী থেকে নামলে ভীড় করে, জয়ধ্বনি দেয়, পাকিস্তানে সঙ্গের হকি খেলায় জিতলে বাজি ফোটায় এখনও।

"স্বদেশ স্বদেশ করিস তোরা এদেশ তোদের নয়।"—হেমচন্দ্র, তুমি কি জ্যোতিষ চর্চ্চা করতে কোন দিন!—নিশ্চয় করতে, তা না হলে তোমার কবিতা খনার বচনের চেয়েও সত্য হল কি করে! স্বাধীনতার তিন দশকের পরেও, নির্মম মর্মান্তিক সত্য! ৪৮ থেকে ৭৯ তিনটে দশক পার হয়ে চলে এলাম তবু আজও দেশের ৭০ ভাগ লোক ক্ষুধায় অন্ন পায় না। আমরা ভয় পাই সে কথা বলতে, তাই বলি দারিদ্র্যসীমার নিচে আছে ওরা এইমাত্র—যখন মারা যায় বলি, অনাহারে মরে নি অপুষ্টিজনিত রোগে মরেছে, সরকারের ত্রাণ দপ্তর আছে, ত্রাণমন্ত্রী আছেন, অনাহারে কেউ মরতে পারে না।

তবু কমও কিছু নেই—একশ টাকার টিকিটের ষ্টেডিয়াম আমাদের জাতীয় গর্ব, আন্তর্জাতিক খেলা চলে সেখানে। আমাদের বিমানবন্দরে জাম্বো জেট নামে সকলকে অবাক করে দিয়ে। দিল্লী, বোম্বাই কলকাতায় শয়ে শয়ে গড়ে-ওঠা পাঁচতারার প্রমোদ নিকেতন আমাদের আন্তর্জাতিক ষ্ট্যাটাস বাড়িয়ে চলেছে নিরন্তর। ফরাসী সম্রাটের কায়দায় ভেঁপু বাজিয়ে গাড়ীর শোভাযাত্রা দেখি নিত্য, তবু নির্বোধের দল খুশি হয় না, নিত্য দেখি অসন্তোষ।

অর্জ্জুন ফকির, তুমি ফিরে এস, তুমি ফিরে না এলে এদেশকে স্বদেশ আমরা ভাবতে পারছি না, ভাবতে পারবো না কোন দিনই। শুধু অনন্তকাল ধরে দেয়ালে দেয়ালে লিখে যাব অর্থহীন ভাষায় "সমাজবাদ আসছে আসবে"।

স্বদেশ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো! তোমাকে প্রণাম করি। তোমাকে বন্দনা করেছি শতবর্ষ ধরে 'বন্দেমাতরমে'র মন্ত্রে। শুধু আজ তোমার স্বাধীনতার শুভলগ্নে বসে শুভকথা বলতে পারলাম না, তোমার জয়ধ্বনি দিতে পারলাম না—এ আমার অপরাধ।

———

বন্দে মাতরম্

(১৮৭৬–১৯৭৬)

। সন্তোষকুমার অধিকারী ।

আজ থেকে একশ তিন বছর আগে ১৮৭৬ সালে কোন এক কবি ঔপন্যাসিক হৃদয়ের এক গভীর উপলব্ধির প্রেরণায় রচনা করেছিলেন স্বদেশ-মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্।' স্বদেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করে যে সঙ্গীত তিনি সেদিন লিখলেন, একদিন তা' একটি নিদ্রিত জাতির হৃদয়ে প্রাণের দীপ্ত অগ্নিকে জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত একদিন মৃত জাতীয় জীবনে জাগরণের যে ঢেউ তুলেছিল, ইতিহাসে তার তুলনা মেলেনা।

১৮৭৬ সালের রচনা হলেও 'বন্দেমাতরম্' এর প্রেরণা কবি আরও আগে পেয়েছিলেন। ১৮৭২ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব'। এই নিবন্ধেই কমলাকান্ত স্বপ্ন দেখল স্বদেশ-মাতৃকার। যে মাতৃমূর্তিতে সমগ্র জাতির চিত্তে এক নতুন উন্মাদনায় উজ্জ্বল করে ধরতে পেরেছিলেন তার সূচনা কমলাকান্তর স্বপ্নদর্শনে কমলাকান্ত স্বপ্নে কি দেখেছিল ?

"দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবল বেগে ছুটিতেছে। আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল অন্ধকারে বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিভিতেছে। আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—'মা' 'মা' করিয়া ডাকিতেছি। ....কোথা মা ? কই আমার মা ? কোথায় কমলাকান্ত প্রসূতি বঙ্গভূমি ?"

স্বদেশকে মাতৃকল্পনা সম্ভবত: এই প্রথম। এই দেশমাতৃকার রূপ বঙ্কিমের চোখে ভক্তি ও ভালোবাসায় নতুন কলেবর ধারণ করল।

"সেই তরঙ্গ সংকুল জলরাশি উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা".....চিনিলাম, এই আমার জননী—জন্মভূমি.....সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।"

বাংলাসাহিত্যে স্বাদেশিকতার পরিবেশ ইতিপূর্বেই সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিবেশ রচনায় যিনি অসামান্য কীর্তির অধিকারী তাঁর নাম দীনবন্ধু মিত্র। বস্তুত: নীলদর্পণ নাটকই সাধারণ বাঙালীকে

ইংরাজ অত্যাচার ও বিদেশী শাসনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সজাগ করে তুলেছিল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে রঙ্গলাল লিখেছিলেন।

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব নিগড় কণ্ঠে কে পরিতে চায় রে,
কে পরিতে চায়।"

হেমচন্দ্র, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র তাঁদের কাব্যে নাটকে দেশাত্মবোধের প্রেরণামূলক সাহিত্য রচনায় মগ্ন। ঠাকুর বাড়ীতে সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে আবহাওয়া গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তার পরিণতি 'হিন্দু মেলা'। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মেলার সূচনা। বাংলাদেশের মানুষের সামনে তখন ভারতীয় ঐতিহ্য এবং জাতীয়তাবোধের প্রতীক স্বরূপ উন্নতশিরে দণ্ডায়মান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর ভ্রূক্ষেপ করেননি ইউরোপের তথাকথিত কালচারের চকিত দীপ্তিতে। তাঁর তালতলার চটির সামনে মাথা নিচু করেনি, এমন মানুষ তখন বাংলাদেশে কেউ ছিল না। মধুসূদন 'মেঘনাদ বধ কাব্যে' বিভীষণ চরিত্রকে ঘৃণায় লিপ্ত করেছেন, যে বিভীষণ স্বদেশ লঙ্কায় বিদেশী রামচন্দ্রকে আবাহন করে এনেছিল। বিভীষণকে ধিক্কার দিয়ে ইন্দ্রজিত বলেছে—

—কোন ধর্মমতে, কহ দাদে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম জন্মভূমি স্বদেশকে মাতৃমূর্তিতে কল্পনা করে মাতাকে আবাহন জানালেন। কমলাকান্তের মুখে শোনা গেল—

"এই কি মা? হ্যাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি.....

"এস মা, গৃহে এস—ত্রিশ কোটি সন্তানে একত্রে, এককালে দ্বাদশ কোটি কর জোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করব।"

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন সেই অমর সঙ্গীত—

বন্দেমাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

* *

বঙ্গদর্শনের জন্য লিখলেও বঙ্কিমচন্দ্র এই সঙ্গীতটিকে গ্রথিত করবার মত উপযুক্ত পটভূমিকা খুঁজছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হল তাঁর উপন্যাস 'আনন্দমঠ'। 'আনন্দমঠ' এর পটভূমিকা

ওঁকে অনেকদিন খুঁজতে হয়েছে। অত্যাচার ও অন্যায় নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাগ্রত বিবেক কোথায়? সন্তকে প্রতিষ্ঠিত করতে ও জননী জন্মভূমিকে শ্রদ্ধার সিংহাসনে বসাতে তিনি ঐতিহাসিক পটভূমির সন্ধান করলেন। খুঁজতে খুঁজতে তিনি পেয়ে গেলেন 'সন্তানবিদ্রোহের' ঘটনা হাণ্টারের লেখা Annals of Rural Bengali গ্রন্থে এই সন্তান বিদ্রোহের ইতিহাসকে বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে—

"A set of lawless banditti known under the name of Sannyasis or Fakeers have long infested these countries and underpretence of religius pilgrimage have been accustomed to traverse the chief part of Bengal....."

ওয়ারেন হেষ্টিংস একটি চিঠিতে লিখেছেন—

"You will hear of great disturbances committed by the Sannyasis or wandering Fakeers who annually infest the provinces.....going in bodies of 1000 and sometimes even 10000 men. An officer of reputation (Captain Thomas) lost his life in an unequal attack upon a party of these banditti.....

বিদেশী শাসক সন্তান দলকে দস্যু বলে অভিহিত করলেও বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন, যে এরা সত্যকারের সন্ন্যাসী ছিল। তাদের শক্তির আরাধনাকে তিনি দেশমাতৃকার পূজায় রূপান্তরিত করেছিলেন। তাদের নির্ভয় প্রাণদানের মধ্যে তিনি আত্মোৎসর্গকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

তবু সন্তান বিদ্রোহকে আদর্শবাদে রঞ্জিত করে দেশমাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে মূর্ত করে তুলতে সম্ভবতঃ মনে দ্বিধা ছিল। রক্ষণশীল বঙ্কিমচন্দ্র মনের মধ্যে সেই আদর্শের পতাকাবাহী এক মহান ব্যক্তিত্বের সন্ধান করেছিলেন। আর ব্যক্তিত্বের রূপ ধরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রায় আচম্বিতে এক দস্যুসন্ন্যাসী—যাঁর নাম বাসুদেও বলবন্ত ফাদকে।

কে এই ফাদকে ?

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই তারিখে হায়দ্রাবাদে মেজর ডানিয়েল ও পুলিশ কমিশনার ব্রুক-এর হাতে ফাদকে বন্দী হন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, যে তিনি একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল গড়ে তুলেছিলেন, এই দলের সাহায্যে সের ট্রেজারি লুট করেছিলেন ; এবং বিদ্রোহ করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন।

একটি দস্যুর গ্রেপ্তারে সেদিন কেউই মাথা ঘামাতে রাজি ছিল না। কিন্তু ফাদকের লেখা আত্মজীবনীটি পুলিশের হাতে পড়ে। এই ডায়েরির কিছু অংশ বোম্বের একটি কাগজে ছাপা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই এই ডায়েরিটি পড়ে থাকবেন।

১৮৬৩-তে ফাদকে মিলিটারি এ্যাকাউন্টস্-এর এক সামান্য কেরাণী ছিলেন। মৃত্যুশয্যাশায়ী জননীকে দেখতে যাওয়ার জন্য ছুটি চেয়ে তিনি ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে চাকরীতে ইস্তফা

দিয়ে তিনি বাড়ী ছুটে গেলেন। কিন্তু মাকে শেষবারের মত দেখাও তাঁর ভাগ্যে ছিল না। যখন বাড়ী পৌঁছলেন তিনি, তখন তাঁর মা মৃত।

এরপর যে ফাদ্‌কে দেখা গেল সে প্রচণ্ড ব্রিটিশ বিদ্বেষী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার মনে পুঞ্জিভূত ঘৃণা। ফাদ্‌কে এরপর ছোট্ট একটি দল গড়ে তুললো। দলের লোকদের সে শরীর চর্চ্চায় শক্তিশালী করলো। দেবতার নামে সে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করলো। কুর্ণুল জেলায় মল্লিকার্জুন মন্দিরে ফাদ্‌কের আসন। খরচ চালাবার জন্য ডাকাতি সুরু করলো ফাদকে। ট্রেজারী লুঠ ডাকঘর লুঠ করে সে টাকা সংগ্রহ করতে লাগলো।

ফাদ্‌কের ডায়েরিতে পাওয়া গেল—মল্লিকার্জুন মন্দিরে সে প্রার্থনা করছে শক্তির। যে শক্তিতে সে ভারতের মাটি থেকে ব্রিটিশ শাসনকে নির্মূল করতে পারবে।

১৮৮০ সালে বিচারে ফাদ্‌কে দোষী সাব্যস্ত হন। তাঁকে এডেনে নির্বাসিত করা হয়।

সত্যানন্দ স্বামীর চরিত্র কি এই বাসুদেব ফাদকের ব্যক্তিত্বে রঞ্জিত নয়?

সন্ন্যাসী ফাদ্‌কে বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ কামনায় লড়াই করেছিলেন। আনন্দমঠ উপন্যাসে সেই লড়াইকে এক নতুন পটভূমিকায় স্থাপিত করে বঙ্কিম আত্মোৎসর্গের আদর্শকে তুলে ধরলেন। আত্মত্যাগের সঙ্গে এসে মিশলো ভক্তি—দেশমাতৃকার জন্য সন্তানের ভক্তি।

আনন্দমঠের উপক্রমণিকায় তিনি লিখলেন—

—....আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?

তখন উত্তর হইল—"তোমার পণ কি?

প্রত্যুত্তরে বলিল—"পণ আমার জীবন সর্ব্বস্ব।"

প্রতিশব্দ হইল—"জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।

আর কি আছে? আর কি দিবে?"

তখন উত্তর হইল—"ভক্তি।"

বন্দেমাতরম্ গানে সন্ন্যাসী গাইল—বাহুতে তুমি মা শক্তি

হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,

তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

১৮৮২ সালে আনন্দমঠ প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪-তে বঙ্কিমের মৃত্যু। মৃত্যুর পূর্বে বঙ্কিম জেনে যাননি, যে আনন্দমঠই তাঁকে অমর করে রাখবে। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত যে একদিন মানুষকে মৃত্যু-জয়ের প্রেরণা দেবে, এও তিনি জানতে পারেননি। তবে 'বন্দেমাতরম্' যে দেশাত্মবোধের প্রেরণা এনে দেবে, এটুকু আশা তাঁর ছিল। তবু আশ্চর্য এই যে, ১৮৮২ থেকে ১৯০৫ পর্য্যন্ত তেইশ বছর সময়ের মধ্যে বন্দেমাতরম্ কোন মর্য্যাদা পায়নি। সমসাময়িক যুগের এন এস মিত্র তাঁর Indian

Problems গ্রন্থে লিখেছিলেন—

Notwithstanding the agitation over the Ilbert Bill, and the imprisonment of Surendranath Banerjee in 1883, no fuss was made over 'Bande Mataram.'

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে প্রথম অন্যান্য সঙ্গীতের সঙ্গে বন্দেমাতরম্ গাওয়া হয়েছিল।

'বন্দেমাতরম্' জাতীয় সঙ্গীতরূপে দেখা দিল ১৯০৫/৬ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। বাংলাকে দুভাগ করার প্রতিবাদে সেদিন সমস্ত বাংলার মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল। সেই ক্ষুব্ধ ও বেদনার্ত জনতা হঠাৎ খুঁজে পেল মাতৃমন্ত্র। দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করে মাতৃ-বন্দনায় মুখর বাঙালী এই একটি মাত্র শব্দের মধ্যে অমৃত জীবনের সন্ধান পেল।

১৯০৫/৬ সালেই ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। আর এই আলোড়নের কেন্দ্রস্থলে ছিল জাতীয় মন্ত্র বন্দেমাতরম্। ১৯০৫-এর ১৬ই অক্টোবর ফেডারেশন হলের মাঠে বাংলার ঐক্যচেতনার পরিস্ফুরণ। সেদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং বিপিনচন্দ্র পাল। এই সভাতেই 'বন্দেমাতরম্'কে জাতীয় আন্দোলনের প্রতীক মন্ত্ররূপে বরণ করা হয়। তারপর হাজার হাজার মানুষ এই মন্ত্র উচ্চারণ করে নির্যাতন এমন কি মৃত্যুবরণ করেছে। ষোল বছরের ছেলে চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে পুলিশের লাঠি বুক পেতে নিয়েছে।

১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে 'বন্দেমাতরম্' জাতীয় সঙ্গীতরূপে গীত হয়। কিন্তু তার পূর্বেই বাংলার প্রত্যেকটি মানুষের মুখে 'বন্দেমাতরম্' স্বাদেশিকতার মহামন্ত্র। শুধু বাংলা নয় সমগ্র ভারতের মানুষ এ মন্ত্রকে গ্রহণ করল এবং 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করে তারা মৃত্যুর মুখে গিয়ে দাঁড়াল।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মাদাম ভিকাজি কামা প্যারি থেকে এক সংবাদপত্র বার করেন : নাম দেন 'বন্দেমাতরম্'। এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রবাসী ভারতীয়দের মনে তিনি বিপ্লবের প্রেরণা সৃষ্টি করেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে দলে দলে মানুষ কারাবরণ করেছে, পুলিশের লাঠি মাথায় করে নিয়েছে ফাঁসির মঞ্চে এগিয়ে গেছে শুধু এই একটি মন্ত্রের জোরে।

'বন্দেমাতরম্' জন্মভূমিকে মহিমান্বিত করেছে মাতৃকল্পনায়, আর মানুষকে মৃত্যুঞ্জয় করেছে তাদের গৌরবে। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা—ভক্তি, ত্যাগ ও আত্মদান এই দুটি শব্দের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল—কিন্তু তার জন্য প্রায় ত্রিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। তারপর হঠাৎ একদিন এই দুটি শব্দ বাঙালী এবং ভারতবাসীর কাছে জীবন জয়ের মন্ত্র হয়ে উঠেছে। স্বাধীন ভারতবর্ষেও অন্যতম জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করে 'বন্দেমাতরম্' আমাদের প্রাণের শক্তিকে উজ্জীবিত করেছে। 'বন্দেমাতরম্'-এর মধ্যে যে অমৃতশক্তি নিহিত ছিল, আজও তা অক্ষয় ও অম্লান হয়ে আছে।

———

মহারাজ ৺ত্রৈলোকানাথ চক্রবর্তী

—ঃ পরলোকগত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী স্মরণে ঃ—

॥ শ্রীভূপতি রঞ্জন মজুমদার ॥

কালের গতিতে দেশ বা সমাজ যখন অধঃপতিত হয়, ব্যষ্টি জীবনের আদর্শহীনতা, ভীরুতা ও আত্ম-মর্য্যাদার অভাবজনিত কলঙ্ক, সমষ্টি জীবনকে যখন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, যখন দুঃখ দুর্দ্দশায় সমাজ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে, তখন সে চায় মুক্তি পথের সন্ধান। দেশ ও জাতির সেই চরম সঙ্কট মুহূর্তে আবির্ভূত হন কিছু ক্ষণজন্মা পুরুষ, যাঁহারা কালের দাবীকে তাহার চাহিদাকে সফল রূপায়ণে নিজেদের নিয়োজিত করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে, বেশ কয়েকজন মহাসাধক জন্ম নিয়েছিলেন, বাঙলা তথা ভারতের বুকে হয়ত বা জাতির আর্ত আহ্বানে। তাহাদেরই অন্যতম ছিলেন আমাদের পরম প্রিয় সহকর্মী বিপ্লবী নায়ক মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী।

এখানে আমি ত্রৈলোক্য মহারাজের জীবনী লইয়া আলোচনা করব না। স্বল্প পরিসরে তাঁর বিরাট কর্মবহুল জীবনের আলোচনা সম্ভবও নয়। মহারাজের জীবনী ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের, তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়বস্তু। স্বাধীন ভারতের ঐতিহাসিকগণই সেই দায়িত্ব পালন করবেন, এই আশাই করি।

ত্রৈলোক্য মহারাজ ছিলেন তিনটি যুগের, প্রাক্ গান্ধী যুগের, বৈপ্লবিক আন্দোলনের, গান্ধীযুগের গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলনের ও তাহার পাশাপাশি বৈপ্লবিক আন্দোলনের এবং স্বাধী-

প্রচেষ্টার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার। মনে হয় মহারাজই ছিলেন এই তিনটি যুগের একমাত্র সাক্ষী ও সক্রিয় যোগসূত্র।

প্রাক্‌গান্ধীযুগে সমস্ত জাতি যখন কুসংস্কার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ভীরুতা ও কাপুরুষতায় আচ্ছন্ন থাকিয়া জীবনমৃত অবস্থায় ধুঁকিতেছিল, সেই কঠিন দিনে বিপ্লবী ভারত জীবনদানের ভিতর দিয়া জীবনের প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিজীবনের আহুতীর ভিতর দিয়া সমষ্টি জীবনে আত্মাহুতীর মহান আদর্শে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার কঠিন কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে। মহারাজ ছিলেন এই বিপ্লবী ভারতের অন্যতম পুরোধা কর্মী ও নেতা। ব্যবহারে তিনি ছিলেন অতি অমায়িক, নম্র, মধুর, বন্ধুবৎসল, এক শিশু-সুলভ মনের অধিকারী। তাঁহার কাছে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই ছিল সমান অধিকার। তিনি থাকিতেন সর্বস্তরের সকল মানুষের ধরাছোঁয়ার মধ্যে। অথচ অন্যদিকে এই মাটির মানুষটিই ছিলেন কর্তব্যে মহান, কর্মে অদম্য দুর্জয় সাহস ও সঙ্কল্পের অধিকারী এক বিরল চরিত্র। এইসব কর্মী সাধকদের পরিচয় হইল কর্মে। প্রেরণা হইল কর্মসাধনায়। সফলতা ও বিফলতা ইহারা সমভাবেই গ্রহণ করেন। ইহারা নিজেরাই নিজেদের শিক্ষক। চলার পথে কাজের ভিতর দিয়া কর্মপথের ও আদর্শের বিকাশ করিয়া, ইহারা আগাইয়া যাইতেন। উজ্জীবন

ইহারা ছিলেন যে কোন দেশের প্রথম সারির বিখ্যাত ও কৌশলী নায়কদের সমকক্ষ।

স্বদেশী যুগ হইতে দেশ সাধনার পথে বারে বারে বাধা আসিয়াছে, আঘাত আসিয়াছে, বিপ্লবী বাঙলা তাহার যথাযোগ্য উত্তর বৈপ্লবীক পথেই দিয়াছে। কিন্তু মর্মন্তুদ আঘাত আসিল এবার যখন পরাজিত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ তাহার ক্রূর চক্রান্তে বাঙলাকে খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া দিয়া বাঙালী জাতির মেরুদণ্ডটা ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল। বিপ্লবী বাঙলা এবার এই ক্রূর চক্রান্তজাল ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া তাহার অতীত ঐতিহ্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইল না। বিপ্লবী বাঙলা হতমান, কেহই কোন পথের সন্ধান দিতে পারিল না পূর্ববাঙলা হইতে বিপ্লবীরা দলে দলে পালাইয়া আসিয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইল। সমস্ত বাঙালী জাতি যেন হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই দুর্দিনে, উভয় বাঙলার যে একমাত্র মানুষটি তাঁহার নির্দিষ্ট কর্মপথ হইতে সরিয়া আসেন নাই এবং নীরবে, ধীর পদক্ষেপে নিজ কর্মপথ প্রস্তুত করিয়া আগাইয়া চলিয়াছিলেন। তিনি হইলেন বিপ্লবী ভারতের আদর্শ পুরুষ আমাদের অতি প্রিয়, অতি শ্রদ্ধার জন, বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী। এক ঘোর অমানিশার অন্ধকারে, এক মহাশ্মশানে তিনি এক মহাতপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন সুদীর্ঘ গত তেইশটি বছর। তিনি বিশ্বাস করিতেন যাঁহারা রাজনৈতিক সাধনা ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত তিনি কখনও তাঁহার কর্মক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে পারেন না। এই শ্রেণীর কর্মী কখন কোন অবস্থাতেই হার স্বীকার করেন না। কর্মের সাধনাতেই ইঁহাদের তৃপ্তি ফলের আকাঙ্খা ইহারা রাখেন না।

এই ছিল ত্রৈলোক্য মহারাজের জীবন ধর্ম। ইহাদের ধর্ম মানে দেশ ও জাতির সেবা। এই সেবা ও ধর্মজীবনের সেই দিনই বিরতি আসিতে পারে, যেদিন ইহাদের জীবন ও আদর্শের ভিত্তিতে দেশ ও সমাজ গড়িয়া উঠিবে।

মহারাজ পশ্চিম বাঙলায় আসিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় যে সব কথা বলিয়া গিয়াছেন, যে কর্মপথের নির্দেশ আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন এবং যে আশার বাণী তিনি আমাদের শুনাইয়া গিয়াছেন, এবার আমি সংক্ষেপে সেই সম্বন্ধেই দুই চারিটা কথা বলিব।

এবার ত্রৈলোক্য মহারাজ পশ্চিম বাঙলায় আসিয়াছিলেন এক দুর্জয় আশা ও বিশ্বাস লইয়া পশ্চিম বাঙলার মানুষকে তাঁহার সুদীর্ঘ তপস্যার ফল জানাইতে। যাহাতে বাঙলা এক দুরূহ পথকে অতিক্রম করিয়া তাহার অভিষ্টলাভে সমর্থ হইতে পারে। যদিও এই ফল লাভ করিতে, হয়ত এখনও তাহাকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। তবুও যে মহারাজ আজ এই অসময়ে ধ্যান ভাঙ্গিয়া তাঁহার তপস্যালব্ধ ফল জানাইতে আমাদের কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন এবং বিরাশী বছরের বৃদ্ধ মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার অচল ও আসক্ত শরীর লইয়াও তারুণ্যের উৎসাহে বিরামহীন ভাবে ছুটিয়া চলিয়াছিলেন, তাহার কারণ তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন—"পরলোকের আহ্বান শুনিতে পাইয়াছি, ডাক আসিয়াছে, এবার যাইতে হইবে।" যেদিন মহারাজ আমার বসোয় আসিয়াছিলেন, আমি তখন তাঁহাকে তাঁহার অসুস্থতার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া, ঘোরাঘুরি না করিয়া চিকিৎসকের নির্দেশমত বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করিলাম। মহারাজ তখন অতি স্বাভাবিক ভাবে হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, "আমি কোন কথা শুনিব না। এবার আমায় বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে না, ওপারের ডাক শুনিতেছি

এবার যাইতে হইবে। তাই পুরাতন সাথীদের সঙ্গে দেখা করিয়া শেষ বিদায় লইয়া যাইব।"

তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। পুরাতন সাথীদের সঙ্গে শেষ দেখা করিয়া শেষ বিদায় লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। এই বিদায় বেলায় তিনি আমাদের শুনাইয়া গেলেন তাঁহার দীর্ঘ তপস্যার ফল। একটি আশার বাণী এবং রাখিয়া গেলেন একটি সতর্কতা ও কিছু গুরু দায়িত্ব।

৺মহারাজ তাঁহার দূরদর্শিতা ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা দেখিতে পাইয়াছিলেন পূর্ব বাঙলার মাতৃগর্ভে একটি বাঙালী ভ্রূণের আবির্ভাব যে পূর্ব বাঙলার সাম্প্রদায়িক দানবের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। এই ভ্রূণ শিশু ধীর গতিতে, কিন্তু দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় লইয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে এবং আজ অধীর আগ্রহে ভূমিষ্ঠের অপেক্ষায় দিন গুণিতেছে। তবুও মাতৃগর্ভের প্রাচীর ভেদ করিয়া, তাহার যে ক্ষীণ, কিন্তু সুস্থ কণ্ঠস্বর পূর্ব-বাঙলার বেড়াইতেছে, সে বাঙালী সত্তার, বঙ্গ আত্মার মর্মবাণী সে 'আমার বাঙলা তোমার বাঙলা একই বাঙলা। আমার ভাষা তোমার ভাষা একই ভাষা, বাঙলা ভাষা। কোন কৃত্রিম বিভাগই বাঙলা ও বাঙালীর সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। বিদেশের ষড়যন্ত্রে, ক্রূর সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে যদি কোন দেশের ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটিয়াও থাকে, তবে সেটা এখন শেষ কথা হইতে পারে না। ইতিহাস কখন শেষ কথা বলে না। ইতিহাসের কোন শেষ লেখা হয় না। বাঙলা বাঙালীর পুনর্ভ্যুদয় ঘটিবেই। তাহার আত্মিক পুনর্মিলন হইবেই। মহারাজ এই আশার বাণীটি শুনাইতে আমাদের কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন এবং শুনাইয়াও গিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই বলিয়া সতর্ক করিয়াও দিয়া গিয়াছেন যে, আমরা পশ্চিম বাঙলার মানুষেরা যেন ভাবাবেগে পরিচালিত হইয়া, অস্থিরতাবশে অধীর আগ্রহে অসহিষ্ণু হইয়া এমন কোন কাজ না করিয়া বসি যাহাতে পূর্ব বাঙলার ঘুমন্ত সাম্প্রদায়িক দৈত্যটি আবার জাগিয়া উঠিয়া, তাহার দীর্ঘ হাতটি-বাড়াইয়া ভাঙ্গা বাঙলার আশা ও স্বপ্ন ঐ বাঙালী শিশুকে আঁতুড়ে তাহার জন্মলগ্নেই হত্যা করিয়া বসিতে পারে।

মহারাজ বলিয়াছিলেন, এখন দুইটি দেশ। রাষ্ট্রীয় নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ পরস্পর বিরোধী স্বার্থ ও সমস্যা ইহার সঙ্গে জড়িত। কাজেই উভয় রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য, আজ উভয়ের সহ-অবস্থান উভয়কেই মানিয়া লইতে হইবে। দেওয়া ও নেওয়ার ভিত্তিতে ওপারের শিক্ষা ও সমাজ বিকাশের ধারা এপারের মানুষের কাছে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে এপারের মানুষের ধ্যান ধারণার স্পর্শে ওপারের মানুষকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে হইবে। এইভাবে উভয় বাঙলার সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মধ্য দিয়া উভয়ের হৃদয়ের বন্ধনকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া উভয় বাঙলার আত্মিক পুনর্মিলন ঘটাইতে হইবে। খুলিয়া যাইবে উভয় বাঙলার মানুষের কাছে একটি নূতন দিগন্ত। এই পথেই রচিত হইবে বাঙলা ও বাঙালী জাতির মহামিলনের পটভূমি। বাঙলা ও বাঙালীর আশা ও ভরসা, উভয় বাঙলার তরুণ সম্প্রদায়কে মহারাজ এই পথে নূতন বাঙলা গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইয়া গিয়াছেন। তরুণ বাঙলাকে আজ আগাইয়া আসিয়া, মহারাজের এই জীবন স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিতে হইবে।

———

১৫ই

আ গ ষ্ট

—বিশেষ প্রতিনিধি

বহু মানুষের দুঃখ কষ্টভোগ ও অশ্রুজলের মধ্য দিয়ে, বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ত্যাগ, নির্য্যাতন ভোগ এবং জীবন আহুতির ফলশ্রুতি স্বরূপ ভারতবর্ষ তার লুপ্ত স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে বত্রিশ বছর আগে। কথাটি সংক্ষেপে বলা হল বটে, কিন্তু এর পেছনে দীর্ঘ সুদীর্ঘদিন ধরে যে তপশ্চর তপস্যা করতে হয়েছিল, যার স্বাক্ষর ইতিহাসের পাতায় বিধৃত হয়ে আছে। সে সম্বন্ধে আজকের দিনের মানুষ, বিশেষ করে রাজনীতির ব্যবসায়ীরা যেন সম্পূর্ণ উদাসীন। যারা এই দুঃসাধ্য মূল্য দিয়ে একাজে সহায়তা করেছিল, যাদের সার্বিক অবদান ব্যতীত একাজ কখনও সমাধা করা সম্ভব হত না, তাদের কথা যেন ভ্রান্তির তলে ডুবে যাচ্ছে। যে কয়জন এখনও বেঁচে আছেন, তাদের সন্ধান করা বা পবিত্র কর্তব্য হিসাবে তাদের নিকট ঋণ পরিশোধ করার কোন প্রচেষ্টাই যেন আজ করণীয় বলে মনে করছেন না এরা। তাদের প্রাপ্য প্রাপ্য না দিয়েও, তারা যে দেশের জন্য স্বাধীনতা নামে অমূল্য সম্পদ আহরণ করে এনেছেন, সেই স্বাধীনতাকেও এরা বিপন্ন করে তুলেছেন। আমাদের পূর্বসুরীরা কোন প্রতিদান চান নি কোন দিন, কোন পুরস্কার লাভ করার আকাঙ্খা ত দূরের কথা। তাদের একমাত্র কাম্য ছিল যে স্বাধীনতা লাভের পর দেশের ও দশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন করা। কিন্তু গভীর দুঃখের সঙ্গে আমরা বলতে বাধ্য যে উত্তরসুরীরা এই দেশ সেবায় নিবেদিত প্রাণ এইসব সর্বত্যাগী মানুষদের আশা পূর্ণ করতে সক্ষম ত হনই নি, বরং তাদের স্বপ্নকে বিলীন করে দিচ্ছেন দিনে দিনে।

আজ বত্রিশ বছর পর, মানুষের মনে একটা গভীর আশঙ্কা ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। দেশ কোথায় চলেছে, দেশকে বর্তমান নেতারা কোথায় নিয়ে চলেছেন এটা একটা দুঃস্বপ্নের মত তাদের মনের উপর জগদ্দল পাষাণের মত চেপে বসেছে। স্বাধীনতার লড়াইটা ছিল একটা মস্ত প্রত্যাশার উপর দাঁড়িয়ে। দেশ স্বাধীন হলে দেশের মানুষের আহার, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সুলভ হবে। দেশের ভিতর নতুন মানুষের সৃষ্টি হবে, যারা ভারতের অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে। দেশের মধ্যে শ্রেণীগত, ধর্মগত,

জাতিগত কোন পার্থক্য থাকবে না। একটিমাত্র ভারতীয় জাতি জন্ম নেবে, যাদের দৃষ্টিভঙ্গী শুধুমাত্র সঙ্কীর্ণ দেশ ভিত্তিক হবে না যাদের দৃষ্টি হবে সার্বভৌমিক। সকলে আমরা সবার তরে, এই হবে তাদের মানসিকতা এবং ভারত হবে বিশ্বের জনগণ কল্যাণ-যজ্ঞের অন্যতম প্রধান হোতা। ভারতীয় সাধনার এটাই ছিল বহু যুগ ধরে ব্যাপী মূলমন্ত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেশটাকে কোথায় এনে দাঁড় করান হয়েছে, অতি অল্পদিনের মধ্যেই তা ভেবে দেশের চিন্তাশীল মানুষেরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছেন। আদর্শকে ক্ষুদ্র স্বার্থ ও লোভের যূপকাষ্ঠে বলিদান করা হচ্ছে কল্পনাতীতভাবে। দল, গোষ্ঠি, ব্যক্তি সম্প্রদায় অঞ্চলের কল্যাণের ধুয়া তুলে তলে তলে কাজ করছেন যারা, তারা দেশপ্রেমকে বিসর্জন দিয়েছেন তাদের চরিত্র থেকে। পক্ষী বিশেষের দুর্নাম আছে যে যত উপরেই সে উঠুক না কেন তার দৃষ্টি থাকে ভাগাড়ের দিকে। এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এরা যত নীতি কথা উচ্চাদর্শ জনসেবার উদ্দেশ্যের কথাই বলুন না কেন তাদের দৃষ্টি কিন্তু নিবদ্ধ সেই নীচু তলায় যেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিগত লালসাকে।

এবারকার স্বাধীনতা উৎসব পালন দিবস উপলক্ষে হিসাব নিকাশ করতে হবে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, আদর্শ, নিষ্ঠা, ত্যাগব্রতীর মানসিকতা নিয়ে। অন্যথায় এই সমূহ সর্বনাশকে রোধ করা সম্ভব হবে না। দিল্লীর লালকেল্লায় যত বাহ্যাড়ম্বর করেই স্বাধীনতা দিবস পালন করা হোক না কেন, তাতে দেশের কল্যাণ সাধিত হবে না। তাই প্রয়োজন আজ সমীক্ষা নিরিক্ষার। গলদ কোথায় সেটা খুজে বের করতে হবে, সেই সব দোষ ত্রুটি দূর করে নতুন ভারত গড়ে তুলবার মন্ত্রে দীক্ষা নীতে হবে। যাদের অযোগ্যতা, অপদার্থতা, লোভ ও লালসা আজ দেশকে এই সর্বনাশা পরিস্থিতির মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে, জন জীবন থেকে তাদের চিরদিনের জন্য নির্বাসিত করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, রাসবিহারী বসু, নেতাজী সুভাষের নির্দেশিত নীতি ও পথ অনুসরণ করতে হবে। ক্ষেতে খামারে, কলে কারখানায়, সমাজের সর্বস্তরে যে যেখানে আছেন, তাদের আহ্বান জানাই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই মহৎ কাজকে সম্পূর্ণ করে তুলতে।

জয় হিন্দ্।

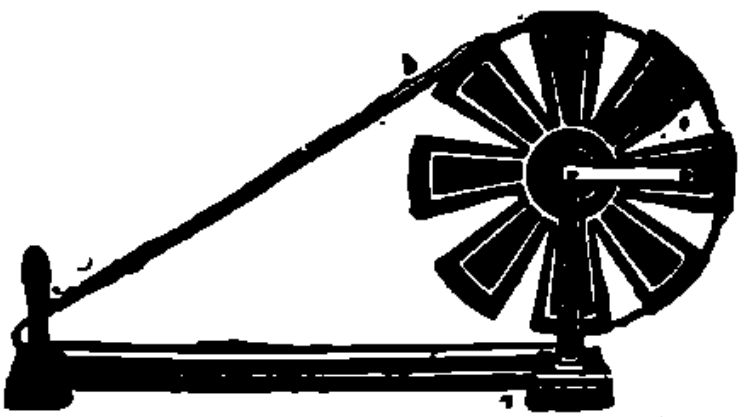

স্মরণীয় সালতামামি

★

(১৬ শ শতাব্দীর শুরু থেকে ১৯ শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত স্মরণীয় ঘটনাবলীর সময় ভিত্তিক বিন্যাস)

১৬০০ — রাণী এলিজাবেথের কাছ থেকে ইংল্যাণ্ডে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক সনদ লাভ।

১৬৯৮ — সুরাট, কালিকট, মাদ্রাজ ও কলিকাতায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন কাশিমবাজারের চক্রান্ত।

১৭৫৭ — পলাশীর যুদ্ধ। ২৩শে জুন মীরজাফর নবাব হলেন।

১৭৬০ — মীরজাফর গদীচ্যুত এবং মীরকাশিমের নবাবী লাভ। নতুন নবাবের সঙ্গে ইংরাজদের মত বিরোধ ও বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ।

১৭৬৪ — ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ, মীরকাশিমের পরাজয় এবং ফকির বেশে দিল্লী পলায়ন।

১৭৬৫ — বক্সার যুদ্ধে দিল্লীর সম্রাট, অযোধ্যার নবাব ও মীরকাশিমের সম্মিলিত সৈন্যদলের শোচনীয় পরাজয়।

১৭৬৯ — বাংলাদেশে প্রচণ্ড খরা,—ফসল শুন্য মাঠ,—পাতা শুন্য বৃক্ষ—কৃষকের হাহাকার।

১৭৭০ — বাংলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ—রোগের প্রাদুর্ভাব—কলেরা, বসন্ত, মহামারী।

১৭৭৫ — মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসী।

১৭৭৬ — বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ—কয়েক লক্ষ লোকের মৃত্যু।

১৭৮৪ — জমিদারী আইন পাশ।

১৭৯৩ — লর্ড কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন।

১৭৯৯ — অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলির বিদ্রোহ. ফলতঃ সাহনাথের রাজা জগত সিংহের নির্বাসন ও কাশীরাজ শিব সিংহের ফাঁসী। রাজা শিব সিংহ ভারতের দ্বিতীয় বলি।

১৮০৮ — বুন্দেলখণ্ডের বিদ্রোহ।

১৮১২-১৮ পাইক বিদ্রোহ ও মারাঠা যুদ্ধ।

১৮১৩ — বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বস্ত্র ও চট কল স্থাপন।

১৮১৪ — রামমোহন রায়ের কলকাতা-বাস।

১৮১৫ — রামমোহন কর্তৃক আত্মীয় সভার প্রতিষ্ঠা।

১৮১৭ ১৮ মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা।

১৮২৭ — ডিরোজিও কর্তৃক নব্য ভাবধারা প্রচার।

১৮২৮ — রামমোহন কর্তৃক সতীদাহ-প্রথা লোপ। ব্যারাকপুরে সৈন্য বিদ্রোহ।

১৮২৯ — দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে রামমোহনের 'রাজা' উপাধী লাভ।

১৮২৯-৩৩ আসামের খাসিয়া বিদ্রোহ।

১৮৩০ — দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর সাহের আবেদন সহ রামমোহনের বিলাত যাত্রা।

১৮৩১ — তিতুমীর এবং ওহাবীদের বিদ্রোহ, সফিউল্লা কর্তৃক ফরিদপুর বিদ্রোহ।

১৮৩২ — গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ। ময়মনসিং-এর হাজং ও মানভূমে বিদ্রোহ, মেদিনীপুর জেলার কর্ণগড় রাজ্যের রাণী কর্তৃক বিদ্রোহ ঘোষণা,
সন্ন্যাসী বরকন্দাজ ও পিণ্ডারী যুদ্ধ এবং সাঁওতাল-বিদ্রোহ।

১৮৩৩ — ইংরেজ আরোপিত সনদের বিরুদ্ধে টাউন হলে প্রতিবাদ সভা।
রামমোহনের মৃত্যু।

১৮৩৫ — সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা।

১৮৩৬ — বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার প্রতিষ্ঠা।
প্রতিষ্ঠাতা—দ্বারকানাথ ঠাকুর, গৌরীশংকর তর্কবাগীশ ও ঈশ্বর গুপ্ত।

১৮৪৫ — প্রথম শিখ যুদ্ধ।

১৮৪৭ — প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ।

১৮৪৮ — 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকা প্রকাশ।
দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ।

১৮৪৯-৫২ নীলকর সাহেবের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

১৮৫০ — দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ।

১৮৫১ — যশোহরে নীল বিদ্রোহ।

১৮৫৫ — মুঙ্গের ও ভাগলপুরে সাঁওতাল বিদ্রোহ।

১৮৫৬ — বিধবা বিবাহ আইন পাশ।

১৮৫৭ — সিপাই বিদ্রোহ শুরু এবং দুই বছর কাল ব্যাপী বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের ঘটনা. এই বিদ্রোহের উল্লেখযোগ্য নেতারা হলেন—নানাসাহেব, তাঁতীয়া তোপে, কুমার সিং, রাণী লক্ষ্মীবাঈ। দুই লক্ষাধিক ভারতবাসী এই বিদ্রোহে আত্মাহুতি দেয় এবং একে ভারতের প্রথম মুক্তি আন্দোলন বলে অভিহিত করা হয়েছে।

১৮৫৮ — ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবসান।

১৮৫৯ — নীল বিদ্রোহ ও ওহাবী বিদ্রোহ।

১৮৬০ — নীল দর্পণ নাটক ও মেঘনাদ বধ কাব্য প্রকাশ।

১৮৬১ — পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (দুই প্রতিপক্ষ—আহমদ শাহ আবদালী ও মারাঠা সেন্যদল)।

১৮৬৩ — মাদক বর্জন আন্দোলন।

১৮৬৭ — হিন্দু মেলা ও চৈত্ত মেলার প্রচলন।

১৮৭০ — কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 'ভারতসঙ্গীত' কাব্য রচনা।
মহারাষ্ট্রে রাণাডের নেতৃত্বে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত বিপ্লবী কার্য্যকলাপ।
ফাড্‌কে বিদ্রোহের সময়কালও প্রায় দুই বৎসর।

১৮৭১ — উত্তর প্রদেশের ওহাবী নেতা আমীর খাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। প্রতিশোধ স্বরূপ বিচারপতি নরম্যানকে হত্যা করেন আবদুল্লা, ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে।

১৮৭২ — রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর আই, সি, এস থেকে পদচ্যুতি।
বংকিম চন্দ্র কর্তৃক 'ধর্ম্ম দর্শন' পত্রিকার প্রকাশ।

১৮৭৫ — ইণ্ডিয়ান লীগ প্রতিষ্ঠা
আন্দোলন পরিদর্শনকালে লর্ড মেয়ো নিহত হলেন, ৮ই ফেব্রুয়ারী বিপ্লবী শের আলীর গুলিতে।
প্রথম গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা।

১৮৭৭ — নাগপুরে ব্যাপক ধর্মঘট।

১৮৭৮ — ফাড়াদার বিদ্রোহ।

১৮৭৯ — অস্ত্র আইন পাশ।

১৮৮০ — সাঁওতাল পরগণায় সাঁওতালদের সশস্ত্র বিদ্রোহ। মাদ্রাজে শ্রমিক ধর্মঘট।

১৮৮১ — প্রথম ফ্যাক্টরী আইন পাশ। নরেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন।

১৮৮২ — রংপুর বিদ্রোহ।

১৮৮৫ — লর্ড ডাফরিনের প্রচেষ্টায় অ্যালান অক্টেভিয়াস হিউম কর্তৃক জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।

১৮৮৬ — শ্রীরামকৃষ্ণদেব গলরোগে আক্রান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগ।

১৮৮৯ — 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সমিতি' নামে লণ্ডন শহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শাখা প্রতিষ্ঠা।

১৮৯২ — সার্বজনীন গণপতি উৎসব।

১৮৯৩ — মহারাষ্ট্রে গণপতি উৎসব। ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকায় ধর্ম মহাসভায় অধিবেশন শুরু। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ দান। শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

১৮৯৫ — শিবাজী উৎসব। চাপেকর সংঘ প্রতিষ্ঠা।

১৮৯৬ — বজবজে চটকল ধর্মঘট।

১৮৯৭ — বিপ্লবীগণ কর্তৃক লেফ্‌টেন্যান্ট আয়ার্স্টকে হত্যা (অংশ গ্রহণকারীগণ—নিবারণ ভট্টাচার্য, সতীশ মুখার্জী ও বিপিন গাঙ্গুলী)। আত্মোন্নতি সমিতির প্রতিষ্ঠা। মহারাষ্ট্রে র‍্যাণ্ডে হত্যা। তিলক রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত।

১৮৯৮-৯৯ — দামোদর চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসী। স্বামীজী কর্তৃক বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা।

১৯০২ — জাপানী কবি ওকাকুরার কলিকাতায় আগমন। স্বামীজীর দেহত্যাগ।

১৯০৩ — বীরাষ্টমী ব্রত উদ্‌যাপন। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা।

১৯০৫ — লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব। ১২ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্জন এশিয়াবাসীকে 'মিথ্যাবাদী' বলায় ভগিনী নিবেদিতার প্রতিবাদ। ৭ই আগষ্ট টাউন হলে প্রতিবাদ সভা। সমগ্র সভামণ্ডপ কালো কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়।
১৬ই অক্টোবর কবিগুরুর রাখীবন্ধন উৎসব ও অরন্ধন।

১৯০৬ — বিপণ কলেজে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক বিশাল সমাবেশ। অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে বরিশালে জনসভা। সারা বাংলায় হরতাল প্রতিপালন।
চারণ কবি মুকুন্দদাসের আবির্ভাব, স্বদেশী সংগীতের প্রচার ও গ্রেপ্তার বরণ। বঙ্গভঙ্গ সমর্থনে ঢাকার নবাব কর্তৃক জনসভার আয়োজন। টাউন হলে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে বিশাল জনসমাবেশ। বরিশালে কংগ্রেস কর্তৃক ভারতের প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও বিলাতী বর্জন। বারীন ঘোষ কর্তৃক যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ; প্রথম সম্পাদক—স্বামীজীর অনুজ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৯০৭ — 'সন্ধ্যা' পত্রিকার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ ও মামলা। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের বিবৃতি দান। সমস্তিপুরে রেল ধর্মঘট।

১৯০৮ — মজফেরপুরে অত্যাচারী কিংসফোর্ডের গাড়িতে বোমা নিক্ষেপের চেষ্টায় ভুল ক্রমে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি কর্তৃক দুজন ইংরাজ মহিলার গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ। ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তার ও ১লা মে মোকামায় প্রফুল্ল চাকির আত্মহত্যা। সমগ্র ভারতে শ্রমিক ধর্মঘট—এই ধর্মঘটের প্রতি কমরেড লেনিনের অভিনন্দন জ্ঞাপন। ৩২নং মুরারীপুকুর রোডে বোমার কারখানায় পুলিশের হানা ও একাধিক বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার। বোমার মামলা। ক্ষুদিরামের ফাঁসী। নরেন গোঁসাইকে হত্যা। সত্যেন বসুর ফাঁসি। নারায়ণগঞ্জে রেলের নিচে বোমা স্থাপন। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে হত্যা। ১০ই নভেম্বর কানাইলালের ফাঁসি।

১৯০৯ — দারোগা আশু বিশ্বাসকে হত্যা।

১৯১০ — ২৪শে জানুয়ারী নীরদ দত্তগুপ্ত হত্যা করেন পুলিশের ডি, এস, পি সামসুল আলমকে।

১৯১১ — ময়মনসিং-এ রামকুমার রায় ও বরিশালে মদনমোহন ঘোষাল নামক পুলিশ অফিসারদ্বয়কে হত্যা।
নিবেদিতার দেহত্যাগ।

১৯১২ — পুলিশ অফিসার মতিলাল রায়কে হত্যা। রাসবিহারীর নেতৃত্বে বসন্ত বিশ্বাস কর্তৃক দিল্লীতে বড়লাটকে হত্যার প্রচেষ্টা।

১৯১৩ — মৌলভী বাজারে গার্ডন হত্যার চেষ্টা। কলেজ স্কোয়ারে যোগেশ চক্রবর্তী বোমায় নিহত। হরিপদ ঘোষ ও বঙ্কিম চৌধুরী নিহত।
আমেরিকায় মোহন সিং বাসনার কাঠের কারখানায় তাঁর সভাপতিত্বে গদর পার্টির জন্ম। সম্পাদক হন লালা হরদয়াল ও কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপিত হয় ৪৪৬, হিল ষ্ট্রীট, সানফ্রান্সিস্কোতে।
রাসবিহারীর নেতৃত্বে সৈন্যদলে বিদ্রোহ ঘটানোর প্রচেষ্টা ও বহু নেতৃস্থানীয় সৈন্যের আত্মাহুতি।

১৯১৪ — বসন্ত চ্যাটার্জীকে হত্যার প্রচেষ্টা ও গোয়েন্দা রামদাসকে হত্যা।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।
আমেরিকার গদর পার্টির সভ্যদের জাহাজে বজবজ অবতরণ ২৭শে অক্টোবর বাবা গুরুদৎ সিং এর নেতৃত্বে। পুলিশের নৃশংস গুলি চালনা ; এবং শিখ বিপ্লবীদের পাঞ্জাবে প্রেরণের জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা। গুলি চালনার ফলে ১৮ জন বিপ্লবী নিহত ও বহু আহত হন।

১৯১৬ — গার্ডেনরিচ ও বেলেঘাটায় স্বদেশী ডাকাতি। রাসবিহারীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতব্যাপী বিপ্লব প্রচেষ্টা। ব্যর্থতার ফলে রাসবিহারীর ভারত ত্যাগ।

দিল্লী ও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা।

যতীন মুখার্জী (বাঘা যতীন) কর্তৃক বিদেশ থেকে অস্ত্র আনার প্রচেষ্টা। বালেশ্বর যুদ্ধ ও বাঘা যতীন-সহ অন্যান্য বিপ্লবীদের আত্মদান।

রাসবিহারীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে সৈন্য বিদ্রোহের দিন ধার্য্য হয় ২১শে ফেব্রুয়ারী।

পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুর জেলার জেলর চাঁদ সিং বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হয় ৩রা আগষ্ট। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী ডাবু সিংকে হত্যা করা হয়। ঐ মামলায় অনেক বিপ্লবীর ফাঁসি হয়।

১৯১৬ — গোয়েন্দা বসন্ত চ্যাটার্জীকে হত্যা।

১৯১৮ — আসামের গৌহাটিতে ও ঢাকার কলতাবাজারে সংঘর্ষ।

১৯১৯ — রাউলাট আইন। ১৪ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাব। সমগ্র ভারতে আন্দোলন শুরু। বৃটিশের দমনমূলক আইন পাশের প্রতিবাদে মদনমোহন মালব্য, মহম্মদ আলি জিন্না ও পণ্ডিত বিষ্ণু দত্ত শুক্লা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ ত্যাগ করেন জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাব প্রবেশের চেষ্টায় গ্রেপ্তার হন মালব্য ও দীনবন্ধু এনড্রুজ। দিল্লী প্রবেশকালে গান্ধীজীর গ্রেপ্তার বরণ। গান্ধীজী, দেশবন্ধু, এস, আর, জয়াকর ফজলুল হক ও আব্বাস তায়েবজীকে সদস্য রেখে কংগ্রেসের 'তদন্ত কমিটি' গঠন।

১৯২০ — সমগ্র ভারতে অসহযোগ আন্দোলন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে গণজাগরণ ও দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ। ২১শে অক্টোবর তাশখন্দে রাশিয়ার উদ্যোগে ভারতীয় কম্যুনিষ্টপার্টি সংগঠিত হয়। প্রথম নেতা অবনী মুখার্জী ও মানবেন্দ্রনাথ রায়।

১৯২১ — বাংলাদেশে অসংখ্য বাঙালীর আন্দোলন ও কারাবরণ। ১৯২২ খৃঃ স্বরাজ্য দল গঠন ১৯২১ সালে জাপানে রাসবিহারী কর্তৃক Indian Indepeuce League প্রতিষ্ঠা, দক্ষিণ ভারতের মালাবারে মুসলমান চাষী মোপলারা বিদ্রোহ করে।

১৯২২ — ৫ই ফেব্রুয়ারী উত্তর প্রদেশের চৌরীচৌরায় নিরস্ত্র জনতার উপর পুলিশের গুলিচালনা। ১৮ই মার্চ গান্ধীজীর গ্রেফতার বরণ।

১৯২৩ — কলিকাতা কর্পোরেশনে দেশবন্ধু প্রথম মেয়র ও সুভাষচন্দ্র প্রথম কর্মকর্তা নির্বাচিত হন। যুক্ত-প্রদেশের ২৪টি জেলায় বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন যোগেশ চ্যাটার্জী।

১৯২৪ — টেগার্ট হত্যার চেষ্টায় গোপীনাথ সাহার ফাঁসী। নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে গ্রেফতার।

১৯২৫ — বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে মেদিনীপুরে কর বন্ধ আন্দোলন। ৯ই আগষ্ট উত্তর প্রদেশের কাকোরী ষ্টেশনে ট্রেন ডাকাতি। ২৬শে নভেম্বর বিপ্লবী নেতা রামপ্রসাদ বিসমিলের গ্রেফতার।

১৯২৬ — বিপ্লবী সতীন সেনের নেতৃত্বে বরিশালের পটুয়াখালিতে সত্যাগ্রহ। ৮ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে আসফাকউল্লা গ্রেপ্তার হন।

১৯২৭ — জেলে ভূপেন চ্যাটার্জীকে হত্যার অপরাধে অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরীর ফাঁসি। কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন রামপ্রসাদ বিসমিল, রেশম সিং, রাজেন লাহিড়ী। আসফাক্‌উল্লার ফাঁসি হয়।

১৯২৯ — লাহোর জেলে ৬৩ দিন অনশনে যতীন দাসের মৃত্যু (১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর)
১৬ই মে পাঞ্জাবের শাহোরমপুরে বোমার কারখানায় গ্রেপ্তার হন গুরুপ্রসাদ, শিববর্মা ও জয়দেব কাপুর। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হন ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, রাজগুরু প্রভৃতি ৩২ জন।

১৯৩০ — 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স' দ্বারা অসংখ্য তরুণকে আটক। লবন আইন অমান্য আন্দোলন মেদিনীপুর আরামবাগ, হুগলী, খলুরঘাট প্রভৃতি স্থানে ব্যাপকভাবে কারাবরণ। ৮ই ডিসেম্বর চট্টগ্রাম লুণ্ঠন। ৮ই ডিসেম্বর বিনয়-বাদল-দিনেশ কর্তৃক রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযান। ২৫শে আগষ্ট পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্টকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়েন দীনেশ মজুমদার। ধৃত অনুজা সেনের আত্মহত্যা। ডাঃ ভূপাল বসু, দীনেশ মজুমদার, সুরেশ দত্তের দ্বীপান্তর।
৩০শে আগষ্ট ঢাকায় লোম্যান ও হডসনকে গুলি। ২৩শে ডিসেম্বর পাঞ্জাবে গভর্নর মনটোরে-নাসিকে হরিকিষেণ গুলি করেন।

১৯৩১ — ৭ই জুলাই দীনেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি, ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত নটায় হিজলী জেলে গুলি। জন গালিক্কে হত্যা ও কানাই ভট্টাচার্যের মৃত্যুবরণ। রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে হিজলীর গুলিচালনার প্রতিবাদে জনসভা।
২৬শে জানুয়ারী হরিকিষেণের ফাঁসি। ২৩শে জুলাই পুনা শহরে গভর্নর আরনোট হটম্যানকে গুলিতে আহত করেন বাসুদেব বলবন্ত গোখামী।

১৯৩১ — ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুর কলেজের প্রদর্শনীতে ম্যাজিস্ট্রেট পেডিকে গুলি করা হয়।

১৯৩২ — দ্বিতীয়বার আইন অমান্য আন্দোলন ও অসংখ্য কারাবরণ। ৩০শে এপ্রিল মেদিনীপুরে ডগলাসকে হত্যা। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসি। চট্টগ্রামের বলঘাটে যুদ্ধ। ঢাকায় পুলিশী প্রহারে অনিল দাসের মৃত্যু। ওয়াশনকে হত্যার প্রচেষ্টায় অতুল সেনের ইচ্ছা মৃত্যুবরণ, শৈলেশ্বর চক্রবর্তী ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দার-এর ইচ্ছামৃত্যু বরণ।

১৯৩২ — ২৪ পরগণা জেলার রাজার হাটে পুলিশের গুলিচালনা। মেদিনীপুরে পুলিশী প্রহারে সন্তোষ বেরার মৃত্যু। ৪ই ফেব্রুয়ারী সিনেট হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন চলাকালে বীণাদাস কর্তৃক বাংলার গভর্নর জ্যাকসনের উপর গুলিবর্ষণ। কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট ষ্টিভেন্সকে গুলিকরে

হত্যা করেন শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী। ২৬শে অক্টোবর পেডি হত্যাকারী বিমল দাশগুপ্ত, ইউরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ ডিলিয়ার্সকে গুলি করেন।

১৯৩৩ — বিপ্লবী কালিপদ মুখার্জীর ফাঁসি ও আন্দামান সেলুলার জেলে মহাবীর সিং, মানকৃষ্ণ দাস ও মোহিত মৈত্রের মৃত্যু। চট্টগ্রামে পুলিশের গুলিচালনা। দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি, ময়মনসিং-এ পুলিশ প্রহারে ধীরেশ দে-র মৃত্যু। মেদিনীপুরে অনাথ পাঁজা, নির্মল জানা ও রামকৃষ্ণ রায়ের ফাঁসি বার্জ হত্যার অপরাধে।

১৯৩৪ — সূর্য সেন (মাষ্টার দা) এর ফাঁসি। কুমিল্লায় অসিত ভট্টাচার্য, নারায়ণ গঞ্জে মতি মল্লিক ও মেদিনীপুর জেলে রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর মৃত্যু।

১৯৩৫ — এ্যাণ্ডারসন হত্যা প্রচেষ্টার অপরাধে ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসি। ঢাকায় কোতোয়ালী থানা অভিযানে পুলিশের গুলিতে নিহত হন রাধানাথ সেন ও হীরালাল দত্ত।

১৯৩৬ — আন্দামানে মোহিত অধিকারীর ও রাজসাহীর জেলে যক্ষ্মায় হেম ভট্টাচার্যের মৃত্যু।

১৯৩৮ — ঢাকা জেলে হরেন মুখার্জীর অনশনে মৃত্যু। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ।

১৯৩৯ — ২য় বিশ্বযুদ্ধের শেষে রাসবিহারীর প্রবাসী ভারতীয় সৈন্যদল গঠন।

১৯৪০ — গান্ধীজীর নেতৃত্বে একক সত্যাগ্রহ ও গ্রেপ্তার বরণ। পুলিশের প্রহারে অনিল দাশ ও প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

১৯৪১ — 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ও 'ভারত রক্ষা' আইন প্রয়োগ। অসংখ্য গ্রেপ্তার। বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু।

ঢাকায় গণ-আন্দোলনে হৃষিকেশ সাহা ও বিপুল বসাক এবং কলিকাতায় দিলীপ বসুর মৃত্যু। মেদিনীপুর, কাঁথি, তমলুক ও মহিষাদলে প্রচণ্ড আন্দোলন—বহু হতাহত, অসংখ্য গ্রেপ্তার। তমলুকে মাতঙ্গিনী হাজরার মৃত্যু। বাটানগরে গুলিচালনা।

১৯৪২ — সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান ও রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের দায়িত্ব গ্রহণ (৪ঠা জুলাই, সিঙ্গাপুরে)।

১৯৪৩ — মাদ্রাজ উপকূলে নৌবিদ্রোহ ঘটাবার অপরাধে মানকুমার বসু ঠাকুর ও অন্যান্যের ফাঁসি। রাসবিহারী কর্তৃক সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজী' নাম প্রদান। ২১শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৪ — কলিকাতায় শিবঠাকুর লেনে পুলিশের গুলিচালনা। নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ কর্তৃক মণিপুরে পতাকা উত্তোলন।

১৯৪৫ — ১১শে জানুয়ারী জাপানে মহানায়ক রাসবিহারীর মৃত্যু।

১৯৪৬ — ১৬ই আগষ্ট কলিকাতায় direct action।

১৯৪৭ — ভারতবর্ষ খণ্ডিত, পাকিস্তানের সৃষ্টি। খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা লাভ।

পরলোকে বিপ্লবদরদী শেখ মুস্তাক আহম্মদ

গত ১০ই জুন, ১৯৭৯ হাড়োয়া (২৪ পরগণা) নিবাসী অনুশীলন সমিতির গৃহী সভ্যা মহিয়সী নারী ছবেরা খাতুনের পরলোক গমনে অনুভূত বেদনা দূর হতে না হতে তাঁহার স্বামী অনুশীলন অনুরাগী শেখ মোস্তাক আহম্মদ গত ২৪শে জুলাই বেলা ২-১০ মিনিটে ৮৪ বৎসর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। মোস্তাক ভাইয়ের উদার মনোভাব ছবেরা খাতুনকে বিপ্লবী সংস্থা অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসার সুযোগ করে দিয়েছিল। স্বামীর চরিত্রবল আসার সুযোগ করে দিয়েছিল। স্বামীর চরিত্রবল, আদর্শনিষ্ঠা ও ত্যাগ স্ত্রীকে সকল কাজে প্রেরণা দিয়েছিল। আমরা এই দুঃখী দরদী নিষ্ঠাবান বন্ধুর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি—সমবেদনা জানাই তাঁহার পরিজন এবং আমাদের সহকর্মী গোলাম কুদ্দুস ভাইয়ের প্রতি।

পরলোকে বিপ্লবী শান্তিদেওয়ান

বিপ্লবী কর্মী শান্তিদেওয়ান গত ২৯শে জুলাই রবিবার দত্তপুকুরের বাটীতে পরলোক গমন করেন। প্রথম যৌবনেই বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। বাড়ী ছিল ফরিদপুর জেলার মালদহ গ্রামে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই একনিষ্ঠ কর্মী দির্ঘদিন কারাবাসে ছিলেন পরবর্তীকালে সংযুক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিষদের কর্মপথে সক্রীয় অংশগ্রহণ করেন। আমরা এই বন্ধুবৎসল একনিষ্ঠ বিপ্লবীর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি—তাঁর পরিবার পরিজনদের গভীর সমবেদনা জানাই।

গণতন্ত্রের সমাধি অনভিপ্রেত

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এখনই কমিশন বসিয়ে এর আশু প্রতিকার করা জাতীয় স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন। অনেক সময় ইতিপূর্বে অযথা নষ্ট হয়ে গেছে—আর সময় নষ্ট করা সমীচিন হবে না, কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের মর্যাদা রক্ষায় এখনই তৎপর হোন; কালক্ষেপে বিরাট ক্ষতি সাধিত হলে তখন অনুশোচনায় শুধু পরিতাপই ভোগ করা যাবে, কাজের কাজ আর কিছুই করা সম্ভব হবে না। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত ও অর্থনীতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে যে তথ্য ও তত্ত্ব মাঝে মাঝে ব্যক্ত করছেন, সে তত্ত্ব ও তথ্য কে সি পি এমও তুড়িমেরে উড়িয়ে দিতে পারছে না। কারণ তার ভিত বড় শক্ত মাটিতে প্রথিত ও সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁদের বক্তব্য হলো যে সি পি এম দলনেতারা বহুদিন ধরে শ্রমিক ফ্রন্টে কাজ করে বৃহৎ বৃহৎ পুঁজিপতিদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ সুবিধা পায় ও তারা ঘনিষ্ট হয়ে ওঠে পারস্পারিক স্বার্থে। ফলে বড় ধণিক-বনিক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়িক স্বার্থ যা বাস্তবক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই নয় তা সংরক্ষণে বর্ত্তমান বামফ্রন্ট তথা সি সি এম সরকার সবিশেষ যত্নবান দেখা যায়। এর প্রমান লুনিয়া লোডশেডিংএর আওতায় ঘন ঘন পড়ে, কিন্তু বিড়লাদেরও অন্যান্য বড় ধনীদের কলকারখানাগুলি সে তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম দুর্ভোগ ভোগে; আর তাছাড়া নিজস্ব বিদ্যুত ব্যবস্থা সর্বক্ষণ চালু রাখার জন্য যে সম্পদের অধিকারী হলে, জেনারেটার বসিয়ে বা জলবিদ্যুত উৎপাদন করে বা তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় উক্ত বড় ধনীদের তা আছে। তাদের সে সুযোগ দেওয়ার জন্যই বোধহয় বর্তমান সরকার, সরকারী বিদ্যুৎ কর্মীদের মধ্যে সিটুর ইউনিয়নের মাধ্যমে বিভেদমূলক ষড়যন্ত্র কায়েম করে সারা পশ্চিমবঙ্গে কৃত্রিম বিদ্যুৎ সংকট সৃষ্টি করে তাকে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ও যখন তখন লোডশেডিংয়ের নিমিত্ত খাড়া করে রেখেছে। এর মূলে বড় ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতা করা ও তাদের অতিরিক্ত বিশেষ সুবিধা দেওয়াই বোধহয় সি পি এম এর আসল উদ্দেশ্য এবং পাছে সেই ব্যাপার সর্বজন সমক্ষে সহসা প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাই তারা নিজ দলছাড়া আর সব মানুষকেই ষড়যন্ত্রকারী ও চক্রান্তকারী আখ্যা দিয়ে বাজার মাত করতে সদাই ব্যস্ত। মুখে দরিদ্রের বন্ধু সেজে, বড় ধনীদের সুকৌশলে তোয়াজ করার কায়দাকানুন সি পি এম ছাড়া আর কোন দলই জানে না বা এরূপ নোংরা কাজ করতে সম্ভবত ঘৃণা বোধ করে।

ঘন ঘন লোড-শেডিং-এর ফলে কারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়? ছোট ছোট কলকারখানার শ্রমিক ও মালিকরা অধিকাংশই বাঙ্গালী, দোকানদাররা, হোটেল ও বাজারের ফোড়েরা, সাধারণ গৃহস্থরা, ডাক্তার-নার্সরা, শিক্ষক-শিক্ষিকারা, ছাত্র-ছাত্রীরা, দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত ঘরের গৃহিনীরা, খেটে-খাওয়া মানুষের দল, গরীব ফেরিওয়ালারা, রিকসা চালকরা, রোগী ও প্রসূতিরা, ছোট ছোট ছাপাখানার কর্মী ও মালিকরা, সাংবাদিকরা, ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মীও কর্তারা অর্থাৎ প্রায় সকল শ্রেণীর সুস্থ ও নিম্নবিত্ত মানুষের দলই এর জন্য অকল্পনীয় ক্ষতি স্বীকারে বাধ্য হয়; কারণ এই সরকার এদের

সকলকেও জেনারেটার বসিয়ে নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুমতি দিয়েছে, যদিও সরকার জানে যে এদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনের তা করার মত তা আর্থিক সঙ্গতি নেই। সরকারের পক্ষে জেনে শুনে এই প্রকার রসিকতা বা মানুষকে ব্যঙ্গ করা কি সাজে? না তা করা বিধি সঙ্গত? সি পি এম দলের পক্ষে যে সবই সম্ভব তা গত দুবছরে প্রত্যক্ষ করা গেছে। সি পি এম নিজ দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়েই বিদ্যুৎ সংকটকে সাদরে ডেকে এনেছে, আর এখন সবদিক সমলাতে না পেরে পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের ঘাড়ে সবদোষ চাপিয়ে শ্লোগান ও দেওয়াল লিখনের সাহায্যে দেশের লোককে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সি পি এম রাজ্যপাটে বসার আগে প্রায় উনিশমাস এদেশে জরুরী অবস্থা চালু ছিল এবং জরুরী অবস্থাকালে একদিনের জন্যও একঘণ্টাকালও লোড-শেডিং হতে দেখা যায় নি। সি পি এম গদীতে বসার সঙ্গে সঙ্গে লোড-শেডিং, বিদ্যুৎ ঘাটতি শুরু হয়ে গেল এবং ক্রমান্বয়ে তা উত্তরোত্তর ভীমবেগে এমন ভীষণ আকার ধারণ করল যে পশ্চিমবঙ্গবাসী চোখে সরিষাফুল দেখতে আরম্ভ করেছে. এরপরও যদি সরকারের চেতনা না এসে থাকে, উল্টে সবাইকে চক্রান্তকারী বলে মিথ্যা সন্দেহ করার বাতিক চেপে থাকে; তবে বলার কিছু নেই। সরকার মনে হয় কৃতকর্মের দোষে নিজের বিপদ ও পতন নিজেই ডেকে আনছে—দ্রুত গতিতে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবেই কারণ তা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। বিরোধীদল সরকারের এবম্বিধ অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করার জন্য সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলে বা সভাসমিতিতে সরকার বিরোধী ভাষণ দিলে বা সরকার বিরোধী আন্দোলনের জন্য জনগণকে ডাক দিলে তা হবে চক্রান্ত এবং সরকার এই তথাকথিত কাল্পনিক চক্রান্তের মোকাবিলায় ক্যাডারদের মিথ্যা ভাষণের মাধ্যমে উত্তেজিত করে বিরোধীদের পারিবারীক নির্যাতনের ব্যবস্থাপত্র দেবে—এ ব্যবস্থা কোন গণতান্ত্রিক প্রথায় দেখা যায়? এ সরকার নিজে বাঁচার জন্য কেন্দ্রের কাছে সংসদীয় গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে সব রকম সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিজের দল সি, পি, এমকে একক ভাবে তা ভোগ করার অধিকার দেয়, এমন কি শরিক দলগুলিকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত কোরে, কিন্তু এ রাজ্যের মানুষ সংসদীয় গণতন্ত্রের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ থেকে প্রায় বঞ্চিত বললেই সত্য বলা হবে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর ভাল মন্দের কথা চিন্তা না করে. যে সরকার কেবল তার দলীয় স্বার্থ পূরণে সদা নিযুক্ত ও ব্যতিব্যস্ত: সে সরকার সাধারণ মানুষের কি হিতসাধন করবে? সাধারণ মানুষের কাছে তাই এ সরকারের কোন মূল্যই নেই। এ সরকার থাকলেই বা কি লাভ, আর অপসারিত হলেই বা কি ক্ষতি? সরকারও যেমন দল বৃদ্ধি, দলবাজী, দল প্রাধান্য ও দলসর্বস্ব ছাড়া আর সব বিষয়ে উদাসীন, অমনোযোগী এবং নিস্পৃহ: পশ্চিম বঙ্গের বৃহত্তম জনসমষ্টিও তেমন এই-সরকারের কাজে অসন্তুষ্ট, সন্দিহান এবং চূড়ান্তরূপে বিরক্ত। কাজেই এই সরকারকে গদীচ্যুত করার জন্য স্বার্থান্বেষীরা ছাড়া বাকি সব দল, মত ও পথের জনগণ ঐক্যবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হয়ে তাদের সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে বৃহত্তম জনসমষ্টিকে সঙ্গে নিয়ে আজ যদি তা সকল কোরে তুলতে পারে; তবে কেন তারা পশ্চাৎপদ হবে? জন স্বার্থেই বামফ্রন্ট তথা সি, পি, এম সরকারকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উপায়ে উৎখাত করাই হবে বিরোধীদলের ও বিরুদ্ধবাদীদের প্রধান এবং প্রথম কাজ। অন্যথায় অদূর ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হবে হেথায়।

———

মার্কসবাদের পটভূমি ও পরিণতি

॥ কালীপদ সরকার ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপের কারণে কার্ল মার্কসকে ইতিপূর্বে জার্মানী ছাড়তে হয়েছিল। তিনি সস্ত্রীক প্যারিসে বাস করছিলেন। এবার তাঁকে ফ্রান্সও ছাড়তে হল। অপর দার্শনিকদের থেকে এখানে মার্কসের বৈশিষ্ট্য, তিনি শুধু তাত্ত্বিকই ছিলেন না, নিজের মতবাদ কার্যে রূপায়িত করতে সুচেষ্টিতও হয়েছিলেন। যদিও সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। তবুও মার্কসীয় সমাজ বিপ্লবের ধারণা তদানীন্তন ইউরোপের চিন্তাক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি যে করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যার পরোক্ষ ফল হয়েছিল কলকারখানার শ্রমিক কল্যাণ-মূলক বিধি বিধানের প্রবর্তন।

মার্কস সহযোগী এঙ্গেলস ছিলেন জার্মানীর এক ধনী বস্ত্রশিল্প মালিকের পুত্র। প্যারিসে মার্কসের সঙ্গে প্রেডারিক এঙ্গেলসের পরিচয় হয় এবং পরিচয় উভয়ের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্বে পরিণতি লাভ করে। এই প্রসঙ্গে আর একজনের নাম স্মরণীয় তিনি হলেন মার্কস পত্নী, স্বামীর দুর্যোগ ভরা জীবনের তিনি ছিলেন দরদী সহচরী।

মার্কস প্যারিস থেকে গেলেন ব্রুসেলসে এবং সেখান থেকে লণ্ডনে। সুতাশিল্প উপলক্ষে এঙ্গেলসের ইংলণ্ডে যাতায়াত ছিল। এঙ্গেলসের সুবিধাতে মার্কসের লণ্ডন বাসের ব্যবস্থা হল। এই সময় ব্রিটেন ও জার্মানীর মধ্যে ছিল ঘোরতর প্রচ্ছন্ন শত্রুতা। জার্মানীর নিকট অবাঞ্ছিত রাষ্ট্রদ্রোহীর ব্রিটেনে আশ্রয় পেতে বেশি অসুবিধা হল না। কার্ল মার্কস বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে সরিয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিলেন লণ্ডন মিউজিয়ামের পাঠাগারে পড়াশুনা নিয়ে। লণ্ডনে বাসকালে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক গ্রন্থ 'ডস্ ক্যাপিটাল' রচনা করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কার্ল মার্কসের মৃত্যু ঘটে।

যে ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টি তত্ত্ব মার্কসীয় দর্শনের নির্ভর ভূমি, আধুনিক পরমাণু বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে তা আর তেমন বিচার গ্রাহ্য নয়। পরমাণুর বিস্ময় রহস্যময় প্রকৃতির মধ্যে বিজ্ঞানীরা এমন এক সত্যের সন্ধান পেয়েছেন যা জড়বাদের ভিত্তিকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। সেই সঙ্গে এতদিনকার স্বীকৃত বিবর্তন তত্ত্ব ও কার্ল মার্কসের আনুমান প্রামাণ্য যুক্তি ভেঙ্গে পড়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

মার্কসবাদের প্রয়োগ ক্ষেত্র কোন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রেই মার্কসের সিদ্ধান্ত সম্মত মানুষের সামর্থ অনুযায়ী কাজ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রব্য পরিমাণ ও চাহিদা অনুযায়ী পারিশ্রমিক দানের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। তাই পারিশ্রমিক সবত্রই অসমান। উপার্জনের অসাম্য হেতু সকলের জন্য জীবনযাত্রার মানও একরূপ করা সম্ভব হয়নি। ফলে সমাজে নতুন শ্রেণী বিন্যাস ঘটেছে। শ্রেণীহীন সমাজ গড়ার সম্ভাবনা হয়েছে সুদূর পরাহত। এত ভাঙ্গাচোরা রক্তপাতের পরে, কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে যদি শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজই না হল, তাহলে মার্কসবাদের বৈপ্লবিক আবেদনের আর রইল কি? টম, হ্যারি, ডিককে লোপাট করে জ্যাক, জিক সামকে শূন্যস্থানে বসিয়ে বিপ্লব একটা করা যায়

বটে তবে সে বিপ্লবের চরিতার্থতা কি? এ প্রশ্ন উঠেছে কমিউনিজমের খাস প্রয়োগ ভূমিতে।

শোধনবাদ এবং মার্কস সূত্রের নিত্য নতুন ভাষ্য ও প্রতিভাষ্যের প্রয়োজন থেকেই মার্কসবাদের বাস্তব-হীনতা প্রতীয়মান। তথাকথিত শ্রমিক একনায়কত্ব শাসিত কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির পরস্পর হানাহানি মার্কসীয় শ্রমিক ঐক্য ও আন্তর্জাতিকতার ব্যর্থতাও বিশ্বমানসে প্রতিভাত।

তাহলে মার্কস তত্ত্বে ইতিবাচক কি কিছু নেই? এমন বহু প্রশ্ন আছে, যার সম্যক উত্তরদান সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। এসম্পর্কে এইটুকু বললেই বোধহয় যথেষ্ট যে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির বৈষয়িক উন্নতির পিছনে মার্কসবাদের ভূমিকার চেয়ে বড় যা আছে তা হল আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যাকে দ্রুত আয়ত্ত করে, রেজিমেণ্টেড শ্রমিক-কর্মচারীর নিরলস কর্ম ও পরিকল্পিত জাতীয় উদ্যোগ। এ ধরনের বৈষয়িক সাফল্য কেবল কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ নয়। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, পশ্চিম জার্মানী, সুইডেন প্রভৃতি অকমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের বৈষয়িক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করলেই এ কথার সারবত্তা বোঝা যায়। এমন কি এ সকল দেশের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান ও কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের শ্রমিকদের চেয়ে উন্নততর।

কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে মানুষ বেকার থাকে না। রাষ্ট্র সকল কর্মক্ষম ব্যক্তিকে কাজ দেয়। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে মানুষের পছন্দ মত কাজ বেছে নেওয়া স্বীকৃত বলেই সেখানে বেকারির সৃষ্টি হয়। উন্নত গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে বেকারদের ভাতা দেওয়াও হয় এবং সকল কর্মক্ষম ব্যক্তির কাজের অধিকার ও আইনের দ্বারা স্বীকৃত। হাজার বছরের পরাধীনতা ও অর্থনৈতিক শোষণ জর্জরিত ভারতের ন্যায় বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশের পক্ষে বিশ ত্রিশ বছরে উন্নত দেশের সম পর্যায়ে উন্নীত হওয়া সহজ নয়। উন্নয়ন প্রচেষ্টার কমপন্থাও এখানে ভিন্ন হতে বাধ্য।

যে দেশে মানুষের সংখ্যার তুলনায় কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ কম, খনিজ দ্রব্য সীমিত, সেখানে Labour saving service অনুযায়ী আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রযুক্ত উৎপাদন ব্যবস্থা বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায়। রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে লোকসংখ্যার তুলনায় প্রচুর বাড়তি কৃষিভূমি, বিশাল অরণ্য ও নানাবিধ খনিজ সম্পদ থাকায়, সেখানকার প্রযুক্তি কৌশল ভারতের ক্ষেত্রে উপযোগী নাও হতে পারে। কোন দেশের উন্নতির মূলে মার্কসবাদের মাত্রিক নয়; পরিকল্পনা, উদ্যোগ ও জাতীয়তাবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত কঠোর শ্রমই হল সাফল্যের মৌল কারণ।

পরলোকে হরিপদ বণিক

ঢাকার অনুশীলন সমিতির একনিষ্ঠ কর্মী হরিপদ বণিক গত ৭ই আগষ্ট কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। কৈশোরেই তিনি বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন। দেশ সেবার কাজে বহুবৎসর কারাবাস করেন। পরবর্তীকালে কলিকাতায় বসবাস করেন এবং সমাজ সেবায় বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি এবং পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাই।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত
বরিশাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এবারে আমি বরিশাল কনফারেন্সের ঘটনার দিকে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আমি এই কনফারেন্সের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত ছিলাম। কনফারেন্সের কয়েকদিন পূর্বে আমাদের কর্মীদের মধ্যে কয়েকটি সমস্যার উদ্ভব হয়। সেই সমস্যার সমাধানের জন্য আমি ঢাকা যাই। সেখানে আমাদের কাজ শেষ হলে আমরা জাহাজে চড়ে ঢাকা থেকে বরিশাল রওনা হলাম। সন্ধ্যার সময় আমরা সেখানে পৌঁছে দেখি কলকাতা এবং অন্যান্য স্থান থেকে ডেলিগেটগণ ইতিমধ্যেই সেখানে এসে গেছেন। তারা তখনও তাদের জাহাজ থেকে নামেননি ; আমাদের আগমনের জন্য জাহাজেই প্রতীক্ষা করছেন। কয়েকটি প্রশ্ন তাদের মনে জাগে এবং সে প্রশ্নগুলি খুবই মৌলিক বলে তারা মনে করেন। তাই জাহাজ থেকে অবতরণ করার পূর্বেই সে সম্পর্কে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চান। বরিশালের রাস্তায় 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। শুধু বরিশালেই নয়, সারা পূর্ববঙ্গেই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আমাদের মত হল এই নিষিদ্ধকরণ আদেশ অবৈধ, বেআইনী। যোগ্য আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণের অভিমতও তাই। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হল। আমরা কি এই বে-আইনী আদেশ দাতা স্বৈরাচারী শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট মাথা নত করব? আত্ম-সম্মান বোধ যার আছে সে কখনও তা করতে পারে না। কিন্তু বরিশালের নেতৃবৃন্দ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটা সর্তে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। সে সর্তটি হল এই যে ডেলিগেটগণের সম্বর্ধনাকালে রাস্তায় 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করা হবে না। তাহলে আমরাও কি সেই সর্তে আবদ্ধ? অপেক্ষাকৃত তরুণ ও উৎসাহী প্রতিনিধিগণের মত হল, এই সর্ত থাকা সত্ত্বেও আমরা 'বন্দেমাতরম ধ্বনি করব, আমাদের মধ্যে একটা আপোষ হল। তাতে সঙ্গে সঙ্গেই সকলে রাজি হলেন এবং সকলের কাছেই তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হল, আলোচনায় এই রকম একটা মত প্রকাশ পেল যে বরিশালবাসীরা আমাদের আমন্ত্রণকারী আর আমরা হলাম তাদের অতিথি, সুতরাং আমাদের যথাসম্ভব এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে তাদের কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় ; তবে এ কথাও ঠিক যে প্রতিনিধিগণের তাদের আইনানুগ অধিকারও বজায় রাখতে হবে। আর সেদিক বিবেচনা করলে পূর্ববঙ্গ সরকারের স্বৈরাচারী আদেশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রাজ পথে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করার অধিকার তাদের আছে। বরিশালের নেতাদের সঙ্গে যে সর্ত হয়েছে তা হল প্রতিনিধিগণের সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের সময় এ ধ্বনি না করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সর্তের মধ্যে এর বেশী আর কিছু নেই। অতএব জাহাজের মধ্যেই বরিশালের নেতাদের সম্মতিক্রমেই সাব্যস্ত হল যে বরিশালের নেতাদের সঙ্গে যে সর্ত হয়েছে তাকে মর্য্যাদা দেওয়া হবে কিন্তু সম্মেলনের অন্যান্য অনুষ্ঠানের সময় আমরা 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করব এটা ধরে নিয়ে যে সে সময় ধ্বনি করার বিরুদ্ধে সরকারের কোন নিষেধ আদেশ নেই। এই সিদ্ধান্তে একমত

হয়ে প্রতিনিধিগণ সন্ধ্যার সময় জাহাজ থেকে অবতরণ করলেন।

মিঃ বিহারীলাল রায়ের বাড়ীতে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। তিনি ছিলেন লাকুটিয়ার জমিদার এবং বৈবাহিক সূত্রে আমার আত্মীয়। মিঃ বিহারী লাল রায় কখনও কোন জনসাধারণের কাজের মধ্যে আসেন নি। তিনি তাঁর জমিদারী কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতেন, তাঁর সময়ও যেমন ছিল না, তেমনি কোন গণ-আন্দোলনের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ অন্যান্য আরও অনেকের মত তাঁকেও তাঁর নিভৃত পরিবেশ থেকে বাইরে টেনে আনল এবং তিনি দেশ বিভাগ বিরোধী আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনের একজন অতি উৎসাহী সমর্থক হয়ে দাঁড়ালেন এবং সেইভাবেই তারপর থেকে তিনি চলেছেন, তাঁর মত লোকের পক্ষে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলাই স্বাভাবিক। কিন্তু জন-মত এতই প্রবল হয়ে দেখা দিল যে অবিরাম ঘূর্ণী স্রোত তাঁকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেল, তিনি জাতীয় দলে যোগদান করলেন।

১ই এপ্রিল শনিবার প্রাদেশিক সম্মেলন বসবে। এদিনই সকালবেলা মিঃ বিহারীলাল রায়ের বাড়ীতে আমি যেখানে ছিলাম সেখানে এক বৈঠক বসল। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সকলেই সেই বৈঠকে উপস্থিত হলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন এন্টি সার্কুলার সোসাইটির প্রতিনিধিগণ। এই সমিতিটি অল্প কিছুদিন পূর্বে গঠিত হয়েছিল। এর সম্পাদক ছিলেন মিঃ শচীন্দ্রপ্রসাদ বোস এবং সভাপতি ছিলেন মিঃ কৃষ্ণকুমার মিত্র। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল, ছাত্রদের কাজে বাধা সৃষ্টির জন্য বাংলা সরকার যে সার্কুলার জারি করেছেন তার বিরোধিতা করা। এই সমিতির মধ্যে বেশ একদল নিষ্ঠাবান 'স্বদেশী' কর্মী ছিলেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বয়সে তরুণ। 'স্বদেশী' কাজে তারা বেশ মূল্যবান সেবা দান করেছেন।

(চলবে)

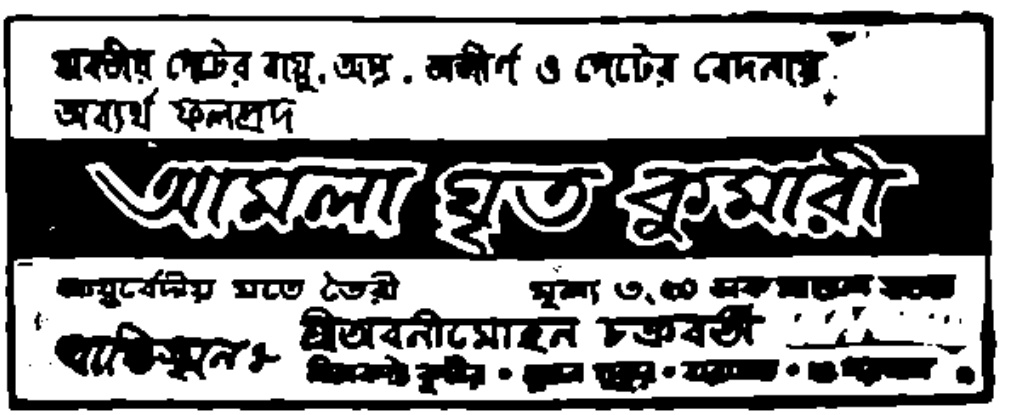

RgedNo. R. N. 24811/71 | Biplabi Bangla Phone : 34-1795 | Regd. WB/NC 77

বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | বাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

2 1 AUG 1979

বিপ্লবী পুস্তকমালা

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের—৩.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ বসুরায়ের—৩.০০

ক্ষীরোদ কুমার দত্তের

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০

২। ভারতীয়তে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০

৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০

৪। পৌরাণী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০

৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫

৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—.৪০

৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি— ০

৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—.৬০

৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০

১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৪০

১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—.৪০

১১। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.১৫

১৩। দেশ বন্ধুর ডোপেমি (১)—১.০০

১৪। দেশ বন্ধুর ডোপেমি (২)—২.০০

১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০

১৬। ১৩ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০

১৭। হার্ডিঞ্জ হত্যা প্রচেষ্টা—.১৫

১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৪.০০

১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৫০

২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :—৯নং বলরাম দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

শৈলশ্রী—১/১/১/A ,বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

— সম্পাদক মণ্ডলী —

শ্রীঅনাদি গোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীঅমরেশচন্দ্র মন্ত্রী, শ্রীপুলিন চ্যাটার্জী

সম্পাদক—শ্রীশান্তি শরণ রায়চৌধুরী

বিপ্লবী বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতারা—শ্রীমনগোপাল পাল।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীসুধেন্দু সোম।

বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৯নং বলরাম দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাংলা

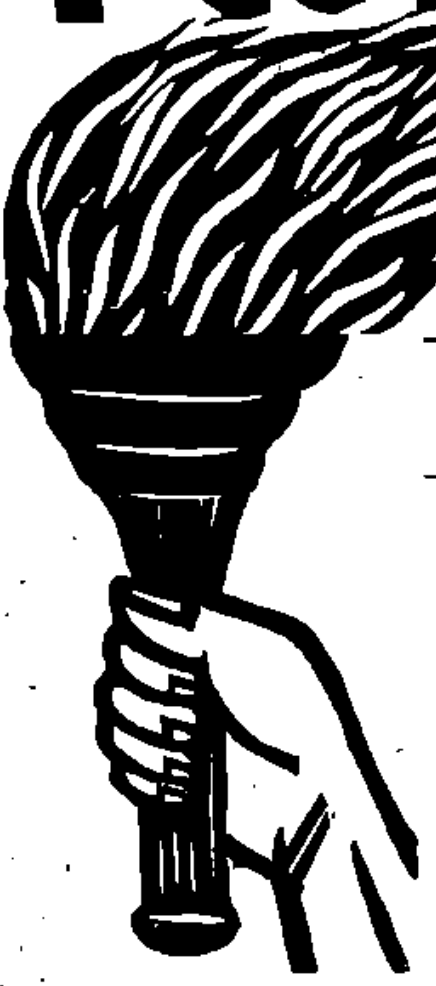

বিপ্লবী পত্রিবদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭৯

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ৮ই ভাদ্র, ১৩৮৬ ২৫শে অগাষ্ট, ১৯৭৯	৪৫ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

সরকার গড়বে কে ?
। সম্পাদকীয় ।

রাজনীতির গতিপ্রকৃতি
। শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ।।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস
। শীতোষ গুহ ।

জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসম্মেলনের ভবিষ্যৎ
।। কালীপদ সরকার ।।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা
। অধ্যাপক মণিমোহন দাশগুপ্ত ।

ঐতিহ্য ধ্বংশ করা চলবে না
।। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাস ।।

অরবিন্দ লহ প্রণাম

ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো
স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
মূর্তিমন্ত মায়ের স্নেহ !
গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি

বালেশ্বর আত্মোৎসর্গ স্মারক সমিতি

চতুর্ষষ্টীতম স্মারক দিবস

সবিনয় নিবেদন,

বিগত ৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ ঐতিহাসিক বালেশ্বর চাষখণ্ড প্রান্তরে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে মহান্ বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বীর বিপ্লবী-চতুষ্টয়ের আত্মনিবেদনের চতুর্ষষ্টীতম পবিত্র স্মারক দিবস উদ্‌যাপিত হইবে আগামী ৯ সেপ্‌টেম্বর ১৯৭৯ সকাল ৯ ঘটিকায় কলিকাতায় আজাদ হিন্দ্ বাগে যতীন্দ্রনাথের মর্মর মূর্তির সম্মুখে। উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন প্রখ্যাত বর্ষীয়ান বিপ্লবী নায়ক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী মহাশয়।

আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করি।

নিবেদক—

১৫ আগষ্ট ১৯৭৯
৪ বল্লভ দাশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীপুষ্পরঞ্জন চাট্টোপাধ্যায়
শ্রীপ্রভাংশু ধর চৌধুরী

বিঃ দ্রঃ—১০ সেপ্টেম্বর বালেশ্বর অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য রক্ততীর্থ যাত্রিগণ ৯ সেপ্টেম্বর রাত্রি ৯ ঘটিকায় হাওড়া হইতে যাত্রা করিবেন। যাতায়াতের ভাড়া ১৫ টাকা ধার্য।

সম্পাদকীয়—

সরকার গড়বে কে ?

বিপ্লবী বাংলার গত ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৭৯ সংখ্যায় আমাদের রাজনৈতিক প্রতিবেদক যে অনুমান করেছিলেন কেন্দ্রের চরণ সিং নেতৃত্বাধীন সরকারের আয়ুষ্কাল সম্পর্কে তাই অবশেষে সত্য প্রমাণিত হল—তবে আটাশ দিনের পরিবর্তে এই সরকারের পরিসমাপ্তি ঘটল মাত্র বাইশ দিনেই। দেশের বর্তমান অচল পরিস্থিতির একমাত্র দাওয়াই মধ্যবর্তী নির্বাচন, এ চিন্তারও বাস্তবায়ন দেখা গেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক লোকসভার সমাপ্তি ও ডিসেম্বরের মধ্যে নির্ব্বাচনের ঘোষণায়।

আসন্ন নির্ব্বাচনের ফলশ্রুতি কি হবে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। দেশের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলি কে কোন্ মোর্চায় অন্তর্ভুক্ত হবে, নতুন কোনো জোট তৈরী হবে কি না, হাওয়া কোন দিক বইবে—নির্বাচনের প্রায় চার মাস আগেই এ সব সম্পর্কে কোন ভবিষ্যতবাণী করা সম্ভব নয়। তবে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষীতে একথা অনুমান করা যায় যে কেন্দ্রের পাঁচমিশালী দলগুলি যথা জনতা (সংসদীয়) ও জনতা (এস) এর অবস্থার বিশেষ অবনতি ঘটবে সর্ব্বসম্মত প্রার্থী নির্ব্বাচনে। পক্ষান্তরে ব্যষ্টী নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস (আই) নির্বাচনে ভাল ফল দেখাবে—যেহেতু প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই দলকে বিশেষ বেগ পেতে হবে না, পরন্তু নির্বাচনী প্রচারের জন্যও এই দল প্রচুর সময় হাতে পাবে। বামপন্থী দলগুলি যথা সি, পি, এম, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর, এস, পি, পি, ডব্লু পি, এবং সোস্যালিষ্ট দল হয়তো এক জোটে নির্বাচনে লড়বে, কিন্তু তাদের ক্ষেত্রেও সিট ভাগাভাগির প্রশ্নে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হবে—'৭৭ এর নির্বাচনের মতো সহজেই নির্বাচন-বৈতরণী পার হওয়া যাবে না। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি জন গণতান্ত্রিক বামজোটের কথা মুখে বললেও কর্মক্ষেত্রে সম্ভবতঃ সেদিকে যাবে না বরং ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে একটি নির্বাচনী সমঝোতা গড়ে তুলতে চাইবে। সবচেয়ে করুণ অবস্থা হবে স্বর্ণ সিং কংগ্রেসের। চরণ সরকারের মন্ত্রীত্বের লোভে এরা যেভাবে নিজস্ব নীতি বিসর্জন দিয়েছিল তাতে যে কোন জোটের সামিল হলেও নির্বাচনে খুব একটা ফায়দা তুলতে পারবে না। বরং সাম্প্রদায়িক দলে চিহ্নিত জনসংঘ তাদের বর্তমান শক্তিকে অনেকটা বাড়িয়ে ফেলবে বলে মনে হয়। অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলির সাফল্য নির্ভর করছে তাদের নীতি ও তার যথাযথ প্রচারের ওপর।

কেন্দ্রের শক্তিবিন্যাস যাই হোক মধ্যবর্তী নির্বাচনেও আমরা হয়তো আর একটি কোয়ালিশন সরকারই পাবো। তবে তা হবে অন্ততঃ বর্তমানের চেয়ে সুদৃঢ় ও স্থিতিশীল—যেহেতু তাতে অংশ নেবে বড়জোর দুটি কি তিনটি দল—তাদের সংযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দেখিয়ে।

———

জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্মেলনের ভবিষ্যৎ

॥ কালীপদ সরকার ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন ঘটল। ইউরোপ সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীনে অকমিউনিষ্ট দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক শিবিরে ভাগ হয়ে গেল। ভেঙ্গে পড়ল পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি এবং জাপানের সাম্রাজ্য। স্বাধীন হল এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশ। খণ্ডিত হল ভারতবর্ষ, জার্মানী, কোরিয়া এবং ভিয়েতনাম। যুদ্ধ শেষ হলেও শান্তি স্থাপিত হল না, উত্তেজনা কমল না। পৃথিবীময় ক্ষমতা বিস্তারের প্রতিযোগিতা শুরু হল দুই বিশ্বশক্তির মধ্যে, প্রতিযোগিতা ঠাণ্ডা লড়াইএর রূপ নিল। এমন সময় চীনে কমিউনিষ্ট বিপ্লব ঘটল, জন্ম নিল প্রজাতন্ত্রী কমিউনিষ্ট চীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য নির্ভর জাতীয়তাবাদী চীন সরকার হটে গিয়ে আশ্রয় নিল ফরমোসা দ্বীপে। যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবার উপক্রম হয়েছিল তা আকস্মিক ভাবে বন্ধ হল সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় আণবিক অস্ত্র নির্মাণের পারদর্শিতা লাভে। প্রতিপত্তি বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তবু অব্যাহত রইল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিষ্ট প্রভাব প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে গড়ল সিয়াটো, সেন্টো এবং ন্যাটো সামরিক জোট, প্রতিরক্ষার তাগিদে সোভিয়েত রাশিয়া গড়ল ওয়ারসো চুক্তিবদ্ধ কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রজোট। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলিকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চলল দুই পক্ষ থেকে।

ভারত দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম রাষ্ট্র, ভারতকে দলে ভিড়াবার কূট কৌশল ও চাপ সৃষ্টি হল উভয় শিবির থেকেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু চাপের নিকট নতি স্বীকার না করে ভারতকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জোটের বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। তিনি যে জোট নিরপেক্ষ নীতি প্রচার করলেন, তাকে স্বাগত জানালেন যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মারশাল টিটো, মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুকর্ণ। শ্রীলংকা, আফগানিস্থান, নেপাল প্রভৃতি রাষ্ট্র এই নীতির সহিত নিজেদের যুক্ত করল। এইভাবে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে উঠল। আন্দোলন নীতি-গতভাবে একটি জোট নিরপেক্ষ জাতিগুলির সম্মেলনে পরিণত হল। বর্তমানে সম্মেলনের সদস্য সংখ্যা নব্বুই। জোট নিরপেক্ষ নীতির উদ্ভাবক হিসাবে পণ্ডিত নেহেরুর অবদান ঐতিহাসিক।

জোট নিরপেক্ষ জাতি সম্মেলন মুখ্যতঃ অতীতের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করায় সোভিয়েত রাশিয়ার পরোক্ষে সমর্থন লাভ করে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক সুয়েজ অধিকারের জন্য মিশর আক্রমণ, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে কঙ্গোর মুক্তিযুদ্ধ এবং কোরিয়ার যুদ্ধকালে জোট নিরপেক্ষ জাতি গোষ্ঠি যে সফল ভূমিকা নেয় তাতে তাদের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে, কিন্তু ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গারি এবং ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চেকোস্লোভা-

কিয়ার গণ অভ্যুত্থান কালে তাদের নিষ্ক্রিয়তা আন্দোলনকে নিঃসন্দেহে বিরূপ সমালোচনার কারণ হতে হয়। তখন জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন যেন সোভিয়েত রাশিয়া প্রভাবিত সংস্থার প্রকৃতি নেয়। সম্মেলন নির্ভর করে তার শান্তির আদর্শ ও যুক্তিনিষ্ঠ প্রচার শৈলীর উপর। সদস্যবর্গ বিভিন্ন মতবাদ আশ্রয়ী হওয়ায় সংগঠনের কর্মসূচী দৃঢ়তাপূর্ণ হতে পারে না। এদের মধ্যে যেমন আছে মধ্যপন্থী ভারত, যুগোশ্লাভিয়া, মিশর, তেমনি আছে চরমপন্থী কিউবা, ভিয়েতনাম, এ্যাংগোলা, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া। সুতরাং অতি সাধারণ বিষয় ছাড়া মতৈক্য স্থাপনের কাজে সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রায়ই হিমসিম খেতে হয়। নেহেরুর সময় এমন অবস্থা ছিল না।

আন্তর্জাতিক প্রশ্নে মতবিরোধ ছাড়াও সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আছে বহু দ্বিপাক্ষিক বিরোধীয় বিষয় যার মীমাংসার কোন সুযোগ নেই জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে। এই শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকে দুই বিশ্ব শক্তির প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগে যে পরিবেশে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন শুরু হয়েছিল বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে উত্তেজনা হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে ভাবজগতের দূরত্ব কমেছে। অভ্যুদয় ঘটেছে তৃতীয় বিশ্ব শক্তি চীনের। দুই বৃহৎ কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র রাশিয়া ও চীনের বিরোধ আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন মোড় এনেছে। ফলে জোট নিরপেক্ষ জাতি সম্মেলনের পক্ষে অতীতের নীতি ও কূট কৌশলের পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে পড়েছে। নেহেরু আমলের কর্মনীতি এখন অচলপ্রায়।

মিশর-ইজরাইল, দুই ভিয়েতনাম, ভারত-পাকিস্তান, চীন-ভারত, এবং সাম্প্রতিক চীন-ভিয়েতনাম যুদ্ধে জোট নিরপেক্ষ জাতি সম্মেলন কোন কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্ষেত্রেও জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের কোন উল্লেখযোগ্য অবদান লক্ষ্য করা যায় না। সাম্রাজ্য ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে গ্যাস উদ্গীরণ অনেক পুরাতন হয়ে গেছে, তার প্রয়োজন-ধার-ভারও কমেছে। উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যের ভারমুক্ত ব্রিটিশ কমনওয়েলথএর নেশনের ন্যায় জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনও কি শেষ পর্যন্ত সদিচ্ছা বিনিময়, পান ও ভোজ সম্মেলনে পর্যবসিত হবে?

সম্প্রতি কলোম্বোতে জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সমন্বয় বৈঠক বসেছিল। আরব রাষ্ট্রগুলি তাতে দাবি করে যে, মিশরকে সম্মেলনের সদস্য পদ থেকে সরাতে হবে কারণ মিশর আরব রাষ্ট্রগুলির সম্মতি না নিয়ে ইজরাইলের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছে। মিশর সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র, তার পক্ষে অপর একটি দেশের সহিত সন্ধি করার নিশ্চয়ই অধিকার আছে। আরব রাষ্ট্রগুলির এই দাবি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের বিষয়বস্তু হতে পারে না। মিশর কোন সামরিক জোটে যোগ দেয় নি, তার সদস্যপদ খারিজের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, বৈঠকে আরব রাষ্ট্রগুলির প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য হয়নি। কারণ বোধহয় তেল। আরবদের তেল হল তাদের তুরুপের তাস। কেউই আরব রাষ্ট্রগুলিকে চটাতে চায় না। তাই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখতে হয়েছে।

অপর একটি বিষয়েও বৈঠক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, কম্বোডিয়ার ভিয়েতনাম প্রভাবিত কাম্পুচিয়া এবং চীন সমর্থিত পলপট সরকার উভয়েই জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের সদস্যপদ প্রার্থী। কাকে রেখে কাকে বাদ দেওয়া যায়—তাই হল সমস্যা।

একজনের পিছনে পরোক্ষে সোভিয়েত রাশিয়া, অন্য জনের পিছনে চীন।

উপরোক্ত দুটি বিষয় নিয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করা এখনো সম্ভব হয়নি। পাকিস্তান জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দলে ঢুকতে চেয়েছে। বিনা বাধায় না হলেও, সদস্যপদ সে পাবে। ভারত পাকিস্তানের আবেদন সমর্থন করেছে। সংকটের জট ছাড়ানোর ভার ন্যস্ত হয়েছে আগামী হাভানা জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্মেলনে। অধিবেশনের বিলম্ব আছে; তার মধ্যে পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে। ইরান সর্বসম্মতি-ক্রমে জোট নিরপেক্ষ দলের সদস্যপদ পেয়ে গেছে।

উন্নতিকামী দেশগুলির ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষ নীতি কল্যাণপ্রদ বলেই দলের সদস্য সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। এখন যা প্রয়োজন তা হল জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য, সদস্যের যোগ্যতা ও আচরণ বিধি প্রণয়ন, নতুবা একটার পর একটা সমস্যা এসে সংগঠনকে বিপর্যস্ত করে ফেলবে।

সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত চীনের চুক্তির মেয়াদ ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে শেষ হবে। কার্যতঃ এই চুক্তি যদিও বলবৎ নেই। ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে চীন যদি জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির সম্মেলনের সদস্যপদ চায় তখন অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে?

চিঠিপত্র

সম্পাদক, বিপ্লবী বাংলা,

শীঘ্রই 'মুক্তিতীর্থ আন্দামান' পুস্তক আকারে প্রকাশিত হইতেছে। গ্রন্থের অনুশীলন ও যুগান্তর এর বিপ্লবীদের অনুরোধ করা যাইতেছে যে ১৯০৯ হইতে ১৯২১ সনের মধ্যে যতটুকু জানা গেছে মোট ৪৬ জন বাংলার বিপ্লবী সুদূর আন্দামান সেলুলার জেলে নির্বাসিত ছিলেন। তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনপরিচিতি ও পাশ পোর্ট আকারের ফটো যত শীঘ্র সম্ভব নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রেরণ করিয়া আমাদের প্রচেষ্টাকে সফল করুন।

নিবেদক—

শ্রীজ্যোতীশ মজুমদার।

কনভেনার প্রাক্তন আন্দামান রাজনৈতিক বন্দী মৈত্রী চক্রের 'মুক্তিতীর্থ আন্দামান' উপসমিতি।

১১৭, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৪

শ্রীঅরবিন্দ লহ প্রণাম—

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে মাঝে মাঝে এমন এক একজন মানুষ ধূলার ধরণীতে অবতীর্ণ হন, যারা শুধু তাদের জন্মভূমির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের মধ্যেই তাঁদের অবদান সীমাবদ্ধ থাকে না। তারা সারা পৃথিবীকেই এমন কিছু দিয়ে যান, যার মাধ্যমে বিশ্বের সকল মানুষই একটা শাশ্বত মূলধন সংগ্রহ করতে সক্ষম হন, যার মূল্য শাশ্বত কালের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয়। তাদের চিন্তা ভাবনা, তাদের বাণী, দেশকালের সীমা অতিক্রম করে চির ভাস্বর হয়ে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ এই জাতের একজন প্রধান পথিকৃৎ। একশত বছরের কিছু পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ ভারত ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর জীবিত কালে যে অবদান রেখেছিলেন, তা আজ শুধু ভারতবর্ষের মানুষেরই নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর অমূল্য সম্পদ ও পথ প্রদর্শক।

শ্রীঅরবিন্দের দৈত ব্যক্তিত্ব ছিল একটা এই জগতের সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যটি ছিল তার অতিন্দ্রিয় মানস। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন সুপ্রামেন্টাল বা অতিমানস স্তরের প্রবক্তা।

প্রথম জীবনে দেশবাসীর দুর্দশা দেখে তিনি অন্তরে নিদারুণ বেদনাবোধ করেছিলেন এবং যখন তিনি অনুভব করলেন, পরদেশী শাসনই সমস্ত অনর্থের মূল, তখন তিনি নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনাকে ত্যাগ করে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করে দেশমাতৃকার যজ্ঞে সর্বস্ব আহুতি দিয়ে দেশের কল্যাণযজ্ঞে সম্পূর্ণভাবে আত্ম নিবেদন করেছিলেন যে ব্রত উদ্‌যাপনে তিনি ফাঁসির রজ্জু পরতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্য রকম ছিল। রাজনীতির মত ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ থাকার জন্য তিনি পৃথিবীতে আসেন নি। সকল মানুষের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাবার সোপান তৈরী করার কাজ করার জন্য আলিপুর বন্দিশালায় বাসুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর জীবনের গতি ভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়, অবশ্য তিনি সাধনার উচ্চস্তরে পৌঁছে যাবার পরও কিন্তু সাধারণ মানুষকে তিনি ভোলেন নি। নিজের ব্যক্তিগত মোক্ষ লাভ করেও কিভাবে সাধারণ মানুষের মোক্ষলাভের পথ সহজ ও সুগম হয় এটা করাই ছিল তাঁর মহান্ উদ্দেশ্য। সাধন মার্গে এই মানসিকতা অভিনব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং একক বললেও অত্যুক্তি হবে না।

আমরা আমাদের বক্তব্য বিশেষ করে সীমাবদ্ধ রাখছি তার স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য অবদানের জন্য। রুদ্রের দূত হিসাবে তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জাতির ঘোর দুর্দিনে তিনি আসন্ন জাতির মধ্যে উচ্চাদর্শ, সাহসিকতা, চরিত্রবল ও দেশের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করার মন্ত্র দিয়েছিলেন। কি অসাধারণ দূরদৃষ্টি তাঁর ছিল, তার প্রমাণ হিসাবে

তাঁর দুই একটি উক্তি তুলে ধরলেই সেটা বুঝতে পারা যায়। যতদূর মনে হয়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে তিনি, Human Liberty, Human Tratern.ty, Democracy of the pleasant, elevation and enlightement of proletariat প্রভৃতির কথা বলেছিলেন। প্রোলেটারিয়েটের যথাকথিত প্রবক্তারা এ কথা স্মরণে রাখতে পারেন। শ্রীঅরবিন্দ অন্য সময়ে যে উক্তি করেছিলেন, সেটা আজকের রাজনীতিবিদদের শিক্ষণীয়। তিনি বলেছিলেন, "যে দেশেই হোক্, বা যে জাতিরই হোক, জাতির অভ্যুত্থানের উদ্যোগ যখন আরম্ভ হয়, তখন এজন্য একটি বৃহৎ ও উদার রাজনৈতিক আদর্শ চাই। ...অব্যক্ত ও সঙ্কীর্ণ আদর্শ, ক্ষুদ্র আশা, ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য, তুচ্ছ সাবধানতা ও ভীরুতা এবং অদূরদর্শী ও সাহস-পরাঙ্মুখ নেতাদল—এ সকল হেয় উপাদান কখনও জাতীয় শক্তি গড়িবার উপযুক্ত সামগ্রী হইতে পারেনা। এরূপ ক্ষুদ্র উপাদান লইয়া কোনও জাতি কোনও কালে মহত্বের উচ্চসোপানে উঠে নাই। "নিরীহো না অশ্নাতে মহং", অর্থাৎ যাহার আশা ক্ষুদ্র। সে কখনও মহত্ব ভোগ করেনা। মহাভারতের এই উক্তি রাজনীতিবিদদের সর্বদা স্মরণ করা উচিৎ।

শ্রী অরবিন্দের একটি বিশেষ উক্তি আজ স্মরণ করা যায়। তিনি বলেছিলেন "আদর্শ সমাজবাদ—উৎপত্তিস্থল হবে এশিয়া, বিশেষ করে ভারতবর্ষে।" ঋষির বাক্য কখনও ব্যর্থ হবে না। এই আশা নিয়ে আমরা অপেক্ষা করব দিন গুণে এবং কালগুণে।

শ্রীঅরবিন্দের এবারকার জন্মদিন আবারো আমরা ঋষিবরণের কথা স্মরণ করব ও মনন করব। এই উপলক্ষ্যে আমাদের নিজেদের এবং দেশবাসীর তরফ থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে আমরা সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

———

যাবতীয় পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ এক মাত্রার মূল্য
প্রস্তুতকারক: শ্রীভবনীমোহন চক্রবর্তী
হিমসাগর কুটীর • কুমার বাজার • শ্রীহট্ট

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত
বরিশাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বৈঠকে এই সাব্যস্ত হল যে প্রতিনিধিগণ সকলে বাজার হাবেলীতে সমবেত হবেন এবং সেখান থেকে সকলে একত্রে শোভাযাত্রা করে কনফারেন্সের মণ্ডপে যাবেন এবং যাওয়ার সময় "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করতে করতে যাবেন। এই আশঙ্কা সকলের মনেই ছিল যে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে, এমন কি বলপ্রয়োগও করবে। কিন্তু এটা কঠোরভাবেই স্থির নিশ্চয় করা হল যে কোন অবস্থাতেই প্রতিনিধিগণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না এবং তারা লাঠি এমনকি বেড়াবার ছড়িও সঙ্গে নিবেন না। ব্যারিষ্টার মিঃ বি. সি চাটার্জি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি তার সঙ্গে একখানা বেড়াবার ছড়ি নিতে পারবেন কিনা। 'না একখানা বেড়াবার ছড়িও নয়" বলে আমি সংক্ষেপে এবং দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলাম। এই নির্দেশ আনুগত্যের সঙ্গেই পালন করা হল।

বেলা ২টার সময় শোভাযাত্রা শুরু হবে। নির্ধারিত সময়ের প্রায় আধ ঘন্টা পূর্বে আমি যথাস্থানে শুরু করলাম। কনফারেন্সের নির্বাচিত সভাপতি মিঃ এ রসুল এবং তার সহধর্মিণী একখানা গাড়ীতে শোভাযাত্রার পুরোভাগে চললেন। মিঃ রসুলের স্ত্রী ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা। শোভাযাত্রার প্রথম সারিতে ছিলাম আমরা কয়েকজন—অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক বাবু মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বাবু এবং আমি। অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্করা ছিলেন পিছনের দিকে। বয়স্করা ছিলেন পিছনের দিকে। জোরদার পুলিসের দল সর্বদাই আমাদের চোখের সামনেই রইল তাদের হাতে ছিল রেগুলেসন লাঠি। একজন সহকারী পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট এগিয়ে চললেন একটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে। সত্যি কথা বলতে কি পুলিসের এইরূপ ক্ষমতা প্রদর্শনের মত কোন ব্যাপারই সেখানে ছিলনা। পরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে তার পরিপ্রেক্ষিতে ছাড়া এই ক্ষমতা প্রদর্শনের কোন প্রয়োজনই ছিলনা এবং এর কোন ব্যাখ্যাও চলেনা।

আমাদের এগিয়ে যেতে দেওয়া হল, কোন হামলা তখন আমাদের উপর হলনা। কিন্তু তরুণ প্রতিনিধিগণ ও এন্টি-সার্কুলেসন সোসাইটির সদস্যগণ যখন রাজা বাহাদুর হাওলী থেকে প্রকাশ্য রাস্তায় বেরিয়ে এলেন তখনই পুলিশের সমস্ত কর্ম-পরিকল্পনা প্রকাশ হয়ে পড়ল। শুরু হল প্রতিনিধিগণের উপর আক্রমণ। চলল তাদের উপর রেগুলেসন লাঠির প্রহার (রেগুলেসন লাঠি হল বেশ মোটা ৬ ফুট লম্বা লাঠি)। "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি লেখা যে সমস্ত ব্যাজ তারা পরিধান করে এসেছিলেন, সেগুলি সব টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। নিষ্ঠুরভাবে লাঠি-পেটা করার ফলে অনেকে সাংঘাতিকভাবে আহত হন। তাদের মধ্যে একজন হলেন চিত্তরঞ্জন গুহ। চিত্তরঞ্জন হলেন সুপরিচিত "স্বদেশী" কর্মী ও বক্তা বাবু মনোরঞ্জন গুহের পুত্র। মনোরঞ্জনকে মারতে মারতে একটি পুকুরের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। পুকুরটি ছিল জলে পরিপূর্ণ। যদি তাকে সে

সময় উদ্ধার করা না হত তাহলে চিত্তরঞ্জনের হয়ত সলিল সমাধি হয়ে যেত।

এই যুবকেরা কোন অপরাধই করেননি। এমন কি তারা পুলিশের আক্রমণের আগে পূর্ববঙ্গসরকারের কাছে বিরক্তিকর "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিও তোলেন নি। তাদের অপরাধের মাথা-মুণ্ড সবই হল এই যে তারা কারও কোন অসুবিধা বা পথ চলতে বাধার সৃষ্টি না করে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে শোভাযাত্রা করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কেবলমাত্র আক্রান্ত হওয়ার পরেই তারা বিপুলভাবে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি তোলেন। বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় এর চেয়ে বেশী বেপরোয়া মার পিঠের কথা ভাবাও কঠিন। শোভাযাত্রাকারীরা যদি কোন অপরাধ করে থাকেন, তা হলে তাদের গ্রেপ্তার করা যেত এবং উচিত বোধ হলে শোভাযাত্রাও ভেঙ্গে দেওয়া যেত। কিন্তু কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য তো তাতে সিদ্ধ হবে না। একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই—সমসাময়িক কালের জনমতেরও রায় ছিল তাই—যে পূর্ব থেকেই কর্তৃপক্ষ এই রকম একটা পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। পূর্ববঙ্গে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে দেশ বিভাগ বিরোধী আন্দোলনকে পিষে মারাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। আর সেই সন্ত্রাস নীতিরই অঙ্গীভূত হল এই পরিকল্পনা। এই নীতিই পরিকল্পিত পদ্ধতিতে তারা অনুসরণ করেছিলেন আন্দোলনকে দমন করে নিশ্চিহ্ন করার জন্য। কিন্তু সে আশা দুরাশা মাত্র। দমন-নীতি কোথাও সফল হয়নি, এখানেও হল না। এতে জনমত আরও শক্তিশালী হল এবং তাদের সঙ্কল্পকে আরও দৃঢ় করে তুললো।

এই রকম হামলা যখন চলছিল আমরা কিন্তু তখন আমাদের পথে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। পুলিশের এই অপকর্মের কথা আমরা কিছু জানতেই পারিনি। আমরা খুসী মনেই এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ কলকাতা থেকে আগত প্রতিনিধি লালমোহন ঘোষাল দৌড়ে এগিয়ে এসে তার দুহাত বিস্তার করে আমাদের কাছে এসে বললেন, আপনারা কী করছেন? আপনারা আর এগোতে পারবেন না। পিছনে পুলিশের লোকেরা আপনাদের প্রতিনিধি ভাইদের পিটাচ্ছে।' আমি তৎক্ষণাৎ ফিরে পিছনের দিকে চলতে লাগলাম। বাবু মতিলাল ঘোষ এবং আরও দু একজন আমার পিছনে পিছনে এলেন। পিছনের দিকে চলে আসতে আমি পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট মিঃ কেম্পকে সামনে দেখতে পেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম 'আমাদের লোকদের মারছ কেন? তারা যদি কিছু করে থাকে সেজন্য আমাকে শাস্তি দাও: আমিই সেজন্য দায়ী: যদি চাও তো আমাকে গ্রেপ্তার কর।' সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট উত্তর দিলেন, 'স্যার, আপনি আপনি আমার বন্দী।' এই সময় মিঃ মতিলাল ঘোষও সামনে এসে বললেন, 'আমাকেও গ্রেপ্তার করুন।' মিঃ কেম্প বললেন 'আমার উপরে কেবলমাত্র মিঃ ব্যানার্জিকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ আছে।' পরিষ্কার বোঝা গেল যে আমাকে গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত আগে থেকেই করে রাখা হয়েছিল। তবে সেটা আর এক কাহিনী।

সমস্ত ঘটনার এই অংশটা আমার গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে এখানেই শেষ হয়ে গেল। আমি একা পুলিশের হেফাজতে একজন বন্দী। মি ভূপেন্দ্রনাথ বসু কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে বললাম, 'আপনারা বরং আমাকে বাদ দিয়েই কনফারেন্সের কাজ চালিয়ে যান। কনফারেন্স বন্ধ অথবা স্থগিত রাখবেন না। বিশেষ বিবেচনা ও সতর্কতার সহিত

আমার পরামর্শ মতই কাজ হল। উত্তেজনা ও ক্রোধ প্রবলভাবে দেখা দিলেও কনফারেন্সের কাজ নির্ধারিত কার্যক্রম অনুযায়ী চলতে থাকে—যেন কোন কিছুই ঘটেনি এমনি ভাবে। স্বায়ত্তশাসন লাভ করার পক্ষে অপরিহার্য্য গুণাবলীর মধ্যে একটি যে আমাদের আছে, এই কঠিন উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেও আত্মসংযম প্রদর্শন করে তার যে প্রমাণ দেওয়া হল, নিতান্ত তুচ্ছ নয়।

ইত্যবসরে মিঃ কেম্প আমাকে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে নিয়ে যান। আমরা একটা ঠিকা গাড়ী (ঘোড়ার গাড়ী) ভাড়া করলাম। মিঃ বিহারীলাল রায়, মিঃ অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কার্য্যবিশারদও আমার সঙ্গে গেলেন। আমি ছিলাম মিঃ তত্ত্বাবধানে। তাকে তো আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে। কিন্তু গাড়ীতে ৫ জনের বসার মত জায়গা ছিল না। কার্য্যবিশারদ গাড়ীর পিছনে সইসের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

মিঃ ইমার্সনের বাড়ীর বারান্দায় আমাদের নিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সেখানে ম্যাজিষ্ট্রেটকে তার কাজে প্রস্তুত হতে সময় দেওয়ার জন্য মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপরে আমাদের ঘরে প্রবেশ করতে বলা হল। কার্য্যবিশারদ যেই মাত্র ঘরে ঢোকার জন্য চৌকাঠ পেরিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে ইমার্সন গর্জন করে আদেশ দিলেন 'বেরিয়ে যাও।' কার্য্যবিশারদের প্রতি এ বৈষম্যমূলক আচরণ করার কারণ ছিল। কার্য্যবিশারদ ছিলেন কালীঘাটের পুরোহিত বংশ হালদার পরিবারের লোক। এই হালদাররা হলেন বাংলার সবচেয়ে পবিত্র মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক। দেশ বিভাগ বিরোধী ও স্বদেশী সভা-সমিতিতে তিনি যখন যেতেন তখন তিনি সাধারণতঃ নিষ্ঠাবান হিন্দুর পোষাক পরেই যেতেন। এটা কেবলমাত্র তার একটা খামখেয়ালী পনাই নয় (যদিও খামখেয়ালী ভাব তার চরিত্রে অনেক ছিল)। তার এই রকম পোষাক পরার কারণ ছিল। এই পোষাক ছিল পৌরোহিত্য ও ব্রাহ্মণত্বের প্রভাব ব্যঞ্জক নিদর্শন। তিনি স্বভাবতঃই চাইতেন তার নিজের সমস্ত শক্তির উৎসগুলিকে তার পক্ষে কাজে লাগাতে। তাই তিনি জামা পরতেন না; কেবল সামান্য ধুতি আর চাদরই ব্যবহার করতেন। তাছাড়া ছিল তার পৈতাটি যেটি প্রকটভাবে তার নগ্ন গাত্রের সাক্ষ্য বহণ করত। তার এই পোষাক ছিল কনফারেন্সের ডেলিগেটদের দেখাবার জন্য, ইমার্সন বা তার আদালতকে দেখাবার জন্য নয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তার পরিচ্ছদের এই স্বল্পতা দেখে রুষ্ট হন এবং তার ম্যাজিষ্ট্রেট পদের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে আদেশ করেন। কার্য্য বিশারদ সে আদেশ পালন করলেন; কিন্তু তিনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন যাতে ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘরে কি হচ্ছে তা দেখতে পান এবং কি কথাবার্তা হয় তা শুনতে পান। ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘর তখন সাময়িকভাবে এক বিচারকের চেম্বারে পরিণত হয়েছিল।

আমি বন্দী অবস্থায় ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘরে প্রবেশ করলাম। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হল, আমি আইন ভঙ্গ করেছি। আমার এ অভিজ্ঞতা এই প্রথম নয়। এ রকম অবস্থায় কয়েক বছর আগেও আমি পড়েছি। তবে তা ছিল এক উচ্চতর আদালতে এর চেয়ে মর্য্যদা-মণ্ডিত পরিবেশের মধ্যে। আমার দুই বন্ধু আমার সঙ্গেই সেই ঘরে প্রবেশ করেন। তাতে কোনরূপ আপত্তি করা হয়নি। তারা সেখানে যে চেয়ারগুলো দেখতে পেলেন তাতেই কজনে বসে পড়লেন। (চ

ঐতিহ্য ধ্বংস করা চলবে না

॥ ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস ॥

কোন জাতী বা দেশ জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল্যবোধ ছাড়া এগুতে পারে না। দেশের অর্থ-নৈতিক কাঠামো যাহাই হউক না কেন জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কোন কার্পণ্য দেখা যায় না, বরং জাতীয় অগ্রগতির পাথেয় হিসাবে জাতীয় অগ্রগতির স্মৃতি যুবকদের সম্মুখে তুলে ধরে। নূতনের আহ্বানে পুরাতনকে জীর্ণ হতে দেয় না, উজ্জ্বল করে জীবন্ত করে তুলে, ঘুমন্ত মনে প্রাণের সঞ্চার হয়, আরও বড় হওয়ার সম্বিৎ পায়।

রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য মনীষীরা সকলেই নতুনের পূজারী ছিলেন, পুরাতনকে ভিত্তি করেই নতুন সৌধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। পুরান স্মৃতিই জীবনের অবলম্বন, তাই বোধ হয় জীবনের শেষ প্রান্তে সাহিত্যিক বনফুলকে রবীন্দ্রনাথ 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' এই গানটি শুনিয়ে ছিলেন। সাহিত্যিক বনফুল রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রনে কয়েক দিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। একদিন খেয়েদেয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছেন এমন সময় রবীন্দ্রনাথের খাদ্যমন্ত্রী বনমালী এসে খবর দিল বাবুমশায় জানতে চাইলেন আপনি ঘুমিয়েছেন কিনা, হয়ত কিছু বলবেন। রবীন্দ্রনাথের ঘরে গিয়ে বনফুল দেখেন একটি হাই পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। রবীন্দ্রনাথের দুই হাতে দুইটি কাঁচের গ্লাস, এক হাতে দুধ, এক হাতে সাগু। খাওয়ার পর রুমাল দিয়ে গোঁফদাড়ি মুছে বনফুলের দিকে মৃদু হেসে বললেন গান শুনবে, আমি এখন গাইতে পারি। বনফুল বললেন আপনার কষ্ট হবে নাতো ? রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন না, বল কোন গানটা গাইব। বনফুল বললেন আপনার যেটা খুশি। রবীন্দ্রনাথ গাইলেন 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'। গান শেষ হবার পর দুইজন কতক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বনফুল বললেন এতদিন আপনাকে দূর থেকে দেখেছি, এবার কাছে থেকে পেলুম। রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন কাছে থেকে সবটা পাওয়া যায় না, দূর থেকে পাওয়াই ভাল। কৈশোরে আমি বঙ্কিমকে খুব কাছে থেকে দেখেছিলুম, সেই জন্য ভালভাবে পাইনি, আজ দূর থেকে তার বিরাট রূপ দেখতে পারছি। বিরাট পাহাড়ের মত তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। সমাজের অগ্রগতির পথিকৃৎদের এই বিরাট রূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই জোরাশাঁকো ঠাকুর বাড়ীর বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়েও রবীন্দ্রনাথ দেশকে চিনতে পেরেছিলেন এবং দেশবাসীর নিকট অক্ষুরন্ত মননশীল প্রাণস্পর্শ সম্পদ রেখে গেছেন। তাই দেখা যায় মোরারজী দেশাই প্রধান মন্ত্রীর গদী হারিয়ে সাংবাদিকদের নিকট রবীন্দ্রনাথের গানের কলি উল্লেখ করেন—'তোর ডাক শুনে কেহ না আসে একলা চলরে।' রবীন্দ্রনাথের গানের 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'—মুজিবকে পাগলা করে দিয়েছিল। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশের জন্যই মুজিবকে আত্মাহুতি দিতে হল, দুনিয়ার ইতিহাসে অমর হয়ে রইল।

ঐতিহ্যের বিরাট রূপ উদ্ভাসিত করতে না পারলে দেশ এগুতে পারে না। সামাজিক অবক্ষয়ের শেষ ধাপ ঐতিহ্যকে মুছে ফেলার চেষ্টা। অত্যাচারী অগণতান্ত্রিক শাসনাত্র সেই পথেই অগ্রসর হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে আয়ুব সেই চেষ্টাই করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের মাতৃভাষা বাংলা সংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথের গান বাঙ্গালীর মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু ফল হল বিপরীত। জনগণ বাঙ্গালীর ঐতিহ্য জোর করে আঁকড়ে ধরল, রক্ত দিল, আয়ুব তন্ত্র ধ্বংস হল। 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' জনমনের মনিকোঠা দখল করল।

আমরা যেন সেই শেষ ধাপে যাবার রাস্তা ধরেছি, আমাদের গৌরব রামমোহনের বাড়ী, বিবেকানন্দের বাড়ী, জোড়াশাঁকো ঠাকুর বাড়ী, ফেডারেশন হল, বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলেজ স্কোয়ার অঞ্চল, হিন্দুস্কুল, হেয়ার স্কুল, সংস্কৃত কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ইত্যাদি। বড়বাজারের কর্মচঞ্চলতা বিরাট বিরাট অট্টালিকা বাঙ্গালীর ঐতিহ্যের নিদর্শন নয়। কলেজ ষ্ট্রীট অঞ্চলের স্মৃতিচারণ করলে ভেসে উঠবে স্যার আশুতোষ ঘোড়ার গাড়ীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করছেন, দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ডিরোজিওর শিষ্য ইয়ং বেঙ্গলদল, কোথাও হেঁটে চলেছেন বিদ্যাসাগর, কি জগদীশচন্দ্র কি প্রফুল্ল চন্দ্র, কোথাও সিঁড়ি দিয়ে নামছেন সুভাষচন্দ্র, কোথাও বই হাতে বেরুচ্ছেন বঙ্কিম। কলেজ ষ্ট্রীট বাঙ্গালীর আত্মা। এই আত্মা প্রসারতার ক্ষুণ্ন করার জন্য অনেক কিছু মুছে ফেলা হয়েছে। কলেজ স্কোয়ারকে বিদ্যাসাগর স্কোয়ার নাম দেওয়ার প্রচেষ্টা চলেছে, ইহাতে বিদ্যাসাগরের প্রতি সম্মান দেখান হবে মাত্র বরং সংস্কৃত কলেজ ও কলেজ স্কোয়ার ভিত্তি করে বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ডের উপর হতে দেশবাসীর দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া হতেছে।

শোনাযায় কলিকাতার প্রায় ৬৮টি পুরান রাস্তা ভেঙ্গে চাওড়া করার উদ্দেশ্যে অর্থের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের দারস্থ হয়েছেন সরকার। তন্মধ্যে কলেজ ষ্ট্রীট একটি। ইহাতে ভাঙ্গা পড়বে প্রেসিডেন্সি কলেজের কতক অংশ, কফি হাউস, আরও অনেক দোকানপাট ও ঐতিহ্যমণ্ডিত বাড়ী। যাদের বাড়ী ভাঙ্গা হবে কলিকাতা করপোরেশন তাদের নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে কারোর বাড়ী কেড়ে নিবেন না। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যথোচিত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। কিন্তু ইতিহাস বা স্মৃতির কি ক্ষতিপূরণ —হতে পারে অর্থের দ্বারা।

নকসাল আন্দোলনের দৌরাত্মে বিদ্যাসাগরের মুণ্ডপাত হয়েছিল, বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি মসীলিপ্ত হয়েছিল। বাংলার শিল্পী, সাহিত্যিক গুণিজন ও জনসাধারণ প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন। সুখের বিষয় নকসালপন্থীরা তাদের চিন্তাধারা পরিবর্তন করেছে, বুঝতে পেরেছে ঐতিহ্যকে আঘাত করলে জনতা সহ্য করবে না, কিন্তু ওদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে, ওদের ত্যাগ ও তিতিক্ষা ভ্রান্ত পথে চালিত না হলে ওরা দেশের সম্পদ হত, দেশ উপকৃত হত। নকসাল পন্থীদের মত উগ্রভাবে না হলেও কোন অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে সুনিপুনভাবে সহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির ভাওতায় বাঙ্গালীর ঐতিহ্য ম্লান করার চেষ্টা চলছে। যাতায়াতের ও যানবাহনের চলাচলের বাহানা তুলে সহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জলুস দেখিয়ে আমাদের যেন বিভ্রান্তি না ঘটায়। দেশহিতৈষী, শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক, যুব ও ছাত্র সমাজকে এই বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। আমাদের আওয়াজ তুলতে হবে আমাদের ঐতিহ্যের স্মৃতি কিছুতেই ম্লান হতে দেব না।

———

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লিখেছেন বিশিষ্ট বিপ্লবী শ্রীসতীশচন্দ্র পাকড়াশী —উষার রঙিন আলোর মতই একদিন বাঙলার বুকে জ্বলে উঠে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম রক্ত-শিখা। অত্যধিক বংসরের পুঞ্জীভূত অত্যাচারের কঠোর আবরণ বিদীর্ণ করে গর্জে উঠেছিল বাঙালীর হাতে বোমা ও পিস্তল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ তখন বাঙালী যুবকের বীরপণার গর্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। সারা ভারতবর্ষ চেয়ে চেয়ে দেখে ভীরু বাঙালীর এই জীবন অভিযান। কত যুবক স্বাধীনতা সংগ্রামের রোমান্সে, উদ্দীপনায় মরণের নেশায় মেতে উঠে, কত যুবক সে আলোতে আত্মাহুতি দেয়, গুলিতে প্রাণ দেয়, দ্বাপান্তরের অন্ধকার কারাকক্ষে অসহনীয় নির্য্যাতনে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করে। নিজেদের ত্যাগ, সাহস ও ঐকান্তিকতা দিয়েই দেশ জননীর বন্ধন মোচন করবে এমনই ছিল তাদের দুর্জয় সঙ্কল্প।

এরা সেদিন সাম্রাজ্যবাদী দানবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নির্বিচারে জীবন বিলিয়ে দিতে এসে ছিল। বিপ্লবী তরুণগণ সেদিন মৃত্যুর গর্জন শুনেছিল সঙ্গীতের মত। তাই মরণের বাঁশী শুনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল মরণের অভিযানে। ক্রমে বাঙলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল অনুশীলন সমিতি। আরম্ভ হল সরকারী কর্মচারী হত্যা, গোয়েন্দা হত্যা, সমিতির অনিষ্টকারী হত্যা, আরম্ভ হল সমিতির পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ। বিপ্লবী নায়ক পুলিনবিহারীর পরিচালনাধীনে ঢাকা সমিতির কাজ এগিয়ে চলল। সমিতি যত শক্তিশালী হতে লাগল সরকারী নির্দ্দেশনের রোলারও ততই দুর্বার গতিতে চলতে লাগল সমিতির উপর দিয়ে। ঢাকা ষড়যন্ত্র, বরিশাল ষড়যন্ত্র, বরিশাল ষড়যন্ত্র দ্বিতীয় এবং রাজা-বাজার ষড়যন্ত্র মামলায় সমিতির নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। পুলিনবিহারী প্রথম থেকেই এর প্রতিকার পন্থার কথা ভাবছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন সরকারী দমন নীতি অচিরেই আরও কঠোর হবে এবং সমিতির নেতাদের পক্ষে বাঙলাদেশে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। এজন্য সমিতির পরিচালনা ব্যবস্থা অনেকটা সহজ করা হল। এক নেতা গ্রেপ্তার হলে পরবর্তী নেতা সহজভাবেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। অনেক স্থলে পূর্ববর্তী নেতা আগে থেকেই পরবর্তী নেতাকে মনোনীত করে যেতেন। তার এই অধিকারের বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন চলতো না। পুলিনবাবুর ব্যবস্থা হল সমিতির নেতাদের তিনি বাঙলার বাহিরে আসাম ও বিহার থেকে কাজ করবার সুবিধা করে দিলেন। এই সময় আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের নির্মান কার্য্য চলছিল। পুলিনবাবু সমিতির অনুগামীদের নূতন গড়া রেলওয়ের প্রতি ষ্টেশন মাষ্টার বা অন্য কোন পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। এর শুভ ফল দুদিকে চলল সমিতির আর্থিক অসুবিধা কিছুটা হ্রাস পেল। আসামের পার্বত্য এবং জঙ্গল পূর্ণ অঞ্চলে বিপ্লবী কেরার কর্মীদের কয়েকটি নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রও সৃষ্টি হল। রাসবিহারী নিয়ন্ত্রণাধীনে

সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, তখন এই সকল আশ্রয় কেন্দ্র খুব সক্রীয় হয়ে উঠেছিল। গৌহাটি সংগ্রামের সময় আসামের নাহার কাটিয়া রেল ষ্টেশনে ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন যামিনী দত্ত। তিনি নিজে বিপ্লবী দলভুক্ত না হলেও সমিতির প্রতি এতই অনুরাগী ছিলেন যে কাউকে বেতন থেকে নিজের খাওয়াপরার জন্য অতি প্রয়োজনীয় পাঁচ ছয়টি মাত্র টাকা রেখে বাকী টাকা সমস্তই সমিতিকে দিয়ে দিতেন। সমিতির বিশিষ্ট কর্মী জীতেশ লাহিড়ী এবং প্রবোধ বিশ্বাস ও কুঞ্জ নামে তাঁর আত্মীয় পরিচয়ে তার সঙ্গেই বাস করতেন। এই জন্যই গৌহাটি সংগ্রামের দিনে পুলিশ তাদের সাধারণ কেন্দ্রে পায়নি। অন্যান্য কর্মীরা গ্রেপ্তার হলেও যাতে সমিতির কাজ চলতে পারে এজন্য তাদের সংক্ষিপ্ত কর্মী হিসাবে রাখা হয়েছিল।

১৯১৪ সালের জুলাই মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল। সরকার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতরক্ষা আইন পাশ করে বিপ্লবীদের বেপরোয়াভাবে গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করলেন। গুপ্তচরের সংখ্যা মাত্রাহীনভাবে বাড়িয়ে তোলা হল। বিপ্লবীদের পক্ষে চলাফেরা করাই অসম্ভব হয়ে পড়ল। সঙ্গে স্ত্রীলোক না থাকলে বাড়ী ভাড়া নেওয়া অথবা দেওয়া নিষিদ্ধ হল। অনুশীলনের নেতা এই সময়ে ছিলেন নলিনী ঘোষ। অনুশীলনের বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্যে অনেকেই তখন ফেরার। এই সকল ফেরার বিপ্লবীদের জন্য নলিনীবাবু আসামে গৌহাটিতে চারিটি বাড়ী ভাড়া নিলেন। এক নং বাড়ীর আটগাঁও হাউস ছিল ষ্টেশনারীর পূর্বদিকে। এখানে থাকতেন সমিতির কলকাতা অনুশীলনের অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তার ফেরার নাম ছিল বড়দা অথবা মাষ্টারদা। এছাড়া ছিলেন নলিনী ঘোষ ফেরার নাম বন্ধু। প্রবোধ দাসগুপ্ত ফেরার নাম দাদু অথবা খোকা। মনীন্দ্র রায় এবং প্রভাস লাহিড়ী। প্রভাস লাহিড়ীর ফেরার নাম ছিল ফিলেসকার। এছাড়া উদ্দান বাজারে দুটি বাড়ী ছিল। এখানে যুগান্তর দলের ফেরার বিপ্লবীরা এসে উঠতেন। এদের মধ্যে ছিলেন সতীশ চক্রবর্তী, ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং ভূপেন দত্ত। ভূপেনবাবুর ফেরার নাম ছিল বড় খোকা। স্থায়ীভাবে এই দুইটি কেন্দ্রে থাকতেন সতীশ পাকড়াশী, বিনায়ক রাও কাপলে, নিকুঞ্জ পাল, প্রবোধ বিশ্বাস এবং মনীন্দ্র রায়। জীতেশ লাহিড়ীর ফেরার নাম ছিল ছোট ফিলোসফার, বিনায়করাও কাপলের ছিলেন মহারাষ্ট্র দেশবাসী। তিনি গদর বিপ্লবীদের সঙ্গে আমেরিকা থেকে ভারতে এসেছিলেন। অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি অনুশীলন সমিতির কর্মী হিসাবে বাঙলা দেশের পরিচালনার ভার অকস্মিকভাবে গ্রহণ করেন। অনুশীলনের আসামের ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন নরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও এখানে থাকতেন। রাসবিহারীর জাপান যাত্রার সময় বিনায়েকরাও কাপলে তাঁর দেহরক্ষক হিসাবে প্রথমে বাঙলাদেশে আসেন। উত্তর ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টা চলবার সময় কাপলে নিজের প্রচেষ্টায় কিছুটা বাঙলা ভাষা শিখেনিয়েছিলেন এজন্য বাঙলাদেশে কাজ করতে তার সুবিধা হবে মনে করে তাঁকে সত্যেন নামে আসামের এই কেন্দ্রে রাখা হল নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেরার নাম ছিল কর্তা। এছাড়া এখানে ছিলেন নলিনী বাগচী। ফেরার নাম স্কলার, তারা প্রসন্ন দের ফেরার নাম টিপু সুলতান। চতুর্থ বাড়ীতে ফ্যান্সী বাজারে থাকতেন সতীশ পাকড়াশী এবং নিকুঞ্জ পাল। অনাবশ্যকভাবে এক বাড়ীর লোক অন্য বাড়ীতে যাতায়াত করতেন না। (চলবে)

রাজনীতির গতিপ্রকৃতি

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

পরশাসন মুক্ত হওয়ার বাসনায়, দেশবাসীর শ্রীবৃদ্ধি কামনায় ও মানবিক মর্য্যাদালাভের আশায় ভারতের শিক্ষিত জনমানস উনবিংশ শতাব্দির প্রায় শেষ ভাগে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ত্যাগব্রতে দীক্ষা নিয়েও নিষ্ঠাসহকারে নিঃস্বার্থ আদর্শবাদকে আঁকড়ে ধরে জনকল্যাণমানসে যে রাজনীতির সূত্রপাত করেন তা সত্যই আপামরজনসাধারণের শ্রদ্ধাআকর্ষণ করে। জনচিত্তে এই সব আদর্শবাদী মহান স্বদেশ প্রেমিকগণ বিপুল আশা ও আকাঙ্খা জাগিয়ে সারাভারতময় এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেন, যার ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্য্যাদালাভ করে এবং ভারতীয়রা বিশ্বে স্বাধীন জাতির মর্য্যাদা পায়। এই বৃহৎ পাওয়ার পিছনে কি বিরাট দেওয়ার ইতিহাস প্রচ্ছন্নভাবে আজও লুপ্তপ্রায় হয়ে আছে, তা কয়জনে সঠিকভাবে জানে? এই স্বাধীনতার বেদীমূলে কত প্রাণ যে হল বলিদান আজ আর কে তার সংখ্যা গোনে? কি মর্ম্মান্তিক নির্য্যাতন, কারাবাস, কঠোর নির্বাসন, শারিরীক ও মানসিক লাঞ্ছনা এবং অত্যাচার অবিচার সহ্য করেছেন সেই সব আগেকার দিনের পূতচরিত্র, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মূর্ত্তবিগ্রহ দেশপ্রেমিক মানবতার পূজারী পূর্বসূরী বিরবীরা তা কল্পনা করলে হয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হবে আবার গর্বে শির সমুন্নত হয় তাঁদের উত্তরসূরী বলে। তাঁরা যে মহান আদর্শ দেশবাসীর কাছে রেখে গেছেন তা ইতিহাসে স্থান নিশ্চয় পাবে আর তাঁরাও বিশ্বে চিরস্মরণীয় হয়ে বিরাজ করবেন অনন্তকাল। যে রাজনীতির সূত্রপাত স্যার সুরেন্দ্রনাথ, দাদাভাই নৌরাজী, কে, টি, তেলাং, মহমতি গোখলে, চাপেকার ভ্রাতৃত্রয়, বালগঙ্গাধর তিলক, মহম্মদ আলি, সৌকত আলি, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধী, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী, লালা লাজপত রায়, মতিলাল নেহেরু, রাজেন্দ্র প্রসাদ, ভি, জে প্যাটেল, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আচার্য্য কৃপালনী মহম্মদ আলি জিন্না, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর, খান অব্দুল গফর খান (সীমান্ত গান্ধী) উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, অশ্বিনী কুমার দত্ত, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র, মানবেন্দ্রনাথ রায় (নরেন ভট্টাচার্য্য) ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়, ঋষি শ্রীঅরবিন্দ, তারেবজ, সইফুদ্দিন কিচলু, এ্যানি বেসান্ত, মনমোহন ঘোষ, সরোজিনী নাইডু, কাকা কালেলকর প্রভৃতি মনীষিদের দ্বারা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য মহাসাধক বীর বিবেকানন্দের দ্বারা দেশবাসী উদ্বুদ্ধ ও তাঁর আশীর্বাদ পূত এবং ভগ্নি নিবেদিতার সাহায্য ও সহযোগীতা পুষ্ট এবং পরিশেষে দুই রাজনৈতিক মহানায়ক গান্ধীজী ও নেতাজীর দ্বারা পরিব্যপ্ত পরিচালিত ও বাস্তবায়িত সে মহান আদর্শবাদী ত্যাগ-সম্বল রাজনীতি আজ বহু কষ্টে অর্জিত স্বাধীন ভারতে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে চিন্তাকরলে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। স্বপ্নেও কি একথা কোনদিন কেউ ভাবতে পেরেছিল? মনে হয় না। মহাত্মা গান্ধী

ভারতবাসীর অন্তরে যে শ্রদ্ধার আসনে স্থান পেয়ে পেরেছিলেন আজ কোন রাষ্ট্রনায়ক সে আসন পাবার কথা মনের কোনেও ঠাঁই দিতে ভরসা পায় না কেন? গান্ধীজী ছিলেন ত্যাগের জীবন্ত দৃষ্টান্ত অপর পক্ষে বর্তমান রাষ্ট্রনায়কগণ ভোগের প্রতিমূর্তি। নেতাজীর মহান আদর্শ ও জলন্ত দেশপ্রেম আজ আর কারোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে কি? অথচ যাঁরা আজ মন্ত্রীত্বের গদীতে সমাসীন তাঁরা সকলেই উত্তম রূপেই জানেন মানুষের বৃহত্তম কল্যাণের জন্যই উক্ত দুই মহাপুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজী কি কৃচ্ছসাধন, কতখানি ত্যাগস্বীকার, কি অমানুষিক নির্যাতন, কি পর্বত প্রমাণ অন্তরায়ের মধ্যে অভিষ্ট সাধনের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প অন্তরে জাগরুক রেখে কি ভীষণ ও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে বারে বারে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের উভয়ের সাধনা ছিল এক ও অভিন্ন এবং তা হচ্ছে দেশের স্বাধীনতা অর্জন।

অহিংসা সত্যাগ্রহ, বিদেশী পণ্য বর্জন ও অহিংস সংগ্রামকে পাথেয় করে গান্ধীজী অগ্রসর হয়েছিলেন স্বীয় পন্থায় এবং জনজাগরণের ক্ষেত্রে তার সফলতা বিরাট ও ব্যাপক আর মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে মাটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ সশস্ত্র বাহিনী তৈরী ও তা পরিচালনা করে দেশের স্বাধীনতার জন্য অগ্রসর হওয়া ও দেশের মাটিতে কোহিমা প্রান্তরে সসৈন্যে হানা দেওয়া কম বিস্ময়কর ও কম লোমহর্ষক কাণ্ড-কারখানা নয়, বরং তা অভাবিত ও গর্বিত এক পরম সাফল্য যাকে সারা পৃথিবী অভিনন্দিত করেছিল বিস্ফারিত বিস্ময়ে। উপরোক্ত দুই রাজ নীতির মূল প্রথিত ছিল কিন্তু দেশের মাটিতে আর তার ভিত্তি ছিল জলন্ত স্বদেশ প্রেম ও ত্যাগব্রতের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এই মহান আদর্শের ধারক ও বাহক দুই জনেই জাতির চিরনমস্য, চিরশ্রদ্ধেয় ও ইতিহাসে চিরভাস্বর। এঁদের সমগ্র জাতি চিরকাল গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে স্মরণ করবে আর ভবিষ্যৎকাল এঁদের দেবতা জ্ঞানে পূজা করবে মনের মন্দিরে নয় শুধু দেব দেউলে প্রতিষ্ঠা করে ভক্তি অর্ঘ দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় অতি পবিত্র ভাবে। হায় বর্তমান রাজনীতি। এই মহামানবের উত্তরসূরী হয়ে তোমরা কি হীন স্বার্থ-পূর্ণ মনোবৃত্তি নিয়ে ক্ষমতাদখলের দ্বন্দ্বে পরস্পরের গায়ে কাদা ছিটিয়ে কুৎসিত করছো ভারতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যকে তা কি একবারও ভেবে দেখার সময় পাওনা? এমনই স্বার্থান্ধ উচ্চাকাঙ্খী সবাই হয়ে পড়েছে যে লজ্জায় তোমাদের মাথা কি মোটেই হেঁট হয় না? ধিক তোমাদের এই স্বার্থান্বেষী আত্মসর্বস্ব রাজ-নীতিকে! তোমরা ভারতের মহান আদর্শকে ধূলায় লুটিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর বলে মনে হচ্ছে। এর পরিণাম কখনই শুভ নয়, বরং দেশকে তোমরা গভীর নৈরাশ্যে ও নৈরাজ্যে নিক্ষেপ করার জন্য মরণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছ। সংঘবদ্ধ ও সংহত হতে পারলে এখনও আশার আলোক দেখা গেলেও যেতে পারে, কিন্তু তোমরা সে পথ বেছে নেবে না বলেই আশংকা হয়; কারণ তোমাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে বহু পূর্বেই যখন তোমরা অষ্টবজ্র সম্মেলন করে ইন্দিরা গান্ধীকে গদীচ্যুত করার মানসে বিভিন্ন মতের ও পথের রাজনৈতিকদলগুলি গোঁজামিলের রাজনীতির মাধ্যমে জোড়াতালি দিয়ে যেনতেন প্রকারেণ ক্ষমতা দখলের খেলায় মেতে উঠেছিল বিশ্বের বিবেক অবজ্ঞায় হয়ে। মুখে তোমাদের শ্লোগান ছিল 'গণতন্ত্র বিপন্ন স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ' আর জয়-প্রকাশজী সর্বভারতীয় নেতার আসনে হঠাৎ উপবেসন করে ও সেইরূপ ভঙ্গিতে তোমাদের ডাক দিয়ে

বললেন—যদি সর্বমতের ও সর্বদলের পুরোধার এক হয়ে এক পথে না চলতে পার, তবে তোমাদের আকাঙ্খা পূরণ হবে না অর্থাৎ ইন্দিরা হটাও দেশ বাঁচাও বলে যে আওয়াজ তুলেছ তা সফল হবে না ; কারণ ইন্দিরা বেশ শক্তিশালিনী ও বুদ্ধিমতী তাঁর সঙ্গে দ্বৈরথে তোমরা পরাস্ত হবে।' জয়প্রকাশজীকে রাতারাতি তোমরা লোকনায়ক বানিয়ে সংবাদ পত্রের শিরোনামে স্থান দিলে নামকরা বড়বড় ধনিক-বনিকদের সাহায্যে. যেহেতু তারাই অধিকাংশ সংবাদ পত্রের মালিক ও নিয়ামক। খেলা জমে উঠলো আর ঐ সব স্বার্থান্বেষী ধনীজনেরা যারা আয়করের ব্যাপারে বারে বারে সরকারের চাপের চোটে অতিষ্ঠ অবস্থায় ছিল তারাও তলে তলে নিভৃতে নীরবে সে খেলায় শরিক হল আত্মস্বার্থে। নামকরা শ্যাগলাররাও ছুটে গেল ভবিষ্যৎ তাদের নিরুপদ্রব করার অভিলাষে—টাকা ছাড়তে লাগলো জলের মত নির্দ্বিধায়। ইন্দিরা গান্ধী বিদেশী রাষ্ট্রের চাপে পড়ে ১৮ই জানুয়ারী ১৯৭৭ সালে লোকসভা সদস্য নির্বাচনের ডাকদিয়ে তোমাদের রাস্তা আগেই পরিষ্কার করে দিয়ে মারাত্মক ভুল করলেন এবং তাই তোমরা একতাবদ্ধ হওয়ার তখন সুযোগ পেলে নচেৎ তোমরা আজ আর নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ী করে দলের মধ্যে দলাদলি করার সুযোগ সুবিধা পেতে কি ? যখন জনসংঘ, আদিকংগ্রেস, সোসালিষ্ট সি, এফ ডি, ও বি, এল, ডি এক হয়ে জনতা নাম নিলে তখন কি জানতে না যে জনসংঘ আর রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ এক বৃন্তে দুটি ফুল ও তারা অভিন্ন এবং আর, এস, এস কর্মীরাই উত্তরকালে জনসংঘের বিশিষ্ট বিশিষ্ট নেতা হয় যেমন শ্রীবাজপেয়ী ও শ্রীআদ্বানি এবং তাঁরা দ্বৈত সদস্যপদ ভোগ করেন আর তাছাড়া হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যে জনসংঘ কৃত সংকল্প তাও কি জানা ছিল না ? যদি না জানা থাকে তবে তোমাদের রাজনীতি করার কোন অধিকার ছিল না। রাজনীতি বুদ্ধিমানদের জন্য আহাম্মকদের জন্য কোন দিনই নয়। তোমরা সবই জানতে ও জেনে শুনেই সেই জনসংঘ তথা আর, এস, এস, সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলে কেবলমাত্র গদীর লোভে। তোমাদের চরিত্র লোভীর চরিত্র, দেশ বাসী তা ভাল করেই এখন জেনে গেছে। সংবিধানে 'রাইট অফ রিকল' নেই যদি তা থাকতো তবে তোমাদের লোকসভায় বসার ও মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ এদেশের জনগণ কিছুতেই দিত না। তোমরা যত কথা বল তা সবই আখের গুছিয়ে নেবার ধান্দায়। জনগণের মঙ্গলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের দারুণ ঠকিয়েছে—সেটা কি বুঝতে পারছ না ? জনতাদল ছিল এক স্বার্থান্ধ দল তার আবার যে কুরি নামলো জনতা (এস) হয়ে তা আরো নিকৃষ্ট কারণ আদর্শ বলতে কিছু নেই এদের, কেবল প্রধান মন্ত্রীর গদীটাই একমাত্র লক্ষ্য এদের এবং তা বৃদ্ধ দলপতির জন্য সংরক্ষিত করার জন্য এত সব ফিরিস্তি ও টাল বাহানা। সাম্প্রদায়িকতা রোধের জন্য এদের কত দরদ শীঘ্রই জানা যাবে। এরা শশকবৃত্তি নিয়ে মনে ভাবছে এদের এই নোংরামির আসল অর্থ কেউ বুঝে না। হায় বুদ্ধিমানের দল ! তোমরা যে কত কাঁচা তা সবাই দেখতে পাচ্ছে। (চলবে)

ভ্রমসংশোধন

গত সংখ্যার সালতামামিতে একাধিক ত্রুটি ও ভ্রম থাকায় আমরা দুঃখিত। আগামী পূজা সংখ্যায় একটি সংশোধিত ও পূর্ণাঙ্গ সালতামামি প্রকাশিত হইবে। সঃ বিঃ বাঃ

RgedNo. R. N. 24911/71 | Biplabi Bangla Phone : 34-1795 | Regd. WB/MC 77

বার্ষিক :—মাত্র ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

বিপ্লবী পুস্তকমালা

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের—৩'০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদারের—৩'০০

ক্ষীরোদ কুমার দত্তের

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১'৫০

২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮'০০

৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২'০০

৪। গৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১'০০

৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১'২৫

৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—'৪০

৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—'৬০

৮। স্বাধীনতার শহীদ মা ও মেয়ে—'৪০

৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—'৬০

১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—'৫০

১। মহাবাহু ও সুভাষচন্দ্র—'৪০

১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—'৭৫

১৩। দেশ যাদের ভোলেনি (১)—১'০০

১৪। দেশ যাদের ভোলেনি (২)—২'০০

১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—'৫০

১৬। ১৩ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১'০০

১৭। হাজির হত্যা প্রচেষ্টা—'৭৫

১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৪'০০

১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—'৪০

২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১'৫০

প্রাপ্তিস্থান :—৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০৭৩

শৈলশ্রী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

— সম্পাদক মণ্ডলী —

শ্রীঅনাদি চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীঅমলেন্দু নন্দী, শ্রীপুলক চ্যাটার্জী

সম্পাদক—শ্রীনাভি কিরণ রায়চৌধুরী

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতালা—শ্রীঅগোপাল পাল।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত । প্রচার সচিব—শ্রীসুধেন্দু সোম।

বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বঙ্কিম ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬. 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭৪

অষ্টম বর্ষ	শনিবার ১৫ই ভাদ্র, ১৩৮৬ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯	৪৬ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

তফাৎ যাও

(সম্পাদকীয়)

রাজনীতির গতিপ্রকৃতি

। শ্রীবরেণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

। কীরোদ দত্ত ।

ভাঙ্গনের ঢেউএ জনতাদল গণতন্ত্র টলমল

।। কালীপদ সরকার ।।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা

। অধ্যাপক মলিনী মোহন সাণ্ডেল ।

ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যের মধ্যে
স্বদেশের উপকার সাধন
সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

সম্পাদকীয়—

তফাৎ যাও

দিল্লীর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে একটার পর একটা দৃশ্যে যে শোচনীয় নাটকের অভিনয় দেখা যাচ্ছে, তা গভীর উদ্বেগজনক। দুইজন রাজনৈতিক অভিনেতার প্রধানমন্ত্রী হবার ব্যক্তিগত লোভ ও আকাঙ্খা চরিতার্থ হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ জন্য রাজনৈতিক আকাশ বাতাসকে এটম বোমার বাষ্পের মত শুধু কলুষিতই করে নাই, মানুষের দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। আদর্শ নিষ্ঠা, রাজনীতি মানবীয় মূল্যবোধের প্রচণ্ড অবক্ষয় ঘটেছে একদিকে, অন্যদিকে দুর্নীতি, মুনাফাবাজকে প্রশ্রয় ও গণতন্ত্রের আদর্শ ও মৌলনীতিকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে ভয়ঙ্কর রকমে। এই সব জনপ্রতিনিধিদের কাজকর্ম মানুষের মনে ঘৃণা ও ক্ষোভেরও সৃষ্টি করেছে তুলনাহীন রকমে। বর্তমান কালকে এরা ম্লেনম্লা করেছেন সর্বরকমে এবং ভবিষ্যৎকেও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছেন মারাত্মকভাবে। দেখে মনে হয়, "আকাশকোণে সর্বনেশে, ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে।"

কেন্দ্রে যা একটা অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে লোকসভার কোন দলেরই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। একাধিক দলের সংযোগ ও সহযোগিতা ভিন্ন কোন একটি দলের পক্ষে প্রশাসন চালবার ক্ষমতা ছিল না। তলে তলে জনতা, জনতা (এস) এবং কংগ্রেস দলের নেতা ও সদস্যদের সবারই অদম্য আকাঙ্খা ক্ষমতার আসনটী আঁকড়ে থাকার। কিন্তু তুরুপের তাস ছিল ইন্দিরা কংগ্রেসের হাতে। পেটে ক্ষুধা, কিন্তু মুখে লাজ। প্রধান দুই পক্ষই চাচ্ছিল ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থন। কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের ছোঁয়াচ যদি লাগে, তবেই ত মুস্কিল। ইন্দিরাজীর বিরুদ্ধে এত কথা বলা হয়েছে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যে প্রকাশ্যে তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করার মুখ নেই এদের। অথচ গদীটা রাখবার জন্য অশোভন আগ্রহ। রাজনীতিক্ষেত্রে এমন দেউলিয়াপনা খুব কমই দেখা যায়। লোকসভার সম্মুখীন হতে ভীত, সন্ত্রস্ত অথচ কৌশলে ক্ষমতার আসন দখলে রাখা চাই। এরাই গণতন্ত্রকে হত্যা করার আওয়াজ তুলেছিল একসময় এবং গণতন্ত্রের আদি এবং অকৃত্রিম ধ্বজাধারী বলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। জনসাধারণের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারব না, অথচ ক্ষমতায় তাদেরই রাখতে হবে, এমন অদ্ভুত আব্দার অবোধ শিশুদের আকাশের চাঁদ ধরে দেবার আব্দারের সামিল বলা চলে। – নিজেদের হিমালয় সদৃশ অযোগ্যতা, অপদার্থতা প্রমাণিত হবার পরও এমন অদ্ভুত দাবী পেশ করা রীতিমত নিন্দনীয় এবং অসমর্থনযোগ্য। যে সংখ্যালঘু দল আরো কিছুদিনের জন্য

গদী আঁকড়ে থাকার সুবিধা পেল, তারা খুবই খুসী। কিন্তু তাদের চেতনাবোধ জাগে নি। তাদের রাষ্ট্রপতি যে সুযোগ দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকার হিসাবে কাজ করবার, সেটা নিছক রাষ্ট্রপতির দান বলা চলে। মাত্র চব্বিশদিনের বেশী যারা টিকতে পারল না, লোকসভায় আস্থাভোট অর্জনের বেলায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল, তাদের ক্ষমতাসীন থাকার কোন নৈতিক বা গণতান্ত্রিক অধিকার আছে বলে মনে হয় না। অবশ্য এনিয়ে আইন বিশেষজ্ঞ, রাজনৈতিকদলের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। জনতা (এস) দলের তরফ থেকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করাই উচিৎ ছিল। কিন্তু ক্ষমতার লোভ সহজে যায় না। তাই পেছন দরজা দিয়ে ঢুকতেও এদের কোন লজ্জাবোধ দেখা দেয় নি। অন্তপক্ষে জনতাদল যে হৈহল্লা করছেন রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মহা অভিযোগ দায়ের করতে যাচ্ছেন, রাষ্ট্রপতির কাজের মধ্যে উদ্দেশ্যপ্রণোদনা খুঁজে বের করতে চাচ্ছেন, তারও কোন যুক্তি নেই। রাষ্ট্রপতি যথাসম্ভব আলোচনা করেছেন. তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভুল নয়, তবুও উদ্দেশ্য আরোপ করার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রপতির সম্মানকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে এইভাবে হেয় করা অত্যন্ত গর্হিত বলা চলে। নির্বাচনের রায়কে একটি দল ভিন্ন সবাই মেনে নিয়েছেন সঠিক বলে। একমাত্র জনতা দল এতে অখুসী। জনতা দল একটি অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ অভিযোগ তুলেছেন। শ্রীজগজীবন রামকে প্রধানমন্ত্রী হতে না দেওয়া নাকি অনুন্নত জাতির আশা আকাঙ্খাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। এই অভিযোগ শুধু দুর্বোধ্য নয়,রীতিমত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। জগজীবনবাবু ত অনুন্নত জাতির প্রতিনিধি হিসাবে এই পদ প্রার্থী হন নি. তিনি দাবীদার ছিলেন জনতাদলের নেতা হিসাবে। তা ভিন্ন, জাতির ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী হবার যোগ্যতা বাড়ায় না। অতীতে কোন দিন এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করা হয় নি। সর্বোপরি কোন গণতন্ত্রে এই নীতি অচল। জনতাদল সে মাত্রা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। অবশ্য হরিজন এবং অনুন্নত জাতির ভোট আদায় করার এটা একটি অতি হীন অপকৌশল মাত্র। সাম্প্রদায়িক, জাতিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি দেশের প্রভূত ক্ষতি সাধন করছে। এই জঘন্য মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিলে অদূর ভবিষ্যতে দেশের সংহতি বিনষ্ট হতে বাধ্য। দেশ যদি না বাঁচে, তবে কোন সম্প্রদায়, কোন বিশেষ শ্রেণী, কোন বিশেষ অঞ্চল একক ভাবে বাঁচতে পারে না, একমাত্র মহামূর্খ ব্যতীত সকলেরই একথা বোঝা উচিৎ।

পুনশ্চ অন্তর্বর্তী নির্বাচন ভিন্ন এই পরিস্থিতিতে অন্য কোন উপায় ছিল না। রাজনৈতিক নেতা বা দলের শুভবুদ্ধি কতটা উদয় হবে বলা শক্ত। তবে দেশের মানুষকে বিচার বিবেচনা করে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে। শ্রেণীগত,জাতিগত, সম্প্রদায়গত, আঞ্চলিকতা ভিত্তিক দলগুলিকে সমর্থন করলে আবারো এই অস্থির পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। সর্ব্বভারতীয় সংগঠন ও ভাবমূর্তি যে দলের নেই, তাদের প্রথম ধাপেই বর্জন করা দরকার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করে যারা মুষ্টিমেয় লোকের লালসা চরিতার্থ করতে চান, তাদের দূরে হটিয়ে দিতে হবে এই কারণে যে তাদের ক্রিয়াকর্ম জাতীয় সংহতির পরিপন্থী। প্রতিটি বড় দলের মনোনীত প্রতিনিধিদের যোগ্যতা, সততা, আদর্শনিষ্ঠা ও দেশ প্রেমের মানদণ্ড যাচাই করাও বিশেষ প্রয়োজন। অপকর্মের সময় যারা মদত দিয়েছিল, তাদের ঢালাও মনোনয়ন দিলে তাদের

কোন সমর্থন জানান উচিৎ হবে না। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে অচল টাকা বাজারে চালাবার চেষ্টা করলে তাদের ভরাডুবি সুনিশ্চিত। একটি আওয়াজ তুলতে হবে যে যারা 'ঘুটা হায়', তারা 'তফাৎ যাও'। কারো ধাপ্পায় ভুলে গেলে দেশের মানুষ নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনবেন। যে গুরুতর সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন বর্তমান 'প্রতি নিশীথের নব পরিণীতাদের চেয়েও অধম ব্যক্তিরা' (মতটা একজন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীর) তাতে একটি দক্ষ, পরিচ্ছন্ন ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ প্রশাসন সৃষ্টি করতে না পারলে জাতিকে ধ্বংসের সম্ভাবনা থেকে বাঁচান যাবে না। একথা মনে রেখেই কাজ করতে হবে। আমরা প্রত্যাশা করব জনগণ দেশের মানুষের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করবেন।

———

'বালেশ্বর দিবস' হীরক জয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটি

প্রিয় বন্ধু,

আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর (১৯৭৯) রবিবার বিপ্লবী মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) ও তাঁর বীর অনুগামী চতুষ্টয়ের আত্মবলিদানের এক অবিস্মরণীয় দিন।

সেই ঐতিহাসিক ঘটনার চৌষট্টিতম বাৎসরিক দিবস উপলক্ষে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হবে বালিগঞ্জ শিক্ষা সদন হলে বৈকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকায়।

এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন বর্ষীয়ান বিপ্লবী নায়ক পণ্ডিত পরমানন্দ। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবেন মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র। উদ্বোধন করিবেন মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী।

এই স্মরণ সভায় আপনার সবান্ধব উপস্থিতি ও সহযোগিতা কামনা করি।

বিনীত—

১৭৩, কাঁকুলিয়া রোড,
কলিকাতা-২৯
২৩-৮-৭৯

সুধীরকুমার ঘোষ
বিভাস রায়
যুগ্ম-সম্পাদক

স্মরণ সভার স্থান—

বালিগঞ্জ শিক্ষা সদন হল

৫১/১, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯।

(গড়িয়াহাট বাসবিহারী মোড়ের উত্তরে ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসের সম্মুখ ফুটে)

॥ অনুষ্ঠান সূচী ॥

তারিখ—৯ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, বৈকাল সাড়ে ৫ ঘটিকায়।

দেশাত্মবোধক সঙ্গীত—শ্রীসবিতাব্রত দত্ত। আবৃত্তি—শ্রীপ্রদীপ ঘোষ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত
বরিশাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমিও তাদের দৃষ্টান্তে একখানা নড়বড়ে চেয়ারে বসার জন্য কেবল মাত্র চেয়ারখানায় হাত রেখেছি, অমনি ম্যাজিষ্ট্রেট গর্জন করে উঠলেন, 'তুমি একজন বন্দী, তুমি বসতে পার না। তোমাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হবে।' প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, আমি আপনার দ্বারা অপমানিত হওয়ার জন্য এখানে আপনার ঘরে আসিনি। আমি শিষ্টাচার ও সুবিবেচনাপূর্ণ ব্যবহার আশাকরি।

মিঃ ইমার্সন রেগে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করলেন এবং আমাকে আমার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে বললেন। আমি অবশ্যই নিজেকে নিরপরাধ বলে এই মামলায় আপত্তি তুললাম এবং আমার পক্ষ সমর্থনের সুযোগ দানের জন্য সময় প্রার্থনা করলাম। এই সমস্ত ঘটনা ঘটার সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে আর একজন ইয়োরোপীয় ভদ্রলোক বসে ছিলেন। এই ভদ্রলোককে পরে আমি নোয়াখালির জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লেস্ বলে জানতে পেরেছি, তিনি আমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করে ঘটনাটির ওখানেই ইতি টানতে উপদেশ দিলেন। আমি বললাম, "আমি মার্জনা প্রার্থনা করব কেন? আমি এমন কিছুই করিনি যার জন্য আমি মনে করতে পারি যে আমার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। আদালত অবমাননার জন্য আমার ২ শত টাকা জরিমানা করা হল।

এর পরে পুলিশের আনা মামলাটি উঠলো। মিঃ কেম্প তার সাক্ষ্য দিলেন, আমার মনে হল এ মামলার তিনি একাই সাক্ষী দিলেন। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল যে আমি এমন একটি শোভাযাত্রায় যোগদান করেছি যে শোভাযাত্রার কোন লাইসেন্স ছিলনা এবং এমন একটি ধ্বনি করেছি যে ধ্বনিটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আমি নিজেকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করে মিঃ কেম্পকে জেরা করার জন্য এবং সাক্ষী উপস্থিত করার জন্য সময় প্রার্থনা করলাম। আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হলনা এবং আমার ২ শত টাকা জরিমানা করা হল। আমার সঙ্গে টাকা ছিলনা। মিঃ কেম্প আমার সঙ্গে এলেন জরিমানার টাকা নেওয়ার জন্য। মিঃ কেম্প সব সময়ই আমার সঙ্গে খুব সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করেছেন।

জরিমানার টাকা দিয়ে সম্মেলনস্থলে ফিরে এলাম। তখন সম্মেলনের অধিবেশন চলছিল। বন্ধুগণসহ আমি যখন সম্মেলন মণ্ডপে প্রবেশ করলাম, তখন সেখানে এক অপূর্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম। সমবেত সকলে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে তারস্বরে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করতে থাকেন। কয়েক মিনিট সম্মেলনের কাজ স্থগিত রাখা হল। তারপরে মঞ্চের উপরে আমরা আসন গ্রহণ করলে পুনরায় কাজ শুরু হল। কিন্তু সম্মেলনের মনোভাব তখন নির্ধারিত

কার্য্যক্রম অনুসরণ করার দিকেই ছিলনা। সে দিনের ঘটনাবলী সময়ের দিক থেকে এত নিকটবর্তী এবং সে ঘটনাগুলির স্বরূপ এত মর্মস্পর্শী যে সে সময় অন্য কোন বিষয়ের দিকে মনোযোগ দেওয়ার কোন অবকাশই ছিলনা।

মুহূর্ত মধ্যে মঞ্চের উপর এসে দাঁড়ালেন বাবু মনোরঞ্জন গুহ। তার সঙ্গে এসে দাঁড়াল কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় তার পুত্র চিত্তরঞ্জন গুহ। মনোরঞ্জন বাবু প্রতিনিধিগণের কাছে এই যুবকের উপর পুলিশ কিরূপ প্রহার চালিয়েছে তা বর্ণনা করলেন। চিত্তরঞ্জনের পিতা মনোরঞ্জন বাবু ছিলেন একজন বাগ্মী পুরুষ। তার বক্তৃতায় আমাদের মাতৃভাষার বিভবকে ব্যবহার করার অদ্ভুত শক্তি তার ছিল। যে অননুকরণীয় ভঙ্গীতে তিনি পুলিশের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করলেন, তাতে শ্রোতৃমণ্ডলী কিছুক্ষণের জন্য মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে রইলেন। চিত্তরঞ্জনকে পুলিশ তাদের রেগুলেশন লাঠি নিয়ে আক্রমণ করে এবং প্রহার করতে করতে একটা পুকুরের জলে ফেলে দেয়। তার সেই অসহায় অবস্থার মধ্যেও তার উপর প্রহার চলতেই থাকে। চিত্তরঞ্জন কোনরূপ প্রতিরোধ না করে প্রতিটি লাঠির আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র 'বন্দে-মাতরম' ধ্বনি করতে থাকে। বিনা প্রতিরোধে বিনা প্রতিবাদে পশু-শক্তির কাছে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সমর্পণ করার এ এক চরম প্রয়াস। পিতা এবং পুত্র মঞ্চের উপরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন: পিতা অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করছেন; পুত্র তার সর্বশরীরে সে অত্যাচারের চিহ্ন বহন করে প্রমাণ উপস্থিত করছে—এ দৃশ্য চিরকালের জন্য স্মরণ যোগ্য হয়ে রয়েছে। এ দৃশ্যটি পরে ক্যানভাস কাপড়ে চিত্রিত করে ১৯০৬ সালে কলকাতা প্রদর্শনীতে দেখান হয়েছিল এবং এই চিত্রটি ছিল সেই প্রদর্শনীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় চিত্র। এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছিলেন লর্ড মিণ্টো।

সন্ধ্যার সময় সম্মেলনের কাজ শেষ হলে প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ আবাসে চলে যান, যাওয়ার সময় তারা বরিশালের রাজপথে সেই নিষিদ্ধ 'বন্দে-মাতরম' ধ্বনি করতে করতে যান, পুলিশ আর হস্তক্ষেপ করে নি। তারা হয়ত মনে করে থাকবে যে সেদিনের কাজে তারা যে বাহাদুরী দেখিয়েছে তা-ই যথেষ্ট, আর দরকার নেই। তাই প্রতিনিধিগণকে তাদের ইচ্ছামত যেতে দেওয়া হল।

সেই পূর্ববঙ্গ সরকার এখন আর নেই, কিন্তু তাদের অত্যাচার নির্য্যাতনের চরম কলঙ্কময় ইতিহাসের কাহিনী আজও শেষ হয় নি। পরের দিন আবার সম্মেলনের কাজ শুরু হল। যথারীতি নির্ধারিত কার্য্যক্রম অনুযায়ী সম্মেলনে কাজ চলতে থাকে। এমন সময় জিলা পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কেম্প সম্মেলনের মণ্ডপে প্রবেশ করলেন। তিনি মঞ্চের দিকে এগিয়ে গিয়ে সভাপতি মহাশয়কে বললেন যে তিনি যদি এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি না থাকেন যে সম্মেলনের শেষে প্রতিনিধিগণ রাজপথে আর 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করবেন না, তাহলে তাদের অবশ্যই সম্মেলন ভেঙ্গে দিতে হবে। প্রতিনিধিগণের সঙ্গে আলোচনা করার পরে সভাপতি মহাশয় সেরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করলেন। মিঃ কেম্প তখন ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারাক্রমে সম্মেলন ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশটি পাঠ করে শোনালেন। সম্মেলনে প্রচণ্ড ক্রোধ ও ক্ষোভের ঢেউ খেলে গেল। প্রতিনিধিগণ কোন ক্রমেই মাথা নত করবেন না। মিঃ জে, চৌধুরী এবং আরও কয়েকজন নেতা কর্ত-

পক্ষের করমান যতই স্বৈরাচারী হোক না কেন, তা মেনে নিতে আবেদন জানালেন। প্রতিনিধিগণ সে আবেদনে সাড়া দিলেন. এই সমস্ত উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে আমাদের দেশবাসীগণ যে শৃঙ্খলা ও নেতাদের উপদেশের প্রতি তাৎক্ষণিক আনুগত্য প্রদর্শন করেন তা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং তাদের এই গুণটিই প্রধানতঃ আন্দোলনের সাফল্য লাভে সহায়তা করেছে।

প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ আসন ত্যাগ করে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি সহকারে সারিবদ্ধভাবে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা বন্দেমাতরম ধ্বনি করা যে বে-আইনী নয় আইনসিদ্ধ তা সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন। সকলেই সম্মেলন মণ্ডপ ছেড়ে চলে গেলেন, কিন্তু একজন সম্পূর্ণ এককভাবে সেখানে বসে রইলেন, ইনি হলেন 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ কৃষ্ণকুমার মিত্র। এঁর সম্পর্কে এই পুস্তকের পাতায় একাধিকবার আমাকে উল্লেখ করতে হয়েছে। ব্রোনাস যখন তার বর্বর দলবল নিয়ে রোম নগরীতে প্রবেশ করছিলেন তখন যেমন পুরাণ দিনের সিনেটরগণ তাদের স্থান ত্যাগ করেন নি তিনিও তেমনি নিজ আসনে বসে রইলেন। তিনি সেখান থেকে নড়বেন না। তাঁর সমস্ত শরীরে যেন তাঁর চিত্তের দৃঢ়তার ছাপ অঙ্কিত হয়ে দেখা দিল। ক্রোধে তাঁর মুখমণ্ডল ম্লান হয়ে উঠলো। কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করার সমস্ত পরিণতির সম্মুখীন হতে তিনি প্রস্তুত। আমরা তাঁকে অনেক বুঝালাম, আবেদন-অনুরোধ করলাম, প্রতিবাদ জানালাম এবং শেষ পর্য্যন্ত অতি কষ্টে আমরা তাঁকে মণ্ডপ ছেড়ে চলে যেতে রাজি করাতে পারলাম।

কনফারেন্স দেখার জন্য প্রায় তিনশত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাদের কাছে মণ্ডপ ছেড়ে যাওয়ার এখন মাত্র দুইটি উপায় রইল। হয় অপরাহ্ণ বেলায় তাদের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে গাড়ীর ব্যবস্থা আগেই করে রাখা হয়েছিল তা না আসা পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত সভা মণ্ডপে অপেক্ষা করতে হবে, নয়তো এই এপ্রিল মাসের প্রচণ্ড রৌদ্র তাপের মধ্যে একরকম অরক্ষিত অবস্থায় নিজেদেরই বাড়ী ফিরে যেতে হবে। তারা শেষের পথটাই বেছে নিলেন। এই পথ বেছে নেওয়ার মধ্যে যে কি পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার রয়েছে, তা যারা ভারতীয় মহিলাদের অভ্যাস ও মনের গতি সম্পর্কে খবর রাখেন তারা সঙ্গে সঙ্গেই অনুমান করতে পারেন, আমরা এই অদ্ভুত আদেশে কতকটা বিমূঢ়ভাবে মণ্ডপ ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। এই আদেশ ছিল ম্যাজিষ্ট্রেটের অধিকার বহির্ভূত এবং সম্পূর্ণরূপে সমর্থনের অযোগ্য। কারণ পূর্ব্বদিনে পুলিশের বল্গা হীন উচ্ছৃঙ্খল আচরণকে মেনে নিয়ে প্রতিনিধিগণ যে সমস্ত ভাব প্রদর্শন করেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দ্বারা কোনরূপ শান্তিভঙ্গ হতে পারে এরূপ আশঙ্কা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। আদেশটি যে ভাষায় সাজিয়ে রচিত হয়েছিল তা নিচে দেওয়া গেল।

"যেহেতু পুলিশের রিপোর্ট দৃষ্টে এটা মনে হচ্ছে যে সহরের বি, এম, কলেজের বিপরীত দিকে একটি মণ্ডপে যে সম্মেলনের অনুষ্ঠান হতে চলছে তা শেষ হওয়ার পরে রাস্তায় রাস্তায় উচ্ছৃঙ্খল ও গোলমেলে শোভাযাত্রাদি দেখা দিতে পারে যে শোভাযাত্রা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে, সেইহেতু এতদ্বারা আমি এই আদেশ দিচ্ছি যে জনসাধারণ বা কোন ব্যক্তি সেই উদ্দেশ্যে মণ্ডপে বা অন্য কোথাও মিলিত হতে পারবে না এবং জনতা

(বাকী অংশ ১১ পাতায়)

ভাঙ্গনের ঢেউএ জনতাদল

গণতন্ত্র টলমল—

॥ কালীপদ সরকার ॥

সম্প্রতি দিল্লীতে যে রাজনৈতিক নাটকের অভিনয় হয়ে গেল তাতে বিস্ময় কৌতূহল বিষাদ হর্ষ কোন রসেরই অভাব ছিল না। নাটকে দ্রুত পটপরিবর্তন এবং প্রবল গতিবেগও ছিল। এক কথায় বলা যায় অভূতপূর্ব। তবে দর্শক শ্রোতারা মনে করছেন যে নাটকের শেষপর্ব এখনো অভিনীত হয় নি, যবনিকাপাতের কিছু বিলম্ব আছে।

দেশের প্রবীণ এবং গণ্যমান্য রাজনীতিকদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা লাভের জন্য জঘন্য আচরণ যেমন বিদেশীদের দৃষ্টিতে ভারতের মর্যাদা হানি ঘটিয়েছে তেমনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছে দেশের মানুষকে। প্রেক্ষাপটের পশ্চাতে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী বিদেশী হস্তের অবস্থানের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সব কিছু দেখে শুনে অনেককেই সখেদে বলতে হয়েছে—হায়রে, এদের আমরা জাতির ভাগ্যবিধাতৃক করে লোকসভায় পাঠিয়েছিলাম।

মাননীয় জন-প্রতিনিধিদের নিয়ে রাজধানীতে যে ঘোড়া বেচা-কেনার বাজার জমে উঠেছিল অথবা পঞ্চাশজন সংসদ সদস্যের জন্য পাঁচ কোটি টাকা খরচের গুজব সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল সে প্রসঙ্গে না গিয়ে, সোজা কথায় স্বীকার করতে হয় ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এখনো অতিশয় যে-মজবুত। যে রাজনৈতিক সততা ও নৈতিক মূল্যবোধ গণতন্ত্রের মৌল শক্তি তার একান্ত অভাব রয়েছে ভারতীয় সমাজ জীবনে।

যে সদস্য যে দলের টিকিটে নির্বাচনে জয়ী হন ; দলত্যাগ করলে তার পক্ষে লোকসভা বা বিধান-সভার সদস্যপদও যে ত্যাগ করা উচিত, এই স্বীকৃত রীতি মেনে না চললে, গণতন্ত্র বাঁচতে পারে না। এই সত্য উপলব্ধি করার সময় অনেকদিন আগেই এসে গেছে। দলত্যাগ রোধের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের উদ্যোগও একাধিকবার হয়েছে, কিন্তু প্রত্যাশিত আইন পাশ হয় নি। হয়ত সকল বড় দলই দলবদলের এই খেলা চায়। অথচ দলত্যাগ প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট সদস্য-আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতাদের অপমান করার সামিল। নির্বাচকদের ইচ্ছাকে পদদলিত করে ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের অধিকার কোন সদস্যের থাকতে পারে না।

দলত্যাগীদের নতুন জোট বলছে—তাঁদের কাজটা ঠিক দলত্যাগ নয়, রাজনৈতিক শক্তির পুনর্বিন্যাস। তাদের কথা মেনে নিলেও বলতে হয়, পুনর্বিন্যাসটা নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে করলেই তো গণতন্ত্র সম্মত হত।

জনতাদলে ভাঙ্গনের বীজউপ্ত ছিল তার গঠন শৈলীতে। ইন্দিরা-বিদ্বেষকে মূলধন করে যে পাঁচটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সমঝোতার দ্বারা জনতাদলের উদ্ভব ঘটেছিল তাতে না ছিল প্রকৃতিগত মিল, না বৈপ্লবিক কর্মপন্থা। জনতাদল আভ্যন্তরীণ প্রশাসন এবং বৈদেশিক নীতিতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সরকারের নীতিই মূলতঃ অনুসরণ করে চলেছিল। এখানে একথা স্মরণীয় যে, ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেছিলেন তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীই এবং নির্বাচনের পূর্বে জরুরী অবস্থানকালীন আইনকানুনের বেশির ভাগ বাতিল করেছিলেনও তিনি। নির্বাচনের পর, নতুন সরকার গঠনের পূর্বে, শ্রীমতী গান্ধী জরুরী অবস্থা সম্পূর্ণ রদও করেছিলেন। ১৯৭৭ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা না করলেও পারতেন, কারণ তখনো লোকসভার বর্দ্ধিত পরমায়ু শেষ হতে এক বছর বাকি ছিল। লোকসভায় শ্রীমতী গান্ধীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল এবং জরুরি অবস্থা ঘোষণাসহ তাঁর সকল কর্মনীতিই লোকসভা কর্তৃক যথাবিধি অনুমোদিত হয়েছিল। তাঁকে স্বৈরতন্ত্রী বলার পিছনে বলিষ্ঠ যুক্তি নেই।

জনতাদলে নিষ্ঠাবান সৎ সংসদ সদস্য ছিলেন না এমন নয়, কিন্তু নব-গঠিত দলের তিন বর্ষীয়ান নেতাই ছিলেন প্রধানমন্ত্রিত্ব পদের দাবিদার এবং তাঁদের এ ভাবনাও ছিল যে বর্তমান সংসদের আয়ুষ্কাল মধ্যে প্রধানমন্ত্রী হতে না পারলে তাঁদের পক্ষে সে সুযোগ জীবনে হয়ত আর আসবে না। শ্রীমোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী হলে অপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সেই কারণে ক্ষুব্ধ হলেন। বাবুজীর দাবী ছিল কমজোরী, কারণ তিনি জে, পি, র ইন্দিরা বিরোধী বিদ্রোহ-সংগ্রামের সহিত যুক্ত ছিলেন না, তিনি ছিলেন তখন শ্রীমতী গান্ধীর ঘনিষ্ট সহযোগী এবং ক্যাবিনেট মন্ত্রী। জরুরী অবস্থা ঘোষণাকে তিনি সমর্থন করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি।

পক্ষান্তরে, শ্রীচরণ সিং জে পির আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং জরুরী অবস্থাকালে জেলেও ছিলেন। জনতাদল গঠনেও তাঁর ছিল বিশেষ অবদান। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে উত্তর ভারত থেকে কংগ্রেসকে উৎখাত করার মূলে যে জনসংঘ বি, এল, ডি আঁতাত, তারও অন্যতম নায়ক ছিলেন শ্রীচরণ সিং। জনতাদলের সংসদীয় নেতা নির্বাচন যদি ১৯৭৭ সালে জে, পি ও কৃপালনীর মধ্যস্থতায় সম্পন্ন না হত তাহলে শ্রীদেশাই প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন কিনা বলা কঠিন। জনতাদলের অন্যতম প্রধান গোষ্ঠী বি, এল, ডি না পেল দলনেতার পদ, না প্রধান মন্ত্রীর গদি। সুতরাং বি, এল, ডির ক্ষোভের কারণ ঘটল, আর শেষে তাই হল বিপত্তির হেতু। দল ভাঙ্গল।

শ্রীচরণ সিং প্রথমে দলের ভিতরে থেকে কলকাঠি নাড়িয়ে অভিলাষ পূরণে সক্রিয় হন। এ প্রয়াস ব্যর্থ হলে, তিনি বাইরের সাহায্যের জন্য হাত বাড়ালেন। জনতাদলকে ভাঙ্গবার জন্য দেশী বিদেশী শক্তির এজেন্টরা ওত পেতে ছিল। চৌধুরী সাহেবকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না, হাত বাড়াতেই বন্ধু পেয়ে গেলেন। কূট কৌশলের খেলায় নীতিবাগীশ শ্রীদেশাই হারলেন। তিনি বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখলেন, জনতা দলের যে প্রধান শ্রীমতি গান্ধীর নির্দয় কঠোর সমালোচক

ছিলেন, সেই শ্রীচরণ সিং শ্রীমতী গান্ধীর সাহায্য নির্ভর হয়ে তাঁকে গদিচ্যুত করলেন। অনেকে মনে করল, কিমাশ্চর্যমতঃপরং। কিন্তু এই হল রাজনীতি। আজ যে শত্রু কাল সে বন্ধু। স্বৈরতন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতা ও সমাজবাদের কথা দেখা গেল নিছক ফাঁকা আওয়াজ।

কংগ্রেসের বিকল্প জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রী দল হিসাবে যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে জনতা পার্টি আত্ম-প্রকাশ করেছিল ভাঙ্গনের আঘাতে সে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে তো? এ প্রশ্ন অনেকের মনেই দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রের ভাঙ্গনের ঢেউ লেগেছে জনতাদল শাসিত রাজ্যগুলিতেও। গভীর রাজনৈতিক অস্থিরতা ছেয়ে ফেলেছে সমস্ত দেশ। অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে সাজো সাজো ডাক পড়েছে কমিউনিষ্ট শিবিরে।

তবে প্রধান মন্ত্রী চরণ সিং শক্ত মানুষ, অভিজ্ঞ রাজনীতিক এবং জাতিতে রাজপুত জাঠ। দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য আছে জাঠদের পিছনে। তিনি নিজেও একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং চিন্তাবিদ। ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা আছে এবং সে বিষয়ে তিনি কয়েকখানা অনুসন্ধিৎসাপূর্ণ বইও লিখেছেন।

চৌধুরী সাহেব নেহেরু নীতির কড়া সমালোচক এবং গান্ধীজীর গ্রামীণ অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় দ্বারা প্রভাবিত। তিনি কৃষক সমাজের আপনার জন বলেও পরিচিত। প্রয়াত লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর পর, শ্রীচরণ সিং হলেন দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি উপর তলার মানুষ নন এবং যাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ আছে পল্লীর দরিদ্র মানুষের সঙ্গে। তাঁর শাসনকালে দেশের অর্থনীতিতে একটা বড় রকমের পরিবর্তন আশা করা যেতে পারে।

জনতা (এস)-কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার কংগ্রেস-(ই) র সমর্থন পুষ্ট হয়ে বর্তমানে যে টিকে থাকবে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। পরে কি হবে, ঘটনা প্রবাহ কোন দিকে মোড় নেয়, বলা শক্ত।

একটা সত্য ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বাদ দিয়ে ভারতীয় রাজনীতি যেন দুই পায়ে ভর দিয়ে চলতে অক্ষম।

যকৃতের পেটের বায়ু, অম্ল, অজীর্ণ ও পেটের বেদনায়
অব্যর্থ ফলপ্রদ
আমলা ঘৃত কুমারী
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী মূল্য ৩.৫০ এক শতাব্দী ধরে
প্রস্তুতকারক: শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
হিমসাগর কুটীর • কুলে রোড • হাওড়া • ৬ পরগণা

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯১৪—১৫ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে, চলছে রাসবিহারীর নেতৃত্বে অনুশীলন, চন্দননগর ও গদর বিপ্লবীদলের মিলিত ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রচেষ্টাও। বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের জার্মানী থেকে অস্ত্র আমদানি প্রচেষ্টাও কিছুটা সাফল্যের দিকে এগিয়েছে। জার্মানী থেকে অস্ত্র আসছে সে সংবাদও পাওয়া গেছে দেশে। তাই দেশের ভিতরে ও বাইরে চলেছে অভ্যুত্থানের উদ্যোগ আয়োজন। এদিকে সরকারী কর্তৃপক্ষও নীরবে বসে নেই। বাঙলাদেশের যুবকমাত্রকেই ধরে ধরে পুরছে কারাগারে ভারতরক্ষা আইনে। ফলে অনুশীলন কর্মীরা বাধ্য হয়েই ফেরার জীবন অবলম্বন করলেন। কিন্তু এদিকে সর্বভারতীয় উদ্যোগ আয়োজনের জন্য তাদের কলকাতায় থাকা প্রয়োজন। কিন্তু পুলিশ একার্যে বাধা সৃষ্টি করবার জন্য এক আইন করল—স্ত্রীলোক সঙ্গে না থাকলে কোন বাড়ী ভাড়া নেওয়া বা দেওয়া দণ্ডনীয়।

অনুশীলন বিপ্লবীদের তখন ভাঙা ঘর। ১৯১০ সালে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে পুলিন বিহারী দাস আজীবন দ্বীপান্তর এবং জ্যোতিময় রায় প্রত্যেকে সাত বৎসর করে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। প্রফুল্ল সেন, রাধিকা রায়, রাধিকা ব্যানার্জী, ক্ষীরোদ গুহ, সুচীন ব্যানার্জী, শান্তি গুহ, তুলসি সেনগুপ্ত, নরেন সেনগুপ্ত, নিশিভূষণ মিত্র প্রভৃতিও বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও তখনও বহু কর্মী এদের মধ্যে আছেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ), অমৃত হাজরা (শশাঙ্ক হাজরা), মদন ভৌমিক, রমেশ আচার্য, প্রতুল গাঙ্গুলি, রমেশ চৌধুরী, নরেন সেন, যতীন রায় প্রভৃতি। ১৯১২ সালের প্রথম দিকে এদের মধ্যে সাইত্রিশজনকে গ্রেপ্তার করে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হল। ১৯১৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী বিচারক বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার রায় দিলেন। রমেশ আচার্য্য এবং যতীন রায় বারো বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। প্রিয়লাল আচার্য্য, কুমুদ নাগ, দেবেন্দ্র বলিক, গোপাল মিত্র সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। এছাড়া নিশি ঘোষ, চণ্ডী বসু এবং দেবেন্দ্র ঘোষের দণ্ড হল পাঁচ বছর। কিন্তু এসত্ত্বেও ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, মদন ভৌমিক, প্রতুল গাঙ্গুলি, রমেশ চৌধুরী প্রভৃতি ফেরার কর্মীগণ বাঙলা ও বাঙলার বাইরে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বিপ্লবী সমিতির শাখা প্রশাখা পরিচালনা করছিলেন। কিন্তু এদের পক্ষে বেশীদিন বাইরে থাকা সম্ভব হলনা। অল্পদিনের মধ্যেই এদের গ্রেপ্তার করে অতিরিক্ত বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হল। ১৯১৫ সালের ২৯শে মে এই মামলার রায় প্রকাশিত হল। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী পনের বৎসর এবং মদন ভৌমিক, প্রতুল গাঙ্গুলি, রমেশ চৌধুরী ও যতীন চৌধুরী দশ বৎসর করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। এই সকল ষড়যন্ত্র মামলার ফলে অনুশীলন সমিতি অনেকটা নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ল। কিন্তু বিভিন্ন শাখা সমিতির

অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত কর্মীদল এসে নেতার আসন গ্রহণ করে সমিতির কাজকর্ম পরিচালনা করতে লাগলেন। সমিতির এই ভাঙ্গা হাটেও বিপ্লব আন্দোলনের কাজ সমানভাবেই চলতে লাগল। কাজকর্ম বিন্দুমাত্র শিথিল হলনা। দিল্লীতে বড়লাট হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হল ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। আসামে মৌলবী বাজারে ম্যাজিষ্ট্রেট গর্ডনকে হত্যা করতে গিয়ে যোগেন চক্রবর্তী নিহত হলেন ১৯১৩ সালের ২৭শে নভেম্বর। লাহোরে লরেন্স উদ্যানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটল গর্ডন হত্যার দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ১৯১৩ সালের ১৭ই মে। কলকাতায় গোল দীঘিতে রিভলবারের গুলিতে পুলিশের গোয়েন্দা হরিপদ দে নিহত হল ১৯১০ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর পরদিনই ৩০শে সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহে পুলিশ ইন্সপেক্টর বঙ্কিম চৌধুরী বোমার আঘাতে নিহত হলেন। এই সমস্ত কারণেই সরকার বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। ফলে বিশিষ্ট কর্মীরা তখনও যারা বাইরে ছিলেন এবং অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক কর্মীদের মধ্যেও অনেকেই ফেরার জীবন অবলম্বন করতে বাধ্য হলেন। এই সকল ফেরার কর্মীদের মধ্যে ছিলেন নলিনী ঘোষ, সুরেশ ভরদ্বাজ, তারিণী মজুমদার, নলিনী বাগচী, প্রবোধ দাসগুপ্ত, সতীশ পাকড়াশী, মারাঠী তরুণ বিনায়ক রাও কাপলে, প্রভাস লাহিড়ী, জীতেশ লাহিড়ী, কাশী ষড়যন্ত্র মামলার ফেরার আসামী নরেন ব্যানার্জী, নিকুঞ্জ সেন, তারাপ্রসন্ন দে, মনীন্দ্র দত্ত, প্রবোধ বিশ্বাস, গোবিন্দ কর, কৃষ্ণ সাহা এবং আরও কয়েকজন।

ফরিদপুর জেলার কুঁয়োরপুর গ্রামের মনমোহন চক্রবর্তী ছিলেন দলের একজন বিশিষ্ট কর্মী। বাড়ীতে তার মা গিরীন্দ্রবোলা দেবী এবং নয় দশ

(৬-এর পাতার পর)

রাস্তায় রাস্তায় জড় হতে পারবে না। আরও যেহেতু এটা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে যে জনতা রাজা বাহাদুরের হাউলিতে জড় হয়ে বে-আইনী ভাবে শোভাযাত্রা গড়ে তুলতে পারে, সেই হেতু এতদ্বারা এই আদেশ দেওয়া যাচ্ছে যে তাও নিষিদ্ধ করা হল।"

সভামণ্ডপ ছেড়ে আমাদের মধ্যে অনেকে চলে গেলেন বাবু রজনীকান্ত দাসের বাড়ীতে, রজনীবাবু ছিলেন বরিশাল আইনজীবী মহলে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে এক বিরাট জনতার সৃষ্টি হল। পণ্ডিত কাব্যবিশারদ, মিঃ বিপিন চন্দ্র পাল এবং আমি তাদের সম্ভাষণ করে দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে এবং স্বদেশী ব্রতের সম্বন্ধে অটুট থাকতে আবেদন জানালাম। (চলবে)

বৎসরের ছোট বোন মঙ্গলা ছাড়া আর কেউ ছিল না। ফেরার বিপ্লবীরা স্থির করলেন তাদের দুজনকেই গ্রাম থেকে নিয়ে এসে কলকাতায় ফেরারী বাসায় ঘর পাতা হবে। মনমোহনবাবুর নিকট প্রস্তাব করা হল তিনিও বলা মাত্রই সম্মত হলেন। গিরীজা দেবীর সম্মতি পেতেও অসুবিধা হল না। ফেরার বিপ্লবীদের সকলকেই তিনি চিনতেন। আপন পুত্রের মত স্নেহ যত্ন করতেন মারাঠী তরুণ বিনায়ক রাও কাপলে অন্য প্রদেশের হলেও তিনি তাকে পুত্রাধিক স্নেহে কোলে বসিয়ে আহার করিয়েছেন। কত যত্নে বিছানা করে কাছে শুইয়ে রেখেছেন। পাছে পুলিশ এসে পড়ার আগেই তাকে জাগিয়ে দেওয়া যায় এজন্য সমস্ত রাত জেগে পাহারা দিয়েছেন। (চলবে)

রাজনীতির গতিপ্রকৃতি

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইন্দিরার গায়ে কাদা ছুড়ে গদীর লোভে হয় মিথ্যা অভিযোগের বহর তুলে সেদিন বাজিমাৎ করেছিল আর না হয় এখন নিজস্বার্থে সেদিনের সেই অভিযোগগুলি বিস্মৃত হয়ে তাঁর সাহায্যে মন্ত্রীসভা দখলের ব্যাপারে ন্যায় নীতির কোন বালাই বোধ হয় তোমাদের নেই। কোনটা সত্যি? হয় তোমরা বোকা আর না হয় তোমরা শয়তান এখন সত্য বল তোমরা কি? রাজনীতিতে বোকা বা শয়তানের আসন অল্পক্ষণ স্থায়ী, তার বেশী নয়; কাজেই এত কায়দা কানুন করে যে গদী হঠাৎ দখল করলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাহায্যে ও অন্যান্যের সাহায্যে তারা যদি তোমাদের পূর্ব পরিচয় ও চরিত্রকে মনে রেখে তোমাদের চেয়ারের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দেয় কোথায় দাঁড়াবে তখন? হবেও তাই, তোমরা নিজেদের তৈরী কালি মুখে মেখে রাস্তায় বের হতে পারবে ত? তোমাদের মহান নেতা ও তাঁর হনুমানটি যে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় রাখলেন এবং যে উচ্চাকাঙ্খার পরাকাষ্ঠা দেখালেন তা ইতিহাসে মসীলিপ্ত অধ্যায় যোজনা করবে। প্রধান মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় চরণ সিং ব্যক্তি জীবনে সৎ হয়েও রাজনৈতিক জীবনে এমন কপট আচরণ করলেন কেন বোঝা বেশ কঠিন। দ্বিতীয় বারে উপ প্রধান মন্ত্রী ও অর্থ মন্ত্রী হয়েও তাঁর আশা মিটলো না কেন? মন্ত্রীসভায় থাকা অবস্থায় তাঁর হনুমান 'রাজনারায়ণ' যে সব অসদাচরণ করে যেতে লাগলেন তা যেমন দৃষ্টিকটু তেমনি নিন্দার্হ। তবুও চরণ সিং এ ব্যাপারে এক দম্ চুপচাপ ছিলেন, কারণ তাঁর অভিপ্রায়মত রাজ-নারায়ণ মোরাজী মন্ত্রীসভাকে উৎখাত করে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করার কাজে মেতেছিল এবং বাস্তবে তা প্রমাণিত হলো সত্যে। রাজনীতির গতি ও প্রকৃতি আজ আর আদর্শবাদ, ত্যাগতিতিক্ষা বা জনকল্যাণের জন্য নয় এর লক্ষ্য এখন স্বার্থসর্ব্বস্ব ব্যক্তিদের পকেট ভর্ত্তি ও উচ্চাকাঙ্খা পূরণ, কূট কৌশলের মাধ্যমে মিথ্যার আশ্রয়ে এবং ইহার চেয়ে হীনতা, দীনতা, নম্রতা ও নোংরামি আর কি হতে পারে? শতধিক এই হীন প্রচেষ্টায় দখলিকৃত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা, হোক সে প্রধান মন্ত্রীর—তবুও এই দলচুটদের নিয়ে যে সরকার গঠন হোল সে সরকার কি স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারবে? লোভী ও স্বার্থপর আয়ারাম গয়া-রামেরা কোথাও বেশী দিন টিকে থাকে না, কারণ অপর পক্ষ এদের আরো লোভের ও প্রাপ্তি যোগের হাতছানি দিয়ে পুনরায় হাত করে নেবে।

জনপ্রতিনিধিদের যদি এই চরিত্র হয়, তবে জনগণের স্বস্তি ও শান্তি পদে পদে বিঘ্নিত হতে বাধ্য আর বর্তমানে তাই ঘটছে যা দেশের পক্ষে চরম ক্ষতিকর ও বিপদজনক। ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে এরূপ আদর্শহীনতার ও লোভীদের কার্যতৎপরতার নজির স্থাপিত হতে গেছে, কিন্তু কেন্দ্রিয় সরকারের ক্ষেত্রে ইহা সর্বপ্রথম সংঘটিত হল, যা দেশবাসীর পক্ষে অসহনীয় লজ্জাকর ও অপমান-

জনক। যে সব লোকসভা সদস্যরা জনতা দলের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রীত্বের গদীতে আসীন ছিলেন তারা কোন্ বিবেচনায় ও কোন্ জনকল্যাণের তাগিদে হঠাৎ রাতারাতি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে জনতা (এস) নামক কল্পিত দলে গেলেন তা কি জনগণের সম্মতিতে ঘটলো, না খেয়াল খুশী মত স্বার্থান্বেষীদের ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের জন্যই কেবল ঘটলো? জনসাধারণের নাম করে গোষ্ঠিকল্যাণ তথা আত্ম কল্যাণ করার অধিকার কি এদেশের বৃহত্তর জনসংখ্যা তাঁদের দিয়েছিল? তা নিশ্চয় দেয় নি এবং তাই এই অকস্মাৎ জনতাদল ত্যাগ ও ব্যক্তিস্বার্থে জনতা (এস) গঠন নীতিবিগর্হিত এক মহা অন্যায় কার্য্য যা যে কোনও আদর্শবাদীর চোখে হীনতার ও দীনতার পরিচায়ক।

রাজনারায়ণ জনতা (এস) দলের যোগ্য সভাপতি বিবেচিত হয়েছেন তার নীতিহীনতার ও ষড়যন্ত্রের পুরস্কার স্বরূপ। তাঁর এখন লোকসভা সদস্যের পদ ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় নির্বাচনে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করা অত্যাবশ্যক যে তিনি জনতা (এস) সভাপতি হয়েছেন জনগণের সম্মতিতে, অন্যথায় মানুষ তাঁকে রাজনৈতিক ভাঁড় আখ্যায় ভূষিত করবে এবং তাঁর সম্বন্ধে ঘৃণিত মনোভাব পোষণ করতে অভ্যস্ত হবে যা অতি স্বাভাবিক ও ন্যায় সঙ্গত ব্যবস্থা বলে আদর্শবাদী রাজনীতিকরা মেনে নেবে। কেন্দ্রীয় সরকারে যে ভাঙ্গাগড়ার খেলা হল তা গণতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়; কারণ নির্বাচক মণ্ডলী এক্ষেত্রে দর্শক ছাড়া কিছুই নয়, যদিও গণতন্ত্রের সঠিক ব্যাখ্যায় তারাই দেশের প্রকৃত মালিক। সাধারণ মানুষ তাই হতাশাগ্রস্থ ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে। তাদের বক্তব্যেই প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী হোন না কেন তারা যে কষ্টে ও দুঃখে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে তা বহাল থাকবে এবং তাদের কল্যাণের কথা শুনিয়ে রাষ্ট্রনায়করা নিজেদের আখের গুছিয়ে নেবে। মোরারজী সরকারের পতনের পর কোন রাজনৈতিক দলের বা লোকসভা সদস্যদের মধ্যবর্তী নির্বাচনের সম্মুখীন হবার সাহস দেখা গেল না, তবে ইন্দিরাজী এ ব্যাপারে সংসাহস দেখিয়ে নির্বাচনকে স্বাগত জানাতে চেয়েছিলেন। বর্তমানে এদেশের রাজনৈতিক গতি ও প্রকৃতি যে পথ ধরে চলতে চাইছেন দেশবাসীকে ক্রমশ নির্বাচন বিমুখও ও গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস হারাতে উৎসাহীত করেছে বলে আশংকা হয়। কেবল ক্ষমতালোভার দল এক্ষেত্রে উৎসাহীত হচ্ছে এবং নানা ছল চুতায় তারা নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির আশায় পালাবদলের পালায় মেতে উঠে দেশে অচিরে রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টির কাজে অজানতে সামিল হচ্ছে। আজকের দিনে রাজনীতি যেন একটা পেশা যা এতকাল নেশা বলেই দেখা গেছে। রাজনীতিতে এই সীমাহীন নির্লজ্জ স্বার্থপরতা ইতিপূর্বে খুব কমই দেখা গেছে। আদর্শবাদ মুখে, মত ও পথ স্বার্থবাদে পরিপূর্ণ। বামপন্থীরা এই পথের পথিক এবং তাদের কথা আগে দল পরে দেশ। তা যদি না হত তবে যখন ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে সর্ব ভারতীয় দল সি, পি, এম, জনতার সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত করে তাদের জোটের শরিক হয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হল; তখন কি জনসংঘ তথা আর এস, এস, গোষ্ঠী ও দলের সঙ্গে এক হাঁড়ির ভাত তারা খায় নি? স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য জনসংঘ ও আর, এস, এস এর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে কি তখন বিবেক বাধে নি? তখন কি জনসংঘ ও আর এস, এস. হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতো না?— না, সাম্প্রদায়িকতার কুকর্মে লিপ্ত ছিল না বা সাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষকতা তারা করছে

গান্ধী হত্যার ব্যাপারে কারা গোপনে গোপনে প্রধান অংশ নিয়েছিল তা কি তখন সি পি এর জানা ছিল না? না জানা থাকলেও দলস্বার্থে তা তখন বিবেচ্য বিষয় বলে গ্রহণ করা হয়নি। দক্ষিণপন্থীরা ব্যক্তিস্বার্থে উল্টো পাল্টা ডিগবাজী খায় আর বাম পন্থীরা দলস্বার্থে ঐ রূপ একই কাজ করে নানা মিথ্যার অবতারণা করে ও কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে। প্রত্যেক দলেরই একটা সুনির্দ্দিষ্ট মতবাদ ও আদর্শবাদ আছে এবং পূর্বে সেই মত ও পথ অনুসরণ করে সব দলই চলবার চেষ্টা করতো। সাধারণতঃ সেই নির্দ্দিষ্ট মতাদর্শেই ইতিপূর্বে রাজনৈতিক দলগুলি চলতো বলেই তারা মানুষের সক্রিয় সাহায্য ও বিপুল সমর্থন পেত, কিন্তু এখন স্বার্থের দাস হয়ে এরা প্রায় সকলেই অশ্রদ্ধার পাত্র হয়েছে। এই অবস্থা যদি কিছুকাল আরো চলে, তবে নির্বাচক মণ্ডলী এদের এই উলঙ্গ স্বার্থপরতা ও মিথ্যার বেসাতি আর বরদাস্ত করবে না। ডান ও বাম দুই দলই বর্তমানে জনগণের দরবারে ধিক্কৃত, নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হতে শুরু হয়েছে—তা কি বর্তমান রাজনীতিকরা জানেন না? মনে হয় জানেন, কিন্তু স্বার্থ চিন্তায় এমনই মগ্ন যে তারা জেনে বুঝেও নিজ নিজ স্বার্থের পায়ে মাথা লুটিয়ে দিতে পিছ্‌পাও হন না এবং এর ফলেই দেশের দুরবস্থা আজ তুঙ্গে।

মানুষের কল্যাণসাধন ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তাবিধানই রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান কাজ, অথচ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা জনকল্যাণ বর্তমানে গৌণ তাদের কাছে। রাজনীতিকরা বর্তমানে যেরূপ আত্মস্বার্থ সংরক্ষণে সদা তৎপর এবং ন্যায়নীতির কথা প্রায় বিস্মৃত দেখা যায়, তাতে দেশ পুনরায় বিদেশীদের দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য না হয় সেইটাই সবচেয়ে গুরুতর চিন্তা। আধুনিকযুগে অবশ্য বিদেশী কোন রাষ্ট্রই এদেশ দখল করে এখানে শাসন রজ্জু হাতে নিতে আসবে না, কিন্তু অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে যে পরাধীনতার গ্লানি বহন করতে হবে না—তা কে বলতে পারে?

রাজনৈতিক সততার অভাব প্রায় সব দলের নেতাদের মধ্যেই বর্তমান পরিদৃশ্যমান, তারা সুবিধাবাদের নীতিকেই আঁকড়ে ধরে নিজ নিজ দলের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এনে দিতে বদ্ধপরিকর, তা সে যে উপায়েই হোক আর যত নোংরা পথেই হোক। ডান বা বাম সকলেই সমান অপরাধে অপরাধী, কারণ ক্ষমতা দখলই মুখ্য উদ্দেশ্য তাদের কাছে এবং ব্যক্তি স্বার্থই শেষ লক্ষ্য দলপতির কাছে রাজনীতির বর্তমান গতি ও প্রকৃতি যে পথে ধাবমান, সে পথ কণ্টকাকীর্ণ বা ধ্বংস অনিবার্য্য। ভারতের মত ত্যাগ ব্রতী দেশে ঝাঁকে ঝাঁকে এত স্বার্থান্বেষী, সুযোগসন্ধানী ও আত্মসর্বস্ব রাজনীতি ব্যবসায়ীর আবির্ভাব সম্ভব হোল কি ভাবে, ভাবলেও দুঃখ হয়। গান্ধীজীর ও নেতাজীর উত্তরসাধকরা স্বার্থপরতা, দীনতাহীনতার কাছে আত্মসমর্পণ করলো এত দ্রুত কি করে? রাজনীতিকরা এখনও স্বার্থান্ধ পথ পরিহার করে যদি সঠিক পথে না চলতে পারেন, তবে সামরিক শাসন এদেশে অবশ্যম্ভাবী।

বিপ্লবী বাংলা পড়ুন
ও
সবাইকে পড়ান—

Phone.: 34-1795

বার্ষিক :—ডাকে ১৫.০০ টাকা ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা মূল্য—৩০ পয়সা

6461 dJS SEP 1979

বিপ্লবী পুস্তকমালা

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রচেষ্টা—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাসের—৩.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদারের—২.০০

ক্ষীরোদ কুমার দত্তের

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০

২। দ্বিতীয়তে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০

৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০

৪। পৌষালী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০

৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫

৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—৪০

৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—৭০

৮। স্বাধীনতার শহীদ মা ও মেয়ে—৪০

৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—৬০

১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—৫০

১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—৪০

১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—৭৫

১৩। দেশ যাদের ভোলেনি (১)—১.০০

১৪। দেশ যাদের ভোলেনি (২)—২.০০

১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—৫০

১৬। ১৯৩ এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০

১৭। হাডিঞ্জ হত্যা প্রচেষ্টা—৭৫

১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৪০

১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—৫০

২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :—৯নং বলরাম দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

শৈলজা—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

— সম্পাদক মণ্ডলী —

শ্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীঅমলেশচন্দ্র নন্দী, শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী

সম্পাদক—শ্রীসতি পাল রায়চৌধুরী

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতার—শ্রীমধুগোপাল পাল।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীসুরেন্দ্র সোম।

বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৯নং বলরাম দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৭

মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পার্টনারসিপি, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯